সচিত্র মাসিক পত্র।

পঞ্চম বর্ষ।

(প্রথম খণ্ড)

বৈশাখ হইতে আশ্বিন

১৩২৫।

সম্পাদক

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম্, এ।

প্রকাশক

সাহিত্য-প্রচার সমিতি লিমিটেড।

২৪ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

প্রথম ষাণ্মাসিক বিষয় সূচী।

বৈশাখ হইতে আশ্বিন

১৩২৫

গল্প-উপন্যাস

প্রবন্ধ

কবিতা

চিত্র সূচী



. পরীরূপিণী স্ত্রী সাগর গর্ভে নিমজ্জমান স্বামীকে উদ্ধার করিতেছেন। (আরব্যোপন্যাস).

৫ম বর্ষ — বৈশাখ—১৩২৫। — ১ম সংখ্যা

"নববর্ষ"

(১)

এ কি কল্লোল জাগে,
বিশ্ব-হৃদয় চঞ্চল করি
উন্মাদ অনুরাগে।
মর্ম্ম কারার রুদ্ধ দুয়ার
মুক্ত করিয়া আজি—
চিত্তে সঘন মঞ্জীর কার
ঝঙ্কারি উঠে বাজি।

(২)

ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে,—
বিরামের লাগি একটি কর্ম্মী
গিয়াছে সিন্ধুনীরে।
তা'রি সাথে গেল বন্ধু যাহারা
অতল সাগরে ভেসে,
তাদেরো রজনী প্রভাত হয়েছে
চির নবীনের দেশে।

(৩)

ঝরিছে কেন বারিধার,
বন্ধন ছিঁড়ি গেছে যারা চলি
ফিরিবে কি তারা আর?
দেখ, চেয়ে যারা রয়েছে দাঁড়ায়ে
তোমারি কুটীরের দ্বারে,
তাই বলে আজ দু'হাত বাড়ায়ে
বরণ করেনে তা'রে।

(৪)

এ মহাতীর্থ মাঝে—
কেবা ধনী কেবা নির্ধ্ধন ওগো—
সে ভেদ কি কভু সাজে?
একই জননীর সন্তান মোরা
লভেছি তাঁহারি জাতি;
সবে মিলে মোরা সত্যের খোঁজে
ছুটিব দিবস রাতি।

(৫)

ঝরে নব আলো রাশি,
সে আলো ধারায় আঁখি দুটি মাজি
উঠগো বিশ্ববাসী।
রুদ্র এসেছে পরখ করিতে
কেবা মেকী কেবা খাটী,
বহ্নির চির তপ্ত পরশে
মেকী হয়ে যাবে মাটি।

(৬)

নমো নমো নমো নম,
রুদ্রের বেশে এসেছে আজিকে
সুন্দর চির মম।
তোমার পরশ বিশ্বের বুকে
ফুটে উঠে অনুপম,
হে মোর নিখিল বাঞ্ছিত ধন
উজ্জ্বল মনোরম।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ

করিয়া থাকে। ডাকোজীর গৃহে এখনও প্রত্যহ অসংখ্য ভক্তের সমাগম হয় এবং মহাধুমধামের সঙ্গে পূজা ভোগ ও আরতি প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত কিম্বদন্তীর অনুরূপ প্রবাদ ভারতের সকল প্রদেশেই এক আধটি শুনিতে পাওয়া যায়। 'মনসার ভাসান' নামক প্রাচীন বঙ্গকাব্যের কবি গৈলা নিবাসী ভক্তপ্রবর বিজয়গুপ্ত সম্বন্ধেও কথিত আছে যে একদিন তিনি যখন ঘুমাইয়া ছিলেন, সেই ঘুমের ঘোরে শুনিলেন কে তাঁহাকে ডাকিতেছে :—

"উঠ উঠ বিজয়গুপ্ত কত নিদ্রা যাও,
শিয়রে মনসাদেবী নয়ন মেলে চাও।"

তিনি চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন বরাভয় লইয়া দেবী শিয়রে দণ্ডায়মান। এমন ধারা প্রবাদের উদাহরণ অনেক দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু দ্বারকা সম্বন্ধীয় কিম্বদন্তীর একটু বিশেষত্ব আছে। সোমনাথের ন্যায় "ত্রিলোকসুন্দর"ও তুর্কীর দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। তাহার চিহ্ন মন্দির-গাত্রে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তবে সোমনাথে যতটা বাড়াবাড়ি হইয়াছিল এখানে হয়ত ততটা হইতে পারে নাই। সেই সময়ে যে বিগ্রহটি অনাহত ছিল, তাহাও বিশ্বাস করা কঠিন হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ বর্ত্তমান দ্বারকানাথ বিগ্রহকে যতটা প্রাচীন বলিয়া পরিচয় দেওয়া হয়, বিগ্রহটিকে ভাল করিয়া দেখিলে সেরূপ মনে হয় না। কালাপাহাড়ের ভয়ে বিশ্বনাথের 'জ্ঞানবাপী'তে পলায়নের যে অর্থ, দ্বারকানাথের ডাকোজী ভবনে পলায়নেরও সেই অর্থ কি না, তাহা ভাবিবার বিষয় সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান দ্বারকার যে অংশে শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠিত সেই অংশটিই প্রাচীন, একথা পূর্ব্ব প্রবন্ধেই বলিয়াছি। এই অংশ প্রাচীর বেষ্টিত এবং এই প্রাচীরের বহু দ্বার এই জন্যই নগরীর নাম দ্বারবতী হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু প্রাচীনাংশও আদি দ্বারকা কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। বিশেষজ্ঞেরা কেহ কেহ বলেন যে, আদি দ্বারকা এখন সাগর-গর্ভে। স্থানীয় কিম্বদন্তীও এই মতেরই পরিপোষক। পাণ্ডাজীকে লইয়া একদিন আমি সাগর কূলে বেড়াইতে ছিলাম। তখন সূর্য্য অস্ত যায় যায়। নিমজ্জমান রবির রক্ত কিরণে সাগর বারি তখন গলিত স্বর্ণের ন্যায় উজ্জল। পাণ্ডাজী তখন সাগরের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বলিলেন, "ঐখানে 'স্বর্ণদ্বারকা' ডুবে আছে।" আমি বলিলাম, "ওখানে তা কেমন করিয়া জানিলেন?" তিনি বলিলেন, 'ভক্তেরা দেখিয়াছেন।' তিনি বলিতে লাগিলেন, আমরা যে দ্বারকা দেখিয়াছি তাহা মানুষের গড়া নকল দ্বারকা, আদি দ্বারকা স্বর্ণনির্ম্মিত, ও 'ত্রিলোক সুন্দর' এ সোনার যাত্রীদিগের মধ্যে যাঁহাদের জন্মজন্মান্তের বহু পুণ্যবল সঞ্চিত আছে, তাঁহারা দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহাদের চরিতার্থতার জন্য স্বর্ণদ্বারকা সাগর বক্ষে ভাসিয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিলেন, ইহা গল্প নহে যুগে যুগে ভক্তেরা নিজ মুখে ইহার সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নরদেহ ত্যাগ করিয়া স্বধামে গমন করিলে মহাসমুদ্র হরিপরিত্যক্ত দ্বারকানগরীকে তৎক্ষণাৎ প্লাবিত করিয়াছিল। সুতরা দেখা যাইতেছে যে সাগর কর্ত্তৃক দ্বারবতী ধ্বংস বিষ কিম্বদন্তী এবং শাস্ত্রোক্তি উভয়ই একমত। তবে শা ইহাও আছে যে ধ্বংস কালে ভগবানের শ্রীমন্দিরটি রক্ষ পাইয়াছিল। বিশ্বাসীর পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। আ যখন দ্বারকায় গিয়াছিলাম তখন, জারমানীর জলাতে সাগরপথে তীর্থযাত্রীদিগের গতিবিধি অত্যন্ত কমি গিয়াছিল। কাজেই সে'বার দ্বারকা অনেকটা নির্জ্জন এ নীরব ছিল। মন্দিরে তেমন ভিড় ছিল না। আ প্রত্যহই প্রাতঃস্নান করিয়া শুদ্ধদেহে এবং যথাসম্ভ শুদ্ধচিত্তে যাইয়া মন্দিরে বসিতাম। দেখিতাম, কত যা আসিতেছে যাইতেছে। তারা কত ভাবে, কত ভাব ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করিতেছে। কত ভ গর্ভগৃহকে শতবার প্রদক্ষিণ করিয়া অশ্রুপ্লাবিতবদ কাতরকণ্ঠে ভগবানের করুণা ভিক্ষা করিতেছে। কেহ ভগবদ্‌বিগ্রহের সম্মুখে ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিয়া পাপাস হৃদয়ের গুরুভার লঘু করিবার চেষ্টা করিতেছে। কেহ মধুরকণ্ঠে ভগবানের গুণগান করিতেছে, আবার কেহ উৎকর্ণ হইয়া তাহা শুনিতেছে। আমি সেই ভক্তসমাগ জাতিচ্যুতের ন্যায় দূরে বসিয়া কেবল দেখিতাম ও শুনিতাম। অনধিকারী বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে যে দিতে পারিতাম না। কিন্তু আমার মনে হইত আমার বিশ্বাসী পূর্ব্বপিতৃগণ আমার সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দিয়া সেই অসংখ্য ভক্তহৃদয় নিঃসৃত ভাবধারা আ পূরিয়া গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহাদের প্রেমাশ্রু আ

নয়নপথে বাহির হইয়া মন্দিরতল সিক্ত করিত। তাঁহাদের ভাবোন্মাদে আমার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত। আমার নিজের জ্ঞান ও বিশ্বাস যতই আমাকে দূরে টানিয়া লইতে চাহিত, আমার অন্তরবাসী পিতৃগণ আমাকে ততই যেন জড়াইয়া ধরিতেন। আমি তাঁহাদের কঠিন ভুজবেষ্টনে শক্তিহীন হইয়া পড়িতাম। এই ভাবে দিনের পরে দিন কাটিতে লাগিল।

চতুর্থ দিন গভীর রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম—আমি যেন আমার সুদূর গ্রাম্য ভবনে চলিয়া গিয়াছি। বহির্ব্বাটির পুকুরের ঘাটে বসিয়া আমার পিতৃদেব সান্ধ্যকৃত্য সমাপন করিতেছেন। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনীভূত হইয়াছে, আকাশে নক্ষত্রমালা একের পর আর ফুটিয়া উঠিতেছে। আমি আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছি। হঠাৎ দেখিলাম, যেন গোলাপী রঙ্গের একখানি কৃষ্ণনামের নামাবলী গগন-প্রান্তে অপূর্ব্ব আলোকে ফুটিয়া উঠিল। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, ভাল করিয়া চক্ষু মুদিয়া আবার চাহিলাম। এবারে যাহা দেখিলাম, তাহা বর্ণন করিতে ভাষা হারিয়া যায়। দেখিলাম—সেইরূপ অসংখ্য নামাবলী নৈশ আকাশকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। তাহাদের গোলাপী আলোকে নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত, তন্মধ্যে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণনাম ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে! আমি আমার ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিলাম—শীঘ্র আসুন, দেখুন এসে কি ব্যাপার! তিনি আসিলেন। তখন পিতাপুত্রে একত্রিত হইয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য নয়ন ভরিয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। এই যে পিতার সঙ্গে দেখিলাম, এইটিই এখানকার আসল কথা। আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞান ও বিশ্বাসই সর্ব্বস্ব নহে। আমরা সংস্কারের দাস, অতীতের সন্তান। আমাদের বয়সের হিসাব হয় না। অতীতের কত সহস্র হৃদয়ের চিন্তার উৎস আমার হৃদয়ে উৎসারিত তাহা কে বলিতে পারে? অতীতের সহস্র চক্ষুর জ্যোতি মিলাইয়া আমার নয়নের দৃষ্টি, অতীতের সহস্র প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিলাইয়া আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা গঠিত। মুখে যতই বড়াই করি না কেন, অতীতকে একেবারে অতিক্রম করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি দ্বারকা বরোদা-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। বরোদার মহারাজ ভারতে আদর্শ নৃপতি। তাঁহার রাজ্যে জন-সাধারণের শিক্ষার যেরূপ সুব্যবস্থা হইয়াছে, ইংরাজশাসিত ভারতবর্ষে তাহা হয় নাই। দ্বারকার ন্যায় ক্ষুদ্র সহরেও স্কুল, লাইব্রেরী প্রভৃতির দ্বারা জ্ঞান-প্রচারের যথেষ্ট সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। দ্বারকার পাব্লিক লাইব্রারী একটি দর্শনীয় বস্তু। নানা জাতীয় বহু সহস্র গ্রন্থে পাঠাগার পরিপূর্ণ। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ইংরাজী, মারাঠি, গুজরাতি এবং হিন্দি সংবাদপত্র টেবিলের উপর সাজান রহিয়াছে। দ্বারকার শিক্ষিত সমাজ মুষ্টিমেয় হইলেও অপরাহ্নে প্রায় সকলেই লাইব্রারী গৃহে সমবেত হন। দ্বারকার শ্রীমন্দির ব্যতীত সেখানে দর্শনযোগ্য অন্য কোন অট্টালিকা দেখি নাই। কেবলমাত্র সাগর কূলে 'সিন্ধুসদন' নামক একটি রমণীয় হর্ম্ম্য দর্শকের লুব্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই গৃহখানি একজন ধনী ভাটিয়া বণিকের আরাম নিকেতন। তিনি মধ্যে মধ্যে দ্বারকায় আসিয়া এই গৃহে বাস করেন। গৃহপ্রাঙ্গনে বণিক প্রবরের পিতা এবং মাতার মর্ম্মরমূর্ত্তি মর্ম্মরনির্ম্মিত চন্দ্রাতপতলে প্রতিষ্ঠিত। স্থানের মহিমায় এবং অবস্থানের সৌন্দর্য্যে এই গৃহখানি একখানি সুচিত্রিত পটের ন্যায় শোভা পায়। কিন্তু দ্বারকার প্রাচীন মাটিতে আধুনিক সকলই যেন কেমন খাপছাড়া বলিয়া মনে হয়। দ্বারকা বৈষ্ণবপুরী, এখানে জীবহত্যা নিষিদ্ধ। এই জন্যই শ্রীমন্দিরে অসংখ্য বনের পাখী নির্ভয়ে বিচরণ করে। সাগরের মাছগুলিও স্নানার্থীর দেহকে বেষ্টন করিয়া আনন্দে ঘুরিয়া বেড়ায়। এখানে একজন শ্বেতকায় পুলিশ সাহেব আছেন। তিনি যে বৈষ্ণব নহেন, তাহা বলা বোধ হয় অনাবশ্যক। মাংসের জন্য জীবহত্যা করিতে হইলে তাঁহাকেও অতি গোপনে হিন্দুর দৃষ্টির বাহিরে ঐ কার্য্য করিতে হয়। বলা বাহুল্য যে তিনি দ্বারকার প্রাচীরের বাহিরে, বহু দূরে সাগর কূলে বাস করেন। হিন্দুর এই মহাতীর্থে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রসার অতি অল্পই দৃষ্ট হইল। মানুষগুলি সমস্তই সেকেলে ধরণের। তাদের বেশ-ভূষায় পারিপাট্য নাই বলিলেই চলে। বাঙ্গালীর পক্ষে সেখানে আহার্য্য বস্তু নিতান্তই অপ্রচুর। মৎস্য মাংস ত নিষিদ্ধই, অনুর্ব্বর দেশ বলিয়া শাকসব্জীও যথেষ্ট পাওয়া যায় বলিয়া বোধ হইল না। শুনিয়াছি সেখানে দুগ্ধের অভাব নাই। তবে গাভীগুলির দৈহিক অবস্থা বাঙ্গালারই মতন শোচনীয় দেখিলাম। দ্বারকার প্রাকৃতিক

অবস্থান বড়ই মনোরম। পশ্চিমে আরব সাগর, উত্তরে এবং পূর্ব্বে যতদূর দৃষ্টি যায় মুক্ত প্রান্তর ধু ধু করিতেছে। সমুদ্রবেলা বৈচিত্রময়। কোথাও অনুচ্চ পর্ব্বত প্রাচীর, কোথাও বালুব তট, কোথাও বিশালকায় প্রস্তরখণ্ড সমাকীর্ণ বন্ধুর, ভগ্ন উচ্চ তীর যেন ঢেউ খেলিয়া চলিয়াছে। আকাশে বাতাসে, সাগরে এবং প্রান্তরে যেন একটা মহা গাম্ভীর্য্য বিরাজিত। হিন্দুর প্রাচীন সভ্যতার এই মহাশ্মশানে যখনই আত্মস্থ হইয়া বসিয়াছি, তখনই মনে হইয়াছে যেন চারিদিক হইতে কেবল 'হাহাকার' ভাসিয়া আসিতেছে। বায়ুর স্বননে হাহাকার, সাগরের গর্জ্জনে হাহাকার, এমন কি সেই নীরব, নিস্তব্ধ মহাকাশকে মথিত করিয়া যেন একটা নির্ব্বাক হাহাকার ছুটিয়া বেড়াইতেছে বলিয়া মনে হইত। বৈষ্ণব দ্বারকা এবং প্রভাসের অতীত কাহিনী মহাভারতের মুকুটমণি। তাহা ত ভুলিবার বস্তু নহে। কিন্তু বর্ত্তমান দ্বারকার মরুভূমিতে আসিয়া সেই কাহিনী স্মরণ করিলে অশ্রুর বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়।

দ্বারকার আব্‌হাওয়া অতি চমৎকার। স্বাস্থ্যের হিসাবে ওরূপ স্থান আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। দ্বারকার অধিবাসী অধিকাংশই হিন্দু। অল্প সংখ্যক মুসলমানও আছে। তাহাদের ভজন সাধনের জন্য সমুদ্রবেলায় একটি ক্ষুদ্র মসজিদ্ নূতন নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা বরোদা মহারাজের সমদর্শিতা এবং মহানুভবতার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। দ্বারকায় কোন প্রকার প্রাচীন শিল্পের নিদর্শন এখন বর্ত্তমান নাই। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা অধিকাংশই জন খাটিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইহাদের প্রায় সকলেই গরু এবং মহিষ পুষিয়া থাকে।

বেট দ্বারকা।

বেটদ্বারকা বা শঙ্খদ্বার মূল দ্বারকা হইতে প্রায় বিশ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে যাইতে হইলে মহিষের গাড়ীতে যাইতে হয়, সাগরের মধ্যে একটি ক্ষুদ্রদ্বীপে এই তীর্থ প্রতিষ্ঠিত। নৌকায় সমুদ্রের কতকাংশ পাড়ি দিয়া এই দ্বীপে পৌঁছিতে হয়। ওদেশে প্রবাদ যে ভগবান বিষ্ণু এইখানে তক্ষকের নিকট হইতে বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন। এখানেও অনেকগুলি মন্দির আছে, তন্মধ্যে শঙ্খনারায়ণ, বেটজী রণছোড়, এবং প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী মিরাবাইয়ের শ্রীকৃষ্ণ মন্দির উল্লেখযোগ্য। এরূপও শুনিতে পাওয়া যায় যে হিন্দুদ্বেষী ঔরঙ্গজেবের সৈন্যেরা দ্বারকার শ্রীমন্দির আক্রমণ করিলে দ্বারকার বিষ্ণুবিগ্রহ শঙ্খদ্বারে স্থানান্তরিত করা হয় এবং সেই অবধি নাকি আসল বিগ্রহমূর্ত্তি বেটদ্বারকায় রহিয়াছে। বেটদ্বারকার পশ্চিমপ্রান্তে জলদস্যুদিগের একটি সুনির্ম্মিত কেল্লা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইহাকে 'কুল্লোর কোট' বলে। এখানে বড় বড় কামান সাজান রহিয়াছে। প্রবাদ এইরূপ যে প্রাচীন যুগে বধেল রাজপুত বংশীয় রাজারা এই দ্বীপে রাজত্ব করিতেন। সেই বংশের শেষ নৃপতি সংগ্রাম জলদস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভয়ানক উপদ্রব আরম্ভ করেন। অবশেষে গাইকোবাড়ের একজন ইংরাজ সেনাপতি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া নির্ব্বাসিত হন। এই দ্বীপে প্রচুর শঙ্খ উৎপন্ন হয়। এখানকার শঙ্খে ঢাকার শাঁখার বালা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এই শঙ্খদ্বার শঙ্খাসুরের অস্থিপঞ্জর হইতে নির্ম্মিত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ এইখানেই সাগর বক্ষে শঙ্খাসুরকে নিহত করিয়াছিলেন। তার পরে এ দ্বীপের সৃষ্টি। ইহাই পৌরাণিক কাহিনী। ইংরাজেরা এ দ্বীপকে Pirate's Island বা 'বোম্বেটের দ্বীপ' নামে অভিহিত করেন। এই 'বোম্বেটে' শব্দ হইতেই 'বেট' শব্দ উৎপন্ন হইয়া থকিবে। প্রত্নতত্ত্বজ্ঞেরা কেহ কেহ বলেন যে এ বেটদ্বারকাই আদি দ্বারকা, বর্ত্তমানে যাহাকে দ্বারকা বলা হয় তাহা বহু পরে নির্ম্মিত হইয়াছিল।' বেটদ্বারকায় 'গোপী তালাও' নামক একটি সরোবর আছে। স্থানীয় কিম্বদন্তী এইরূপ যে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে শ্রীবৃন্দাবনের গোপীরা এই সরোবরের জলে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সরোবরের কর্দ্দমের একটা বিশেষ গন্ধ আছে। অনেকে উহাকে চন্দনগন্ধের অনুরূপ বলিয়া মনে করেন। এ কর্দ্দমের দ্বারা তীর্থযাত্রীগণ তিলক কাটিয়া থাকেন।

এই দ্বীপে একটি অতি প্রাচীন বৃক্ষ আছে। সে নাকি কল্পবৃক্ষ। কেহ কেহ ইহাকে পারিজাত আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকেন। এই বৃক্ষ নাকি দেবী সত্যভামার তৃপ্তির জন্য শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক স্বর্গের নন্দনকানন হইতে আনীত হইয়াছিল। বৎসরের দশমাস কাল এই বৃক্ষ পত্র-পুষ্প-বিহীন মৃতপ্রায় অবস্থায় থাকিয়া কেবল মাত্র আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে নাকি একটি করিয়া ফুল প্রসব করে। ঐ ফুলে রণছোড়জীর পূজা করিয়া থাকে।

বিষ্ণুর এই রণছোড় নাম বহুবার এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে। কাজেই এই নামের পৌরাণিক কাহিনী এইখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। প্রবল পরাক্রান্ত মগধরাজ জরাসন্ধ বার বার মথুরানগরী আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করেন। ভগবান বিষ্ণু জানিতেন যে বিধির অনতিক্রমণীয় বিধানে মহারাজ জরাসন্ধ তাঁহার অবধ্য। কাজেই অনর্থক লোকক্ষয়ে তাঁহার করুণহৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি রণভঙ্গ দিয়া মথুরা হইতে দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। তিনি অপ্রমেয় শক্তিশালী হইয়াও কেবল মাত্র লোকহিতের জন্য করুণাপরবশ হইয়া নিজে খর্ব্বতা স্বীকার করিলেন বিষ্ণুর এই অনুপম মহত্ব চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তাঁহার 'রণছোড়' নাম এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

পুণ্যতীর্থ দ্বারকায় এক সপ্তাহ মাত্র থাকিয়া যাহা কিছু দেখিয়াছিলাম, জানিয়াছিলাম, বুঝিয়াছিলাম এবং শুনিয়াছিলাম তাহা প্রায় সমস্তই বলা হইয়াছে। সময় এবং অবসর হইলে পরে প্রভাসের কথা বলিবার ইচ্ছা থাকিল আজ এই পর্য্যন্ত।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

অসময়ে।

(১)

মেসে ভাত খেয়ে রাত জেগে জেগে
টিস্ টিস্ করে গা
চোখে দেখি ধোঁয়া সরষের ফুল
কাঁপে সদা হাত পা,
গেল মেধা বল বুক টলমল
ফুরাল মাথার ঘি,
পড়িতে পড়িতে সকলি ফুরাল
পরীক্ষা দিব কি ?

(২)

ভোজের বাড়ীতে মাছের গন্ধে
গা বমি করিছে যে
দুপুর গড়ালে তোমার মাছের
পোলাও খাইবে কে ?
গন্ধে গন্ধে ক্ষুধা গেল চলে
হাতে পায়ে শুধু ঘি,
লুচি ভেজে ভেজে তারপর শেষে
ও লুচি খাইব কি ?

(৩)

পাত্রী দেখিতে ছুটিনু ছুটানু
অনেক সহর গাঁ।
কিন্তু হায়রে একটিও ক'নে
পছন্দ হলো না।
একটা—না—এক মিলে যায় খুঁত।
পেলেও রাজার ঝি
যৌবন গেলে খুঁজিতে খুঁজিতে
বিবাহ করিব কি ?

(৪)

খেতাবের লাগি জমিদারী গেল ;
জমা টাকা ছিল যা
তাও গেল সব পরোপাসনায়
উপাধি মিলিল না।
রায় বাহাদুরী মিলিল যখন
তখন সে আরেশ্চিঃ,
নাই ঘোড়া গাড়ী সহরের বাড়ী
খেতাবে হইবে কি ?

বেতাল ভ[ট্ট]

পল্লীর প্রাণ।

(১৬)

হরিঘোষাল গ্রামে ফিরিয়া গেলেন। গ্রামবাসীরা শুনিল, হরিঘোষাল নালিশ করিতে আসিয়াছেন শুনিয়াই যাদব আসিয়া তাঁহার হাতে পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া পড়ি[ল।] দুর্ব্বিনীত নিবারণ যতই অন্যায় করিয়া থাক, সে তাঁ[হার] সহোদর ভাই। এ যাত্রা তাহার প্রার্থনায় ঘোষাল তাঁহা

মার্জ্জনা করুন,—অবিলম্বে সে দেশে গিয়া নিবারণের যথোচিত শাস্তিবিধান করিবে। বেণীবাবুও আবার যাদবের মুরুব্বি কিনা—তাঁহাকেও হাতে পৈতা জড়াইয়া যাদব বড় ধরিয়া পড়িল। তিনি অতি সদাশয় ও ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি, একান্ত কৃপানির্ভর এই ব্রাহ্মণসন্তানের কাতর প্রার্থনা তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। যাদব যখন নিজেই প্রতিপাল্য ভ্রাতার যথেষ্ট শাস্তিবিধান করিবে বলিতেছে, তখন নালিশ না করিয়া এযাত্রা দুর্ব্বৃত্ত নিবারণকে ক্ষমা করিতেই তিনি হরিঘোষালকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। তাঁহার স্নেহের ভাই অম্বিকাও ইঁহাদের সমর্থন করিয়া হরিঘোষালকে বড় অনুনয় করিয়া কহিল, "দাদা, এঁরা এতক'রে ব'লছেন, নিবেটাকে এবার মাপই কর। একটা মাছি মেরে হাত কালো আর কেন ক'র্‌বে বল? যাদব ত ব'লছেই প্রতিবিধান এর ক'র্‌বে, তোমার মান সে রাখ্‌বে। দেখই না সে কি করে?" সহরের আরও কত উকিল মোক্তার আসিয়াছিল—বেণীবাবুর দ্বারে ত ইহারা বাঁধা—তারাও সকলে বড় অনুরোধ উপরোধ করিল। অগত্যা হরিঘোষাল নালিশটা ছাড়িয়াই দিলেন। আর সত্যই নিবারণ ত একটা নগণ্য কীট—পায়ে দলিয়াই তাকে তিনি পিষিয়া ফেলিতে পারেন। নালিশ করিয়া জেলে দিয়া তার কদর কেন বাড়াইতে যাইবেন? সহরেও সকলে এই কথাই বলিল। যাদবও বাড়ী আসিতেছে। ভাল, দেখা যাউক, সে কি করে। ইত্যাদি কত কথাই একদিনের মধ্যে গ্রামে প্রচারিত হইল।

নিবারণ কহিল, "মা, শুনলে দাদার কাণ্ড?"

ভবানীঠাকুরাণী উত্তর করিলেন, "তুই যেমন পাগল! হরিঘোষালের কথা—পনের আনাই ওর মন গড়া।"

"নালিশ ক'র্‌বে ব'লে গিয়েছিল, না ক'রেই যে ফিরে এল।"

"তা বেণীবোস বুদ্ধি ত রাখে। একটা ফৌজদারী মামলা বাধাবে, কি এমন হ'য়েছিল? ব'লে ক'য়ে হয়ত মিটিয়ে দিয়েছে। তারিণীও ত ব'ল্লে, নালিশ যদি করেই, পাঁচ সাত টাকা জরিমানা হয় ত ঢের, আর কিছু ভয় নেই। আর সে ত মাজেষ্টর সাহেবকে সব বুঝিয়েও ব'ল্‌বে ব'লেছিল, কত ভালবাসে তাকে সাহেব—কত খাতির করে——"

"দাদা যে বাড়ী আসছে।"

"তা আসুক না? কি ক'র্‌বে সে এসে?"

"সবাই ত ব'লছে আমায় শাস্তি দেবে।" বলিতে বলিতে নিবারণ একটু হাসিল।

ভবানীও হাসিয়া কহিলেন, "কি শাস্তি দেবে? তুই ত আর কচি খোকাটি নয় যে ধ'রে মার্‌বে তোকে? না হয়, দুটো গালমন্দ দেবে। তা বড় ভাই—দুটো গালমন্দ দিলই বা?"

"ত গালমন্দ যত তার খুসী দিক না? দাদা যদি সত্যি ধ'রেও মারে, তবু কি কথা ব'ল্‌ব?"

ভবানী কহিলেন, "তা গালমন্দ দুটো দিতে পারে বই কি? তুইও বড্ড বাড়াবাড়ি করেছিলি। পরের পুকুর—কেন তুই জোর ক'রে তা সাফ্‌ ক'ত্তে গেলি? না হয় গিইছিলিই, যখন এসে বারণ ক'ল্লে ছেড়ে দিলেই ত হ'ত। বুড়ো মানুষ, কেন একটা হাতাহাতি তার সঙ্গে ক'ত্তে গেলি? তুইও বাপু বড্ড গোঁয়াড়।"

"তা ও পুকুর সাফ ক'র্‌বে না কেন? চারধারে এতগুলো লোক পচা জল খেয়ে ম'র্‌ছে—"

"তাই বলে কি পরের যায়গায় জুলুম ক'ত্তে যাবি? না হয়, ওই তারিণী র'য়েছে, তাকেই বল্‌তিস্‌। সে ত পঞ্চায়েতী করে,—যা হক্‌ একটা বিলি ব্যবস্থা এর ক'ত্ত। তা তোর আর তর সইল না। একি মগের মুলুক যে কেবল গায়ের জোরেই যা খুসী তাই ক'রে বেড়াবি?"

নিবারণ উত্তর করিল, "গাঁয়ের দশা কতকটা এখন মগের মুলুকের মতই হ'য়েছে বই কি মা। তারিণী মামা পঞ্চায়েত আছেন, পঞ্চায়েতী আইনও আছে। তা ভয়ে সে আইন্‌ তিনি চালাতে চান না,—কখনও চেষ্টা কিছু ক'ল্লেও কেউ তার কথা শোনে না। শোনে না ত শোনেই না। ঢোঁড়া সাপকে ভয় কে করে? ঘোষালদের পুকুরের কথাই কি তাঁকে বলিনি? তা ওকে ভয় করেন তিনি বাঘের মত, জোর ক'রে কিছু ব'লতে ভরসা পেলেন না। খারাপ লোক—কোনও আইন মানবে না, নিয়ম মানবে না, যা খুসী তাই ক'রে বেড়াবে—শাসন ক'র্‌বার কেউ নাই,—গায়ের জোরে কি কুটচক্র ক'রে নিজের ভালই কেবল খুঁজবে—দশজনের সর্ব্বনাশ কেন হ'ক্‌ না তাতে, ফিরেও তাকাবে না। কেউ বল্‌বার নেই যে এইটেতে দশের ভাল্‌ হবে, কর,—ওইটেতে দশের মন্দ হবে,

না ক'রো না। সমাজের ধর্ম্ম চুলোয় গেছে,—রাজার আইন থেকেও নেই। এই ত গাঁয়ের দশা! মগের মুলুক আর কাকে বলে মা?"

বলিতে বলিতে নিবারণ কিছু উত্তেজিত হইয়া উঠিল। মুখ অগ্নিবর্ণ হইল,—বুক ফুলিয়া উচু হইয়া উঠিল।

ভবানী কহিলেন, "তা হ'লেও থানা পুলিশ র'য়েছে, জেলা সহরে হাকিম্ আদালত র'য়েছে—এই রকম জবরদস্তি কি চ'লে বাবা? এই ত ঘোষাল নালিশ ক'ত্তে গিয়েছিল,—নালিশ যদি ক'ত্ত, তবে ত জেল হ'ত।"

নিবারণ উত্তর করিল, "সব মাজেষ্টর সাহেবকে বুঝিয়ে ব'ল্তাম। সে হয়ত বুঝত, ভেতরের কথা কি জান্তে পেরে হয়ত ছেড়েই দিত, না হয় আইনের মান বাঁচাতে ২।১ টাকা জরিমানা ক'ত্ত। আর জেলই যদি হ'ত, না হয় হ'তই। তবু গাঁয়ের যা দশা, এই রকম জবরদস্তীই দরকার হ'য়ে প'ড়েছে। অসৎ লোক—স্বার্থপর লোক যারা দশের ভাল যাতে হয়, তা কিছুতেই ক'র্বে না,—এজন্যে আইন থাকলেও গায়ের জোরে তা অগ্রাহ্য ক'রেই চ'ল্বে, তাদের এম্নি ক'রেই জব্দ ক'ত্তে হবে। বুড়োরা ত সব ম'রে আছে,—ভাল কি তা বুঝবেও না, বোঝালেও ক'র্বে না। আজ জ্বরে, কাল কলেরায়, একে একে মর্বে—তবু পুকুরেরপানা হাতে করে একমুঠো তুলে ফেলবে না। গাছপাতাপচা বর্ষার জল সরিয়ে দিতে এক আঙুল যায়গা ছেড়ে দেবে না। অগত্যে ছেলেগুলোও যদি দল বেঁধে জোর জুলুমে এই সব করে, তবুও পাড়াগাঁগুলো কতক প্রাণ পেয়ে বাঁচে।"

ভবানী কহিলেন, "কি জানি বাছা, অতশত বুঝিও না,—তোদের সঙ্গে কি তর্ক ক'রে আমরা পারব? হিতে শেষে একটা বিপরীত না হ'লেই বাঁচি বাবা।"

"হিত যদি ঠিক হয়, হিতে কখনও বিপরীত হয় না। হাঁ, দশের হিতে একজন কারও বিপরীত হয়ত হ'তে পারে—দশের কখনও হবে না। তা এ রকম যায়গায় একজন কারও যতই বিপরীত হ'ক, সে বিপরীতও ভাল।"

ভবানী কহিলেন, "তোকে নিয়ে দেখ্ছি বিস্তর দুঃখু আমার কপালে আছে। এই বুদ্ধি ধ'রে ত অমনি গোঁয়ার্ত্তুমি ক'রে বেড়াবি। কবে কার হাতে খুন হবি, না হয় বড় একটা দাঙ্গাহাঙ্গামা ক'রে পাঁচ সাত দশ বছর জেলেই যাবি।"

নিবারণ হাসিয়া কহিল, "এই বুদ্ধি দিয়ে গোঁয়াড় ছেলে পেটে ধরেছ মা, দুঃখ যদি কিছু পেতে হয় ত পাবে। নিজে কর্ম্মের ফল ব'লে তা মাথায় ক'রে নিও।"

"তা বই কি? গোয়ার্ত্তুমি ক'রবি তুই, বেয়া বুদ্ধি এল তোমার মাথায়,—তার জন্যে দুঃখু ক্লেশ হ' আমার কর্ম্মফল।"

নিবারণ আবার হাসিয়া কহিল, "মায়ের কর্ম্মফল তা ছেলেতেই দেখা দেয় মা। আমি তোমারই কর্ম্মফল। আর—যেমনটি পেয়েছিলে তাই আছি। লেখাপড়া বেশী শিখিনি—তোমায় ছেড়ে দূরে সহরেও বেশী দিন গিয়ে রয়নি! বদলে নতুন কিছুও হয়নি।"

"রক্ষে কর্ বাপু, এ কর্ম্মফলে আমার কাজ নেই। তু একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে থাক। না হয় চাকরী বাকরী গিয়ে কর্ —রাতদিন আর এমন উদ্বেগ অশান্তিতে বাঁচিনে। এ রোদে রোদে জলে জলে এগাঁয়ে ওগাঁয়ে ঘুরে কোথায় একটা শক্ত ব্যামো স্যামো বাধাবি না কোথাও গিয়ে কার সঙ্গে একটা দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটাবি—"

"তাই ত মা, ওই ত আমার স্বভাবের দোষ। কেব খেয়ে আর ঘুমিয়ে চুপচাপ ঘরে বসে থাকতে যে পারিনে তা আমার জন্যে কি—এত অসুখী তুমি আছ মা?"

"বালাই! অসুখী কেন থাকব? তুই কি আমার তেম ছেলে যে কোনও দুঃখ আমায় দিবি? সাত জন্মের তপি আমার ছিল তাই এমন সোনার চাঁদ দুটি ভাই তোদে কোলে পেয়েছিলাম। তবে যেদো যেন কেমন হ'য়ে যেন যা —বাড়ীঘরে আস্তেই চায় না। ঘরে যে মাথা দিয়ে আছি—সে ত তোকে নিয়ে—তোর দিকেই চেয়ে। ওই ত সেদি ঘোষালদের বাড়ীর কুন্তীর মা ব'ল্ছিল, দিদি, তোমার নি রণের মত ছেলে আর হয় না, দুঃখীর ওপর এত দয়া আ কাল কি আর কেউ করে? তা তাদের ঘরটুকু সে দিয়েছিস্, বেশ ক'রেছিস্। আহা, বড় দুঃখু পাচ্ছে তার আমি কি বাবা মানা করি? দুঃখীর দুঃখু যদি কিছু দূর ক' পারিস্—সে ত আমার ভাগ্যির কথা। তবে ওই যে জো জুলুম ক'রে হাঙ্গামা বাধিয়ে ফেলিস্—তাই ত ভয় করে।"

"তাও যে ক'ত্তে হয় মা। কুচক্রী বদ্ লোক য কারও দুঃখু ঘটায়, তবে তা দূর কত্তে গেলেই যে তার স ঝগড়া বেধে যায়।"

"তা বাছা একটু সাবধান হ'য়ে চলিস্। ওই হরিঘোষাল বড় কুচক্রী লোক, বেণীবোসরা আবার তাদের পক্ষে,—যা ব'লে তাই করে। সহরে গিয়েছিল, কি চাল চেলে এসেছে কে জানে? যেদোই বা কেন এই কথা নিয়ে বাড়ী ধেয়ে আস্‌ছে ভেবে পাইনে। শেষে ভেয়ে ভেয়ে একটা মনান্তর তোদের না ঘটে। যত মরণ হ'য়েছে ত আমারই,—পোড়া যমেও যেন ভুলে র'য়েছে আমায়।"

নিবারণ হাসিয়া কহিল, "যমেই যদি ভুলে র'য়েছে, তবে আর মরণ কি ক'রে হ'ল মা? এমন অবুঝের মত কথাটাও ব'লে ফেলে?"

"নে বাছা, আমরা বুড়ো হাবা মানুষ, অত হিসেব করে কি আর কথা ব'ল্‌তে জানি?—হাঁরে, যেদো কি সত্যিই আস্‌বে?"

"কি জানি মা, চিঠি ত কিছুই লেখেনি। তবে হরিঘোষাল ত বড়াই ক'রে বেড়াচ্ছে, দাদা বাড়ী আস্‌ছে আমায় শাস্তি দিতে।"

"শাস্তি আবার কি দেবে? তা গালমন্দ কিছু যদি দেয়, ঝগড়াঝাটি একটা করিস্‌নে বাছা। ভেয়ে ভেয়ে তোরা ঝগড়া করবি, আর শত্তুরে হাস্‌বে।"

"গালমন্দ দেয় দেবে, চুপ ক'রে কাণে শুনে যাব—ঝগড়া আমি কিছু ক'রব না। তবে অন্যায় যদি কিছু বলেন, তাঁর হুকুম মেনেও চ'ল্‌তে পারব না। হরিঘোষাল যা ব'ল্‌লে, সত্যি যদি তিনি সেই রকম কিছু ক'রে থাকেন, তবে তিনি মোটেই ভাল কাজ করেননি। রামঃ! শুনে অবধি ঘেন্নায় যেন আমার ম'রে যেতে ইচ্ছে হচ্চে।"

"ওই ত! আগে থেকেই মনটা বাঁকিয়ে নিয়ে ব'সে আছিস্। যত গোল ত ওতেই হয়। না না! ও সব কিছু নয়। ঘোষাল এসে মিছে কথা রটিয়েছে। একটা কিছু বলা ত চাই। কেঁদে কেটে তার পায়ে ধরে পড়েছে, পৈতে দিয়ে বেণীবোসের হাত জড়িয়ে ধরেছে, দূর হ'ক্‌! তাই কি যেদো কত্তে পারে? তবে মিটিয়ে নেবার জন্যে—হাঁ, দু কথা গিয়ে বল্‌তে পারে। সে হ'ল সহরের উকিল, মামলা মোকদ্দমার ভাল মন্দর তোর চেয়ে ত বেশী বোঝে।"

"তা বুঝুক। এই নিয়ে হরিঘোষালের খোসামোদ কিছু করার চাইতে মামলা মোকদ্দমার হাজার মন্দও অনেক ভাল।"

"নিবুদা! বেড়াতে যাবে না আজ?" শিবু আসিয়া নিবারণকে ডাকিল।

"হাঁ, চল্! মার সঙ্গে ঝগড়া কচ্ছিলাম ব'সে।"

"কি নিয়ে?"

"এই হরিঘোষালের মামলার কথা নিয়ে।"

শিবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"খুব জব্দ হ'য়ে এসেছে! নালিশ ক'ত্তে গিয়েছিল—হাঃ হাঃ হাঃ! কিছু না নিবুদা—মামলা কেউ নেয় নি। একি একটা মামলা যে কেউ নেবে? সহরে যদি যেতে নিবুদা, ছেলেরা যে তোমার মাথায় ক'রে নিয়ে নাচত, সভা ক'রে ফুলের মালা পরিয়ে—তোমায় 'এড্রেস্' (অভিনন্দন) দিত।"

"ওমা! ছেলে বলে কি? মাথায় ক'রে নাচত! কেন? আর কি দিত ফুলের মালা পরিয়ে ব'ল্লি—কি এদ্রে দিত রে?"

শিবু হাসিয়া উঠিল, কহিল, "ও সব তুমি কিছু বুঝবে না জ্যাঠাই মা। নিবুদা কত বড় একটা বাহবা কাজ করেছে জান?"

"হাঁ, তা করেছে বই কি?—পরের পুকুর নিয়ে দাঙ্গা করেছে, এমন বাহবা কি আর হয়? বাহাবায় আর কাজ নেই বাছা। কোথার জল কোথায় গে গড়ায় তাই আগে দেখ। ওই ত যেদো আস্‌ছে, ভেয়ে ভেয়ে কি একটা ঝগড়াঝাঁটি বাধে তাই ভাবছি।"

"তা আসেন যদি আসুন না, তার জন্যে ভাবনা কি? হরিঘোষাল যদি মিছে করে কিছু ব'লেই থাকে, আমরা তাঁকে বুঝিয়ে দিতে পারব না? বড়দা লেখাপড়া শিখেছেন, ওকালতী করেন, বুঝবেন না যে নিবুদা অন্যায় কিছু করেনি, ভালই বরং করেছে? হরিঘোষালকে কে না জানে?"

"দূর হ হতভাগা ছেলে! হরিঘোষাল হরিঘোষাল কচ্চিস্—সে হ'ল তোর শশুর, গুরুজন—"

শিবু মুখ বাঁকাইয়া কহিল, "আর রেখে দেও জ্যাঠাই মা! শশুর! ভাবতেও ঘেন্না করে। বাবাকে ব'লব, ওদের ঘরে আমি বিয়ে ক'রব না। তার চাইতে আমার গলাটা যেন কেটে ফেলে দেন।"

নিবু কহিল, "তুই দেখছি বেজায় গোল বাধাবি শিবু! মেয়ে ত আর হরিঘোষালের নয়, অম্বিকেঘোষালের।"

"ও—দুই ঘোষালই সমান। দুই ভাই ত?—আর গাঁয়ে ওদের ওই একই ঘর ত? ওই হরিঘোষাল ওই তার বোন বামাঠাকুরঝি - কাজ নেই দাদা, পালিয়ে দেশ ছেড়ে যাব। তার চাইতে—ওই কুন্তীকে বিয়ে ক'রেও একটা কাজের মত কাজ হ'ত।"

ভবানীঠাকুরাণী একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, "আহা, আমার যদি আর একটা ছেলে থাকৃত শিবু, কুন্তীকে ঘরে আনতাম। অমন লক্ষ্মী মেয়ে আর হয় না।—নেই কিছু, কার হাতেই যে আবাগী মেয়েটাকে ফেলে দেবে।"

"মাকে বাবাকে ব'লে দেখ না জ্যাঠাই মা? বিয়ে যদি ক'ত্তেই হয়—"

নিবারণ বাধা দিয়া কহিল, "শিবু, তুই দেখছি বড় একটা গোল পাকিয়ে তুলবি। তোর বাবা কি ঘোষালরা যদি শোনে, একটা কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে।—কুন্তীর মাকে পর্য্যন্ত ওরা ভিটে ছাড়া করে পথে বের ক'রে দেবে।"

"এমন অত্যাচারী যারা তাদের মেয়েও বিয়ে ক'ত্তে বল নিবুদা? সে যে আমার মাবাবাকেও তবে বাড়ী ছাড়া ক'রবে।"

ভবানী কহিলেন, "ঐ যা বল্লি শিবু। ঘরের বিচের না ক'রে কেবল টাকা দেখেই যারা বউ আনে, তাদের শেষে দুঃখ পেতে হয় বই কি? এই ত কর্ত্তা যেদোর বিয়ে দিলেন, তখনই কত বারণ ক'রেছিলুম আমি—"

নিবারণ কহিল, "থাক্ মা, এখন সে পুরোনো কথা তুলে আর কাজ কি? সেই বাড়ী ছেড়েছে, তোমায় ত বাড়ী ছাড়া করেনি? চল্ শিবু। ও সব এখন ভাবিস্নি কিছু। বাপের সঙ্গে আগেই একটা ঝগড়া বাধাবি, তাই ভয় পাই। সহরে গিয়ে বরং একটু খোঁজ খবর নে, জান্ যে মেয়েটা কেমন।—বামাপিসির ভাইঝি ব'লে যে সে বামাপিসির মতই হবে, এমন কথা কিছু নেই। চল্, বেলা গেল, বেড়িয়ে আসিগে আয়।"

ভবানী কহিলেন, "রাতটাত বেশী করিস্নে যেন। সকালেই ফিরে আসিস্। যে অন্ধকার—পথের আবার দুধারে জঙ্গল যেন হুমড়ে পড়েছে। সাপ টাপের ঘাড়ে পা দিয়ে একটা সর্ব্বনাশ করবি শেষে।"

"তবু ত এই জঙ্গল সাফ ক'ত্তে যদি চাই—ব'লবে জুলুম কল্লাম, মগের মুলুক হল—" বলিতে বলিতে নিবু হাসিয়া উঠিল, শিবুও তার প্রতিধ্বনি করিল। হাসিতে হাসিতে দুইজনে চলিয়া গেল।

(১৭)

পরবর্ত্তী শনিবারে যাদব বাড়ী যাইবেন, তার জন্য প্রস্তুত হইলেন। চারুমুখীও অনেক ভাবিয়া শেষে স্থির করিলেন, তিনি তাঁহার সঙ্গে যাইবেন। স্বামীর চিত্ত অতি দুর্ব্বল,—শাশুড়ী কি দেবর কেহই কম পাত্র নহেন। একা অসহায় অবস্থায় ইঁহাদের হাতে গিয়া পড়িলে, তিনি কি করিয়া আসেন, তাহার স্থির কি? কে জানে, হয়ত মাতার ও ভ্রাতার কথায় ভুলিয়া তিনি বলিয়া আসিবেন, নিবারণ যাহা করিয়াছে, বেশ করিয়াছে। তার জন্য কোনও রূপ অবনতি স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। না, তা হয় না। একা তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। সঙ্গে গিয়া রাশ টানিয়া রাখিতে হইবে। নতুবা সব গোলমাল হইয়া যাইবে। চারুমুখী সঙ্গে যাইতেই প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু ছেলেপিলেদের কি করা যায়? সেই প্রায় একদিনের কষ্ট হাঙ্গামার পথ,—বর্ষা আসিতেছে, পাড়াগাঁয়ের সেই পানা পুকুরের পচাজল, জোঁক পোকে ভরা ঘন জঙ্গল,—বৃষ্টি পড়িলে পথে সেই প্যাচ্‌পেচে কাদা, বাড়ীতে সেই স্যাৎ-সেঁতে মাটির ঘর,—সব গিয়া যদি অসুখ হইয়া পড়ে, তবে কি হইবে? আবার ইস্কুল কামাইও অন্ততঃ দুই তিন দিন হইবে। অকারণে—অকারণে কেন বরং অপকারণে—এতটা পড়ার ক্ষতি ছেলেদের হইবে, এটাও অভিভাবকের বিশেষ বিবেচনা করা উচিত। কোলের মেয়ে টিবী—মোটে পাঁচ ছয় বৎসর বয়স হইয়াছে, তাকে নিতেই হইবে। বড় দুই ছেলে—জিম ও টম—(মাতার আদরের নাম—পিতা-মহী আদর করিয়া নাম রাখিয়াছিলেন, কার্ত্তিক আর গণেশ)—এখন আট দশ বছরের হইয়াছে,—ইস্কুলে পড়ে। বাসায় মহুরী আছে, মাষ্টার আছে, ঝি আছে, বামন আছে—(চাকর সঙ্গে যাইবে—নহিলে চলিবে কেন?)—পাশেই যাদবের বন্ধু উকিল হিমাংশুবাবুর বাসা—হিমাংশু-গৃহিনী কুমুদকামিনী আবার চারুমুখীর 'মেরীবেল্'—(ইংরেজী নামে পাতান আনন্দময়ী সখী)। তাঁদের তত্ত্বাবধানে অনায়াসে ছেলেদের রাখিয়া যাইতে পারে। চারুমুখীর প্রস্তাবে ও বন্দোবস্তে যাদব এক বাক্যে সম্মত হইলেন। জিম ও টম বাড়ী যাইবে, ঠাকুমা, কাকাবাবু আর কাকীমাকে দেখিবে—

বলিয়া একবার আবদার নিয়াছিল। কিন্তু গরম চোকে চাহিয়া চারুমুখী একটা ধমক দিতেই তারা ভয়ে চুপ করিল। পিতা অপেক্ষা মাতার শাসন কঠোর ছিল, মাতাকে তারা বেশী ভয় করিত। চারুমুখী শুনিয়াছিলেন, ইংরেজিতে নাকি একটা প্রবাদ আছে, 'বেত ছাড় না ছেলে মাটি কর'—(Spare the rod and spoil the child) ছেলেদের সম্বন্ধে এই নীতিই তিনি অতি সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুস্তকে আবার ইহাও পড়িয়াছিলেন, সুসভ্য ইয়োরোপ অঞ্চলে কোন্ কোন্ বড় লোক সুশিক্ষিতা জননীর সুশিক্ষা ও সুশাসনের প্রভাবেই অত বড় হইয়াছিলেন। তাঁহারও উচ্চাকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল,—নিয়ত অশিথিল শিক্ষায় ও শাসনে তিনিও তাঁহার ছেলেদের বড় লোক করিয়া তুলিবেন। যাহা হউক, মাতার কঠোরশাসনে অভ্যস্ত ছেলেরা এক ধমকেই নিরস্ত হইল। স্বামী ও কন্যাটিকে লইয়া চারুমুখী স্বামীর পল্লীগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় জিম ও টম ছল ছল চোকে পিতামাতার দিকে চাহিয়া রহিল। যাদবেরও চক্ষু দুটি ছল ছল হইয়া উঠিল। পুত্রদের কোলে টানিয়া নিয়া চুম্বন করিয়া মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা দিয়া তিনি বিদায় নিলেন।

চারুমুখী কহিলেন, "ভয় কি? ও বাসার মেরীমা তোদের কত ভালবাসে, তার কাছে থাকবি—দুঃখ কি? পড়াশুনো কামাই ক'রে এখন কি সেই পাড়াগেঁয়ে জল-কাদায় জঙ্গলে তোদের যাওয়া উচিত? আমাদের যেন জরুরী কাজ,—না গেলে নয়, তাই যেতে হ'চ্চে। তোরা কেন যাবি? এর পর বড় হ'য়ে ক'লকেতা কলেজে প'ড়তে যাবি,—এখন থেকেই আমাদের ছেড়ে থাকা একটু একটু অভ্যেস ক'ত্তে হয় যে! যা—যা! ইস্কুলে যা, বেলা হ'য়েছে দেখ্ছিস্ না? ওই যে মাষ্টারমশাই দাঁড়িয়ে আছেন, যা।"

ছেলেরা চোক্ মুছিতে মুছিতে বই খাতা লইয়া ইস্কুলে গেল। স-কন্যা চারুমুখীও স্বামীর সঙ্গে গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন।

পরদিন সকালে সস্ত্রীক যাদব বাড়ীতে গিয়া পৌছিলেন। আগের দিন পত্রেও তিনি সংবাদ দিয়াছিলেন, বিশেষ কোনও কার্য্যে ২।৩ দিনের জন্য বাড়ী আসিতেছেন।

যেটুকু সন্দেহ ছিল, তাহা দূর হইল। নিবারণ বুঝিল, হরিঘোষাল আসিয়া যাহা বলিয়াছে, তাহা সত্যই। দাদা অতটা হীনতা স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, আবার বাড়ীতেও ধাইয়া আসিয়াছেন, তাহাকে শাস্তি দিতে।

আবার বধূঠাকুরাণীও সঙ্গে আসিয়াছেন, পাছে শাস্তি-বিধানে দাদার শৈথিল্য কিছু হয়। ভাল দেখা যাউক, কি শাস্তি ইঁহারা দেন। বিরাগে ও অভিমানে নিবারণের মন যারপরনাই অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। প্রাণখোলা হাসিতে দাদার ও বউদিদির এই গৃহাগমনকে সে সম্বর্দ্ধনা করিতে পারিল না,—যদিও ইঁহাদের এইরূপ গৃহাগমন এখন নিতান্তই বিরল। তার সঙ্গে প্রাথমিক সম্ভাষণে যাদবেরও বিশেষ প্রসন্নভাব দেখা গেল না। ভবানীঠাকুরাণীও ভাবিলেন, হরিঘোষালের কথা তবে একেবারেই মিথ্যা নয়, যাদব যে সত্যই বাড়ী আসিল,—ভিতরে বাস্তবিকই কিছু তবে আছে। যাহাহউক, ছেলে বাড়ী আসিয়াছে,—মায়ের প্রাণ—অনেক দিন পরে মুখখানি দেখিলেন,—আনন্দে তাঁহার বুকখানি ভরিয়া উঠিল,—মুখেও প্রসন্নহাসি ফুটিল। প্রণত ছেলেকে বউকে আশীর্বাদ করিয়া, টিবীকে তিনি কোলে তুলিয়া নিলেন, সোহাগ করিয়া তার দাড়ীতে হাত দিয়া চুমা খাইলেন। তারপর কহিলেন, "কইরে, আমার কার্ত্তিক গণেশ কইরে? তাদের যে দেখ্ছি না! কোথায় রইল তারা?"

যাদব কহিলেন, "তারা আসেনি মা।"

"আসেনি! বলিস্ কি বাবা? এলি যদি এতদিন পরে তাদের নিয়ে এলি না! কতদিন দাদাদের চাঁদমুখ দুখানি দেখিনি——"

"ছুটি ত নেই—পড়া কামাই হয়——"

"কি যে বলিস্ বাছা, আজ ত রবিবার,—ক'দিনই বা তোরা থাকবি? ছেলে মানুষ—কি এমন পড়া কামাই তাদের হ'ত?—আমার প্রাণটাও'ত তাদের জন্যে পোড়ে। কতদিন দেখিনি—এইটুকু ব্যথা আমার বুঝলিনি যাদব! বাড়ীঘর ত ছেড়েইছিস্ এক রকম, তবু যদি একবার এলি ভাব্লিনি যে তাদের সঙ্গে না আনলে আমি কত দুঃখু পাব! দুদিনের পড়া কামাই—সেইটেই কি এমন বেশী হ'ল? সবই বাছা তোদের বাড়াবাড়ি।"

দাওয়ায় মাতাপুত্রে কথা হইতেছিল। চারুমুখী গৃহ-মধ্য হইতে একটু চাপা গলায় কহিলেন, "কেবল কি পড়া

কামাই? এই ত বর্ষা এল, পাড়াগাঁয়ের জল হাওয়া খারাপ—একটা অসুখবিসুখ কিছু যদি হ'য়ে পড়ে—"

ভবানী উত্তর করিলেন, "কি যে বল মা! পাড়াগাঁয়ে কি আর মানুষ নেই—না সবাই ম'রে ছেড়ে গেছে? বালাই! দুদিনে কি হ'ত? এই ত আমার যেদো আর নিবু—এই গেঁয়ে ঘরেই ত তাদের মানুষ ক'রে তুলেছিলাম,—জামাও পরেনি—জুতোও পরেনি—মিলুতও না এ সব তখন কিছু। শীতেবাদলে একটু পুরোণো কাপড় গলায় বেঁধে দিতাম—ধুলোকাদায় খেলা ক'রে বেড়াত। তারাও ত এত বড় হ'য়েছে।—ষাট! তাদের শরীরও এমন মন্দ হয়নি—ব্যামোপীড়ে ও এমন কিছু কখনও দেখিনি।"

চারুমুখী উত্তর করিলেন, "সেদিন কি আর এখন আছে? তখন যা চ'লত, এখন আর তা চলে না।"

"তা ত নাই মান নইলে, আমি বুড়ো পিতেমহই বাড়ীতে র'য়েছি—আমার কত আহ্লাদের কার্ত্তিক গণেশ—দু বছরে তাদের মুখ দেখতে পাইনে?"

যাদব একটু লজ্জা পাইয়া কহিলেন, "থাক মা। যা হ'য়েছে—তা হ'য়েছে। এবার পূজোর সময় বরং তাদের নিয়ে আসব।"

"তা বাবা, তোদের ছেলে, দয়া ক'রে দেখাস্ দেখ্‌বি। নইলে আর উপায় কি? দাবী দাওয়া ত আমার কিছু নেই, কেবল পুড়ে মরাই সার।"

বলিতে বলিতে ভবানী অঞ্চলে নয়ন মার্জ্জনা করিলেন।

যাদব কহিলেন, "তা বরং আমাদের সঙ্গে চল না মা? কদিন থাক, আবার যখন ইচ্ছে হয় আসবে।"

"থাক্ বাবা! আর কাজ কি? যেখানেই থাকে—ভাল থাক্, বেঁচে থাক্—কাণে শুন্‌লেই ভাগ্যি মনে ক'রব। তা ছেলেমানুষ—কার কাছে তাদের রেখে এলি?"

চারুমুখী বলিয়া উঠিলেন, "তা, সে জন্যে ভাববার কিছু দরকার নেই। বাসায় লোকজন আছে, আবার পাশের বাসায় আমার মেরীবেল্ র'য়েছে—"

কিছু বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া ভবানী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে র'য়েছে পাশের বাসায়?"

যাদব একটু সঙ্কুচিত ভাবে কহিলেন, "ওই আমার বন্ধু হিমাংশুবাবুর স্ত্রী,—পাশেই তাঁরা থাকেন, খুব ভাবসাব আছে;—সুবাদে ওই ব'লে তাকে ডাকা হয়।"

ভবানীর ললাটে একটু ভ্রূকুটি উঠিল। আর কিছু তিনি বলিলেন না। ইহাদের চালচরিত্র সবই ওই আলাদা একরকম হইয়া গিয়াছে! গেঁয়ে বুড়ী তিনি, এ সব বুঝিবার বুদ্ধি তাঁহার নাই। থাক্, ইহারা বাঁচিয়া থাক্, সুখে থাক্—সেই এখন তাঁর ভাল। হায়, কি কুতপ্রত্যাই তিনি করিয়া আসিয়াছিলেন, পেটের ছেলে—তাও এমন বিদেশী পরের মত হইয়া গেল। গভীর একটি দীর্ঘনিশ্বাস তিনি করিলেন।

কাদম্বিনী যাকে প্রণাম করিয়া তার ছেলেটিকে ঘরের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া জল আনিতে গেল। চারুমুখী দূর হইতেই খোকার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এস খোকা!" উঠিয়া কাছে গিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া নিলেন না। খোকা জ্যাঠাইমার এই সন্নাদর আহ্বানে কর্ণপাতও না করিয়া হামাগুড়ি দিয়া দরজার কাছে আসিল, চৌকাঠ ধরিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইল। ভবানী একবার চাহিলেন,—কিছু বলিলেন না। বড় অভিমান তাঁহার হইয়াছিল, আদর করিয়া নিবারণের ছেলেটিকে যাদবকে দেখাইবার জন্য কোনও রূপ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। যাদব কহিলেন, "নিবুর ছেলে বুঝি? বাঃ—দিব্যি ছেলে হ'য়েছে ত? নিয়ে এস না মা এ দিকে?"

ভবানী নিঃশব্দে উঠিয়া খোকাকে কোলে তুলিয়া কাছে আনিলেন,—যাদব হাত বাড়াইল, খোকার জ্যাঠার দিকে একবার চাহিল, তারপর মুখ ফিরাইয়া পিতামহীকে জড়াইয়া ধরিল। যাদব অগত্যা একটি টাকা বাহির করিয়া খোকার হাতে গুজিয়া দিতে চেষ্টা করিলেন;—খোকা হাতে নিল না, টাকাটি মাটিতে পড়িয়া গেল। ভবানী টাকাটি তুলিয়া নিয়া খোকাকে লইয়া ঘরে গেলেন। নিবারণকে ডাকিয়া তার হাতে বাজারের টাকা দিলেন। নিবারণ বাজারে গেল। দাদার চাকরকে সঙ্গে যাইতে ডাকিল না।

যাদব উঠিয়া কাপড়চোপড় ছাড়িয়া শিবুর পিতা ও বাড়ীর সর্ব্বানন্দ গাঙ্গুলী মহাশয়ের কাছে গেলেন।

পাড়ায় যাদব সব কথাই শুনিল। হরিঘোষাল আসিয়া যাহা বলিয়াছে, তাহাও শুনিল। ব্যাপারটা আদালত পর্য্যন্ত গড়াইতে না দিয়া যেভাবেই হউক যাদব যে আপোষে মিটাইয়া ফেলিতে পারিয়াছে, সেটা ভালই হইয়াছে। অনেকেই যাদবের বিচক্ষণতার প্রশংসা

করিলেন। নিবারণ বড় একটা গোঁয়ার্ত্তুমি করিয়াছে বটে, তবে কু-অভিসন্ধি তার কিছু ছিল না। যাদব যেন তাকে একটু বলিয়া কহিয়া বুঝাইয়া দিয়া যায়, যাহাতে এত বাড়াবাড়ি সে আর না করে। আর হাজার হইলেও হরিঘোষাল বুড়ামানুষ, নিবারণকে লইয়া যাদব যেন তার কাছে একবার যায়,—নরম হইয়া দুইটা মিষ্ট কথা বলিয়া তার কাছে মাপ চাহিয়া আসে। আপোষেই যদি মিটিয়া গেল, ইহা লইয়া আর কোনও মনোবাদ না থাকাই ভাল।

হরিঘোষাল আসিয়া যাহা বলিয়াছে,—যাদব দেখিল, পাড়ার লোকে তাহাই বিশ্বাস করিয়াছে,—কিন্তু তার জন্ম যাদবের প্রশংসা বই নিন্দা কেহই করিতেছে না। একটা ফৌজদারী মামলায় পড়িয়া ছোট ভাই জেলে না যায়, তার জন্ম উকিল বড় ভাই এটুকু করিবে না কেন? বিবাদ যেভাবেই হউক আদালতের বাহিরে মিটিয়া যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। তার জন্ম হাতে পায়ে ধরা ত অল্পের কথা, কিছু টাকাকড়িও যদি দিতে হয়, সেও ভাল।

যাদব নীরবে এই প্রশংসা গ্রহণ করিল, কোনও প্রতিবাদ করিল না।—তিনি যে বাস্তবিক হরিঘোষালের অতটা খোসামোদ করে নাই, তাহা কাহাকেও বুঝাইতে প্রয়াস পাইল না। ইহাতে ভাল বই মন্দ ত কেহ তাহাকে বলিতেছে না। সে আরও ভাবিয়া দেখিল, প্রতিবাদ করিলে তার ফল ভাল হইবে না। ইহা লইয়া গ্রাম্য লোকের মধ্যে নানা কথা হইবে। কত রকমের লোক আছে, কেহ কেহ হরিঘোষালকেও গিয়া বিদ্রূপ করিবে। তাকে আর এক রকম করিয়া গিয়া সব বলিবে। অম্বিকাঘোষাল ও বেণীবাবুর কাছেও বিকৃতভাবে এই প্রতিবাদের কথা যাইবে। তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইবেন,—মনে করিবেন যাদব গ্রামে গিয়া ঘোষালদের মান না রাখিয়া আরও গ্লানি বাড়াইয়া আসিয়াছে। নিবারণ ত তার কথা শুনিবেই না। মিছা আরও তার নামে দোষ পড়িবে। যাদব নীরবে সকল কথা স্বীকার করিয়া নেওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়া মনে করিল।

আর যদি এ সম্বন্ধে কিছু বলিতেই হয়, ঘরে গোপনে মাকে আর নিবুকে বুঝাইয়া বলিবে,—অবশ্য যদি দেখা যায়, যে তাঁহারা এতটা ভাল মনে করেন নাই। যাহা হউক, চারুমুখী যে আসিয়াছে, তার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যাহা ভাল হয় স্থির করিবেন;—আপাততঃ ইহাদের কাছে ওসব কৈফিয়তের কোনও প্রয়োজন নাই।

ওদিকে ভবানীঠাকুরাণী খোকাকে কোলে নিয়া রন্ধনশালার দিকে গেলেন। কাদম্বিনী মশলা পিষিতেছিল ভবানী কহিলেন, "বলি একবার যাও না বাছা, এতখানি বেলা হ'ল, মেয়ে কি খাবে একবার গিয়ে দেখ না? আ উনি চান টান এখন ক'র্‌বেন কিনা তাও ত সুধোতে হয়।"

কাদম্বিনী কহিল, "টিবীকে খাবার কিছু এখন দেননি মা?"

ভবানী কহিলেন, "না বাছা, ওসব আমি কিছু বু সুঝিনে। ঘরে ত চিড়ে আছে, মুড়ী আছে, আম আ কাঁঠাল আছে, কলা আছে, তা এসব ওঁরা মেয়েকে খে দেবেন কিনা কে জানে? তাই বলে ত চুপ্‌ ক'রেও থাব যায় না। আহা! মুখখানি বাছার শুকিয়ে গেছে,—কা রেতে হয় ত খাওয়াই ভাল ক'রে হয় নি। তা একব গিয়ে সুধোও না কি খাবে?"

কাদম্বিনী হাত ধুইয়া উঠিয়া বড় ঘরে গেল।

"দিদি, টিবু সকালে খাবার কি খাবে?"

চারুমুখী বাঁকা ঠোঁটে একটু হাসিয়া চক্ষু টানিয়া কা লেন, "তবু ভাগ্যি এতক্ষণে তা মনে তোমাদের প'ল উনি বুঝি গিয়ে তোমার খবর ক'স্তে পাঠালেন?"

"তা কি ক'র্‌ব মা? তোমরা সহরে থাক, ছেলে পি সব সহরে কত যত্নে মানুষ ক'চ্ছ—আমি গেঁয়ে বুড়ো হা মানুষ—তোমাদের ভাল মন্দ কিছু বুঝিও না, জানিও ন কি দিতে যাব, শেষে তুমি হয়ত ব'ল্‌বে মেয়ের অ ক'র্‌বে। তাই ওকে পাঠিয়েছি। আহা, বাছার মুখখা শুকিয়ে গেছে—ব'ল্লাম, যা খেতে বলে তাই গিয়ে দেও!"

বলিতে বলিতে ভবানী গৃহে প্রবেশ করিলেন। অ মান যতই হউক, নাতিনী কি খাইবে, তার জন্মও একটা উৎকণ্ঠা তাঁর হইতেছিল। তাই ছোটবধূ পাঠাইয়া দিয়া তিনিও দেখিতে আসিয়াছেন, কি খাইতে ব এবং ঘরে তাহা আছে কিনা।

দেবর ও শ্বশুর সঙ্গে অতি গুরুতর একটা ভেদ ঐ ঘটিবে, এবং অতি সরল ও কোমলস্বভাব স্বামীর স্বার্থরক্ষ ওজ্ঞ ভেদটি অতি কৌশলে তাঁকেই ঘটাইতে হইবে,—ই বুঝিয়া চারুমুখী দৃঢ়সংকল্প করিয়া আসিয়াছিলে

বাহিরে ভালমানুষীর কোনও ত্রুটি তিনি করিবেন না। তাঁহাদের সরল সহৃদয়তার কোনও অভাব ছিল না, কেবল নিবারণের দোষেই এই অনর্থ ঘটিল, কোনও প্রতিকার তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইল না,—পাড়ার ও গ্রামের লোক এইরূপ যাহাতে বোঝে তাহাই করিতে হইবে। কিছু অসুবিধা হইলেও, সরল অমায়িক ভাবে—ঘরের আপন বউটিকে যেমন চলিতে হয় ঠিক তেমনই চলিয়া তিনি দেখাইবেন, তাঁহার মনে কোনও গোল নাই। বাড়ী আসিবেন, স্থির করিয়া অবধি চারুমুখী এইরূপ ভাবেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন,—এবং বাড়ীতে পৌছিয়া সেইরূপ ভাবেই চলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন।

কিন্তু সে সংকল্প রক্ষাকরা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। একে ত বাড়ীতে পা দিয়া অবধিই তাঁহার গাটা যেন কেমন ছম ছম করিতেছিল,—চারিদিকে সব যেন কেমন ভিজা ভিজা ঠাণ্ডাঠাণ্ডা আঁধার আঁধার লাগিতেছিল,—মনটা কেমন মিয়িয়া যাইতেছিল, কেমন ত্যক্তবিরক্ত বোধ হইতেছিল,—মনে হইতেছিল, এখনই এই মুহূর্ত্তেই তাঁহার সেই সহরের সুখাবাসে ফিরিয়া যাইতে পারিলে, যেন তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতেন। দেহ মনের এই অবস্থা—ভাল, তাও তিনি কোনও মতে সহিতেন—'রোগী যেমন নয়ন-মুদিয়া নিম্বভক্ষণ করে।' কিন্তু শাশুড়ীর এই অনর্থক কঠোর ব্যবহারের বিরুদ্ধে তাঁহার মন একেবারেই বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তিনি ত হেলাফেলার মত একটা গেঁয়ে বউ নন,—সহরের প্রথিতযশা উকিলের গৃহিণী। সহরের পদস্থ-মহিলাসমাজে তাঁহার একটা মর্য্যাদাও আছে, বার্ষিক মেলার সময় যে মহিলাকমিটি হয়, তার মধ্যে সহকারী সম্পাদিকার পদও তিনি পাইয়াছেন,—সাহেব মেমরা 'মিসেস গাঙ্গুলী' বলিয়াও তাঁহার নাম উল্লেখ কখনও কখনও করিয়া থাকেন।—সেই তিনি কিনা আজ এই গ্রাম্যগৃহে গ্রাম্য বৃদ্ধা কর্ত্তৃক এরূপ অবমানিতা হইতেছেন! হউন এই গ্রাম্যবৃদ্ধা তাঁহার শ্বশ্রূ,—শ্বশ্রূই গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাঁহার উপরে নির্ভর করিতেছেন, তিনি শ্বশ্রূর উপরে এতটুকুও নির্ভর করেন না। বাড়ী আসিয়া পা দিতে না দিতেই এ কি অভদ্র ব্যবহার! গ্রাম্য বর্ব্বরতাকে সাধে তিনি এত ঘৃণা করেন? সাধে গ্রামে আসিতে চান না—গ্রাম্য সংসর্গে মিশিতে চান না?

সকল সংকল্প ভাঙ্গিয়া গেল,—একখানি সরোষ অভিমা চারুমুখীর চিত্ত ভরিয়া উঠিল। শাশুড়ীর এই বাঁকা কথা কোনও উত্তর করিতেও তাঁহার ঘৃণা হইল,—ঝায়ের দিে চাহিয়া তিনি কহিলেন, "কিছু খেতে দিতে হবে না ওদে ঢের খেয়ে থাকে ওরা,—সকালে একবেলা তোমাদের ঘরে খাবার কিছু না খেলে মরে যাবে না। সাধে বাড়ী আসতে চাইনে? আসতে আসতেই ত এই গঞ্জনা! একটা মে মোটে নিয়ে এসেছি—তাতেই এই, খোকাদের শু আনলে ত রক্ষেই ছিল না।"

একে নাতিরা না আসায় ক্ষোভে তাঁহার চি মথিত হইতেছে, তার উপর বধুর এত মর্ম্মান্তিক কথা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল,—তিনি কহিলেন, "প্রা আমার এত বড় ঘা দিয়ে কথাটা ব'ল্লে বাছা টিবুকে নিয়ে এসেছ ব'লে তোমায় আমি গঞ্জ কচ্ছি! ছি—ছি—ছি! এমন রূঢ় কথাটা—আমি শাশু আমায় তুমি ব'ল্লে! ওরা তোমার পেটে হ'য়েছে, আমা কি কেউ নয়? হাঁ, আমার রাগ হ'য়েছে,—হবে না আজ দুদিন আমি পথ চেয়ে আছি,—কাতুগণু আমা বাড়ী আসবে। কেন তাদের নিয়ে এলে না? তারা কি আমার কেউ নয়? কোনও দাবী দাওয়া আমার তাদে উপর নেই? তুমি তাদের পেটে ধরেছ,—তাদের বা ষেদোকে কি আমি পেটে ধ'রে নি? মাই দিয়ে মানু করিনি?"

"ক'রে থাকেন, তাদের সঙ্গে বুঝুনগে,—সে জন্যে পাওনা, কাণ ধ'রে আদায় ক'রে নিনগে। আমি কোন দায়িক নই যে আমাকে এত কথা শোনাচ্ছেন।"

"নেও বাছা, আর বকাবকিতে কাজ নেই। আমা সুখ চাইবে কি মানমর্য্যাদা রাখবে, এ প্রত্যাশা তোমা কাছে কিছু করি নে। সে যাই হ'ক্ গে, এখন আমা উপর রাগ ক'রে কি মেয়েটাকে না খেতে দিয়ে রাখবে আহা, বাছার মুখখানি শুকিয়ে গেছে। যাও ছোট-বউম মুড়ীটুড়ী কিছু না খায়, দুধ আর খান কত বাতাসা নি এস, আর কটা আম কেটে দেও,—তাই খাবে এখন।"

এই বলিয়া ভবানী বাহিরে চলিয়া গেলেন। কাদম্বি খাবার আনিতে যাইতেছিল। চারুমুখী ডাকিলে "কাদম্বিনী!"

"কি দিদি!"

"ওসব এনো না কিছু ব'লছি। টান মেরে আমি বাইরে ফেলে দেব।—নারাণ!"

চাকর আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

"তোর কাছে পয়সা আছে না?"

"আছে মা।"

"তবে যা—বাজারে গিয়ে ভাল খাবার কিছু টিনীর জন্যে নিয়ে আয়গে। বাজে কিছু আনিস্ নি। দুটো সন্দেশ আর দুটো রসগোল্লা খালি নিয়ে আস্‌বি। দেখিস্. পচাটচা হয় না যেন।"

এই বলিয়া চারুমুখী মেয়েটির হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কাদম্বিনীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "কোন্ ঘরে আমাদের থাক্‌বার যায়গা দিয়েছ?"

কাদম্বিনী নতমুখে উত্তর করিল, "ওই পশ্চিমের ঘরই—"

চারুমুখী কন্যার হাত ধরিয়া গম গম করিয়া নামিয়া গিয়া পশ্চিমের ঘরে উঠিলেন। বাড়ীতে কখনও আসিলে এই ঘরেই তাঁহারা থাকিতেন,—যথোপযোগী আসবাব-পত্রও এই ঘরটিতে থাকিত। নিবারণ এ ঘর কখনও ব্যবহার করিত না।

চারুমুখী দেখিলেন, ঘরটি বেশ পরিষ্কার ভাবেই সাজান আছে। কিছু প্রীত তিনি হইলেন,—মনের রাগটাও নরম হইল। হাঁ, কাদম্বিনীর একটু আক্কেল পছন্দ আছে বটে! হাজার হউক, একালের মেয়ে ত? লেখাপড়াও যেমন হ'ক্—একটু শিখিয়াছে ত?

গায়ের জামা, সায়া প্রভৃতি ছাড়িয়া আলনায় রাখিয়া, টেবিলের কাছে একখানি চেয়ারে চারুমুখী বসিলেন। খোলা জানালা দিয়া ফুর ফুরে হাওয়া আসিতেছিল। আকাশ পরিষ্কার ছিল, চমচমে রোদ উঠিয়াছিল,—সম্মুখের বারান্দা ভরিয়া বেশ রোদ পড়িয়াছিল,—ঘরটি ও বেশ সাজান ও পরিচ্ছন্ন। চারুমুখীর মনের ভারটা কিছু কমিল। এ দিকে পাড়া হইতে নিভম্বিনী, বিনোদিনী, ক্ষান্তমণি প্রভৃতি অনেকে আসিয়া তাঁহাকে স্মিতমুখে সম্বর্দ্ধনা করিল,—তাহাদের সঙ্গে নাগরিক জীবনের অনেক সুখসৌভাগ্যের ও গৌরবের কথাও আলোচনা করিবার সুযোগ হইল। মনটা একেবারে হালকা হইয়া গেল। সকলের উৎফুল্ল হাসিতে গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল।

একটু পরে কাদম্বিনী আবার আসিয়া সঙ্কুচিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, দুটো আম আর একটু দুধ কি টিবুকে এনে দেব?"

একটু চক্ষু টানিয়া চারুমুখী কহিলেন, "তা ইচ্ছে হয় দিতে পার এনে।"

"তুমি এখন নাইবে না? নেয়ে কিছু—খেলে ভাল হত। রাঁধ্‌তে ত বেলা হবে—"

বিনোদিনী কহিল, "কোথায় বা নাইবে ভাই! ে জল,—মাগো! হাত দিতে ঘেন্না ক'রে।"

চারুমুখী কহিল, "জল কি খুব খারাপ? তাইত, কি করি তবে—এই ত মুস্কিল পাড়াগাঁয়ে! খারাপ জল টল ভাই, কোনও দিন আমার সহ্য হয় না। আগে ত নাইবা জন্য নদীর জলই আনিয়ে দিতেন,—এখন আর কোন ভাবনা নেই, কল হ'য়েছে, বাসায়ও একটা কল বছর খানেক হ'ল আনিয়েছেন। দু তিন শ টাকা খরচ ক'ত্তে হ'ল তাতে তা ভাই, তোলা জলে কি আর কাজ চলে? এ খাসা—কল খুলে দিলাম—ঝর ঝর করে পড়ছে—না হয় চৌবাচ ভ'রেই রেখে দিলাম—কোনও ভাবনা নেই।"

ক্ষান্তমণি কহিল, "তাইত ভাই, তুমি কি ওই পুকুরে জলে গিয়ে নাইতে পার্‌বে? তা এক কাজ কর্ ছোটবউ, কুয়ো থেকে দুকলসী জল কেন তুলে দেনা?"

"কুয়ো! বাড়ীতে কি কুয়ো আছে?"

নিতম্বিনী উত্তর করিল, "হাঁ, নিবারণ ত এবার এক কুয়ো করেছে। জল মন্দ নয়।"

"খুব ঠাণ্ডা হবে না?"

"তা বরং গরম ক'রেই দেবে; কুয়োর জল ত ঠাণ্ডা আমাদেরও গায়ে দিলে গাটা ছম ছম ক'রে ওঠে!"

কাদম্বিনী কহিল, "তবে কি কুয়োর জলই গরম ক' দেব দিদি?"

চারুমুখী একটা হাই তুলিয়া কহিলেন, "তা নারাণ আ —সেই দেবে এখন। তুমি আর অত ক'ত্তে যাবে কেন?

কাদম্বিনী চলিয়া গেল। ক্ষান্তমণি কহিল, "তা বলি ভাই, তোমার যেমন বিবেচনা, এমন আর কজ হয়? কি বলিস্ বিনি? এই ত সহরে থাকে, কদ্দিন বাড়ীতে এসেছে, যাদের উপর কাজের কোনও চাপ দি চায় না। খেতে পরতেও ত ওরাই দিচ্ছে!

চারুমুখী একটু সগর্ব্ব হাসি হাসিয়া কহিলেন, "তা ভাই চপ কেন দেব? সঙ্গে চাকর র'য়েছে, নাইবার একটু, জল সেই ত দিতে পারে। অনর্থক কাউকে বেশী খাটান তাই আমি ভাল বাসিনে।"

বিনোদিনী কহিল, "ঐ ত নারাণ এসেছে। যা ত নারাণ, কুয়ো থেকে দুকলসী জল তুলে—ছোটবউ উনুন ধরিয়ে দেবে এখন—গরম করে দে—তোর মা নাইবেন। এস ভাই, মাথাটা আঁচড়ে তোমায় তেল মাখিয়ে দিই। আহা, পথের ক্লেশে শরীর যেন কালী হয়ে গেছে।"

"ওমা তুমি কেন ভাই ঠাকুরঝি? তেল একটু মেখে নিতে আমিই কি পারব না? তবে ওখানে অবিশ্যি ঝিই তেল টেল মাখিয়ে দিত। মাগী মানুষ বড় ভাল—ছেলে পিলেদের দরদ ক'রে যেন আপনার জনের মত।"

"তা আমরা কি পর ভাই? বাড়ী এসেছ কদ্দিন পরে—একটু তেল তোমায় মাখিয়ে দিতে পারব না?"

এই বলিয়া বিনোদিনী মাথার কাপড় ফেলিয়া দিয়া—চারুমুখীর খোপা খুলিতে আরম্ভ করিল।

যথারীতি চারুমুখীর স্নানাদি হইল। নিতম্বিনী মাথা আঁচড়াইয়া সিন্দুরের টিপ পরাইয়া দিল। প্রফুল্ল মুখে তিনি চেয়ারখানিতে গিয়া বসিলেন। কাদম্বিনী কিছু আম মিষ্ট দুগ্ধ আনিয়া দিল. জলযোগ করিয়া দুটি পান মুখে দিয়া চারুমুখী শয্যায় শয়ন করিলেন। পথশ্রমে ক্লিষ্ট ছিলেন—একটু বিশ্রাম আবশ্যক বই কি?

তখন যাদব ফিরিয়া আসিলেন। প্রতিবেশিনীরা যে যার গৃহে গেলেন। যাদব ঘরে গিয়া বসিলেন, নারাণ তামাক আনিয়া দিল। তামাক খাইতে খাইতে যাদব পাড়ায় যাহা শুনিয়া আসিয়াছিলেন, সব চারুমুখীকে বলিলেন।

চারুমুখী কহিলেন, "বেশ করেছ। ঘরেও ওসব কাউকে বুঝিয়ে বলবার দরকার নেই। দেখনা ঠাকুরপো কি বলে? ওদের বোধ হয় খুব অভিমান হয়েছে। এতটা হীনতা তুমি স্বীকার করেছ, এই নিয়ে ঝগড়া ওরাই বাধাবে। বেশ তাই হ'ক্—তোমার দোষ কিছু থাকবে না। লোকে ওদেরই মন্দ বলবে।"

দুইজনে এই প্রসঙ্গে ফিসফাসে অনেক কথা হইল। ভবানীঠাকুরাণী বক্রদৃষ্টিতে দুই একবার ওই ঘরের দিকে চাহিলেন। বউ ছেলের কাছে কত করিয়া যেন ঝগড়ার কথা লাগাইতেছে। তা লাগাক, এত ভাবনা কি তাঁহার?—দুটি খাইতে দেয়, না হয় নাই দেবে। নিবারণ ত আছে, দুটি ভাত কাপড় সেই কি তাঁহাকে দিতে পারিবে না?

(ক্রমশঃ)

সংগ্রহ বৈচিত্র।

করাতের গুড়া হইতে কাগজ প্রস্তুত।

বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য কাগজের অভাবের কথা সকলেই অনুভব করিতেছেন। কাগজের মূল্য ত বৃদ্ধি পাইয়াছেই, তাহা অপেক্ষাও কষ্টের কারণ হইয়াছে যে চড়া দাম দিয়াও প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট কাগজ পাওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে যে দ্রব্য দিয়া কাগজ তৈয়ারী হয় তাহা প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধে ব্যবহৃত হইতেছে। তাহার উপর নিয়মিত জাহাজ চলাচল না থাকায় উক্ত দ্রব্যাদির সরবরাহও কম হইতেছে।

এই কষ্ট দূর করিবার জন্য কিছুকাল অবধি করাতের গুড়া হইতে কাগজ নির্ম্মাণের চেষ্টা হইতেছে। স্কটল্যাণ্ড দেশে এবারডিন্ সহরের ডনসাইড (Donside) কাগজের কলে করাতের গুড়া হইতে কাগজ তৈরী করিবার পরীক্ষা আরম্ভ হয়। এই চেষ্টায় তাহারা সফলও হইয়াছে। (Aberdee Euening Express) নামক একখানি খবরের কাগজের এক সংস্করণ কাগজে ছাপা হইয়াছে। উক্ত কাগজের কল সংবাদপত্রাদি ছাপাইবার জন্য নূতন উপায়ে যে কাগজ তৈরী করেন, সেই কাগজে বিলাতের Express নামক সংবাদ পত্রখানি ছাপা হইতেছে। কাগজগুলি বেশ হইয়াছে। প্রচুর পরিমাণে এই কাগজ তৈয়ারী হইতেছে। আশা করা যায় যে শীঘ্রই কাগজের অভাব কিছু পূরণ হইবে।

একশত বৎসর পূর্ব্বে বিলাতের বারমণ্ডসে (Bermondsey) কাগজের কল এই উপায়ে কাগজ প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করেন।

সাধারণ পাঠাগার।

আজকাল সমস্ত সভ্য দেশেই বড় বড় সাধারণ পাঠাগার স্থাপিত আছে। বহুলোক এই সমস্ত পাঠাগারে যাইয়া জ্ঞানের চর্চ্চা করিতেছেন। শিক্ষার প্রসারের জন্য ইহার আবশ্যকতা এখন সকলেই স্বীকার করেন। আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে পৃথিবীর প্রাচীন ও আধুনিক কয়েটি বিখ্যাত পাঠাগারের কথা বলিব।

খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৪০ সালে প্রাচীন গ্রীসের রাজধানী এথেন্স (Athens) নগরে পিসিসট্রেটস (Pisistratos) একটি পাঠাগার স্থাপিত করেন। ইহা পৃথিবীর প্রাচীনতম সাধারণ পাঠাগার বলিয়া কথিত হয়। টলেমী নামধারী মিশররাজগণ কর্ত্তৃক এলেকজেণ্ড্রিয়া (Alexandria) নামক নগরে একটি বৃহৎ সাধারণ পাঠাগার স্থাপিত হয়—ইহাতে ৫০০,০০০ খণ্ড পুস্তক ছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৭ সালে ইহা স্থাপিত হয়। কথিত আছে যে ৬৪১ সালে প্রাচীন

ওমার মিশর জয়ের সময়ে এই পাঠাগার আগুন লাগাইয়া নষ্ট করেন। কিন্তু সৈয়দ আমীরআলি সাহেব তাঁহার History of the Saracens নামক গ্রন্থে এ কথা অস্বীকার করেন। তাঁহার মতে ওমারের ন্যায় সদাশয় খালিফের দ্বারা একার্য্য অনুষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। তিনি বলেন, জুলিয়াস সিজার যখন এলেকজেন্দ্রিয়া নগর আক্রমণ করেন, সেই সময় উক্ত পাঠাগারের কিয়দংশ নষ্ট হইয়াছিল। তাহার পর চতুর্থ খৃষ্টাব্দে রোমসম্রাট্‌ থিয়োডোসিয়াস্ (Theodosius) অবশিষ্টাংশ নষ্ট করেন। এসম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। যাহা হউক, যাঁহার দ্বারাই এই কার্য্য হইয়া থাক্, তিনি পৃথিবীর মহা ক্ষতি করিয়াছেন সন্দেহ নাই। অসিনাস্ পলিও রোমে প্রথম সাধারণ পাঠাগার স্থাপিত করেন। ইহার পর রোমসম্রাট্‌ অগষ্টাস্ প্যালাটিন (Palatine) নামে এক প্রকাণ্ড পাঠাগার স্থাপন করেন।

গিবন (Gibbon) বলিয়াছেন যে মিশর দেশে ফতেমীয় (Fatamites) নামধারী মুসলমান সম্রাট্‌গণ যে পাঠাগার স্থাপন করেন, তাহাতে একলক্ষ অতি সুন্দর বাঁধাই পাণ্ডুলিপি ছিল। স্পেনে ওমিয়াড্ (Ommiades) রাজগণের এক পাঠাগার ছিল। তাহাতে পুস্তকের সংখ্যা ছিল ৬০০,০০০ লক্ষ। ইহার মধ্যে ৪৪ খানি তালিকা পুস্তক (Catalogues) ছিল। স্পেন দেশে এণ্ডালুসিয়া বলিয়া একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। সেই রাজ্যে ৭০টি সাধারণ পাঠাগার ছিল।

এখন আমরা আধুনিক পাঠাগারের কথা বলিব। ইউরোপের আধুনিক বড় বড় পাঠাগারগুলির কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইংলণ্ডে ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরী (British Museum Library) নামে যে প্রকাণ্ড পাঠাগার আছে, তাহার বই রাখিবার আলমারীগুলি একত্রিত করিলে তাহার বিস্তৃতি হয় ৩২ মাইল। পুস্তকের সংখ্যা ১,২৫০,০০০ লক্ষ। পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ৮৯০০০ হাজার। সেই লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রতি বৎসর গড়ে ৪০০০০ হাজার পুস্তক সংগ্রহ করেন।

সম্রাট চতুর্দ্দশ লুই প্যারিসে Bibliotheque Nationale of Paris নামক যে পাঠাগার স্থাপন করেন তাহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার পুস্তকের সংখ্যা ১,৪০০,০০০ লক্ষের উপর। ক্ষুদ্র পুস্তিকার (Pamphlets) সংখ্যা ৫০০০০০ লক্ষ। এই স্থানে ১৭৫,০০০ লক্ষ পাণ্ডুলিপি আছে। মানচিত্র (Maps and charts) প্রভৃতির সংখ্যা ৩০০,০০০ লক্ষের উপর। পুরাতন মুদ্রা ও পদক প্রভৃতির সংখ্যা ১৫০,০০০ লক্ষ। অঙ্কিত চিত্র (engravings) পুস্তকের সংখ্যা ১[illegible]। ইহা ব্যতীত ১০০,০০০ লক্ষ নানাবিধ চিত্র আছে।

এই ফ্রান্স দেশে আর একটি পুস্তকাগার আছে। তাহাতে ৬০০,০০০ লক্ষ পুস্তক আছে, ক্ষুদ্র পুস্তিকা আছে [illegible] পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ৮৫০০০ হাজার।

জর্ম্মাণীতে মিউনিচ্ নগরে একটি পুস্তকাগার আছে,—তাহাতে ছয় লক্ষ পুস্তক ও দশহাজার পাণ্ডুলিপি আছে।

অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার পুস্তকাগারে পাঁচলক্ষ পুস্তক ও বিশহাজার পাণ্ডুলিপি আছে।

রোমের ভেটিকান (Vatican) প্রাসাদে পোপদের যে পাঠাগার আছে তাহাতে দুইলক্ষ পুস্তক ও ৪০,০০০ হাজার পাণ্ডুলিপি আছে।

রুষিয়ার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে ৬৫০,০০০ লক্ষ পুস্তক ও ২১,০০০ হাজার পাণ্ডুলিপি আছে।

ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনের পুস্তকাগারে পুস্তকের সংখ্যা ৪০০,০০০ লক্ষ ও পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ১৫০০০ হাজার।

মশক নিবারণ।

(শ্রীমাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়।)

ম্যালেরিয়া বিষবাহী মশক সম্বন্ধে বহু আলোচনা ও গবেষণার বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। শব্দ ও বর্ণ বিশেষে মশকের নৈসর্গিক অনুরাগ বিচিত্র বলিয়াই মনে হয়।

মশক তাহার নিজের গুণ গুণ শব্দের ন্যায় মিষ্ট স্বরের নিতান্ত অনুরক্ত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তারকেশ্বর অঞ্চলে জনৈক ব্রাহ্মণ নিম্নস্বরে হারমোনিয়াম বাজাইয়া সহস্রাধিক মশক আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে মশকবহুলস্থানে কয়েকজন একত্রিত হইয়া খোলা যায়গায় যখন চলে, যে ব্যক্তি বেশী কথা বলে তাহার নিকট, বহু মশক একত্রিত হয়। বৈদ্যুতিক মোটর দ্বারা মশকবৎ ধ্বনি উৎপাদন করিয়াও ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে।

বর্ণের মধ্যে মশক হরিদ্রাবর্ণের বিরোধী এবং গাঢ় নীলবর্ণের নিতান্ত অনুরক্ত। নীলবর্ণের পর্দা ঝুলাইয়া এ বিষয় পরীক্ষিত হইয়াছে। একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নীলবর্ণের আচ্ছাদনে গা ঢাকিয়া শয়ন করিয়া প্রভাতে দেখিয়াছেন যে তাঁহার শয়ন ঘরটি মশকে পরিপূর্ণ।

ব্যাক্‌ট্রিও লজিকেল পণ্ডিতগণ বিভিন্ন বর্ণের মশক আকর্ষণের শক্তি নিম্নলিখিত রূপ স্থির করিয়াছেন :—

গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ	০	ঈষৎ সবুজবর্ণ	৪
কমলালেবুর বর্ণ	১		
শ্বেতবর্ণ	২	গাঢ় রক্তবর্ণ	৯০
ঈষৎ নীলবর্ণ	৩	নীলবর্ণ	১০৪

উপরোক্ত পরীক্ষা হইতে ইহা অনুমান করা যায় যে হরিদ্রাবর্ণের মোজা পরিধান করিলে মশক দংশন হইতে অনেকটা নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে। মশক প্রায়ই পায়ে দংশন করিয়া থাকে। কথা না কহিয়া থাকিতে পারিলে আরও ভাল হয়। সকলেই ইহা আবশ্যকমত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।



সর্ব্ব দেবগণের সম্মিলিত তেজে মহিষ মর্দ্দিনী মহাশক্তির আবির্ভাব।

[মার্কণ্ডেয় চণ্ডী—দেবীমাহাত্ম্য—মধ্যম চরিত]

সংখ্যা (অর্থাৎ ৬০ দণ্ড ৬০×৬০×৬০=২১৬০০০ বিপল) দ্বারা ভাগ করিলে (১২৯৬০০০০০÷২১৬০০০ =৬০০) ভগন পাওয়া যাইবে। রাশ্যাদির ভুজকে (অর্থাৎ ৩৬০ অংশকে) তিন দ্বারা গুণ করিয়া ১০ দিয়া ভাগ করিলে যে $\left(\frac{৩৬০ \times ৩}{১০} = ১০৮\right)$ সংখ্যা পাওয়া যায় তাহাকে অয়নাংশ বলিয়া জানিবে। এখন দেখা যাইতেছে যে, এক মহাযুগে অর্থাৎ ৪৩২০০০০ সৌর বৎসরে যদি ক্রান্তিপাতবিন্দু ৬০০ বার পরিভ্রমান হয়, তাহা হইলে একবার পরিলম্বমান হইতে অর্থাৎ ১০৮ অংশ গমন করিতে, উহার ৪৩২০০০০÷৬০০=৭২০০ সৌর বৎসর এবং এই হিসাবে এক অংশ গমন করিতে ৭২০০÷১০৮=৬৬⅔ বৎসর অতিবাহিত হয়।

মুঞ্জাল, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি কয়েকজন আর্য্য জ্যোতির্ব্বিদ সূর্য্যসিদ্ধান্তের এই দোলায়মান গতি স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বলেন, ক্রান্তিপাত বিন্দু রাশিচক্রের উপর দিয়া বরাবর পশ্চিমাভিমুখে ঘুরিয়া আসিতেছে। আধুনিক পাশ্চাত্যপণ্ডিতদিগের মতও এইরূপ। তাঁহারাও ক্রান্তিপাত বিন্দুর দোলায়মান গতি স্বীকার করেন না। তিলক মহাশয় তাঁহার অরিয়ণ (Orion) নামক গ্রন্থে বৈদিক প্রমাণাদি দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, বাসন্ত-বিষুবন্ বৈদিক সময়ে প্রথমতঃ পুনর্ব্বসুনক্ষত্রে, পরে মৃগশিরায় এবং শেষে কৃত্তিকানক্ষত্রে ছিল। তৈত্তিরীয় সংহিতায় বর্ণিত আছে, চিত্রানক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসীতে উত্তরায়ণ হয় (১)। পূর্ণিমার দিন চন্দ্র চিত্রানক্ষত্রযুক্ত হইলে, সূর্য্য তাহা হইতে প্রায় চতুর্দ্দশনক্ষত্রে অর্থাৎ রেবতীর শেষভাগে অথবা অশ্বিনীর আরম্ভে অবস্থান করে। সুতরাং জানা যাইতেছে যে, কোনও সময়ে সূর্য্যের রেবতী বা অশ্বিনীনক্ষত্রে অবস্থানকালে উত্তরায়ণ হইত। ক্রান্তিবৃত্তের উত্তরায়ণ বিন্দু হইতে বিষুব বিন্দু ৯০ অংশ বা প্রায় সাত নক্ষত্র দূরে অবস্থিত। রেবতীনক্ষত্রে উত্তরায়ণ হইলে বিষুব-সংক্রমণ বিন্দু উহা হইতে সাত নক্ষত্র দূরবর্ত্তী পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে থাকাই সম্ভব। অধুনা অশ্বিনী নক্ষত্র অয়নচলনের আরম্ভ বিন্দু হইলেও বিষুবন্ উহা হইতে ২১ অংশ পশ্চিমে উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে অবস্থান করিতেছে। উত্তরভাদ্রপদ হইতে পুনর্ব্বসুর দূরতা প্রায় ৮ নক্ষত্র অথবা ১০৮ অংশেরও অধিক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে ১০৮ অংশ গমন করিতে ক্রান্তিপাত বিন্দুর ৭২০০ বৎসর সময় লাগে। অতএব দেখা যাইতেছে যে খৃষ্ট জন্মিবার প্রায় ৫॥০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে পুনর্ব্বসুনক্ষত্রে মহাবিষুব সংক্রান্তি হইত।

ইহার প্রায় দুই হাজার বৎসর পরে আর্য্যঋষিগণ দেখিলেন, চিত্রানক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসীতে উত্তরায়ণ না হইয়া চিত্রা হইতে দুইনক্ষত্র দূরে উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসীতে উত্তরায়ণ হইতেছে (১)। তখন বিষুব সংক্রমণ বিন্দুকেও পুনর্ব্বসু হইতে দুই নক্ষত্র দূরে মৃগশিরা নক্ষত্রে পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হইল।

পুনরায় প্রায় দুই হাজার বৎসর পরে অর্থাৎ খৃষ্টের প্রায় ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যঋষিগণ যখন দেখিলেন যে, উত্তরফল্গুনী হইতে দুই নক্ষত্র দূরে মঘানক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসীতে উত্তরায়ণ হইতেছে, তখন তাঁহারা মৃগশিরা হইতে দুইনক্ষত্র দূরবর্ত্তী কৃত্তিকানক্ষত্রে বিষুবন্ বা আরম্ভ বিন্দু স্থির করিলেন (২)। আজও পর্য্যন্ত ফলিত জ্যোতিষের দশা গণনায় কৃত্তিকা নক্ষত্রকে নক্ষত্রমণ্ডলীর আদি নক্ষত্র বলিয়া গণনা করা হইতেছে।

ইহার প্রায় আরও দুই হাজার বৎসর পরে অর্থাৎ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বরাহমিহির, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ দেখিলেন যে, মকররাশির আদিতেই উত্তরায়ণ হইতেছে। তখন তাঁহারা উত্তরায়ণ বিন্দু হইতে ৯০ অংশ দূরে অর্থাৎ কৃত্তিকার দুই নক্ষত্র পশ্চাতে অশ্বিনী নক্ষত্রের আদিতে বিষুবন্ পরিবর্ত্তন করিয়া সংশোধন করিয়া লইলেন। অধুনা অশ্বিনী নক্ষত্রকেই আমাদের গণনার আদি নক্ষত্র বলিয়া পরিগণিত করা হয়।

অর্থাৎ দ্বাদশ সৌরমাসে এক সৌর বৎসর, এক সৌর বৎসরে এক দিব্যদিন, ৩৬০ দিব্যদিনে অথবা ৩৬০ সৌর বৎসরে এক দিব্যবর্ষ এবং ১২০০০ দিব্যবর্ষে অর্থাৎ ১২০০০×৩৬০=৪৩২০০০০ সৌর বৎসরে চতুর্যুগ অথবা এক মহাযুগ হইয়া থাকে।

(১) মুখং বা এতৎ সংবৎসরস্য যচ্চিত্রা পূর্ণমাসঃ।

(১) এষা বৈ প্রথমা রাত্রিঃ সংবৎসরস্য যদুত্তরফল্গুনী মুখত এবং সংবৎসরস্যাগ্নি মাধায় বসীয়ান ভবতি।

[তৈঃ ব্রাঃ প্রঃ]

(২) কৃত্তিকাস্বগ্নি মাদধীত … মুখং বা এতন্নক্ষত্রাণাং যৎ কৃত্তিকাঃ।

[তৈঃ ব্রাঃ প্রঃ]

এখন দেখা যাইতেছে যে প্রায় প্রতি দুইহাজার বৎসর অন্তর ক্রান্তিপাত বিন্দু দুই নক্ষত্র অথবা ২৭ অংশ করিয়া পশ্চিমে সরিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সূর্য্য-সিদ্ধান্তমতে এক অংশ গমন করিতে ক্রান্তিপাতবিন্দুর ৬৬$\frac{২}{৩}$ বৎসর সময় লাগে।* সুতরাং ২৭ অংশ গমন করিতে উহার ৬৬$\frac{২}{৩}$×২৭=১৮০০ বৎসর সময় লাগিয়া থাকে। পাশ্চাত্য মতেও উহার ২৭ অংশ গমন কাল ৭১$\frac{২}{৩}$×২৭=১৯৩৫ বৎসর। এখন কথা হইতেছে যে, স্থূল-হিসাবে প্রায় প্রতি দুই হাজার বৎসর অন্তর যদি ২৭ অংশ বা দুইনক্ষত্র পরিত্যাগ করিয়া ক্রান্তিপাতবিন্দুর সংস্কার করা হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বে যে সূর্য্য-সিদ্ধান্তের দোলায়মান গতির কথা বলা হইয়াছে, তাহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে। ১৮০০ বৎসরে যখন বিষুবন্ আরম্ভ বিন্দু হইতে ২৭ অংশ পশ্চিমে সরিয়া আসিবে, তখন তাহাকে পুনরায় আরম্ভ বিন্দুতে প্রত্যাগমন করিতে অবসর না দিয়া, যদি ২৭ অংশ পিছাইয়াই আরম্ভ বিন্দু সংস্কার করিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব কথিত দোলায়মান গতি কথাটার সার্থকতা কোথায় থাকে? সূর্য্য সিদ্ধান্তের "চক্রং প্রাক্ পরিলম্বতে" এই কথাটার উপর নির্ভর করিয়াই অনেক জ্যোতির্ব্বিদ ক্রান্তিপাত বিন্দুর দোলায়মান গতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আজকাল কেহ কেহ মনে করেন বিষুবন্ যখন আরম্ভ বিন্দু হইতে ২৭ অংশ পশ্চিমে সরিয়া যায়, তখন আরম্ভ বিন্দু বিষুববিন্দুর পূর্ব্বভাগে অবস্থান করে এবং সেই হেতুই উহা "চক্রং প্রাক্ পরিলম্বতে" বলিয়া সূর্য্যসিদ্ধান্তে বর্ণিত হইয়াছে। তবে কথা হইতে পারে, সূর্য্যসিদ্ধান্তে যে এক মহাযুগে ৬০০ বার দোলায়মান হইবার কথা আছে, এবং তদনুসারে যে একবার দোলায়মানের ১০৮ অংশ পরিসর গ্রহণ করিয়া অয়ন-চলনে বার্ষিক গতি নির্ণয় করা হয়, তাহার কারণ কি? অবশ্য নিশ্চয় করিয়া ইহার কোনও কারণ বলা যায় না বটে, তবে অয়নগতির বর্ষমান নির্ণয় করিবার জন্য সূর্য্যসিদ্ধান্তে একটা গণনার প্রণালীমাত্র অবলম্বন করা হইয়াছে, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হয় না।

অয়নবেগ সম্বন্ধে হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদদিগের মধ্যেও বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। মুঞ্জালাদি জ্যোতির্ব্বিদগণ বলেন, এককল্পে অয়নগতির ১৯৯৬৬৯ ভগণ হইয়া থাকে। সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে এককল্পের মান ৪,৩২,০০,০০০ বর্ষ। সুতরাং একবার পূর্ণাবর্ত্তন হইতে ক্রান্তিপাত বিন্দুর প্রায় ২১৬৩৬ বৎসর এবং এক অংশ গমন করিতে প্রায় ৬০ বৎসর সময় লাগে। অতএব দেখা যাইতেছে যে এইমতে অয়নগতির বার্ষিকমান প্রায় ১ কলা হয়। ভাস্করাচার্য্যও এই মত পোষণ করিতেন। তাঁহার প্রদত্ত বর্ষমান ৩৬৫'২৫৮৪৪ দিন হইতে প্রকৃত বর্ষমান ৩৬৫'২৫৬৩৭ দিন বিয়োগ করিলে, জানা যায় তিনি বর্ষমান '০০২০৭ দিন অথবা প্রায় ৭॥ পলা অধিক গণনা করিয়াছিলেন। এই হিসাবে ১ কলা হইতে ৭॥ বিকলা বিয়োগ করিলে অয়নগতির বার্ষিকমান ৫২'৫ বিকলা পাওয়া যায়। কেহ বলেন ২৫৭০৪ বৎসরে ক্রান্তিপাত বিন্দুর এক পূর্ণাবর্ত্তন হয়। সুতরাং এক অংশ গমন করিতে উহার $\frac{২৫৭০৪}{৩৬০}$=৭১$\frac{২}{৫}$ বৎসর সময় লাগে এবং এই হিসাবে উহার বার্ষিকগতি $\frac{৩৬০×৬০×৬০}{২৫৭০৪}$=৫০'৪ বিকলা হয়।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে পঞ্জিকাদি গণনা করা হইয়া থাকে। ইহার মতে বিষুবন্ বর্ত্তমান ১৮৩৮ শকে আরম্ভ-বিন্দু হইতে ২১ অংশ ১৫ কলা ১৮ বিকলা অথবা ৭৬৫১৮ বিকলা পশ্চিমে সরিয়া আসিয়াছে। সূর্য্যসিদ্ধান্তানুসারে ক্রান্তিপাত বিন্দুর বার্ষিক গতি ৫৪ বিকলা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে $\frac{৭৬৫১৮}{৫৪}$=১৪১৭ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ৪২১ শকে শূন্য অয়নাংশ ছিল অথবা এই শকে বিষুবন্ কৃত্তিকা হইতে অশ্বিনী নক্ষত্রে পরিবর্ত্তন করিয়া সংস্কার করা হইয়াছে। অধুনা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে অয়নচলনের বার্ষিক গতি ৫০'২ বিকলা এবং এই হিসাবে উহার পূর্ণ এক অংশ গমনকাল প্রায় ৭১$\frac{২}{৩}$ বৎসর। সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে ক্রান্তিপাত বিন্দুর এক অংশ গমন কাল ৬৬$\frac{২}{৩}$ বৎসর। সুতরাং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রদত্ত মান অপেক্ষা প্রতি অংশ গমনে ৭১$\frac{২}{৩}$—৬৬$\frac{২}{৩}$=৫ বৎসর অধিক এবং পূর্ণ ২৭ অংশ গমনে ৫×২৭=১৩৫ বৎসর অধিক গণনা করিয়া থাকেন। মলমাস বা অধিমাস ত্যাগ দ্বারা যেরূপ সৌর ও চান্দ্রমাসের সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়, হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদগণও সেইরূপ, স্থূল হিসাবে প্রায় দুইহাজার বৎসর অন্তর দুই নক্ষত্র বা ২৭ অংশ পশ্চিমে আরম্ভ-বিন্দু পরিবর্ত্তন করিয়া বৎসর ও ঋতুগণনাদির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

বর্ত্তমান কালের ন্যায় পূর্ব্বে গ্রহনক্ষত্রাদি পর্য্যবেক্ষণোপযোগী উৎকৃষ্ট যন্ত্রাদি ছিল না। তথাপি আর্য্যঋষিগণ তাঁহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিদ্বারা যেরূপ সূক্ষ্ম অয়ন বেগ নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে বাস্তবিকই বিস্ময়াপ্লুত হইতে হয়। অনেকে মনে করেন, প্রাচীন ঋষিগণ যোগবলে চন্দ্র সূর্য্যাদির গতিবিধি নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক সংহিতাদি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। কথাটা কতদূর যুক্তিসঙ্গত জানি না; তবে আর্য্য জ্যোতির্ব্বিদগণই বলিয়া গিয়াছেন, "সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ।" চন্দ্র সূর্য্যই জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাক্ষী। অর্থাৎ জ্যোতিষশাস্ত্র প্রত্যক্ষবিষয়সম্ভূত; শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট গণিতের সাহায্যে গ্রহ-ভ-গণনাদি কর, দেখিবে গণিতাগত স্থানের সহিত দৃষ্টস্থানের অবশ্যই ঐক্য হইবে। জগতের সকল বস্তুই পরিবর্ত্তনশীল। নভোমণ্ডলস্থ গ্রহনক্ষত্রাদিরও আকার ও গতিবিধি চিরকাল একরকম থাকিতেছে না ও কখনও এক প্রকার থাকিবে না। বৈদিক সময় হইতেই আর্য্য ঋষিগণ নভোমণ্ডলস্থ গ্রহনক্ষত্রাদির যখন যেরূপ গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তখন তাহাই সাধ্যমত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যে যাবতীয় বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, অথবা তাঁহারা যাহা লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন তাহার কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, একথা সাহস করিয়া বলা যায় না। সুতরাং গ্রহাদির গতিবিধি যখন যেরূপ লক্ষ্য করা যাইবে, তদনুসারে জ্যোতিষশাস্ত্র সংস্কৃত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। অধুনা পাশ্চাত্য জোতিষ এত উন্নত যে তাহার তুলনায় হিন্দু জ্যোতিষকে কিছুই নয়ও বলা যাইতে পারে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে; বহুকাল হিন্দু জ্যোতিষকে সংস্কার করা হয় নাই। আজকাল আমাদের উৎকৃষ্ট মানমন্দিরাদির অভাব, উপযুক্ত বেধ-যন্ত্রেরও অভাব এবং আমরা নিজেরাও পরিদর্শন করিতে অশক্ত। এক্ষেত্রে পাশ্চাত্য জ্যোতিষের সাহায্যে আমাদের জ্যোতিষকে সংস্কার করিয়া লওয়াই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

কল্পনার প্রতি।*

এস মোর কল্পনা-সুন্দরী!
উষার পূরবী তান লয়ে,
শোভাময় অমল শীতল
কনক আঁচল উড়াইয়ে।
ভুলে যাও অতীত সঙ্গীত,
রেখে দাও ভবিষ্য ভরসা,
সম্মুখের সুধার ভাণ্ডার
কর পান মিটিয়ে তিয়াসা।
বাঁধ বীণা নব তার দিয়ে,
গাও আজি নবীন সঙ্গীত,
পায় যদি একটু সান্ত্বনা
আঁধারের কোনবা ব্যথিত।

স্বর্গীয় হেমন্তবালা দত্ত।

* লেখিকার অন্তিম রোগশয্যায় রচিত।

প্রাচীন "পাড়াগাঁয়ের চাষার গীত"

ভোর।

বাঁশী বাজাইওনা, কোন রসিকে বাজায় বাঁশী
নাম লইওনা—(ধুয়া):—
কদম তলে এড়ি (১) বাঁশী সেনান করেছে
পবনের বাতসে (২) বাঁশী রাধা বলেছে—
একেত কানাইর বাঁশী তা'তে সপ্ত বেধা (৩)
বাঁশী যে কেমনে জানে মোর নাম রাধা?
কোন রসিকে বাজায় বাঁশী শুনতে বিপরীত
ঘরে কাম (৪) এড়ি (৫) ভইনে (৬)
শুনে বাঁশীর গীত।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন।

(১) রাখি (২) বেগে, জোরে (৩) ছিদ্র (৪) কার্য্য, কর্ম্ম (৫) রাখিয়া (৬) ভগ্নী।

আলমগীরের পত্র।

(গত চৈত্র সংখ্যা হইতে আরম্ভ)

(১০)

প্রিয় পুত্র মহম্মদ আজাম, জগদীশ্বর তোমাকে সতত রক্ষা করুন। আমার মনে হয় তুমি ভ্রমণকালীন অতি দ্রুত অশ্বচালনা করিয়া থাক। কেননা, শুনিলাম তোমার শয্যাবাহক ভৃত্য সৈয়দ তোমার অশ্বের ধাকায় পড়িয়া গিয়া সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চত্ব পাইয়াছে। কি আপশোষ! আমার নিকটে যে কয়দিন তুমি ছিলে, তোমাকে আমি সর্ব্বদাই অমনোযোগী এবং অন্যমনস্ক দেখিতাম। আমার সঙ্গে কতদিন তুমি বেড়াইয়াছ—আমি কি প্রণালীতে অশ্বচালনা করিয়া থাকি, তাহা তুমি দেখিয়াছ এবং জান। তবে কেন তুমি আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর নাই? কেন তুমি অসংযতভাবে অশ্বচালনা করিয়াছিলে? এ সম্বন্ধে মহাত্মাগণের কি উপদেশ আছে জান?—"অশ্বচালনা করিবে, কর, কিন্তু ধীরে- শান্তভাবে, কদাচ দ্রুত এবং দুর্দ্দান্তভাবে চালনা করিও না। কারণ, তোমার পায়ের নীচে কত হাজার হাজার মৃতদেহ সমাধিস্থ রহিয়াছে।" এই কথাটি ভালরূপ মনে রাখিও।

(১১)

ভাগ্যবান্ পুত্র, আমি শুনিলাম তোমার খাস মুন্সী মুস্তাফা কুলীবেগ বেশ সততার সহিত কাজ করিয়া থাকে। এ অতি উত্তম কথা। তাহাকে যদি তুমি কোন খেতাব দিতে চাও বা কোন অতিরিক্ত পদ দিতে চাও, আমাকে লিখিও, আমি তাহাকে তাহা প্রদান করিব। জানিও পুত্র, সৎলোক ঠিক খাটি সোণার মত। কথাই আছে "মানুষ জগতের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু মানুষের যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণ—অর্থাৎ সততা—তাহা অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। সাহাম্‌সার (সাজাহানের) হিতৈষী উজির সায়েদ আল্লা খাঁ একদিন নমাজ শেষ করিয়া খোদার নিকট আশীর্ব্বাদ চাহিলেন। তাঁহাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া প্রার্থনা জানাইতে দেখিয়া একজন দুর্ব্বিনীত ওমরাহ জিজ্ঞাসা করিল, কি আশীর্ব্বাদ তিনি চান। তিনি উত্তর দিলেন "আমি সৎলোক হইব, শুধু এই আশীর্ব্বাদ চাই।" তিনি উত্তম জবাবই দিয়াছিলেন। সততা এবং নিষ্কপটতা ভগবানের এই শ্রেষ্ঠ দান মানবের আজন্মসম্বন্ধ হইলেও, এই দুইটি গুণ যাহাতে বজায় থাকে, তজ্জন্য ভৃত্যগণকে উৎসাহিত এবং পুরস্কৃত করা প্রয়োজন। কারণ, এতদ্বারা ভৃত্যগণ স্বচ্ছন্দে এবং নির্ব্বিঘ্নে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার সুযোগ পায় এবং জীবিকা উপার্জ্জনে তাহাদিগকে কোনরূপ উৎকণ্ঠা ভোগ করিতে হয় না। ফলতঃ, সাংসারিক অভাব ও অনাটন তাহাদিগকে বিপথে লইয়া যাইতে পারে না। ইহার ফল বড়ই সুখকর হয়। কারণ, যে ভৃত্য সুখী এবং নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট, সে অধিক কার্য্য করিয়া থাকে।

(১২)

সুখী পুত্র মহম্মদ আজাম, জগদীশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন। মালব দেশ ঘটিত ব্যাপারে বুঝিতে পারিলাম যে সঙ্কীর্ণচেতা পাহাড়সিংএর ঔদ্ধত্য এবং হটকারিতাই সে প্রদেশে এত অধিক গোলযোগ, অশান্তি ও বিদ্রোহ ঘটাইবার কারণ। কিন্তু ভালই হইয়াছে যে হতভাগা তোমার সহকারী উজীর তালুক চাঁদ কর্ত্তৃক হত হইয়া এত শীঘ্র নরকস্থ হইয়াছে। এজন্য জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ। "হে ন্যায়পরায়ণ পরমেশ্বর তোমার এই অনুগ্রহের জন্য আমি সম্পূর্ণরূপে নিজেকে তোমার নিকট উৎসর্গ করিলাম।" পুত্র, তোমার কার্য্যে আমি বড়ই খুসী হইয়াছি। তুমি যে রাজভৃত্যগণকে উৎসাহিত ও পুরস্কৃত করিয়া, তাহাদের দ্বারা রাজ্য শাসন করিয়া লইতেছ ইহা বড়ই সুবুদ্ধির পরিচায়ক। তোমার এই ব্যবস্থা আমি অন্তরের সহিত সমর্থন করিলাম এবং উপঢৌকন স্বরূপ তোমাকে একটি মুক্তার হার প্রেরণ করিলাম—ইহার মূল্য পঞ্চাশ হাজার মুদ্রা। তোমার এই হিন্দু মন্ত্রী মাড়োয়ারী তালুকচাঁদ দুর্দ্দান্ত রাজপুত পাহাড়সিংকে তীর নিক্ষেপ দ্বারা নিহত করিয়া খুব বাহাদুরী করিয়াছে—ঠিক যেন এক চড়ুই পাখী একটা শিকারী বাজকে মারিয়াছে। এই লোকটাকে আমি পাঁচহাজারীর পদে উন্নীত করিয়া 'রাও' উপাধি প্রদান করিলাম এবং এতৎসহ একটি সম্মানের পরি-

চন্দ, একখানি তলোয়ার এবং একটি ঘোড়া বক্‌সিশ দিলাম। তুমিও তাহাকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবে। তাহাকে একটি বিভাগের শাসনকর্ত্তা করিয়া তাহার সাহসের সুখ্যাতি সূচক একখানি চিঠি তাহাকে লিখিয়া পাঠাইবে। এই প্রকার কার্য্যের ফল খুব ভাল হয়। কারণ, অন্যান্য ভৃত্যগণ ইহা দেখিবে এবং পুরস্কারের আশায় তাহারাও ভাল কাজ করিবে।

(১৩)

সৌভাগ্যবান্ পুত্র, একজন গুপ্তচর আসিয়া আমাকে খবর দিল যে বাহাদুরপুর (খান্দেশ) হইতে আওরঙ্গাবাদের পথ নিরাপদ নয়। এ পথে দস্যুর বড়ই উপদ্রব। দস্যুগণ পথিক ও ব্যবসায়ীগণের যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া লয়। আমেদাবাদ এবং বুরহানপুরের নিকটবর্ত্তী জায়গায়—অর্থাৎ যেখানে রাজকীয় সৈন্যের আড্ডা—যখন দস্যুগণের এত উৎপাত, তখন দূরবর্ত্তী স্থানের কথা একবার ভাবিয়া দেখ। তোমার নিয়োজিত চরগণ তোমাকে আসল খবর মোটেই দেয় না। পুত্র, রাজকার্য্যে অবহেলা এবং অমনোযোগ রাজধর্ম্ম নয়। তুমি নূতন চর নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দাও এবং পুরাতন চরগণকে রীতিমত সাজা দাও। সত্বর একটা পৃথক সৈন্যদল নিযুক্ত করিয়া দস্যুগণকে দমন কর শীঘ্র রাজপথ নিরাপদ কর। আর কতদিন এই প্রকার বিশৃঙ্খলতার সহিত কাজ করিবে। বড়ই লজ্জার কথা। মহাত্মাগণ কি বলেন জান? "তোমাকে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে বলি না, লাভবান হইতেও বলি না। কিন্তু তুমি সুযোগ হারাইও না। যে কাজ করিবে বলিয়া মনস্থ করিয়াছ, অবিলম্বে তাহা সম্পাদন কর।" সুখী হও, পুত্র।

(১৪)

ভাগ্যবান্ পুত্র, চীনদেশের একটি উৎকৃষ্ট জলপাত্র এবং কাচকড়ার তৈরী একটি কুর্সি আমি উপঢৌকন স্বরূপ পাইয়াছিলাম। পুত্র, এই দুইটি জিনিষ আমি তোমাকে পাঠাইলাম। এই দুইটি উপঢৌকনের জন্য, পুত্র, আমাকে তোমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। প্রতিদান স্বরূপ তুমি আমাকে এক ঝুড়ি আম পাঠাইয়া দিবে। পূর্ব্বকার কথা ভুলিয়া যাও, পুত্র।

(১৫)

প্রিয়তম পুত্র, মহম্মদ আজাম, বুরহাণপুরে আমি একদিন ফকির মিঞা আবদুল লতিফের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম—তাঁহার পবিত্র সমাধি অধিকতর পবিত্র হউক। কথাপ্রসঙ্গে আমি তাঁহাকে বলিলাম—আপনি যদি অনুমতি করেন, আপনার ফকিরশালার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য আমি কয়েকখানি গ্রাম আপনাকে প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। প্রত্যুত্তরে এই কথাগুলি তাঁহার পবিত্র মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল। "রাজার দান লইলে তাঁহার অনুগ্রহভাজন হইতে হইবে। খোদা যখন আমাকে খোরাক যোগাইতেছেন, তখন কেন আমি রাজার দান লইয়া তাঁহার অনুগ্রহ লইব?" আমি বলিলাম—আপনার কথা ঠিক। কিন্তু আমি ফকিরগণের এবং ধার্ম্মিকগণের সেবা করিতে ইচ্ছা করি, কেননা ইহাতে জগতের উপকার করা হইবে। আপনাদিগকে অনুগৃহীত করিবার উদ্দেশ্য নয়, আমার নিজের সুখের বাসনায় এবং উত্তরোত্তর ধনবৃদ্ধির কামনায় আমি এই দান করিতে ইচ্ছুক। মিঞা বলিলেন—"তোমার উদ্দেশ্য সাধু—যদি ইহা তুমি অন্তরের সহিত কামনা করিয়া থাক। কিন্তু, অন্য পন্থাও আছে।

কৃষকগণের নিকট হইতে তুমি কেবল অর্দ্ধেক রাজস্ব আদায় কর। যাহারা দরিদ্র এবং কঠিন পরিশ্রমী তাহাদের নিকট অর্দ্ধেকেরও কম রাজস্ব লও। ফকিরগণকে মাসহারা প্রদানের ব্যবস্থা কর। যে সকল লোক নিরাশ্রয়, যাহারা মরুভূমিতে বাস করে এবং যাহারা ঈশ্বরে শ্রদ্ধাবান তাহাদিগকে মাসিক বৃত্তিদানের ব্যবস্থা কর। এরূপ ন্যায়পরায়ণতার সহিত বিচারকার্য্য কর যে, কেহ যেন নিজে নিজ অধিকারে বঞ্চিত না হয়। দুর্ব্বল প্রবলকর্ত্তৃক যাহাতে উৎপীড়িত না হয়, তাহার প্রতিবিধান কর। এই সকল কার্য্য করিলে দেখিবে, তুমি যে সুখের অভিলাষী তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।" পুত্র, গুজরাটের প্রজাগণের অভিযোগ এবং দুর্দ্দশার কথা শুনিবামাত্র মিঞার কথাগুলি আমার মনে পড়িয়া গেল এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমাকে তাহা লিখিয়া পাঠাইলাম। তোমার মঙ্গল হউক পুত্র।

(১৬)

সুখী পুত্র তুমি তোমার বৃদ্ধ পিতাকে যে আম্র উপঢৌকন পাঠাইয়াছ, তাহা পাইয়া আমি যৎপরোনাস্তি তুষ্ট হইয়াছি। এই অজানিত নূতন আম্রের নামকরণ করিতে তুমি আমার অনুরোধ করিয়াছ। নিজেই ত তুমি এ বিষয়ে,

খুব দক্ষ, তবে কেন বৃদ্ধপিতার উপর এই ভার দিয়াছ, পুত্র? যাহাহউক ফরমাইস্ যখন করিয়াছ, তখন তামিল করিতেই হইবে। আমি এই আম্রের নাম রাখিলাম—"সুধারস" ও "রসনা বিলাস।"

(১৭)

প্রিয় পুত্র আজাম, সাহান্‌সা (সাজাহান) বলিতেন 'অলস লোকেই শিকার-প্রিয় হয়।' শিকারে সময় ক্ষেপণ করা নিষ্কর্ম্মা লোকের কাজ। সংসারের ভোগবিলাসে আসক্ত হওয়া এবং রাজধর্ম্মের প্রতি অমনোযোগী হওয়া বড়ই গর্হিত কার্য্য। কারণ, ইহজগতে যে যেরূপ কাজ করিবে, পরজগতে সে তদনুযায়ী ফলভোগ করিবে। পুত্র, সাহানসা (সাজাহান) কিরূপ সুনিয়মে তাঁহার প্রাত্যহিক কার্য্য করিতেন, বলিতেছি শুন।—তিনি প্রত্যহ রাত্রি এক প্রহর থাকিতে প্রফুল্লচিত্তে শয্যাত্যাগ করিতেন এবং গোসলখানায় গিয়া যথারীতি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া প্রাত্যহিক কোরাণপাঠে মনঃনিবেশ করিতেন। তৎপরে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে মোল্লাদিগের নামাজের চীৎকার শেষ হইলে পর তিনি প্রাতঃকালীন উপাসনা করিতেন। উপাসনা শেষ হইলে "দর্শনী-ঝোরকা"য় * গিয়া উপবেশন করিতেন—তথায় সমবেত প্রজাবৃন্দ তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া তৃপ্ত হইত। বেলা এক প্রহরের সময় তিনি দেওয়ানী আমে উপস্থিত হইতেন। তথায় আমীর ওমরাহ্ এবং পদস্থ কর্ম্মচারীগণ নতজানু হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিত। তৎপরে রাজকার্য্য আরম্ভ হইত। উজিরগণ এবং ধনাধ্যক্ষগণ যে যাহার কাগজ পেশ করিত। রাজভৃত্যগণ, সহর কোতোয়ালগণ, এবং জেলার শাসনভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারীগণ বিশ্বস্ততা এবং কার্য্যকুশলতা দেখাইয়া থাকিলে তাহা সম্রাটকে জানান হইত। তিনি ইহাদের যার যা অভিলাষ পূর্ণ করিতেন। দেওয়ানী আমের কার্য্য শেষ হইলে সম্রাট রাজকীয় অশ্ব এবং হস্তী যথারীতি পরিদর্শন করিতেন। তৎপরে বেলা দেড়প্রহরের সময় তিনি দেওয়ানী আমে গিয়া দর্শন দিতেন। তখন খাস মুন্সীগণ নবনিযুক্ত কর্ম্মচারীগণের কার্য্যবিবরণ তাঁহার সমীপে উপস্থাপিত করিত; সম্রাট তাহাদের সম্বন্ধে শেষ হুকুম প্রদান করিতেন। অতঃপর মুন্সীগণ প্রত্যেক প্রদেশে যে যে আবশ্যকীয় ঘটনা ঘটিতেছে তাহার বিবরণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংবাদ সম্রাটের গোচর করিত। তিনি সে সকলের মীমাংসা করিয়া শেষ হুকুম প্রদান করিতেন। এই সকল কার্য্যে বেলা দ্বিপ্রহর অতিবাহিত হইত। তৎপরে তিনি মধ্যাহ্নভোজন করিতেন। তাঁহার ভোজ্য সামগ্রী খাস লোক দ্বারা বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রস্তুত হইত। তিনি শরীর ধারণের উপযোগী, রাজকার্য্য সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বলধানের উপযোগী, এবং স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী আহার্য্য গ্রহণ করিতেন। তৎপরে, যে সকল লোক তাঁহার দ্বারা প্রতিপালিত হইত এবং যাহাদিগকে তিনি প্রত্যহ খোরাক যোগাইতেন তাহাদের আহারের বিষয় তদন্ত করিতেন। এই সকল লোকের অধিকাংশই ধার্ম্মিক, ভগবদ্ভক্ত এবং শাস্ত্রজ্ঞ ছিল। নিঃস্ব, দরিদ্র, অনাথ, আতুর এবং দুর্দ্দশাগ্রস্থ লোকও বিস্তর ছিল। তিনি ইহাদের অধিকাংশকেই চিনিতেন। আহারের ব্যাপার শেষ হইলে তিনি বিশ্রাম লাভার্থ খাস কামরায় প্রবেশ করিতেন। বেলা তিনপ্রহরের সময় তিনি বিশ্রামকক্ষ হইতে বাহির হইতেন এবং হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া কোরাণপাঠে রত হইতেন। কোরাণপাঠের পর দ্বিপ্রহরের নামাজ শেষ করিয়া তিনি আসাদ বুরুজে আসিয়া উপবেশন করিতেন। এখানে প্রধান প্রধান উজীরগণ উপস্থিত থাকিত। তাহারা রাজস্ব এবং রাজনীতি সংক্রান্ত কার্য্য সম্রাট সমীপে উপস্থাপিত করিত এবং সম্রাটের দস্তখতের জন্য আর্জি সকল পেশ করিত। এখানকার কার্য্য শেষ করিয়া তিনি পুনরায় দেওয়ানী আমে গিয়া হাজির হইতেন। এই সময় মুন্সীগণ, যে সকল লোক উচ্চপদে নূতন বাহাল হইয়াছে এবং যাহারা রাজকীয় জায়গীর প্রার্থনা করে তাহাদের কাগজপত্র দাখিল করিত। সম্রাট খুব সতর্ক হইয়া এই সকল কাগজ দেখিতেন এবং উমেদারগণের বংশমর্য্যাদা ও ব্যক্তিগত গুণপনা বেশ ভালরূপ তদন্ত করিয়া ইহাদের যোগ্যতা অনুযায়ী পদ বা জায়গীর দিতেন। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে দেওয়ানী আম হইতে বাহির হইয়া তিনি "সান্ধ্য উপাসনা" শেষ করিতেন, তারপর নিজের খাস কামরায় গিয়া বসিতেন। এই সময় এখানে বিদ্বজ্জনের সম্মিলনী হইত। সুনিপুণ ঐতিহাসিকগণ, সুললিতভাষী

* মোগলবাদশাহগণ যেখানে বসিয়া প্রজাদিগকে দর্শন দিতেন; সে স্থান অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। দিল্লী-দুর্গের অভ্যন্তরে, যমুনার উপকূলবর্ত্তী প্রস্তরখচিত এই বারান্দা এখনও দর্শকের নয়নগোচর হয়।

কথকগণ, অভিজ্ঞ ভ্রমণকারীগণ, এবং সুকণ্ঠ গায়কগণ এখানে সমবেত হইত। স্ত্রীলোকেরা পর্দ্দার আড়ালে বসিতেন এবং পুরুষেরা সম্মুখে বসিতেন। সম্রাটের ইচ্ছা এবং আদেশ অনুযায়ী ইহারা তখন প্রাচীন রাজগণের ইতিহাস, মহানুভব ব্যক্তিগণের চরিতকথা এবং দেশ বিদেশের পুরাতত্ত্ব ও ভ্রমণকাহিনী বিবৃত করিত। এইরূপে মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি সময় যাপন করিতেন। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে, সাহানসা দিবাভাগ এবং রাত্রিকাল বেশ সুনিয়ন্ত্রিতভাবে অতিবাহিত করিতেন। এই প্রকারে, সময়ের সদ্ব্যবহার দ্বারা তিনি রাজ্যের প্রতি, প্রজাবর্গের প্রতি এবং নিজের প্রতি সুবিচার করিতেন। আমার পুত্রের প্রতি আমার যে স্নেহ তাহা আন্তরিক, এতটুকুও বাহিক নহে। সেই হেতু, আমি আমার প্রিয়পুত্রকে যাহা ভাল এবং মূল্যবান, তাহা লিখিয়া জানাইলাম। লিখিতে বসিয়া এখন আমি যতদূর স্মরণ করিতে পারিলাম, লিখিলাম। আমাকে ক্ষমা করিও, পুত্র।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযামিনীকান্ত সোম বিদ্যারত্ন।

দেবতা ও মানব।

(১)

আমি চাহিনা অমরাবতী
ঘুচেনা যাহার সুরাসুর করে চিরদিন দুর্গতি!
সুরগণ চাহে আপন করিতে যারে
অসুর ছিনায় নিজের বীর্য্য ভারে—
সে মায়াপুরীর অধিকার লয়ে হোক্
দ্বন্দ্ব অসুরে সুরে!—
আমি চাই শুধু একটি কুটীর ছোট
নিভৃত পল্লী পুরে।

(২)

চির নন্দন পারিজাতে
চাহিনা রচিতে চারু বিচিত্র বিলাস দিবস রাতে;
বাসব বিজয়ী সুর সম্রাট হ'তে
চাহিনা গো আমি চাহিনাক' কোন্ মতে
গজ-বাজি রাজি মণি মাণিক্য সুধা
নিক যার খুশী হরি
আমি চাহি শুধু দশজনে সাথে নিয়ে
খেয়ে ও খাওয়ায়ে মরি।

(৩)

আমি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব
চাহিনা হইতে নাহি সে বাসনা, আমি মর্ত্ত্যের জীব!
বর দিতে হবে ছলনা করিয়া তায়—
দেবতা তাঁহারা তাঁদের এ শোভা পায়—
ফাঁকি দেওয়া বরে নরহরি রূপ ধরি।
আমি যে মূর্খ প্রাণী,
আশীষ করিতে রাখিতে নারিব কভু
প্রাণে এতটুকু গ্লানি।

(৪)

আমি চাহি একটুকু ঠাঁই
যেথায় সকল খোলা প্রাণে হাসি গলা ধরে' কবে' ভাই।
শত্রুতা কারো যদিই সাধিতে হয়
তার মাঝে যেন ঢাকা ঢাকি নাহি হয়,
আশীষ করিব প্রাণঢালা স্নেহ প্রেমে—
তাই দেবতা হ'তে না চাই
যুগ যুগ যেন জনম জনম চির
মানব জনম পাই।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

ক্ষমা।

(কথা-নাট্য)

প্রথম দৃশ্য।

[স্থান—গুণেন্দ্রনাথের বসিবার কামরা। পাত্র—গুণেন্দ্রনাথ ও "ক"। গুণেন্দ্রনাথ জাতিতে হিন্দু, তবে তিনি একেলে অর্থাৎ নব্যভাবের ভাবুক। "ক" একজন সাধারণ ব্যক্তি একেলে কিম্বা সেকেলে কোন বিশেষণই তাঁহার সম্বন্ধে খাটে না। "ক"এর প্রকৃত নাম পরে প্রকাশ্য। "ক" গুণেন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধু না হইলেও পরিচিত বটে।]

ক।—শুনছি, নব্যপন্থীরা আজ একটা সভা করে স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচার কর্ব্বে।

গুণেন্দ্র।—তাই নাকি; সুখবর।

ক।—আমি ভাবচি ঐ সভায় গিয়ে একটা হট্টগোল বাধিয়ে দেব; এত বাড়াবাড়ি আর সয়না।

গুণেন্দ্র।—Sorry, আপনি একালের যুবক হয়েও মনের স্কন্ধ হতে এখনো সেকেলে ভাবের জোয়াল নাবিয়ে ফেল্‌তে পারেন নি?

ক।—যাই বলুন, আমি ত এই হালফ্যাসনের স্ত্রী-স্বাধীনতার ভিতর কোন ভালই দেখ্‌চিনা।

গুণেন্দ্র।—হয়ত এই দোষটা স্ত্রীস্বাধীনতায় নেই—আছে আপনার মনের ভিতর। সেই দোষেরই অঞ্চলে আপনারি বিকৃত দৃষ্টিতে আপনি এই হালফ্যাসনের স্ত্রী-স্বাধীনতার ভিতর সবটাই দোষ দেখ্‌চেন।

ক।—কি জানি হতে পারে,—কিন্তু কতগুলো যুবক এই ধরণের স্ত্রীস্বাধীনতা দিয়ে ভাবচে মস্ত একটা কিছু কল্লুম।

গুণেন্দ্র।—সত্যি বল্‌তে কি, যদি একেলে যুবকেরা সমাজের যাবতীয় শাসনকে অমান্য করে, মেয়েদের পুরুষদের সঙ্গে সম-অধিকার দিতে পারে, তা হলে অবিশ্যি তারা একটা মস্ত কাজ কর্ব্বে।

ক।—আপনিও দেখ্‌চি একেবারে ষোলআনা একেলে। তা হলে দেখ্‌চি, আপনার সঙ্গে এবিষয় আলাপ না কল্লেই ভাল ছিল।

গুণেন্দ্র।—তাতে আর কি হয়েচে। এরমধ্যে আলাপ বই দাঙ্গা আর হাঙ্গামার ত কিছু নেই।

ক।—বলেন কি মশাই—আলাপের ভিতর দিয়েই প্রলাপ আরম্ভ হয়, তারপর অমনি হাতাহাতি করে বিলাপ সুরু হয়ে যায়। সেদিনকার সেই মেসের কাণ্ড মনে নাই?

গুণেন্দ্র।—কই কোন মেসে? আমি ত তার কোন খোঁজ রাখিনি—কি ব্যাপারটা বলুন দেখি শুনি?—

ক।—সেই—তের নম্বর * * * বাজার মেসে। এক চশমাধারী ছোকরা—হঠাৎ বলে বস্‌ল—"রবিবাবুর কাছে দ্বিজুরায় নিতান্তই কিছু না।" যেম্‌নি সে এই কথা বলা, অম্‌নি সেই মেসেরই এক দ্বিজুরায়ের চেলা—মহা তর্জ্জন করে এসে বল্লে—"কি হে, তোমাদের রবিঠাকুরের সাহিত্য এমন কি একটা সাতরাজার ধন এক মাণিক যে, তুমি ফস্ করে দ্বিজুরায়ের উপর এমন একটা রিমার্ক পাশ্ করে দিলে?"

এম্‌নি করে দুজনের মধ্যে বাক্যযুদ্ধ হতে হতে একেবারে হাতাহাতি হ'য়ে গেল!—তাতেও কি কাণ্ড শেষ হয়? ওরি মধ্যে একজন জুতাটারও সদ্ব্যবহার করার চেষ্টায় ছিল—ভাগ্যিস্ মেসের পোষাকুকুর টম্, কোন এক সুযোগে, সেই ব্যক্তির জুতার দুই পাটিই খেয়ে শেষ করে দিয়েছিল। নইলে সেদিন ভারি একটা হট্টগোল পড়ে যেত। যা'হোক মেসের অন্যান্য ছাত্রদের চেষ্টায় সেই যুদ্ধ থেমে গেল। যুদ্ধ শেষ হবার ঘণ্টা কয়েক পরে টের পাওয়া গেল—উভয় যোদ্ধা, উভয় কবির মাত্র একটি করে লেখা পড়েছিল। যিনি দ্বিজুরায়ের ভক্ত, তিনি পড়েছিলেন কেবল "দুর্গাদাস", আর যিনি রবিবাবুর ভক্ত, তিনি পড়েছিলেন, "রাজা ও রাণী"।

গুণেন্দ্র।—তাই নাকি! ব্যাপারটা ত বেশ থিয়েট্রিক্যাল হয়েছিল। যাক্, আপনি অবিশ্যি সেরকমের কোন কাণ্ডের প্রত্যাশা নিশ্চয়ই কর্ব্বেন না। কারণ মেয়েদের সম্বন্ধে আমি আলোচনাই কর্ব্ব। আমার মনে হয়, মেয়েদের তরফ থেকে আমরা তাঁদের অসুবিধের কোনো কথাই শুনতে

পাইনা বলে, আমরা ওদের সুখ দুঃখ বুঝিনা। আমাদের দেশের মেয়েরা কতকটা পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মত। আধুনিক কালের যুবকদের উপর তাদের পিঞ্জর হতে মুক্তি দেবার ভার এসে পড়েছে।

ক।—আপনার কথা শুনে—চারু বাবুর "পিঞ্জরের বাহিরে" গল্পটার কথা মনে পড়ে গেল। সে গল্পটা পড়ে মনে হল পাখীটা যতক্ষণ পিঞ্জরের মধ্যে ছিল বেশ ছিল,—যেমনি বাইরে বেরিয়ে পড়ল, অমনি তার অবস্থাটা এমন বিশ্রী হয়ে পড়ল, যে তাকে দেখে বাজারের ডানাকাটা পাখীরাও সেচ্ছায় মাথা গোঁজবার জায়গা খুঁজ্‌তে লাগল। এই শ্রেণীর পিঞ্জরছাড়া পাখীর কদর ভাবজগতে যতই বেশী হোক, কর্ম্মজগতে তাদের অবস্থা ঘৃণ্য ও নিন্দনীয়। এর ফলে এই হয় যে আমরা মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলি।

গুণেন্দ্র।—মেয়েদের প্রতি আমাদের যে মনোভাবকে আমরা শ্রদ্ধা বলে জানি—সেটা আদৌ শ্রদ্ধা নয়, বরং তার উল্টো,—অর্থাৎ খাঁটি অশ্রদ্ধা। সেই অশ্রদ্ধাটা আবার, দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অনুগ্রহ দেখানোর ভাবে লিপ্ত। কতকটা সোণার খাঁচার মধ্যে বুলবুল পুষে তাকে সোহাগ করে দুধ কলা খাওয়ানের মতন।

ক।—উপমা দিয়ে কথা বলার কৌশল বৈবিক সম্প্রদায় খুব ভাল রকমই জানেন—এবং সেই জন্যই আপনারা সাহিত্যিক-বচনে প্রতিবাদীপক্ষের মুখটা যদিও কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করেছেন—কিন্তু আসলে আলোচ্যবিষয়ের কোন মীমাংসা কত্তে পারেন নি—অর্থাৎ আপনাদের ভাবময় বড় বড় কথার সঙ্গে, আপনাদের কর্ম্মজীবনের কোন যোগ নেই।

গুণেন্দ্র।—দেখুন, আপনি কিন্তু আলাপের মধ্যে প্রলাপের ঝাঁজ এনে ফেল্‌চেন। আপনার উক্তির মধ্যে যুক্তির চেয়ে—যুক্তিহীনতাই বেশী প্রকাশ পাচ্ছে। সুতরাং আপনার সঙ্গে অধিক তর্ক কল্লে পুনরায় মেসের ব্যাপার হয়ত ঘটে যেতে পারে। সুতরাং আমরা চলন্ত তর্কটা বন্ধ করে দি।

ক।—সত্যি বটে, আমি আপনার সঙ্গে তর্কে না আঁট্‌তে পেরে টেম্পার লুস্‌ কচ্ছিলুম। আশা করি এক্সকিউস্‌ কর্ব্বেন।

গুণেন্দ্র।—যাক্‌, এরমধ্যে ক্ষমা করা করির বিশেষ কিছু নেই। আপনি কিছু মনে কর্ব্বেন না। কোন বিষয় তর্ক করলেই মনের মধ্যে একটা উত্তেজনা আস্‌বেই।

ক।—যাক্‌, আপনার একটা মস্ত গুণ লক্ষ্য কল্লুম। আপনি খুব কুলহেডেড্‌, আচ্ছা তবে আসি।

গুণেন্দ্র।—আচ্ছা তবে নমস্কার, কাল কিন্তু আপনার চায়ের নিমন্ত্রণ রইল, আস্‌তে ভুল্‌বেন না।

ক।—নিশ্চয়ই আসব।

(২)

[স্থান—একটি বাগান। বাগানে গুণেন্দ্র ও ভবেশ। ভবেশ গুণেন্দ্রনাথের শৈশবের সহপাঠী।]

ভবেশ।—তোমাকে আজকাল এমন উদাস উদাস কেন ঠেক্‌ছে?

গুণেন্দ্র।—একটা বিশেষ কারণ হয়েছে।

ভবেশ।—বলি সেই কারণটা কি?

গুণেন্দ্র।—কারণটা,…"যদি বারণ কর তবে গাহিব না।"

ভবেশ।—তাই নাকি, বলি বারণের চোকঠারটা কোন দিক থেকে পেলে?

গুণেন্দ্র।—ঐ পশ্চিম ধার থেকে।

ভবেশ।—তুমি দেখ্‌ছি ভারি বেল্লিক,—বেচারী ছাদের উপর বিকেল বেলাটায় একটু পায়চারি করে বেড়াত—সেদিকেও নজর দিয়েছ!

গুণেন্দ্র।—বল কেন ভাই, একেবারে জখম হয়ে গিয়েছি। বইতে পড়েছি, মেয়েদের কটাক্ষ, বড়ই মর্ম্মঘাতী—এখন সেই কটাক্ষের বাণে মর্ম্মটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে।

ভবেশ।—তাহলে আর কি—আঁচলে গ্রন্থি দেবার জোগাড় করে ফেল।

গুণেন্দ্র।—কিন্তু সব সময় মনের আশা ——

ভবেশ।—মনের আশা আবার কি?

গুণেন্দ্র।—মনের আশা মনেই থাকে
প্রাণ্‌টা মরে পুড়ে
দেখে দেখে পরণে তার
শান্তি পুরে ডুরে।

ভবেশ।—ডুরে আবার কি?

গুণেন্দ্র।—দূত্‌ বেরসিক! ডুরে মানে ডুরে কাপড়!

কবিতার মিলের জন্যে আজকাল ওরকম দুএকটা শব্দ বাদ দেওয়ার আইন হয়ে গেছে।

ভবেশ।—যাক্ ভাই, কবিতার থেকে শব্দ বাদ্ যাক ক্ষতি নেই, কিন্তু তোমার মনের থেকে যেন—পরণে যাঁর ডুরে, তিনি যেন বাদ না যান।

গুণেন্দ্র।—তিনি মনের থেকে বাদ্ গেলে - পৃথিবী থেকে বাদ্ পরে যাব যে!

ভবেশ।—অর্থাৎ—

গুণেন্দ্র।—অর্থাৎ মৃত্যু।

(৩)

[গুণেন্দ্র তাঁহার কামরায় চিঠি লিখেতেছেন। পার্শ্বে পরেশ,—গুণেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু]

পরেশ।—কিরে, তুই কলম ছাড়বি না? কত গুলো চিঠি লিখ্ বি?

গুণেন্দ্র।—আর বলিস কেন। মেয়ে বন্ধুদের চিঠির জবাব দিতে দিতে নাকাল হয়ে গেলুম, এই দেখ না ছ'খানা চিঠি লিখেছি, সবটাই মেয়েদের চিঠির জবাব। যদি এই মেয়েদের একজনেরও চিঠির জবাব দুএক কথায় সেরে ফেলি, তা হলে বিপদ; কাজেই লম্বা লম্বা চিঠি লিখছি।

পরেশ।—বাস্‌রে বাস্! এত 'বন্ধুনী' জুটিয়ে ফেলেছিস্! বিজুলিটি কে?

গুণেন্দ্র।—দত্ত সাহেবের ছোট মেয়ে। বাস্তবিক মেয়েটি যেমন সুন্দরী তেম্নি সুগায়িকা। ওরকম মেয়ে সচরাচর নজরে পড়ে না।

পরেশ।—তাকে যে চিঠি লিখচিস্?

গুণেন্দ্র।—না ভাই তুমি বোঝ না। মেয়েরা ভয়ানক সেন্‌সিটিভ হয়, সেদিন চায়ের টেবিলে—তার দেওয়া সবটুকু মিষ্টি খেয়ে উঠতে পারিনি—হয়ত বেচারী সে জন্য ক্ষুণ্ণ হয়েচেন। তাই ভাবছি ক্ষমা চেয়ে পত্র লেখা ভাল।

পরেশ।—তিনি মিস্ না মিসেস্।

গুণেন্দ্র।—না তিনি মিস্। কিন্তু সেজন্য ভয় পেওনা। বন্ধনের ব্যবস্থা অন্যত্র হয়েছে—পরে সে রহস্য ফাঁক্ কর্ব্ব, এখন নয়!

পরেশ।—"স্নেহবতী"—কে?

গুণেন্দ্র।—তিনি আমার দাদার শালার খুড়তুতো ভায়ের শালার এক বিশেষ বন্ধুর স্ত্রী।

পরেশ।—সেই শেষ শালার বিশেষ বন্ধুর নাম কি?

গুণেন্দ্র।—তাঁর নাম কি ঠিক জানিনা, তাকে দেখিওনি জানিও না।—ঘটনা ক্রমে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বম্বে যেতে পথে ট্রেণে আলাপ হয়। আমিই নানা রকমে নানা পরিচয়ের সূত্র ধরে খাতির জমিয়ে নিয়েছিলুম। বেশ মহিলা! হিন্দুঘরের মেয়ে হলে হবে কি, তাঁকে দেখলে মনে হবে ইয়ুরোপীয় কোন মেয়ে বাঙ্গালী পরিচ্ছদে আত্মগোপন করে আছেন।

পরেশ।—তাকে চিঠি লিখি্তে বস্‌লি কেন?

গুণেন্দ্র।—তিনি একটা কাণের ফুল কেনার ফর্ম্মাজ দিয়েছিলেন, তাই এ পত্র লিখ্ ছি।

পরেশ।—কাণের ফুল কিনেছিস্?

গুণেন্দ্র।—এখনো কিনিনি—তবে পত্র প্রাপ্তির সংবাদটি দিয়ে ফেলি, পরে বিস্তৃত পত্র দেব।

পরেশ।—বকুল আবার কে?

গুণেন্দ্র।—ইনি সেই বকুল—যাঁর কথা তোমায় বলেছিলাম, সেই যাঁকে দেখে প্রথম কবিতার সৃষ্টি—

আকুল হয়ে বকুল তুলি
যৌবন কুঞ্জে,
হিয়ায় সেই মধুপ শুধু
ক্ষণে ক্ষণে গুঞ্জে।

সম্প্রতি একটি মুন্‌সিফের সঙ্গে এঁর বিয়ে হয়ে গেছে। মুন্‌সিফটি আবার আমার কাকার বন্ধু। স্কুলে যখন পড়তুম, ঐ মুন্‌সিফ্‌কে, কাকা বলতুম। দেখা হলে এখনো কাকাই ডাকি।

পরেশ।—তা হলে বকুলকে কাকী ডাক্‌বি;—অন্ততঃ মুখে ত নিশ্চয়ই।

গুণেন্দ্র।—শুধু মুখে কেন বুকেও কাকী ডাক্‌তে পারি—কেন না, মনের থেকে বকুল বাসি হয়ে অনেক দিন আগেই ঝরে গিয়েছে—এখন মনের মধ্যে আর একজনের অর্চ্চনা আর স্তুতি চল্‌ছে?

পরেশ। ধন্যি বাপু তুই? আচ্ছা বিয়ে হবার পর বকুলের সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে?

গুণেন্দ্র।—শুধু দাখা, মুন্‌সিফ্ কাকার বাড়ী গিয়েছি—কাকীকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে এসেছি। কাকীও আমায় দেখে খুসী। কাকী কিন্তু চিঠির মধ্যে এখনো সময় সময়

পূর্ব্বস্মৃতি এনে ফেলেন। আমি কিন্তু খুব সাবধান। বাবা, অন্ত-লোকের বউ নয় একেবারে আইনপড়া আদালতের হাকিমের বউ। কোথায় চিঠির কোন কথার মধ্যে দুষ্য কিছু বের করে ফেল্‌বে! এত গেল সাবধানের কথা। আসলে মনের মধ্যেও তাঁর সম্বন্ধে এখন আর কোন রকমের 'কিন্তু' নেই।

পরেশ।—দ্যাখ্, তুই সাবধান হয়ে চলিস্। মেয়েদের সঙ্গে এত বেশী চিঠি লেখা লিখি ভাল না, কোনদিন বিপদে পড়বি।

গুণেন্দ্র।—দ্যাখ, তোমরা হিন্দুয়ানীর চাপে পড়ে একেবারে অপদার্থ হয়ে গেছ। মেয়েদের সঙ্গে মিসলে কি হয়? পুরুষ আর মেয়ে সমান। তোমরা আবহমান কাল থেকে এই দুই জাতির মধ্যে ভেদ-রেখা এমন করে টেনে আনছ, যে তার জন্যে আমাদের সমাজটা এমন অধঃপাতে গিয়েছে!

পরেশ।—সমাজ অধঃপাতে যায় যাক্—সমাজকে অধঃপাত থেকে উদ্ধার কর্ত্তে গিয়ে তুমি নিজে অধঃপাতে যেওনা! যাক্ সে কথা। চট্‌পট চিঠি লেখা সেরে ফেল। আজ বিকেলে গড়ের মাঠে এলফিন্‌ষ্টোন বায়স্কোপে জিগোমারের কীর্ত্তি দেখাবে। তার মধ্যে ডিটেক্‌টিভ্‌-এর অনেক কেরামতি আছে। দেখ্‌তে যাবে? দাদা বল্‌ছেন তাঁর মটর নিতে, দিব্যি যাওয়া যাবে।

(প্রস্থান)

(৪)

ক।—শুনছি আপনার বিয়ে হয়ে গেছে?

গুণেন্দ্র।—আজ্ঞে হাঁ।

ক।—বিয়েটা বেনারসেই হয়ে গেল?

গুণেন্দ্র।—আজ্ঞে বেনারসেই হল।

ক।—আপনার স্ত্রীটি আপনার মনের মতই পেয়েছেন?

গুণেন্দ্র। এত খবর আপনি কোত্থেকে সংগ্রহ কল্লেন?

ক।—আজ্ঞে অত্যন্ত গুপ্ত মহাল থেকে?

গুণেন্দ্র।—হাঁ তিনি হিন্দু বউদের মত এক হাত ঘোমটা দেওয়া পছন্দ করেন না। এমন কি সব সময় পর্দ্দার আড়ালে ঝাপটি মেরে বসেও থাকেন না।

ক।—একটু ভুল বলচেন—আপনার স্ত্রী, একহাত ঘোমটাত দূরের কথা, এক ইঞ্চি কাপড়ও মাথায় রাখা কর্ত্তব্য মনে করেন না।

গুণেন্দ্র।—বাস্‌রে! আপনি এত ঘরের খবর কোথায় পেলেন? আমার শ্বশুরকুলের সঙ্গে কি আপনার কোন পরিচয় আছে?

ক।—কোন কালেই আপনার শ্বশুরকুলের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই।

গুণেন্দ্র।—তাহলে এত ঘরের খবর কোথায় পেলেন?

ক।—বেশী দূর থেকে নয়—আপনারই হৃদয়রাণী শ্রীমতী বিভার নিকট থেকে।

গুণেন্দ্র।—(একটু বিমর্ষ অথচ ব্যাকুলভাবে) বিভার সঙ্গে আপনার পরিচয়ের সূত্রটা কি?

ক।—তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় একটু নূতন রকমেই হয়েছিল। গড়েরমাঠে বায়স্কোপে তিনি সেখানে তাঁর এক ক্রশ্‌চেন লেডী ফ্রেণ্ডের সঙ্গে গিয়েছিলেন। বেশ সপ্রতিভভাবেই আমার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন। সেই সময় লক্ষ্য করেছিলুম—তিনি সেকালের কুসংস্কার মুক্ত হয়ে অনেকটা একেলে হয়ে পড়েছেন। ফেরবার সময় সেইজন্যেই তাঁদের দুজনকে, আমার মটরে উঠ্‌তে বলার কোন সঙ্কোচ অনুভব কল্লুম না। পথে ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে তাঁরা কোনি এক Miss বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে নেমে গেলেন। এর পর তাঁর সঙ্গে বহুবার বহুজায়গায় দেখা হয়েছে। এবং সেই থেকে তিনিও আমায় চিঠিপত্র লেখেন, আমিও তাঁকে লিখি। মাঝখানে, আমার চিঠি পেতে কিছু দেরী হওয়ায় তিনি অভিমান করেছিলেন। কিন্তু সে মান অল্পদিনেই ভঞ্জন করে দিয়েছিলাম।

গুণেন্দ্র।—(রুদ্ধ প্রায় কণ্ঠস্বরে ও ম্লানমুখে) তা হলে দেখ্‌চি বিভার সঙ্গে, আমার চেয়ে আপনার আলাপটাই বুনিয়াদী।

ক।—কতকটা তাই বটে।

গুণেন্দ্র।—আমার একটু কাজ আছে। কাজেই উঠ্‌ছি, ক্ষমা কর্ব্বেন।

ক।—তা হলে আমিও আসি—

গুণেন্দ্র।—আচ্ছা, তা হলে—নমস্কার।

(উভয়ের প্রস্থান)

(৫)

[গুণেন্দ্রনাথের বৈঠকখানায় গুণেন্দ্রনাথ বিমর্ষভাবে কাগজ কলম লইয়া—চিঠি লিখিতে উদ্যত এমন সময়]

ভৃত্য।—হুজুরের চায়ের জল চড়াব ?

গুণেন্দ্র।—পাজি ব্যাটা! হারামজাদা! কে তোকে এখানে আস্‌তে বল্লে ? ফেলেদে চা। আমি চা খাব না।

(গুণেন্দ্রনাথ পত্নীকে পত্র লিখিতেছেন)

চিঠি

প্রিয়তমা———

তোমার সঙ্গে, অন্তরের সম্বন্ধটাকে ঘনিষ্ঠ করে নেবার পূর্ব্বে, কয়েক বিষয় তোমার সঙ্গে একটু বোঝাপড়া করে নিতে চাই। স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমার মত এই—

(১) স্ত্রী-স্বাধীনতা ভাল—কিন্তু মেমেদের মত নয়।

(২) তুমি সকলের সঙ্গে কথা কইতে পার্ব্বে—কিন্তু আমার অনুপস্থিতিতে কোন যুবকের সঙ্গে নয়।

(৩) দীর্ঘ ঘোমটার বিরোধী বটি আমি, কিন্তু তাই বলে মাথায় কাপড় না দেওয়াটাকে নিতান্তই অপছন্দ করি।

(৪) যত ইচ্ছা হাস্য কর্ত্তে পার কর—কিন্তু সভায় মজ্‌লিসে হাস্‌তে হাস্‌তে হেলে দুলে এলিয়ে পড়াটা আমার কাছে ভাল বলে ঠেকে না।

(৫) একলা বেড়াতে পার ঘরের বারান্দায় কিম্বা তোমাদের বাগানের সাম্‌নের পথে—ঠিক সদর রাস্তায় নয়।

(৬) ঠিক যে সব পুরুষ তোমার মামা কাকার অন্তর্গত নয়, তাদের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করোনা ; যেহেতু তা দুষ্য।

পত্র শেষ কর্ব্বার পূর্ব্বে আর একটা কথা বলি। আমার বিয়ের পূর্ব্বে, গড়ের মাঠে বায়স্কোপে, কিম্বা যেখানেই হউক, তুমি অন্য কোন লোকের সঙ্গে প্রেমে পড়েছিলে কি ? যদি পড়ে থাক, তাহলে তোমার অন্তরের যাবতীয় মধু তারি জন্যে সঞ্চিত রেখো ; উচ্ছিষ্ট প্রেমে আমার আবশ্যক নেই। ভালবাসার মধ্যে সংশয় থাকা বড় খারাপ— সুতরাং আমার এই শেষ প্রশ্নের উত্তর সঠিক দেবে। এই উত্তরের উপরেই, তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ সত্য হওয়া আর না হওয়া নির্ভর করছে। ইতি—

শ্রীগুণেন্দ্রনাথ বসু।

(৬)

(গুণেন্দ্রনাথের বসিবার কামরায় গুণেন্দ্রনাথ ও "ক")

ক।—কেমন আছেন মশাই ? বিভার চিঠি পত্র কিছু পেলেন ?

গুণেন্দ্র।—(ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া) দেখুন মশাই, আপনি একটু বেয়াদবী কচ্ছেন !

ক।—বেশ মশাই, এরমধ্যে এমন চটবার ত কিছু নেই, বিভার কুশল বই আর ত কিছু জিজ্ঞেস করিনি—এত রাগবার কি হল ?

গুণেন্দ্র।—(অধিক বিরক্ত হইয়া) মশায়, বিভার কুশল অকুশলের জন্য আপনার কেন এ্যাত মাথাব্যথা ?

ক।—বিলক্ষণ! তিনি কিছুদিন হয় তাঁর অসুস্থতার সংবাদ দিয়ে আমায় একটা চিঠি লিখেচেন—তারপর এই সাত দিনের মধ্যে আর তাঁর কোন চিঠিপত্র পাইনি—তাই মনটা খারাপ—

গুণেন্দ্র।—(আরো উষ্ণ হইয়া) বটে, তা মনটা না হয় খারাপই রইল, আমার কাছে বার বার ঘ্যানর ঘ্যানর করে কি লাভ হচ্চে ?—যাক মশাই—আপনি আমার স্ত্রী-সম্বন্ধে আমাকে কোন কথা বল্‌বেন না। আর সহ্য হয় না। অসহ্য হয়েছে !

ক।—বেশ তা হলে আমি চল্লুম, এই সঙ্গে তা হলে—

গুণেন্দ্র। ("ক" এর কথায় বাধা দিয়া) হাঁ এই সঙ্গে আপনার সহিত আমার সম্বন্ধ রহিত হল। এখন আপনি আসুন, আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।

(কএর প্রস্থান। গুণেন্দ্র আপনার মনে বলিতে লাগিল—)

বড় ভুল ভেবেছিলাম। এখন দেখ্‌ছি স্ত্রী-স্বাধীনতা ভারতে যে নাই, ভালই হয়েছে। মেমেদের মত আমাদের দেশে মেয়ে স্বাধীনতা চল্‌বে না। তাইত, বিভা, আমার চিঠির জবাব না দিয়ে লিখ্‌লো চিঠি ঐ বেটা আহাম্মক্‌ কে! নিশ্চয়ই এর মধ্যে কিছু 'কিন্তু' আছে। যাক্‌, বিভার সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচিয়ে ফেলাই ঠিক। কিন্তু ও লোকটাই বা কি রকম প্রকৃতির ? এই সেদিন, দত্ত সাহেবের মেয়েদের সঙ্গে মহোল্লাসে চা পান করেছিলুম, সেইজন্য ও ব্যক্তি, মেয়েঘ্যাসা বলে আমায় কত না ঠাট্টা করেছিল। এখন কিনা নির্লজ্জের মত নিজেই বল্‌ছে বিভার সঙ্গে, বায়স্কোপে খাতির জমিয়েছিল। দুনিয়াটা দেখ্‌ছি আগা গোড়াই ফাঁকি।

(হঠাৎ পরেশের প্রবেশ)

পরেশ।—ওরে হতভাগা, দুনিয়াটার এত বড় ফাঁকির খবর—মেয়েদের বন্ধু করবার সময় পাস্‌নি ? ইতিপূর্ব্বে

তুইও ত বিস্তর মেয়েদের সঙ্গে দেলখোস গল্প করে আড্ডা দিয়েছিস—চিঠি লিখেছিস।

গুণেন্দ্র।—আর বলিস না। ঠেকে বুঝেছি—মেয়ে স্বাধীনতা চল্‌বে না।

পরেশ।—ভালই বুঝেছিস্ চল্ এখন ওঠ্—খোকার বাড়ী নিমন্ত্রণ আছে। ৯টার সময় যেতে বলেছিল, এখন রাত্তিরও ৮॥টা হয়েছে।

গুণেন্দ্র।—তাইত রে,—সে কথা মনেই নাই যে—

পরেশ।—মনে ত হয়েছে, এখন চল্। (উভয়ের প্রস্থান)

(৭)

[গুণেন্দ্র তাহার বসিবার ঘরে বসিয়া ভবেশের সহিত জীবনের সুখ ও দুঃখ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে এমন সময় পিওন আসিয়া একটা চিঠি গুণেন্দ্রনাথের হাতে দিল]

ভবেশ।—কার চিঠি এল ?

গুণেন্দ্র।—আমার বড় শালীর—

ভবেশ।—কই এত দিনের মধ্যে তোর বড় শালীর কোন রকম্ কথাই তো আমায় বলিস্‌নি।

গুণেন্দ্র।—তার কারণ আছে। আমি তাঁকে চোখেই দেখিনি। আমার বিয়ের সময় উনি সম্বলপুরে ওঁর এক জ্যাঠার বাসায় ছিলেন।

ভবেশ।—লোকটি কেমন ?

গুণেন্দ্র।—শুনেছি বেশ রসিকা।

ভবেশ।—বোধ হয় বিভার সম্বন্ধে তোকে কিছু লিখেছেন—না ?

গুণেন্দ্র।—তা ত লিখেছেন—আজ বেলা ১০॥ সময় তিনি আমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে আসবেন। তা তিনি বিভার সম্বন্ধে যতই ওকালতি করুন, আমি তাঁকে স্পষ্টই বলে দেব যে, বিভাকে নিয়ে আমি ঘর কর্ত্তে পার্ব্ব না। হাজার হোক বিভা ত হিন্দুঘরের মেয়ে, তার পক্ষে অতটা হাল ফ্যাসনের স্ত্রী-স্বাধীনতা নকল করা ঠিক হয় না।

ভবেশ।—একি কথা বলছিস্! কিছুদিন অর্থাৎ বিয়ের আগে তুই কতবার বলেছিস্ না—হিন্দুয়ানী বড় বদ, মেয়েদের স্বাধীনতা নেই ইত্যাদি—আবার তুই উল্টো সুর ধরেছিস্!

গুণেন্দ্র।—মানুষ চিরকালই যে বিশেষ এক মতে টিক্ করে থাকবে, তার কোন কারণ নেই—যুক্তিও নেই। পৃথিবীতে সবই পরিবর্ত্তনশীল; সুতরাং মানুষের মনের চিন্তারও যে পরিবর্ত্তন ঘটবে, এ আর বিচিত্র কি ? বরং এই অনন্ত পরিবর্ত্তনটাই স্বাভাবিক। কাজেই এক সময় স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষে ছিলাম বলেই যে আজও সেই মত পোষণ কর্ব্ব—এর কোন মানে নেই।

ভবেশ।—ধন্যি বাপু তোমরা নবীন সাহিত্যিকের দল। ভাবের কথার এবম্বিধ প্রলেপ দিয়ে তোমরা অনায়াসে নিজেদের দুর্ব্বলতা কে ঢাক্‌তে পার। যাক্ বাপু, তা হলে এখন সোজা হয়ে এসেছ। গিরীশ যখন বলেছিল, ভারত-বর্ষে মেয়েস্বাধীন, মারাঠী স্ত্রীস্বাধীনতার ধরণে চল্‌তে পারে, তখন যে নাক সিটকে বলেছিলে "Still that is insufficient।" আর এখন যে একেবারে মতটাই বদ্‌লে ফেল্লে।

(এমন সময় ঘর ঘর করিয়া একটি সেকেণ্ডক্ল্যাশ ঠিকা গাড়ী গুণেন্দ্রনাথের বাটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ীর ভিতর হইতে, একটি তরুণী, বিভা ও "ক" নামিয়া, গুণেন্দ্রনাথের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন।)

তরুণী।—(গুণেন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া)

আপনিই কি গুণেন্দ্র বাবু ?

গুণেন্দ্র।—আজ্ঞে হাঁ।

তরুণী।—আমিই তোমাকে চিঠি লিখেছিলুম। বিভা আমার সঙ্গে এসেছে। দেখ্‌তে পেয়েছ ? দেখ ত চেয়ে ওর পোষাকে মেয়েদের পোষাকের গন্ধ কতটা আছে ?

গুণেন্দ্র।—আপনার কথার উত্তর দেবার পূর্ব্বে একটা অনুরোধ ("ক"এর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া) ঐ লোক-টাকে ঘরের থেকে বার করে দিন—He is a knave। I can't bear his sight।

তরুণী।—ক্ষ্যাপা না পাগল, কি বলছ কি ? উনি যে আমার স্বামী। বিভার বয়স যখন ১২ বছর,-উনি তখন ওকে ইংরিজে বাংলা দুই পড়িয়েছেন।

গুণেন্দ্র।—(অপ্রস্তুত হইয়া) তাই নাকি ?

তরুণী।—(গুণেন্দ্রনাথের কর্ণমূলে কোমল কর-চম্প-কাঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া) বুদ্ধিমানের ঢেঁকি এই বুকের পাটা নিয়ে স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচার কর্ত্তে বেরিয়েছিলে ? যাও হাঁটুজলে ডুব দিয়ে মর গিয়ে। ("ক"এর প্রকৃত নাম নৃপেন্দ্র।)

নৃপেন্দ্র।—যাক্ বেচারা কে আর কেন লজ্জা দিচ্ছ ?

হাজার লোক ত যুবক, তায় ইংরাজি ভাবাপন্ন—তাতে আবার উঠ্‌তি বয়সে সুন্দরী স্ত্রীর স্বামীত্ব হয়েচে—কাজেই ওর কাছে আমার এই বিদ্রূপটাও সত্য হয়ে উঠেছিল।

গুণেন্দ্র।—আর কেন, যথেষ্ট হয়েছে।

তরুণী।—যথেষ্ট কিছুই হয়নি। বিভার পায়ে ধরে বিশবার নাকে খত দিয়ে ক্ষমা চাও। একি ঠাট্টা পেয়েছ? সম্বন্ধ ত্যাগ কল্লেই হল?

নৃপেন্দ্র।—অনেক হয়েছে। আর কাটা ঘায়ে নুণের ছিটে দিওনা।

ভবেশ।—ঠিক বলেছেন নৃপেন্দ্র বাবু—adding insult to injury।

তরুণী।—আচ্ছা আর বিরক্ত কর্ব্ব না। তবে ক্ষমা চাইতে হবে।

গুণেন্দ্র।—কার কাছে?

তরুণী।—আমার কাছে, ওঁর কাছে, আর পায়ে ধরে বিভার কাছে।

গুণেন্দ্র।—আপনার কাছে ক্ষমা, নৃপেন্দ্র বাবু আপনার কাছে ক্ষমা, আর বিভা তোমার কাছে তিনবার ক্ষমা, ক্ষমা, ক্ষমা!

(সমাপ্ত)

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী।

ধৃষ্টতা।

নাহি মোর আপনার স্থান, আমি চাহি অপরে রাখিতে,
যথা মোরে মানে নাকো কেহ, তথা সদা চাহি শ্রেষ্ঠ হ'তে।
মোর যথা নাহি প্রয়োজন, অনাহুত কেন যাই তথা।
পায়ে ঠেলে চলে যায় যারা, তাহাদেরি কহি মর্ম্মব্যথা,
এ কষ্ট ত ইঙ্গিত তোমারি, না মানিয়া পুড়ি অপমানে
নিত্য ছেড়ে অনিত্যে মজিয়া, বৃথা তাপ সদা সহি প্রাণে।

শ্রীমতী অবলাবালা মিত্র।

মূল্যবৃদ্ধি।

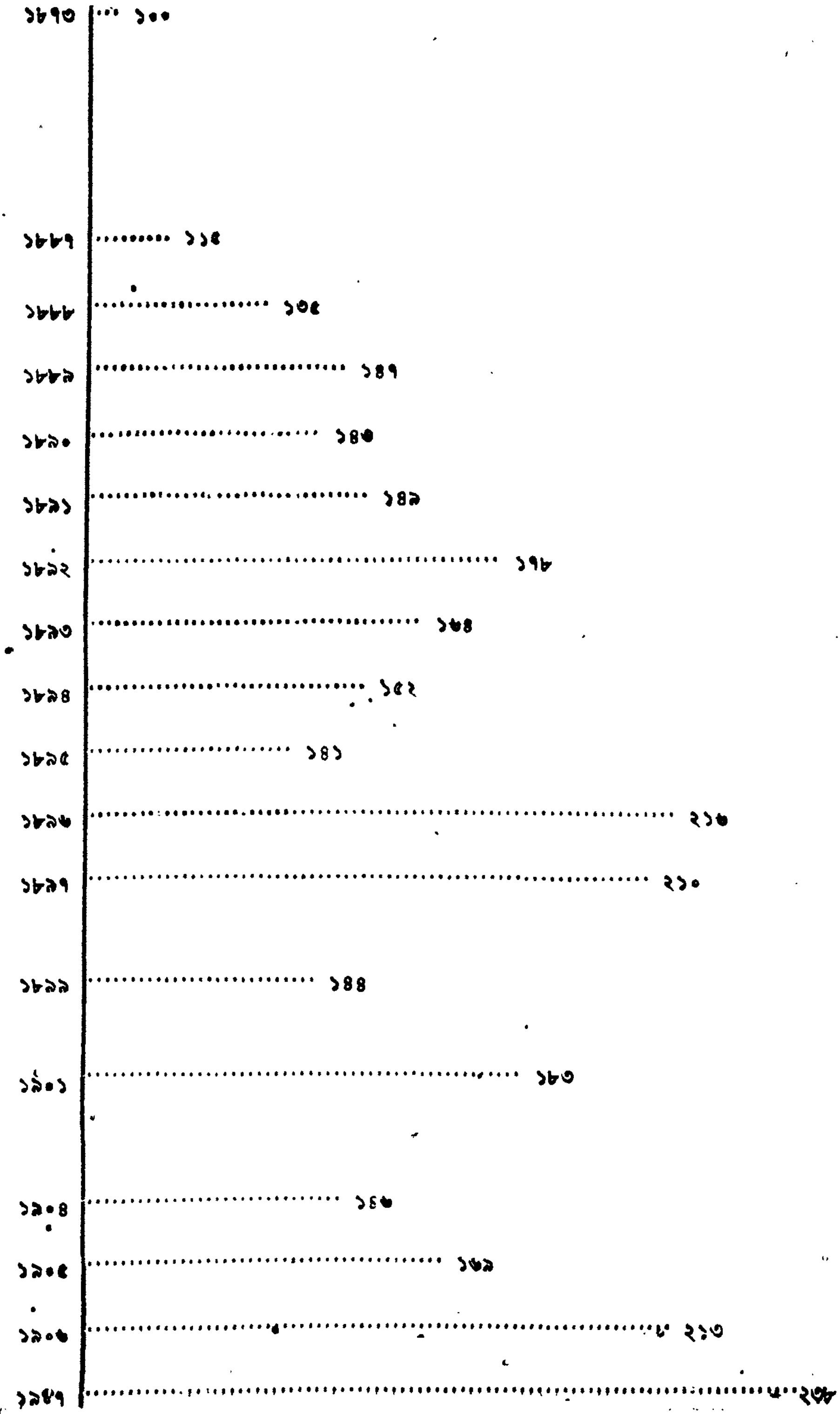
দেশময় একটা কোলাহল উঠিয়াছে, জিনিষ পত্রের মূল্য বৃদ্ধির জন্য লোকের বড় কষ্ট হইয়াছে। কোন ভদ্রলোকের সহিত ঘরকন্নার কথা উঠিলেই ঐ এক কথা—"আর মশায়, যে মাগ্‌গির দিন পড়েছে, কিছুতেই আর কুলায় না। এর পর ত দেখ্‌ছি, না খেয়ে মারা যেতে হবে।" সাধারণতঃ সকল দ্রব্যেরই, বিশেষ খাদ্যদ্রব্যের মূল্য যথার্থই খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু লোকের সেজন্য যথার্থই বড় কষ্ট হইয়াছে কিনা এবং হইয়া থাকিলে কি পরিমাণ হইয়াছে ও সে কষ্ট নিবারণের কোনও উপায় আছে কিনা, তাহা বিবেচনার বিষয়।

প্রথমতঃ দেখা দরকার মূল্যবৃদ্ধির গতি কিরূপভাবে চলিয়াছে এবং এই মূল্যবৃদ্ধির কারণ কি? তারপর প্রতিকারের আবশ্যকতা বোধ করিলে তাহার উপায়ের সন্ধান করিতে হইবে।

পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের জন্য অশেষ অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তনহেতু অনেক দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়াছে এবং কোন কোন দ্রব্যের মূল্য কমিয়াছে। সে সকল তত্ত্ব এ প্রবন্ধে বিচার করিবার সুবিধা হইবে না। যুদ্ধের জন্য যে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে, তাহা আমি বিবেচনার বিষয় হইতে এজন্য বাদ দিব। খাদ্য দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির নালিশই বেশী শুনিতে পাওয়া যায় এবং খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য দেশে আর অন্য বিষয়েও খরচ বাড়িয়াছে সুতরাং অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির বিষয়েই বিশেষরূপ বিবেচনার আবশ্যক হইয়াছে।

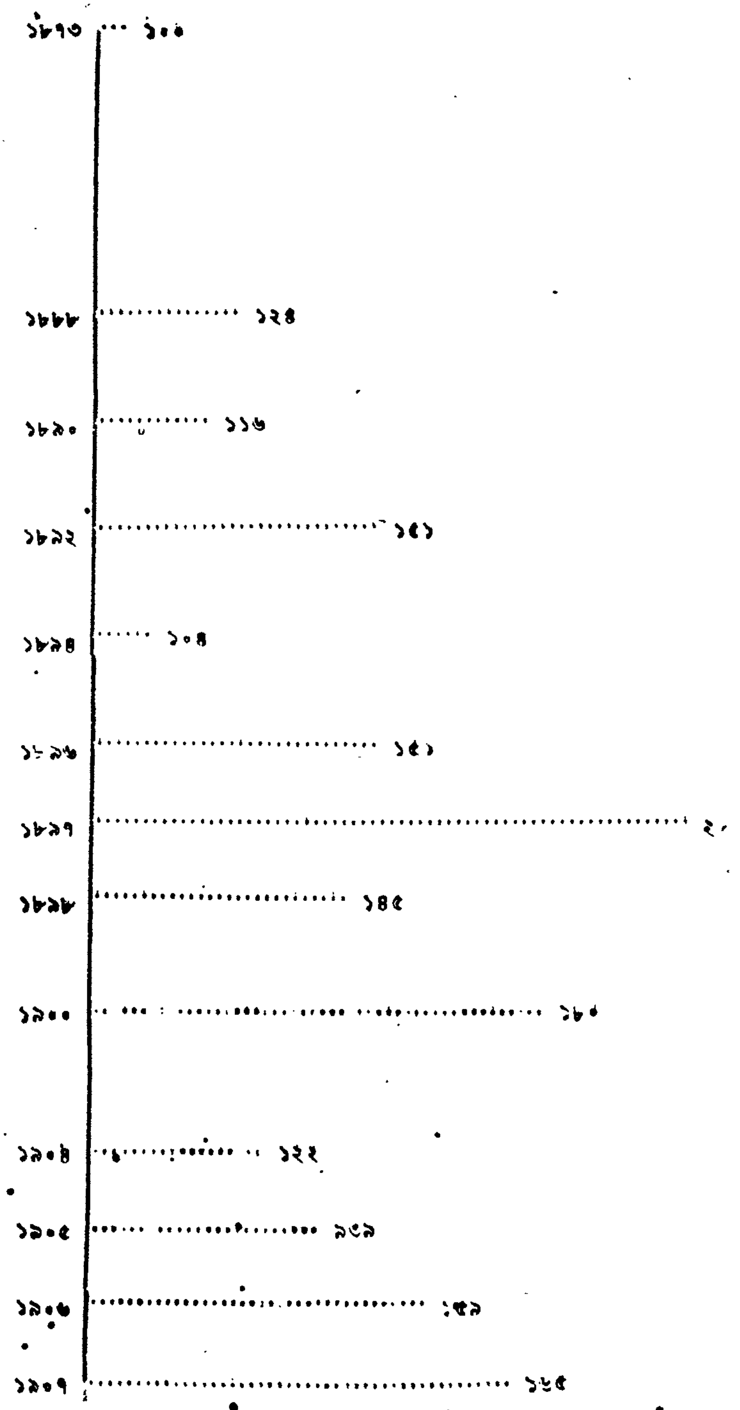
ভারতের প্রধান খাদ্য চাউল ও গম। নিম্নের চিত্র হইতে ১৮৭৩ হইতে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩৫ বৎসরে এই দুই দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির গতি ও পরিমাণ উপলব্ধি হইবে। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে আমরা ইহাদের মূল্য ১০০ ধরিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধির পরিমাণ এই চিত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছি। (প্রতি বৎসরের মূল্যের প্রথম অঙ্কগুলি কোন রেখা দ্বারা সংযোগ করিলেই চিত্রটী সম্পূর্ণ হইবে।)

চাউল।



১৮৭৩ ১০০
১৮৮৭ ১১৫
১৮৮৮ ১৩৫
১৮৮৯ ১৪৭
১৮৯০ ১৪৩
১৮৯১ ১৪৯
১৮৯২ ১৭৮
১৮৯৩ ১৬৪
১৮৯৪ ১৫২
১৮৯৫ ১৪১
১৮৯৬ ২১৬
১৮৯৭ ২১০
১৮৯৯ ১৪৪
১৯০১ ১৮৩
১৯০৪ ১৫৬
১৯০৫ ১৬৯
১৯০৬ ২১৩
১৯০৭ ২৩৮

গম।



উপরোক্ত চিত্র হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী ৩০।৩৫ বৎসরে চাউলের মূল্য দ্বিগুণের উপর উঠিয়াছে এবং গমের মূল্য দেড় গুণেরও অনেক অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৮৯৬।৯৭ সালে ভারতের নানাস্থানে অতিশয় অনাবৃষ্টি ঘটিয়াছিল। ঐ সময়ে চাউল ও গমের মূল্য হঠাৎ অতিশয় অধিক বাড়িবার

বার তাহাই কারণ হইলেও মোটামুটি একটা সাধারণ ক্রমবৃদ্ধি প্রায় সমভাবেই চলিয়াছে। বৃদ্ধির সাময়িক পরিবর্ত্তন—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি নানারূপ প্রাকৃতিক কারণে ঘটিয়াছে মনে করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই নিয়মিত ক্রমবৃদ্ধির কারণ আমাদিগকে অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে। রত্নপ্রসূ ভারত যে একেবারে উর্ব্বরাশক্তি বিহীন হইয়া পড়িয়া শস্য প্রদান করিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করিতেছেন সে কথাও ঠিক করিয়া বলা চলে না; কারণ সরকারী 'রিটার্ণ' হইতে ভারতে জমির পরিমাণে ধান এবং গমের উৎপত্তির পরিমাণ প্রায় সমানভাবেই আছে—দেখা যাইতেছে। লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকিলেও যে হিসাবে লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে, শস্যের উৎপাদন সেই পরিমাণ দ্রুত গতিতে না বাড়িলেও দেশের উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ঐ বর্দ্ধিত লোকসংখ্যার পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ হইয়াছে দেখা যায়। অবশ্য ইহা মূল্যবৃদ্ধির একটি কারণ হইলেও এবং বৎসর বিশেষে দেশে অজন্মা হইয়া সাময়িক মূল্য বৃদ্ধির কারণ ঘটিলেও এই নিয়মিত অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধির কারণ কেবল মাত্র ইহাই হইতে পারে না।

এই মূল্যবৃদ্ধি হওয়ায় দেশের একশ্রেণীর লোকের বিশেষ কষ্ট ঘটায়, দেশে যে অসন্তুষ্টি এবং অসুখের সৃষ্টি হয়, তাহা গবর্ণমেণ্টেরও মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং গবর্ণমেণ্ট ইহার কারণ এবং প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য এক অনুসন্ধান কমিটী নিয়োগ করেন। তাহার ফলাফল কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, জানি না।

আমার মনে হয়, কেবল উপরোক্ত কারণ দুইটি ভিন্ন অন্যান্য অনেক কারণেও খাদ্যের এইরূপ মূল্য বৃদ্ধি পইয়াছে। নিম্নে ধারাবাহিকরূপে এই কারণগুলির পর্য্যালোচনা করিতেছি :—

(১) অনাবৃষ্টি এবং অতিবৃষ্টি প্রভৃতি কারণে শস্য নষ্ট হইয়া, প্রায়ই দেখা যাইতেছে, সাময়িকভাবে শস্যের মূল্য অতিশয় বাড়িয়া যাইতেছে। এই কারণেই অনেক গো-মহিষাদি পশুও নষ্ট হইতেছে। ১৮৯১।৯২ খৃষ্টাব্দে ভারতের বহুদিনব্যাপী অনাবৃষ্টির কথা অনেকের মনে আছে। এই অনাবৃষ্টির জন্য ঐ সময় হঠাৎ শস্যের দাম অতিশয় বাড়িয়া যায়। উপরোক্ত চিত্র হইতে ঐ সময় চাউলের দাম হঠাৎ কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা পাঠকগণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ঐ সময় ইউরোপে অজন্মা হইয়া তথায় গমের অতিশয় অভাব হয় এবং ভারতীয় গম তথায় অনেক পরিমাণে রপ্তানি হইতে থাকে। ইহা ভিন্ন জল এবং খাদ্যাভাবে অনেক গো-মহিষাদি পশুর মৃত্যু ঘটায়, নূতন চাষের অবস্থাও আশাপ্রদ হয় না। সুতরাং পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর বৃষ্টির অবস্থা অনুকূল হইয়া বর্দ্ধিত মূল্যের পরিমাণ কমিয়া গেলেও উহা একেবারে পূর্ব্বের 'লেভেলে' আসে না। তবুও মূল্য ক্রমশঃ কমিয়া ১৮৯৪।৯৫ খৃষ্টাব্দে খাদ্যের মূল্য বেশ সস্তা হয় কিন্তু তারপরেই ১৮৯৬।৯৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে ভয়ানক অনাবৃষ্টি হইয়া হঠাৎ খাদ্য দ্রব্যের মূল্য ভয়ানক চড়িয়া যায় এবং দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। উপরোক্ত চিত্র হইতে এই হঠাৎ ভয়ানক রূপ মূল্যবৃদ্ধির গতি ও পরিমাণ সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। এই অনাবৃষ্টি এবং তজ্জনিত অভাবের উপর অতিশয় অধিক পরিমাণ রপ্তানির টানে লোকের ক্লেশের পরিমাণ আরও বাড়িয়া উঠে। ইহাতে দেশের মজুত সামান্য শস্য পর্য্যন্ত ফুরাইয়া যায়। ফলস্বরূপ পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরে শস্যের অবস্থা ভাল হইলেও, মূল্য আশানুরূপ কমিতে পারে না। এইরূপ উপর্য্যুপরি ঘটায় এবং তদনুসঙ্গিক নানাকারণে যে ক্রমশঃ মূল্যবৃদ্ধির অনেক সাহায্য করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

(২) দ্বিতীয় কারণের বিষয়েও পূর্ব্বে কিছু আভাষ দিয়াছি। জমিতে খাদ্য উৎপত্তির পরিমাণের হার খুব না কমিয়া থাকিলেও শস্য উৎপাদনের জমির পরিমাণ দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত সমতা রাখিতে পারিতেছে না। ১৮৯৭।৯৮ খৃষ্টাব্দে ভারতে ১৮৩০ লক্ষ একার জমিতে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯০৬'০৭ খৃষ্টাব্দে ঐরূপ জমির পরিমাণ ১৯৩০ লক্ষ একারে উঠিয়াছিল; অর্থাৎ দশবৎসরে খাদ্য শস্য উৎপাদনের জমির পরিমাণ শতকরা প্রায় ৭॥ ভাগ মাত্র বাড়িয়াছিল দেখা যায়। কিন্তু ঐ সময়ে কার্পাস এবং পাটের জমির পরিমাণ শতকরা যথাক্রমে ৫০ এবং ৭০ ভাগ বৃদ্ধি হইয়াছিল। ১৮৯৭'৯৮ এবং পরবর্ত্তী দুই বৎসরে ভারতে যথাক্রমে ৫০০০ লক্ষ ৫০৫০ লক্ষ এবং ৫৫১০ লক্ষ হন্দর চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু ১৯০৪।০৫ এবং পরবর্ত্তী দুই বৎসরে গড়পড়তায় প্রতিবৎসর উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ৪৪৪০ লক্ষ হন্দরের উপর উঠে নাই। ভারতে ঐ সময় উৎপন্ন গমের পরিমাণ বাড়িয়াছিল,

এবং প্রথমোক্ত সময়ে যে পরিমাণ গম উৎপন্ন হইয়াছিল, দ্বিতীয়োক্ত সময়ে উৎপত্তির পরিমাণ গড়পড়তায় তদপেক্ষা শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ফলস্বরূপ আমরা উক্ত চিত্রে দেখিতে পাইতেছি, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে চাউলের দাম যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, গমের মূল্য সে পরিমাণ বাড়িতে পারে নাই। চাউলের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার আরও একটি কারণ, দক্ষিণ ভারতবর্ষের অনেক সাধারণ লোক—যাহাদের প্রধান খাদ্য পূর্ব্বে ছিল জোয়ার এবং বাজরা—তাহারা এখন কার্পাসের চাষে অবস্থা ভাল করিয়াছে এবং হাতে প্রচুর পয়সা হওয়ায় উৎকৃষ্টতর খাদ্য-চাউল এবং কখনও গম ব্যবহার করিতেছে। ভারতের কোন প্রদেশ নূতন করিয়া বিশেষভাবে গমের ব্যবহার আরম্ভ করে নাই। দেশের লোকসংখ্যা নানারূপ ব্যাধির বিদ্যমানতা সত্বেও বাড়িয়া যাইতেছে। যে পরিমাণে খাদ্য বাড়িয়াছে, তাহা বর্দ্ধিত লোকসংখ্যার পক্ষে পরিমাণে যথেষ্ট হইলেও যে হিসাবে লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে, খাদ্যের পরিমাণ সে হিসাবে বাড়ে নাই। ইহার উপর শস্যের রপ্তানি চলিতেছে। সুতরাং সেজন্য কিছু মূল্য বৃদ্ধি না হইবার কারণ নাই।

(৩) পূর্ব্বেই আমি বলিয়াছি দেশের জনসংখ্যাবৃদ্ধির অনুপাতে খাদ্য-শস্য উৎপত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় নাই। এবং পূর্ব্বে যাহারা অন্যান্য খাদ্য ব্যবহার করিত এখন তাহারা চাউল এবং কদাচিৎ গম ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার উপর এই সকল খাদ্য বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। যে সময়ের কথা আমি বিবেচনা করিতেছি, ঐ সময় চাউল ও গমের রপ্তানি যে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু পূর্ব্বে যে দামে রপ্তানি হইত ক্রমেই তদপেক্ষা অধিক দামে রপ্তানি আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে আর্থিক হিসাবে ভারতের সুবিধা হইলেও যে সকল সমৃদ্ধিশালী দেশে ইহা রপ্তানি হইতেছে, ঐ সকল দেশের প্রচলিত মূল্যের সহিত ভারতের মূল্যের সামঞ্জস্য হইয়া আসিতেছে। রেল জাহাজ প্রভৃতির অত্যধিক প্রচলনে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত স্বাভাবিক নিয়মেই এদেশের মূল্যের সমতা সঠিক হইবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। অন্যান্য সম্পন্ন দেশ তাহাদের আবশ্যকতা অনুসারে অধিক দামে আমাদের খাদ্য-শস্য ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেছে। ঐ মূল্যের সহিত সমতারক্ষার নিয়মে এদেশেও মূল্য বাড়িয়াছে। কিন্তু বিদেশ হইতে বর্দ্ধিত মূল্য পাইয়া আমরা যে লাভ করিতেছি, তদ্দ্বারা অধিকমূল্যে খাদ্য খরিদের লোকসান আমাদের কিছু পোষাইয়া যাইতেছে। সে কথা পরে বলিতেছি।

অন্যান্য দেশে রপ্তানির জন্য ঐ সকল দেশের প্রচলিত বর্ত্তমান মূল্যের সহিত এদেশের চাউল এবং গমের মূল্য কিরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই। কারণ চড়াদামে রপ্তানির জন্য খরিদ চলিতে থাকিলেই এদেশের ব্যবহারের জন্যও ঐরূপ চড়াদামে দ্রব্য খরিদ করিতে হয়, এবং এদেশে অন্যান্য কারণে বাজার চড়িলে অপর দেশকেও ঐ সকল দেশের মূল্যের সহিত সমতা রাখা সম্ভব হইলে, চড়াদামে ভারতে শস্য খরিদ করিতে হয়। এইরূপে পরস্পরের স্বাভাবিক প্রতিযোগিতায় মূল্য বাড়িয়া যায়। নিম্নের তালিকা দুইটি হইতে পাঠকগণ ধান এবং গমের রপ্তানির মূল্যের বৃদ্ধির পরিমাণ বুঝিতে পারিবেন।

ধান।

বৎসর	রপ্তানির প্রতি টনের গড় মূল্য
১৯০৩—০৪	৮৫৲ টাকা
১৯০৪—০৫	৭৯৲ টাকা
১৯০৫—০৬	৮৬৷৷০ টাকা
১৯০৬—০৭	৯৫৲ টাকা
১৯০৭—০৮	১০৫৷৷০ টাকা

গম।

বৎসর	রপ্তানির প্রতি টনের গড় মূল্য
১৯০৩—০৪	৮৫৲ টাকা
১৯০৪—০৫	৮৬৷৷০ টাকা
১৯০৫—০৬	৮৭৷৷০ টাকা
১৯০৬—০৭	৯১৲ টাকা
১৯০৭—০৮	৯৮৲ টাকা

উপরোক্ত তালিকায় দেখা যাইবে যে কেবল ১৯০৪—০৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে এবং ইউরোপে যথেষ্ট পরিমাণ শস্য জন্মাতে রপ্তানি শস্যের মূল্য কিছু কম হইয়াছিল। নতুবা উহার মূল্য ক্রমশঃই বাড়িয়াছে দেখা যায়। এ বৃদ্ধিতে এদেশেও মূল্য বৃদ্ধি হইবার এক কারণ ঘটিয়াছে।

(৪) কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর এবং উল্লেখযোগ্য কারণ ভারত গবর্ণমেণ্টের—কেবল ভারত গবর্ণমেণ্টের কেন সমস্ত সভ্যজগতের গবর্ণমেণ্টের—মুদ্রানীতি। এই নীতির ফলে পৃথিবীতে নানারূপ মুদ্রার পরিমাণ ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে মুদ্রার পরিমাণ যাহা ছিল, এখন তদপেক্ষা অনেক পরিমাণে অধিক হইয়াছে। ভারতের মুদ্রাসংখ্যাও অনেক বাড়িয়াছে। যে সময়ের কথা আমরা বিবেচনা করিতেছি, ঐ সময়ের প্রারম্ভে কেবল এক ১৮৭৭—৭৮ খৃষ্টাব্দেই ভারতের টাকশালে ১৫৯৪৩৪৯৮০ নূতন টাকা প্রস্তুত হইয়াছিল। ঐ সময়ে রূপার বাজার সস্তা থাকায় এবং এইরূপ টাকা প্রস্তুতের কার্য্য ক্রমাগত চলায়, দেশে এত অধিক পরিমাণ টাকা সঞ্চালিত হইতে থাকে যে টাকার ক্রয়করী শক্তি অতিশয় কমিয়া যায় এবং ইংলণ্ডীয় স্বর্ণমুদ্রার সহিত বিনিময়ের সমতা রাখিবার জন্য হোমচার্জ্জের নিমিত্ত ভারত গবর্ণমেণ্টের ভয়ানক লোকসান হইতে থাকে। ইংলণ্ডে টাকা পাঠাইতে ইংরেজ কর্ম্মচারীগণের বিনিময়ের বাজারে অতিশয় ক্ষতি হইতে থাকে। তখন তাহাদিগের ক্ষতিপূরণের জন্যও (Exchange compensation) গবর্ণমেণ্টকে ব্যবস্থা করিতে হয়। নির্দ্দিষ্ট বেতনভোগী কর্ম্মচারীদিগেরও টাকার ক্রয়করী শক্তি কমিয়া যাওয়ায় অতিশয় কষ্ট এবং অসুবিধা ঘটে। টাকার পরিমাণ কমাইবার জন্য তখন গবর্ণমেণ্ট ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে অবাধ টাকা প্রস্তুতের পক্ষে টাঁকশাল বন্ধ করিয়া দেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডীয় মুদ্রা "সভারেণকে"—প্রতি টাকার মূল্য ১ শিলিং ৪ পেন্স ধার্য্য করিয়া—এদেশীয় মুদ্রার স্থলে ব্যবহারের ব্যবস্থা করেন। ১৮৩৫ এবং ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের পুরাতন মুদ্রা গবর্ণমেণ্টের হাতে আসিলেই উহা গলাইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করা হয়। এইরূপ নানারূপ কৃত্রিম উপায় দ্বারা গবর্ণমেণ্ট বিনিময়ের বাজারের লোকসান কিছু নিবারণ করেন এবং টাকার ক্রয়করীশক্তি বাড়াইবার চেষ্টা করেন। এই নীতির সমীচীনতার বিষয় পরে বলিব।

এখানে বলা আবশ্যক, দেশে যথেষ্ট পরিমাণ মুদ্রা না থাকিলে ব্যবসায় বাণিজ্যের কার্য্য চলিতে পারে না, সুতরাং আবশ্যক মত গবর্ণমেণ্টকে নূতন টাকাও প্রস্তুত করিতে হয়। এইরূপে ১৯০১ হইতে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ৮৫ হইতে ৯০ কোটি নূতন টাকা প্রস্তুত হয়। অনেক টাকা নানাপ্রকার গহনা প্রস্তুতের কার্য্যে লোকে গলাইয়া নষ্ট করিয়াছে সত্য, কিন্তু তথাপিও ভারতে অনুমান ৩০০ কোটী টাকা সঞ্চালনে আছে। ইহা ভিন্ন কাগজের মুদ্রা অর্থাৎ নোট, হুণ্ডি, ব্যাঙ্কের চেক প্রভৃতিও অনেক চলিতেছে। সুতরাং নানারূপ ব্যবস্থাসত্ত্বেও ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের পর ক্রমাগত মুদ্রাবৃদ্ধির কার্য্য চলিতেছে। ফলতঃ যে বৎসর হইতে আমরা মূল্যবৃদ্ধির হিসাব আরম্ভ করিয়াছি, ঐ বৎসর হইতে যে বৎসর পর্য্যন্ত আমরা বিবেচনার মধ্যে আনিয়াছি সেই পর্য্যন্ত দেশের মুদ্রাসংখ্যা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এই বর্দ্ধিত মুদ্রা দেশের দ্রব্যের মূল্যের উপর কিরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করিতেছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার। মুদ্রার আবশ্যক—বিনিময়ের সুবিধার জন্য। মুদ্রা দ্রব্য-বিনিময়ে মধ্যবর্ত্তীর কার্য্য করে। এই মধ্যবর্ত্তীর দ্বারাই এখন সমুদায় ব্যবসায়বাণিজ্য অর্থাৎ ক্রয়বিক্রয়ের কার্য্য চলে। ক্রয়বিক্রয়ের আবশ্যকতা অনুসারে এই মধ্যবর্ত্তীর পরিমাণ না থাকিলে ব্যবসায়বাণিজ্যে অসুবিধা ঘটে। ভারতের অন্তর্বাণিজ্য এবং বহির্বাণিজ্যের ক্রমপ্রসারের সহিত এই মধ্যবর্ত্তীর অর্থাৎ মুদ্রার আবশ্যকতা ও পরিমাণও বাড়িয়াছে। এখন এই মধ্যবর্ত্তীর দ্বারাই সমস্ত বিনিময়ের কার্য্য পৃথিবীতে চলিতেছে। এই মধ্যবর্ত্তীর সহিত দ্রব্য বিনিময়ের হারকে ইহার মূল্য বলে।

এখন এই মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ মুদ্রার পরিমাণ দ্রব্য-বিনিময়ের আবশ্যকতা অনুসারে যথেষ্ট পরিমাণ না থাকিলে, তাহার টানাটানি পড়ে এবং উহার দাম চড়িয়া যায়, অর্থাৎ উহার ক্রয়করীশক্তি বৃদ্ধি পাইয়া দ্রব্যের মূল্য সস্তা হয়। আর বিনিময়ের আবশ্যকতার পক্ষে মুদ্রার-পরিমাণ অধিক হইলে উহার অনাদর ঘটিয়া উহার দাম কমিয়া যায় অর্থাৎ উহার ক্রয়করী শক্তি কমিয়া গিয়া দ্রব্যের মূল্য অধিক হয়। ফলতঃ সকল দেশেরই প্রচলিত মোট মুদ্রার সংখ্যার সহিত ঐ দেশের মোট দ্রব্যের সাধারণতঃ বিনিময় হইয়া থাকে। এবং উভয়ের পরিমাণ অনুসারে এই বিনিময়ের হার নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

ইহা হইতে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে দেশে মুদ্রা বৃদ্ধি হইলেই মূল্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কোন স্থলে

যদি ২৫৲ টাকা এবং ২৫ মণ চাউল থাকে, তাহা হইলে উহা ১৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হয়; কিন্তু যদি ২৫৲ টাকা স্থলে ১০০৲ টাকা হয় এবং চাউলের পরিমাণ ঐ ২৫ মণই থাকে, তখন উহার প্রতিমণ ৪৲ টাকা করিয়া বিক্রয় হয়। ভারতে মূল্যের অবস্থা অনেক পরিমাণে সেইরূপ দাঁড়াইয়াছে।

ব্যবসায়বাণিজ্যের জন্য আবশ্যকীয় মুদ্রা সাধারণের হাতে যায় এবং দেশের মধ্যে সঞ্চালিত হইতে থাকে। সত্য বটে, এ দেশের লোক টাকা বৃথা ফেলিয়া রাখিতে ভালবাসে এবং সেজন্য দেশে গুপ্ত সঞ্চয় না আছে তাহা নহে; কিন্তু এই সঞ্চয়ের অধিকাংশই স্বর্ণমুদ্রায়। যেরূপেই হউক এই গুপ্ত সঞ্চয়ের কারণে ব্যবসায়ের পক্ষে মধ্যে মধ্যে মুদ্রার অকুলন হওয়ায় নূতন মুদ্রা সৃষ্ট হওয়ার এক কারণ ঘটিয়াছে। ব্যবসায়ের খাতিরে নূতন মুদ্রা সৃষ্ট হইয়া একবার সঞ্চালনে গেলে উহা আর ফিরিয়া না আসিয়া সঞ্চালনেই থাকিয়া যাইতেছে। এইরূপে মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়া দ্রব্যের মূল্য বাড়াইয়া দিয়াছে। বর্দ্ধিত এবং বর্দ্ধমান মুদ্রা-দেশের লোকের হাতে যাইয়া আর্থিক হিসাবে তাহাদের আয় বাড়াইয়াছে; কিন্তু সমস্ত দ্রব্য, বিশেষ খাদ্য দ্রব্যের মূল্য ঐ কারণেই বাড়িয়া যাওয়ায় তাহাদের এই বর্দ্ধিত আয়েও কুলাইয়া উঠিতেছে না। সুতরাং সকলেই এই মূল্য-বৃদ্ধিকেই কষ্টের কারণ বলিয়া মনে করিতেছেন।

পরলোক-গত স্যার এডওয়ার্ড বেকার মূল্যবৃদ্ধির এই কারণ একেবারে অস্বীকার করিতেন। তিনি প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেন যে এই মূল্যবৃদ্ধির কারণ দেশের সর্ব্ব-প্রকার সমৃদ্ধির বৃদ্ধি এবং তাঁহার মতের অনুকূলে যুক্তি দেখাইতেন যে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে টাকশাল বন্ধ হইবার পরে ১৫ বৎসরে ভারতে যত মুদ্রার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বের ১৫ বৎসরে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ মুদ্রার সৃষ্টি হইয়াছিল; কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫ বৎসর হইতে পরবর্ত্তী ১৫ বৎসরে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য অধিক পরিমাণে বাড়িয়াছে। ইহা ভিন্ন ব্যবসায়বাণিজ্যের আবশ্যকতার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে মুদ্রা সৃষ্ট হইতে আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কথাটা ঠিক। কিন্তু স্যর এডওয়ার্ড বেকার এবং তাঁহার মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ একটা বিষয় বিবেচনা করেন নাই; তাহা এই যে, পূর্ব্বের ১৫ বৎসরে যে মুদ্রা সৃষ্ট হইয়াছিল, দ্বিতীয় ১৫ বৎসরে ঐ মুদ্রা লোপ পায় নাই, তাহা দেশেই ছিল। তাহার উপর ঐ পরবর্ত্তী সময়ে কিছু কম পরিমাণে হইলেও আরও মুদ্রা সৃষ্ট হইয়া, মুদ্রার পরিমাণ আরও বাড়াইয়া দেয় এবং তদনুসারে মূল্যও বাড়িতে থাকে। এই মূল্য বৃদ্ধির গতি ঠিক মুদ্রা বৃদ্ধির গতির সহিত ঘড়ির কাঁটার ন্যায় মিল রাখিয়া চলে নাই সত্য; কিন্তু মূল্যের আরও নানাকারণে বৃদ্ধি ও হ্রাস হইয়া থাকে। ঐ সকল কারণের সংমিশ্রণে মুদ্রা বৃদ্ধির গতির সহিত মূল্যের উর্দ্ধগতি ঠিক অনুপাতে চলিতে পারে না, কিন্তু মোটের উপর একটা সাধারণ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। উঁহারা আরও বলেন যে মুদ্রাবৃদ্ধির সহিত মূল্যবৃদ্ধির সম্বন্ধ থাকিলে সকল দ্রব্যেরই মূল্য বাড়িত, কেবল খাদ্য-শস্যের মূল্য বাড়িবে কেন? কিন্তু খাদ্যের মূল্য অধিকতর পরিমাণে বাড়িলেও, অন্যান্য অনেক আবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্যই বাড়িয়াছে। তবে খাদ্যের মূল্য অনুপাতে অধিক বৃদ্ধি হওয়ার অন্য কারণ আছে। এবিষয়ে স্বর্গীয় মিঃ গোখেল বলিয়াছেন :—

"Such a rise need not be uniform in the case of all commodities, for in the view which I am stating, prices are a function of three variables—currency, demand and supply, and any general rise resulting from a disturbance of the currency may be modified in particular cases by one or both of the other factors."

অর্থাৎ "এই প্রকার মূল্য বৃদ্ধি যে সমস্তদ্রব্যের বেলায়ই সমানভাবে চলিবে তাহা নহে, কারণ আমি যে মত ব্যক্ত করিতেছি, তদনুসারে মূল্য—মুদ্রার সঞ্চালন, তাহার চাহিদা এবং যোগান—এই তিনটি বিভিন্ন কারণের উপর নির্ভর করে এবং মুদ্রাবৃদ্ধির জন্য সাধারণ মূল্যবৃদ্ধি বিশেষ বিশেষস্থলে অপর একটি কিম্বা দুইটি কারণের দ্বারা নিয়মিত হইতে পারে।"

স্যার এডওয়ার্ড বেকারের মতের ইহা চরম উত্তর। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের "ইকনমিক জর্ণ্যালে" মিঃ জে, এম্, কেন্‌স্ "Recent Economic Events in India" নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাতেও তিনি অন্যান্য কারণের উল্লেখ করিয়া এই মুদ্রাবৃদ্ধিকেই খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধির

প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। করাচির চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মিঃ ওয়েবও এই মতের সমর্থনকারী। সুতরাং দেখা যাইতেছে মুদ্রাবৃদ্ধির সহিত অপরাপর কয়েকটী কারণের সংমিশ্রণে দেশে খাদ্যের এই প্রকার মূল্য বাড়িয়াছে। এই সঙ্গে আমার মনে হয়, আর একটী কারণও মূল্যবৃদ্ধির সাহায্য করিতেছে। এই কারণের বিষয় পূর্ব্বে সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে "সভারেণকে" এ দেশের প্রচলিত মুদ্রা বলিয়া আইনতঃ স্বীকার করিয়া লওয়ায়, ভারতকে পৃথিবীর অপরাপর স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহারকারী দেশের সহিত একসূত্রে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ সকল দেশের সহিত ভারতবর্ষের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য চলিতেছে। সুতরাং তথায় সাধারণ মূল্যবৃদ্ধির সহিত ভারতেও মূল্যবৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু এ দেশের খাদ্যদ্রব্যের মূল্য এত পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে এই স্বর্ণমুদ্রার প্রচলনকে ইহার আংশিক কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেও সঙ্কোচ বোধ করি। কারণ, রৌপ্যমুদ্রা ষ্টাণ্ডার্ড থাকিবার সময়েও ভারতে যথেষ্ট মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে এবং বিনিময়ের বাজারে রৌপ্য ও স্বর্ণের সাধারণ মূল্যের হিসাবেই আমদানী রপ্তানি মালের মূল্য বরাবর নিরূপিত হইয়াছে। সুতরাং ভারতীয় মুদ্রার ষ্টাণ্ডার্ড স্বর্ণে নিরূপিত হওয়ায় ভারতের খাদ্যের বাজার অতি সামান্য পরিমাণেই বিচলিত হইয়াছে। দেখা যাইতেছে, ১৯০৪ হইতে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৪ বৎসরে ইংলণ্ডে খাদ্যের মূল্য শতকরা ১৬ ভাগ বাড়িয়াছে, কিন্তু ঐ সময়ে ভারতে খাদ্যের মূল্য শতকরা ৪৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মুদ্রার স্বর্ণের ষ্টাণ্ডার্ড এদেশে মূল্যের উর্দ্ধগতির উপর যদি কোনও কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা হইলে অতি সামান্য ভাবেই করিয়াছে।

উপরে যে সমস্ত কারণের উল্লেখ করিয়াছি, ভারতের খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধি নিমিত্ত উহার সকলগুলিই অল্প বিস্তর দায়ী। এখন দেখা দরকার, এই মূল্যবৃদ্ধির জন্য দেশের লোকের বিশেষ কষ্ট হইয়াছে কিনা এবং ইহা দেশের পক্ষে শুভদিন-সূচক কিনা। এই বর্দ্ধিত মূল্য যদি দেশের সমৃদ্ধির পরিচায়ক না হয়, তবে কিরূপে উহার উর্দ্ধগতি নিবারণ করা যায়, তাহাও চিন্তা করা দরকার।

অর্থনৈতিকগণের মধ্যে এ বিষয়ে দুইটি দল দাঁড়াইয়াছে। একদল বলিতেছেন, দেশে যখন খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়িয়াছে, লোকের বেতন বাড়িয়াছে, দৈনিক পরিশ্রমের হার বাড়িয়াছে, তখন দেশ ক্রমে সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইতেছে বলিয়াই বুঝিতে হইবে। কোন দেশে উচ্চমূল্য, ঐ দেশের বর্দ্ধিত ক্রয়কারী শক্তিরই পরিচায়ক এবং তাহাতে দেশের সুখ স্বচ্ছন্দতার উচ্চতর আদর্শ, অধিকতর লাভ এবং উচ্চতর বেতনেরই সূচনা করে। সকল উন্নত দেশেই বর্দ্ধিত মূল্য হইতে ঐ সকল দেশের অধিকতর সমৃদ্ধিরই পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং ভারতে বর্দ্ধিত মূল্য হইতে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। বাস্তবিক পক্ষে এই বর্দ্ধিত মূল্যে, কৃষক, শিল্পী, শ্রমজীবী এবং সাধারণ রায়তের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে এবং উহারা ক্রমেই ধনবান্ হইতেছে। এই দলের কথা ঠিক হইলে, এই মূল্য বৃদ্ধির জন্য আমাদের আনন্দপ্রকাশ করাই উচিত।

দ্বিতীয় দল বলিতেছেন, মূল্যবৃদ্ধিতে দেশের সমৃদ্ধির সূচনা করে সত্য, কিন্তু ভারতে সে মত চলিতে পারে না, কারণ ভারতের এই মূল্যবৃদ্ধি অস্বাভাবিক, এবং সুস্থ, সবল ধনবৃদ্ধির পরিচায়ক নহে। ভারত এই বৃদ্ধিতে শোথগ্রস্ত রোগীর ন্যায় হইয়া পড়িতেছে। বাহির হইতে ইহাকে সকলে সুস্থতার লক্ষণ বলিয়া মনে করিতেছে, কিন্তু ভিতরে এই দারুণ ব্যাধি ইহাকে একেবারে অসার জলপূর্ণ মাংসপিণ্ডে পরিণত করিতেছে। ইঁহারা বলিতেছেন, ভারতের মূল্যবৃদ্ধির কারণ সাধারণতঃ ধনবৃদ্ধি নহে; যে মূল্যবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে তাহা অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনা,—রেলওয়ে, রাস্তা প্রস্তুত প্রভৃতি সাধারণ কার্য্যে স্থল বিশেষে প্রচুর অর্থ নিয়োগ, এ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে দেশান্তরিত করিবার নিমিত্ত বিদেশী মূলধনের আবির্ভাব প্রভৃতি নানাপ্রকারের স্থানীয় কারণে উৎপন্ন হইয়াছে এবং উহাতে দেশের লোকের দারুণ দুর্দ্দশা উপস্থিত করিয়াছে। কৃষক, শিল্পী প্রভৃতিও ইহাতে উপকৃত হইতে পারে নাই, কারণ এ দেশের এই সকল লোক বর্দ্ধিত মূল্যের সুবিধা কি করিয়া আদায় করিতে হয় তাহা জানে না, এজন্য এই মূল্যবৃদ্ধির সুবিধা বিদেশী ব্যবসায়ী, মহাজন এবং শ্রমনিয়োগকর্ত্তাগণই ভোগ করিতেছেন। তাহার প্রমাণ দেশের সাধারণ রায়ত, মহাজনের হাতেই বাঁধা রহিয়াছে। ধনবৃদ্ধি হইলে তাহাদের এ দশা কেন? সত্য, বেতন এবং দৈনিক পরিশ্রমের হার

বাড়িয়াছে, কিন্তু খাদ্যের দাম যে হিসাবে বাড়িয়াছে, এ হার সে হিসাবে বাড়ে নাই। এ দেশের সাধারণ লোকের আয়ের ⅘ অংশ খাদ্যের জন্য ব্যয়িত হয়, সুতরাং ইহাদের দুর্দ্দশার সীমা নাই। যতদিন না দেশের যথার্থ সম্পদের পরিমাণ বাড়িতেছে, অর্থাৎ আমরা আমাদের শ্রমজাত দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া দেশের ধনবৃদ্ধি করিতে না পারিতেছি, ততদিন মূল্যবৃদ্ধিকে দেশের সমৃদ্ধিবৃদ্ধির কারণ বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। বাস্তবিক পক্ষে এই মূল্যবৃদ্ধিতে পারিশ্রমিকের হার বাড়াইয়া দেশের শিল্পজাতদ্রব্য উৎপাদনের ব্যাঘাতই করিয়াছে, কারণ ভারতে সস্তা পারিশ্রমিকের জন্য সস্তায় দ্রব্য উৎপাদনের যে সুবিধা ছিল, খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে সে সুবিধা চলিয়া যাইয়া দেশীয় শিল্পাদির ক্ষতি করিতেছে। এখন আর ভারত সস্তায় দ্রব্য সামগ্রী উৎপন্ন করিয়া পৃথিবীর বাজারে উহা সস্তায় বিক্রয় করিতে পারিতেছে না। ফলস্বরূপ উহা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় অক্ষম হইয়া আর বিদেশী বাজারে দাঁড়াইতে পারিতেছে না এবং শিল্পাদি যাহা কিছু দেশে অবশিষ্ট ছিল, তাহাও ধ্বংস হইবার উপক্রম হইয়াছে। যথেষ্ট রপ্তানি না থাকিলে ভারতের 'হোম চার্জ' প্রভৃতি নানাপ্রকারের বিদেশী দেনা শোধ করাও অতিশয় কষ্টকর এবং অসুবিধাজনক হইবে এবং এইরূপে এই মূল্য-বৃদ্ধি হইতে আমাদের সমস্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংসের পথে যাইতে থাকিবে।

উপরোক্ত উভয় প্রকারের উক্তিই দুই পক্ষের চরমপন্থী-দিগের মত। ইহাদের সকলেই কেবল একদিক দেখিয়া, অপর দিক দেখিবার বেলায় অন্ধ হইয়া থাকি-তেছেন। আমার মনে হয়, আসল সত্যটা ইহাদের এই পৃথিবীর মেরুদ্বয়ের ন্যায় বিভিন্নমুখীন মতের মধ্যস্থলে অবস্থিত। কথাটা পরিষ্কার করিবার জন্য এই উভয় মতের বিষয়ই সংক্ষেপে বিবেচনা করা দরকার।

প্রথমতঃ, যাঁহারা বলিতেছেন যে খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধি একটা শুভলক্ষণ এবং উহা দেশের সমৃদ্ধির পরিচায়ক, তাঁহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে এই বৃদ্ধির সহিত তদনুপাতে দেশের সম্পদ বাড়ে নাই এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যেখানে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার সম্পদ কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িতেছে, সেখানেও ভারতের অনুপাতে খাদ্যের মূল্য বাড়ে নাই। ভারতে যে হিসাবে মূল্য বাড়িয়াছে, সে হিসাবে সম্পদ বাড়িলে অর্থাৎ সম্পদের অনুপাতেই মূল্য বাড়িয়াছে স্বীকার করিয়া লইলে ভারতবর্ষকে অতিশয় সমৃদ্ধিসম্পন্ন দেখিতে পাইতাম। তাহা হইলে, আজ আর কৃষকের মহাজনের নিকট দেনা, মধ্যবিত্তের অন্নচিন্তা, শিল্পীর উদরান্নের অভাব দেখিতে পাইতাম না। সুতরাং যে হিসাবে মূল্য বাড়িয়াছে, সে হিসাবে ধনসম্পত্তি দেশে বাড়ে নাই। অবশ্য ধনবৃদ্ধি যে মূল্যবৃদ্ধির একটি কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় দলের লোকেরা এই মূল্যবৃদ্ধিকে অবিমিশ্র অনিষ্টের কারণই মনে করেন। তাঁহারা স্বীকার করিতেই চান না যে সাধারণ প্রজার অবস্থা ভাল হইয়াছে, তাহাদের জীবনযাত্রার আদর্শ উন্নত হইয়াছে, তাহারা উৎকৃষ্টতর খাদ্য ভক্ষণ করিতেছে এবং উন্নততর গৃহে বাস করিতেছে। কিন্তু যাহা আমরা সকলেই দেখিতে পাইতেছি, তাহার কোন প্রমাণের দরকার নাই। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছি, চাষা ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড পরিয়া কোনরূপে লজ্জা নিবারণ করিত, কুঁড়ে ঘরে বাস করিত, মাটির বাসনে আহার করিত, তাল-পাতার ছাতা মাথায় দিত, অগ্নিতে শীত নিবারণ করিত, এবং সামান্য শাকান্ন ভোজনে উদরের পরিতৃপ্তি সাধন করিত। এখন দেখিতেছি, তাহারা সুন্দর বিলাতী বস্ত্র পরিধান করে, গেঞ্জি ও জামা গায়ে দেয়, সুদৃঢ় টিনের ঘরে বাস করে, বিলাতী জুতা পায়ে দেয়, সুদৃশ্য আলোয়ান গায়ে দিয়া শীত নিবারণ করে, পিতল কাঁসার বাসন ব্যবহার করে, বিলাতী ভাল ছাতা মাথায় দেয় এবং হাটবাজারে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান ভাল খাদ্য ক্রয় করে। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে যে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মাসিক ১০৲ টাকা ব্যয়ে সংসার চালাইতেন, খড়ের ঘরে বাস করিতেন, চটীজুতা পায়ে দিতেন, তাঁতীর মোটা কাপড় পরিতেন, স্ত্রীপরিবারের জন্য রূপার গহনা প্রস্তুত করিতেন এবং পুত্রকন্যার বিবাহে ১০০৲ টাকা খরচ করিলে খুব অধিক ব্যয় করিয়াছেন মনে করিতেন, এখন তিনি পাকা বাড়ীতে বাস করিতেছেন, মাসিক ১০০৲ টাকা খরচ করিতে পারিতেছেন, সুন্দর দেশী ও বিলাতী কাপড় ব্যবহার করিতেছেন, মূল্যবান বিলাতী জুতা পায়ে দিতেছেন, স্বর্ণ-আবরণে স্ত্রীপরিবারের বিলাসিতার সাধ মিটাইতেছেন এবং পুত্র-কন্যার বিবাহে ১৫০০৲। ১৫০০৲ ব্যয় করিয়াও কষ্ট অনুভব করিতেছেন না। এসব ঘটনা

ত আমরাই দেখিতে পাইতেছি। এ সকল কি সমৃদ্ধির লক্ষণ নহে? মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে সত্য, কিন্তু যখন মূল্যবৃদ্ধি হয় নাই, তখনও একবেলা অন্ন জোটে নাই, আর মূল্যবৃদ্ধি হইয়া প্রত্যহ অন্ততঃ দুইবার করিয়াও উত্তম খাদ্যের সংস্থান করিতে পারিতেছি—ইহার কোন অবস্থা ভাল? মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে সেই অনুপাতে সম্পদ বৃদ্ধি না হইয়া থাকিলেও, আমার ঐ বর্দ্ধিত মূল্য দিবার যথেষ্ট ক্ষমতা জন্মিয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে আমাকে ১০৲ টাকা দিতে হইলে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হইত সেস্থলে এখন আমার একশত টাকা দিতে হইলেও বিশেষ বেগ পাইতে হয়না। মূল্য বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সেই বর্দ্ধিত মূল্য দিবার ক্ষমতাও যদি আমার জন্মে এবং মূল্য কম থাকিবার বেলায় যাহা আমার সাধ্যাতীত ছিল, মূল্যবৃদ্ধি হওয়ার পর যদি তাহা আমার সহজ প্রাপ্য হইয়া থাকে, তবে সেই বর্দ্ধিত মূল্য আমার কি ক্ষতি করিল? বাস্তবিক পক্ষে দেশে মূল্যবৃদ্ধি হওয়ায় ঐ বর্দ্ধিত মুদ্রার সহিত বিনিময়ের জন্যই ঐ মূল্যবৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। অন্যান্য কারণের সহিত সংমিশ্রিত হওয়ায় অন্যান্য সকল দ্রব্যের মূল্য খাদ্যের ন্যায় বৃদ্ধি পায় নাই কেন, তাহা মিঃ গোখেলের কথায় পূর্ব্বে বলিয়াছি।

যাঁহারা বলেন, শস্যাদি মূল্যবৃদ্ধির সুবিধা দেশের চাষারা কিছুই পাইতেছে না, কেবল বিদেশী ব্যবসায়ী ঐ সুবিধা ভোগ করিতেছে, তাঁহাদের অনুসন্ধানস্পৃহার বিশেষ প্রশংসা করিতে পারি না। যাঁহাদের ঐ বিষয়ে সামান্য অভিজ্ঞতাও আছে, তাঁহারাও স্বীকার করিবেন যে কৃষি দ্বারা উৎপন্ন কোন দ্রব্যের মূল্য সহরে কিম্বা বন্দরে মণকরা দুই আনা চড়িলে সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে চারি আনা না হইলেও অন্ততঃ দুই আনা চড়িয়া যায়। বাস্তবিক অর্থনৈতিক আইনের ফলে এবং রেল প্রভৃতি যাতায়াতের উপায়ের বৃদ্ধির সহিত ব্যবসায়বাণিজ্যের অবস্থা পৃথিবীতে এই প্রকার দাঁড়াইয়াছে যে এরূপ না হইয়াই পারে না। যে ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা আছে, তাহাতেই এরূপ ঘটিয়া থাকে। ভারতীয় কৃষকের কাঁচামালের ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতার অভাব নাই। সুতরাং চাষা, কোন অস্বাভাবিক কারণ না ঘটিলে, তাহার দ্রব্যের বরাবর উপযুক্ত মূল্যই পাইয়া আসিতেছে। দেশে মুদ্রার সংখ্যা বাড়ায় উহার ক্রয়কারী শক্তি কমিয়া গিয়া কৃষকের উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যই বাড়িয়াছে; অনেক দ্রব্য বিদেশে যাইতেছে, তথা হইতে ভারতবর্ষ এই মূল্যবৃদ্ধির জন্য অধিকতর অর্থ পাইয়া লাভই করিতেছে এবং কৃষকের হাতেও ইহাতে অধিকতর অর্থ আসিয়া তাহার অবস্থা উন্নততর করিয়া দিতেছে। তাহার খাজনা দিতে হয় টাকায়, সুতরাং অল্প শস্যের বিনিময়ে অধিক মুদ্রা পাওয়ায় তাহাদের খুব সুবিধাই হইয়াছে। বাস্তবিক এই বর্দ্ধিত মূল্য হইতে তাহারা সুখস্বচ্ছন্দতাই পাইয়াছে। কৃষিজীবীর সংখ্যাই ভারতে প্রায় শতকরা ৭৫ জন। সুতরাং এই মূল্যবৃদ্ধিতে দেশের নিতান্ত অসুবিধা হইয়াছে মনে করিবার কারণ নাই।

তবুও দেখিতে পাই মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষ হইয়া ভারতের কৃষকদিগের এবং সাধারণ লোকের বিশেষ কষ্ট হইতেছে। ইহার কারণ দেশে শস্য নষ্ট ঘটিয়া প্রজার হাতে অর্থাভাব। শস্য বিক্রয় করিয়া টাকা না আসিলে প্রজার অতিশয় কষ্ট উপস্থিত হইয়া থাকে। স্যার এণ্টনী ম্যাকডোনেলের দুর্ভিক্ষ-কমিশন স্পষ্টই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এদেশে খাদ্যের দুর্ভিক্ষ কখনও হয় না। যে দুর্ভিক্ষ আমরা দেখিতে পাই উহা মুদ্রার দুর্ভিক্ষ; কারণ ভারতে ভয়ানক দুর্ভিক্ষের সময়েও এদেশের বন্দর হইতে চাউল গম প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে সকল দেশ ঐ সময় আমাদের দেশের শস্য লইয়া যায়, তাহারা আমাদের হইতে অনেক পরিমাণে ধনবান। তাহারা আমাদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক মূল্য এজন্যই দিতে পারে এবং মূল্যের প্রতিযোগিতায় আমাদিগকে পরাস্ত করিয়া আমাদিগের শস্য লইয়া যায়। বাস্তবিক পক্ষে অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় ভারত অতিশয় দরিদ্র। আমি "ভারতে ষ্টেটব্যাঙ্ক" (State Bank for India) শীর্ষক প্রবন্ধে * দেখিয়াছি যে ভারত বাসীর প্রত্যেকের বাৎসরিক গড় আয় ২৪৲ টাকার অধিক নহে। কিন্তু ইংলণ্ডবাসী প্রত্যেকের গড় আয় ৬০০৲ টাকা, ক্যানাডার অধিবাসী প্রত্যেকের গড় আয় ৫৫০৲ টাকা, এবং অষ্ট্রেলিয়া বাসী প্রত্যেকের গড় আয় ৫০০৲ টাকা। এ হিসাবে ভারত কিরূপ দরিদ্র তাহা বুঝাইবার আবশ্যক নাই। কিন্তু পৃথিবীর বাজারে ঐ সকল দেশের সহিত আমাদের প্রতিযোগিতা করিতে হইতেছে। ফলতঃ ইহারা যে

* "The Modern Review"—March and April 1918.

মূল্যে খাদ্য খরিদ করিতে পারিতেছে, আমরা তাহা পারিতেছি না। বিদেশী মূল্য এবং আমাদের হাতের মুদ্রার পরিমাণের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যখন বাজার চলিতেছে, তখন আমাদের খাদ্য খরিদে কোন কষ্ট হইতেছে না; কিন্তু দেশে অজন্মা হইয়া কি অপর কারণে দ্রব্যের মূল্য ঐ 'লেভেল' ছাড়াইয়া উঠিলেই আর আমরা পারিয়া উঠিতেছি না। বিদেশীয়গণের অর্থবল অধিক থাকায় তাহারা আমাদের শস্য অধিক দামে কিনিয়া লইতেছে। মূলকথা এখন সমস্ত পৃথিবীকে বাদ দিয়া আর ঘরের ধন ঘরে লইয়া সপ্তসিন্ধু এবং মহাশৈল বেষ্টিত হইয়া বসিয়া থাকিবার উপায় নাই। পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে অন্যান্য শক্তির সহিত প্রতিযোগিতায় জয়ী হইয়া বাঁচিতে হইবে। আমার কাহারও সহিত প্রতিযোগিতা নাই বলিয়া মহা আধ্যাত্মিক সাজিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। তুমি ছাড়িতে পার, তোমাকে কেহ ছাড়িবে না। নবীন কর্ম্মজগতের আবর্ত্তময় স্রোতের টানে পড়িতেই হইবে। সুতরাং এখন চেষ্টা করিতে হইবে যেন আমরা ঐ স্রোতের খরতর-প্রবাহে নিমজ্জিত না হই। চারিদিগের ধনী দেশ সমূহের সহিত এই তীব্র প্রতিযোগিতায় বাঁচিতে হইলে তাহাদিগের সহিত তুলনায় আমরা কত দরিদ্র তাহা বুঝিতে হইবে এবং কি করিলে সেই দরিদ্রতা দূর হইতে পারে সেই উপায়ের চিন্তা করিতে হইবে। মুদ্রাবৃদ্ধি না হইলে দেশে সম্পদ বৃদ্ধি হইবে না। সুতরাং আরও মুদ্রা বাড়াইতে হইবে। কি করিয়া তাহা হইতে পারে, তাহা "মুদ্রাসঙ্কট ও তাহার প্রতিকার" প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। (মালঞ্চ ১৩২৪, ৫৪৫ পৃঃ)

পৃথিবীর বাজারে অন্যান্য দেশের সহিত একসূত্রে গ্রথিত হইয়া আমরা মূল্যবৃদ্ধির জন্য যে কোলাহল করিতেছি ঐ কোলাহলের বিশেষ কারণ নাই। দেশের সমস্ত শিল্প-বাণিজ্য-কৃষি মুদ্রার অভাবে অধঃপাতে যাইতেছে। যে জমিতে বিলাতে যে পরিমাণ শস্য জন্মে ভারতে ঐ পরিমাণ জমিতে তাহার এক তৃতীয়াংশ হইতে কম জন্মিয়া থাকে। শিল্প-বাণিজ্যের ত কথাই নাই। ভারতে লক্ষ লক্ষ বিঘা উর্ব্বর ক্ষেত্র অর্থের অনটনে চাষের অভাবে অলস পড়িয়া রহিয়াছে। এই সমস্ত কার্য্যেই টাকার দরকার। সুতরাং দেশে প্রচুর পরিমাণে ধন বৃদ্ধি করিতে হইলে আরও অনেক মুদ্রার আবশ্যক। বিদেশী বিনিময়ের সহিত সমতা রাখিয়া মুদ্রাবৃদ্ধি করিলে, তাহাতে দেশের অসুবিধা হইবে না। এই বর্দ্ধিত মুদ্রায় দেশের সম্পদ বৃদ্ধি হইতে থাকিলে, এই মুদ্রা দেশের লোকের হাতে যাইয়া প্রথমতঃ আরও মূল্যবৃদ্ধি করিতে পারে। কিন্তু অধিকতর মুদ্রা লোকের হাতে পড়ায় ঐ বর্দ্ধিত মূল্য দিতে কাহারও বিশেষ অসুবিধা হইবে না। সুতরাং তাহাতে কাহারও আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। দেশের দরিদ্রতা-সমস্যার মীমাংসা করিতে হইলে নূতন মুদ্রাদ্বারা নূতন কার্য্যের পত্তন করিয়া ধন বৃদ্ধির ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে।

পেশাদার কেরাণী এবং আরও একশ্রেণীর নির্দ্দিষ্ট বেতনভোগীর মূল্যবৃদ্ধিতে কষ্ট হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে কিন্তু তাহার প্রধান কারণ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের সাধারণ আবশ্যকীয় বর্দ্ধিত খরচের আবশ্যকতার সহিত এই শ্রেণীর লোকের আয়ের সামঞ্জস্য হইতে সকল দেশেই সময় লাগে। যেরূপ এই অসামঞ্জস্য ঘটিতে থাকে অমনিই নিয়োগকারী এবং নিযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে একটি অর্থনৈতিক সংগ্রাম উপস্থিত হয়। আবশ্যকতা এবং পরিমাণের আইন অনুসারে এই সংগ্রামের ফলাফল নির্দ্দিষ্ট হয়। এই দেশে শিল্প বাণিজ্য এবং অন্যান্য অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থার অবর্ত্তমানে এবং অনাদরে অনেক লোক চাকরীপ্রার্থী হইয়াছে। এবং আবশ্যকতা হইতে পরিমাণ এত বেশী দাঁড়াইয়াছে যে এই আইনের ফলে এই সকল লোকের দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই শ্রেণীর লোকের কার্য্যে এত প্রার্থী ছিল না, সুতরাং ইহাদের আদর ছিল। এখনও এই শ্রেণীর লোকে অন্যান্য নানাপ্রকারের অর্থকরী কার্য্য শিক্ষায় অগ্রসর হইয়া ইহাদের দল কমাইতে পারিলে অবশিষ্টের আবার আদর হইবে। এই বিশেষত্বের দিনে, সকলকেই কোন না কোন কার্য্যে প্রকৃতরূপে উৎকর্ষতা লাভ করিতে হইবে। কার্য্যানভিজ্ঞ (uuskilled) দিগের দুর্দ্দশা অনিবার্য্য। এই নিয়ম সত্ত্বেও বেতনভোগীদিগের বেতন বৃদ্ধি ক্রমে হইতেছে এবং হইবে। ইহাই নিয়ম। তবে যাঁহারা সময়ের এই পরিবর্ত্তনের সহিত নিজেদের প্রকৃতি এবং অভ্যাসের পরিবর্ত্তন করিয়া সমাজে কার্য্যকরী হইতে পারিবেন না, তাঁহারা দয়ার পাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এইরূপ শ্রেণীর জনসংখ্যা দেশে সামান্যমাত্র, পরন্তু ইহাদের অবস্থাও ৪০

বৎসর পূর্ব্বে ইহাপেক্ষা ভাল ছিল, তাহা বলিতে পারি না। মূল্যের উর্দ্ধগতির সহিত ইহাদের আয় বাড়ে নাই এরূপ মনে করিবার কারণ নাই।

উপস্থিত যে মূল্য বাড়িয়াছে, বর্দ্ধিত ও বর্দ্ধমান মুদ্রাই ইহার কারণ। ঐ মুদ্রা লোকের হাতে আসিয়াছে। অধিক টাকা থাকিলে অধিক মূল্য দিতে কষ্ট হয় না। সুতরাং খাদ্যের মূল্যের কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেও উহা আমরা সহজেই দিতে পারিতেছি। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ইহা হইতে সহজে দিতে পারিতাম এরূপ মনে করিবার কোন যুক্তি নাই। বহুকাল পূর্ব্বে আমাদের এ বিষয়ে কি অবস্থা ছিল, তাহা আমি জানি না, সে কথা ঐতিহাসিকগণ বলিতে পারেন। বিদেশে খাদ্যের মূল্য সস্তা নহে। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমরা অতিশয় দরিদ্র হইলেও এখন আমরা যে মূল্যে খাদ্য খরিদ করিতেছি, আমাদের আর্থিক অবস্থার সহিত উহার সামঞ্জস্য নাই, একথা মনে করিবার কারণ দেখি না। প্রকৃত পক্ষে এজন্য আমাদের কোনও কষ্ট হইয়া থাকিলে উহা আংশিকভাবে কাল্পনিক, একেবারে বাস্তবিক নহে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র।

মান ও অপমান।

কে বলে গৌরবে বাড়ে প্রাণের গরব ?
কিরীট কুসুম ভারে পড়ে মাথা নুয়ে
দিগন্তে নোয়ায় মেঘে সলিল বিভব,
সম্মান ভাবের মত শিরে টানে ভূঁয়ে।
দিলে যা' গৌরব-ভার গুণীর মাথায়
কেমনে বহিবে তাহা এই দ্বিধা ভয়ে
গুণী যে রহিল নত জগতের পায়,
সবার অর্পিত অর্ঘ্য নিজ শিরে ব'য়ে।

কে বলেছে অপমানে দম্ভী বিদ্রোহীর,
নুয়েছে উদ্ধত শীর্ষ পথের ধূলায় ?
ফলের গৌরব গেলে শাখী দৃপ্তশির,
পদাঘাতে দর্পে ফণী গরজে ফণায়।
অপমানে সবি যদি লহ তার হরে'
হতাশ ভীষণ হবে সকলি হারায়ে।
উৎপতিত ধনু, গুণ ছিন্ন হলে' পরে
সবেগে বিঁধিতে বক্ষ উঠিবে দাঁড়ায়ে।

শ্রীকালিদাস রায়।

দাদা।

(১)

"দেখ্ নিয়ে, তুই এরপর থেকে আমাকে দাদা বলিস্।"

"হ্যাঁ আমি তোকে দাদা বল্‌তে যাব বৈকি। আমি তোর চেয়ে ছ'মাসের বড়; তুই আমাকে দাদা বলবি।"

"ওঃ, ভারি ছ'মাসের বড়! আর সব বিষয়ে ত আমি তোর চেয়ে বড়? আমি তোর চেয়ে মোটাসোটা, তোর চেয়ে মাথায় উঁচু; তোর চেয়ে আমার গা'য়ে জোর বেশী,—তোর চেয়ে—"

"তা'হলেও আমিই তোর দাদা।"

"আচ্ছা বেশ; আমিই ছোট হ'লাম; আমাকে কোলে কর্। যে যাকে কোলে কর্ত্তে পার্ব্বে সেই তার দাদা।"

"বেশ; আয়!"

আমি হাস্‌তে লাগলাম, তাকে জড়িয়ে ধ'রে তোলবার অনেক চেষ্টা কর্‌লাম, কিন্তু পার্‌লাম না। কাছে একটা পাথর ছিল—তার ওপর আমি ব'সে পড়্‌লাম। সে তখন

খুব খানিকটা হেসে ব'ল্লে—"খুব হয়েছে; ক্ষমতা ত বোঝা গেছে; এখন কে কার দাদা?"

আমি ব'ল্লাম, "এখনও আমিই তোর দাদা; তুই আগে আমাকে কোলে কর, তবে ত তুই আমার দাদা হবি।"

সে হাস্‌তে হাস্‌তে অনায়াসে আমাকে বুকে তুল্‌লে;—এক হাতে আমার মুখটা চেপে ধ'রে অনেকগুলি চুম খে'লে; তারপর জিজ্ঞাসা ক'ল্লে "কে দাদা?"

আমি ব'ল্লাম, "আমি দাদা।" আমি দিব্যি আরামে তার কোলের উপর ছিলাম; তার ঘাড়ে মুখ গুঁজে দিয়ে মুখ টিপে টিপে হাসছিলাম। আমার কথা শুনে সে বল্লে, "ওরে দুষ্টু,—তবে দেখ্, দিই ফেলে—"

আমি দু'হাতে তার গলাটা জড়িয়ে ধর্ল্লাম; বল্লাম—"তুইই দাদা।"

সে তখন পাথরটার ওপর বস্‌ল; আমি তার কোলেই রইলাম।

তখন আকাশে রংএর খেলা শেষ হ'য়ে গিয়েচে। সূর্য্যদেব দূর আকাশের সাগরে প্রায় ডুবে গেছেন। বনের রং কালো হ'য়ে আস্‌চে। সমস্ত জগৎজুড়ে পূরবীর তান জেগে উঠেছে।

দাদার কোলে আমি অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে-ছিলাম—কখনও নদী দেখছিলাম; কখনও আকাশ দেখছিলাম;—এলোমেলো কত কি ভাবছিলাম। কি একটা অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দের আবেগ আমাকে অস্থির ক'রে তুলেছিল। দাদা স্থির হ'য়ে বনের দিকে চেয়েছিল। কি ভাবছিল কে জানে। ও ওই রকম গম্ভীর ধরণের।

ক্রমে সন্ধ্যা তাঁর শান্তির মঙ্গলঝাঁপি নিয়ে পৃথিবীতে নেমে এলেন; নীড়ে-ফেরা পাখীর গানে তাঁর আগমনী-গান বেজে উঠল; রজনীগন্ধার গন্ধ তাঁর স্পর্শে আকুল-আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে গেল; বধূদের শঙ্খধ্বনি গ্রামের সমস্ত অমঙ্গল অপবিত্রতাকে দূর ক'রে দিলে,—সন্ধ্যা-দেবীকে বরণ করে নেবার জন্য পল্লীর ঘরে ঘরে মঙ্গল-দীপ জ্বলে উঠ্‌ল।

অন্ধকার হয়ে গেছে,—আমার চমক ভাঙ্গ্‌ল। সে জড় পদার্থের মত নিশ্চল হ'য়ে ব'সেছিল, আমি ডাক-লাম—"দাদা?"

"ভাই!"

"চল্ বাড়ী যাই।"

(২)

আমাদের বাড়ী কমলপুর। আমার মায়ের ছেলে হয়নি ব'লে, বাবা আবার বিয়ে করেছিলেন। নূতন মায়ের ছেলে হ'ল; তার চার বৎসর পরে আমি হ'লাম। আমি যখন ন'বৎসরের তখন মা মারা গেলেন। দিনকতক পরে আমার মামা আমাদের বাড়ী এলেন;—ফিরে যাবার সময় সঙ্গে নিলেন।

মামা শরীর সারবার জন্য মধুপুরে থাকৃতেন। আমরা সেখানে গেলাম। সেখানে আমরা চার বৎসর ছিলাম। আমার প্রায়ই অসুখ হ'ত। সেইজন্য মামা আমাকে ইস্কুলে দেননি। আর বাড়ীতে পড়তেও আমার মোটেই ভাল লাগ্‌ত না। আমি কারু সঙ্গে মিশতাম না;—কোথাও বেরুতাম না, বাড়ীর বাগানে—গাছের গোড়া খুঁড়ে, গাছে জল দিয়ে, একলা বসে থেকে সময় কাটিয়ে দিতাম।

বাবা মধ্যে মধ্যে পত্র দিতেন; আমাকে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্য মামাকে লিখতেন,—মামা উত্তর দিতেন,—"এখানে মধুপুরেই নির্ম্মল সেরে উঠ্‌তে পাচ্ছে না;—দেশে গেলে ত ম্যালেরিয়ায় মারা যাবে। সেরে উঠুক তখন নিয়ে যাব।" আমারও কেমন দেশে যেতে ইচ্ছে হত না কেন জানি না!

একদিন মামার বাড়ী কৃষ্ণগড় থেকে একটা "টেলিগ্রাম এলো, "শীগ্‌গির এসো, মায়ের খুব অসুখ।" মামা সেই দিনই সেখান থেকে রওনা হলেন।

আমরা কৃষ্ণগড়ে পৌঁছাবার দু'দিন পরেই দিদিমা মারা গেলেন। মামা মধুপুরের বাসা তুলে দিলেন। জিনিষপত্র সব আনিয়ে ফেল্লেন।

আমি মধুপুরে যেমন, এখানেও তেমনি; কোথাও বেরুতাম না; কারুর সঙ্গে মিশতাম না। একদিন আমা-দের বাড়ীতে একটি ছেলে এলো,—মোটাসোটা,—খুব বড় বড় চোখ,—প্রকাণ্ড মাথা,—হাসি হাসি মুখ। মামীমা আমাকে বল্লেন নির্ম্মল, "এ তোমার ভাই, তুমি এ'র সঙ্গে খেলা ক'রো। এ সত্যেন বাবুর ছেলে। সত্যেন বাবু তোমার মামার ছেলেবেলাকার বন্ধু; তারপর সেই ছেলেটিকে

বল্লেন, "বিমল তুই একে খেলা কত্তে নিয়ে যাস্। এ কারু সঙ্গে মিশ্‌তে চায় না। বেচারা বড় লাজুক।"

আমি এতক্ষণ একদৃষ্টে তার দিকে চেয়েছিলাম; সেও আমার দিকে চেয়েছিল; আর হাসছিল। তাকে যেন আমার খুব ভাল লাগ্‌ছিল; তার মুখের থেকে আমি আমার চোখ তুলে নিতে পার্‌ছিলাম না। সে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে আমার—হাত ধরে বল্লে, "নির্ম্মল চল বেড়িয়ে আসি"। আমি তার সঙ্গে বেড়াতে গেলাম। এই দিন সে গুরু—আমি শিষ্য। সে কথায় কথায় আমাকে কত জিনিষ শেখাতে লাগ্‌ল। সে যখন হাঁসত—তখন তাকে আমার ভয় হত না; তখন আমার চোখে তার মত সুন্দর আর থাকত না। কি সে যখন বড় বড় উজ্জ্বল গম্ভীর চোখ আমার মুখের ওপর রেখে আমাকে উপদেশ দিত;—আমি ভয়-ভক্তিপূর্ণ চোখে তার দিকে স্থির হয়ে চেয়ে থাক্‌তাম। সে আমার জীবনে কি পরিবর্ত্তনই এনে দিয়েছিল!

আমি অনেক শিখ্‌লাম। ক্রমে তার উপর আমার যে একটা ভয়ের ভাব ছিল সেটা কেটে গেল। তাকে ভালবাস্‌লাম। যে দিন দেখেছিলাম সেইদিনই ত তাকে ভালবেসেছিলাম,—সে ভালবাসা এতদিন ভয়ভক্তি-পূর্ণ ছিল। এখন তা আত্মহারা অবাধ হ'য়ে গেল। পাড়ার লোকেরা আমাদিগকে দেখে ব'ল্‌ত "আহা! ছেলে দুটি যেন রাম লক্ষ্মণ।"—আমরা দু'জনেই মাতৃহারা,—দুই হতভাগ্যে পরস্পরকে জড়িয়ে থাক্‌তাম।

(৩)

সে দিন সকাল বেলা। দাদা অন্য দিন আমাকে বেড়াইতে যাবার জন্য ডাক্‌তে আসে, আজ আসেনি। আমি তাদের বাড়ী গেলাম—তারা ব'ল্লে "সে ত বেড়িয়ে গেচে!" এদিক ওদিক দেখে,—তখন আর কি করব- দুঃখিত হয়ে অন্যমনস্কভাবে বনের দিকে চল্লাম।

কানানদীর ওপারের জামের বনের মধ্যে তখন জাগরণের সাড়া পড়ে গেছে। বর্ণ, গন্ধ, গান জাগরণের উল্লাসে মেতেছে। আমি নদী পার হ'য়ে বনে ঢুকলাম। একটু দূর বন থেকে অস্পষ্ট গানের সুর ভেসে আস্‌ছিল। সেই দিকেই চল্লাম। গান হচ্ছিল—

"মা ব'লে আর ডাকিস্‌নারে মন, মাকে কোথায় পাবি ভাই,
থাক্‌লে সে যে দিত দেখা সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই॥"

আমি দাঁড়ালাম। দাদা গান গাচ্ছিল। দাদা আমাকে আজ একলা ফেলে চ'লে এসেচে,—যা কখনও হয় না,—আমার বড় রাগ হ'ল অভিমান হ'ল। আমি মনে ক'ল্লাম—এখুনি বাড়ী ফিরি; বেড়াতে যাব না, আবার মনে হ'ল—আমি একলা বেড়াতে এসেচি একলা বাড়ী ফিরে যাব; ওকে দেখা দেবো না। এই সব ভাব্‌চি আর এগিয়ে যাচ্চি। ক্রমে দাদার এত কাছে এসেছি যে আর গোটা চার গাছ পার হ'লেই তার সাম্‌নে গিয়ে পড়্‌ব। দাঁড়ালাম,—দেখি, ও কি কচ্চে। ও তখন গান গাচ্ছিল—এক মনে; আর চোক দিয়ে ঝর ঝর ক'রে জল পড়ছিল। আমিও কেঁদে ফেল্লাম—আমাদের যে একই ব্যথা! ওঃ! সে কি করুণ্ সুর,—আমার রাগ অভিমান কোথায় ভেসে গেল,—আমি ছুটে গিয়ে দাদার কোলে ব'সে তার গলা জড়িয়ে ধল্লাম। দু'জনেই কাঁদি,—আর দু'জনেই দু'জনের চোখের জল মুছাই। খানিক পরে আমি দাদাকে জিজ্ঞাসা ক'ল্লাম,—"তুই আজ আমাকে একলা ফেলে রেখে চ'লে এলি কেন?"

দাদা ব'ল্লে, "কাল রা'তে একটা বড় কুস্বপ্ন দেখে মনটা খুব খারাপ হয়ে আছে। রাত্রে খুব কেঁদেছি—আর খুব ভোরে উঠেই চ'লে এসেছি। অত ভোরে উঠলে তোর ঠাণ্ডা লাগ্‌বে বলে তোকে ডাকিনি।"

"কি স্বপ্ন দেখেছিলি?"

"মাকে স্বপ্নে দেখেছিলাম।"

আমি তার বুকে মুখ গুঁজে দিলাম। তার সমস্ত বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। প্রসঙ্গটা পাল্টে দেবার জন্য আমি তাকে বল্লাম,—"দাদা, আমি তোর উপর রেগেচি। বল্—তুই আর আমাকে ফেলে কোথাও যাবি না?"

দাদা একটু হেসে আমার মুখচুম্বন ক'ল্লে। ব'ল্লে, "না, তোকে ছেড়ে আর কোথাও যাব না। কিন্তু এ কথা কি শেষ পর্য্যন্ত থাকে ভাই?"

"কেন থাকে না?"

"ধর্—আমি যদি ম'রে যাই, তা হলে ত এ কথা রইল না।"

"ও সব কথা বল্‌বি ত ভাল হবে না। আমরা এক সঙ্গে মর্‌ব।"

"তা কি হয়! জগতে কটা এ রকম হয়?"

"কেন হয় না? আমরা দু'জনে এক সঙ্গে মর্ব্ব। মর্ব্বই—কেউ কারুর মরার পর বেঁচে থাক্‌বে না। বেঁচে থাকতে পার্ব্বে না।"

"তাই যেন হয়।"

কথাগুলো আমার মনে যেন একটা কি কালো ছায়া এনে দিলে। আমি উঠে পড়্‌লাম; বল্লাম—"চল্‌ বেলা হয়ে গেছে।"

দু'জনেই আজ দু'জনকে খুব আঁকড়ে ধরে চলেচি। যেন কি অজ্ঞাত ভয় আমাদের বুকে পাথরের মত চেপে বসেচে।

(৪)

কৃষ্ণগড়ে এ'সে দু'বৎসর কেটে গেছে। বাবা একবার এসেছিলেন, আমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন; মামা আমাকে ছাড়্‌তে চান্‌নি—বাবাও তাতে বিশেষ জেদ করেন নি। আর আমার বাড়ী যাবার নাম শুনে গা'য়ে জ্বর এসেছিল। "দাদাকে ছেড়ে যেতে হবে? কখনও না।" বাড়ীতে যেতে হয়নি—আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

এখন আমাদের গ্রামে (কৃষ্ণগড়ে) খুব অসুখ হ'চ্ছিল। আমার একদিন ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হ'ল। শীগ্‌গির সারল না। বরং দিন দিন বাড়্‌তে লাগ্‌ল। দাদা অনবরত আমারই কাছে ব'সে থাকত। যেদিন থেকে জ্বর হ'য়েছিল—সেই দিন থেকেই আমাকে ডাক্তারে দেখছিল। জ্বর বাড়তে—অন্য একজন ভাল ডাক্তার দেখতে লাগলেন। পনের দিন গেল। জ্বর সমান। আমি কঙ্কালাবশেষ হয়ে গেছি। দাদাও উদ্বেগে—অনিদ্রায় শুকিয়ে অর্দ্ধেক হ'য়ে গেছে। ওঃ, সে কি পরিশ্রম! সারা রাত আমার মাথার গোড়ায় ব'সে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়েছে। তুলে ধ'রে বমি করিয়েছে;—নিজে হাতে ওষুধ খাইয়েছে। কাউকে এ সব কর্ত্তে দেয়নি। সবাই তাকে রোগীর কাছে থাক্‌তে বারণ করেছিল; সে কারও কথা শোনেনি।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। জ্বর ঘোর বিকারে পরিণত হ'ল। অন্যান্য নানা উপসর্গও দেখা দিল। ডাক্তা আমার সম্বন্ধে হতাশ হ'লেন। আমি বিকারের ঘো তিন দিন অচেতন ছিলাম। সকলেই প্রতিমুহূর্ত্তে আমা জীবন-দীপ নেভ্‌বার আশঙ্কা কচ্ছিলেন। কিন্তু আমি বেঁ উঠলাম। বোধ হয় ম'লেই—যাক্‌। বেঁচে উঠে আর দাদাকে দেখিনে! তার কি অসুখ হ'ল? নিশ্চয়। মামী মাকে জিজ্ঞাসা কল্লাম—বল্লেন, "সে তার মামার বাড়ী গেছে।" আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম। আমার সঙ্গে দেখা না ক'রে সে মামার বাড়ী গেল?

পথ্য করার পর সাত আট দিন গেল;—আমি একটু একটু উঠ্‌তে পারি। দাদার জন্যে আমার কিছুই ভাল লাগছিল না। আমি একদিন বৈকালে তাদের বাড়ী গেলাম। খুব কষ্ট হ'ল। বাড়ীতে ডাক্‌লাম—"দাদা!"—

কারু সারা নেই। আবার ডাক্‌লাম। দাদার সৎমা কেঁদে উঠ্‌লেন। এ কি! ইনি কেঁদে উঠ্‌লেন কেন? আমি কাঁপতে কাঁপতে তার দিকে যাবার চেষ্টা কচ্ছিলাম। হ'রে চাকর আমাকে এসে ধরলে,—বাইরে নিয়ে এ'ল;—বল্লে, "বাবু, সে অতি দুঃখের কথা; আপ্‌নাকে যে দিন ডাক্তার জবাব দিইছিল, সেই দিন খোঁকাবাবু বিষ খেয়ে—"

ব্যস্‌। আমি চীৎকার করে মাটিতে প'ড়ে গেলাম। আমার সংজ্ঞা লোপ হ'ল। * * * * * * *

* * * * *

মামা বসন্ত রোগে মারা গেলেন। আমি পাগল হয়েচি! মামী কাঁদেন;—কি কর্ব্ব! আমি সকাল, দুপুর, সন্ধ্যেয় কানানদীর ধারে সেই জাম বনে ব'সে থাকি। দাদা আসে; আমরা কত খেলা করি। আমি দাদাকে ফিরে পেয়েচি। আগেকার চেয়ে আরও বড় ক'রে—আরও বেশী ক'রে পেয়েচি। দাদা আসে—দাদা এ'লে বন আরও সুন্দর হয়;—দাদা হাসে—সে হাসিতে বনের হাসি উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। দাদা গান গায়—সে গানে বনানীর গায়ে রোমাঞ্চ হ'য়; লতায় লতায়—সুপ্ত ফুলের শিশুগুলি জেগে ওঠে। দাদা আসে—আমাকে আগের চেয়ে বেশী আদর করে; আগের চেয়ে বেশী স্নেহে কোলে নেয়—চুম দেয়।

শ্রীমতী তিনকড়ি দেবী।

সাহস।

তিনটি ভুবন আজ্‌কে আমার শত্রু যদি হয়
একটি জনে পেলে আমি করবো নাক ভয়।
রুষ্ট রহুক বিশ্বখানা
তুষ্ট রহুক সেই সে জনা
বুক যে শুধু তারেই পেলে
সকল ব্যথা সয়।

সম্মুখেতে যোগিনী র'ক রিক্তা বিষদোষ,
'অমায়' আসি বস্থক 'মঘা' করি বিষম রোষ।
নাইকো আমার ভয় ভাবনা
সঙ্গে রহুক সেই সে জনা,
শুদ্ধ চির চন্দ্র আমার
নাইরে পরাজয়।

বিপদ আস্থক আপদ আস্থক করি হুলুস্থুল
নারায়ণী সেনার সাথে বিপুল কুরুকুল।
সারথি সে থাকুক রথে
করবো না ভয় কোনই মতে
মরার আগে মরেই আছে
আমার রিপুচয়।

মশানেতে লউক মোরে বন্ধ করি কর
লুটে লউক 'সপ্ত ডিঙা' ডুবাক 'মধুকর'।
ভয় কি আমার নাইক দেরী
আস্‌বে ছুটে চণ্ডী বুড়ী
জানে না ত কোথায় সে যে
কেমন ভাবে রয়।

জতুগৃহে পোড়াক মোরে দারুণ শোক তাপ
দুর্ব্বাসা সশিষ্যে আস্থন দিতেই অভিশাপ।
কেবল হরি নামের বলে
হস্তী আমায় যায় না দলে
নিবেদনে বিষ যে আমার
হয় রে মধুময়।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের

একাদশ অধিবেশনের

সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের

অভিভাষণ।

[শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ আচার্য্য শ্রীযুত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সভাপতির পদগ্রহণ করিতে না পারায় শোভন বিনয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া সভাপতি মহাশয় বলেন :—

এই সাহিত্য-সম্মিলনের ভাব-জগতে সূচনা হইবার পর সুকবি ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের আহ্বানে ১৩১২ বঙ্গাব্দের চৈত্রের শেষে সাহিত্যসেবিগণ কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে প্রথম সাহিত্য-সম্মিলন অনুষ্ঠিত করিবার জন্য বরিশাল নগরে সমবেত হন। কিন্তু রাজনীতির কল-কোলাহলে, বিশেষতঃ পুলিশ-পুঙ্গব-দিগের সুদীর্ঘ 'রেগুলেসান' লাঠির গুরুগম্ভীর নিনাদে, ঐ মিলিত-প্রায় সাহিত্য-সম্মিলনের বোধন না হইতেই বিসর্জ্জন হইয়া গেল। পরে ১৭ই কার্ত্তিক ১৩১৪ সাল, রবিবারে কাশিমবাজার রাজবাটীর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রাঙ্গনে বদান্যবর

বিদ্যোৎসাহী বঙ্গজননীর সুসন্তান শ্রীযুক্ত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের উদ্‌যোগ আমন্ত্রণ ও আয়োজনে এই 'সাহিত্য সম্মিলন' প্রথম সমবেত হইলেন। ঐ দিন বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ঐ দিন প্রথম সর্ব্ব-বঙ্গের সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী সুধীগণ এক বিরাট যজ্ঞশালায় সমবেত হইয়া এক শুভ বাণী-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর বঙ্গ ও বিহারের নানাস্থানে এই সাহিত্য-সম্মিলনের পর পর নয়টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে—আজ আমরা ঢাকাবাসীর আহ্বানে সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্‌বোধন-স্বরূপ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাহার একাংশ আপনাদের শুনাইতে চাই—"সাধকভেদে যেমন জননীর মূর্ত্তি ভেদ হয়, সেইরূপ দেশভেদে ও কালভেদে তিনি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি গ্রহণ করেন। 'বন্দেমাতরম্' এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র সেই শ্যামাঙ্গিনী জননীকে যে মূর্ত্তিতে দেখিয়াছিলেন সেই মূর্ত্তি আমাদের উপস্থিত যুগধর্ম্মের অনুকূল মূর্ত্তি। বঙ্কিম-চন্দ্রের পূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালী মায়ের এই মূর্ত্তি এমন স্পষ্ট-ভাবে দেখিতে পান নাই, এবং সেই মূর্ত্তিকে ইষ্টদেবতারূপে স্বীকার করিয়া তদুপযোগী সাধনার সময় পান নাই। * *"

"অতঃপর আর বলিতে হইবে না, আমাদের যুগধর্ম্মের লক্ষণ কি? বঙ্গের সাহিত্যগুরু আমাদিগকে যে লক্ষ্য ধরিয়া যাইতে বলিয়াছেন, বঙ্গের সাহিত্যসেবিমাত্রকেই সেই লক্ষ্যের অভিমুখে চলিতে হইবে। প্রত্যেকের পক্ষে চলিবার পথ ভিন্ন হইতে পারে। সাহিত্যসেবীর মধ্যে কেহ কবি, কেহ ঔপন্যাসিক, কেহ দার্শনিক, কেহ বৈজ্ঞানিক,কেহ জ্ঞান প্রচারে ব্রতী, কেহ ভক্তিপথের উপদেষ্টা, কেহ কর্ম্মমার্গের পথপ্রদর্শক। কিন্তু আজিকার দিনে বঙ্গের সাহিত্যসেবীর এক বই দ্বিতীয় লক্ষ্য হইতে পারে না। যিনি যে কামনা করিয়া কর্ম্ম করিবেন, তাঁহাকে সেই শ্যামাঙ্গিনী জননীর চরণে সেই কর্ম্মফল অর্পণ করিতে হইবে। যিনি যে ফুল আহরণ করিবেন, সে সকল ফুলই সেই রাঙ্গাচরণের রক্ত-জবার সহিত মিশাইতে হইবে। পত্র, পুষ্প, ফল, তোয় যাহা আহরণ করিবেন, তাহা ভক্তিপূর্ব্বক সেই স্থানেই অর্পণ করিতে হইবে। "যজ্জুহোসি, যদশ্নাসি, যৎ করোষি, দদাসি যৎ",—ভগবতীর আদেশ—সেই সমস্তই সেই এক চরণে অর্পণ করিতে হইবে।" আমিও রামেন্দ্র বাবুর এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলি—আজ নহে কাল নহে, 'যুগে যুগে বর্ষে বর্ষে নিত্য নিরন্তর' আমাদের সমস্ত সাধনার লক্ষ্য, সমস্ত উদ্দেশ্যের বিধেয়, সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষার গম্য ঐ শ্যামাঙ্গিনী জননী, ঐ সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা, ঐ কাননকুন্তলা, ঐ নদীমেখলা, ঐ সাগরশীতলা, ঐ সুস্মিতা ভূষিতা জননী। আসুন মাকে প্রণাম করিয়া বলি—

বন্দে মাতরম্ ॥

শোকপ্রকাশ।

[সাহিত্য সম্মিলনের দুইজন ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ৺সারদা চরণ মিত্র এবং ৺ অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহোদয়দ্বয়ের কথা উল্লেখ করিয়া শোক প্রকাশ করেন।]

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনের কথা।

সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন সম্মিলন-পরিচালনের জন্য কোন নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করা হয় নাই; বরং সম্মিলনের শৈশব-দোলায় নিয়মের বজ্রবন্ধনী নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল; এবং প্রথম বর্ষের কার্য্যবিবরণীতে ঘোষিত হইয়াছিল যে—"বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অন্নপ্রাশন-সংস্কার সম্পাদিত হইলে চূড়াকরণকালে তাহার ভবিষ্য জীবনের অনাময় নিমিত্ত উপযুক্ত বিধি-ব্যবস্থার আস্থাপন করা যাইবে।" কিন্তু অচিরেই বিধি-ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। তদনুসারে দ্বিতীয় অধিবেশনে সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্যপ্রণালী স্থিরীকরণের নিমিত্ত পাঁচজন ব্যক্তির উপর ভার অর্পিত হয়। তাঁহারা খসড়া নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়া ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত তৃতীয় অধিবেশনে উহা উপস্থিত করিলে ঐ বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ হইয়া উক্ত নিয়মাবলী তৎপরবর্ত্তী সম্মিলনে বিবেচিত হইবে, এইরূপ স্থির হয়। কিন্তু ঐ তৃতীয় অধিবেশনেই ভবিষ্যৎ সম্মিলনের কার্য্যনির্ব্বাহার্থ সাহিত্য, ইতিহাস, ও বিজ্ঞান, এই তিন বিভাগের জন্য তিনটী শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছিল। জাতীয় সাহিত্যের গঠনে দর্শনের স্থান সংকীর্ণ বিবেচিত হওয়ায় বোধ হয় ঐ অধিবেশনে দর্শনের জন্য কোন ভিন্ন শাখা-সমিতি-গঠনের প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। পরবর্ত্তী অধিবেশন, যাহা ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই অধিবেশনে নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি গৃহীত হয়। ঐ নিয়মাবলীতে সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য এই প্রকারে বিবৃত হইয়াছিল,—

"বিবিধ শাস্ত্রের আলোচনা, প্রচার ও সুধীগণের মধ্যে ভাব-বিনিময় সম্মিলনের উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। বাঙ্গালাদেশ ও বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে স্থানীয় অনুসন্ধান দ্বারা সর্ব্ববিধ তথ্যনির্ণয় উক্ত উদ্দেশ্যের বিশিষ্ট অঙ্গরূপে গণ্য হইবে ; তজ্জন্য এবং বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের জন্য ও স্থানীয় লোকদিগকে তৎসম্বন্ধে উৎসাহিত করিবার জন্য প্রতিবর্ষেই সাহিত্য-সম্মিলন আহূত হইবে।"

পরে সংশোধিত হইয়া সম্মিলনের উদ্দেশ্য এখন এইভাবে প্রকাশিত হইতেছে,—

"সুধীগণের মধ্যে ভাব-বিনিময়, বিবিধ শাস্ত্রের আলোচনা ও প্রচার বাঙ্গলা দেশ ও বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে স্থানীয় অনুসন্ধান দ্বারা সর্ব্ববিধ তথ্যনির্ণয় এবং জনগণের মধ্যে সাহিত্যানুরাগ ও জ্ঞানের বিস্তার বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।"

প্রথম প্রথম দর্শন সাহিত্যিক শাখার অঙ্গীভূত ছিল, কিন্তু পরে দর্শন স্বতন্ত্র শাখায় নিজের যোগ্য আসন লাভ করিয়াছে। এখনকার নিয়মে কার্য্যের সুবিধার জন্য সম্মিলনের কার্য্য নিম্নলিখিত চারিভাগে বিভক্ত হইতে পারে। প্রয়োজন হইলে একই সময়ে একাধিক শাখার অধিবেশন হইতে পারিবে। (ক) সাহিত্য শাখা (খ) দর্শন শাখা (গ) ইতিহাস ও ভূগোল শাখা (ঘ) গণিত ও বিজ্ঞান শাখা।

চুঁচুড়ায় সাহিত্য-সম্মিলনের যে পঞ্চম অধিবেশন হয়, ঐ অধিবেশনে প্রথম বিজ্ঞান শাখার স্বতন্ত্র সভার অনুষ্ঠান হয়। তৎপরবর্ত্তী চট্টগ্রামের অধিবেশনেও ঐ প্রণালী অনুসৃত হইয়াছিল। কলিকাতা নগরীতে সাহিত্য-সম্মিলনের যে বিরাট অধিবেশন হইয়াছিল, ঐ অধিবেশনেই প্রথমতঃ সম্মিলনের কার্য্য উক্ত চারি শাখায় বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন শাখার স্বতন্ত্র সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

"তদবধি বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া সাধারণ সভাপতি ব্যতীত চারিশাখার চারিজন বিভিন্ন সভাপতি নির্ব্বাচিত হইতেছেন, এবং প্রত্যেক সভাপতি স্ব স্ব শাখার উপযোগী স্বতন্ত্র অভিভাষণ পাঠ করিতেছেন। ইহার ফলে সমাগত সুধীবৃন্দ অনেক সময় ইচ্ছা সত্ত্বেও সকল শাখার রসাস্বাদে বঞ্চিত হইতেছেন। কারণ, সময়াভাবে প্রায় এক সময়েই চারি শাখার ভিন্ন ভিন্ন গৃহে অধিবেশন করিতে হইতেছে। শ্রোতৃবৃন্দ যোগসিদ্ধির অভাবে কায়ব্যূহ রচনায় অসমর্থ হইয়া হয় একশাখায় অনুপস্থিত থাকেন, অথবা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া শাখা হইতে শাখান্তরে বিচরণ করিয়া যুগপৎ শ্রান্তি ও নির্ব্বেদ অনুভব করেন। ইহার একটা সদুপায় হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সে সদুপায়ের প্রধান অন্তরায় পঠিতব্য প্রবন্ধের বাহুল্য।

সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষেরা প্রবন্ধ-সংগ্রহের জন্য সারা দেশময় নারদের নিমন্ত্রণ করেন। তাহার ফলে প্রত্যেক শাখাতে পাঠের জন্য নানা বিষয়ে উত্তম মধ্যম বহুসংখ্যক প্রবন্ধ উপস্থিত হয়। সময়াভাবে অধিকাংশ প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। এবং যদি বা দু' একজন সৌভাগ্যবান্ লেখকের ভাগ্যে প্রবন্ধপাঠের সুবিধা ঘটে, তথাপি সেই সকল প্রবন্ধ চারিশাখায় যুগপৎ অধিবেশনের হট্টগোল যথোচিত মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে না। এইরূপে অনেক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ মাঠে মারা যাইবার উপক্রম হয়। সাহিত্য-সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে এই বিষয়ের প্রতিবিধান করিবার জন্য আমি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। সাহিত্য-সম্মিলনকে সাহিত্য দর্শন ইতিহাস বিজ্ঞান—এই চারিশাখায় বিভক্ত করিবার ব্যবস্থা যে সঙ্গত ও সমীচীন, এ বিষয়ে বোধ হয় মতভেদ নাই। এই চারিশাখার পৃথক পৃথক অধিবেশনও যে বাঞ্ছনীয়, তাহাও বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু এই সকল বিশেষ অধিবেশন সাধারণ শ্রোতৃবৃন্দের মিলন স্থান না হইয়া বিশেষজ্ঞের চিন্তাবিনিময় ও গবেষণা-পরিচয়ের কেন্দ্র করিলে কিরূপ হয়? এবং প্রত্যেক শাখার বিশিষ্ট সভাপতির অভিভাষণ যুগপৎ পঠিত না হইয়া সাধারণ সভায় পর পর পঠিত হইবার ব্যবস্থা করিলে কেমন হয়? যেন সমবেত সুধীবৃন্দ ইচ্ছা থাকিলে কেহই ঐ সকল অভিভাষণের রসাস্বাদ হইতে বঞ্চিত না হন। সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ প্রবন্ধের বাহুল্য-ঘটা সঙ্কুচিত করিয়া প্রত্যেক শাখার আলোচ্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এক বা দুইজন ব্যক্তিকে সাধারণ শ্রোতার উপযোগী করিয়া স্ব স্ব বিষয়ে বক্তৃতা বা প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য আহ্বান করিলে ভাল হয়। শুনিয়াছি, এমন এমন একটি প্রবন্ধ শুনাইবার জন্য ইংলণ্ডের বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোক সর্ব্বদাই এটল্যান্টিক সমুদ্র পার হইয়া আমেরিকায় যান, এবং আমেরিকার বিশিষ্ট লোক ইংলণ্ডে আসেন। আমাদের বিশিষ্ট মহোদয়েরা এক জেলা হইতে অন্য জেলায় আসিতে পারিবেন না কি?

এইরূপ করিলে প্রতিবর্ষে সাধারণ সভাপতির অভিভাষণ ব্যতীত প্রত্যেক শাখায় সেই শাখার সভাপতির অভিভাষণ এবং একটি কিংবা দুইটি বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সম্মিলনের গৌরবের সামগ্রী হইতে পারিবে এবং ঐ সমস্ত প্রবন্ধই সাধারণ সভায় সমবেত সকল সুধীবৃন্দের বিনোদন ও শিক্ষণের উপায়স্বরূপ হইবে। সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞের বৈঠকে কূটপ্রশ্ন ও সমস্যার আলোচনা চলিবে। তৎসঙ্গে প্রাচীন পুঁথি মুদ্রা-লিপি আলেখ্য শাসনমূর্ত্তি প্রভৃতির প্রদর্শন, আলোকচিত্রের সাহায্যে সরল ও সরস ভাবে জ্ঞানবিস্তার এবং সাহিত্যিক-দিগের মধ্যে সৌহার্দ্দ ও ভাববিনিময় দ্বারা সাহিত্য-সম্মিলনের এই আনন্দের মেলা শুধু হাসি খেলা ও হট্টগোলে শেষ না হইয়া সাফল্য ও সার্থকতা লাভ করিবে।

আপনাদের স্মরণ হইবে যে, বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বিগত দশম অধিবেশনে সম্মিলনকে ১৮৬১ খৃঃ অব্দের ২১ আইন অনুসারে রেজেষ্টরী দ্বারা বিধিসিদ্ধ বৈধতা প্রদান করিবারজন্য সেই সম্মিলনের সভাপতি মাননীয় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয়, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী এবং আমাকে লইয়া একটী শাখা সমিতি গঠিত হইয়াছিল। এই সমিতি বর্ত্তমান নিয়মাবলীর আদেশে কতকগুলি নিয়মাবলীর খসড়া প্রস্তুত করিয়া সম্মিলন পরিচালন সমিতি, উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্যকরী সমিতি প্রভৃতির নিকট বিবেচনার্থ পাঠাইয়াছেন। তাঁহাদের অভিমত প্রাপ্ত হইলে রেজেষ্টরীকারী-সমিতি আপনার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া বোধ হয় সম্মিলনের আগামী অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত করিতে পারিবেন।

বঙ্গ-সাহিত্যের বিশ্ববিজয়ী সৌধ।

দশম অধিবেশনের সভাপতি-রূপে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী যে আশা ও উদ্দীপনা পূর্ণ হৃদয়গ্রাহী অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার ধ্বনি নিশ্চয়ই আপনাদের হৃদয়-তন্ত্রীতে এখনও ঝঙ্কৃত হইতেছে। "দেশ-মাতৃকার মুখ উজ্জ্বল করিব। আমার জননী বঙ্গভাষাকে জগতের বরণীয় করিব। আমার মাকে এমন করিয়া সাজাইব, এমন করিয়া সুন্দর করিব, যাহাতে আর দশ জন অন্য মায়ের সন্তান আমার মাকে মা বলিয়া জীবন ধন্য জ্ঞান করিবে।" এই প্রকার পবিত্র সঙ্কল্পরূপ গঙ্গাজলে আমাদিগকে অভিষিক্ত হইতে তিনি উপদেশ করিয়াছিলেন বঙ্গসাহিত্যের বিশ্ববিজয়ী সৌধ নির্ম্মাণকল্পে দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া তিনি উদ্দীপনার ভাষায় বলিয়াছিলেন,— "বাঙ্গালী জাতির ইতর ভদ্র সকলের মনে একবার কো[illegible] ক্রমে জাগাইয়া তুলিতে হইবে যে আমার মাতৃভাষা অভ্যুদয়ের সহিত একসূত্রে আমার নিজের, তথা সমগ্র জাতির অভ্যুদয় গ্রথিত; বঙ্গদেশের অদৃষ্ট, বঙ্গবাসীর অদৃষ্ট বঙ্গভাষার ভূয়োবিস্তারের উপর নিহিত। যতদিন বঙ্গের অতি নগণ্য পল্লীতে পর্য্যন্ত বঙ্গবাণীর বিজয়শঙ্খ নিনাদিত না হইবে, ইতর ভদ্র সমস্বরে বঙ্গভাষার বিজয়প্রশস্তি উদাত্তকণ্ঠে আবৃত্তি না করিবে, ততদিন বঙ্গের জাতীয় সাহিত্যের বিশ্বসাহিত্যে অন্তর্নিবেশ অসম্ভব। যখন ঋতুরাজ বসন্ত ধরাধামে অবতীর্ণ হন, সারা ব্রহ্মাণ্ডটা এক ভাবে, এক উন্মাদনায় বিভোর হইয়া উঠে, একমনে সকলে মধুর বাসন্তী-মূর্ত্তির পূজা করিয়া তৃপ্তিলাভ করে। যদি সারা বঙ্গদেশটাকে এক ভাবে, একই উন্মাদনায় বিভোর করিয়া তুলিতে পার, তোমার জননী বঙ্গভাষার ভুবনমোহিনী মূর্ত্তির বিমল প্রভায় বাঙ্গালী জনসাধারণের হৃদয় বিভাসিত করিয়া তুলিতে পার, দেখিবে, তোমার দ্বিভুজা বঙ্গভারতী, দশভুজার মূর্ত্তিতে বাঙ্গালীর সমক্ষে অবতীর্ণা। দেখিবে, বিশ্বের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে তোমার বঙ্গবাণীর বিজয়শঙ্খ ধ্বনিত হইতেছে। 'বাঙ্গালার মাটী, বাঙ্গালার জলে' পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে।"

আমরা সমস্বরে দেবভাষায় বলি—বাঢ়ম্, বাইবেলের ভাষায় বলি, Amen—আরও বলি "সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাম্।"

কিন্তু সরস্বতী মহাশয় ধ্যাননেত্রে ভাবরাজ্যে যে মহনীয় চিত্র দর্শন করিয়াছেন, যদি তাহাকে আকার দান করিয়া বাস্তবে পরিণত করিতে হয়, তবে প্রথমেই বঙ্গভাষাকে বাঙ্গালীর সর্ব্ববিধ শিক্ষার বাহন করিতে হইবে—তাহা না পারিলে আমাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইবে, সমস্ত শ্রম পণ্ড হইবে, সমস্ত আশা ভগ্ন হইবে।

কথাটা এত গুরুতর যে, একটু বিস্তার করিয়া বলি। বঙ্গসাহিত্যের বিশ্ববিজয়ী সৌধ নির্ম্মাণ করিতে অনেকগুলি নিপুণ কর্ম্মঠ স্থপতির দরকার—এ কথা বোধ হয় কেহই

অস্বীকার করিবেন না। এখন প্রশ্ন এই যে, বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর দ্বারা ঐরূপ দুর্গতির উদ্ভব হইতেছে কি না? আমার এক পরিহাস-রসিক বন্ধু বলেন যে, গবর্মেণ্টের প্রবর্ত্তিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণোদিত শিক্ষার ফলে কেবল দুই শ্রেণীর জীব তৈয়ারী হইতেছে—এক গোলাম, অন্য গুণ্ডা। কথাটা যে একেবারে অমূলক, তাহা নহে; কিন্তু হয় ত ইহাতে কিছু অত্যুক্তি আছে। অতএব যাঁহারা আমার বন্ধুর মত চটুল নহেন, যাঁহারা গম্ভীর ভাবুক দায়িত্ব-জ্ঞানী লোক, তাঁহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাউক। প্রথমতঃ, আমাদের সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ইনি বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর উপর এমন বিরক্ত ছিলেন যে, আমাদের শিক্ষিতদিগকে ভারবাহী গর্দ্দভের সহিত তুলনা করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই—"খরো যথা চন্দনভারবাহী।" তার পর যিনি বিধিদত্ত অধিকারে বঙ্কিমবাবুর সাহিত্য-সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন, সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি বলেন? তিনি আমাদিগকে চলন্ত নোটবুক ও স্ফুরন্ত ফনোগ্রাফ বলিয়াছেন, এবং শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মৌলিকতা ও সজীবতার অভাবকে লক্ষ্য করিয়া তাহাদের মুখে এই কবিতাটি বসাইয়াছেন :—

"ভয়ে ভয়ে যাই ভয়ে ভয়ে চাই,
ভয়ে ভয়ে শুধু পুঁথি আওড়াই!"

পূর্ব্ব ও পশ্চিম—যুক্ত-বঙ্গের গৌরব কবিবর নবীনচন্দ্র সেন আত্মজীবনচরিতে আমাদের শিক্ষাপ্রণালীকে 'শিশুমুণ্ড-মালিনী মহাকালী' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, এবং ঐ শিক্ষার ফলে অকালে কত শিশুহত্যা হইতেছে, তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার ভাব অবলম্বন করিয়া আমার এক অভিন্নকলেবর বন্ধু একটি ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা আপনাদের শুনাইতে চাই—

নিজ শিব পদে দলে,
শিশু মুণ্ডমালা গলে,
সংহার-রূপিণী, ঘোরা, মুখে অট্টহাস।
লোল রসনা লকে,
রুধির ঝলকে ঝকে,
পূতনারূপিনী বামা বঙ্গে পরকাশ॥

ইহা আপনাদের নিকট কবিতার অত্যুক্তি মনে হইতে পারে। অতএব একজন ধীর স্থির প্রাজ্ঞ ব্যক্তির উক্তি শুনুন। ইনি দেশপূজ্য মারাঠা জননায়ক জষ্টিস্ রাণাড়ে। তিনি এই শিশুহত্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—*

"বিদেশী ভাষায় বিবিধ বিষয় আয়ত্ত করিয়া ছাত্রদিগকে ঘন ঘন কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়। ইহাতে যে দুঃসহ পরিশ্রম হয়, তাহা অনেক ছাত্রের অকাল মৃত্যু একটি প্রধান কারণ। ইহাদের সকল কর্ম্ম-শক্তি যে একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায়, সর্ব্বত্র কেবল একটা অবসাদ ও জড়তার ভাব দেখা যায়, তার কারণ এই শিক্ষা প্রণালী।"

দেহক্ষয় অপেক্ষা এই যে মনের অপচয়—মানসসিক পঙ্গুতা—ইহা আরও মারাত্মক।

আমাদের দেশমান্য সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, যিনি আজীবন শিক্ষার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন, এবং যিনি স্বভাবসুলভ ধীরতার বশে প্রত্যেক শব্দ ওজন করিয়া উচ্চারণ করেন, তিনি এ সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন,—"বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী সন্তোষজনক ফল দিতেছে না। তাহার পরিবর্ত্তনের সময় আসিয়াছে।"

আমার স্মরণ আছে, একবার কলিকাতার সেণ্টজেভিয়ার কলেজের অধ্যক্ষ Father Lafont, যাঁহার সহিত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তিনি আমাদের শিক্ষা-প্রণালীকে huge sham বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছিলেন,—তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার জানত এমন কয়েকটি ছাত্র আছে, যাহারা উপাধি-পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে, অথচ সেই সেই বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। এ কথার বোধ হয় আমরা অনেকেই নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে সমর্থন করিতে পারি। আমি একজন দর্শনশাস্ত্রের এম-এর কথা জানি, যিনি কেবল নোট পড়িয়া পাশ হইয়া-ছেন, একখানিও দার্শনিক গ্রন্থ উল্টাইয়া দেখেন নাই। সম্প্রতি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে একজন Astro-nomy-সংযুক্ত গণিত বিভাগে এম-এ পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন, অথচ কোন দিন গগনবিহারী গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য দূরবীক্ষণে চক্ষুঃ-সংযোগ করেন নাই। অনেকেই শিক্ষিতদিগের পঙ্গুতা ও শিক্ষার বন্ধ্যাত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বোম্বাই প্রদেশের ডাক্তার ভাণ্ডারকর দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন

* অভিভাষণে উদ্ধৃত অংশগুলি প্রায়শঃই ইংরেজিতে আছে। আমরা তাহার মর্ম্মানুবাদ মাত্র দিলাম। ব, স

—"The languid interest which our graduates feel in literary pursuits in after life"। দ্বিতীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই জ্ঞানস্পৃহার অভাবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত বিদ্যালয় সমূহে বহুকাল হইতে বিজ্ঞান অধ্যাপন ব্যবস্থা হইয়াছে, তথাপি বিজ্ঞানের প্রতি আন্তরিক অনুরাগসম্পন্ন ব্যুৎপন্ন ছাত্র আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না; কেন না, ইংরাজীতে একটি কথা আছে, ঘোড়াকে জলাশয়ের নিকটে আনিলে কি হইবে? উহার যে তৃষ্ণা নাই। একজামিন্ পাশ যেখানকার ছাত্রদের মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানকার যুবকগণের দ্বারা অধীত বৈজ্ঞানিক বিদ্যার শাখা প্রশাখাদির উন্নতি হইবে, এরূপ প্রত্যাশা করা নিতান্তই বৃথা। সেই সকল মৃতকল্প, স্বাস্থ্যবিহীন যুবকগণের যত্নে জাতীয় ভাষার উন্নতিবিধান কিংবা যে কোন প্রকার দুরূহ ও অধ্যবসায়-মূলক কার্য্যের সাফল্যসম্পাদনের আশা নিতান্তই সুদূরপরাহত।"

ডাক্তার রায়ের বহু পূর্ব্বে মনস্বী ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "সামাজিক প্রবন্ধে" আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন যে, দেশে বিজ্ঞানশালার প্রতিষ্ঠা করিলে কি হইবে, দেশের মধ্যে এখনও বৈজ্ঞানিকতার অঙ্কুরোদ্গম হয় নাই। এই সকল গুরুকল্প ব্যক্তিদিগের কথার পর আমি কি বলিতে পারি? আর যদিই বা বলিতে যাই, হয় ত কিছু কটু কঠোর বলিয়া ফেলিব। তবে আমার যাহা বক্তব্য, এক জন আইরিস্ লেখক আয়ারল্যাণ্ডের শিক্ষা-বিভ্রাটের বর্ণনায় তাহা যথাযথ বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিই—আপনারা ঐ উক্তিতে আয়ারলাণ্ডের স্থানে [illegible]ণ্ডিয়া বসাইয়া লইবেন;—

"আয়ারলণ্ডের শিক্ষা-প্রণালী বুদ্ধিবৃত্তিকে বিষমভাবে চাপিয়া রাখে; ভাবরসকে স্ফূর্ত্তি পাইতে দেয় না; আত্মাকে হীন করে; দেহকে ক্ষীণ করে। পুরুষপরম্পরাগত ভাব ও আদর্শ হইতে দেশবাসীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে এবং দেশকে চিনিতে না দিয়া তার মনুষ্যত্বকে অবনত করিয়া দেয়। অনর্থক বাজে কথায় তার মন পূর্ণ করিয়া রাখে। পুরুষপরম্পরাগত প্রাচীন ভাবের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া তার কল্পনাশক্তি নষ্ট করে। ব্যায়ামানুশীলনের অভাবে তাহার দেহকে দুর্ব্বল করে।"

যে শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে এত দোষ, তাহার আমূল সংস্কার না হইলে আমাদের জাতির কি ভরসা আছে? যদি বঙ্গ-সাহিত্যের বিশ্ববিজয়ী সৌধ গড়িয়া তুলিতে হয়, তবে তাহার জন্য অনেকগুলি মানুষ চাই—কয়েকজন অতিমানুষও চাই—মেষের দ্বারা সে কার্য্য হইবে না, মহিষের দ্বারাও সে কার্য্য হইবে না। আমরা এমন শিক্ষা চাই, যাহার ফলে স্বতন্ত্র স্বালম্ব স্বনিষ্ঠ স্বাধীন সামাজিক প্রস্তুত হইবে; যাহাদের দেহে বল থাকিবে, মনে দৃঢ়তা থাকিবে, হৃদয়ে বিশ্বাস থাকিবে, এক কথায়, যাহারা এই মৃতকল্প দেশকে সজীব সজাগ করিতে পারিবে, দেশে নূতন শিল্প নূতন বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করিবে, নূতন সাহিত্যের নবগঙ্গা আনয়ন করিবে; নূতন বিজ্ঞানের যজ্ঞশালা রচনা করিবে; নূতন দর্শনের স্বর্ণসৌধ গড়িয়া তুলিবে। কেন বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীতে এইরূপ-মানুষ প্রস্তুত হইতেছে না। বাঙ্গালীর বুদ্ধির অভাব নাই, অধ্যবসায়ের অভাব নাই। তথাপি এইরূপ হইতেছে কেন? আমাদের দেশে শিক্ষা কেন বন্ধ্যা হইতেছে, শিক্ষিত কেন পঙ্গু হইতেছে? ইহার প্রধান ও প্রথম কারণ, বাঙ্গালাকে **শিক্ষার বাহন** না করিয়া বিদেশী ভাষার দ্বারা শিক্ষা-দান। এইরূপ পৃথিবীর আর কোন দেশে আছে বলিয়া শোনা যায় নাই। আর কোথায়ও কখনও ছিল কি না, তাহাও জানা যায় নাই। কেবল কিছুদিনের জন্য ছিল নরম্যান-বিজয়ের পর নিপীড়িত ইংলণ্ড দেশে। কিন্তু ইংরেজ জাতি প্রকৃতি-সুলভ অমোঘতায় শীঘ্রই নরম্যানকে আত্মসাৎ করিয়া নিজের শিক্ষা স্বাভাবিক ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছিল। এদেশে কত দিনে এই শুভ ঘটনা সংঘটিত হইবে?

আমাদের শিক্ষার্থীদিগকে cram-কারী বলিয়া বিদ্রূপ করা হয়। তারা মুখস্থ করিয়া পাশ করে; বস্তু শিখে না বাক্য শিখে, ভাব শিখে না ভাষা শিখে; তারা গতানুগতিক—তাহাদের মৌলিকতা নাই, স্বাধীন চিন্তা, আত্মনির্ভর নাই, গবেষণায় প্রবৃত্তি নাই। তাহারা কেবল চর্ব্বিতচর্ব্বণ করে, বাস্তুনিষেবন করে। তাহারা নিজের পথ কাটিয়া লইতে পারে না, জাতীয় জীবনের প্রদীপ্ত হোমানলে ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থ ও সুবিধা আহুতি দিতে পারে না। সমস্তই স্বীকার করি। কিন্তু জিজ্ঞাসা

কস্থি—ইহার জন্য তাঁহারা দায়ী, না তাঁহাদের শিক্ষাপ্রণালী দায়ী? আমার স্মরণ আছে যখন আমি প্রবেশিকা পরীক্ষার দ্বারে উপনীত হইবার জন্য প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিলাম, তখন ইংরাজি ভাষায় ইতিহাস প্রভৃতি আয়ত্ত করিবার জন্য কি গলদ্‌ঘর্ম্ম পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল এবং অবশেষে পরাভূত হইয়া কিরূপে key ও catecheism এর আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। অথচ যাদের 'ভাল ছেলে' বলে, মেধাবী পরিশ্রমী তীক্ষ্ণবুদ্ধি সচ্চরিত্র— আমি তাহাদের একজন ছিলাম। অবশ্য আমার বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে আপনাদের একথা বিশ্বাস হইবে না, কিন্তু স্মরণ রাখিবেন আমার যে বর্ত্তমান আমি, সেটা পুরাতন আমির ধ্বংসাবশেষ মাত্র—এ আমি, পরীক্ষা-ঘানির ঘর্ষরনিষ্পিষ্ট নিঃসার জীব। কিন্তু চিরদিন এমন ছিলাম না। তবে জানেন ত'—'পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙে হীরার ধার'।

"আত্মা বৈ জায়তে পুত্র"—নিজেরা ছাত্র দশায় যে সকল মর্ম্মপীড়া অনুভব করিয়াছিলাম, এখন শিশু পুত্রদের মধ্যে তাহার পুনরভিনয় দেখিতেছি। আমার একটি নয় বৎসরের পুত্র আছে। সে সখ করিয়া বিনা সাহায্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শকুন্তলা ও সীতার বনবাস পড়ে। অবাধে পরিয়া যায়, নিঃশেষ না করিয়া নিরস্ত হয় না। কিন্তু দেখিতে পাই, ইংরাজি পড়িতে হইলে তাহার হৃৎকম্প হয়। দুই বৎসরের বিবিধ চেষ্টাতেও সে এখনও first book সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারিল না। শিক্ষা এ দেশে কত সুখের কত আনন্দের প্রস্রবণ হইতে পারিত, যদি না বিদেশী ভাষা-শিক্ষার বিকট-ছায়া শিক্ষাঙ্গনে নিপতিত হইয়া শিশুদের হৃদয়ে ভীতি ও আতঙ্কের সঞ্চার করিত। বাঙ্গালী জাতি নাকি অজেয় অমর জাতি, তাই এত শিক্ষা সঙ্কটের মধ্যেও বাঙ্গালীর প্রতিভা একেবারে ম্লান হইয়া যায় নাই; এবং তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি একেবারে ভোতা হইয়া যায় নাই। এই প্রণালী সত্ত্বেও যে সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সার রাস বিহারী ঘোষ, সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি মনস্বী পুরুষ (বিদেশে যাঁহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে তাঁহাদের নাম ধরিলাম না) আবির্ভূত হইয়াছেন, ইহাতে আশা হয় যে বাঙ্গালীকে কেহই পরাভূত করিতে পারিবে না। সার আশুতোষও গতবারে বলিয়াছিলেন—'সুজলা, সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির বক্ষের ক্ষীর-ধারায় এমনই একটা সঞ্জীবনী-শক্তি আছে যাহাতে বঙ্গে কোন দিন কৃতীর অভাব হয় না, হইবেও না। যেমন অবস্থাতেই বাঙ্গালীকে ফেলিয়া দাও না কেন, বঙ্গসন্তানের হৃদয়ে কখনও নৈরাশ্য বা দৌর্ব্বল্য আসে না'। তবে এ কথা আমি বলিতে বাধ্য যে, রবীন্দ্রনাথকে যদি আমাদের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সোপান-পরম্পরা অতিক্রম করিতে হইত, তবে তিনি রবীন্দ্রনাথ হইতেন কি না সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ। কিন্তু শ্বেতভুজা শতদলবাসিনী নাকি তাঁহার হৃৎপদ্মে আপনার রক্তচরণ চিহ্নিত করিবেন, পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়াছিলেন, সেই জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রবেশিকা অবধি পহুঁছিতে পারিলেন না। ধরণী স্বস্তিশ্বাস মোচন করিলেন, দেবতারা দুন্দুভি নিনাদ করিলেন, দিক্-বালারা অম্লান পারিজাত-মালা হস্তে লইয়া কালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, বঙ্গদেশ আর একজন মহাকবির সম্ভাবনায় রোমাঞ্চিত হইল। বাস্তবিক ইহা একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, আমাদের শিক্ষাপ্রণালীতে যাহারা উপেক্ষিত অনেক সময় তাহাদের মনীষাই দেশকে সুবাস বিতরণ করে। সকলেই জানেন ডব্লিউ, সি, বন্দোপাধ্যায় এন্‌ট্রেন্স পাশ করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ ইংরেজীতে ফেল হইয়াছিলেন। সম্প্রতি যে ২৬ বর্ষীয় মান্দ্রাজী যুবক কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিষয়ে অপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া ভারতবাসীদিগের মধ্যে প্রথম এফ, আর, এস-রূপ জয়-টীকা ললাটে ধারণ করিয়াছেন তিনি ৬ বৎসর পূর্ব্বে মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় গলাধাক্কা খাইয়া পোর্টইঞ্জিনিয়ার আফিসে কেরাণীগিরি করিতে বাধ্য হন। কিন্তু দুষ্ট সরস্বতীর এমনই প্রেরণা এবং প্রতিভার এমনই অপ্রতিহত গতি যে, সেই কেরাণী যুবক অপ্রত্যাশিত ভাবে কেম্‌ব্রিজে নীত হইল, এবং অনুকূল অবস্থার গুণে তাহার মনীষাপুষ্প বিকশিত হইয়া উঠিল।

বাঙ্গালাকে যে সর্ব্ববিধ শিক্ষার বাহন করা উচিত এ বিষয়ের মতভেদ হইতে পারে ইহা আমার ধারণা ছিল না। কিন্তু দেখিয়াছি যে, সকলে এ সম্বন্ধে এক মত নহেন। সেই জন্যই এ বিষয়ে, যুক্তিতর্কের অবতারণা করিতে হয়।

সে যুক্তিতর্ক নিজের কথায় না দিয়া কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি, যাঁহাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে তর্ক উঠিতে পারে না তাঁহাদের কথাতেই দিব। প্রথমতঃ সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,—তাঁহার মত যোগ্য কে? তাঁহার উক্তি শুনুন—

"উপরের দিকে সকল বিষয়ই ইংরেজিতে শিখিতে হয়। ইংরেজি বাঙ্গালীর পক্ষে অতি দুরূহ ভাষা। এই ব্যবস্থা ছাত্রদের বড় কঠোর ভাবে চাপিয়া রাখে।"

অনেক বৎসর হইল বঙ্গদর্শনে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—

"যদি নিজ ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা হইলে অনেকটা সহজে হয়। তাহা না হইয়া এক অতি কঠিন অতি দূরবর্ত্তী জাতির ভাষায় আমরা শিক্ষা পাই। শুদ্ধ সেই ভাষাটী মোটামুটী শিখিতে রোজ চারি ঘণ্টা করিয়া অন্ততঃ আট দশ বৎসর লাগে। ভাষাশিক্ষাটী অথচ কিছুই নহে, ভাষা শিক্ষা কেবল অন্য ভাল জিনিস শিখিবার উপায় —উহাতে শিখিবার পথ পরিষ্কার হয় মাত্র সেই পথ পরিষ্কার হইতে এত সময় ব্যয় ও এত পরিশ্রম! তবুও কি সে ভাষা বুঝা যায়? তাহার যো কি?

* * * * *

ইংরেজি ভাষা শিক্ষা কর, ভাল করিয়া শিক্ষা কর। ইংরেজিতে আঁক কসিতে হইবে, ইতিহাস পড়িতে হইবে, বিজ্ঞান শিখিতে হইবে, ইহার অর্থ কি? বাঙ্গালা দিয়া ইংরেজি শিখ না কেন? ইংরেজি দিয়া শাস্ত্র শিখিতে যাও কেন? আরও অধিক দুঃখের কথা এই যে আমাদের সংস্কৃত শিখিতে হইলেও ইংরেজির মুখে শিখিতে হয়।"

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচয়িতা ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ একজন সুযোগ্য ব্যক্তি। তাঁহার কি অভিমত শ্রবণ করুন :—

"ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মূলহীন বৃক্ষের ন্যায়—যেন কতকগুলি কাটা ডাল মাটিতে পুতিয়া রাখা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কেবল জল ঢালিয়া কোনও মতে সেগুলিকে একটু বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। নতুবা এ মাটিতে তা বাঁচিত না।

বাহিরের জিনিষ বলিয়াই ইংরেজি ভাষার সব শিক্ষা দিতে হয়। বিদেশী ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিলে প্রকৃত শিক্ষালাভে কত বাধা হয়, তাহা ভারতীয় শিক্ষকগণই জানেন।"

আর একজন সুযোগ্য ব্যক্তির অভিমত শুনুন। ইহার শিক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। ইহার নাম সার হেন্‌রী ক্রেক্—

"প্রাচ্যকে পাশ্চাত্যের নকলনবীশ করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাদের দেশের জীবন ও ভাবপরম্পরার সঙ্গে তাহাদের শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা উচিত। আমরা ভারতবাসীকে একথা বুঝিতে দিব কেন যে ইংরেজি না শিখিলে উচ্চশিক্ষা অসম্ভব। যখন আমরা দেখিতে পাই, ভারতের প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সন্তানদের দেশীয় ভাষা শিখাইতে চান না, আমাদের তখন মনে করা উচিত ইহা আমাদের প্রদত্ত শিক্ষার গৌরব নহে, ব্যঙ্গ মাত্র।"

কিন্তু বিদেশীর নিকট ধার করা বাণী সংগ্রহ করিতে যাই কেন? আমাদের দেশের জন্য যাঁহারা ভাবেন, দেশকে যাঁহারা চিনেন, যাঁহারা দেশের অশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের ভাজন, তাঁহাদের মত ত শুনিলাম। যদি আরও অভিমত সংগ্রহ করিয়া পুঞ্জীকৃত পাহাড় রচনা করা দরকার হয়, তাহাও পারি। কিন্তু তাহাতে বিরত থাকিয়া কেবল আর একটিমাত্র অভিমত উদ্ধৃত করিব। কারণ আমার বিশ্বাস এ অভিমতের পর অন্ততঃ সাহিত্য-সম্মিলনে আর দ্বিমত হইবে না। এ অভিমত শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের— "বিদ্যালয়ের কাজে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা, তাতে দেখিয়াছি একদল ছেলে স্বভাবতই ভাষা শিক্ষায় অপটু। ইংরেজি ভাষা কায়দা করিতে না পারিয়া যদি বা তারা কোনও মতে এণ্ট্রেন্সের দেউড়িটা তরিয়া যায়—উপরের সিঁড়ী ভাঙ্গিবার বেলাতেই চিৎ হইয়া পড়ে।

এমনতর দুর্গতির অনেকগুলি কারণ আছে। একে ত যে ছেলের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, তার পক্ষে ইংরেজি ভাষার মত বালাই আর নাই। ও যেন বিলিতি তলোয়ারের খাপের মধ্যে দিশি খাঁড়া ভরিবার ব্যায়াম। তার পরে, গোড়ার দিকে ভাল শিক্ষকের কাছে ভাল নিয়মে ইংরেজি শিখিবার সুযোগ অল্প ছেলেরই হয়,—গরীবের ছেলের ত হয়ই না। তাই অনেক স্থলেই বিশল্যকরণীর পরিচয় ঘটে না বলিয়া আস্ত গন্ধমাদন বহিতে হয়;—ভাষা আয়ত্ত হয় না বলিয়া গোটা ইংরেজি বই মুখস্ত করা ছাড়া উপায় থাকে না। অসামান্য স্মৃতিশক্তির জোরে যে ভাগ্যবানেরা এমনতর কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড করিতে পারে, তাহা শেষ পর্য্যন্ত উদ্ধার

পাইয়া যায়—কিন্তু যাদের মেধা সাধারণ মানুষের মাপে প্রমাণসই, তাদের কাছে এতটা আশা করাই যায় না, তারা এই রুদ্ধ ভাষার ফাঁকের মধ্য দিয়া গলিয়া পার হইতেও পারে না, ডিঙাইয়া পার হওয়াও তাদের পক্ষে অসাধ্য। * * * ভালোমত ইংরেজি শিখিতে পারিল না এমন ঢের ঢের ভালো ছেলে বাঙ্গালা দেশে আছে। তাদের শিখিবার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমকে একেবারে গোড়ার দিকেই আটক করিয়া দিয়া দেশের শক্তির কি প্রভূত অপব্যয় করা হইতেছে না?"

আপত্তি উঠিবে যে বাঙ্গালা ভাষায় পাঠ্য পুস্তক কোথায় যে আমরা বাঙ্গালাকে শিক্ষার বাহন করিব। উত্তরে বলিতে চাই যে প্রবেশিকা ও আই, এ, পরীক্ষায় তোমরা ইতিহাস, ভূগোল, গণিত বিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল ইংরেজি কেতাব পড়াও, তাহার সমতুল্য গ্রন্থ বাঙ্গালাতে এখনই প্রচুর আছে রবীন্দ্রবাবু 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে এই আপত্তির যথেষ্ট খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার কথাগুলি শুনুন—

"আমি জানি তর্ক এই উঠিবে—তুমি বাংলা ভাষার যোগে উচ্চশিক্ষা দিতে চাও; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় উঁচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই? নাই সে কথা মানি, কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কি উপায়ে? শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে, সৌখীন লোকে সখ করিয়া তার কেয়ারী করিবে,—কিম্বা সে আগাছাও নয় যে, মাঠে বাটে নিজের পুলকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে। শিক্ষাকে যদি শিক্ষাগ্রন্থের জন্য বসিয়া থাকিতে হয় তবে পাতার যোগাড় আগে হওয়া চাই তার পরে গাছের পালা, এবং কূলের পথ চাহিয়া নদীকে মাথায় হাত দিয়া পড়িতে হইবে।"

বাঙ্গালার উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহির হইতেছে না এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয়, তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালার উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহাতে বাঙ্গালার জন্য যোগ্য স্থান নির্দিষ্ট হয় এবং প্রবেশিকা ও এফ, এ পরীক্ষায় যাহাতে ইতিহাস প্রভৃতির জ্ঞান বাঙ্গালার বাহনে বিতরিত হয়, তজ্জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন কতবার চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা বোধ হয় আপনাদের অবিদিত নাই। আপনাদের স্মরণ হইতে পারে যে, ১৩০১ বঙ্গাব্দে যখন শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন, সেই সময় সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতিকে লইয়া এই বিষয়ের উপায় বিধান জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। ঐ কমিটির আমিও একজন সদস্য ছিলাম। ঐ কমিটি অনেক আলোচনার পর নিম্নলিখিত মন্তব্যদ্বয় গ্রহণ করিয়াছিলেন :—

১। বিশ্ববিদ্যালয় এরূপ ব্যবস্থা করুন যে, এফ্ এ ও বি এ পরীক্ষায় যে সব ছাত্র কোনও প্রাচীন ভাষা গ্রহণ করিয়াছে, তাদের এমন একটি প্রশ্ন পত্র হইবে যে ইংরেজি হইতে দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিতে হইবে এবং মৌলিক রচনা লিখিতে হইবে। রচনার আদর্শ ভাষা কি হইবে তার জন্য পাঠ্য নির্দিষ্ট থাকিবে।

২। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ইতিহাস ভূগোল ও গণিতশাস্ত্রের প্রশ্নের উত্তর দেশীয় প্রচলিত ভাষায় ছাত্রেরা দিতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয় এরূপ ব্যবস্থা করুন।

* * * * *

বলা বাহুল্য যে এই উদ্যম সফল হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁহারা ঐ সময়ে হর্ত্তা কর্ত্তা ছিলেন, দ্বিতীয় প্রস্তাব তাঁহারা বিবেচনার অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। প্রথম প্রস্তাব সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদের পর মহাপ্রাজ্ঞ সেনেট-মণ্ডলী ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী এইরূপ স্থির করেন যে, এফ্ এ ও বিএর পরীক্ষার্থীদিগকে বাঙ্গালা রচনা সম্বন্ধে বিকল্প দেওয়া হউক এবং সুযোগ্য পরীক্ষার্থীদিগকে একখানা করিয়া সার্টিফিকেট দেওয়া হউক। ইহার কিছুদিন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবর্জ্জনা পরিষ্কার জন্য লর্ড কর্জ্জন সম্মার্জ্জনী হস্তে আসরে অবতীর্ণ হন। তিনি ইউনিভারসিটি কমিশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ১৯০২ সালে প্রকাশিত রিপোর্টের ৯৪-৯৫, প্যারায় দেশীয় ভাষাসমূহের প্রতি কিছু কৃপা-কটাক্ষ দৃষ্ট হইয়াছিল।"

* * * * ইহার পর ১৯০৪ সালের এক গবর্ণমেণ্ট মন্তব্যে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, ১৩ বৎসরের অনধিক বয়স্ক শিক্ষার্থীদিগকে ইংরাজিদ্বারা শিক্ষা দেওয়া অনুচিত এবং ইহাও বলা হয় যে প্রবেশিকা স্কুলের ছাত্রদিগকে মাতৃভাষা শিক্ষা হইতে একেবারে বঞ্চিত করা অনুচিত। বিস্ময়ের কথা নহে কি? এই স্বতঃসিদ্ধ কথা

গবর্ণমেণ্ট-মন্তব্যের দ্বারা প্রচারিত করিতে হইল। আমাদের দেশের অনেকই বিশেষত্ব, কিন্তু বোধ হয় সকলের চেয়ে বিশিষ্ট বিশেষত্ব ইহাই।

ইহার পর প্রধানতঃ সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় বাঙ্গালা ভাষার একটু বিশিষ্ট স্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণালীর এক কোণায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এখন প্রবেশিকা, এফ্ এ, বি এ পরীক্ষার্থী সকল বাঙ্গালী ছাত্রকে বাঙ্গালা রচনা বিষয়ে পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা হয়। এবং রচনার রীতি শিখাইবার জন্য models of style রূপে কয়েকখানি পুস্তকের নাম নির্দ্দেশ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে বাঙ্গালা কবিতার কোনও বই পাঠ্য পুস্তক হইতে পারে না। এমন কি বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যও কোন পরীক্ষার বা প্রশ্নপত্রের বিষয় হয় না। এ সম্বন্ধে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যাহা করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ। জানি লোহার বাসরঘরে ছুঁচ হইয়া ঢোকাও শক্ত; কিন্তু ইহাতে আমরা সন্তুষ্ট নহি। এ যেন বড় মানুষের ভোজের টেবিলে দরিদ্র আত্মীয়ের ধিক্কৃত কষ্টাসন। সেইজন্য আপনাদের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় বাঙ্গালার কথায় দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমি শুনিয়াছি, উদ্দেশ্য—শুধু বাঙ্গালা লিখিবার রীতি শিখান হইবে, আর কিছু হইবে না। এ কথা শুনিয়া আমি অবাক্ হইয়াছিলাম। বাঙ্গালা ভাষার যে অশেষ সম্পদ, তাহাতে কি বাঙ্গালী ছাত্রের কোন আবশ্যক নাই? বাঙ্গালা ভাষার যে অনন্ত সৌন্দর্য্য আছে, বাঙ্গালা সাহিত্যের যে একটা অতল প্রাণ আছে, সে কথা ভুলিয়া গিয়া কি আমাদের শিক্ষা-প্রণালী নির্দ্ধারিত করিতে হইবে? আমার বাঙ্গালা ভাষা যে রাজরাণী, আপনার গৌরবে সে যে গরবিণী। এই যে তোমরা বল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা প্রবেশ করিয়াছে, মনে রাখিও, তাহার যে নিজস্ব গৌরব, সে গৌরবে তাহাকে প্রবেশ করিতে দেও নাই, সামান্যা দাসীর মত তোমাদের এই কারখানার মধ্যে একটা কোণায় তাহাকে বসিবার ঠাঁই দিয়াছ মাত্র।

আমি জানি কেহ কেহ অল্পেই সন্তুষ্ট। তাঁহারা বলেন, "নেই মামার অপেক্ষা কাণা মামা ভাল। 'অল্পেই তুষ্ট হও বেশীর তৃষ্ণা ত্যাগ কর।" একথা কিন্তু দেশের শিক্ষা দীক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা কখনই অল্পে সন্তুষ্ট নই, অল্পে সন্তুষ্ট হইব না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বলিয়া গিয়াছেন—"ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।" আমরা ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া এখনও বলি "মারিত হাতী।" সেইজন্য দেখিতে পাই পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে সাহিত্য-সম্মিলন অল্পে তুষ্ট না হইয়া অধিক পাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বর্দ্ধমানে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য-বিবরণীতে দেখিলাম প্রায় সর্ব্বসম্মতি মতে নিম্নলিখিত মন্তব্যটি গৃহীত হইয়াছিল।—"বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের প্রসারের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে সকল বিধি-ব্যবস্থা হইয়াছে, তজ্জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন ধন্যবাদ জানাইতেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বিশ্বাস,—বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের যথাসম্ভব আরও প্রসার বৃদ্ধি হওয়া সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি আপাততঃ সত্বর অবলম্বন করিবার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করিতেছেন।

(ক) প্রবেশিকা হইতে বি এ শ্রেণী পর্য্যন্ত ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা-সাহিত্য পঠন-পাঠনের এবং ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষার পরীক্ষার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষারও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(খ) প্রবেশিকা ও ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ইংরাজি সাহিত্য ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে বাঙ্গালায় লিখিতে পারিবে।

(গ) অধ্যাপকগণ ইচ্ছা করিলে কলেজে বাঙ্গালা ভাষায় অধ্যাপনা করিতে পারিবেন।

(ঘ) বাঙ্গালা ভাষা ও তৎসংক্রান্ত ভাষাবিজ্ঞান এম এ পরীক্ষার অন্যতম বিষয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে। অন্যান্য প্রাকৃত-ভাষাও এই পরীক্ষার শিক্ষার বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঙ) দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করাইবারও সমস্ত বক্তৃতা গ্রন্থাকারে ছাপাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

সুখের বিষয় এ সম্বন্ধে রাজপুরুষদিগের সকরুণ দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে। বিগত আগষ্ট মাসে সিমলা-শৈলে

শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষগণের যে সম্মিলন হয়, সেই সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে আমাদের বড়লাট বাহাদুর লর্ড চেমস্‌ফোর্ড যাহা বলিয়াছেন,—তাহার মোট মর্ম্ম এই যে,—

'ইংরেজি ও দেশীয় ভাষা—উভয়ই শিক্ষার বাহন রূপে আমাদের স্কুল সমূহে প্রচলিত আছে। স্কুলের পাঠ্য ছাত্রদের পক্ষে সহজে আয়ত্ত করিবার পক্ষে কোনও বাহনের উপযোগিতা কিরূপ তাহা আমাদিগকে বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হইবে।'

বড়লাটের এই সকল বাণীতে উৎসাহিত হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রভৃতিকে লইয়া একটি শাখা-সমিতি গঠিত করেন। আমিও ঐ শাখা-সমিতির একজন সভ্য আছি। শাখা-সমিতির আলোচ্য বিষয় এই ছিল যে "উচ্চশিক্ষা বিস্তারের কোন প্রকার ক্ষতি না হয় অথচ বঙ্গভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা যাহাতে রীতিমত হয় এবং ক্রমে ক্রমে যাহাতে বঙ্গভাষা রীতিমত পুষ্টিলাভ করিয়া পরিণামে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা-প্রদানের উপযোগী হইতে পারে, ইহার জন্য আমাদের বর্ত্তমানে কি কর্ত্তব্য?" শাখা-সমিতি বহু আলোচনার পর যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন নিম্নে তাহা বিবৃত করিলাম :—

(১) শিক্ষা বিষয়ে বঙ্গভাষার উন্নতি ইংরেজী শিক্ষার বাধাজনক হইতে পারে এবং যে সকল বিষয়ে উচ্চ-শিক্ষা ইংরাজীতে লাভ করা যাইতেছে ও যাইতে পারে, সে সকল শিক্ষা সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ বাধা হইতে পারে—এ আশঙ্কা অমূলক।

(২) কি নিম্ন, কি উচ্চ সকল প্রকার শিক্ষাই যতদূর সাধ্য শিক্ষার্থীর মাতৃ-ভাষাতে দেওয়া উচিত। যতদূর দেখা যাইতেছে তাহাতে ইহা নিঃসন্দেহরূপে নির্দ্দেশ করা যায় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত ইংরাজী সাহিত্য ভিন্ন আর সকল বিষয়েই বাঙ্গালা ভাষাতে আবশ্যক গ্রন্থের কোন অভাব নাই এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর ভাষা-বিভ্রাটেরও আর কোন আশঙ্কা নাই। মধ্য (Intermediate) পরীক্ষাতেও অধিকাংশ বিষয়েরই আবশ্যক গ্রন্থের অভাব নাই। আর যে যে বিষয়ের গ্রন্থের অভাব আছে, তত্তদ্‌বিষয়ের গ্রন্থের অভাব অতি সহজেই পূরণ হইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সম্পূর্ণ বাঞ্ছনীয় এবং সে বাঞ্ছা পূর্ণ হইবার কোনও বাধা দেখা যায় না যে, বি এ, এম্ এ পরীক্ষার বিষয়ও একদিন বাঙ্গালা ভাষাতে বাঙ্গালী শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে। দুই বৎসর পরে হউক, আর ৫ বৎসর পরে হউক, বাঙ্গালা ভাষাতেই সমস্ত উচ্চশিক্ষার বিষয় অধীত হইবে—এই ঘোষণা কর্ত্তৃপক্ষ-কর্ত্তৃক একবার প্রচারিত হইলে অল্প দিনের মধ্যেই সুযোগ্য গ্রন্থকারের লিখিত নানা বিষয়ে সদ্‌গ্রন্থ প্রচুর পরিমাণে রচিত হইবে।

(৩) আর একটি বিষয়ে বক্তব্য এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষা কেবল রচনা শিক্ষার জন্য এক্ষণে পঠিত হয়। সে নিয়মের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য উভয় বিষয়ই পঠিত হয় ও উভয় বিষয়েই পরীক্ষা হয়, ইহা প্রয়োজনীয়।

(৪) এম্ এ পরীক্ষাতে প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্য বঙ্গভাষাতত্ত্ব এবং বঙ্গ-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস প্রভৃতি পরীক্ষার বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৫) বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিকল্পে আমাদের শেষ বক্তব্য এই যে, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উপযুক্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তি দ্বারা উচ্চশিক্ষা বিস্তারোপযোগী বক্তৃতা বঙ্গভাষায় প্রদানের প্রথা—যাহাতে আরও অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করে, ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

এ সম্পর্কে এই সাহিত্য-সম্মিলনের কিছু কর্ত্তব্য আছে কিনা, সমবেত সুধীবর্গ তাহার বিচার করিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত উপাধি বিতরণ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস্ চ্যান্সলার ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত Research বা অনুসন্ধান কার্য্য যে বাঙ্গালাতেই হওয়া উচিত এই সম্বন্ধে কয়েকটি যুক্তিযুক্ত কথার অবতারণা করিয়াছিলেন। সে কথাগুলি আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

"ভাষা সম্বন্ধে কঠিন বাধা যে দেশে আছে, সে দেশে মৌলিক গবেষণার কার্য্য বিস্তার লাভ করে না। তবে স্থায়ী ফলও বিশেষ কিছু হয় না। মৌলিক গবেষণার জন্য বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন আছে এবং বর্ত্তমানে যদিও তাহার ফল ইংরেজিতে প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু অন্যান্য বহু বিষয়ের শিক্ষা বিস্তারে দেশীয় ভাষার প্রয়োজন আমাদিগকে স্পষ্টভাবে অবিলম্বে স্বীকার করিয়া নিতে হইবে।"

সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর আমাদের গবর্ণর লর্ড রোণাল্ডসে মহোদয় বিস্ময় মুখে কয়েকটি আশার বাণী শুনাইয়াছেন।

"প্রথমেই আমাদের চক্ষে পড়ে যে ভারতে যে ভাষায় উচ্চ শিক্ষা প্রদত্ত হয়, তাহা ছাত্রদের মাতৃভাষা নহে। শিক্ষা কি ভাষায় হওয়া উচিত সে বিতর্কে আমি এখন প্রবেশ করিব না। পাশ্চাত্য শিক্ষায় বাহন ইংরেজিই হইবে ইহা মানিয়া নিয়া আমি প্রথমে অনুসন্ধান করি, ছাত্রদিগকে ভাল কার্য্যকর ইংরেজি শিক্ষা দিবার কি ব্যবস্থা আছে। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম সর্ব্ববাদী-সম্মত মত এই যে ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষা স্কুলে একেবারেই ভাল হয় না, যাহা শিখে, তার সাহায্যে কলেজের পাঠ্য ইংরেজি ভাষার অভ্যাস করা তাহাদের পক্ষে সুকর হয় না।"

শুনিতেছি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশোধনের জন্য যে কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে, আমাদের বিগত সম্মিলনের সভাপতি সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যাহার একজন প্রতাপী সভ্য—সেই কমিশন বাঙ্গালাকে শিক্ষার বাহন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। কমিশনের সদস্যদিগের মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, তাঁহাদের শিরে বিধাতার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক। আমরা তাঁহাদের আশাপথ চাহিয়া রহিলাম। কালিদাসের সময়ে আশা-বন্ধ কুসুমসদৃশ সদ্যঃপাতী প্রণয়ী হৃদয়কে বিপ্রয়োগে নিরুদ্ধ রাখিত। এখন ইহা দুঃশিক্ষা-পীড়িত সাতকোটী নরনারীর অবসন্ন হৃদয়কে সঞ্জীবিত করিবে।

শিক্ষালয় ও শিক্ষাপ্রণালী।

কিন্তু শুধু বাঙ্গালাকে শিক্ষার বাহন করিলেও চলিবে না—শিক্ষালয়গুলির আবহাওয়া বদ্‌লাইতে হইবে, শিক্ষা-প্রণালীর আমূল সংস্কার করিতে হইবে। এখনকার স্কুল-কলেজ নামধেয় বিদ্যাবিপণিগুলিকে বিদ্যামন্দিরে—অন্ততঃ বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে হইবে, এবং তাহার অঙ্গনে প্রাচীন ভারতের গুরুশিষ্যের মধুর সম্বন্ধের মিষ্ট বাতাস প্রবাহিত করিতে হইবে এবং শান্ত তপোবনের মুক্ত আকাশ বিলম্বিত করিতে হইবে। দেখুন, অশ্রদ্ধার দানে দাতা ও গৃহীতা—উভয়েই পতিত হয়। আমাদের ছাত্রেরা যে ইহাদের প্রদত্ত বিদ্যা গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, তাহার অন্যতম কারণ শিক্ষকের প্রতিকূল ভাব। পূর্ব্বকালে শিক্ষক সেবক ছিলেন—বিদ্যাকে সেবার ভাবে শ্রদ্ধার সহিত সম্ভ্রমের সহিত সুংযমের সহিত ভয়ের সহিত দান করিতেন। 'শ্রদ্ধয়া দেয়ং হ্রিয়া দেয়ং ভিয়া দেয়ং সংবিদা দেয়ং অশ্রদ্ধয়া ন দেয়ম্'। সেই জন্য বিদ্যা বিদিতা হইয়া ছাত্রকে গরীয়ান্ করিত।

আচার্য্যাদ্ধৈব বিদিতা বিদ্যা স্বাধিষ্ঠং গময়তি।

কিন্তু এখন? কদর্য্য দাতা যেমন অবজ্ঞার সহিত ভিক্ষুককে মুষ্টি ভিক্ষা দেয়, অনেক স্থলে বিদেশী অধ্যাপক তেমনি অবজ্ঞায় ছাত্রদিগকে বিদ্যার ক্ষুদ বিতরণ করেন। আমরা একজন অধ্যাপকের নিকট পড়িতাম। তিনি প্রকাণ্ড পণ্ডিত ছিলেন—কত বিদ্যা তাঁহার বিশোদরে নিহিত ছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু তিনি কোন দিন আমাদের মুখের দিকে তাকান নাই—তাঁহার চক্ষু সর্ব্বদা স্বীয় বুটের উপর সংলগ্ন থাকিত—কদাচিৎ কেতাবের উপর পড়িত—কিন্তু কোন কারণে কোনদিন আমাদের উপর পড়ে নাই। আমরা সে সময়ে রঘুবংশে বাল্মীকির তপোবন হইতে আনীতা সীতার বর্ণনা পড়িতাম—'কাষায় পরিবীতেন স্বপদার্পিতচক্ষুষা' এবং মনে মনে তাঁহার সহিত আমাদের অধ্যাপকের তুলনা করিতাম। ইনি যদিও 'কাষায়-পরিবীত' ছিলেন না, কিন্তু সর্ব্বদাই 'সপদার্পিতচক্ষু' থাকিতেন।

এই শ্রদ্ধার ও অশ্রদ্ধার দান লইয়া একবার দেবলোকে তুমুল কলহ হইয়াছিল। শ্রোত্রিয়ের অশ্রদ্ধার দান বড়, না পতিতের শ্রদ্ধার দান বড়। উভয় পক্ষের বক্তৃতার পর ভোট লওয়া হইল। দেখা গেল দুইদিকের ভোট-সংখ্যা সমান। তখন দেবলোকের সভাপতি প্রজাপতি ঠাকুর উঠিয়া বলিলেন, "মা কৃধ্বং বিষমং সমম্"। অসমান জিনিসকে সমান করিও না—কারণ, "শ্রদ্ধাপুতং বদান্যস্য হতমশ্রদ্ধয়েতরৎ।" পতিতের শ্রদ্ধাপূত দান শ্রোত্রিয়ের অশ্রদ্ধার দেওয়া হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ। আমরাও এই কথা বলি। আমরা দিগ্‌গজ পণ্ডিতের অশ্রদ্ধার বিদ্যা-বিতরণ চাই না, অপণ্ডিতের শ্রদ্ধা-পূত দানই আমাদের শিরোধার্য্য।

আরও দেখুন, প্রাচীনকালে গুরু চাহিতেন যে, যেমন দিক্ বিদিক্ হইতে নদনদী আসিয়া সমুদ্রে মিলিত হয়, সেইরূপ দশ দিক্ হইতে ব্রহ্মচারী আসিয়া তাঁহার আশ্রমে মিলিত হউক।

"যথাপঃ প্রবতা যন্তি যথা মাসা অহর্জরং
তথা মা ব্রহ্মচারিণঃ ধাতর্ আয়ান্তু সর্ব্বতঃ"

আমরা কিন্তু বিদেশী ভাষার এবং বিকট রেগুলেশনের লৌহময় প্রাচীর রচনা করিয়া শত প্রাকার বেষ্টনীর মধ্যে বিদ্যা-বধূকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছি। যদি কোনও দিগ্বিজয়ী বীর অন্তর্গৃহে প্রবেশ করিতে পারে, তবে সে হয় ত বিদ্যার চকিত চমৎকৃতি কোন দিন প্রত্যক্ষ করিবে।

এ দেশে যদি বিদ্যার প্রকৃত আবাদ করিয়া সোনা ফলাইতে হয়, এবং সেই সোনার অলঙ্কার রচনা করিয়া বঙ্গবাণীর বর অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করিতে হয়, তবে বর্ত্তমানে প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীর হাব-ভাব আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এবং ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে ইয়ুরোপের বিশেষত্ব-বর্জ্জিত হীন অনুকৃতি না করিয়া ইহাকে ভারতীয় বিদ্যা, ভারতীয় ভাব, ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান, ভারতীয় সাহিত্য ইতিহাস দর্শন চর্চ্চার কেন্দ্রস্থান করিতে হইবে। ইহার অর্থ এরূপ নয় যে, আমরা পাশ্চাত্য culture হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ও বিযুক্ত করিব। আমরা য়ুরোপের সাহিত্য, দর্শন, কলা-বিদ্যা, সমাজতত্ত্ব, শিক্ষাতত্ত্ব, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রভৃত পরিমাণে শিক্ষাও গ্রহণ করিব। কিন্তু পূর্ব্বকালে যেমন করিয়া গ্রীক্, হুন, শক, পহ্লব প্রভৃতিকে আপনাদিগের মধ্যে হজম করিয়াছিলাম, সেইরূপ পাশ্চাত্য বিদ্যা ও জ্ঞানকে গ্রাস করিয়া আত্মসাৎ করিয়া ফেলিব। তাহারা আমাদের 'ওদন' হইবে 'উপসেচন' হইবে, তাহারা এখনকার মত আমাদিগকে অভিভূত পরাভূত করিতে পারিবে না। ঐ সকল বিদ্যা ও কলাকে আমাদের ভারতী সরস্বতীর সাম্রাজ্ঞী হইতে দিব না, শুদ্ধদাসী করিয়া রাখিব।

এ সম্বন্ধে কয়েকজন অভিজ্ঞ ইংরাজের উক্তি ও উপদেশ আপনাদিগকে শুনাইতে চাই। আপনারা দেখিবেন যে, আমরা যাহা অবাধে উপেক্ষা করি, দূরদৃষ্টিশীল এই সকল বিদেশীয়েরা তাহাকে কি চক্ষে দেখে। প্রথম সার জর্জ বার্ডউড্-এর কথা শুনুন। তিনি অনেক দিন বোম্বাই প্রদেশে বাস করিয়াছিলেন, এবং ভারতীয় শিক্ষাদীক্ষার সহিত সুপরিচিত ছিলেন।——

"প্রথম কথা এই যে আপনাদের উচ্চশিক্ষার ভার ক্রমে আপনারা নিজেরাই গ্রহণ করুন। আধুনিক বিজ্ঞান ইয়োরোপের জিনিষ। সুতরাং বিজ্ঞান অনুশীলনের জন্ত আপনারা ইয়োরোপেরই অনুবর্ত্তন করিবেন। দেশের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার বিবেচনায় বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা নিম্ন মধ্য ও উচ্চশিক্ষায় যত আপনারা করিতে পারেন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কখনও হইবে না। কিন্তু সাহিত্য-কলা দর্শন ও ধর্ম্মের শিক্ষা—মোট নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানানুশীলন সম্বন্ধে ইহা বলা যায় যে ৪০০০ বৎসরের আর্য্য প্রভুত্বের যে ফল আপনাদের দেশে রহিয়াছে তাহা ত্যাগ করিবেন না। সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার প্রভাবকে প্রসারিত ও প্রবল করুন।"

ভূতের মুখেও রামনাম শুনিতে পারা যায়, এই নীতি অবলম্বন করিয়া বোম্বাইএর ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড সিডেনহাম—যিনি সম্প্রতি ইঙ্গ-ভারতীয় সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদের বিদেহমুক্তির ব্যবস্থা করিতেছেন—তাঁহার একটা উক্তি আপনাদিগকে শুনাইব।—

"শিক্ষার দ্বারা আমরা কোনও প্রাচীন জাতির বুদ্ধি—তাহাদের রুচি ও মত—বিদেশী আদর্শে ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারি না। সম্ভব হইলেও ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। কোনও জাতির পুরুষ-পরম্পরাগত প্রতিভা ও চিত্তের গতি কিরূপ, তাহার কোনও হিসাব না করিয়া কৃত্রিম উপায়ে তাহাদিগকে ভিন্ন পথাবলম্বী করিবার চেষ্টায় (Artificial conversion) সে জাতির অবনতি বই উন্নতি কখনও হয় না।"

এই উক্তির মধ্যে দুইটা খুব দরকারী শব্দ আছে—"Artificial Conversion"। আমাদের ছাত্রমণ্ডলীর যেটা বিশিষ্ট ব্যাধি—বিদ্যা-অজীর্ণ (mental dyspepsia) তাহার নিদান ঐখানে। যন্ত্রসিদ্ধ ভোজন দ্বারা একটা সমগ্র জাতিকে কখনও পীন ও পুষ্ট রাখা যায় না।

আর একজন অভিজ্ঞ ইংরেজের কথা শুনাইব—ভিনসেণ্ট স্মিথ। অন্য প্রসঙ্গে ইহার কথা একবার বলিয়াছি, তাঁহার কথাগুলি অতি সারগর্ভ এবং আমাদের সবিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয় কেন দেশের হৃদয়ে শিকড় পাতিয়া সজীব মহীরুহে পরিণত হইতেছে না, তাহার কারণ আমরা ভিনসেণ্ট স্মিথ মহোদয়ের কথার মধ্যে পাইয়াছি। গাছের ডাল কাটিয়া যদি উবর ভূমিতে প্রোথিত কর, তবে রাজকীয় জলসেক দ্বারাও তাহার কিছু বিকাশ হইবে কি?

"যখনই কোনও ভারতবাসী ছাত্রকে দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করিতে বলা হয়, তখন পাশ্চাত্য চিন্তার অজ্ঞাত আকারের দিকে তাঁহার মনকে জোর করিয়া নিবার চেষ্টা করা উচিত নয়। তাহাদের দেশের জ্ঞানিগণ যে দিকে যে ভাবে এই

সব তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছেন, সেই দিকে সেইভাবেই যাহাতে তাহারা দর্শন শাস্ত্রানুশীলনের সুযোগ পায় সেইরূপ ব্যবস্থাই করিতে হইবে। প্লেটো আরিষ্টটল্, কাণ্ট অপেক্ষা কোনও অংশে ইহারা হীন নহেন। শিক্ষার ব্যবস্থা এইরূপ হওয়াই উচিত যে প্রধানতঃ ছাত্রগণ ভারতের দর্শন শাস্ত্রানুশীলন করিবে। তুলনায় পার্থক্য বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই পাশ্চাত্য দর্শন মোটামুটি পড়িলে চলিবে। যতদূর জানি ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষাতেও মোটের উপর এই প্রণালী অবলম্বন করা উচিত। ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাশ্চত্যভাবের দিক হইতে নয়, প্রাচ্যভাবের দিক হইতেই অনুসন্ধান করিতে হইবে। বর্ত্তমান প্রচলিত প্রথার আমূল সংস্কার করিয়া এই নূতন প্রণালীর প্রবর্ত্তন অতি কঠিন। অধ্যাপকগণ সকলে পুরাতন নীতিতে অভ্যস্ত। কিন্তু হয়ত এমন শক্তিধর মহাপুরুষ কেহ জন্মিবেন যিনি এই শিক্ষার কঠোর পাশ হইতে মুক্ত, এবং যিনি বুঝিবেন, ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের চিন্তা জ্ঞান ও বিদ্যারই অভিব্যক্তি হইবে, নতুবা ইহার এ নামই [বৃ]থা। তিনিই ভারতে এমন উচ্চশিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রয়াস [প]াইবেন যাহাতে ভারতে প্রকৃত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।"

আমরা ঐরূপ শক্তিধর মহাপুরুষের আশাপথ চাহিয়া [আ]ছি—যাঁহার আগমনে ভারতবর্ষে প্রকৃত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং যিনি ভারতবাসীর স্থগিত [ভা]বধারা এবং স্তম্ভিত চিন্তাস্রোতকে আবার গতিদান করিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত উপাধি-বিতরণ উপলক্ষে রেক্টর মহোদয় লর্ড রোণাল্ডসে ইউনিভারসিটি কর্ত্তৃক [ভা]রতীয় দর্শনের বয়কট্ প্রসঙ্গে এরূপ কয়েকটি কথা বলিয়াছেলেন, যাহাতে আমাদের হৃদয়ে কিছু আশার সঞ্চার [হই]য়াছে।

"আমি অনেক কলেজ পরিদর্শন করিয়া দেখিলাম, দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলনই ছাত্ররা অধিক পছন্দ করেন। ইহাতে [আ]মি বিস্মিত হইলাম, কারণ ভারতের চিন্তা এইরূপ তত্ত্বালোচনার দিকেই চিরদিন আকৃষ্ট হইয়াছে। আমার বিস্ময়ের [কা]রণ এই যে, বি এ পরীক্ষায় পাঠ্য পর্য্যন্ত ভারতীয় দর্শনের [কো]নও স্থান নাই। এ পর্য্যন্ত কেবল পাশ্চাত্যের দর্শনই শিক্ষা [দে]ওয়া হয়। বি এ পাঠ্যের উপরে যারা যায় তারাই কেবল স্বদেশের চিন্তা ক্ষেত্র হইতে যে গভীর তত্ত্বজ্ঞানের উৎসসমূহ উৎসারিত হইয়াছে, তাহা পান করিবার সুযোগ কিছু পায়। সরলভাবে বলিতে গেলে, ইহা অপেক্ষা শিক্ষা-বিভ্রাট আর কিছু হইতে পারে না। ভারতবাসী ছাত্রেরা ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন পড়িয়া বাহির হইতেছে, অথচ তত্ত্বজ্ঞানে জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী শঙ্করের নাম তারা জানে না, বহুপ্রাচীন কালাগত ভারতের ন্যায়ের সূক্ষ্ম তর্কপ্রণালীর কিছুই তাহারা অবগত নয়। সত্যই, ইহা অপেক্ষা শিক্ষার প্রকাণ্ড বিভ্রাট (stupendous anomaly) আর কি হইতে পারে? ভারতের প্রতিভা হইতে প্রসূত ভারতের গভীর চিন্তাধারার আলোচনা করিয়া তাহাতে অধিকার লাভের পর অন্যদেশে চিন্তাধারার সঙ্গে ছাত্রগণ পরিচিত হইবে, এই ব্যবস্থাই স্বাভাবিক ব্যবস্থা। বিশ্ববিদ্যালয়ে এইরূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাইলেই আমি সুখী হইতাম।"

লর্ড রোণাল্ডসে যাহাকে stupendous anomaly বলিলেন আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই বিরাট বেঁথাপ্পাটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপুরুষদিগের চক্ষে এতদিন পড়ে নাই। একেই বলে চক্ষু থাকিতে অন্ধ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও রেক্টর মহোদয়ের উক্তিতে উৎসাহিত হইয়া কেহ কেহ আশা করিতেছেন যে, হয়ত এবার একটা কিছু সদুপায় হইবে। এই সকল উক্তি লক্ষ্য করিয়া ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয় সেদিন কলিকাতার এক সভায় বলিয়াছিলেন যে, ঐ দিন বোধ হয় অদূরবর্ত্তী, যে দিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় ভাবে ভাবিত হইবে, এবং জাতীয় সৌরভে বাসিত হইবে। বিধাতা সেই শুভদিন শীঘ্র আনয়ন করুন।

ইতিমধ্যে কিন্তু আমাদের কয়েকটি করণীয় আছে। সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিগত অধিবেশনে বলিয়াছিলেন যে,—"বঙ্গের যে অশিক্ষিত জনরাশি, তাহাদের মধ্যে যাহাতে শিক্ষার আলোকচ্ছটা নিপতিত হয়, উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত সুধীমণ্ডলীর পার্শ্বে যাহাতে বঙ্গের নিরক্ষর জনসঙ্ঘ আসিয়া অকুতোভয়ে ও অসঙ্কোচে দাঁড়াইতে পারে, তাহা যতদিন না করিতে পারিব ততদিন আমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।" এরূপ করিতে হইলে প্রথমেই আমাদের সাধু-ভাষা বনাম চলিত ভাষার বিবাদ মিটাইতে হইবে। আমরা "কোকিলকলালাপবাচাল যে মলয়াচলানিল সে

উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছনির্ঝরাম্ভঃকণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে—ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের এরূপ বাঙ্গালা চাই না—"আমি ল্যাণ্ডো গাড়ীতে ড্রাইভ করিতে করিতে হাওড়া ষ্টেসনে পৌছিয়া বেনারসের জন্য বুক করিলাম, ফাষ্ট ক্লাসে লোয়ার বার্থ ভেকাণ্ট ছিল না, আপর বার্থে বেডিংটা স্পেড করিয়া একটু সর্টন্যাপ দিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় হুইসিল দিয়া ট্রেণ ষ্টার্ট করিল—এইরূপ ইঙ্গ-বঙ্গীয় ভাষাও আমরা চাই না। এবং "মোরা হোলাম পত্তিবাসী, সারাখুত্তি যাওয়া আসা কত্তে লেগেচি, নুন না থাকিলে নুন চেয় অনিছি তেল পলাডা তেলপলাডাই আনলাম। ছেলেডা কান্দি নাগলো গুড় চেয়ে দেলাম;—বসিগার বাড়ী সাত পুরুষ থেয়ে মোরা আর ওনাদের খবর রাকি নে"—সাহিত্যের জন্য এইরূপ গ্রাম্যভাষাও চাই না। আমরা চাই এমন ভাষা, যাহা সাধু হইবে অথচ সরল হইবে, চলিত হইবে অথচ ইতর হইবে না। এই মধ্যপথ অবলম্বন করিলে কিরূপ হয়? এ সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বর্দ্ধমানে আমাদিগকে যাহা উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ রাখা ভাল। "দেশের লোকে যে সকল শব্দ বুঝে, অথচ সত্য সত্য ইতুরে কথা নয়, যে সকল কথা ভদ্রলোকের কাছে বলিতে আমরা লজ্জিত হই না, সেই সকল কথায় মনের ভাব ব্যক্ত করিলে লোকে সহজে বুঝিতে পারিবে, ভাষাও ভাল হইবে।" আর একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে এই ধরণের কথাই বলিয়াছিলেন। "সাহিত্যের ভাষা যেন কথোপকথনের ভাষা হইতে এমন দূরে সরিয়া না পড়ে যে সাহিত্যের সঙ্গে কথোপকথনের সম্পর্ক লোপ পায়। সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে কথোপকথনের ভাষার যত নৈকট্য থাকে, যত ঘনিষ্ঠতা থাকে, ততই ভাল; দুইএর অন্তর যত অধিক হয় ততই মন্দ। বিচ্ছেদ হইলে কেহ কাহারও উপকার করিতে পারে না; একই ভাষা ক্রমে দুইটি পৃথক্ ভাষা হইয়া দাঁড়াইতে পারে। তাহাতে কেবল যে ভাষার অনিষ্ট তাহা নহে, সমাজের বিশেষ অমঙ্গল ঘটিবার আশঙ্কা হয়।" ইন্দ্রনাথ বাবুর শেষ কথাটা মনে রাখিবার কথা। শিক্ষা ও সাহিত্যকে যদি লোকায়ত্ত করিতে হয়, তবে লিখিত ভাষা ও চলিত ভাষার মধ্যে একটা পৃথক প্রবাহ সৃষ্টি করিলে চলিবে না। এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বাকল্ সাহেব অনেক দিন হইল আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথার উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে বলিয়াছিলেন,—'মহামতি বাকল্ ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণ দেশের শিক্ষাবিস্তার তুলনা করিতে গিয়া দেখাইয়াছেন যে, জার্ম্মাণদেশে সর্ব্ববিদ্যায় অসামান্য প্রতিভাশালী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অথচ রাজনৈতিক উন্নতি বিষয়ে ইংলণ্ড অপেক্ষা পশ্চাৎপদ। ইহার কারণ এই যে, জর্ম্মাণদেশীয় পণ্ডিতগণ চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া এমন এক "পণ্ডিতী" ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাহা কেবল সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ; সে সমস্ত উচ্চভাব সমাজের নিম্নতম স্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে না। ইহার ফল এই হইয়াছে যে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায় ও জনসাধারণের মধ্যে একরূপ একটি অনতিক্রম্য প্রাচীর স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডে বহুকাল হইতে বিজ্ঞান-বিষয়ক সাধারণের বোধগম্য অনেক সরল পুস্তক প্রকাশিত হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে তাহার ভাব ও স্থূলমর্ম্ম প্রবেশ করিতে পারিয়াছে। এই প্রকার শ্রেণীগত পার্থক্য আমাদের অত্যধিক প্রবল।"

সঙ্গে সঙ্গে টোলের প্রচলিত সংস্কৃতশিক্ষার সঙ্গে বাঙ্গালার শিক্ষার মিশ্রণ ও মিলন করিতে হইবে। সংস্কৃত-শিক্ষিত পণ্ডিতমণ্ডলী যে নবীন জ্ঞানে বঞ্চিত থাকিবেন, এবং গরীয়সী বঙ্গবাণীকে তাঁহাদের বিমাতা ভাবিয়া বিমুখভাব অবলম্বন করিবেন, ইহা নিতান্ত ক্ষোভের কথা। আমরা জানি, তাঁহাদের মধ্যে কেহ সেদিনও বঙ্গভাষা যে ভাষা পদের বাচ্য নহে, তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য নব্য ন্যায়ের পাঁয়তারা করিয়াছেন। কিন্তু এমন পণ্ডিতও বিরল নহেন, যিনি সংস্কৃত ভারতীর সহিত মাতৃভাষারও পূজা করেন। আমরা চাই যে, টোলের সংস্কৃত-বিদ্যার্থীকে বাঙ্গালার সাহায্যে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি কিছু কিছু পড়ান হয়; এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের গদ্য পদ্যের অমৃতধারায় অভিষিক্ত হন। সংস্কৃতই তাঁহাদের তপস্যার নিধি থাকুক, কিন্তু তাঁহারা যেন দেশমাতৃকার সেবা হইতে একেবারে বঞ্চিত না হন।

পরিভাষা-সঙ্কলন।

সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যের প্রসার ও সমৃদ্ধির জন্ত আমাদিগকে নূতন শব্দ গড়িতে হইবে। বিশেষতঃ বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে। এ সম্বন্ধে সাহিত্য-সম্মিলন হইতে পূর্ব্বে পূর্ব্বে কতক চেষ্টা ও আয়োজন হইয়াছে। সেই আয়োজন এখন সম্পূর্ণ করিবার সময় আসিয়াছে। দর্শনের পরিভাষা-সঙ্কলন সম্বন্ধে আমি বর্দ্ধমান-সম্মিলনে যাহা বলিয়াছিলাম, সে সম্বন্ধে আপনাদের প্রণিধান প্রার্থনা করিতেছি। "যত দিন না বাঙ্গলা ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য-দর্শনের গঠন পাঠন সাধিত হইবে, ততদিন প্রকৃত দার্শনিক পরিভাষা সঙ্কলিত হইবার সম্ভাবনা অল্প। সজীব দর্শন-চর্চ্চা দেশমধ্যে প্রচলিত হইলে ভিন্ন ভিন্ন লেখক একই দার্শনিক তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন পরিভাষার প্রয়োগ করিবেন। সেই সকলের মধ্যে যাহা যোগ্যতম, তাহাই টিঁকিয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে বহু আয়াস ও সময় ব্যয় করিয়া সংস্কৃত দর্শন-সাহিত্যে ব্যবহৃতপারিভাষিক শব্দের সূচী সঙ্কলন করিতে হইবে। ইহা একের সাধ্য নহে, সমবেত চেষ্টা এবং যথেষ্ট সময় ব্যয় ভিন্ন এ কার্য্যে সফলতা হইবে না।"

দর্শন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলাম, বিজ্ঞান সম্বন্ধেও সেই কথা বক্তব্য। এই প্রসঙ্গে আমাদের লক্ষ্য করা উচিত যে, ইংরাজী শিক্ষিতেরা যখন প্রথম বাঙ্গালা লিখিতে সুরু করিলেন, তখন তাঁহারা সংস্কৃত দর্শনে, বিজ্ঞানে, কাব্যে, অলঙ্কারে, নীতি-শাস্ত্রে, কলা-শাস্ত্রে যে শব্দসম্পদ্ আছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া এবং তাহার সাহায্য না লইয়া মনগড়া কিম্ভুত-কিমাকার অনেকগুলি শব্দ রচনা করিলেন। ঐ সকল শব্দ বাঙ্গালীর মুখেও নাই, এবং সংস্কৃত অভিধানেও নাই? এবং ঐ সব কষ্ট-কল্পিত বাক্যই এখন বাঙ্গালা সাহিত্যে চলিত হইয়াছে। ঘরে টাকা থাকিতে ধার করা যেমন আহাম্মকী, এও সেইরূপ আহাম্মকী—কিন্তু যাহা হইয়াছে, তাহার উপায় নাই। এখন আমরা যে সকল পরিভাষা রচনা করিব তৎসম্বন্ধে যেন বাঙ্গালা ভাষার জাতি ও প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখি * এবং সংস্কৃত সাহিত্যের খনির মধ্যে যে সকল শব্দ-মণি প্রচ্ছন্ন আছে তাহার সন্ধান লই।

যশোলিপ্সা-সংযম।

এখনও দেশের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে নূতন আবিষ্কারী নূতন গবেষণার ফল ইংরাজী ভাষার সাহায্যে বিবৃত ও প্রচারিত করিলে শীঘ্র যশস্বী হওয়া যায়। এই ইংরাজির দ্বারে যশের লোভ আমাদের সংবরণ করিতে হইবে। দেখুন, আমাদের মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রও প্রথম জীবনে ইংরাজিতে রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে সকল রচনা আজ কোথায়? কোন্ বিস্মৃতির অতল তলে তলাইয়া গিয়াছে। আমাদের যে কিছু প্রতিভা, যাহা কিছু আলোচনা, অন্বেষণ, আবিষ্কার, সমস্তই বঙ্গবাণীর চরণ-সরোজে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হইবে। এ-সম্বন্ধে গত অধিবেশনে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ বলিয়াছিলেন। "কোন একটা নূতন কিছু আবিষ্কার করিলেই তাহা বিদেশীয় ভাষায় প্রথমতঃ প্রকাশ করিলে প্রচুর যশঃ অর্জ্জিত হইবে, এই প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে হইবে। আমাদের যাহা কিছু উত্তম, যাহা কিছু সৎ, উদার, অপূর্ব্ব ও অনুপম, তাহা বঙ্গ-ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করিব, বাঙ্গালার সম্পত্তি বাঙ্গালার মাতৃভাষারি ভাণ্ডারেই সঞ্চিত রাখিব, দেশের ধন স্বহস্তে দেশকে বঞ্চিত করিয়া বিদেশে বিলাইয়া দিব না, এমন করিয়া ধনের উপচয় করিব, বৃদ্ধি করিব, যাহাতে জলধির জলের ন্যায় আমার মাতৃভাষার ভাণ্ডারে সঞ্চিত ধনরাশি, যে যত পারে গ্রহণ করিলেও কদাচ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে না।"

আমরা চাই যে, গীতাঞ্জলির মত, চিত্রার মত বিষবৃক্ষের মত কাব্য, নাটক বাঙ্গালা হইতে ভাষান্তরিত হইবে। আমরা আরও চাই যে, আমাদের জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত মনীষীগণ তাঁহাদের মৌলিক চিন্তা মৌলিক গবেষণা বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত করিবেন, যেন বিদেশীয়েরা মধুলোলুপভৃঙ্গের মত ঐ সকল অমূল্য বস্তুর আহরণের জন্য বাধ্য হইয়া বঙ্গসাহিত্যের তপোবনে সমিৎ হস্তে উপসন্ন হয়।

উপসংহার।

বাঙ্গালী জাতির এমন দুর্দ্দশার দিন গিয়াছে, যখন বাঙ্গালা-দেশনায়কদিগকে বাধ্য হইয়া বঙ্গভাষার দ্রোহ করিতে হইত। আমি এক জনের কথা জানি, যিনি বঙ্গ-জননীর কৃতী সুসন্তান ছিলেন, অথচ ইংরেজমহলে পসারের জন্য তাঁহাকে বলিতে হইত যে, তিনি বাঙ্গালা জানেন না। কি শোচনীয় অবস্থা। অবশ্য যে সকল পদভ্রষ্ট খেতাঙ্গ

* শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরীর রাজসাহীতে পঠিত অভিভাষণ।

বিধাতার ভৌগোলিক ভ্রান্তির ফলে আমাদের এই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা কবি দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায়—'আমরা বাংলা গিয়েছি ভুলি, আমরা শিখেছি বিলিতি বুলি, আমরা চাকরকে ডাকি বেয়ারা, আর মুটেকে ডাকি কুলি—' যাঁহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ সধবার একাদশীতে নিমচাঁদ অনেক দিন হইল বলিয়া গিয়াছেন—I read English, write English, talk in English, speechify in in English, think English, dream in English, —(আমি ইংরেজি পড়ি, ইংরেজি লিখি, ইংরেজিতে কথা বলি, বক্তৃতা করি, ইংরাজিতে চিন্তাকরি, ইংরেজিতেই স্বপ্ন দেখি।)—বিধাতার আজব সৃষ্টি সেই সকল অদ্ভুত জীব দেশ হইতে বিলুপ্ত না হইলেও বিরল হইয়া আসিতেছে। তাঁহাদের সম্বন্ধে যত্ন করা সময়ের অপব্যয়। কিন্তু আমরা—যাহার বঙ্গবাণীর চিহ্নিত সেবক, আমরাও কি তাঁহার ভাবে মস্‌গুল, বিভোর হইতে পারিয়াছি? আমরা কি তাঁহার সেবায় সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে পারিয়াছি? এক কথায়, আমরা কি তাঁহাকে পরায়ণ করিতে পারিয়াছি? এখনও আমাদের সাহিত্য হইতে বিলাতীর বোট্‌কা গন্ধ গেল না! ১২৮৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গদর্শনের এক জন লেখক তাঁহার সহযোগীদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, যত দিন পর্য্যন্ত মনের মধ্যে ভাব ইংরাজীতে উদয় হয়, ততদিন যেন কেহ বাঙ্গালা লিখিতে না বসেন। বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যেন বাঙ্গালার ভাষা শিক্ষা করা হয়! এই অনুরোধ কি আমরা পালন করিয়াছি? পালন না করার ফল কিরূপ হইয়াছে? অনেক স্থলে বাঙ্গালার অর্থ করিতে হইলে ইংরাজীতে তর্জ্জমা করিয়া তবে বুঝিতে হয়। যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, তাঁহারা মূঢ়ের মত মূক থাকিয়া অগত্যা অবশেষে লেখকের জয়জয়কার করেন। * এইরূপ অঘটনঘটন সম্পাদন করিয়া আমরা কখনই একটা বিশ্ব-বিজয়ী সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে পারিব না। অথচ ঐরূপ সাহিত্য আমাদের গড়িয়া তুলিতেই হইবে, নতুবা আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের সমস্ত উদ্যম পণ্ড হইবে এবং আমাদের ভাষার নিয়তি ব্যর্থ হইবে। তাহা আমরা কখনই হইতে দিব না।

রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে আমরা ইংরাজি অথবা হিন্দী কিংবা ও উভয়েরই ব্যবহার করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনেও আমরা বাঙ্গালারই শরণাপন্ন হইব। ইংরাজি অথবা হিন্দী রাষ্ট্রীয় ভাষা হয় হউক, কিন্তু আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, ভাব অভাব, অনুসন্ধান আবিষ্কার, আলোচনা, আন্দোলন, সমস্তই বাঙ্গালাতে প্রচার করিব। আমাদের দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, কাব্য নাটক উপন্যাস, উপকথা—সমস্তই বাঙ্গালাতে প্রকাশ করিব। যে ভাষার উৎপত্তি সরিদ্বরা গঙ্গার ন্যায় উত্তুঙ্গ, যাহার প্রবাহ যমুনার ন্যায় নির্ম্মল, যে ভাষায় চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যে ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেব ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, যে ভাষায় কৃত্তিবাস কাশীদাস রামায়ণ মহাভারত রচনা করিয়াছেন, মুকুন্দরাম ঘনরাম যে ভাষার পল্লীকবি, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, কান্তকবি যাহার ধর্ম্ম-সঙ্গীত-রচয়িতা; ভাষার অবসাদ-সময়েও ভারতচন্দ্রের মত কবি, দাশুরায়ের মত পাঁচালীকর্ত্তা আবির্ভূত হইয়াছিলেন; যে ভাষায় মধুসূদন বজ্রনাদে মেঘনাদ শুনাইয়াছেন, হেমচন্দ্র উদাত্তস্বরে বৃত্রসংহার গাহিয়াছেন, নবীনচন্দ্র রৈবতক কুরুক্ষেত্র প্রভাসে চতুর্দ্দশ বর্ষ ধরিয়া কৃষ্ণলীলা ধ্যান করিয়াছেন; যে ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস আছে, রমেশচন্দ্রের শত 'বর্ষ' আছে, যে ভাষায় দিনবন্ধু, গিরীশচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষিরোদ প্রসাদ নাট্য কবি; যে ভাষায় রামমোহন বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমার গদ্যকর্ত্তা; কালীপ্রসন্ন, অক্ষয়চন্দ্র, চন্দ্রনাথ, গদ্য লেখক। যে ভাষায় হরপ্রসাদ রজনীকান্ত অক্ষয়কুমার নগেন্দ্রনাথ দিনেশচন্দ্র ইতিহাস-রচয়িতা, সে ভাষায় কালীবর দ্বিজেন্দ্রলাল চন্দ্রকান্ত দর্শন রচনা করিয়াছেন, যে ভাষায় দেবেন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্র শিশিরকুমার বিজয়কৃষ্ণ বিবেকানন্দ ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং যে ভাষায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অজেয় ও অমোঘ লেখনী চালনা করিয়াছেন—সেই ভাষা আমাদের মাতৃভাষা; এমন মায়ের গৌরবে আমরা কে না গৌরবিত, এমন মায়ের মহিমায় আমরা কে না মহীয়ান্? যারা এমন মায়ের সন্তান, তারা অজয় অমর অক্ষয়, তারা মৃত্যুঞ্জয়, তারা বিশ্বজয়ী। এমন মায়ের সেবায় কে না আপনাকে উৎসর্গ করিতে পারে?

আসুন, আমাদের আরাধ্যা, হৃদয়ের রাণী, বঙ্গবাণীর জয়-ধ্বনি করিয়া জীবন সার্থক করি—জয় বঙ্গবাণীর জয়!!

---

* ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বাঙ্গালাভাষার সংস্কার।

প্রিয়তম।

তুমি, দূর হ'তে আরো নিকট হয়েছ—প্রিয় হতে প্রিয়তম।
প্রসূনের মত মরম বুঝিয়া,
মু'খানি তোমার রয়েছে ফুটিয়া,
আঁখির পলকে পুলক তুলিছে তবরূপ অনুপম;
নীরব নিশীথে পাপিয়ার তানে,
ও স্বর লহরী ভেসে আসে প্রাণে,
হৃদয় বীণার তারটি ঘেরিয়া বলে মৃদু মনোরম।
তুমি, দূর হতে আরো নিকট হয়েছ—প্রিয় হতে প্রিয়তম।

তোমার দেহের পরশ পাইয়া,
সুরভি সমীর এসেছে ধাইয়া,
প্রতি লোমকূপে পরশন সুখ—শিহরণ অনুপম;
বরণ তোমার জোছনায় মিশি,
লুটিয়া পড়েছে উজলিয়া দিশি
ত্রিদিব সুষমা ধরায় এনেছে নিরমল নিরুপম।
তুমি, দূর হ'তে আরো নিকট হয়েছ—প্রিয় হতে প্রিয়তম॥

শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ।

কিসের টান।

বেলা তখন প্রায় ৮টা। বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় একটি যুবক ট্রাম হইতে নামিয়া বড় একটা বাড়ীর ফটকের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। যুবক ভিতরের দিকে একবার চাহিল, যেন কি প্রয়োজনে সেথায় যাইবে, অথচ কিছু সঙ্কোচ বোধও হইতেছিল।

ভস্ ভস্ শব্দে একখানি মোটর আসিয়াও ফটকের কাছে থামিল,—মোটর হইতে অতি পরিপাটি সাহেবী বেশে সজ্জিত গুম্ফ শ্মশ্রুমুণ্ডিত সুকান্ত ক্ষীণদেহ আর একটি যুবক নামিল,—মুখে সিগারেট, রমণী-সুলভ কোমল-কর-পল্লবে মিহি ছড়ি।

"আরে নীরু যে? হাঁহে, দাঁড়াও দাঁড়াও—শোন, কেমন আছ?"

মোটরাবতীর্ণ সুবেশ যুবক (নাম নীরেন্দ্র বা মিষ্টার এন্ বোস) ফিরিয়া মুখ তুলিয়া সম্মুখস্থ দীর্ঘকায় যুবকের পানে চাহিল। মুখে কেমন একটা অপ্রসন্ন বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ পাইল।

"কিহে চিন্তে পাচ্চনা নাকি? বটে!"

"কে—"

"বটে! সত্যিই চিন্তে পাচ্চ না! বেণুর এই হাতের কিল চড় গুলো—এরি মধ্যে ভুলে গেলে। কবছর বিলেতে ছিলে তা গায়ে ত এমন বাড়নি—দেখদিকি মনে পড়ে কিনা?"

হাসিতে হাসিতে বেণু নীরেন্দ্রের পিঠে একটি থাপড় দিল। থাপড়টি আদরের হইলেও তাহাতে জোর বেশ ছিল। নীরেন্দ্র একটু কাঁপিয়া উঠিল, মুখখানিও লাল হইল,—বেদনায় কি অপমানে তা ভাল বুঝা গেল না।—ধীরে ধীরে কহিল, "কে কে—বেণু? তাইত! আমি চিন্তে পারিনি—তুমি এত বড় হ'য়ে প'ড়েছ—"

"বড়? বটে! ছোট ছিলাম কবে?"

নীরেন্দ্র আমতা আমতা করিয়া কহিল, "পাঁচ ছয় বছর আগে দেখা—কবছরে আরও অনেকটা বেড়েছ বই কি? একেবারে যে প্রকাণ্ড পালোয়ানের মত হ'য়ে উঠেছ। মুখে অত বড় গোঁফ—হঠাৎ চিন্‌তে পারিনি, ভাল আছ্ ত? এখানে—"

"এখানে একটু কাজে এসেছি। তা তুমি এখানে—"

"আমি এখানে রোজই প্রায় আসি।"

"এঁরা—"

"এঁরা আমার বন্ধু।"

"বন্ধু! কে বন্ধু? ভুপেশবাবুর ছেলে বুঝি!"

"না, ভুপেশবাবুর বড় ছেলে বিলেতে,—আর ছেলেরা এখনও পড়ে। সে রকম কিছু নয়। তবে ভুপেশবাবুকে বন্ধু ব'লতে পারি। এদের পরিবারের সঙ্গে ঐকটা বন্ধুত্ব হয়ে গেছে।"

"বটে! তা বেশ হ'য়েছে, এই পুরোণো বন্ধুটির একটু উপকার কর না?"

"কি কত্তে হবে?"

"ভূপেশ বাবুর সঙ্গে একটু আলাপ করিয়ে দেবে।"

"ভূপেশবাবুর সঙ্গে? কেন, কিছু দরকার আছে তোমার?"

"দরকার আছে বই কি? নইলে গরীবের ছেলে আমি অত বড় একটা লোকের সঙ্গে কি ইয়ারকি ক'ত্তে যাব?"

"কি দরকার?"

"সে সব আমিই তাঁকে ব'লব. তুমি শুধু আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবে। তোমার পুরোণো বন্ধু ব'লে হয়ত—একটু খাতির করিবেন?"

নীরেন্দ্র একটু কি ভাবিয়া কহিল, "হুঁ,—তা তুমি এখন কি ক'চ্ছ?"

"কিছুই কচ্চি না। তবে কিছু ক'রব বলেই এসেছি।"

"কি ক'রবে?"

বেণুলাল উত্তর করিল, "তিনি তাঁর ছোট ছেলেদের জন্য একটি মাষ্টার চান—তাদের পড়াবে, ব্যায়াম শিখাবে, ঘুঁসোঘুসি শিখাবে, বাইক্ চড়া, ঘোড়ায় চড়া, গাড়ী হাঁকান এ সব—শেখাবে ইত্যাদি। বড়লোকের বাতিক কত রকমই হয়! তা আমি সব পা'রব। তাই একটা দরখাস্ত নিয়ে এসেছি।"

"ও তার ক্যাণ্ডিডেট্ তুমি! তা. তুমি কি বি এ পাশ করেছ?"

"না, বার কত ফেল ক'রেছি। বাবা মারা গেছেন, পড়া আর চলে না,—কিছু রোজগার করাও দরকার হ'য়েছে। তাই এখন কাজকর্ম্ম খুঁজ্ছি। সব স্কুলে বি এ পাশওয়ালাদের যে ঠেলাঠেলি,—১৫ টাকার একটা মাষ্টারীতেও তাদের ডিঙ্গিয়ে ঢুকতে পেলাম না। ইনি শুনেছি ৫০ টাকা মাইনে দেবেন--বাড়ীতে থেকে খাসা খাওয়াটাও পাওয়া যাবে।"

"ইনি যে গ্র্যাজুয়েট চান্!"

"পাবেন কোথায়? এসব খেলোয়াড়ী বিদ্যে কোথায় কোন্ গ্রাজুয়েটের আছে? তবে আমি নাকি নেহাৎ বয়াটে ছিলাম, পড়ার চাইতে খেলাগুলো তাই বেশী শিখেছি—"

"ছেলেদের পড়াতেও ত হবে। তাই বি এ পাশ করা মাষ্টারই তিনি চান—

"তা পাশ না ক'রে থাকি—কবার ফেল ক'রলাম ত? 'শতমারী ভবেৎ বৈদ্য।' কাঁচা কোন্ গ্রাজুয়েট্ ছেলে পড়াতে আমার চেয়ে ভাল পা'রবে? তারাই যে এক একটা কচি ছেলের মত। স্কুলে নিচের ক্লাসেও একদিন পড়াতে গেলে ভয়ে কাঁপতে থাকে। আর আমাকে দেও—ফার্ষ্ট ক্লাসের ছেলেগুলোকেও খাসা পড়িয়ে আস্‌ব,—কেউ ব'লতে পারবে না যে আমি এম এ পাশ করে আসিনি।"

নীরেন্দ্র একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া কহিল, "তবে বি, এ পাশ ক'ত্তে পারনি কেন?"

"কি জান নীরু, কেবল বাজে বই পড়ি, পড়ার বই ভাল লাগে না, আর নোট্‌গুলো লিখতেও ভাল লাগে না—মুখস্থও কত্তে পারি নে। তা যাগ্ গে—দেখা করি, তিনি ত কেবল থল্ থলে ননীগোপাল কি হেড়ো তালপাতার সিপাই গ্রাজুয়েট চান্ না? পাকা একজন এথ্‌লেটও হয়ত আমাকেই পছন্দ করতে পারেন।"

"তা বেশ ত, দেখা কর।"

"তাই কর্‌ব ব'লেইত এসেছি—তবে দৈবাৎ যদি তোমার সঙ্গেই দেখাই হল,—এ সুযোগটা ছাড়ি কেন? পরিচয় করিয়ে দিলে একটু সুবিধে নিশ্চয়ই হবে। হয় ত তোমার বন্ধু ব'লে ওই যে একটু খাক্‌তির ডিগ্রির অভাবে আছে, তা হয়ত মাপ করেই নেবেন।"

নীরেন্দ্র কহিল, "দেখ বেণু, আমার introduction—তার কি এমন দরকার আছে? তুমি আমার চেনা—শুধু এতেই কি ভূপেশ বাবু তোমাকে কাজ দেবেন?"

"শুধু চেনা—বল কি নীরু?"

"আর কি ব'লতে পারি? পাঁচ ছয় বছর তোমার সঙ্গে কোন্ পরিচয় নেই, তোমার সম্বন্ধে কিছু জানি না। conscientiously আর কি ব'লতে পারি?"

"বটে!—আচ্ছা, তুমি কিছু ব'লোনা তবে। নিজের পরিচয় নিজেই দেব।"

"তুমি কি এখনই ভূপেশবাবুর কাছে যাচ্ছ?"

"হাঁ!"

নীরেন্দ্র ঘড়ি দেখিয়া কহিল, "আমি আর তবে ওখানে এখন নাই বা গেলাম। আমার সাম্‌নে—"

বেণু হাসিয়া উঠিল,—কহিল, "নীরু, কোনও ভয় নেই,—তোমার সাম্‌নে আমার কোনও সঙ্কোচ হবে না। যদি ভয়

কর, তোমার বন্ধু ব'লে পরিচয় দিয়ে বড় লোক বন্ধুর সাম্‌নে তোমার লজ্জা দেব, সে ভয় মিথ্যে। তা আমি ক'র্‌বনা। কারণ, তাতে আমি নিজেই লজ্জা বোধ ক'র্‌ব।"

"না—না! তা ব'ল্‌ছিনে, তা বলছিনে, তবে—"

"তবে টবে কিছু বুঝিনে নীরু। সোজা কথাই ভাল। আমার কাজে আমি যাচ্ছি, তোমার কাজে ইচ্ছে হয় তুমি যাও, না হয় না যাও। আমার সঙ্গে তোমার—বন্ধুত্ব থাক্‌, পরিচয়ও যদি স্বীকার ক'ত্তে এখানে না চাও, বেশ, তাই হবে। আমিও চাইব না। বস্‌—ফুরিয়ে গেল। এখন তোমার কাজ তোমার, আমার কাজ আমার।"

এই বলিয়া বেণু দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

নীরেন্দ্র কহিল, "শোন বেণু, একটি কথা ব'ল্‌ছি—"

"কি?" বেণু ফিরিয়া দাঁড়াইল।

"তুমি আমার চেনা—এটা কিছু বেশী কথা নয়। তবে আমাদের বন্ধুত্ব—আমরা এখন বন্ধু, এটা তুমিও বলতে পার না, আমিও বলতে পারি না। যাই হোক, তুমি যা ব'ল্লে, let that be a bargain (সেইটেই আমাদের মধ্যে ঘরোয়া বন্দোবস্ত হ'ক)। সে 'বারগেন,' তুমি রাখ, আমি তোমাকে সাহায্য ক'র্‌ব—যাতে এই কাজটা তুমি পেতে পার।"

বেণু আবার হাসিয়া উঠিল। কহিল, "নীরু, কোনও 'বারগেন' তোমার সঙ্গে ক'ত্তে চাইনে। তোমার কোনও সাহায্যও চাইনে। তবে বন্ধুত্ব কি পরিচয়ের কথা? তুমি ইচ্ছে কর না—আমিও ইচ্ছে করি না। বস্‌! আর কেন? সময় আর নেই, আমি এখন যাই।"

এই বলিয়া বেণু ভিতরে প্রবেশ করিল। নীরেন্দ্র দাঁড়াইয়া একটু কি ভাবিল। তারপর মোটরে গিয়া উঠিল।

মোটর নীরেন্দ্রের গৃহাভিমুখে ছুটিল।

ফটকের কাছেই উপরের একটি ঘরের খোলা জানালার কাছে, একটি যুবতী দাঁড়াইয়া স্থিরদৃষ্টিতে ইহাদের দিকে চাহিয়াছিল। ভিতরে ঢুকিতেই বেণু দৈবাৎ উপরের দিকে একবার চাহিল। যুবতী ত্রস্ত সরিয়া গেল। কে এ যুবতী? ইহাদের কথাবার্ত্তা সব শুনিয়াছে কি?

(২)

দ্বারের কাছে দারোয়ান তখন ছিল না। ভিতরে গিয়া বারান্দায় উঠিতেই বেয়ারা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। বেণু আবেদনখানি হাতে দিয়া একটু চিরকুটে লিখিল—আবেদনকারী সাক্ষাতের আদেশ অপেক্ষা করিতেছে।

বেয়ারা বেণুকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া আবেদন ও চিরকুট লইয়া ভিতরে গেল।

বেণু হাতের ছড়ীগাছটি যথাস্থানে রাখিয়া একখানি চেয়ারে বসিল,—সম্মুখে বড় একখানি আয়না ছিল, বেণু সেই আয়নার দিকে চাহিল, রুমাল বাহির করিয়া মুখখানি পুছিল, চুলগুলি একটু হাতে চাপিয়া ঠিক করিয়া নিল, গোঁফে একটু চাড়া দিল, উড়ুনীটি ঝাড়িয়া একটু গুছাইয়া গায়ে ঠিক করিয়া দিল। কারও বাড়ীতে দেখা করিতে গিয়া, সম্মুখে কোনও আরসীতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিলে, যুবার ত কথাই নাই, বৃদ্ধই বা কে আছেন, বেশ-বিন্যাসের এইটুকু প্রসাধন না করিয়া নেন? বেণু আরও বড়লোকের বাড়ীতে চাকরীর উমেদার হইয়া আসিয়াছে। উমেদারকে একটু পরিপাটিভাবেই কর্ত্তার কাছে উপস্থিত হইতে হয়। অপারিপাট্য বা অপরিচ্ছন্নতা শিথিল বিশৃঙ্খল চরিত্রের পরিচায়ক,—এরূপ উমেদারের প্রতি প্রথম দৃষ্টিতেই লোকের একটা অবজ্ঞা জন্মে। কাজে লোকে সুশৃঙ্খল পটু লোক চায়। তাহাতে হীন দেখিলে, কেবল দরিদ্র বলিয়া দয়া করিয়া কেহ লোক নেয় না। আর দরিদ্র হইলে যে অপরিচ্ছন্ন হইতেই হইবে, এমন কথাও কিছু নাই। সেরূপ দরিদ্রকে দয়া করিয়া লোকে কিছু ভিক্ষা দিতে পারে,—কাজের মত কাজ সহজে দেয় না।

বেয়ারা আসিয়া বেণুকে সেলাম করিল। তার নির্দ্দেশ মত বেণু ভিতরে একটি সুসজ্জিত কামরায় প্রবেশ করিল,—এটি ভূপেশ বাবুর খাসকামরা,—গুরু কোনও কার্য্যে কাহারও সঙ্গে আলাপের প্রয়োজন হইলে এইঘরেই তিনি তাহাকে লইয়া বসিতেন।

বেণু অগ্রসর হইয়া নমস্কার করিল। ভূপেশ বাবু উঠিয়া তাহার করমর্দ্দন করিয়া বসিতে বলিলেন। ভূপেশবাবু আসন গ্রহণ করিলে বেণুও সম্মুখের একখানি চেয়ারে বসিল।

"আপনার নাম বেণুলাল চৌধুরী?"

বেণু উত্তর করিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

ভূপেশবাবু কিছুকাল বেণুর দিকে চাহিয়া রহিলেন। যুবকটির বেশ চেহারা, দেহের গঠন বেশ শক্তিমান বলিষ্ঠ

পুরুষের মত, মুখের ভাবে ও চোকের দৃষ্টিতেও বেশ সুচতুর সপ্রতিভ লোক বলিয়াই ইহাকে মনে হয়।

চাহিয়া চাহিয়া ভূপেশবাবু বলিলেন, "আপনার—চেহারাটি বেশ বটে।"

চেহারা বেশ! বলে কি? জামাই হ'তে ত আসিনি? তবে কি আমায় ঘোড়া কিনতে চায় নাকি? মনে মনে এই টিপ্পনী করিয়া বেণু সবিনয়ে কহিল, "আজ্ঞে চেহারা যাই হ'ক, কাজ যদি ক'রতে পারি,—"

ভূপেশবাবু কহিলেন, "হাঁ, সেই কাজের কথা ভেবেই আমি বলছি। আমি একজন এথ্লেট্ টিউটরই চেয়েছিলাম,—চেহারায় আপনাকে বেশ এথ্লেট ব'লেই মনে হচ্চে।"

"আজ্ঞে ছেলেবেলা থেকেই জিম্‌ন্যাষ্টিক করবার বাতিক আছে, খেলাটেলাও সব রকম ক'রে থাকি।"

"ঘোড়ায় চড়ার অভ্যাস কেমন আছে?"

"আজ্ঞে, নিজের ঘোড়া নেই,—তবে ঘোড়া পেলেই চড়ি, তা সে পাড়াগাঁয়ের মেঠো ঘোড়াই হ'ক, আর সহরের তেজী ওয়েলারই হ'ক।"

"বাইক?"

"বাইক নিজেরই আছে।"

"গাড়ী হাঁকান কখনও হ'য়েছে?"

"আজ্ঞে, হ'য়েছে। আমার এক মামাত ভাই ইঞ্জিনিয়ার,—তাঁর ওখানে প্রায়ই যাই, আর তাঁর টম টম হাঁকাই।—"

"মোটর?"

"ঐটি শিখতে হবে। এদ্দিন সুযোগ হয়নি। দু'তিন দিন ধ'রে এক টেক্সিওয়ালার সঙ্গে জুটে একটু একটু অভ্যাস ক'চ্চি।"

"আমার এই বিজ্ঞাপন দেখে?"

"আজ্ঞে হাঁ।—তা একসপ্তা সময় পেলে বেশ শিখে নিতে পারব। আপনার ত মোটর আছে? যদি সুযোগ পাই, তবে এইখেনেই শিখে নেব।"

ভূপেশবাবু কহিলেন, "ছেলেদের পড়াতেও হবে। আপনি ত গ্রাজুয়েট নন?"

"আজ্ঞে, না।"—

"কোথাও মাষ্টারী ক'রেছেন?"

"সে না করবার মত। আপনাদের গাঁয়ের ইস্কুলে মাষ্টার মশাইরা কেউ কখনও ছুটি নিলে, তাঁদের যায়গায় মাঝে মাঝে পড়িয়েছি,—এই মাত্র।"

"তা হ'লে ছেলে পড়াবার অভ্যাস কিছু নেই?"

"বাঁধা অভ্যাস কিছু হয়নি। তবে, আমি—কাজকর্ম্ম কিছু না থাকায় আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতে খুব বেড়াই। যেখানেই যখন থাকি, ছেলেপিলেদের ধ'রে পড়াই। তারাও আমার কাছে প'ড়তে চায়।"

"হুঁ!—আমি একজন গ্রাজুয়েটও চেয়েছিলাম। আপনি—"

"গ্রাজুয়েট নই। তবে বারকতক ফেলকরা বি এ, যদিও বার বার ফেল্ করাটা যোগ্যতার পরিচয় কিছু নয়। তবে কলেজে অনেকদিন প'ড়েছি বটে,—পরীক্ষাও অনেক দিয়েছি। তা, গ্রাজুয়েট নইলে কি আপনার চ'লবে না?"

"চ'লবে না এমন কথা ব'লতে পারি না। অভিজ্ঞতা থাক্‌লে, আণ্ডারগ্রাজুয়েটও কাঁচা গ্রাজুয়েটের চাইতে অনেক সময় ভাল হয় দেখা যায়।"

বেণু সহজভাবে উত্তর করিল, "আজ্ঞে, আমি কাঁচা-গ্রাজুয়েট নই,—তবে পাকা আণ্ডারগ্রাজুয়েট বটি।—আপনি কদিন দেখ্‌তে পারেন, আমি কেমন পড়াই, ছেলেরা খুসী হ'য়ে আমার কাছে পড়ে কি না। আপনার আপত্তি না থাক্‌লে এ পরীক্ষায় আমি প্রস্তুত আছি।"

ভূপেশবাবু একটু ভাবিয়া কহিলেন, "আপনার কোনও টেষ্টিমোনিয়াল্ আছে?"

"কিসের টেষ্টিমোনিয়াল? আমি যে কবার বি এ ফেল ক'রেছি—"

"না, তার কোনও টেষ্টিমোনিয়াল চাই না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কে কতদূর পড়েছে, তা কেউ ফাঁকি দিতে পারে না। তবে—অন্য যে সব যোগ্যতা আমি চাই—"

বেণু বলিয়া উঠিল, "আজ্ঞে, তাতে ফাঁকি দেওয়া আরও শক্ত। সে ফাঁকি একদিনেই ধরা পড়ে। আপনি টেষ্টিমোনিয়ালের কথা ব'লছেন, সবচেয়ে বেশী ফাঁকি ওতেই চলে। আমাদের দেশে যে কেউ কোনও টেষ্টিমোনিয়াল এনে উপস্থিত ক'ত্তে পারে।"

"তা কতকটা ঠিক বটে।"

বেণু কহিল, "এ সব কাজ আমি কোথাও করিনি,—টেষ্টিমোনিয়ালও নাই। আর, আমি ব্যায়ামে পটু কিনা,

ঘোড়ায় চড়তে বাইক চালাতে গাড়ী হাঁকাতে জানি কিনা, তা কি কোনও টেষ্টিমোনিয়ালে প্রমাণ ক'রতে পারবে? — আপনি অনুমতি করেন, আমি এখনই দেখাতে পারি, আমি এসব ভাল জানি কিনা।"

ভূপেশবাবু কহিলেন, "সে বেশ দেখে নিতে পারব,— তবে এবেলা সময় নেই, নটা বেজে গেল।—তা আপনি প্রবেশনে (পরীক্ষার কড়ারে) কাজ কত্তে রাজি আছেন?"

"হাঁ, সচ্ছন্দে আছি। একহপ্তা কাজ করি, মাইনে পাইনে,—আমার কাজে যদি আপনি সুখী হন, স্থায়ীভাবে রাখবেন। না হন, বিদায় ক'রে দেবেন।"

"আচ্ছা, তাই তবে কথা রইল। আপনাকে এখানেই ছেলেদের নিয়ে থাকতে হবে। কবে আপনার আসবার সুবিধে হবে?"

"যেদিন বলেন, আসতে পারি?"

"আচ্ছা, কাল সকালেই তবে আসবেন। মাইনে কেন পাবে না? যে কদিন কাজ ক'রবেন—শেষে যদি থাকা না-ও হয়—তার পুরো মাইনে আপনি পাবেন।"

"যে আজ্ঞে।—তবে উঠি আজকে, কাল সকালে আসব।" এই বলিয়া বেণু নমস্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ভূপেশবাবুও আসন হইতে উঠিয়া আদরে তার করমর্দ্দন করিতে করিতে কহিলেন, "বরং ওবেলায় সন্ধ্যের পরই আসবেন—কাল সকাল থেকেই কাজ আরম্ভ ক'রবেন। একটা রুটিন আপনি ক'রে রাখবেন, রাত্তিরে দেখব।"

"যে আজ্ঞে, তাই আসব,—নমস্কার!"

বেণু বিদায় হইল। বেণুর সরল ও সপ্রতিভ কথাবার্ত্তায় এবং ব্যবহারে ভূপেশবাবু বড় সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার মন মনে হইল, এই যুবকের শিক্ষাধীনে ছেলেগুলি মানুষ হবে। এক্কে মানুষ বলা যায়, পুরুষ বলা যায়,—শিক্ষক সব এই রকম হয়, তবেই দেশের ছেলেগুলা মানুষ হইয়া উঠিতে পারে।

বেণুও বড় খুসী হইয়া আসিল। তার মনে হইল, ও ইঁহার বাড়ীতে থাকিয়া তাকে চাকরী করিতে হইবে, তার অসম্মান কিছু হইবে না। একেবারে বড়লোকের বাড়ীর 'ম্যাষ্টার' হইয়া সে থাকিবে না।

(৩)

সন্ধ্যার পরেই বেণু তার তোরঙ্গটি, আর দুই একটি পুঁটলী লইয়া ভূপেশবাবুর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বেহারা তাকে তার নির্দ্দিষ্ট ঘরে নিয়া গিয়া আলোটি টিপিল, পাখা খুলিয়া দিল,—তোরঙ্গ ও পুঁটুলী যথাস্থানে রাখিল। বেণু একখানি চেয়ারে বসিল। উপরে তখন বড় মধুর নারীকণ্ঠে কে গাহিতেছিল। গানটি ও সুরটি তার বড় মিঠা লাগিল। বাঃ! এমন গান যদি সন্ধ্যায় দুই একটি শোনা যায়, তবে মাহিনা কিছু না পাইলেও এ বাড়ীতে চাকরী করা পোষায়! তবে কিনা মাহিনাটা তার নিতান্তই চাই,—সঙ্গীত কাণে যতই সুধাবর্ষণ করুক, অন্নবস্ত্রাদি স্থূল পার্থিব অভাবগুলি একেবারেই পূর্ণ করে না। বেণু একটি নিশ্বাস ছাড়িল।

মাষ্টার আসিয়াছেন শুনিয়া ছেলেরা ছুটিয়া আসিল। সুন্দর চাঁদের মত তিনটি ছেলে—বয়স নয় দশ হইতে চৌদ্দ পনর বৎসরের মধ্যে,—মুখভরা হাসি, সরল মিষ্টভাষী, নাম প্রশান্ত, সুশান্ত, আর সুকান্ত। ছোট একটি মেয়েও আসিল—নাম উর্ম্মিলা—সংক্ষেপে উর্মি।

সকলে আসিয়া বেণুকে হাসিমুখে নমস্কার করিল,— বেণুও সকলকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া হাসিমুখে আশীর্ব্বাদ করিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ছেলেমেয়েগুলির সঙ্গে বেণুর যেন বেশ ভাব হইয়া গেল।

উর্মি ছুটিয়া উপরে গেল,—সিঁড়ি হইতে ডাকিতে আরম্ভ করিল, "দিদি! দিদি! মাষ্টারবাবু এসেছেন।"

সঙ্গীত বন্ধ হইল,—বেণু বুঝিল, ইহাদের দিদিই গান করিতেছিলেন। একটু পরেই পরদা সরাইয়া উর্মির হাত ধরিয়া একটি যুবতী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল।

ছেলেরা কহিল, "এই যে দিদি!"

উর্মি কহিল, "এই যে দিদি এয়েচে মাষ্টারমশাই,— আমি উর্ম্মিলা আর আমার দিদি সীতা। দিদির বর হবে রাম, আমার বর হবে লক্ষ্মণ। তা নীরুদা মোটেই রামের মত দেখতে নয়,—হাঁ, সেই শিবের ধনুক আর তাকে ভাঙ্গতে হয় না"—

একটু ভ্রূকুটি করিয়া সীতা উর্মিকে পর্দ্দার বাহিরে ঠেলিয়া দিল, কিন্তু উর্মি আবার আসিয়া দাঁড়াইল। বেণু দেখিল, এই যুবতীকেই সে সকালে জানালায় দেখিয়াছিল।— লজ্জায় তার মুখখানি লাল হইয়া উঠিল,—ত্রস্তে উঠিয়া সে সীতাকে নমস্কার করিল, সীতাও সলজ্জভাবে প্রতিনমস্কার

করিয়া কহিল, "বসুন আপনি,—বাবা এখনও আসেননি, এখনই আসবেন।"

বেণু উত্তর করিল, "তা যখনই আসুন,—ছেলেরা আছে, ওদের সঙ্গে বেশ গল্প ক'চ্চি,—কোনও অসুবিধা হবে না।"

সীতা কহিল, "ওই পাশের ঘরে জল আছে, আপনি কাপড়চোপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে আসুন,—আমি খাবার নিয়ে আসছি।"

বেণু উত্তর করিল, "খাবার আর এখন কেন?"

সীতা কহিল, "এখন মোটে সাড়ে সাতটা। রাত্তিরে খেতে প্রায় ১০টা হবে। কদ্দূর থেকে এসেছেন, খাবার কিছু খাবেন বই কি? আপনি চা খান ত?"

বেণু হাসিয়া কহিল, "পেলে খাই, তবে বাঁধা অভ্যেস কিছু নাই। ওসব হাঙ্গামা কিছু ক'রবেন না। যদি কিছু খেতেই হয়, যা হয় কিছু পাঠিয়ে দিন, চা নাই হ'ল।"

"যদি খান, কেন হবে না? এক কাপ চা দিতে হাঙ্গামা কিছু হবে না। আপনি যান, কাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে আসুন,—আমি খাবার নিয়ে আসছি।"

এই বলিয়া সীতা বাহিরে চলিয়া গেল। বেণু জুতা ও জামা ছাড়িয়া গামছাখানি লইয়া বাথ রুমের দিকে চলিল।

সুকান্ত বলিয়া উঠিল, "গেঞ্জিটাও ছেড়ে ফেলুননা মাষ্টারমশাই,—আপনার মাছেল (muscle) কেমন দেখি—"

বেণু হাসিয়া কহিল, "পাগল! একেবারে খালি গা কি ক'ত্তে আছে? তোমাদের হ'ল সাহেব বাড়ী।"

সুশান্ত কহিল, "সাহেব বাড়ী! সাহেববাড়ী কেন হবে মাষ্টারমশাই? আমরা যে বাঙ্গালী—"

বেণু হাসিয়া কহিল, "সাহেব-বাঙ্গালী,—আমাদের গেঁয়ে বাঙ্গলা-বাঙ্গালী নয়।"

ছেলেরা খুব হাসিয়া উঠিল। প্রশান্ত কহিল, "না মাষ্টারমশাই, আমরা একেবারে সাহেব-বাঙ্গালী নই,—বাবা ত বাড়ীতে খালিগায়ে থাকেন—চাপকান প'রে কোর্টে যান—"

বেণু কহিল, "তা হ'লেও আমার খালিগায়ে থাকাটা অসভ্যের মতই হবে। নয় কি?"

সুকান্ত কহিল, "খালি গায়ে একেবারে কেন থাকবেন? তবে কিনা—এখন গাটা খুলে দিন—আমরা আপনার মাছেল দেখি। বাবা যে বলেন, আমাদের খুব মাছেল হ'তে হবে।"

সুশান্ত কহিল, "তাই ত—আপনার মাছেল দেখলে আমরা বুঝব কেমন মাছেল আমাদের হ'তে হবে। বাবা ব'লেছেন, আপনি খুব জোয়ান।"

বেণু অগত্যা গেঞ্জিটি খুলিয়া ফেলিল।—তাহার বিশাল পেশল বক্ষ, দৃঢ় পেশল বাহু, সুগঠিত স্কন্ধ দেখিয়া ছেলেরা বড় আনন্দিত হইল,—বেণুকে ঘিরিয়া তার গা টিপিয়া টিপিয়া, কোথাও এক আধটা থাপড় দিয়া দেখিতে লাগিল।

"বাঃ! খাসা মাছেল! হাঁ, মাষ্টারমশাই, আপনি কি রামমূর্ত্তির মত জোয়ান হবেন? মোটর ধ'রে রাখতে পারেন? বুকে হাতী তুলতে পারেন?"

"বাবাঃ! রামমূর্ত্তির মত জোয়ান হ'লে আর ভাবনা ছিল কি? এক বছরেই যে একেবারে বড়মানুষ হ'য়ে যেতাম। অনেক টাকা হ'ত,—অনায়াসে যুদ্ধে চ'লে যেতে পারতাম।"

"যুদ্ধে! যুদ্ধে যেতে কি টাকা লাগে? টাকা যে আরও পাওয়া যায়!"

সুকান্ত বেণুকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "না মাষ্টার মশাই, আপনি যুদ্ধে চ'লে যাবেন না। তা হ'লে আমাদের সব শেখাবে টেকাবে কে? মাছেল হবে কি ক'রে?"

"নারে পাগল! যুদ্ধে যদি যেতে পাত্তাম—এদ্দিন চ'লে যেতাম। তবে টাকা নাই—"

প্রশান্ত কহিল, "যুদ্ধে যেতে টাকা কেন লাগবে মাষ্টারমশাই? খরচ পত্তর ত গবর্ণমেণ্টই দেবে?"

"আমার খরচ পত্তর শুধু দেবে, আর কারওটা ত দেবে না? বাড়ীতে মা আছেন, ছোট ভাই আছে, একটি বোন আছে বিয়ে হয়নি,—"

"ও—তা এগার টাকা মোটে মাইনে দেবে—এতে চ'লবে কেন?"

সুশান্ত কহিল, "আরও যে যুদ্ধ, ম'রে গেলে ত সেই এগার টাকাও পাওয়া যাবে না—"

সুকান্ত বলিয়া উঠিল, "না মাষ্টারমশাই, আপনি ম'রবেন না। যুদ্ধে গিয়ে কাজ নেই—গেলেই ম'রে যাবেন—"

বেণু কহিল, "নারে পাগল, ম'রব না। অত পুণ্যি আমার হবে না। জানিস্ যুদ্ধে ম'লে কি হয়?"

"কি হয় মাষ্টারমশাই ?"

"তার সব পাপ ক্ষয় হয়, একেবারে স্বর্গে দেবতাদের কাছে সে চ'লে যায়।"

"তাই না কি। কে ব'ল্লে ?"

"শাস্ত্রে আছে।"

এমন সময় চা এবং একখানি রেকাবে কিছু খাবার লইয়া সীতা গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। বেণু বড় লজ্জা পাইল,—তাড়াতাড়ি গামছাখানি খুলিয়া নগ্নদেহ আবৃত করিতে করিতে কহিল, "আমার হাতমুখ ধোয়া হয়নি এখনও—খাবারটা ওইখেনে থাক্—"

সীতা ভাইদের একটু ধমক দিয়া কহিল, "তোরা ত ভারি দুষ্টু! এখনও ওঁকে হাতমুখ ধুতে যেতে দিস্‌নি ?"

"এই যাচ্চি আমি,—ছেলেমানুষ, ওদের সঙ্গে একটু খেলা ক'চ্ছিলুম—"

এই বলিয়া বেণু গেঞ্জিটি হাতে লইয়া দ্রুত বাথরুমে প্রবেশ করিল। সীতা খাবার ও চা টেবিলের উপরে রাখিয়া কহিল, "তোরা যে খুব পেয়ে ব'সেছিস্ ওঁকে।"

প্রশান্ত কহিল, "কান্ত আর শান্ত ওঁর গা খালি ক'রে নিয়ে মাস্‌ল দেখ্‌ছিল,—"

"তাই ত বল্‌ছিলাম—খুব ভাল মানুষটি পেয়ে খুব পেয়ে ব'সেছিস্ তোরা ওঁকে।"

সুকান্ত কহিল, "মাষ্টারমশাই খুব ভাল দিদি! আর বড় খাসা মাস্‌ল আছে,—একেবারে রামমূর্ত্তির মত জোয়ান নয়—তবে খুব জোয়ান। রামমূর্ত্তির মত জোয়ান হ'লে—উনি যুদ্ধে যেতেন—"

সীতা হাসিয়া কহিল, "যুদ্ধে যেতে হ'লে কি রামমূর্ত্তির মত জোয়ান হ'তে হয় ? তা হ'লে আর যুদ্ধে কারও যেতে হবে না।"

ঠিক এমন সময়ে বেণু বাথরুম হইতে গৃহে প্রবেশ করিল। সীতার মুখে এই মন্তব্য শুনিয়া সে বড় অপ্রতিভ হইল,—কহিল, "ওরা ভুল বুঝেছে আমার কথা। যুদ্ধে যেতে কি আর রামমূর্ত্তি হওয়া লাগে ? সেদিন আর নেই যে একা ভীম আস্ত গাছ তুলে তুলে সব শত্রুকে পিটিয়ে মারবে। এখনকার একটা 'শেলে' অমন দশটা রামমূর্ত্তি উড়ে যায়।"

প্রশান্ত কহিল, "না দিদি, উনি তা বলেন নি। তবে, টাকা নেই—বাড়ীতে মা আছেন, ভাই আছে, বোন্ আছে, তাদের খেতে দিতে কেউ নেই—"

বেণু কহিল, "ও কথা থাক্ প্রশান্ত—ছি! টাকা থাক্‌লে হয়ত আরও কত ছুঁতো দেখাতাম্। যে যাবে না—তার ছুঁতোর অভাব হয় না।"

সীতা কহিল,—"আপনার কি যুদ্ধে যেতে মন যায় ?"

বেণু উত্তর করিল, "সেকথা আর কি ক'রে বলি ?—যখন যাইনি, যেতেও এখনও পাচ্চিনে—তখন আর কি ক'রে বলি যে মন যায় ? সে মন যাওয়ার কোনও অর্থ নাই। মন যদি তেমন যায়—তবে কোনও বিবেচনায় কাউকে ধ'রে রাখ্‌তে পারে না। এক পরিবার পরিজনের কথা। তা আজ ব্যামো হয়ে ম'লেই বা তাদের কে দেখবে ?"

বেণু একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। সীতা কহিল, "চা টা জুড়িয়ে যায়, আপনি এখন খান।"

"হাঁ"—বেণুর মুখে একটু হাসি ফুটিল,—সে টেবিলের কাছে বসিয়া জলপানে ও চা-সেবনে মনোনিবেশ করিল। সীতা গিয়া একগ্লাস জল ও পান লইয়া আসিল,—টেবিলে রাখিয়া কহিল, "আমি তা হ'লে আসি,—কিছু দরকার হ'লেই শান্ত কান্তকে ব'ল্‌বেন।—লজ্জা ক'র্‌বেন না কিছুতে, নিজের বাড়ীর মতই এখানে মনে ক'র্‌বেন। বাড়ীতে আপনার ভাই বোন আছে, আমরাও এখানে আপনার ভাইবোনের মত জান্‌বেন।"

এই বলিয়া নমস্কার করিয়া সীতা চলিয়া গেল।

কিছুকাল পরেই ভূপেশবাবু ফিরিয়া আসিলেন। কাজের একটা রুটিন বেণু দিনেই করিয়া রাখিয়াছিল। ভূপেশবাবু তাহাই অনুমোদন করিলেন।

ভূপেশবাবু তাঁহার ঘরে গিয়া বসিলেন,—বেণু ছেলেদের লইয়া গল্প আরম্ভ করিয়া দিল। ঘর ভ'রিয়া হাসির রোল উঠিতে লাগিল। ভূপেশবাবুর কাণে সে ধ্বনি পৌছিল, তিনি বড় আনন্দিত হইলেন। হাঁ, একটি শিক্ষক মিলিয়াছে, যে ছেলেদের প্রাণে আনন্দের উচ্ছ্বাস তুলিতে পারে।

রাত্রি প্রায় ১০টা বাজিল,—তখন আহারের ডাক পড়িল। ছেলেরা বেণুর হাত ধরিয়া আহারের গৃহে প্রবেশ করিল।

সারি সারি কয়েকখানি যায়গায় খাদ্যাদি সজ্জিত,—সম্মুখে সৌম্যদর্শনা স্মিতমুখী প্রৌঢ়া এক নারী উপবিষ্টা, পশ্চাতে একটা দ্বারের কাছে সীতা দণ্ডায়মানা।

বেণু অগ্রসর হইয়া প্রৌঢ়াকে প্রণাম করিল, দেখিয়াই সে বুঝিয়াছিল, এই প্রৌঢ়াই এ বাড়ীর গৃহিণী, তার ছাত্রদের জননী। গৃহিণী আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "এস বাবা! বেঁচে থাক! ব'স,—খেতে বস।"

বেণু একখানি আসনে বসিল,—ছেলেরাও পাশে পাশে বসিয়া গেল।

মাতার আদেশে সীতা চাটনী, দুধ ও মিষ্টাদি আনিয়া দিল। বিবিধ সুভোজ্যের আস্বাদনে এবং গৃহিণী বিরাজ-মোহিনীর সস্নেহ মিষ্ট আপ্যায়নে পরম পরিতোষে আহার করিয়া বেণু শয়ন করিতে গেল। বড় লোকের বাড়ীতে গৃহশিক্ষক হইয়া সে আসিয়াছে,—এরূপ আদর যত্ন সে প্রত্যাশা করে নাই। একেবারে অবাক্ হইয়া সে গেল। সব যেন তার স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

সকালে নীরুর ব্যবহার তার মনে পড়িল :—ইহাদের সঙ্গে নীরুর মত লোকের এত ঘনিষ্ঠতা কি প্রকারে হইল, ভাবিয়া সে বিস্মিত হইল। নীরু সঙ্গেই কি সীতার বিবাহ এঁরা দিবেন? এই সীতা আর সেই নীরু—সে কেমন হইবে? ছি! তবে সে বড় লোকের ছেলে—বিলাত ফেরত ব্যারিষ্টার। সীতা সুখে থাকিবে। কিন্তু থাকিবে কি? এত ক্ষুদ্র প্রাণ যার, তাকে কি সীতা শ্রদ্ধা কখনও করিতে পারিবে? প্রাণ যেখান হইতে বিরাগে ফিরিয়া আসে, ঐশ্বর্য্যের সহস্র ভোগ কি সেখানে কাউকে তৃপ্তি দিতে পারে? ভাবিতে ভাবিতে বেণু একটি নিশ্বাস ছাড়িল।

(৪)

মাসাধিককাল চলিয়া গেল। পড়ান, কি খেলান, কি ব্যায়ামানুশীলন করান, সকল কর্ম্মেই বেণুর অসাধারণ কুশলতা দেখিয়া ভূপেশবাবু একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন,—ছেলেরা তার এমন বাধ্য হইয়া উঠিল যে রাত্রিতেও তারা বেণুদাকে ছাড়িয়া—থাকিতে চাহিত না। বেণুর সঙ্গে এক গৃহেই শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বেণু গৃহের সকলেরই বড় প্রিয়, বড় শ্রদ্ধাভাজন হইয়া উঠিল।

নীরু আসিত যাইত, বেণুর সঙ্গে তার বড় দেখা হইত না। বেণু দূরে থাকিত, নীরুও বেণুর কাছদিয়া কখনও ঘেঁসিত না। ইহাদের সঙ্গে যে কোনও পরিচয় তার আছে কেহ তাহা জানিতে পারিল না।—এক সীতা জানিত, কারণ সে প্রথমদিনকার সেই কথাবার্ত্তা শুনিয়াছিল। কিন্তু সে তার কোনও ভাঁজ কখনও দিত না। তবে আগের মত সরল মন-খোলাভাবে সে আর নীরুর সঙ্গে মিশিতে পারিত না।—নীরু লক্ষ্য করিত, সীতা যেন কিছু চাপা—কেমন ভার ভার—কেমন আনমনা হইয়া থাকে,—সহজ শিষ্টভাবে কথার উত্তর দেয়,—কিন্তু নিজে বেশী কিছু কথা বলে না। নীরু ইহাও লক্ষ্য করিল, কখনও কোনও কথা-প্রসঙ্গে বেণুর কথা কেহ তুলিলে সীতার মুখখানি যেন বড় প্রফুল্ল হইয়া উঠে,—বেণুর সম্বন্ধে কোন কথা যখন সে বলে, প্রাণভরা একটা শ্রদ্ধার উচ্ছ্বাস যেন তাহার প্রকাশ পায়। নীরুর মনটা বড় দমিয়া যায়, মুখখানি আঁধার হইয়া উঠে,—কখনও প্রাণভরিয়া যেন আগুন জ্বলিয়া উঠে!

বলা বাহুল্য নীরুর সঙ্গে সীতার বিবাহের কথা হইয়াছিল। ভূপেশ বাবুর সঙ্গে নীরুর পিতার সৌহার্দ্দ ছিল। নীরু বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার কিছুদিন পরেই এই সম্বন্ধের প্রস্তাব হইল। ভূপেশবাবু বলিয়াছিলেন, "বেশত। নীরু ঘরের ছেলের মত, আস্‌ছে যাচ্ছে,—দুজনের যদি দুজনকে পছন্দ হয়, বিয়ে দেওয়া যাবে। বেশ নূতন একটা love match (প্রেমের বিবাহ) হ'বে।

সেই অবধি নীরু সর্ব্বদা আসিত যাইত। আগের মতই অবাধে বাড়ীর ভিতরে গিয়া সকলের সঙ্গে মিলিত মিশিত।

তবে ভূপেশবাবু তাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, বিবাহ সম্বন্ধে কোনও আলাপ সে সীতার সঙ্গে না করে। গৃহিণীকেও বলিয়া দিয়াছিলেন, সীতার সঙ্গে নিভৃতে নীরু যেন আলাপের কোন সুযোগ না পায়। নীরু সীতার জন্য একেবারে পাগল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সীতার মনের ভাব কি তাহা বুঝা যাইত না। নীরু ঘরের ছেলের মত, বহুদিন অবধি পরিচয়,—আগের মতই নিঃসঙ্কোচে সে তার সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলিত। সম্প্রতি যে কিছু ভাবান্তর হইয়াছিল,—তাহাও সকলে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এ সঙ্কোচ প্রেমের লক্ষণ কিনা কেহ ভাল বুঝিতেন না। প্রেম যদি না হয়, তবে এ সঙ্কোচ কেন? বিরাগ নয় ত? তারই বা কারণ কি হইতে পারে?

(৫)

রংরুট সংগ্রহের জন্য খুব সভাসমিতি তখন হইতেছিল। নীরেন্দ্র তার বড় একজন চাঁই। সভায় ইংরেজিতে খাসা বক্তৃতা

করিত,—বক্তৃতার টাইপ করা অনুলিপি দৈনিক পত্রিকার আফিসে দিয়া আসিত,—পরদিন কাগজে যখন তাহা বাহির হইত, দাগ দিয়া ভূপেশবাবুর কাছে পাঠাইত। কারণ ভূপেশবাবু কাজের লোক, সকালে মোট মোট টেলিগ্রাফের খবরগুলি ছাড়া আর কিছু দেখিবার অবসর বড় হইত না। নীরেন্দ্রর প্রেরিত কাগজে দাগ দেওয়া বক্তৃতার অনুলিপির উপর একবার চক্ষুদিয়া যাইতেন, একটু হাসিতেন। সীতাকে পড়িতে পাঠাইয়া দিতেন।

সেদিন এড় একটি সভায় বাহাবা বক্তৃতা দিয়া উৎফুল্ল চিত্তে নীরেন্দ্র সন্ধ্যার পর ভূপেশবাবুর বাড়ীতে আসিল। ভূপেশবাবুর তখন একটু অবসর ছিল,—উপরে বসিয়া সীতার গান শুনিতেছিলেন।

নীরেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিল, যথারীতি আদরে অভ্যর্থিত হইয়া সুখাসনে উপবিষ্ট হইল। সীতা হারমোনিয়ামটি ছাড়িয়া উঠিয়া বাহিরে গেল,—চা ও কিছু খাবার আনিয়া নীরেন্দ্রের কাছে রাখিল।

ভূপেশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ বুঝি তোমাদের একটা সভা হ'ল নীরু ?"

নীরেন্দ্র চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া কহিল, "হাঁ,—বেশ successful meeting (সফল সভা) আজ হয়েছিল।"

"Successful ! কি হিসেবে ? মেলাই রিক্রুট হ'ল ?"

"না, রিক্রুট তেমন হ'চ্ছে কই ?"

"সভায় তবে কিসের সাফল্য হ'ল ?—বক্তৃতায় ?"

"হাঁ—লোক হ'য়েছিল বেশ—আর বক্তৃতাগুলিও বেশ impressive (চিত্তাকর্ষক) হ'য়েছিল—তবে—"

"ছেলেরা কেউ নাম লেখায়নি। তা, এই লোকের হিড় ভিড়ে আর গলাবাজিতে লাভ কি হ'চ্ছে ?"

নীরেন্দ্র কহিল, "তাই ব'লে কি চুপ ক'রে বসে থাকা যায় ? দেশ নিদ্রিত অসাড়,—এম্‌নি ক'রেই জাগাতে হবে—একটা সাড়া তুলতে হবে। অবিরত বুঝিয়ে বুঝিয়ে, ব'লে ব'লে, ভাবের তরঙ্গতুলে, ক্রমে লোকের মন তৈরী ক'ত্তে হ'বে। ভীরু জাতি—যুদ্ধের ডাকে ভয় পায়।—আরাম বিরামে অলস, ভোগবিলাসের দাস—সৈনিকজীবনের কঠোরতায় আত্মদান ক'ত্তে এরা পারে না। বুঝেও এরা বুঝ্‌তে চায় না—জনে জনে প্রাণ দিতে প্রস্তুত না হ'লে মৃত এ জাতিতে প্রাণ জেগে উঠ্‌বে না।"

সীতার অধরপ্রান্তে একটু বক্রহাসি ফুটিয়া উঠিল,—সে কহিল, "কেবল সভায় তার বক্তৃতা না ক'রে কাজে আপনারা পথ দেখান না ?"

"কাজে! কাজেই ত লেগে আছি, এই সব সভা অর্গানাইজ কচ্চি ——"

সীতা উত্তর করিল, "সে আর এমন কঠিন কাজ কি ? তা ত বুড়োরাই বেশ ক'ত্তে পারে,—এ সব সভা বক্তৃতার কাজ তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আপনারা সব সৈনিক হ'ন না ? দেখ্‌বেন, দলে দলে লোক এসে আপনাদের পাশে দাঁড়াবে।"

"আহা, তা যদি হ'ত,—কত সুখী হ'তাম আজ্‌কে। সৈনিকের বেশ ধ'রে যুদ্ধক্ষেত্রে নাম্‌তে-প্রাণটা যে কি অধীর হ'য়ে উঠ্‌ছে, তা যদি বুঝ্‌তে সীতা!—কিন্তু সব চেপে রাখ্‌তে বাধ্য হচ্চি ?"

"কেন ?"

"এই সব কাজ কে ক'র্‌বে ? বুড়োরা ? তারা তেমন ভাবে আস্‌ছে কই ? আমি যেতে পারি—একজন সৈনিক মোটে তাতে বাড়্‌ল। থাক্‌লে যে শত শত সৈনিক আন্‌তে পার্‌ব ——"

"তাই বা পাচ্চেন কই ?"

"পাচ্চি না—পার্‌ব! হ'চ্ছে না—হবে! গেলে ত কিছুই হবে না। তবু যেতে চেয়েছিলাম,—এই ত সে দিন মনটা যেন আগুন হ'য়ে উঠ্‌ল, আপনাকে আর সাম্‌লে রাখ্‌তে পারলাম না। তা রংরুটের ফরমটা পূর্ণ ক'রে মিষ্টার রের হাতে দিতেই তিনি একেবারে চ'ম্‌কে উঠ্‌লেন, টুক্‌রো টুক্‌রো করে সেটা ছিঁড়ে ফেলে দিলেন,—ব'ল্লেন, নীরু, তুমি কি পাগল হ'য়েছ ? যে মাথা হাজার হাজার হাত চালাবে—সেই মাথা কি একটা হাতের কাজে নষ্ট ক'রে ফেলা যায় ? সেনাপতিকে পিছনে থেকে হাজার হাজার সেনাকে যুদ্ধক্ষেত্রে চালাতে হয়, সে কি গিয়ে আগে ম'র্‌তে পারে ?"

রুমাল বাহির করিয়া নীরেন্দ্র স্বেদাপ্লুত ললাট মার্জ্জনা করিল।

সীতা ধীরে ধীরে কহিল, "দেশে তবে দেখ্‌ছি মাথাই বেশী, হাত বড় কম। গোলাগুলি যখন ছুটবে, মাথাগুলি বাঁচাবে কে ? সেনা নেই, সবাই

সেনাপতি। শত্রু যখন আস্‌বে, কার আড়ালে লুকোবেন তাঁরা ?"

ভূপেশবাবু হাসিয়া উঠিলেন,—কহিলেন, "নীরু! আমার মনে হয় কি জান ? প্রথম প্রথম তোমাদের মুখের বক্তৃতা শোনার চেয়ে হাতে অস্ত্র দেখ্‌লে ভরসা ক'রে লোক এগোবে বেশী। অর্গানিজেশনের কথা ব'ল্‌ছ ? পনেরো যুবক তোমরা যদি হাতে বন্দুক ধ'রে নাম, বুড়োরা উদাসীন থাক্‌তে পারবে না। অর্গানিজেশন চালাতে তাদের পাকা মাথাই চাই। আর কি জান, নিজেদের ছেলেরা সব কাজে নাম্‌লে তাদের যে গরজ হবে, পরের ছেলের বেলায় সে গরজ কারও হয় না। আর এই সব পরের ছেলে—দেশের গরীব দশজনের গরীব ছেলে, বাজে লোকের মত এঁরা তাদের দেখেন। এদের জন্যে প্রাণে কারও লাগে না,—সন্ধ্যেবেলা সভায় দুই একটা বক্তৃতে দেওয়া ছাড়া—ব্যবসার ক্ষতি ক'রে মন দিয়ে কেউ খাট্‌তেও চান না।"

সীতা কহিল, "সেদিন কাগজে প'ড়্‌ছিলাম, কে লিখে-ছেন—দেশে ঢের যুবক আছে যারা লেখাপড়া ভাল শেখেনি, কাজকর্ম্ম পায় না, ঘুরে ঘুরে বেড়ায়,—তারা কেন সব এসে রংরুট হ'ক না ?"

"সে ত ঠিক কথাই লিখেছেন। যাদের ভবিষ্যৎ বড়, বড় আশা আছে,—বড় বড় কাজে থেকে অর্থ উপার্জ্জন ক'রে তারা দেশের অনেক উপকার ক'ত্তে পারবে। তাদের জীবনের বড় একটা মূল্য আছে।—এমন ক'রে—সামান্য সিপাহীর বিপৎ-সঙ্কুল কাজে তাদের বলি দেওয়া দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়।"

সীতা উত্তর করিল, "আমাদের দেশের পক্ষে আজকাল এর চাইতে বড় কাজও কিছু নাই। একাজ বাজে লোককে দিয়ে হবে না। এ বলির জন্য তারা প্রস্তুত নয়,—তাদের ডাকাও মিছে। বড় ঘরের, বড় ভবিষ্যতের, বড় বড় ছেলে-দের এই বড় বলিতে আগে আত্মদান ক'ত্তে হবে। দেখে এরা পিছনে আস্‌তে পারে। তোরা ছোট—তোরা অকেজো—তোরা যুদ্ধে গিয়ে মর, আমরা বাহাদুরী করি, তোদের রক্তে জিয়ান দেশের সকল সুখ ভোগ করি—এই ত ডাক ? এতে তারা ছুটে এল না কেন ?"

"কেন এই ত সিপাহীদের মাইনে বাড়ানর কথা হ'চ্ছে। তারা কি রোজগার করে ? এটা কি তাদের বড় একটা আকর্ষণ নয় ?

"প্রাণ দেবার পক্ষে, সৈনিক-জীবনের অশেষ কঠোরতা সইবার পক্ষে, মাসে ২০।২৫ টাকা মাইনে পথের ভিকিরী যে, তার পক্ষেও আকর্ষণ কিছু নয়। কয় পুরুষ যাবৎ যুদ্ধবিগ্রহ যারা চোকেও দেখেনি, এত বড় মারাত্মক যুদ্ধে তাদের টেনে নিতে হ'লে যে প্রেরণা চাই তা এদের মধ্যে নাই। বড় ঘরের শিক্ষিত ভাল ভাল ছেলেদের মধ্যেই তা সম্ভব—তাদেরই আগে পথ দেখাতে হবে। যদি তা তারা কেউ না পারে, সাধারণ লোককে ভীরু ব'লে দোষ দেওয়া তাদের অন্যায়।"

ভূপেশবাবু হাসিয়া কহিলেন, "সীতা এইবার চ'টে গেছে। বুঝ্‌লে নীরু, ওকে ঠাণ্ডা ক'ত্তে চাও ত নিজে গিয়ে রংরুটের দলে ভর্ত্তি হও।"

বেয়ারা আসিয়া সেলাম করিয়া, একখানি কার্ড দিল। ভূপেশবাবু দেখিয়া কহিলেন, "তবে তোমরা ঝগড়াটা চালাও বা মেটাও—যা হয় কর। আমাকে একটু উঠ্‌তে হ'ল—"

এই বলিয়া ভূপেশবাবু নীচে নামিয়া গেলেন।

"সীতা!" নীরেন্দ্র ডাকিল,—স্বর বড় কোমল—ঈষৎ কম্পিত।

"আজ্ঞে!"

"আজ্ঞে! আজ একেবারে 'আজ্ঞে' কেন সীতা ?"

"আপনি বয়সে বড়—বড় ভাইয়ের মত—"

"যা আছি তা বরাবরই আছি। তা তোমার সেই সহজ মিষ্টি 'উঁ' আজ একেবারে গম্ভীর 'আজ্ঞে' হ'ল কেন, সীতা ? 'আজ্ঞে'টা বড় পরের মত—যেন ভয়ে ভয়ে কত দূরে সে র'য়েছে—কাছে আস্‌তে পায় না—ভরসা ক'রে চায়ও না।"

সীতা একটু হাসিল।

নীরেন্দ্র কহিল, "আর কখনও 'আজ্ঞে' ব'ল্‌বেনা ত ?"

"যদি বারণ করেন, ব'ল্‌ব না।"

"যদি বারণ করি!—যদি না করি ?"

সীতা একটু মুখ ফিরাইয়া নিল,—কিছু বলিল না।

নীরেন্দ্র আবার ডাকিল, "সীতা!"

"কি, বলুন ?"

"তুমি কি চাও আমি যুদ্ধে যাই ?"

নীরেন্দ্রের স্বর এবার বড় কম্পিত।

সীতা উত্তর করিল, "আমি চাইব কেন, আপনি নিজে চান যাবেন, না চান না যাবেন,—আমার চাওয়া না চাওয়ায় কি এসে যায় ?"

"তোমার চাওয়া না চাওয়ায় কি এসে যায় ? সীতা! তুমি এমন কথা ব'ল্‌ছ? তুমি কি চাও না চাও, তাই যে আমার সব চেয়ে বড় কথা। বল, তুমি চাও, আমি কালই নাম লিখিয়ে দিচ্ছি—"

সীতা নতমুখে উত্তর করিল, "আমি কিছুই চাই না,—আপনার ইচ্ছে এমন হয়, দেবেন নাম লিখিয়ে ?"

"ইচ্ছে! ইচ্ছে কেন হবে না ? কার না হয় ? হঁা, তবে সামান্য সিপাহী হ'য়ে যাওয়া—সেটা আমাদের চলে না। হঁা, দিক্ আমাকে জেনারেল করে অগত্যা কর্ণেলের পদই দিক্—এক্ষুণি যাব,—সব sacrifice (বলিদান) ক'রে চলে যাব!"

সীতা ধীরে ধীরে কহিল, "শুনেছি কর্ণেল পর্য্যন্ত কেউ উঠ্‌তে পাল্লে, তার প্রাণের আশঙ্কা এক রকম থাকে না,—যুদ্ধের সময় অনেক পিছনেই তাকে থাক্‌তে হয়, তদ্দূর গোলাগুলি পৌঁছায় না।"

নীরেন্দ্রের চোকমুখ একেবারে লাল হইয়া উঠিল। একটু উত্তেজিত—অনুযোগের সুরে সে কহিল, "সীতা!"

"আজ্ঞে ?"

নীরেন্দ্র ভ্রূকুটি করিল। কহিল, "আমি—কদ্দিন ধ'রে তোমার ব্যবহারে বড় একটা ঠাণ্ডা (cold) অবজ্ঞার ভাব লক্ষ ক'চ্ছি। আজ ত রীতিমত একটা বিরাগই প্রকাশ পাচ্ছে! কেন ব'ল্‌তে পার ?"

সীতা নতমুখে মৃদুস্বরে কহিল, "না——"

"কেন পার না ? আমি জান্‌তে চাই।"

সীতার প্রশান্ত ললাটে একটু ভ্রূকুটি-কুটিল হইয়া উঠিল, সে কহিল, "ছি! এসব কথা আপনি কেন তুলছেন ?"

"কেন তুলছি ? আমি জান্‌তে চাই, জান্‌তে আমার অধিকার আছে—"

"অধিকার! কিসের অধিকার ?" সীতা এইবার মুখ তুলিয়া স্থির দৃষ্টিতে নীরেন্দ্রের দিকে চাহিল। নীরেন্দ্র একটু অপ্রতিভ ভাবে চক্ষু নত করিল। একটু পরে কহিল, 'তোমার বাবা ব'লেছেন, তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ দেবেন—"

"আমি জানি না,—বাবাকে জিজ্ঞাসা করুন।"

সীতা উঠিল,—দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। নীরেন্দ্রও উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "সীতা! শোন!"

সীতা দাঁড়াইল। নীরেন্দ্র কহিল, "সীতা, আমি জান্‌তাম, তুমি আমায় ভালবাস। কিসে তায় বঞ্চিত হ'লাম—তাকি ব'ল্‌বে না ?"

"আপনি এ সব কি ব'ল্‌ছেন নীরুবাবু ? ছি—ছি! শুন্‌তেও যে আমার লজ্জা করে।" সীতা দ্রুতপদে প্রায় দ্বারের বাহিরে গিয়া পড়িল।

নীরেন্দ্র আবার কহিল, "সীতা! আর একটি কথা—এক মিনিট—একটু দাঁড়াও!"

সীতা আবার দাঁড়াইল। নীরেন্দ্র কহিল, "তোমার ব্যবহার আমার একেবারে অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। শেষ কথা আমি শুন্‌তে চাই। বল, আমাকে কি বিবাহ ক'র্‌বে না ?"

"তার কর্ত্তা আমি নই, বাবাকে জিজ্ঞাসা করুন।"

এই বলিয়া সীতা দ্রুতপদক্ষেপে চলিয়া গেল।

নীরেন্দ্র কিছুকাল স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর কাহাকেও কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

(৬)

পরদিন সন্ধ্যার পর ভূপেশ তাঁহার খাসকামরায় বসিয়া কি কাগজপত্র দেখিতেছিলেন,—এমন সময় বেণু আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল।

"এস বেণু, ব'স! কি, কোনও কথা আছে ?"

"আজ্ঞে হাঁ!" এই বলিয়া বেণু একখানি চেয়ারে বসিল।

"কি কথা, বল।"

বেণু উত্তর করিল, "ব'ল্‌তে বড় লজ্জা ক'চ্চে। কিন্তু না ব'ল্লেও নয় ——"

"কি হে ? ব'লেই ফেল না ছাই।"

"আজ্ঞে, আপনাদের এখানে বড় সুখেই ছিলাম। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি—থাকা আর হ'ল না ——"

"হ'ল না ? সে কি বেণু! ছেলেগুলোকে একেবারে ভাসিয়ে দিয়ে কোথায় যেতে চাও ? কেন, কি হ'য়েছে ?"

"আজ্ঞে, এতদিন চেপে চুপে ছিলাম,—আর পাল্লাম না,—আমি যুদ্ধে যেতে চাই—"

"যুদ্ধে যেতে চাও! সর্ব্বনাশ! সে কি ?"

"আজ্ঞে, সর্ব্বনাশের কিছুই নেই এতে—সামান্য একটা লোক আমি——"

"বেণু! ওসব কুবুদ্ধি ছেড়ে দেও।—এ বাতিক আবার কেন হ'ল?"

বেণু উত্তর করিল, "আজ্ঞে, বাতিক যে কেন হ'ল, তা বলা শক্ত। তবে আজ নতুন হয়নি, বরাবরই আছে। এদ্দিন চেপেচুপে রেখিছেলাম,—এখন আর পাচ্ছি না। শক্ত ভূতের মত ঘাড়ে চেপে ব'সেছে,—যেন ঠেলে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে।"

"নাবিয়ে দেও—নাবিয়ে দেও! ওসব ভূতে পাওয়াটা কিছু নয়। তুমি কি ভাবছ, সেপাই হ'য়ে যুদ্ধে গেলেই দেশের বড় একটা উপকার তুমি ক'রবে?"

"আজ্ঞে, ওসব বড় বড় কথা মোটেই ভাবিনি। যারা যায়, তারা ওসব বিবেচনা ক'রে বোধ হয় মোটেই যায় না, বাতিকে যায়,—থাকতে পারে না ব'লে যায়। যুদ্ধের একটা টান এমন আছে,—কারও কারও প্রাণটা বড় তাতে টানে,—যাদের টানে তারাই যায়, না গিয়ে পারে না।"

"হু! তা তোমার কি সত্যিই এমন টান প'ড়েছে।"

"আজ্ঞে—তাইত মনে হচ্ছে।"

ভূপেশবাবু বেণুর মুখে চাহিয়া একটুকাল ভাবিলেন, তারপর ধীরে ধীরে কহিলেন, "হাঁ দেখ বেণু, তোমার মত ছেলেদের আপনা হ'তেই যুদ্ধে যেতে ইচ্ছে হ'তে পারে। এটা বেশ বুঝি। তবে আরও অনেক বিবেচনা ত আছে। অবিশ্যি আমার ছেলেদের গরজে ব'লতে পারি না যে তুমি যুদ্ধে যেও না,—এখানে থেকে তাদের পড়াও আর খেলা টেলা করাও। সেটা বড় স্বার্থপরের মত কথা হবে,—যদিও আমি স্বার্থপর বড় কম নই—তোমাকে বেঁধে রাখতে পাল্লেও রাখতে চাইব। যাক্! তবে তোমার অন্য বিবেচনা আছে। বাড়ীতে তোমার মা আছেন, একটি বোন আছে, ভাই আছে—"

"সেটা খুব বড় বিবেচনাই এদ্দিন ছিল—"

"এখন গেল কিসে?"

বেণু উত্তর করিল, "আমার বোনটি বড় লক্ষ্মীমেয়ে। সবাই টাকা চায় না, ভাল মেয়েও চায়। আমার এক বন্ধু ব্যবসা ক'রে বেশ দুপয়সা রোজগার কচ্ছে—বোনটি সে আদর ক'রেই বিয়ে ক'ত্তে চাচ্ছে। কাজেই বড় একটা দায় কমে গেল।"

"তা গেল বটে। কিন্তু মা আর ভাই?"

"আমি মাইনে ত কিছু পাব। আর যদি জমাদার টমাদার একটা হ'তে পারি তবে বেশী ক'রেই পাব। তাতেই চ'লে যাবে।"

"এখন চ'লে যাবে,—কিন্তু তারপর?"

"তারপর—শুনেছি কিছু ক'রে তারা পেন্সন পরিবারকে দেয়। মা একা বিধবামানুষ,—তাতেই চ'লবে। আর ভাই—তা বেটাছেলে ত? ঠেলে উঠতে পারবেই। আবার বন্ধু ভগ্নীপতিও ত থাকবে—আমার দায় সে কিছু নেবেই। তারপর দেখুন, অত সব ভাবনা ক'ত্তে গেলে আর চলে না। আজ যদি ব্যামো হয়ে মরি, তা হ'লেই বা তাদের কে দেখবে?"

"হুঁ!—তা—তোমার মার অনুমতি পেয়েছ?"

"মার অনুমতি কি আর কেউ এতে পায়? তবে বুঝিয়ে সব লিখব,—আমায় আশীর্ব্বাদ অবশ্য করবেন?"

"তা হ'লে কি সত্যিই যেতে চাও বেণু?"

"আজ্ঞে, আপনার অনুমতি চাই।"

"আমার অনুমতি! তার উপর কি কিছু নির্ভর ক'চ্চে?"

"অনেকটা ক'চ্ছে। আপনাকে এখন পিতার মত শ্রদ্ধা করি। আপনার অনুমতি পেলে মনটা বেশ ভাল থাকবে।"

"তোমার মন খারাপ আমি করব না।—যদি যেতেই চাও, বেশ—আমি অনুমতি দিচ্চি—আশীর্ব্বাদ কচ্চি।"

বেণু ভূমিষ্ঠ হইয়া ভূপেশবাবুকে প্রণাম করিল। সাশ্রুনয়নে ভূপেশবাবু বেণুকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "ছেলেরা বড় দুঃখ পাবে,—তা পাক, এও তাদের বড় একটা শিক্ষা! তোমার মঙ্গল হ'ক্! আজ বলছি বেণু তোমাকে আমি বড় স্নেহ করি, শ্রদ্ধাও যথেষ্ট করি।"

দ্বারদেশে কার পদশব্দ হইল।—উভয়ে চাহিয়া দেখিলেন, নীরেন্দ্র।

"তবে আসি এখন।"—এই বলিয়া বেণু চলিয়া গেল।

নীরেন্দ্র ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া একখানি চেয়ারে বসিল, এইদৃশ্যে সে কিছু বিস্মিত হইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিল। "কি?"

ভূপেশবাবু একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, "না—আর কিছু না। বেণু যুদ্ধে যাচ্ছে।

"কে বেণু! যুদ্ধে যাচ্ছে! বেণু—যুদ্ধে যাচ্ছে?"

নীরেন্দ্রের মুখখানি কেমন লাল হইয়া উঠিয়া আবার বড় ফ্যাকাসে হইয়া গেল। ভূপেশবাবু বিস্মিতভাবে তাহার দিকে চাহিলেন—কি তাঁহার মনে হইল, তিনি বলিয়া ফেলিলেন, "বেণুকে কি—তুমি চেন নাকি?"

সহসা এই প্রশ্নে নীরেন্দ্র যেন এতটুকু হইয়া গেল,—আমতা আমতা করিয়া কহিল, "হাঁ, আগেও দেখেছি—মাঝে মাঝে—তখন প'ড়তাম—খেলাটেলা খুব ক'ত্ত—"

"কই, তোমাদের যে চেনা পরিচয় আছে, এমন ভাব ত কখনও দেখিনি।"

নীরেন্দ্র একটু কি ভাবিল,—তারপর কহিল, "সেটা—বেণু ইচ্ছে করেনি। কারণ——"

"কারণ?"

"কারণ—সে হয়ত মনে ক'রেছিল—আমি তাকে চিনি জান্‌লে—আপনি তার—গতজীবনের সম্বন্ধে আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌বেন। সেটা—তার পক্ষে—বড়—ভাল হত না।"

"নীরুবাবু! ছি! আপনি এ সব কি ব'ল্‌ছেন?" সহসা সীতা গৃহে প্রবেশ করিল।

নীরেন্দ্রের মুখখানি আবার লাল হইয়া উঠিল।

ভূপেশবাবু কহিলেন, "কিরে সীতা! তুই———"

"মাপ করুন বাবা,—আমি একটা কথা জিজ্ঞেস ক'ত্তে আস্‌ছিলাম—উনি বেণুবাবুর সম্বন্ধে যে কথা ব'ল্‌ছিলেন, তা মোটেই সত্যি নয়।"

নীরু বলিয়া উঠিল,—"সত্যি নয়! তুমি তার কি জান সীতা?"

"আপনি কি ব'ল্‌তে চান, পাছে তাঁর সম্বন্ধে কোনও নিন্দের কথা বেরিয়ে পড়ে, তাই তিনি আপনাকে ব'লেছেন, আপনি যে তাঁকে চেনেন, একথা আপনি বাবাকে না বলেন?"

নীরেন্দ্র কহিল, "এ সব কথার মধ্যে তোমার না আসাই ভাল সীতা।"

"আমি আস্‌তে কখনও চাইনি। কিন্তু আপনি মিছে ক'রে অসাক্ষাতে তাঁর বদনাম ক'চ্ছেন, তাঁর চরিত্রের উপরে বাবার শ্রদ্ধা নষ্ট ক'রে দিচ্ছেন,—জেনে শুনেও কি ক'রে চুপ ক'রে থাক্‌ব?"

"কি তুমি জান? বেণু তোমাকে কি ব'লেছে?"

"তিনি কিছুই বলেননি।"

"তবে?"

"তবে—নীরুবাবু, বাধ্য হ'য়ে আমাকে আজ সব কথা বল্‌তে হচ্ছে। বেণুবাবু যে দিন প্রথম এখানে আসেন, দরজার কাছে আপনার সঙ্গে তাঁর দেখা হ'য়েছিল—"

নীরেন্দ্র যেন এতটুকু হইয়া গেল,—তবু সাহস করিয়া সে বলিল, "হাঁ, হ'য়েছিল, তার কি?"

"তখন—আপনাদের যে কথাবার্ত্তা হয়, সব আমি শুনেছিলাম,—কাছেই উপরের জানালার ধারে আমি তখন দাঁড়িয়েছিলাম।"

ভূপেশবাবু কহিলেন, "কি, ব্যাপার কি? আমি ত কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনি! হাঁ, নীরু, কি কথা হ'য়েছিল?"

নীরু উত্তর করিল, "সীতা কি শুনেছে, সীতাই জানে। আমার কথা—যদ্দূর ব'লেছি—তার বেশী কিছু ব'ল্‌বার নেই।"

ভূপেশবাবু কহিলেন, "আচ্ছা—সীতা, তুমি এখন যাও। এসব তর্কবিতর্কের দরকার কিছু নেই। হাঁ, কি ব'ল্‌তে এসেছিলে তুমি?"

"মা ব'ল্‌ছিলেন, কাল সকালে কালীঘাটে যাবেন। তার বন্দোবস্ত ক'রে রাখতে হবে।"

"আচ্ছা, সে হবে, তুমি যাও, বলগে।"

সীতা চলিয়া গেল।

ভূপেশবাবু কহিলেন, "দেখ নীরু, বেণুকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি। ছেলেবেলায়—হয়ত—কিছু উচ্ছৃঙ্খল ছিল, তা এখন ত বেশ সংযত আর সুবুদ্ধি ব'লেই তাকে বোধ হয়। যাক্‌, পুরোণো কোনও কথা তুলে আর কাজ নেই।"

নীরেন্দ্র কহিল, "আমি তুল্‌তে কখনও চাইনি,—চাইবও না। তবে একটি কথা আপনাকে আজ ব'ল্‌তে চাই।"

"কি বল?"

"সীতাকে আমি বিবাহ ক'ত্তে চেয়েছিলাম, আপনাদেরও ইচ্ছে ছিল। তা এ সম্বন্ধে শেষ একটা কথাবার্ত্তা এখন ঠিক হ'য়ে গেলেই ভাল হয়।"

ভূপেশবাবু কহিলেন, "হুঁ—! তা—দেখ নীরু, তুমি ঘরের ছেলের মত, সীতাকেও লেখাপড়া শিখিয়েছি, বড় ক'রে ফেলিছি,—তাই ভেবেছিলাম,—তোমরা খোলাখুলি

ভাবে একটু মেলমেশ, দুজনের যদি খুব ভাল লাগে, বিয়ে হবে। তোমার বাবাও তাতে মত দেন—”

“হাঁ, তা আর কত দিন অপেক্ষা ক'র্ত্তে হবে? এখন কথাটা ঠিক ঠাক হ'য়ে গেলেই ভাল হ'ত।”

“হুঁ—। তা, সীতাকে বিবাহ ক'র্ত্তে তোমার—আগ্রহ কি খুব আছে?”

“আছে, খুবই আছে। তাই আজ আপনার কাছে এই কথা উপস্থিত কচ্ছি।”

“হুঁ! কিন্তু—সম্প্রতি কিছুদিন ধ'রে দেখছি, সীতা মনে মনে যেন তোমার উপর তেমন খুসী নয়—”

“তার কারণ আছে। সীতা মনে করে—আমার যুদ্ধে গেলে ভাল হত। কিন্তু আপনি কি মনে করেন, সেটা সম্ভব?”

“না, তা মোটেই মনে করিনে।”

“এই ত, দেখুন, রিক্রুটের জন্য অর্গানিজেশনের কাজটা———”

ভূপেশবাবু কহিলেন, “নীরু, ভুল বুঝোনা! সব বিষয়ে আমি খোলাখুলি কথাই পছন্দ করি। আমি এটা মনে করিনে যে রিক্রুট জোটানর কাজ তুমি যুদ্ধে গেলে চ'ল্‌বে না, তাই তোমার পক্ষে যুদ্ধে যাওয়া সম্ভব নয়। তবে—”

“কি তবে?”

“কি জান নীরু, সেটা তোমার দোষ কিছু নয়,—তুমি বড় ঘরের ছেলে,—নিজেরও বেশ বড় হ'য়ে উঠ্‌বার ভরসা দেখা যাচ্ছে,—ছেলেবেলা থেকে কেবল সুখেই রয়েছ, স্বভাবে তাই কিছু কোমল আত্মসুখপ্রিয় হ'য়েছ। শরীরেও পুরুষোচিত কঠোর শক্তি কিছু বিকাশ পায় নি। বাঙ্গালী বড় লোকের ছেলে সবই প্রায় এই রকমই। এদের কারও পক্ষে যুদ্ধে যাওয়া মোটেই সম্ভব ব'লে আমি মনে করিনে,—যদি না বেজায় বাতিকে কেউ ক্ষেপে ওঠে। তা সে রকম বাতিক তোমার নাই।”

“বাতিক! বলেন কি? স্বদেশসেবার এমন প্রেরণার কি এমন শক্তি নাই—”

“ওসব পোষাকী স্বদেশসেবা—নীরু—সভা-বক্তিতের উপরে আসল কাজ পর্য্যন্ত তার প্রেরণা বড় ওঠে না। আমাদের দেশ যা, তাতে কল্‌কেতার এই সৌখিন বড় লোকদের জীবনটাকে খাটি স্বদেশ-সেবকের জীবন আমি বল্‌তেই পারিনে। কারণ দেশ ব'লে যা বুঝি, তার সঙ্গে এঁদের কোনও সংশ্রব নেই। দেশের দশজনের সুখ দুঃখের কোনও ভাগ এঁরা নেন না,—কোনও ধারও এঁরা ধারেন না। তাদের বাড়ী ঘরে, তাদের সঙ্গে মিলেমিশে তাদের মত একদিনও এরা থাকতে পারেন না।”

“সেটা ক'র্ত্তে পাল্লে অবিশ্যি খুবই ভাল হ'ত। তবে—”

“থাক্ আর ওসব কথা এখন। তা, সীতার ত এমন কোনও অভিপ্রায় বুঝ্‌তে পারিনি যে তুমি যুদ্ধেই যাও এটা সে চায়। তবে সাধারণভাবে তার মত এই যে বড় লোকের ছেলেরা আগে না গেলে, সাধারণ গরীবের ছেলে তেমন আস্‌বে না। সে ত ঠিক কথাই। আর তাই নিয়ে তোমার সঙ্গে তার তর্ক বিতর্কও হয়। তবে আজকের এই ঘটনা—”

নীরেন্দ্র কহিল, “এরই ভিতর তার গূঢ় রহস্য আছে—আমার তাই মনে হয়।”

“কি রকম?”

“বেণুর উপরে তার বড় একটা পক্ষপাত—অনেক দিন ধ'রে লক্ষ্য ক'রে আস্‌ছি। আপনাদের সাবধান হওয়া উচিত, নইলে হয়ত বড় একটা জটিল সঙ্কটে আপনাদের প'ড়্‌তে হবে। আর—আমিও এখন ঠিক জান্‌তে চাই, সীতা আমাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত কিনা।”

ভূপেশবাবু কহিলেন, “তুমি কি ব'ল্‌তে চাও, বেণুকে সীতা ভালবাসে বা বাসতে পারে,—তাই সে তোমার উপরে তেমন খুসী এখন নয়?”

নীরেন্দ্র কহিল, “সে রকম সন্দেহ আমার মাঝে মাঝে হয়। যাই হ'ক, এ সম্বন্ধে শীঘ্র একটা কিনারা যাতে হয় তাই আমি চাই।”

“হুঁ—! বেণুকে সীতা শ্রদ্ধা করে খুব। তবে ভালবাসা—তা হ'লেও আমি বড় আশ্চর্য্য হব না।”

“আপনি এ কি বলছেন? বেণুকে সীতার ভালবাসা—এর চাইতে অসঙ্গত, আপনার মেয়ের পক্ষে এর চাইতে হেয় একটা ব্যাপার—আর কিছু হ'তে পারে কি?

ভূপেশবাবু ধীরে ধীরে কহিলেন, “তবে অসম্ভব কি অস্বাভাবিক ব'লে আমি মনে করি না। আমার মনে হয়, বেণুতে এমন কিছু আছে, যার টানে রাজার মেয়ের মনও তাতে অনুরক্ত হ'তে পারে।”

নীরু বড় বিরক্ত হইয়া কহিল,—"তা হ'লে কি বেণুর সঙ্গেই আপনি সীতার বিবাহ দিতে চান ?"

"বেণুর সঙ্গে সীতার বিবাহ! এ রকম একটা কথা —তার কোনও সম্ভাবনা মনেও কখনও হয়নি। এটা ভাব্বার কথা বটে। সীতা বেণুকে ভালবাসে। কথাটা নূতন—তবে খুব সম্ভব বটে।——"

নীরেন্দ্র আগুন হইয়া উঠিল, কহিল, 'তা বেশ, বেণুর সঙ্গেই তবে সীতার বিবাহ দেবেন। আমার আর কোন কথা নাই তবে,—এখন উঠি, নমস্কার।"

ভূপেশবাবু কহিলেন, "নীরু, দেখ রাগ করোনা। সীতা বড় হ'য়েছে, তার অমতে কোথাও তাকে বিবাহ দেওয়াটা ঠিক নয়। তবে বেণুর সঙ্গে তার বিবাহ—এটাও ঠিক থাপ খাবে কিনা, বুঝ্‌তে পাচ্চি না, তবে সত্যিই যদি তাকে সে ভালবেসে থাকে—"

"বেশ বিয়েই দিবেন। বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা বেশ থাপ খাবে।"

গম্‌ গম্‌ করিয়া নীরু চলিয়া গেল।

ভূপেশবাবু নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। মনটা একেবারে এই চিন্তায় ডুবিয়া গেল।

কথাটা নূতন, বড় একটা চমকই প্রথমে লাগিয়াছিল। কিন্তু বেণুর মত অমন ছেলে,—দৈহিক স্বাস্থ্যে, শক্তিতে,—কর্ম্মকুশলতায় অতুলনীয়—যেন মূর্ত্তিমান পৌরুষ। সরল, উদার, অমায়িক, প্রাণভরা সবল সুস্থ একটা আনন্দের স্ফূর্ত্তি। সর্ব্বত্র সপ্রতিভ, নির্ভীক, আপনা পৌরুষের মর্য্যাদায় কেমন আপনাকে দিব্যি ধ'রে রেখেছে—কারও কাছে কিছুতেই যেন সে খাট নয়।

এমন যুবকের প্রতি কোন্ কুমারীর চিত্ত না আকৃষ্ট হইয়া পারে? সীতা যদি তাকে ভালবাসিয়াই থাকে, উন্নত অবিকৃত নারী-প্রাণের পরিচয় সে দিয়াছে। তাকে দোষ দেওয়া যায় না। নীরু বলিল, বাঁদরের গলায় মুক্তার মালা।—না না,—তা বলা যায় না। বরং বীরের গলায় বিজয়ের পুষ্পমালা! কিন্তু তবু—সীতার সঙ্গে তার বিবাহ কি সম্ভব? অবশ্য কুলে শীলে সে হীন নয়,—তবে গরীব! তার ঘরে সীতা কি সুখে থাকিবে? আবার যুদ্ধে যাইতে চায়। সত্যই বড় সঙ্কট উপস্থিত হইল।

কাগজে পত্র সব পড়িয়া রহিল। রাত্রি প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত নিশ্চলভাবে বসিয়া তিনি ভাবিলেন।

আহারাদির পর নিভৃতে শয়নগৃহে তিনি গৃহিণীকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। অনেক আলোচনা হইল। শেষ উভয়েরই এই এক সিদ্ধান্ত ঠিক হইল যে সীতা যদি সত্যই বেণুকে ভালবাসিয়া থাকে, তবে বিবাহ দেওয়াই ঠিক। এক গরীব, আর বিলাত যায় নাই—কি বড় একটা পাশটাশ কিছু করে নাই,—নহিলে সর্ব্বাংশে বেণু সীতার যোগ্য পাত্র। নীরুটা হউক বড়লোকের ছেলে—হউক বিলাত ফেরতা ব্যারিষ্টার—বেণুর কাছে কিছু নয়। সীতা নিজেও তাকে পছন্দ করে না। তা বেণু বড় পাশ না করুক, বিদ্যা তার এমন কমই বা কি? গরীব আছে তিনি টাকা-কড়ি দিলেই চলন সই অবস্থা তার হইবে। তবে শ্বশুরের টাকায় বড়মানুষী সে যদি না চায়।—যে তেজী ছেলে, না চাইতেও পারে। তা—আসল কথা হইতেছে, মেয়ের মন, সে যদি সচ্ছন্দে বেণুর ঘরে যাইতে চায়, তবে তাঁহাদের এমন আপত্তি কি? আর সুবিধা কিছু করিয়া দিলে, ক্ষমতা আছে, বেণু নিজেই হয়ত বেশ উন্নতি করিতে পারিবে। তবে যুদ্ধে যাইতে চায়। ঐখানেই ত গোলের কথা। তা দেখা ত যাউক, কি সে বলে? তারপর যা হয় হইবে।

(৭)

বেণু সব শুনিল। পরদিন সন্ধ্যার পর নিভৃতে ভূপেশ বাবু সব কথা তাকে খুলিয়া বলিলেন। শুনিয়া বেণুর প্রাণটা—কেমন যেন হইল—যেন এক এক বার নাচিয়া উঠিয়া আবার দমিয়া দমিয়া যাইতে লাগিল। কি ভাবে সে কথাটা গ্রহণ করিবে, কিসে বলিবে, বলিতে পারে, বুঝিয়া কূল পাইল না। এই বড়লোকের বাড়ীতেও কখনও কোনও লজ্জার সঙ্কোচ তার হয় নাই,—কিন্তু আজ সে বড় বেশী সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। মুখ তুলিয়া সোজা মুখের দিকে চাহিয়াই সকলের সঙ্গে সহজ সরলভাবে সে এতদিন কথা বার্ত্তা বলিয়াছে। কিন্তু আজ সে মুখ তুলিতে পারিল না। বালিকার মত লজ্জায় আরক্ত মুখখানি নত করিয়া সে বসিয়া রহিল।

ভূপেশবাবু কহিলেন, "তা, কি বল এখন বেণু?

কথঞ্চিৎ আত্ম-সম্বরণ করিয়া বেণু কহিল, "আজ্ঞে

এমন একটা কথা স্বপ্নেও কখনও মনে ক'ত্তে পারিনি। এটা কি- ভাল হবে ?

"কার পক্ষে ? তোমার ?"

"না—না। আমার কথা কিছুই ভাব্‌ছি না। সী— এই আপনাদের।"

"তা ত তোমাকে খুলেই সব ব'ল্লাম। অনেক বিবেচনা ক'রে—ভাল হবে ব'লেই—এই মত আমরা স্থির ক'রেছি। এখন তোমার অভিপ্রায় জান্‌তে চাই।"

"এ যেন কেমন বড় অসম্ভব—বড়ই অস্বাভাবিক ব'লেই মনে হচ্চে——"

ভূপেশবাবু কহিলেন, "আগে ভাবিনি বেণু, কিন্তু এখন যত ভাব্‌ছি, ততই মনে হ'চ্চে, এর চাইতে সম্ভব আর স্বাভাবিক আর কিছু হ'তে পারে না। আমরা এখন অন্ধ হ'য়ে আছি, মানুষ চিনি না, পৌরুষের মর্য্যাদা করি না.— বাইরের সাজে ভুলে পুতুল মাথায় তুলে নিয়ে নাচি। কিন্তু মানুষ যে, মানুষের টান তার সব চেয়ে বড় টান। নারী যে, পৌরুষকে'সে সব চেয়ে বেশী আদরে বরণ ক'র্‌বে। তা— এখন কি বল বেণু ?"

বেণু আনতমুখে কহিল, "যদি আপনার অনুমতি হয়, আগে সীতার সঙ্গে একবার দেখা ক'ত্তে চাই।"

"বেশ, তাই ক'র্‌বে। আজই কর না ?"

"আজ—পারব না,—কাল দেখা ক'র্‌ব।"

ভূপেশবাবুকে প্রণাম করিয়া বেণু উঠিয়া গেল।

পরদিন দিন ভরিয়া বেণু তার বাঁধা কাজ সব করিল,— ধীর নিঃসঙ্কোচ নির্ভীকভাবে—আগের মতই হাসিয়া গল্প করিয়া সে তার কাজ করিয়া গেল,—যেন এমন কিছুই ঘটে নাই, যাতে তাঁর একটুও ভাবান্তর হইতে পারে। সন্ধ্যার পর সে সীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। সীতা সলজ্জভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল,—আরক্ত মুখখানি একেবারে নত হইয়া পড়িল।

বেণু কহিল, "ব'স সীতা !"

সীতা পাশেই একখানি চেয়'রে বসিল। বেণুও আসন গ্রহণ করিয়া একটু কি ভাবিল,—তারপর কহিল, "সীতা! একটি কথা তোমাকে ব'লব ব'লে এসেছি।"

মৃদুস্বরে সীতা কহিল, "বলুন।"

"ভূপেশবাবু আমার সঙ্গে তোমার—বিবাহ দিতে চান। কিন্তু আমি এখনও ঠিক বুঝ্‌তে পাচ্চি না—এ বিবাহে কি ক'রে তুমি সুখী হবে। সত্যি কি তুমি—"

সীতা কহিল, "কেন আমাকে আর লজ্জা দিচ্চেন ? বাবাই ত সব ব'লেছেন।"

বেণু কহিল, "হাঁ, তিনি সবই ব'লেছেন। কিন্তু তবু তোমার সঙ্গে একবার দেখা ক'ত্তে চেয়েছি। অনর্থক কোনও দীনতার অভিনয় ক'র্‌ব—বাস্তবিক তা মনে করি'নি,— যদিও তুমি আমায় ভালবাসতে পার, আমার সঙ্গে সুখে থাকতে পার, এমন একটা কথা স্বপ্নেও কখনও ভাব্‌তে পারিনি। তবে—আজ সাহস ক'রে ব'ল্‌তে পাচ্চি— ব'ল্‌তেও এসেছি—তোমাকে আমি ভালবাসি। তোমাকে খুব শ্রদ্ধা করি জান, কিন্তু সেই শ্রদ্ধার অন্তরে প্রাণের বড় একটা মধুর আকর্ষণও ছিল, যা নিজের কাছেও কখনও স্বীকার ক'ত্তে ভরসা পাইনি। কিন্তু আজ আর সে সঙ্কোচ আমার নেই,—প্রাণের তলে যা চেপে রাখ্‌তে চেয়েছি, প্রাণভ'রে তা উঠেছে। নিঃসঙ্কোচে আমার প্রাণের সকল কথা তোমাকে আজ ব'ল্‌তে এসেছি। তুমি ভালবেসেছ— তাই, যেন মনে ক'রোনা—শুধু শ্রদ্ধায় শুধু কৃতজ্ঞতায়—, কতকটা ভয়ে ভয়ে কুণ্ঠিতচিত্তে তোমাকে গ্রহণ ক'ত্তে প্রস্তুত হয়েছি। যদি তা হ'তাম, তোমার এ ভালবাসার বড় অবমাননাই তাতে হ'ত। তুমি ভাল বেসেছ,—আমিও ভালবেসেই তোমাকে পেতে চাই, ভালবাসা দিয়েই তোমার ভালবাসার মর্য্যাদা রাখ্‌ব, তাই আজ তোমাকে ব'ল্‌তে চাই।"

সীতা মুখ তুলিতে পারিল না,—একটি কথাও বাহির হইল না। অপূর্ব্ব এক আনন্দের উচ্ছ্বাসে সমস্ত দেহ তার কম্পিত হইয়া উঠিল,—প্রাণ একেবারে পরিপূর্ণ হইল। এ পরিপূর্ণতা সকল ভাষাকে অভিভূত করিয়া রাখে।

বেণু আবার কহিল, "কিন্তু শুধু ভালবাসি ব'লেই তোমাকে গ্রহণ ক'ত্তে পারি না। তোমার যোগ্য আমি হ'তে চাই। কেউ যে ব'ল্‌বে সীতা অযোগ্য পাত্রে আত্মদান ক'রেছে—তোমার এ অবমাননা কখনও আমার সইবে না। তোমাকে বিবাহ ক'র্‌বার আগে, আমি দেখাতে চাই, তোমার অযোগ্য আমি নই। আমি চাই, আমার স্ত্রী ব'লে তোমার গৌরবে লোকে তোমায় ধন্য ধন্য ক'র্‌বে, হীন ব'লে কৃপায় তোমার দিকে কেউ চাইবে না।"

সীতা কম্পিত মৃদুকণ্ঠে উত্তর করিল, "যদি কেউ তা চায়, সেই তারই হীনতার পরিচয় দেবে।"

বেণু কহিল, "তা হক, তাই বা কেন আমরা সইব? যতই হীন সে হ'ক, কাউকে কেন তোমাকে এইটুকু অমর্য্যাদা ক'র্‌বার অবসরই বা আমি দেব?"

"আপনি কি ক'র্ত্তে চান?"

বেণু উত্তর করিল, "দেখ, পদ-গৌরবে তোমার পিতা আমার চেয়ে লোকসমাজে অনেক বড়। আমার ধন নাই, বিদ্যা সামান্য, পদগৌরব একেবারে শূন্য। কিন্তু তোমার পিতা সত্যই ব'লেছেন, পুরুষের পক্ষে পৌরুষ সকলের বড়। তিনি বলেন, আমার সেই পৌরুষ আছে। কিন্তু লোকের কাছে তার প্রমাণ আমাকে দিতে হবে। যদি পারি, তখন বড় হ'য়ে—বাস্তবিক লোক-সমাজেই তোমার যোগ্য হ'য়ে—তোমাকে স্ত্রী ব'লে গ্রহণ করব। তার আগে পারব না।"

"কিসে সে প্রমাণ হবে? আপনি ত যুদ্ধে যেতে চান——"

"হাঁ,—আগে চেয়েছিলাম, যুদ্ধের টানে, এখন আরও চাই তোমার টানে। আমি যুদ্ধে যাব,—যদি বিধাতা দয়া করেন, পৌরুষের সেই বড় কর্ম্মক্ষেত্রে পৌরুষেই যদি আমি বড় হ'তে পারি,—সত্যি কারও চাইতে ছোট ব'লে তখন আমি আপনাকে মনে ক'র্‌ব না, আর কেউও তা মনে ক'র্‌বে না। তখন—যদি ফিরে আসি—তোমায় বিবাহ ক'রব।—আমার জন্য অপেক্ষা ক'র্ত্তে পার্‌বে সীতা?"

বেণু সীতার হাতখানি হাতে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "তুমি ভালবাস, তোমায়ও বড় ভালবাসি, তাই আজ এ কথা বলছি। জুলুম ব'লে ত মনে ক'র্‌বে না? পার্‌বে অপেক্ষা ক'র্ত্তে?"

"জুলুম কিসে? ছি! পারব—সুখেই পারব।"

দুই হাতে সীতার হাত দুখানি বেণু আরও জোরে চাপিয়া ধরিল।

সম্পূর্ণ।

ছেলেমানুষী।

উষার আধ আঁধার-আলোয় যখন গাহে চন্দনা
নিদ্রা-শিথিল অধর-পরশ তখন লাগে মন্দ না।
সুপ্ত দুটি আঁখির টানে
মুখ দুখানি কাছে আনে
সকাল রাতের শীতল বাতাস মোটেই অপছন্দ না।
দ্বিপ্রহরে যখন ঘুঘু বিষাদ করুণ সঙ্গীতে
কাঁপায় তার নীরবতায় মিলে দুটি সঙ্গিতে,
মিষ্টি ভারি চক্ষু দুটি
জান্‌লা দিয়ে পলায় ছুটি
করুণতায় যখন চাহে ঘুঘুর তানই লঙ্ঘিতে।

জ্যোৎস্না যখন ফেলে ঢেকে নীহারিকায় প্রান্তরে
চক্ষু যখন চেয়ে চেয়ে মোটেই নহে ক্লান্ত রে,
মন্দ দুটি চরণ চতুর
বিদ্রোহী যে মনের মধুর
শব্দ বাজে কাণের মাঝে স্নিগ্ধ অবিশ্রান্তরে?

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সৃষ্টি-বিফলতা।

স্বর্ণ ভুবনে গন্ধ বিহীন,
নাহি নন্দনতরুতে ফুল,
ইক্ষুদণ্ডে ফলের অভাব,
নিঃস্ব লেখক,—বিধির ভুল॥

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ।

স্বর্গীয় কবিরাজ

দুর্গাপ্রসাদ সেন।

গত একবৎসরে বিধাতা ভারতগগন হইতে যে কয়েকটি নক্ষত্রপ্রদীপ স্বভবন সজ্জিত করিবার জন্য চয়ন করিয়া লইয়া গিয়াছেন, বঙ্গদেশের চিকিৎসক-শিরোমণি ঋষিকল্প কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ সেন মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম ও শেষবর্ত্তী। গত শতাব্দীর মধ্যে স্বকীয় অসামান্য প্রতিভা ও পরিশ্রমের বলে যাঁহারা সামান্য অবস্থা হইতে প্রতিকূল ঘটনাবলী অতিক্রম করিয়া মানব-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছেন, কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ সেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ১২৩৯ বঙ্গাব্দের ২৯শে আষাঢ় তিনি তাঁহার মাতৃভূমি ঢাকার অন্তর্গত কমরপুর নামক একটি ক্ষুদ্রগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। যখন তিনি একাদশ দিবসের শিশুমাত্র, তখন তাঁহার জননী ইহলোক ত্যাগ করেন। যাহাহউক, এই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠা সহোদরা, ঢাকার অন্তর্গত বিখ্যাত সোনারঙ্ গ্রাম নিবাসী প্রসিদ্ধনামা কবিরাজ ৺দীনবন্ধু সেন মহাশয়ের মাতা, তাঁহাকে স্তন্যাদি প্রদান করিয়া সঞ্জীবিত রাখেন। দুর্গাপ্রসাদের পিতা ৺নীলাম্বর সেন ইহার পরে আবার দারপরিগ্রহ করেন। তাহার এই বিমাতা বিমাতাসাধারণের ন্যায় ছিলেন না, পক্ষান্তরে নিতান্ত স্নেহশীলা ছিলেন। কবিরাজ মহাশয় তাহার স্নেহের কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধবয়সেও সাশ্রুনেত্র হইয়া পড়িতেন। এই পুণ্যবতী রমণীই পরলোকগত কবিরাজ সুধীপ্রবর অন্নদাপ্রসাদ সেনের জননী ছিলেন। দুর্গাপ্রসাদের পিতা ঢাকা নগরীতে থাকিয়া চিকিৎসা করিতেন ও তাৎকালিক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের অগ্রগণ্য ছিলেন। তাহার প্রসিদ্ধি ও প্রতিপত্তি এত অধিক ছিল যে ঢাকানগরীর সে সময়ের প্রবাদ বাক্যের মধ্যে পর্য্যন্ত তাহার বটিকার নাম সগৌরবে স্থান লাভ করিয়াছিল। এই নীলাম্বর সেন অতিশয় প্রাচীনতন্ত্রী পুরুষ ছিলেন। তখন দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। বালক দুর্গাপ্রসাদের অসামান্য প্রতিভা লক্ষ্য করিয়া তাহার পিতার এক আত্মীয় তাঁহাকে ইংরাজী পড়াইবার পরামর্শ প্রদান করেন। বৃদ্ধ নীলাম্বরের এই বিজাতীয় ভাষায় প্রতি আদৌ কোন অনুরাগ ছিল না,—ফলে তাঁহার আত্মীয়ের পরামর্শ প্রত্যাখ্যাত হয়। দুর্গাপ্রসাদ বাল্যে সে সময়ে গ্রাম্য পাঠশালায় লব্ধ শিক্ষা সমাপন করিয়া স্বগ্রামবাসী পণ্ডিত রাজদুর্লভ শিরোমণির নিকট টীকা পঞ্জী ও বাদর্থ প্রভৃতির সহিত সমগ্র কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন, পরে সোনারঙ্ গ্রামে দীর্ঘকাল বাস করিয়া তত্রত্য পণ্ডিত-প্রবর কালীকান্ত শিরোমণির নিকট সাহিত্য ও দর্শনাদি শাস্ত্র এবং প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য কালিদাস গুপ্ত কবিরত্ন মহাশয়ের নিকট সমগ্র আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁহার আয়ুর্ব্বেদবিষয়িণী অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষা পিতা নীলাম্বর সেনের নিকট এবং সহযোগী চিকিৎসকভাবে অগ্রজ ভারতবিখ্যাত স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের নিকটেই হইয়াছিল। যাহাহউক, এই সময়ে দুর্গাপ্রসাদের পিতা স্বর্গীয় নীলাম্বর গঙ্গাতীরে বাস উদ্দেশ্যে সপরিবারে বৃদ্ধা মাতাকে লইয়া আসিয়া কলিকাতায় কুমারটুলীতে বাস করিতে থাকেন, এবং কিছুকাল মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই নীলাম্বর সেন মহাশয়ই কুমারটুলীর কবিরাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা, এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে কলিকাতায় তিনি যে সামান্যকাল বাস করিয়াছিলেন, সেই সময়ের মধ্যেই তিনি অসাধারণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ও উত্তরকালে স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেনের অলোক-সামান্য প্রতিষ্ঠাই ইহাদিগকে কলিকাতায় স্থায়িভাবে বাস করিতে বাধ্য করে। পিতার মৃত্যুর পর অগ্রজের সহিত দুর্গাপ্রসাদ চিকিৎসা ব্যবসায় পরিচালনা করিতে থাকেন, কিন্তু নির্ব্বিঘ্নে তিনি এই কার্য্য বহুদিন করিতে পারেন নাই। আনুমানিক যখন তাঁহার বয়ঃক্রম ২৪ কিম্বা ২৫ বৎসর, সেই সময়ে তিনি সর্ব্বাঙ্গগত বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হন। এই রোগ, তাঁহার চলিবার, কথা বলিবার, কঠিন পদার্থ গলাধঃকরণ করিবার, এমন কি স্পর্শানুভূতির শক্তি পর্য্যন্ত হরণ করিয়াছিল। বহু চিকিৎসায়ও ফল না হইতে দেখিয়া দুর্গাপ্রসাদ জগতের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক অনাদিনিধন ভবানীপতির শরণাপন্ন হন, এবং তাঁহার প্রসাদে প্রায় ১৪।১৫ বৎসর অশেষ কষ্ট ভোগ করিবার, পর এই রোগ হইতে

মুক্তিলাভ করেন। ভগবান্ তারকেশ্বর স্বপ্নাদেশে তাঁহাকে তাঁহার পায়স-প্রসাদ ও ব্রাহ্মণের পাদোদক ও পাদরজ ভক্ষণের অনুমতি প্রদান করেন, এবং তিনিও এই মহৌষধি ব্যবহারে আরোগ্য লাভ করেন। অতঃপর গঙ্গাপ্রসাদের গৃহে গৃহ-বিবাদের সূত্রপাত হইলে, ভ্রাতার আদেশ অনুসারে দুর্গাপ্রসাদ ভ্রাতৃদত্ত বর্ত্তমান কুমারটুলী ষ্ট্রীটস্থ তৃতীয় সংখ্যক বাটিতে উঠিয়া আসেন। এই সময়ে তাঁহার পুত্র সুবিখ্যাত স্বর্গীয় কবিরাজ নিশিকান্ত উপযুক্ত। দুর্গাপ্রসাদ পুত্রের সহিত একযোগে ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। গত ১৩১১ বঙ্গাব্দের মহাপূজার কিছুকাল পূর্ব্বে নিশিকান্ত অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি অসামান্য ধৈর্য্য-বলে দুর্ব্বহশোক দমন করিয়া পৌত্র শ্রীযুক্ত কালীভূষণ সেন মহাশয়কে লইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অবশেষে ভগবানের আহ্বান আসিয়া তাঁহার শ্রুতিমূলে উপনীত হইল। গত ৩০শে ফাল্গুন রাত্রি ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত সুস্থ শরীরে যাপন করিয়া একবার শৌচান্তে তিনি তাঁহার মৃত্যু আসন্ন বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং নিজেই নিজের গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করিয়া এক ঘটিকা মধ্যে ভগবানের নাম করিতে করিতে গঙ্গাগর্ভে তনুত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার পঞ্চাশিতি বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল, আমাদের দেশে বর্ত্তমানে বিখ্যাত পুরুষের যে ব্যাপক অর্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে দুর্গাপ্রসাদ তাঁহাদের মধ্যের কেহই ছিলেন না। সচরাচর লোকে যাহাকে সাধারণের উপকার (Public benefit) বলে, তিনি তাহার কিছুই করেন নাই বলিলেও হয়, এত-দ্ব্যতীত তিনি রাজনৈতিক বা সাহিত্যিকও ছিলেন না। দুর্গাপ্রসাদ ছিলেন চিকিৎসক, চিকিৎসার ক্ষেত্রই তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ছিল, এবং এই চিকিৎসা-জগতে বাস করিয়াই তিনি মানব-সেবা-ব্রতের ভারগ্রহণ পূর্ব্বক জগতের অশেষ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অভাবে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-জগতের যে ক্ষতি হইয়াছে শীঘ্র তাহার পূরণ হইবে কিনা তাহা সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানই বলিতে পারেন সময়—কালে তাঁহার ন্যায় চিকিৎসক আরও জন্মগ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার সহিত প্রাচীন-জগতের সকল বৈশিষ্টতার যে একটি মূর্ত্তি (a type of the ancient world) চিরতরে অন্তর্হিত হইয়া গেল, এ যুগে তাঁহার পুনরাবির্ভাব দুরাশামাত্র। বিদ্যা, বিনয়, ঐশ্বর্য্য, সরলতা, সৌজন্য ও ধর্ম্মপ্রাণতার এরূপ সম্মিলন একাধারে বর্ত্তমান-জগতে প্রায় দৃষ্ট হয় না। তিনি জীবনে বহু অর্থ ব্যয় এবং ৺কাশীধামে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা, ৺অন্নপূর্ণা পূজা ও স্বীয় পিতামাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বহু দরিদ্র, ব্রাহ্মণ ও আত্মীয়স্বজনকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করান, মুক্ত হস্তে দীনজনকে দান, দরিদ্র ছাত্রবর্গকে ও অন্যান্য বহু ব্যক্তিকে প্রত্যহ অন্নদান প্রভৃতি কার্য্যে অর্থের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তথাপি তিনি অর্থগৃধ্নু ছিলেন না। দরিদ্র ব্যক্তি মাত্রই তাঁহার নিকট হইতে বিনামূল্যে উপদেশ ও ঔষধ পাইত। ধনী ব্যক্তিবর্গকেও তিনি অর্থের নিমিত্ত পীড়ন করিতেন না। তাঁহার কৃত-কর্ম্মের জন্য গর্ব্ব ছিল না, সম্পাদনীয় কর্ম্মের নিমিত্ত আড়ম্বর ছিল না; দেবতা-ব্রাহ্মণের প্রতি আন্তরিক ভক্তির পরিমাণ অসীম ছিল; তিনি জীবনে তাঁহার আরাধ্য ব্রাহ্মণের পাদোদক ভিন্ন ঔষধ পান করেন নাই, এমন কি কঠিন রোগাক্রান্ত সমাগত রোগীদিগকেও ঐ মহৌষধ ব্যবহার করিতে বলিতেন। তাঁহার ভক্তিতে আবেগের আবিলতা ব্যতীত অন্য কোন আবিলতা ছিল না। হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন তাহার অতিশয় প্রিয় ছিল। বস্তুতঃ "ন ধনং ন জনং ন সৌন্দর্য্যং কাময়ে, কেবলং ভবতাৎ তৎপদে ভক্তিরহৈতুকী," ইহাই জীবনের কামনা ছিল। ইহার বলে, ইহার আশ্বাসে তিনি বৃদ্ধবয়সে অসাধ্যব্যাধি অর্দ্দিতকে (Facial paralysis) ঔষধের সাহায্য ব্যতিরেকে জয় করিয়াছিলেন, ইহারই বলে তিনি উপযুক্ত বিখ্যাত পুত্র নিশিকান্তের এবং জ্যেষ্ঠ পৌত্র পরিণতবয়া বিধুভূষণের পরলোক-গমন-জনিত শোক বীরের ন্যায় সহ্য করিয়াছিলেন। ইহারই বলে তিনি পরলোকে হাসিতে হাসিতে গমন করিয়াছেন। তাঁহার আদেশে প্রত্যহ সায়াহ্নে ছাত্রগণ তাঁহার সমক্ষে বহুক্ষণ ধরিয়া হরি সঙ্কীর্ত্তন করিত। ঔষধ বিতরণ তিনি এত অধিক করিতেন যে তাহা বলিলে সাধারণ লোকের মনে অবিশ্বাস্য বলিয়া সন্দেহ জন্মিতে পারে। এমন কি প্রতিমাসে আমরা এক একজন ছাত্রও যে পরিমাণে ঔষধ বিতরণ করিয়াছি, তাহাতে একজন চিকিৎসকের সমগ্র বৎসরের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে।

তিনি জগতে যে সকল বস্তু ভালবাসিতেন তন্মধ্যে মানব,

সঙ্গীত ও ভগবানের নামই প্রধান। তাঁহার হৃদয় সরলতার আধার ছিল,—বালকও তাঁহার নিকট কোন প্রকারের সঙ্কোচ বোধ করিত না। ভাষায়, ব্যবহারে, কিছুতেই তাঁহার কুটীলতা বা আড়ম্বর ছিল না। তিনি প্রসন্ন গম্ভীর মূর্ত্তি হাস্যময় অথচ সুরসিক পুরুষ ছিলেন। রোগীসকল তাঁহার নিকট হইতে পুত্রের অধিক স্নেহলাভ করিত। তাঁহার গুণ বর্ণনা করিতে গেলে একটি প্রবন্ধ তাহার পক্ষে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, বস্তুতঃ যিনিই একবার তাহার নিকটস্থ হইয়াছেন ইহ জীবনে তিনি তাহাকে আর ভুলিতে পারিবেন না! বঙ্গ-ভূমি এইরূপ একটি চিকিৎসককে হারাইয়া যেরূপ ক্ষতিগ্রস্তা হইয়াছেন, তাহা ভাষায় বলিবার নহে। তিনি উপযুক্ত বয়সে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার গুণের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইলে শোক আপনা হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। ভগবান এই পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষের বংশের ধারা অবিচ্ছিন্ন ও চির উজ্জ্বল করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা; আর সেই স্বর্গগত মহাপুরুষের পাদপ্রান্তে যাহাতে আমরাও তাঁহার আদর্শ নয়নসমক্ষে বর্ত্তমান রাখিয়া তাঁহার ন্যায় জীবনযাপন করিতে পারি এই প্রার্থনা করিয়া তাঁহার মহিমান্বিত জীবন-বৃত্তান্তের সংক্ষেপে উপসংহার করিলাম।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত।

স্নেহ হারা।

তুমিত দিয়েছিলে তুমিত কেড়ে নিলে
বিফলে প্রাণ তবে কেন বা কাঁদে,
কেন বা আঁখি ঝ'রে কেন সে ঘুরে মরে
কেন না দৃঢ় করে হৃদয় বাঁধে।
স্মিরিতি কূলে কূলে যাতনা ফুলে ফুলে
মরম বাঁধ ছাপি কেন বা ওঠে।
কাহার পথ চাহি বিষাদ গান গাহি
আকুলে কোন পথে কোথা বা ছোটে।

বুঝি না দয়াময় বিশাল ধরাময়
কত কি ভাঙ্গা গড় নিখিল ভরি।
কাহার ইঙ্গিতে কোন সে সঙ্গীতে
আমরা হাসি কাঁদি খাটিয়া মরি।
আপন সুখে দুঃখে করম স্রোতমুখে
বেতস সম ভাসা ছিল যে ভাল;
পরের কোলে ফেলে স্নেহের দীপ জ্বেলে
আঁধার ঘরে কেন দেখালে আলো।

শ্রীগোবিন্দলাল মৈত্র।

স্বর্গালোক।*

(রূপক)

(১)

ক্রমে ক্রমে মেঘস্তর ঊর্দ্ধে সরিয়া গেল। কুয়াসার ঘন আবরণ ভেদ করিয়া নীল আকাশের গায়ে বিরাট পাহাড় শ্রেণী আবার ধীরে ধীরে দেখা দিতেছিল। সমুন্নত গিরিশৃঙ্গ শুভ্র তুষার-মণ্ডিত হইয়া বহুদূর হইতে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল।

এক সমুজ্জ্বল স্বর্ণাভ আলোকরশ্মি পূর্ব্বদিগন্ত অনুরঞ্জিত করিয়াছিল। উহার মৃদু উত্তাপে কঠিন বরফস্তূপ বিগলিত হইয়া রক্তবর্ণ গোলাপদাম মুকুলিত হইয়াছিল।

* ইংরাজী হইতে অনূদিত।

(২)

দুইটি মানবমূর্ত্তি বহুদূর হইতে আলোকরশ্মি লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছিল। বহুক্ষণ পথ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে তাহারা একত্রে আলোকরাজ্যে প্রবেশ করিল।

এতদিন যাহারা সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে চিরসাথী-ছিল, আজ হঠাৎ আলোকের সম্মুখীন হইবার পর তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষভাব জাগিয়া উঠিল।

একজন অপরকে উদ্দেশ করিয়া বলিল "তুমি এখানে কেন? এ আলোক আমার।" দ্বিতীয় ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল "মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক! উহা আমার আলোক।"

তৎপর তাহারা এতকালের স্নেহ-ভালবাসা সমুদয় বিসর্জ্জন দিয়া নির্দ্দয়ভাবে পরস্পরকে আক্রমণ করিল। তাহাদের পদতলে নিষ্পেষিত গোলাপের দলগুলি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া রক্তস্রোতে ভাসিয়া গেল।

এই সময়ে অকস্মাৎ তাহাদের মাঝখানে মৃত্যুর কালো-ছায়া নিপতিত হইল, তাহা দেখিয়া তাহারা ভীত হইয়া পলায়ন করিল, কিন্তু ছায়া তাহাদের অনুসরণ করিতে ছাড়িল না। তাহাদের রক্তে পৃথিবী কর্দ্দমাক্ত হইয়া গেল এবং গোলাপগুলি আবার নবমুকুলিত হইল।

কিন্তু আলোকরশ্মি তেমনি জ্যোতিষ্মান ছিল।

(৩)

আবার দুটি অপরূপ রূপলাবণ্যবতী রমণী বহুমূল্য বস্ত্রা-ভরণে ভূষিত হইয়া আলোকের পানে অগ্রসর হইতে লাগিল। একটি দুর্ব্বল, রোরুদ্যমান মৃতপ্রায় শিশুকে সঙ্গে লইয়া তাহারা আসিয়াছিল।

আলোকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একজন অপরকে বলিল "তুমি তোমার ক্রোড়স্থ শিশু প্রেমকে ছাড়িয়া দাও। দেখ, এখন আমরা গন্তব্যস্থানে পৌছিয়াছি। সৌন্দর্য্য-গৌরবে আমিই এ আলোক ও প্রেমের অধিকারিণী।"

অন্য নারী উত্তর করিল, "ওগো ছলনাময়ী! সৌন্দর্য্য তোমার কোথায়? এ পৃথিবীতে আমিই সৌন্দর্য্যের রাণী, প্রেম আমার ভৃত্য, আলোক আমার সম্পদ, অতএব আর কলহে কাজ নাই। এই প্রেম ও আলোক আমার।"

তাহাদের মাঝখানেও আবার সেইরূপ কালোছায়া পতিত হইল। মৃত্যুর করালহস্তে নিষ্পেষিত হইয়া সৌন্দ-র্য্যের রাণীদ্বয় অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

কিন্তু শিশুটি তখনও একা পড়িয়া কাঁদিতেছিল। আলোক তেমনিভাবে জ্বলিতেছিল।

(৪)

অবশেষে এক সঙ্গিহীন পান্থ আলোকের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার ক্লান্ত সুন্দর মুখে গভীর চিন্তার ছায়া পড়িয়াছিল, কারণ এ জীবনে সে কখনও পরিশ্রমের পুরস্কার পায় নাই।

অনাবৃত মস্তক ঊর্দ্ধে তুলিয়া সে আলোকরশ্মি দেখিতে পাইল এবং মৃদুহাস্য করিয়া আনন্দ গদ্‌গদকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "হে পরমেশ্বর, তোমাকে ধন্যবাদ! এই ত সেই আলোক।"

প্রেম এতক্ষণ একাকী পড়িয়া কাঁদিতেছিল, সত্যকে দেখিবামাত্র সে কাছে গিয়া তাহার পদদ্বয় চুম্বন করিল।

করুণকণ্ঠে প্রেম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে? কেন এত পরিশ্রম করিয়া আলোর সন্ধানে বাহির হইয়াছ? কই, তোমার মুখে শান্তি এবং পবিত্রতা ছাড়া বিদ্বেষভাব ত দেখিতে পাইলাম না?"

অপরিচিত পথিক স্মিতহাস্যে উত্তর করিল, "এ পৃথিবীতে আমি নিঃসঙ্গ এবং সকলের অশ্রদ্ধার পাত্র। আমার নাম সত্য। আমার কিছুমাত্র সম্বল নাই। একটা আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্তও না। একাই আমি আলোকের আশায় বাহির হইয়াছিলাম। আজ একাই তাহা পাইলাম, তাই আলোক-দাতাকে আমি ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি আমাকে উহা হইতে বঞ্চিত করেন নাই।" আবার ছায়া পতিত হইল। কিন্তু এইবার পূর্ব্বেকার মত কালোছায়া নহে। উহা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া বিকশিত হইল। শ্রান্ত পথিক এই অমৃতধারা পান করিয়া সুস্থ হইয়া উঠিল। প্রেম তাহার অশ্রুজল মুছিয়া ফেলিল, বহুদূর হইতে অপূর্ব্ব সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল এবং স্বর্গের আলোক সমস্ত অচলে ছড়াইয়া পড়িল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

তিনটী বাসনা ।*

হাসি মুখে গুটি গুটি
কাপড়ে ঢাকিয়া মুঠি
মা'র কাছে ছুটি' এল মেয়ে ;
সুমুখে দাঁড়ায়ে তা'র,
দুলায়ে গলার হার,
কহিল সে মুখ-পানে চেয়ে—
"আয় না মা খেলা করি,
—আমি যেন হ'ব পরী
তুই যেন হ'বি কাণা বুড়ী।"
বুঝিয়া পুঁটুর কথা
মা বলিল—"ভাল কথা,
বড় ক্ষিদে দেমা দু'টী মুড়ি।"
পুঁটু বলে—"না মা, তা' না
তুই অন্য কিছু চা' না
পুঁতি-মালা, বাঁশী—আরো কিছু।"
বুঝিয়া মেয়ের পুঁজি
মা ভাবিল মাথা গুঁজি
কহিল—"দেনা মা দুটো নিচু।"
ঠোঁট দুটি ফুলাইয়ে
এবার বলিল মেয়ে
—"তবে যা মা, তোর সাথে আড়ি।"
এই বলি' পুঁটুরাণী
ঘুরাইয়া মুখখানি
যেতে গেল মা'র কাছ ছাড়ি' ।
মা তাহার হাত ধরি'
কহিল মিনতি করি'
—"দিয়ে যা মা ছোট রাঙা বাঁশী"

কোথা গেল রাগ তা'র
"এই নেও" ব'লে মা'র
বাসনা পূরিল মেয়ে হাসি' ।
তারপর মৃদু হেসে
পুঁটু,—মার কোল ঘেঁসে
কাপড়ে ঢাকিয়া হাত বলে
"আরো চা'না—বাঁশী ছাড়া"
মা বলিল—"ভাবি দাঁড়া,
—পুঁতি-মালা দেমা পরি গলে।"
"বেশ বেশ" ব'লে পুঁটী
হেসে হয় লুটোপুটি
মার হাতে পুঁতি-মালা রাখি' ।
ধরি কচি হাত তার
মা বলিল—"কিছু আর
এখনো রয়েছে দিতে বাকি !"
কিছু নাই বুঝি' মেয়ে
বলে মুখ-পানে চেয়ে
"আজ না মা, কাল ফের দেবো।"
মা কহিল—"তা হ'বে না,
আজ আরো কিছু দেনা,
একটিও আরো কিছু নেবো।"
এই বলি মাতা কয়
"অন্য আর কিছু নয়,
সোণা মুখে চুমু খাবো আমি।"
লাজে রাঙা করি' মুখ
জড়ায়ে মায়ের বুক
মা'র মুখে দিল মেয়ে হামি।

* কোন একটি নিম্ন শ্রেণীর ইংরাজি পাঠ্য পুস্তকের গল্পের ছায়া অবলম্বনে লিখিত।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী।

পল্লীর প্রাণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পূর্ব্ব বৃত্তান্তের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :—নিবারণ শিখে নাই, সুতরাং বিষয় কর্ম্ম কিছু করিত না। জননী গাঙ্গুলী বলিষ্ঠ, কর্ম্মঠ ও সহৃদয় গ্রাম্য যুবক। লেখাপড়া বেশী ভবানীঠাকুরাণী এবং স্ত্রী কাদম্বিনীকে লইয়া বাড়ীতেই

থাকিত। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যাদব সহরে ওকালতী করিতেন, স্ত্রীপুত্র নিয়া সেখানে থাকিতেন, বাড়ীতে মাসে মাসে খরচ পাঠাইতেন। নিজের তেমন কাজ কিছু না থাকিলেও নিবারণ একেবারে অলস ও অকর্ম্মা হইয়া ঘরে বসিয়া থাকিত না। গ্রামের যুবকদের লইয়া লোকের উপকার হয়, এমন অনেক কাজ সে করিয়া বেড়াইত। ইহাতে যুবকগণ তাহার বড় অনুগত ছিল, এবং অন্যান্য অনেকেই তাহাকে বড় ভাল বাসিত। জননী ভবানীঠাকুরাণীও যারপর নাই বুদ্ধিমতী ও সহৃদয়া নারী ছিলেন, প্রতিবেশী ও দীনদুঃখী সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। শিবু বা শিবানন্দ নামে প্রতিবেশী একটি যুবক—জ্ঞাতি সম্পর্কে নিবারণের ভাই, নিবারণের বড় স্নেহের পাত্র ছিল,—সে এবার বি, এ পাশ করিয়াছিল।

গ্রামে বড় জল কষ্ট ছিল,—ঘোষালদের একটি এঁধো পুকুর ব্যতীত নিবারণদের পাড়ার আর গতি কিছু ছিল না। কিন্তু ঘোষালরা সে পুকুরটি কখনও সাফ না করায় সকলেরই বিশেষ অসুবিধা হইত। পঞ্চায়েত প্রেসিডেণ্ট তারিণী বাড়ুয্যে জ্ঞাতি সম্পর্কে নিবারণের মামা—পুষ্করিণী সংস্কারের জন্য কাহাকেও জোর করিয়া কিছু বলিতে বা আইনতঃ কোনও প্রতিকারের চেষ্টা করিতে সাহস করিতেন না। নিবারণ গিয়া তাঁহাকে বলিল, আইনের বলে বাধ্য করিয়া ঘোষালদের বাড়ীর কর্ত্তা হরিঘোষালের দ্বারা যদি তিনি সত্বর পুকুর সাফ না করান, তবে গ্রামের যুবকদের লইয়া দল বাঁধিয়া জোর করিয়া সে পুকুর সাফ করিবে। তারিণী বাড়ুয্যে হরিঘোষালকে বড় ভয় করিতেন। হরিঘোষাল বড় বদ লোক ছিলেন,—বিশেষ সেদিন বাজারে এমন একটা ঘটনা হইয়াছিল, যাহাতে তিনি হরিঘোষালের সঙ্গে প্রকাশ্যে কোনও গোলমাল করিতে ভরসা পাইলেন না। ঘটনাটি এই,—বাজারের চাউলের দোকানদার হারাণদত্তের ছেলে ডাক হরকরার কাজ করিত, আর সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চায়েতীর ট্যাক্স আদায় করিত। হরিঘোষাল বড় ঘুরাইতেন, ওয়াদামত দেখাও পাওয়া যাইত না। গোপালদত্ত বাজারে হরিঘোষালকে দেখিতে পাইয়া তাগিদ করে। ইহাতে বড় ঝগড়া বাধে,—এবং হরিঘোষাল গোপালকে প্রহার করায় একটা দাঙ্গার উপক্রম হয়। নিবারণ মাঝে পড়িয়া মিটাইয়া দেয়,—হরিঘোষালের সঙ্গে তাহারও কিছু বচসা হয়। গোপালদত্ত তাঁহাকে অপমান করিয়াছে এবং নিবারণ তাহার পোষকতা করিয়াছে, এই বলিয়া হরিঘোষাল বড় রাগিয়া যান।

যাহাহউক, পুকুর সাফ করা সম্বন্ধে নিবারণের প্রস্তাবে তারিণীবাড়ুয্যে ইঙ্গিতে অনুমোদন করিলেন। এবং ভরসা দিলেন, কোনও গোল হইলে তিনি নিবারণকে সাহায্য করিবেন।

হরিঘোষালের প্রতিবেশী বেণীমাধব বসু বড় উকিল ছিলেন এবং গ্রামেও তাঁহার বেশ প্রতিপত্তি ছিল। হরিঘোষালের ভাই অম্বিকাঘোষাল তাঁহার প্রধান মোহরের ছিলেন এবং বেশ দুপয়সা রোজগার করিতেন, ইহাতে এবং আরও কোনও কোনও কারণে ঘোষালরা বেণীবসুর বিশেষ অনুগ্রহভাগী ছিলেন।

হরিঘোষালের পরিবারে তাহার বালবিধবা ভগ্নী বামা অতি প্রচণ্ডা নারী ছিলেন, ভ্রাতৃবধূ দাক্ষায়ণীর উপরে তিনি বড় অত্যাচার করিতেন। দাক্ষায়ণী কখনও নীরবে সহিয়া যাইতেন, কখনও দুকথা শুনাইয়াও দিতেন। হরিঘোষালও ভগ্নীর পোষকতাই করিতেন, কারণ ভগ্নীকে তিনি নিজেও কিছু ভয় ও খাতির করিতেন। বামার নিজের কিছু নগদ সম্পত্তি ছিল। ভ্রাতার উপরে তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইত না। সুতরাং কাহাকেও তিনি গ্রাহ্য করিতেন না।

হরিঘোষালের খুড়তাত ভাই ছিলেন, তারকঘোষাল, ইনি যাহা রোজগার করিতেন, হরিঘোষালের হাতেই দিতেন, কয়েক বৎসর হইল তারকঘোষালের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর পর হরিঘোষাল তাঁহার স্ত্রী কমলাকে পৃথক করিয়া দেন, এবং নানা চক্রান্ত করিয়া তাঁহার সঙ্গে একটা লেখাপড়া করিয়া নেন যে কমলা পাঁচ টাকা করিয়া মাসহরা পাইবেন, এবং বাড়ীতে থাকিতে পারিবেন,—পারিবারিক সকল সম্পত্তির—এমন কি বসত বাড়ীর উপরেও সকল দাবী দাওয়া ত্যাগ করিবেন। একটি বয়স্থা কন্যা কুন্তী এবং বালকপুত্র ক্ষেতুকে লইয়া কমলা যারপর নাই দুঃখ পাইতেন। সহৃদয়া দাক্ষায়ণী গোপনে যখন যাহা পারিতেন, এটা ওটা দিয়া কমলার সাহায্য করিতেন। তবে বামা টের পাইলে বড় ঝগড়া বাধিত। বাজারে গোপালদত্তের সঙ্গে কলহ যেদিন হয়, সে দিন হরিঘোষাল একটি চিতল মাছ কিনিয়া আনেন। দাক্ষায়ণী গোপনে তার দুখানা মাছ কমলাকে

দিয়া আসেন। বামার সন্দেহ হওয়ায় বকাবকি করিয়া গিয়া কমলার পাকশাল হইতে সেই মাছ কাড়িয়া আনেন। পরদিন সকালে ক্ষেতুর মুখে সেই কথা শুনিয়া নিবারণ কিছু মাছ আম দুধ প্রভৃতি গোপনে পাঠাইয়া দেয়। ক্ষেতুর সঙ্গে সে কমলার ঘরেও একবার আসিয়াছিল। ঘরের চালে শণ নাই দেখিয়া নিবারণ বলিয়াছিল,—সে নিজেই দুই একজন সঙ্গীকে লইয়া নিজের বাড়ী হইতে শণ ও বাঁশ আনিয়া ঘর মেরামত করিয়া দিবে।

গ্রামে একজন বিধবা ছিলেন চন্দ্রমণি, তাঁহার আর কেহই ছিল না। বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতেন,—ফুল কুড়াইতেন, আর দুঃখের কথা বলিয়া নানাবিধ খাবার জিনিষ ও সংগ্রহ করিতেন,—তা ছাড়া এর কথা ওর কাছে বলিয়া ঝগড়াঝাঁটিও খুব বাধাইতেন। নিবারণ যখন খাদ্যদ্রব্যাদি পাঠাইয়াছিল, ঠিক সেই সময় চন্দ্রমণি আসিয়া কমলার ঘরের দ্বারে দাঁড়াইলেন। ক্ষেতুর কথায় চন্দ্রমণি জানিতে পারিলেন, দ্রব্যাদি সব নিবারণ পাঠাইয়াছে। কমলা তাঁহাকে একটি আম দিয়া বিদায় করিলেন এবং বিশেষভাবে তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, এ সব কথা যেন ওঘরে গিয়া না বলেন। চন্দ্রমণি বামাকে কিছু কলমীশাক দিবার অছিলা করিয়া হরিঘোষালের ঘরের দিকে গেলেন। এই সময় হইতে বর্ত্তমান পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইয়াছে।]

(৮)

বাড়ীতে ঢুকিয়াই চন্দ্রমণি দেখিলেন, পাকের ঘরের দাওয়ায় বসিয়া দাক্ষায়ণী মাছ কুটিতেছেন।

"মাছ কুট্‌ছিস্ বড়বউ ? কি মাছ এসেছে লো! চিংড়ী ?"

দাক্ষায়ণী বিরক্তির ভাবে উত্তর করিলেন,—হাঁ, দিদি, দেখনা এই একরাশ কুচো চিংড়ী এসেছে--বাছ্‌তে আমার ছদণ্ড গেল। এও কি একটু বড় মেলে না ? তা বাজারের যত ছাইভস্ম সস্তা জিনিষ খুঁজে খুঁজে আন্‌বে! মরণও কি হয় না আমার!"

চন্দ্রমণি কহিলেন, "ওঘরে দেখ্‌লাম চিতল মাছ এসেছে —এই এত বড় বড় কখানা কোল—যেন তক্ তক্ ক'চ্চে।"

"চিতল মাছ ? আহা বাছারা খাক্।—মুখ থেকে কাল মাছ দুখানা—কেড়ে নিল—"

জিভে কামড় দিয়া দাক্ষায়ণী সংত্রস্ত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাহিলেন।

কাল তবে কিছু একটু গুরুতর ব্যাপারই হইয়াছিল, ওরাও কথাটা ঘুরাইয়া নিল। আবার বড় বধূও বলিতে বলিতে ভয়ে চমকিয়া উঠিল। চন্দ্রমণির স্বভাবতঃই অতি প্রবল কৌতূহল একেবারে অসহনীয় মাত্রায় উঠিল।

"কেন লো, কি হ'য়েছিল কালকে ? ওরাও ব'লতে ব'লতে কথাটা যেন ঘুরিয়ে নিল,—আবার তুইও চম্‌কে উঠলি। কেন, হ'য়েছিল কি কাল্‌কে ? কে মাছ কেড়ে নিয়েছিল লো ?"

দাক্ষায়ণী আমতা আমতা করিয়া কহিলেন, "ওমা, মাছ আবার কে কেড়ে নেবে ?—বেড়ালের যে দৌরাত্ম্যি ঠাকুরঝি—এই ত কাল—থালা ভরা মাছ—একটু উঠে গেছি—তিন চারটে বেড়াল এসে সব মুখে করে নিয়ে গেল—"

"ওমা বেড়ালে মাছ নিয়েছে—তা অত চমকালি কেন ?—আমাকে এত লুকোবার কি হ'য়েছে লো ? তোদের ঘরের কথা—আর কথাই বা কি—আমি কি আর কাউকে ব'লতে যাব। সে অভ্যেসই অমার নেই।"

"না ঠাকুরঝি, লুকুবো কেন ? লুকোবার ত এমন কিছু হয়নি। তা ওরা যে চিতল মাছটাছ এক আধদিন খায় এ ঘরের লোকে সেটা—জানত দিদি সব—না জানাই ভাল।—তা কে মাছ দিয়েছে।"

"ওই আমাদের নিবু।—মাছ দিয়েছে, আম দুধ বাতাসা —কত দ্রব্যই পাঠিয়ে দিয়েছে! তা থাক থাক্, দুঃখী—দয়া ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছে—ভাল ক'রে একদিন খাক্! হুঁ—"

"আহা, নিবারণের বড় দয়ার শরীর!—দুঃখীকে এমন ক'রে কজনে দেয় ? এইত ঠাকুরঝি, আমরা ব'ল্‌তে ঘরের লোক্—কিছু দিয়েই ত তত্ত্ব ক'ত্তে পারিনে।"

"হাঁ, নিবু আমাদের খুব ভাল ছেলেই বই কি ? তবে জান কি ভাই, দুঃখী হ'লেই কেবল হ'য় না। পাওয়া থোয়ার ভাগ্যিই একটা কারও কারও থাকে—নইলে দুঃখী কি আর নেই ? সবাইকে কে এত দেয় বল। তা, বামা কোথায় লো ?"

দাক্ষায়ণীর ভয় হইল। এসব কথা ননন্দার কাণে গেলে, এ আনন্দে ওদের বিষ তুলিয়া তিনি ছাড়িবেন।

"কেন ঠাকুরঝি? তাকে খুঁজছ কেন?"

"এই দুটো কলমী শাক এনেছি, দিয়ে যাব। সে দিন ব'লেছিল——"

"সে ত—আহ্নিকে ব'সেছে এখন। বরং ওই হবিষ্যের ঘরের দোরে রেখে যাও,—আমি ব'লব এখন।"

"কোথায় আহ্নিকে ব'সেছে? বড় ঘরে বুঝি?"

"হাঁ,"—এদিক ওদিক একটু চাহিয়া চাপাস্বরে দাক্ষায়ণী কহিলেন, "তা দেখ দিদি,—দোহাই তোমার—এসব কথা যেন ভাই ঠাকুরঝিকে কিছু ব'লো না। জান ত সব—বড় অনর্থ হবে। আহা, পরে পাঠিয়ে দিয়েছে—সুখে কিছু মুখেই দিতে পারবে না।"

চন্দ্রমণি জিভ কাটিয়া কহিলেন, "ওমা, তাই কি আমি ব'লব? সর্ব্বনাশ! তবে শাক দুটি হাতে ক'রে এনেছি—তার কাছেই গিয়ে দিয়ে আসি। কে জানে, শেষে হয়ত ভাই অনুযোগ দেবে—ব'লবে 'দিদি, এলে—একটিবার দেখা ক'রেও গেলে না।' আমার ত ভাই সবারই মন রেখে চ'লতে হয়। হুঁ————!!"

চন্দ্রমণি গুটি গুটি গিয়া বড় ঘরে উঠিলেন। দাক্ষায়ণীর মাছ বাছা হইল,—মাছ ধুইতে তিনি ঘাটে গেলেন। সেখানে কমলার সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল।

দাক্ষায়ণী সভয়ে কহিলেন, "সর্ব্বনাশ ক'রেছিস্ ছোট-বউ!"

কমলা চমকিয়া উঠিলেন।

"কেন, কি হ'য়েছে দিদি?"

"বলি, নিবারণ তোদের মাছটাছ কিছু পাঠিয়ে দিয়েছে, চন্দর ঠাকুরঝিকে তা দেখালি কেন? তোর কি একটু বুদ্ধি নেই?"

কমলা উত্তর করিলেন, "ওমা, আমি কি দেখিয়েছি দিদি? কোত্থেকে আবাগী এসে দোরের কাছে দাঁড়াল—"

"তা নিবারণ পাঠিয়েছে কেন ব'ল্লি। বাজার থেকে নিজে এনেছিস্ ব'ল্লেই হ'ত। না হয় আর কারও নাম ক'রতিস্। নিবারণের ওপর যে ওরা হাড়ে হাড়ে চটা।"

"কি ক'রব দিদি?—ক্ষেতু টপ ক'রে ব'লে ফেল্লে। তা, চন্দরঠাকুরঝি কি ঠাকুরঝিকে সব ব'লে দিয়েছে?"

"ব'লেনি এখনও, তবে না ব'লে কি ছাড়বে? একটা অনর্থ আজ বাধাবে দেখছি।"

কমলা ভ্রূকুটি করিলেন, কহিলেন, "কি আর অনর্থ বাধাবে? ব'লতে কিছু আসে, আমিও দুকথা শুনিয়ে দেব। কেন, এত সইতে যাব কেন? তারটা কিছু নিয়ে ত আর খাচ্চিনে।"

দাক্ষায়ণী উত্তর করিলেন, "সত্যি বোন, কত আর লোকে সইতে পারে? তবে আমার নাকি উপায় নেই, সবই সইতে হয়। তুই এত সইতে যাবি কেন? পাঁচ টাকা ক'রে খরচ দেয়,—সে কি খাতির ক'রে দেয়? তার জন্যে এত ভয় কি তোর? বেশী ক'রেও এক পয়সা দেবে না? ওই যা দেয়, তাও না দিয়ে পারবে না। সত্যি আজ যদি কিছু ব'লতে আসে, শক্ত ক'রে দু কথা শুনিয়ে দিবি। হাঁ!"

খালুই হইতে একমুঠা চিংড়ি তুলিয়া নিয়া দাক্ষায়ণী চুপি চুপি কহিলেন, "এই মাছ খাবলা নিয়ে যা,—ওদের ভেজে দিস্—"

"না দিদি, আর কাজ নেই। মাছ ত র'য়েছেই, আর কুন্তী বড় রাগ ক'রবে। আর কাজ কি দিদি? মিছে তোমারও জ্বালা, আমারও জ্বালা। যা হয় কিছু জুটলেই হল।"

দাক্ষায়ণী একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া মাছ খাবলা আবার খালুইতে রাখিলেন। কহিলেন, "আর এম্নি পোড়ার দশাও হ'য়েছে,—নিজের ঘর সংসার—তাও যেন সাত চোরের এক চোর হ'য়ে আছি। ক্ষেতু, কুন্তী—ওরা কি আমার পর বোন্? কত দুঃখু পাচ্চে—একটা কিছু দেব্য ফেলা গেলেও হাতে ধ'রে ওদের দিতে পারিনে। আর পেটেও এম্নি আদাড় কতকগুলো এসে জন্মেছে—যেন ওৎপেতে থাকে—হতভাগারা! কিছু যদি দিয়েছি—অমনি গিয়ে লাগিয়ে দেবে? কত পাপ ক'রেই যে এসেছিলাম বোন্!"

ওদিকে চন্দ্রমণি গিয়া ঘরে উঠিলেন। বামাসুন্দরী নাসিকাগ্রে করাঙ্গুলী স্থাপন পূর্ব্বক পূজার আসনে বসিয়া ছিলেন,—তিনি প্রণায়াম করিতেছিলেন।

"এই যে চন্দরদি! এস!—ও বিন্দী! ও পটলী! ওলো, পোড়ারমুখীরা কোথায় গে মলি! একখানা আসন এনে দে না গতর খাকীরা! বলি, ও বড়বউ! ম'রেছে! গোষ্ঠী শুদ্ধকে খাটে নিয়েছে।"

নাসিকাগ্র করাঙ্গুলী তখনও পুষ্ট ছিল,—কারণ প্রাণায়াম শেষ হয় নাই। পূজার কোনও ক্রিয়ারই ইহাতে বাধা—বামার কেন, কাহারও হয় না,—মনে মনে মন্ত্র আবৃত্ত বা স্মৃত হইবে,—হস্তসঞ্চালনে পূজার ক্রিয়া চলিবে। চক্ষুর দৃষ্টি, কর্ণের শ্রুতি, অধরের হাসি, কণ্ঠ ও রসনার সবল চালনা—কেন বিষয়ান্তরে তখন প্রযুক্ত হইতে পারিবে না? একাধিক কার্য্য এক সঙ্গে করিতে পারা—বরং অধিকতর শক্তিরই পরিচায়ক!

চন্দ্রমণি কহিলেন, "ঘাটে গেছে। বুঝি মাছ ধুতে থাক্—থাক্, আসনে আর কি দরকার? এম্‌নিই আমি বস্‌ছি।"

এই বলিয়া চন্দ্রমণি মাটিতেই হাঁটু ভাঙ্গিয়া উচু হইয়া বসিলেন। আঁচল হইতে কত গাছি ডকৃতকে কলমী শাক বাহির করিয়া সম্মুখে রাখিলেন—আমটি হাতেই রহিল।

বামা হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, "বাঃ! দিব্যি শাকগুলি ত। বাড়ুয্যেদের পুকুর থেকে বুঝি আন্‌লে?"

"হাঁ বোন্, সকালে শাক তুলে এনেছিলাম,—ভাব্‌লাম বলি, যাই বামাকে দুটো দিয়ে আসি। কলমী শাক সে ভালবাসে।"

"তা বেশ ক'রেছ দিদি! ওদের ওই পুকুরটায় দিব্যি কলমী শাক হয়। আর আমাদের এই এঁধো পুকুরটা—ঝাড়ু মার—ঝাড়ু মার! কেবল প্যানা—কেবল প্যানা!"

বামার প্রাণায়াম হইল। যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করিয়া, দেবতার উদ্দেশ্যে তিনি পাদ্য অর্ঘ্যাদি টাটে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। চন্দ্রমণি হাতের আমটি একটু নাড়িয়া চাড়িয়া সম্মুখে রাখিলেন।

চন্দ্রমণির প্রাণটা আইঢাঁই করিতেছিল—কেমন করিয়া তিনি কমলার গৃহে প্রেরিত নিবারণের উপঢৌকনাদি সম্বন্ধীয় সকল সংবাদ সালঙ্কারে বামার কর্ণগোচর করিবেন! তা ছাড়া, মৎস্য-সংক্রান্ত গূঢ় রহস্যটা জানিবার জন্যও তাঁহার মনটা একেবারে অধীর হইয়া উঠিতেছিল। কমলা বারণ করিয়া দিয়াছিলেন—দাক্ষায়ণীও বারণ করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং মনের মধ্যে কথাটা বড় তীব্রভাবেই খোঁচা খুঁচি করিতেছিল। আবার তার জন্যই আপনা হইতে কথাটা তুলিতে মনে একটা খুঁৎখুতিও হইতেছিল। পরছিদ্রান্বেষণ, পর কুৎসা যতই তাঁহার আনন্দের কারণ হউক, সর্ব্বত্র অবিরত বিচরণে কলহ কন্দলের সূত্রপাত যতই তিনি করুন, চন্দ্রমণি স্বভাবতঃই এমন নিষ্ঠুর ছিলেন না যে জানিয়া শুনিয়াও অনর্থক দুঃখীর জ্বালা বাড়াইয়া তিনি তৃপ্তি লাভ করিবেন। বামা ওকথা শুনিলে যে কমলাকে আজ চোকের জলে ভাত মুখে নিতে হইবে,—তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু এমন কথাটা একেবারে চাপিয়া যাওয়াও তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছিল। আরও ওরা নিষেধ করিয়া দিল,—ব্যাপারটা বড় সহজ নয়। রহস্যও যথেষ্ট আছে।—কাল মাছ নিয়া কি হইয়াছিল, দুজনেই চাপিয়া গেল। আবার একটু ভয়ও হইতেছিল। ভয়ে ভয়ে লুকাইয়া দিক্, যা দেয় দাক্ষায়ণীই দেয়। বামা বড় কৃপণী, আবাগীর হাতের ফাঁনা দিয়া একটু জলও গলে না। সে বারণ করিয়া দিল,—সত্যই অমনই কথাটা আসিয়া বামাকে বলা,—ভাল হইবে না। তবে বামা যদি আপনা হইতে কিছু জিজ্ঞাসা করে, তবে তার উত্তরে তাকে যাই তিনি বলুন না, দোষ কেহ দিতে পারিবে না। সত্যই একেবারে জলজ্যান্ত মিছা কথাগুলাও ত তিনি বলিতে পারেন না? আরও বামা যে খাণ্ডারণী! জানিতে পারিলে তাঁকে খাইয়া ফেলিবে। তাই অগত্যা আমটির দিকে বামার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে সেটিকে তিনি নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন,—একবার এ হাতে নেন, একবার ওহাতে নেন, একবার মাটিতে রাখেন, ইত্যাদি।

বামা ইতিমধ্যে ইষ্টদেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে করিতে চন্দ্রমণির প্রশ্নোত্তরে তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন, বাজার হইতে কি কি তরকারী আসিয়াছে এবং অদ্য তাঁহার হবিষ্যে ঐ কলমী শাক ব্যতীত আর কি কি রন্ধনের আয়োজন হইতে পারে।

বলিতে বলিতে বামা একটি সচন্দন রক্তপুষ্প বুকের কাছে ধরিয়া ধ্যানে বসিলেন,—চন্দ্রমণি তাঁহার অন্তরের অভাব পূরণার্থে কোথায় কি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, তাহার বিবৃতি আরম্ভ করিলেন।—

নামান্তে বামা চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন,—চন্দ্রমণি আমটি হাত হইতে সম্মুখের দিকে একটু সরাইয়া মাটিতে রাখিলেন। রাম! বাঁচা গেল! এতক্ষণে বামার দৃষ্টি সেই আমটির দিকে পড়িল!

"আম কে দিল চন্দরমণি?"

চন্দ্রমণি উত্তর করিলেন, "আর কে দেবে বোন্, ওই ওঘরের ছোটবউ দিলে। আস্‌তে আস্‌তে তার দরজার কাছে একটু দাঁড়ালাম,—ডালাভরা আম ছিল, একটা দেখি হাতে ক'রে আমায় দিলে।"

"ডালাভরা আম! বটে! আর মাগী কত ঢাকারই জানে! দোরে দোরে কেঁদে বেড়ায়, ছেলেমেয়েকে পেট ভ'রে খেতে দিতে পারে না—আবার ডালাভরা আম কোথেকে এল!"

এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ভ্রূকুটিকুটিলাননা বামা সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি হাতে তুলিয়া নিয়া মনে মনে মন্ত্র আবৃত্তি আরম্ভ করিলেন।

চন্দ্রমণি কহিলেন, "দেখলাম ত ডালাভরা আম, বড় একঘটি দুধ, চিনি, বাতাসা, আর দিব্যি কখানা চিতল মাছের কোল—"

"চিতল মাছের কোল! বটে! আঃ—হারামজাদী!"

পুষ্পাঞ্জলি টাটে নিক্ষেপ করিয়া বামা উগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে দিয়েছে এসব বল্‌তে পার চন্দর দিদি?"

আরও একটি পুষ্পাঞ্জলি বামা হাতে তুলিয়া নিলেন।

চন্দ্রমণি চিবাইয়া চিবাইয়া কহিলেন, "তা বোন্, শুন্‌লে আবার ওরা আমায় গাল দেবে—আমি ভাই দুঃখী মানুষ—কারও ভালতেও নেই মন্দতেও নেই। তা শুন্‌লাম, আমাদের নিবু নাকি পাঠিয়ে দিয়েছে। তার দয়ার শরীর! —কাল নাকি কি হ'য়েছিল—মুখের মাছ কে কেড়ে নিয়ে গেল—বড়বউ ব'ল্লে, বেড়ালে খেয়েছে—"

"আঃ! ভাইখাকী আঁটকুড়ির বেটীরা! (পুষ্পাঞ্জলি টাটে নিক্ষেপ)—এম্‌নি ক'রে আমার কুচ্ছো ক'রে বেড়ান হচ্ছে! আমি বেড়াল। বটে!—আর কি ব'লেছে—চন্দরদি?" (পুনঃ পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ।)

চন্দ্রমণি কহিলেন, "না—আর কি ব'ল্‌বে? ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে দুজনাই চেপে গেল,—যায়ে যায়ে ওদের দুটিতে বেশ ভাব আছে। তা মাছ নিয়ে কাল কি হ'য়েছিল বামা?"

শেষ পুষ্পাঞ্জলিটা টাটে ফেলিয়া বামা কহিলেন, "ভাব আছে! ভাব ত দেখি, কেমন আমাকে কি ক'রে ফাঁকি দেবে—দুই শুখেকোর বেটীতে মিলে তারই ফন্দী আঁটছে। এই ত কাল—দু'খানা বড় চিতল মাছ চুরী ক'রে মাগী দিয়ে এল—"

"ওমা কি ঘেন্না! কে?"

"এই আমাদের বউঠাকুরুণ! আর কে? ও ঘরের ছোট ঠাকুরুণকে গিয়ে দিয়ে আসা হ'ল। দাতার বেটী দাতা! বাপ ভাই কত দিচ্ছে?"

পূজান্তে জপ করিয়া 'গুহ্যাতি গুহ্য গোপ্তা' ইষ্টদেবতাকে বামা তাহা সমর্পণ করিলেন।

"ওমা! তাই বল্!"

"ও মাগী তাই আবার ফেণের গামলার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল———"

"গলায় দড়ী! গলায় দড়ী! ওমা, বড়বউ না হয় দরদ ক'রে দু'খানা মাছ দিয়েই এসেছিল, তা তুই মাগী কি ক'রে তা হাতে তুলে নিলি? আবার ফেণের গামলায় লুকিয়ে রাখ্‌ল! ওমা কি ডাকাত গো কি ডাকাত!"

দাক্ষায়ণী কি প্রয়োজনে তখন গৃহে প্রবেশ করিলেন,—চন্দ্রমণি কিছু অপ্রস্তুত হইয়া কহিলেন, "এই যে বড়বউ! এই কালকার মাছের কথা বামা ব'ল্‌ছিল—তাই ব'ল্‌ছিলাম, পরের তরেও তোমার প্রাণটা পোড়ে, হাতও বড়—তা দরদ ক'রে দু'খানা যদি দিয়েই এসে থাক—

দাক্ষায়ণী কিছু উষ্ণভাবে কহিলেন, "তার কি হ'য়েছে? যদিই কখনও কিছু দি, কারওটা ত আর কেড়ে নিয়ে দিই না, নিজের সংসার থেকেই দি।—আমার জিনিষ আমি দেব, সেই বা তা নেবে না কেন? দু'খানা মাছ না হয় দিয়েই ছিলাম. তাই কি ঠাকুরঝির অম্‌নি গিয়ে কেড়ে নিয়ে আসা উচিত হ'য়েছে?"

বামা তখন আহুত ইষ্টদেবতাকে সেদিনের মত বিদায় করিয়া দিয়া নির্ম্মাল্য বিসর্জ্জন করিতেছিলেন।

দাক্ষায়ণীর কথা শুনিতে শুনিতে ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কি! কি ব'ল্লি—তোর বাপ-ভায়ের মাথা খেয়ে! আমার উচিত হয়নি? ওলো, ও আবাগী বাপভাইখাকী! ওলো, আমার উচিত অনুচিত বল্‌তে তুই কে? তোর কিছু খাই না তোরটা পরি? তুই ত তুই—তোর ভাতারেরই কিছু খাই পরি যে সেও আমাকে এমন কথা বল্‌তে পারে?"

"তুমিও আমারটা খাওনা পরনা ঠাকুরঝি, আমিও তোমারটা খাই না পরি না, যে যখন তখন বাপ ভাই তুলে আমায় গাল দেবে। কেন, আমার বাপভাই

তোমার কি ক'রেছে যে তুমি কথায় কথায় তাদের ম'ড়াবে ছাড়াবে, আর মাথা খাওয়াবে ?"

"গাল দেব না ? দুশোবার দেব ! শ্মশানের মুড়ো জেলে ঘাটের মড়াদের মুখে দেব ! কি ক'রবিলো তুই আমার ? বাপভাই করে বড় দরদ হ'য়েছে ! আর আমার ভাইয়েরটা পরকে লুটিয়ে দিচ্ছিস্—আমার একটু দরদ হয় না ?"

দাক্ষায়ণী উত্তর করিলেন, "তোমার ভাই—আমার কি কেউ নয় ?—আমারও এ সংসারে একটা দাবী দাওয়া আছে। সত্যি দাসী কিনে আনেনি। দিয়েছিলামই না হয় দুখানা মাছ,—কেন তুমি তা কেড়ে আনতে গেলে ?"

"ব—টে ! বলি তোর যে আজ বড় বাড় হ'য়েছে ! একেবারে যে সাপের পাঁচ পাও দেখেছিস্ ?—বলি, কি হ'য়েছে ? কি ভেবেছিস্ তোরা ? আবার—নিবে ও ঘরে আনাগোনা করে, আম পাঠায়, দুধ পাঠায়, মাছ পাঠায়, বলি এসব কি ? গাঁয়ে এত লোক থাকতে মাগী নিবের কাছে নালিশ ক'ত্তে যায় কেন ? সেই বা এ সব পাঠায় কেন ? সকালে দেখলাম, পান চিবোতে চিবোতে বেরিয়ে গেল।—আমার চোকে কিছু পড়ে না, বটে !—"

দাক্ষায়ণী কহিলেন, "বলি ঠাকুরঝি ! এসব কি ব'লছ তুমি ? ওমা কি সর্ব্বনেশে সব কথা !—আর চন্দর ঠাকুরঝি, তোমাকেও বলি, এরি মধ্যে এসে লাগিয়ে দিয়েছ !"

চন্দ্রমণি বলিয়া উঠিলেন, "ওমা, আমি কেন লাগাতে যাব ? তবে বামা সুধোল, আম কোথায় পেলে,—তা—"

বামা কহিলেন, "বলি ওর লাগাতে হবে কেন ?—আমি টের পাইনে কিছু ? আমার চোকে ধুলো দিয়ে এই বজ্জাতি চাল তোরা চালবি ভেবেছিস্ ? আমি বুঝিনি কিছু ? নিবে কেন ওঘরে আনাগোনা করে ? কেন এ সব পাঠায় ? ওই দস্যির মত হুমড়ো ব্যাটা—ঘরে অত বড় থুবড়ো মেয়ে—জাতমানের ভয় নেই তোদের ?"

"দেখ ঠাকুরঝি, ওসব অকথা কুকথা কিছু বলো না। জাতমানের ভয় তুমি যা কর, তার চাইতে অনেক বেশী আমরা করি।"

"তাই ত দুই মাগীতে মিলে এই কুচাল তোরা চালছিস। আর তেজ তাই আজ কত।—দেখব—দেখব ! নিবের কাছে যায় হারামজাদী নালিশ ক'ত্তে। আর সে ডালা ভ'রে ভ'রে খাবার পাঠায়! জাত যাবে। ওই মেয়ে নিয়ে মাগীর জাত যাবে। তোরও কাটা নাকে তখন ঝামা ঘসা হবে। ওলো, আমি যেন চুপ করে রইলাম,—সবাই কি থাকবে ? কদিন থাকবে ?"

"তুমি ত এখন চুপ কর ঠা'কুরঝি। কেউ এতে কিছু ব'লবে না। নিবারণকে সবাই জানে।—হাঁ!"

"ওলো জানে—জানে,—নিবে যে সাধু তা সবাই জানে! হস্তি দস্তি বয়েসের ব্যাটা—ষাঁড়ের মত পথে পথে কুঁদে বেড়াচ্ছে—ওলো, ব'লে রাখছি আজ, নিবের সঙ্গে অত ঘোনাঘনি ভাল হবে না। মুখ যে দিন পুড়বে টের পাবি!"

"এখন ক্ষ্যামা দেও ঠাকুরঝি, দোহাই তোমার—ক্ষ্যামা-দেও। একেবারে জ্ঞানশূন্যি হ'য়েছ। হাজার হ'ক নিজের ভাইঝি ত ? যা ব'লতে নেই তাই ব'লছ। একটা কথা যদি ওঠে,—মুখে কালি ত তোমাদেরই পড়বে।"

কথাটা যে কতদূর অসঙ্গত—বামা নিজেও তাহা উপলব্ধি করিতেছিলেন। সত্য আজ আলাদা হইয়া থাক, তারক-ঘোষালের কুলমান—হরিঘোষালেরই কুলমান। রাগের মুখে কথাটা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল,—কিন্তু তার পরেই বামার সুর নরম হইয়া আসিতেছিল। জিদের বশে শেষে যাই তিনি বলুন, গালিতে সেই উগ্রচণ্ডার হুঙ্কার ঝঙ্কার আর তেমন ছিল না।

কমলা সেদিনকার মত বাঁচিয়া গেলেন। বামার রোষাগ্নির মুখে প্রথমেই দাক্ষায়ণী আসিয়া শক্ত হইয়া দাঁড়াইলেন। চূড়ান্ত একটা তাহার সঙ্গেই হইয়া গেল। কলহের প্রচণ্ডধারা দাক্ষায়ণী হইতে প্রতিহত হইয়া খোদ বামার উপরেই গিয়া পড়িল। মুখে কিছু না বলিলেও মনে মনে বামা আজ হার মানিলেন। আবার নূতন করিয়া কমলার সঙ্গে কলহের সৃষ্টি করিতে তিনিও আজ পারিলেন না। ঘাটে পথে দুই একবার যখন সাক্ষাৎ হইল, রোষ-কটাক্ষে বামা কমলার দিকে চাহিলেন মাত্র, মুখে আর কিছু বলিলেন না।

তবে বামা ইহাও লক্ষ্য করিলেন, কমলা যেন তাঁহার সেই সরোষ-বক্রদৃষ্টিতে আজ আর তেমন ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িতেছে না, আজ যেন মাগী তাঁহাকে গ্রাহ্য কিছু কম করিতেছে।—দুকথা বলিলেও সমান দুকথা শুনাইয়া দিতে পারে।

কিছু অর্থ আছে। এত সাহস্ মাগীর কিসে হইল? নিবে আটকুঁড়ীর ব্যাটার কাছে জোর পাইয়াছে! এ কিসের জোর? সকালে সে কেন আসিয়াছিল? তার কাছে হারামজাদী নালিশ করিতে গেল কেন? এত খাবারই বা সে পাঠাইল কেন? হুঁ। আচ্ছা থাক্ বজ্জাত বেটীরা! দেখা যাইবে!

(ক্রমশঃ)

বিবিধপ্রসঙ্গ।

এসিয়ায় সমর-সঙ্কট—ভারতের বিপদ।

যে আশঙ্কা প্রথম হইতেই আমরা করিতেছিলাম, তাহা বুঝি সত্যই এতদিনে আসন্ন হইয়া আসিল। দক্ষিণ পশ্চিম এসিয়ার তুর্কীসাম্রাজ্য প্রথম হইতেই যুদ্ধের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে। তুর্কীর সাহায্যে জর্ম্মাণী একদিকে মিশরে এবং আর একদিকে মেসোপটেমিয়ার মধ্যদিয়া পারস্য সাগর পর্য্যন্ত আপন প্রভুত্ব বিস্তারে এতদিন বহু চেষ্টা করিয়াছে। সুয়েজ খাল হইয়া মিসর পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিতে পারিলে ভারতের দিকে ইংরেজের পথে বড় একটা বাধা সৃষ্টি করা যায়। এদিকে বোগদাদ হইতে পারস্যসাগর পর্য্যন্ত অবাধ গতি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে, সহজেই স্থল ও জলপথে ভারত আক্রমণ জর্ম্মাণীর অনেক সহজ হয়। কারণ জর্ম্মাণ অধিকার হইতে বৃটিশ ভারতের ব্যবধান সে অবস্থায় বড় বেশী থাকে না।

বৃটিশশক্তিও প্রথমাবধি মিসর ও মেসোপটেমিয়া হইতে জর্ম্মাণীকে বাধা দিবার জন্য প্রাণপণে প্রয়াস পাইতেছেন,—প্রয়াস এ পর্য্যন্ত নিষ্ফলও হয় নাই। তুর্কজর্ম্মাণবাহিনী যে বাধা পাইয়াছে, গত তিন বৎসরে তাহা অতিক্রম করিয়া আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। একটি কথা এস্থলে আমরা গৌরবে উল্লেখ করিতে পারি এই যে, এই অঞ্চলে তুর্কীজর্ম্মাণের পথে এই বাধা ইংরেজ প্রধানতঃ ভারতীয় সেনার সাহায্যেই দিতে পারিয়াছেন। এখনও বাঙ্গালী পল্টন যাহা প্রস্তুত হইতেছে, মেসোপটেমিয়াতেই প্রেরিত হইতেছে।

পারস্যের পূর্ব্বভাগ দিয়া ভারতের দিকে জর্ম্মাণীর আর এক পথ ছিল। প্রথম হইতেই পারস্য অঞ্চলে জর্ম্মাণ চরগণ নানারূপ চক্রান্ত করিতেছেন,—কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা বিশেষ সফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ পারস্যে বড় কোনও গোলযোগের কথা শোনা যায় না। পারস্যে ও আফগানিস্থানের উত্তর সীমান্ত ঘুরিয়া রুষ সাম্রাজ্যের সীমা মধ্যএসিয়ার যে স্থান পর্য্যন্ত আসিয়াছে, তাহা প্রায় কাশ্মীরের সংলগ্ন; সুতরাং যতদিন রুষিয়া খাড়া ছিল, মিত্রশক্তিপুঞ্জের অন্যতম প্রধান শক্তি হইয়া যুঝিতেছিল, ততদিন, পারস্যের পশ্চিমে ইংরেজ-অধিকৃত মেসোপটেমিয়া এবং উত্তর পূর্ব্বে রুষিয়া দুইদিকে এই দুই বড় শত্রু থাকিতে পারস্যের মধ্য দিয়া তুর্কজর্ম্মাণের পক্ষে ভারতের দিকে অগ্রসর হওয়া তত সহজ ছিল না,—যদি না পারস্য আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশ একেবারে তুর্কী জর্ম্মাণের পক্ষ অবলম্বন করে। তাহা করে নাই। যাহা হউক, সম্প্রতি রুষসাম্রাজ্যের পতনে পারস্যের উত্তর পূর্ব্বদিক নিষ্কণ্টক হইয়াছে। পশ্চিমে একদল তুর্কী-জর্ম্মাণ যদি বৃটিশ বাহিনীকে ব্যাপৃত রাখিতে পারে, আর একদল পূর্ব্ব-পারস্যের মধ্যদিয়া ভারতের সীমান্তে আসিয়া পৌছিতে পারে। জর্ম্মাণীর সমগ্র শক্তি এখন পশ্চিম সীমান্তে ফরাসী যুদ্ধে নিযুক্ত আছে। ইংরেজ ও ফরাসী ব্যূহ ভেদ করিয়া বিশাল জর্ম্মাণ সেনা একদিকে ফরাসী রাজধানী প্যারী এবং অপরদিকে ফরাসী দেশের উত্তর উপকূলে ক্যালে প্রভৃতি বন্দরে পৌছিবার জন্য ভীষণ বেগে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। এই পর্য্যন্ত পৌছিবার জন্য আজ তিন বৎসর যাবৎ জর্ম্মাণী বহু চেষ্টা করিতেছে। কারণ, তাহা হইলে যেমন ফরাসীকে কাত করা যায়, আবার ইংলণ্ড আক্রমণও জর্ম্মাণীর পক্ষে সহজ হয়।—

এখনও বৃটিশফরাসীবাহিনী কতকটা পিছনে হটিলেও ব্যূহবদ্ধ হইয়াই আছে,—এবং জর্ম্মাণীর প্রবল আক্রমণে বাধা দিতেছে। যদি এখানেই হেস্ত নেস্ত একটা না হয়,—জর্ম্মাণী ফরাসী রাজধানী প্যারী নগরে অথবা ক্যালে

বন্দরে পৌঁছিতে না পারে,—তবে ওদিককার আক্রমণের বেগ সম্বরণ করিয়া এসিয়ার দিকে তাহা পরিচালিত করিতে পারে। সে দিকে প্রায় ভারতের সীমান্ত পর্য্যন্ত জর্ম্মাণীর পথ এখন অনেকটা মুক্ত। জার্ম্মাণীর চরগণ ইতিমধ্যেই পরস্তে ও নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্যঅঞ্চলের দুর্দ্দান্ত বর্ব্বরজাতিদের মধ্যে বহু চক্রান্তে ভারতে উৎপাত ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছে।

বৃটিশ রাজ্যের প্রধান সচীব লয়েড জর্জ্জ যে বার্ত্তা পাঠাইয়াছেন, তাহাতে ইহার আভাষ পাওয়া গিয়াছিল। দিল্লীর দরবারে সে দিন বড়লাট বাহাদুর স্পষ্ট ভাষাতেই এই বিপদের আশঙ্কা ঘোষণা করিয়াছেন। স্বয়ং সম্রাট পঞ্চম-জর্জ্জও এই বিপদের সম্ভাবনা তাঁহার রাজকীয় বার্ত্তায় ভারতবাসী প্রজাকে জ্ঞাপন করিয়াছেন।

একথা সকলেই এখন বুঝিতে পারেন, আমরাও অনেকবার বলিয়াছি, রাজপুরুষগণও এখন বলিতেছেন, কেবল আপন দেশ ভারতকে নয়,—পশ্চিম ও মধ্য এসিয়াকে পর্য্যন্ত জর্ম্মাণ বিপ্লবের ভীষণ পরিণাম হইতে রক্ষা করা এখন ভারতীয় প্রজার সাহায্যেই সম্ভব হইতে পারে। মেসোপটেমিয়া মিসর ও প্যালেষ্টাইন অঞ্চলে জর্ম্মাণীর পথ বন্ধ করিতে হইবে,—প্রচুর ভারতীয় সেনা সেথানে চাই। পারস্তের পূর্ব্বাঞ্চল দিয়া তুর্কিজর্ম্মাণসেনা ভারতের দিকে আসিতে পারে, সেপথ বন্ধ করিতে হইবে।—কে করিবে? ভারতবাসীপ্রজা। ভীষণ দুর্দ্দান্ত পার্ব্বত্য জাতিসমূহকে উত্তেজিত করিয়া জর্ম্মাণচরগণ ভারতে উৎপাত সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই সব উৎপাত দমন করিতে হইবে। কে দমন করিবে? সশস্ত্র ভারত।

অস্ত্রধারী অনুরক্ত ভারত এসিয়ায় বৃটিশ প্রভুত্বের যে কত বড় সহায় হইতে পারে, তাহা বৃটিশরাজশক্তি—হায়, এতদিনে বুঝিয়াছেন! তাই ভারতের সকল প্রদেশের প্রজার কাছেই তাঁহারা জনবল ও ধনবল চাহিতেছেন। হায়, আজ যে ডাক পড়িয়াছে, তিনবৎসর পূর্ব্বে যদি তা পড়িত, আজ যে আয়োজন আরম্ভ হইতেছে, তিন বৎসর পূর্ব্বে যদি তা হইত, তবে বৃটিশরাজ ও ভারতীয় প্রজা—কাহারও কি আজ কোনও দুর্ভাবনার বা আশঙ্কার কোনও কারণ থাকিত? জর্ম্মাণী কি আজ সদন্ত লোলুপদৃষ্টিতে ভারতের দিকে চাহিতে পারিত? কিন্তু এখন!—দেবতারা দয়া করুন —যেন এখনও সময় থাকে।

ভারতের সমগ্র শক্তি যুদ্ধে নিয়োগ করিতে হইবে।

গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন, ভারতকে ভারতরক্ষা করিতে হইবে, এসিয়া রক্ষারও সহায়তা করিতে হইবে। জন চাই, ধন চাই, আরও বহু আয়োজন চাই,—সকল শক্তি প্রধানতঃ যুদ্ধের প্রয়োজনেই নিয়োগ করা চাই। এক বৎসরের মধ্যে পাঁচলক্ষ সৈন্য প্রস্তুত করিতে হইবে,—কোটি কোটি টাকার আবশ্যক, তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে।—যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করিতে হইবে,—সরঞ্জাম ও রসদাদি যথাস্থানে সত্বর প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সকলের আগে এই কাজ, তারপরে অন্য কথা। রেলগাড়ী, ষ্টিমার প্রভৃতি প্রধানতঃ যুদ্ধের আয়োজনেই ব্যবহার করিতে হইবে,—দেশের লোকের জন্য জিনিষপত্রের আমদানী সুলভ হইবে না,—যতদূর সম্ভব স্থানীয় উৎপাদনের উপরেই তাহাদের নির্ভর করিতে হইবে। দেশের মধ্যে মালের আমদানী রপ্তানীর জন্য দেশীয় নৌকা গাড়ী প্রভৃতি প্রধানতঃ ব্যবহার করিতে হইবে। এজন্য নৌকাদিও নূতন করিয়া আবার প্রস্তুত করিতে হইবে।

দিল্লীর দরবারে এই সব ব্যবস্থার প্রয়োজন সকলে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহও সচেষ্ট হইতেছেন। বিপুল এই যুদ্ধের আয়োজনে সরকারী কর্ম্মচারী ও বেসরকারী জননায়কবর্গ সকলেরই সহায়তার প্রয়োজন হইবে।

সাফল্যের সম্ভাবনা।

এতটা আয়োজন করিতে হইবে। কত সময়ের মধ্যে করিতে হইবে, তাহা গবর্ণমেণ্ট স্পষ্ট বলেন নাই। তবে শীঘ্রই যে করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, কখন যে বড় বিপদ আসিয়া পড়িবে, কে জানে? ভারতবর্ষ যদি সময় মত আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া প্রস্তুত হইতে না পারে, তবে সেই বিপদে আপনাকে রক্ষা করা তার পক্ষে দুঃসাধ্য হইবে। তবে একটি কথা গবর্ণমেণ্ট স্পষ্ট বলিয়াছেন। এক বৎসরের মধ্যে ভারতে পাঁচ লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিতে হইবে। এই পাঁচ লক্ষ সৈন্যকে বেতন দিতে হইবে, আহার দিতে হইবে, পোষাক দিতে হইবে, অস্ত্র দিতে হইবে,—ইহাদের লইয়া যুদ্ধে যাইতে হইলে আরও অনেক সরঞ্জাম লাগিবে। ইহাদের শিক্ষা চাই, যুদ্ধ চালাইবার জন্য

নায়ক চাই। এই সব নায়কদেরও উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হইবে, তাহাদের উচ্চতর বেতন যোগাইতে হইবে। ইহাদের জন্য ডাক্তার চাই, ঔষধ চাই, হাঁসপাতাল চাই, শুশ্রূষাকারী চাই। পাঁচলক্ষ সৈন্য যুদ্ধ করিতে যাইবে, সঙ্গে কত যে কুলীমজুর সেবক ভৃত্যাদি লাগিবে,—তাহা সমরবিভাগের কর্ম্মচারিগণই বলিতে পারেন,—আমরা কিছুই জানি না।

অল্প সময়ে এই দেশে যুদ্ধের এই বিপুল আয়োজন কেমন করিয়া যে সফল হইবে, তাহা ভাবিয়া কূল পাই না। দেশের লোক ত একরকম কিছুই এসব জানে না। গবর্ণমেণ্টের সমরবিভাগের কর্ম্মচারিগণ অনভিজ্ঞ দেশীয় লোকের সফল সহায়তা কতদূর পাইবেন? ইহাদের শিখাইয়া নেওয়াই কি সহজ হইবে? অতিমানুষিক শক্তির প্রয়োজন। তবে এ শক্তি তাঁহাদের কতটা আছে, গবর্ণমেণ্টই জানেন,—আমরা কি প্রকারে বলিব?

ধন ও জন সম্বন্ধে দুই একটা কথা আমরা বলিতে পারি। প্রজা টাকা দিতে পারিলে ধন হইবে লোক দিতে পারিলে জন হইবে। এই ধন ও জন লইয়া এক বৎসরের মধ্যে নূতন পাঁচ লক্ষ সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা এবং তদুপযোগী সরঞ্জামাদির আয়োজন করা,—এই দুইটি অতি কঠিন কার্য্যের নিয়স্তৃত্ব গবর্ণমেণ্টকে করিতে হইবে। আমরা সাধ্যমত সহায়তা করিতে পারি,—তাও যদি তাঁরা শিখাইয়া দেন, কেমন করিয়া কি করিতে হইবে। কারণ এ সব কিছুই আমরা জানি না। শতাধিককাল শান্তিতে গবর্ণমেণ্টের আশ্রিত হইয়া দেশে আছি,—এসব কাজে কখনও আমাদের ডাক পড়ে নাই।

ধন সংগ্রহের জন্য গবর্ণমেণ্ট নূতন সমরঋণের প্রবর্ত্তন করিতেছেন, প্রয়োজন হইলে নূতন করও ধার্য্য হইবে। এ সম্বন্ধে আমরা এই বলিতে পারি, ইচ্ছায় দিক্ অনিচ্ছায় দিক্, প্রজার সামর্থ্যে যতদূর কুলায় গবর্ণমেণ্ট চাহিলে তারা দিবে, না দিয়া পারিবে না। একবেলা খাইয়া, কপনি পরিয়া, গাছতলায় শুইয়াও তারা টাকা দিবে। জুলুম কিছু হইলেও তা হয়ত বরদাস্ত করিবে। তবে দরিদ্র এদেশ বড়ই দরিদ্র। নিংড়াইয়া গুঁড়া করিয়া ফেলিলেও শুকনা কাঠে রস বাহির হয় না। তাই, দরিদ্রের উপরে অনর্থক বেশী চাপ না দিয়া ধনীর ঘরে চাহিলে ফল বেশী হইবে। দেশের সাধারণ লোকের নিতান্ত দেহরক্ষা উপযোগী অন্নবস্ত্র ও সামান্য তৃণকুটীরের উপরে আর কিছুই বড় নাই। অনেক ধনী মাসে চুরুট-সিগারেটে বা সাবান এসেন্সেই যা ব্যয় করেন, তাহাতে বহু দরিদ্র পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া যায়,—তাঁহাদের বড় বড় বিলাসের কথা নাই ধরিলাম। যাহা হউক, ধন দেশ যত দিতে পারে তা দিবে, বহু ক্লেশ নীরবে সহিয়াও দিবে। তবে তাহাতে কুলাইবে কিনা, কর্ত্তাদের ভাবিতে হইবে। কিন্তু জনের কথা বড় শক্ত কথা। পাঁচ লক্ষ একবৎসরে মিলিবে কি? সৈন্যই পাঁচ লক্ষ,—অসামরিক (non-combatant) জনও কম প্রয়োজন হইবে না। টাকা দিতে পারিলে, শেষোক্ত জনবল মিলিতে পারে। কিন্তু টাকাতেও প্রাণদিতে প্রস্তুত এত সৈন্য সহজে এক বৎসরে মেলা কি সহজ হইবে? কথাটা ভাবিবার কথা বটে।—না হইলেও রক্ষা নাই,—অথচ হওয়া কঠিন। কেমন করিয়া হয়, তার উপায় চিন্তা করিতে হইবে।

ভারতের জনসংখ্যার তুলনায় ৫ লক্ষ সৈন্য কিছুই নয়। ইয়োরোপে এক এক দেশে জনসংখ্যার তুলনায় যে যোদ্ধৃসংখ্যা মিলিয়াছে, তার হিসাবে ভারতে কোটি কোটি সংখ্যক যোদ্ধা পাওয়া উচিত। কিন্তু ভারতের অবস্থা অন্যরূপ। দুই একটি প্রদেশের কোনও কোনও সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে গবর্ণমেণ্ট সিপাহী গ্রহণ করিতেন,—কতিপয় এই সম্প্রদায় ব্যতীত ভারতীয় অগণ্য জন-মণ্ডলী কয়পুরুষ যাবৎ যুদ্ধ কি তা জানে না,—অস্ত্র কি তা এক রকম চক্ষেও দেখে না। ক্ষিপ্ত শিয়াল কুকুর দেখিলেও ভয়ে তাদের পালাইতে হয়। সহস্র সহস্র লোক আজীবন গ্রাম্য চৌকিদারের উপরে সামরিক মূর্ত্তি চক্ষেও কখনও দেখে না। আত্মরক্ষা বলিয়া যে একান্ত অপরিহার্য্য একটা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব বা কর্ত্তব্য মানবের থাকিতে পারে, তাও সকলে ভুলিয়া গিয়াছে। মানব হইয়া জন্মিলে যে অন্ততঃ দেহে সুস্থ ও বলিষ্ঠ হওয়া সকলের বড় প্রয়োজন, বিদ্যালয়ে রাশি রাশি বই পড়ে, কত বিদ্যা কণ্ঠস্থ করে'—কেবল এই কথাটি ছেলেরা শিখে না, তার জন্য কোনও ব্যবস্থাও এক রকম নাই। কেন এমন হইল, এত বড় একটা কেন জাতি এমন দেহে এমন ক্ষীণ ও দুর্ব্বল, মনে মরা, শক্তমনে বর্জিত সামরিক [illegible]

কেন এমন হইল, কে তার জন্য দায়ী, তার আলোচনা এখন নিষ্ফল। তবে এই জাতির মধ্য হইতে সহসা পাঁচ লক্ষ সৈন্য যোগান যে কত কঠিন ব্যাপার হইবে, তা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পারিবেন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, তোমরা ভীরু কাপুরুষ, তাই যুদ্ধের নামে ভয় পাও। সর্ব্বনাশ উপস্থিত, এখনও তোমরা জাগিতে চাও না। হাঁ, আমরা ভীরু, আমরা কাপুরুষ। ভীরু কাপুরুষ ছিলাম না, এখন হইয়াছি। কিন্তু কেন হইয়াছি?

যাক্। পাঁচ লক্ষ সৈন্য এখন তুলিতে হইবে। কেমন করিয়া তোলা যায়, তাই এখন সকলের ভাবিতে হইবে।

যে সব সম্প্রদায় হইতে এপর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট সৈন্য সংগ্রহ করিতেন, তাহাদের মধ্য হইতে এই কয়বৎসরে আরও অনেক সৈন্য তোলা হইয়াছে। তারা যুদ্ধেও গিয়াছে। ইহাদের মধ্য হইতে আর কত সৈন্য পাওয়া সম্ভব হইতে পারে তা গবর্ণমেণ্ট জানেন, আমরা বলিতে পারি না। এ সম্বন্ধে প্রাঞ্জাব অগ্রণী। পাঞ্জাবের লাট সাহেব বলিতেছেন, পাঞ্জাবকে আরও দুইলক্ষ সৈন্য যোগাইতে হইবে। পাঞ্জাবে বোধ হয় লোক আর বাকী থাকিবে না। তবে পাঞ্জাবীরাই এখন ভারতের মধ্যে প্রধান যোদ্ধৃজাতি। সেখানে ইহা সম্ভব হইতেও পারে। লাট সাহেব আরও বলিয়াছেন, আপনা হইতে যদি সম্ভব না হয়, কনস্ক্রপসনের দরকারও হইতে পারে। যাহা হউক, বাকী তিনলক্ষ অন্যান্য প্রদেশ হইতে যোগাইতে হইবে। কোন প্রদেশ হইতে কত সংগ্রহ করিতে হইবে। তাহারও মোট মোট একটা কথা হইয়াছে।

আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালার কথাই বলিতে পারি। অন্য প্রদেশের খবর বেশী রাখি না। বাঙ্গালার লাট লর্ড-রোণাল্ডশে বাহাদুর সেদিন কলিকাতার দরবারী সভায় বলিয়াছেন, বাঙ্গালা হইতে গড়ে মাসে ১০০০ একহাজার করিয়া এই বৎসরে মোট ১২০০০ লোক চাই। কিন্তু ষ্টেট্‌স্‌-ম্যান্ সেদিন একটা হিসাব ধরিয়া দেখাইয়াছেন, বাঙ্গালা হইতে ৩০০০০ ত্রিশ হাজারের কমে হইবে না। সুতরাং মাসে ২৫০০ আড়াই হাজার করিয়া রংরুট দরকার হইবে।

যাহাই হউক, মাসে একহাজার করিয়া ধরিলেও, বাঙ্গালা হইতে এখন এই রংরুট কেমন করিয়া কোন্ শ্রেণীর মধ্য হইতে সংগ্রহ হইতে পারে, তাহা দেখিতে হইবে।

যে সব কারণে ভারতে অধিক সৈন্য সংগ্রহ করা কঠিন, সে কারণ বাঙ্গলাতেও বর্ত্তমান আছে,—বেশ প্রবলভাবেই বর্ত্তমান আছে।

সামরিক প্রেরণা পৌরুষের বড় একটি ধর্ম্ম। এই প্রেরণা যাহাদের মধ্যে আছে, যুদ্ধের ডাকে তারা পাগল হইয়া ছুটে,—কোনও ভয়ে তারা দমে না, কোনও প্রলোভন তাদের পিছনে টানিয়া রাখিতে পারে না। কিন্তু এই প্রেরণা বাঙ্গালীর মধ্যে এখন বড় কম। তবু পুরুষ পরম্পরা-গত বহু প্রতিকূল অবস্থার চাপে একেবারে বাঙ্গালীর প্রাণ হইতে ইহা দূর হয় নাই। তার বড় একটি প্রমাণ—এ পর্য্যন্ত তিন হাজার ভদ্রবংশীয় বাঙ্গালী যুবক সামান্য সিপাহী হইয়া যুদ্ধে গিয়াছে। যারা গিয়াছে, তারা এই প্রেরণার বলেই গিয়াছে,—আর কোনও বড় আকর্ষণ তাহাদের ছিল না। এই সাময়িক প্রেরণা লোকের চিত্তে যেখানে জাগান যায়, সেখানে যুদ্ধের জন্য লোকের অভাব কম হয়। একান্ত রণবিমুখ জাতির মনেও এই প্রেরণা জাগাইয়া তাদের সামরিক জাতিতে পরিণত করা যায়। বাল্যাবধি শিক্ষার সঙ্গেই এই চেষ্টা করিতে হয়। কিন্তু বাঙ্গলায় বর্ত্তমানে যে শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহা এই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে নিতান্তই প্রতিকূল। এখন নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজার সময় আর নাই। স্বাভাবিক সাময়িক প্রেরণার সহায়তা বাঙ্গলায় রংরুট সংগ্রহে বড় পাওয়া যাইবে না।

কেহ কেহ বলিতেছেন, সিপাহীর বেতন বাড়িবে, কমিশনী নায়কের পদ পাওয়া যাইবে, ইহাও কি বড় একটা আকর্ষণ হইবে না?

একটি বড় কথা এস্থলে আমাদের মনে রাখিতে হইবে। যখন সমূহ কোনও বড় যুদ্ধ উপস্থিত নাই, ভবিষ্যতে হইতে পারে তার জন্য আগেই প্রস্তুত হইবার উদ্দেশ্যে কোনও গবর্ণমেণ্ট যদি প্রজাদের সৈনিকবৃত্তি গ্রহণে উৎসাহিত করিতে চান, তখন যাহা সম্ভব হয়, এতবড় একটা মারাত্মক যুদ্ধের মধ্যে তাহা সম্ভব হয় না। তখন সাধারণতঃ লোকে যাহা উপার্জ্জন করে, তার সমান—এমন কি কিছু কম হইলেও বহু যুবক সৈনিকের বা সেনানীর বৃত্তি গ্রহণ করিতে প্রলুব্ধ হইতে পারে। কারণ, পৌরুষ ধর্ম্মের একটা তৃপ্তি—সেই তৃপ্তিজাত এমন একটা আনন্দ তাহাতে আছে,

যাহা পুরুষমাত্রেরই বড় একটা আকর্ষণের কারণ, হইতে পারে। কিন্তু এই যুদ্ধে যে যাইবে, তাকে একরূপ প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়াই যাইতে হইবে, সমূহ অনভ্যস্ত অশেষ কঠোরতা সহিতে প্রস্তুত হইতে হইবে। আমাদের মত রণবিমুখ জাতির কথাই নাই, রণপ্রমুখ জাতির মধ্যেও, যারা যায় নাই, তাঁদের নূতন যাইতে মন তেমন অগ্রসর হয় না। গবর্ণমেণ্ট শুনিতেছি ১১ টাকার স্থলে সিপাহীর বেতন ১৭ টাকা করিবেন। এ ত সামান্য, প্রাণ দিতে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী টাকাতেও লোকে সহজে চায় না। কমিশনী নায়কত্ব লাভের আশা ভদ্রবংশীয় সাহসী যুবকদের পক্ষে একটা আকর্ষণের বস্তু হইতে পারে। কিন্তু খুব বেশী সংখ্যকের হইবে বলিয়া মনে হয় না।—কারণ ইহাতেও মরণপণ করিয়াই যাইতে হইবে।

আর একটি বড় কথা আছে, যুদ্ধে প্রাণ দিতে প্রস্তুত না হইলে প্রবল শত্রুর আক্রমণে দেশে বড় বিপ্লব উপস্থিত হইবে, ধন সম্পদ থাকিবে না, মান ইজ্জৎ থাকিবে না। প্রাণের দরদ ইহার উপরে কাহারও হওয়া উচিত নয়। টাকার ও পদের প্রলোভন অপেক্ষা এই বিবেচনায় লোকে প্রাণ দিতে বেশী প্রস্তুত হয়। বাঙ্গালীও হইতে পারে।

কিন্তু এখানেও ভাবিবার কথা আছে। সাধারণতঃ লোকের স্বভাবই এই যে ভাবী কোনও অদৃশ্য বিপদ অপেক্ষা সমূহ বিপদকে বেশী ভয় করে। যে দেশে সংঘশক্তির বিশেষ উন্মেষ কিছু হয় নাই, রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের উন্নত বুদ্ধিতে দশের ভবিষ্যৎ মঙ্গলে ব্যক্তিবিশেষের আশুস্বার্থ বলি দিবার প্রয়োজন, যে দেশের লোক তেমন বুঝে নাই সেরূপ কোনও কর্ম্মের সাধনা যে দেশে নাই,—সে দেশের পক্ষে এইরূপ একটা আশঙ্কার কথা তুলিলেই যে দলে দলে লোক প্রাণ দিতে অগ্রসর হইবে, এরূপ আশা সফল নাও হইতে পারে। বরং উল্টা, ভয়ে সব লোক একেবারে অসাড় হইয়াও পড়িতে পারে।

যাহাহউক, তবু দেখিতে হইবে, কেমন করিয়া, কোথা হইতে লোক আসিতে পারে। বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থায় চাষী শিল্পী কৃষাণমজুর প্রভৃতি অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত নিম্নতর শ্রেণী সমূহের মধ্যে লোক যে পাওয়া যাইবে, সে আশা বড় আমরা করি না।—সিপাহীর এগার না হউক, সতের টাকা বেতনের জন্য ভিখারীও যে প্রাণ দিতে আসিবে, এমন মনে হয় না। ইহাদের মধ্যে রাষ্ট্রীয়বুদ্ধি একেবারেই জাগ্রত হয় নাই। খাজনা দেওয়া ছাড়া সরকারের প্রতি তাহাদের যে আর কোনও দায়িত্ব আছে, ইহা তারা জানে না, বোঝেও না। সরকার তাহাদের বিপদে রক্ষা করিবেন, এইমাত্র তারা জানে,—কিন্তু সরকারের হাতের বল যে তারাই, সরকারকেও যে তাদের রক্ষা করিতে হয়, একথা তারা কখনও শিখে নাই।—ভাবী কোনও বিপ্লবে [illegible]—কত উৎপাত তাহাদের হইতে পারে, [illegible] ভীষণ চিত্র যদি এখন তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলে—ইহাও অসম্ভব নয় যে তারা কাঁদিয়া সরকারী লোকের পায়ে লুটাইয়া পড়িবে,—বলিবে, "ওগো সরকার-বাহাদুর! তোমরা 'মাবাপ,' আমাদের রক্ষা কর। আমরা কিছু জানি না।"

তবে ভদ্রবংশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে রাষ্ট্রীয়বুদ্ধি কিছু জাগিয়াছে,—রাষ্ট্রীয় উচ্চ আকাঙ্ক্ষাও তাদের প্রাণে দেখা দিয়াছে, —এখন এই কঠোর বিপদসঙ্কুল রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ প্রথমে তাহাদের মধ্যেই সম্ভব,—যদি তাহারা বুঝিতে পারে, ভরসা পায়, এই দায়িত্ব গ্রহণের ফলে, তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্রীয় উন্নত অধিকার তাদের লাভ হইবে। সিপাহীর বেতনের উচ্চতর হার তাদের পক্ষে কিছুই নয়। রাজকীয় কমিশনের আশা কতকটা পরিমাণে লোভনীয় হইলেও, বড় বেশী হইবে বলিয়া মনে হয় না। বিপ্লবের ভয় —মান ইজ্জৎনাশের বড় ভয় বটে। কিন্তু তার জন্যও তাদের প্রজারূপে যে দায়িত্ব—সে দায়িত্বও প্রজার অধিকার লাভ বা লাভের আশা ব্যতীত তেমন আগ্রহে গ্রহণ করিতে বেশী সংখ্যায় প্রস্তুত হইবে কি?

তাই আমরা বলিতে চাই, খাস বৃটনের ন্যায় ভারতবাসীও বৃটিশপ্রজার সকল অধিকার ভোগ করিতে পাইবে, সিভিল ও মিলিটারী উভয় রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রেই বৃটন ও ভারতবাসী সমান হইবে—যদি এই আশার বাণী গবর্ণমেণ্ট এখন ঘোষণা করিতে পারিতেন—এবং যাঁহাদিগকে শিক্ষিত সম্প্রদায় আপনাদের রাষ্ট্রীয়জীবনের নায়ক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা যদি এই আশার কথা বলিয়া তাহাদের উৎসাহিত করিতে পারিতেন,—তাহা হইলে, বেতন যাহাই হউক, আহার্য্যাদি উপযুক্ত পরিমাণে পাইলেও—বহুসংখ্যক শিক্ষিত যুবক আজ স্বদেশ রক্ষায়—বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষায় অগ্রসর হয়ত হইতেন। তারা যদি আগে আসেন, তবে তাঁহাদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত নিম্নতর শ্রেণীর মধ্য হইতেও ক্রমে যথেষ্ট লোক পাওয়া যাইবে। কেহ কেহ বলিতেছেন—গবর্ণমেণ্টও বলিতেছেন তোমরা কোনও 'বারগেন' (দরদস্তর) এখন করিও না। এ 'বারগেনের' সময় নয়। আমরাও বলি, এ 'বারগেনে'র সময় নয়, এবং 'বারগেনে'র ভাবেও এ কথা আমরা বলিতেছি না। 'বারগেন' নয়, কিন্তু যে অবস্থা না হইলে, যে আশা না জাগিলে, দেশরক্ষায়—সাম্রাজ্য রক্ষায়—দেশের লোক প্রণোদিত হইবে না,—দেশের ও সাম্রাজ্যের হিতকামী মিত্র বলিয়া তাহাই স্পষ্ট কথায় বলিতেছি। গবর্ণমেণ্ট যদি ভুল বুঝিয়া থাকেন, যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের মনস্তুষ্টির জন্য সেই ভুলেরই পোষকতা করিবেন, তাঁহাদিগকে গবর্ণমেণ্টের মিত্র বলিতে পারি না। আপৎকালে প্রভুকে ভুল যে দেখাইয়া দেয়, কোন পথে নিষ্কৃতির উপায় তাহা যে সাহস করিয়া নির্দ্দেশ করে, সেই প্রভুর প্রকৃত মিত্র। আর যে তা করে না, প্রভুর আপাত-

অধস্তনের জন্য 'বো হুকুম' বলিয়া সেই ভুলেই প্রভুকে রাখিতে চায়, সে মিত্র নয়, প্রভুর পরম শত্রু।

কি প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে।

যাহা হউক, গবর্ণমেন্ট যাহা ভাবিয়া যে নীতিই অবলম্বন করুন, যে কোনও অবস্থাতেই কি প্রণালী অবলম্বন সহজে বর্ত্তমানে বাঙ্গলার সৈন্য সংগ্রহ হইতে পারে, তাহা যে বিশেষ বিবেচনার বিষয় ইহাতে সন্দেহ নাই।

দিল্লীর সামরিক মহাসভার অবসানে সুবিখ্যাত ব্যবহারজীবী, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ি (বি, কে, লাহিড়ি) বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থায় কি প্রকারে আমাদের দেশে উপযুক্ত সৈন্য সংগ্রহ হইবে সেই বিষয় আলোচনা করিয়া সম্প্রতি অমৃতবাজার পত্রিকায় সে একখানি গভীর যুক্তিপূর্ণ পত্র দিয়াছেন। তিনি যে মত প্রকাশ করিয়া যে পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা অতি সমীচীন বলিয়া আমরা মনে করি। নিম্নে তাঁহার সেই পত্রখানির মর্ম্মানুবাদ আমরা দিলাম। "বড়লাট বাহাদুর দিল্লীর মহাসভায় তাঁহার বক্তৃতার একস্থানে বলিয়াছেন যে প্রধানতঃ তিনটি বিশেষকারণে ভারতবর্ষ হইতে আমাদের আরও লোকের প্রয়োজন হইয়াছে (১) প্যালেষ্টাইন, মিসর ও মেসপটেমিয়ার প্রয়োজনে, (২) আফগানিস্থান হইতে বাহিরের শত্রুকে দূর করিতে আমিরকে সাহায্য করিবার জন্য এবং (৩) ভারতবর্ষের সীমান্ত রক্ষা করিবার জন্য। এই কার্য্যের জন্য "রেগুলার" সৈন্যের প্রয়োজন এবং এই সৈন্যবিভাগে যোগদান করা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এখন প্রশ্ন হইতেছে যে ভারতবর্ষের সীমান্তপ্রদেশসমূহ রক্ষার জন্য ও ভারতের বাহিরে যুদ্ধ করিবার জন্য কতলোক ইচ্ছা করিয়া আসিবে এবং সে বিষয়ে দেশনায়কদিগের চেষ্টা কতদূর সফল হইবে। বাঙ্গালীর যুদ্ধবিদ্যা শিখিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা আছে এবং সহজে যে সে বিদ্যা অভ্যাস করিবার ক্ষমতাও তার আছে একথা এখন সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহাদের সৈনিকজীবন যাপন করিতে কি করিয়া প্রলুব্ধ করা যায়, তাহাই এখন বিশেষ চিন্তার বিষয়। যুদ্ধের প্রথমভাগে আমাদের অনেক প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইয়াছে, আমরা অনেক বিষয়ে নিরাশ হইয়াছি, তথাপি আমরা ভীরু, আমরা যুদ্ধ করিতে জানি না বা পারি না—অথবা সেদিকে আমাদের কোন উৎসাহ নাই—এই নিন্দা ও মিথ্যা কলঙ্ক হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিবার জন্য আমাদের শিক্ষিত যুবকবৃন্দ সামান্য সিপাহী হইয়া সৈন্যশ্রেণীতে যোগ দিয়াছেন। আমরা যে ভীরু নই, আমাদের যে যুদ্ধ করিবার আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহা যখন একবার প্রমাণিত হইল, তখন আর এ কার্য্যে যোগ দিবার তাঁহাদের বিশেষ কোন প্রবৃত্তি বা উৎসাহ রহিল না। কাজেকাজেই পূর্ব্বে যে ভাবে সৈন্য সংগ্রহ হইতেছিল, তাহা আর হইল না। বিশেষ চেষ্টাসত্ত্বেও Recruiting Committee প্রতিমাসে ১০০ শতের বেশী লোক সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না। বাধ্য না হইয়া সেচ্ছায় লোক যাহাতে সৈন্য হয়, এই চেষ্টায় সফল হইতে হইলে ইংরাজী শিক্ষিত যুবকদিগের স্বদেশপ্রেমের দোহাই দিয়া—তাহাদিগকে এই কার্য্যে ব্রতী করিতে হইবে। সৈন্য হইবার জন্য তাহাদের নূতন কোন উৎসাহ নাই। বেতনবৃদ্ধি ও দেশী সৈন্যকে 'কমিশন' দিবার প্রস্তাবে সৈন্যসংগ্রহ কার্য্যে সাহায্য করিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে যে বিশেষ কোন ফল হইবে এরূপ মনে হয় না।

বড়লাট বাহাদুর তাঁহার বক্তৃতার আর একস্থানে বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষে বিপদের আশঙ্কা আছে। তিনি বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষের মত আফগানিস্থানেও এমন কতকগুলি লোক আছে যে তাহারা মূর্খতার দরুণই হউক বা অতি বিশ্বাসের দরুণ হউক চারিদিকের এই উত্তেজনার সময় সহজেই কোন বাজে কথায় একেবারে উত্তেজিত হইয়া উঠিতে পারে। তাহাতে গবর্ণমেণ্টের অনেক সময় অনেক বিপদ হয়। বাস্তবিক এই সামান্যবিষয়ের জন্য আমাদের বাড়ী ঘর স্ত্রীপুত্র লইয়া অনেক সময় ভীষণ বিপদে পড়িতে হয়। তাহার প্রমাণ বাঙ্গালায় 'হাটলুটের' ব্যাপার ও বিহারের দাঙ্গা। সে সব কথা এখনও সকলের বেশ মনে আছে। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালার শান্তিরক্ষার জন্য একদল বাঙ্গালী টেরিটোরিয়াল সৈন্য প্রস্তুত করুন। ১৮–৩০ বৎসরের একলক্ষ শিক্ষিত যুবক আমাদের দেশে আছে—তাঁহারা সকলেই ইহাতে যোগদান করিবে। বাঙ্গালার বিভিন্নস্থানে তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হউক। তাহাদের শিক্ষা শেষ হইলে জরুরী প্রয়োজনে তাহারা কাজ করিতে পারিবে, এবং বাঙ্গালী ব্যাটালিয়নে ও ভারতরক্ষী ফৌজের সাহায্যেও আসিতে পারিবে। আবার শিক্ষা শেষে কেহ কেহ চুপ চাপ করিয়া ঘরে বসিয়া আপিসে চাকরী করিয়া কোটান কইক্কর, মনে করিয়া—স্বেচ্ছায় পল্টনে ও ভারতরক্ষী ফৌজে যোগ দিবে। আশা করি বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে একটু মনোযোগ দিবেন। বাঙ্গালীর যুবকবৃন্দ তাহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যে পশ্চাৎপদ হইবে না।"



"কর্পূর-মঞ্জরী"

১৪১-৪২ পৃষ্ঠা

পল্লীর প্রাণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

(১০)

সেইদিন বাজার হইতে ফিরিয়াই নিবারণ ঝাড়ে গিয়া কয়েকটি পাকা বাঁশ কাটিল। স্নানাহারের পর শিবু আর যতীনকে ডাকিয়া বাঁশ ফাঁড়িয়া চটা প্রস্তুত করিতে বসিল।

শিবু কহিল, "কি হবে নিবুদা ?"

"একটা পুরোনো ঘর ছাইতে হইবে।"

"কাদের ঘর ?"

"সে কাল টের পাবি,—তবে তোকে যেতে হবে না।"

"কেন নিবুদা ?"

"সেখানে তোর যেতে নেই।"

যতীন্ বলিয়া উঠিল, "যেতে নেই। কোথায় ? আমাদের যেতে আছে ত ?

"তা আছে। সবারই আছে, কেবল শিবুর নেই। তবে সবার দরকার হবে না। তুই একজন হ'লেই চ'লবে। আর গয়েজকে নেব,—ঘর ছাইতে তার হাত পাকা, একদিনেই হয়ে যাবে।"

"শিবুর খালি যেতে নেই,—আর সবারই আছে—কোথায় ? ওহো! বুঝেছি—বুঝেছি ? হা হা হা!"

যতীন্ হাতে তালি দিয়া হাসিয়া উঠিল।

"চুপ যত্নে! এখনই মন্ত্রভেদ করিস্‌নে যেন। শিবে! হা ক'রে চেয়ে রইলি কেন রে ? কাজ কর্—কাজ কর্! হ'ক্—চটা চাছা তোর সমান হ'চ্ছে না। তোর চাইতে

যতীন্ কহিল, "দায়ে সাফ বেশী হ'ক, কলমে কম। ও অনার পেয়েছে, আর আমি খালি পাশ।"

"কিছু না—কিছু না! মুখস্থ ক'রেছে বেশী—তাই অনার পেয়েছে। লেখাতেও শিবের হাত ভাল—নইলে ওর চাইতে আমিও লিখি ভাল। কি জানিস্, হাত যাদের সাফ, হাতের কাজ তাদের সবই সাফ হবে,—সে কলমই হ'ক কি দা কুড়ুলই হ'ক, সূঁচ হ'ক কি তুলিই হ'ক্।"

শিবু কহিল, "থাকল তবে তোমার দা আর চটা নিবুদা! হাত আগে সাফ করাও তখন ক'র্‌ব,—নইলে নয়।"

"তা হ'লে আর ক'র্ত্তে কখনও হবে না। ওরে হতভাগা! শেখ্—শেখ্। দুটো চটা নষ্ট হবে, সে আমার যাবে,—তোর কি ? শেখ্ শেখ্—লেগে পড়ে খেটে শিখ্‌লে চলন সই বিদ্যে সবারই সব কাজে হয়। বই পড়ার বিদ্যে যতই হ'ক, হাতের কাজে কেন মুখ্যু থাক্‌বি ? দরকার হ'লে মজুর মজুরই সই—এম্‌নি ধারা যদি হ'তে পারিস্, তবেই মানুষ হবি।"

শিবু লজ্জা পাইয়া আবার দা হাতে নিয়া কহিল, "শুধুই চটা চাঁছাবে দাদা, ঘর ছাইতে নেবে না,—শিখ্‌ব কি ক'রে ?"

"ঘর ছাবি—ঢের পুরোনো আছে,—ছা না—কত ছাবি। কেবল ওই একখানা বাড়ী বাদ।"

যতীন জুড়িয়া দিল,—"যেহেতু সেখানা হ'চ্ছে—বা হবে তোমার—'অসারে খলু সংসারে শ্বশুর-মন্দিরম্।'"

হরিঘোষালের ভাই অম্বিকা ঘোষালের কন্যার সঙ্গে শিবুর বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছিল। অম্বিকাঘোষাল আগেই লম্বাপণে শিবুর সঙ্গে তাঁহার কন্যার সম্বন্ধের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। শিবুর পিতা সর্ব্বানন্দ গাঙ্গুলীরও অমত তাহাতে ছিল না। কারণ, বর্ত্তমান এই প্রাপ্য ছাড়াও ভবিষ্যতে শিবু ওকালতীতে বসিলে বেণীবাবুকেও বড় মুরুব্বী পাওয়া যাইবে। শিবুর বি এ পাশের সংবাদ আসিলে হরিঘোষাল আবার আসিয়া সর্ব্বানন্দকে বড় ধরিয়া পড়েন। সর্ব্বানন্দ বলিয়া ছিলেন, শীঘ্রই তিনি সহরে গিয়া শেষ কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিবেন।

শিবু কহিল, "শ্বশুর বাড়ী! সে কি? কাদের ঘর ছাবে সেখানে! কেন? তাদের কিসের দুঃখু?"

যতীন্ কহিল, "তাদের দুঃখু নেই বটে। তবে—পাশেই ছোট এক ঘর বড় দুঃখী আছে। পরশু গিয়েছিলাম সেখানে—ও ঘরে যে কি ক'রে থাকে তারা! মনে হচ্ছিল, নিবুদাকে ব'লে—ওদের ঘরখানা মেরামত করে দিলে মন্দ হয় না।"

শিবু কহিল, "ও—বুঝেছি। তা আমি কেন যাব না?"

নিবারণ কহিল, "নারে না। সেটা ভাল হয় না। ঐ একই বাড়ী ত? ন কাকা বড় রাগ ক'রবেন। আর দরকারই বা কি? তুই না গেলে যে ঘর ছাওয়া হবে না, তা ত আর নয়!"

যতীন্ কহিল, "ভাল হ'ক আর নাই হ'ক, শিবুর বাবা সেটা মোটেই পছন্দ ক'রবেন না। আর যাই বল নিবুদা, শিবুর যে ওই ঘোষালদের ঘরে বিয়ে হবে,—এটা মোটেই আমার ভাল লাগ্‌ছে না।"

"ন কাকার এ পছন্দটা—আমারও যে খুব ভাল লাগ্‌ছে তা নয়। তবে অম্বিকে ঘোষাল তার পরিবার নিয়ে সহরে থাকেন—আদব কায়দাটা নেহাৎ মন্দ বলা যায় না!"

শিবু কহিল, "তা থাকুন—বেণীবোসের মুহুরী ত? আবার হরিঘোষালের ভাই!—বাবাকে কিছু ব'লতে ভরসা পাই না, নিবুদা,—কিন্তু মোটেই আমার ভাল লাগ্‌ছে না এটা। তুমি যদি মাকে একটু বল নিবুদা।"

"হাঁ, শেষে কাকা কাকীতে একটা কুরুক্ষেত্তর বাধাই আর কি? তাই নিয়ে শেষে বাপে ছেলেতেও মন ভাঙ্গাভাঙ্গি হ'ক। ভায়ে ভায়ে মন ভাঙ্গে, ঘরও ভাঙ্গে—সেটা—যা হ'ক্ চ'ল্‌তি হ'য়ে গেছে। তবে বাপ ছেলেতে—না শিবু সেটা মোটেই ভাল হবে না।"

"মন ভাঙ্গাভাঙ্গি কেন হবে নিবুদা?—"

"মতের আর গরজের এত বড় একটা ঠোকাঠুকি হ'লে মন তাতে ভেঙ্গে ওঠে বই কি শিবু?"

"তাই ব'লে—এত বড় ব্যাপারে যার উপর সারাটা জীবনের সুখ দুঃখ নির্ভর ক'চ্চে—তাতেও কি নিজের কি ভাল লাগে না লাগে তা একটু ব'ল্‌তে পাব না?"

নিবারণ কহিল, "ব'ল্‌তে চাস্—পারিস্ যদি সোজা গিয়ে বাবার কাছে বল্,—মধ্যস্থ কেউ মনের কথাটা ভাল ক'রে বোঝেও না, বোঝাতেও পারে না,—আরও নিজের মতামতটা তার মধ্যে জড়িয়ে ফেলে বেজায় একটা গোল পাকিয়ে তোলে।"

"অতটা—ভরসা পাইনে নিবুদা।"

"তবে চুপ মেরেই যা। হরিঘোষাল খারাপ লোক ব'লে—তাই ভাইঝিও যে খারাপ হবে এমন কোনও কথা নেই। ছোট মেয়েটি—কাদার মত মন—যেমন গড়াবি—তেমনি গ'ড়ে উঠ্‌বে। আর জানিস্ ত 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি'—শাস্ত্রেরও বচন এই আছে। আরে—ও গয়েজ—গয়েজ! কোথা যাচ্চিস্ রে! শোন্—শোন্—এদিকে আয়! কথা আছে।"

গয়েজ (ফয়েজের পুত্র) সম্মুখের রাস্তা দিয়া দা হাতে লইয়া কাজে যাইতেছিল। নিবারণের ডাকে কাছে আসিল।

"সেলাম চাচাঠাকুর! কি এজ্ঞে কর?"

"আগে আজ্ঞে করি, একটু তামাক খা! ওই যে দাওয়ায় তামাক ক'লকে—[illegible] সব র'য়েছে—"

গয়েজ গিয়া তামাক সাজিল,—"হুঁকোটা চাচাঠাকুর?"

নিবারণ উঠিয়া গিয়া হুঁকাটি আনিল,—গয়েজ কলিকাটি তার কাছে সরাইয়া রাখিল। নিবারণ কয়েকটা লম্বা টান দিয়া ধূমায়িত কলিকাটি খুলিয়া আবার গয়েজের সামনে রাখিল। গয়েজ কলিকাটির গোড়ায় দুটি হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া কয়েকটা টান দিল। কলিকাটি আবার নিবারণের কাছে রাখিয়া কহিল, "তামাক ত খেলাম,—এখন আর কি এজ্ঞে চাচাঠাকুর!"

"কাল তোর কাজ [illegible]"

"হাঁ, কাজের কি আর জিরেন আছে চাচাঠাকুর? জিরেন দিলেই বা চলে কই? বাজান আছে জ্বরে প'ড়ে——"

"কাল কোথায় কাজ ক'র্‌বি?"

"ওই ঘোষাল মশাই ব'ললেন, তানার বাগানে কি কাম আছে——"

"এই মাটি ক'রেছে—যা! আমি ভাব্‌ছিলাম আমাদের সঙ্গে তোকে নিয়ে যাব—একটা ঘর ছেয়ে দিতে হবে——"

"তোমার কামেই তবে যাব চাচাঠাকুর! ঘোষাল মশাইয়ের কাম কালকের দিন বাদে না হয় পরশুদিনই ক'র্‌ব। কাল একদিনে হবে ত?"

"তা—তেমন খাট্‌তে পারিস্‌ ত হবে বই কি? সকালে দুটো পান্তা খেয়ে আস্‌বি। দুপুরে চিড়েগুড় দেব—আর একেবারে সন্ধ্যেবেলা ঘরে গিয়ে ভাত খাবি। একদিনের মজুরী তোকে দেব,—ক্ষেতি কিছু হবে না?"

"না বাবাঠাকুর—ঐটি হবে না। মোটে একটা দিন তোমার কাম ক'র্‌ব—তার আবার মজুরী কেন? আবার সে কামও ত পরের বাড়ীর কাম। তা চাচাঠাকুর গরীবের কিছু ত ক'ত্তে পারিনে—তোমার সঙ্গে একদিন গিয়ে ঘর ছেয়ে আস্‌ব—গতরে একদিন খাটা—তার আবার মজুরী কেন?"

"চ'ল্‌বে কি ক'রেরে পাগল? ফয়েজদা ব্যামোতে প'ড়ে আছে——"

"তা আছে—তার জন্যে ভাবনা কি? খেতে একদিন না পাই, তোমাদের পেসাদ ত আছে?"

"আচ্ছা, সে তখন যা হয় বোঝা যাবে। কাল তবে খুব সকালে দুটো পান্তা খেয়েই আস্‌বি—ভুলে যাস্‌নি যেন।"

"কোথায় যেতে হবে?"

"ওই ঘোষালদেরই বাড়ীতে।"

"তবেই খেয়েছ চাচাঠাকুর। ঘোষালমশাই যে একেবারে মাত্তে আস্‌বে! আবার পিসীঠাকুরুণ যদি বকাবকি লাগিয়ে দে——"

"চুপ মেরে কাজ ক'রে যাবি। ব'কে ব'কে আপনিই থেমে যাবে তারা। ঘোষালমশাইও তেড়ে ফুঁড়ে দুই একবার আস্‌বে,—গায় হাত তুলবে না। জবাব কিছু ক'র্‌বিনে—ওদের দিকে ফিরেও চাইবিনে,—নিজের মনে কাজ ক'রে যাবি। বস্‌!——"

যতীন্‌ কহিল, "এত ভারি আহ্লাদে কথা! কেবল তারা ব'ক্‌বেই আর আমরা চুপ ক'রে থাক্‌ব? কেন, শক্ত দুকথা শুনিয়ে দিতে দোষ কি?"

"তোরা ত ঝগড়া ক'ত্তে যাবিনে, যাবি কাজ ক'ত্তে। বকাবকি একটা বাধিয়ে নিলে কাজ এগোবে না। বিপক্ষ যতক্ষণ শুধু মুখই চালায়, হাতে এসে বাধা কিছু দেয় না, কাজের লোকের ততক্ষণ মুখ বুজে হাতে কাজ ক'রে যাওয়াই ঠিক। জব্দ যদি ক'ত্তে চাস্‌, জান্‌বি, ঝগড়াটে লোক ঝগড়া বাধাতে না পাল্লে যত জব্দ হয়, এমন আর কিছুতে হয় না।"

গয়েজ কহিল, "ওই যা ব'ল্লে চাচাঠাকুর। তবে আমরা নাকি মোছলমানের জাত—বেইমানী কথা কেউ ব'ল্লে—রাগটা হয় বেশী—আর সামলাতে পারিনে। তা উঠি এখন চাচাঠাকুর—চটাগুলো—আমিই চেঁছে দিয়ে যেতাম,—তা ওই ভটচাযবাড়ী কামে আজ নেগেছি—বিকেল বেলাটা কামাই ক'ল্লে—আবার পয়সা নিয়ে ঘুরোবে। সেলাম চাচাঠাকুর!"

এই বলিয়া গয়েজ তার দা খানি হাতে লইয়া চলিয়া গেল।

পরদিন নিবারণ, বন্ধু যতীন্‌ ও বরদা এবং অনুগত গয়েজকে লইয়া কমলার ঘর মেরামত করিতে গেল। খড়, বাঁশের চটা প্রভৃতি সরঞ্জাম সব নিজেরাই বহিয়া লইয়া গেল।

হরিঘোষাল গয়েজের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ উপলক্ষ করিয়া বকাবকি আরম্ভ করিলেন। নিবারণের প্ররোচনায় গয়েজের এত দুঃসাহস হইয়াছে! তিনিও দেখিবেন, তার নিবারণ বাবা তাকে কেমন করিয়া রক্ষা করে! আর নিবারণই বা কি ভাবিয়াছে যে এমন করিয়া তাঁহার পিছনে সে লাগিয়াছে, প্রত্যহ তাঁহার অপমান করিতেছে—কাজের ক্ষতি করিতেও দ্বিধা করিতেছে না। আর তার এত কাঁকার দালালীই বা কেন? তাঁহার ভ্রাতৃবধূর জীর্ণ ঘর কি তিনিই মেরামত করিয়া দিতে পারিতেন না যে আজ বাহিরের লোক আসিয়া তাঁহার ঘর মেরামত করে? আর সেই ভ্রাতৃবধূরই বা এত দুঃসাহসিকতা কেন যে তাঁহার এত বড় শত্রুর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া তাঁহার অপমান করিতে তিনি প্রবৃত্ত হইয়াছেন? তাঁহার বাড়ীর সীমানায় তাহাকে প্রবেশ

করিতে না দিলে নিবারণের চৌদ্দ পুরুষের সাধ্য আছে, কোনও বিপদে আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারে? ইত্যাদি।

নিবারণের নির্দ্দেশ মত তার সহযোগীরা সত্যই একেবারে নীরবে কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। পরেশ মুচকি মুচকি হাসিতেছিল।—প্রতিপক্ষের এত গালাগালের সম্মুখে নিবারণের দলের এই নীরব উপেক্ষা সহকারে কাজ করিয়া যাওয়া—ইহা তাহার মনে বড় একটা বিস্ময়কর কৌতুকের সৃষ্টি করিতেছিল।

সকলের আরও একটি বড় বিস্ময়ের কারণ ইহা হইতেছিল, যে বামার তীব্রকণ্ঠ তাহাদের কর্ণে সুধাবর্ষণ করিতেছিল না।

তাহারা দেখিল, বামা যখন তখন বাহিরে আসিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া ভীষণ রোষকষায়িত নেত্রে তাহাদের দিকে চাহিতেছেন, কিন্তু একটি কথাও তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন না।

তার কারণ ছিল। হরিঘোষালের রাগ হইয়াছিল, অপমানবোধ হইয়াছিল। বামারও রাগ হইয়াছিল, ভ্রাতার কোনও অবমাননা বা অনিষ্ট বামার সহিত না। কিন্তু আজ তাহার উপরে আরও এমন একটা তীব্রতর—গভীরতর বিষ বামার মনে দেখা দিয়াছিল—যাহার কোনও প্রকাশ মুখের কোনও কথায় তিনি সহসা করিতে পারিলেন না। বটে! কাল সর্ব্বনেশে মাছ পাঠাইল, আমদুধ পাঠাইল,—আজ আবার ঘর মেরামত করিয়া দিতে আসিয়াছে! এত দরদ কিসের? কাল বড়বউ মাগী তাঁকে ধমকাইয়া জব্দ করিয়াছিল। কিন্তু আজ! আজ এসব কি? বিষের জ্বালায় ঘরে আপনমনে বামা গজ গজ করিতেছিলেন,—আর বিষের সে গজগজানি দাক্ষায়ণীকে লক্ষ্য করিয়াই বেশী নির্গত হইতেছিল! দাক্ষায়ণীও ভাবিলেন, ছোটবউ এটা বড় অবিবেচনার কার্য্যই করিল। অবশ্য দোষের কিছুই ইহাতে নাই,—ঠাকুরঝি তার বিষমনের দোষেই সব দোষ দেখিতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও—ছোটবউএর পক্ষেও, এটা কিছু বাড়াবাড়িই হইল। ঠাকুরঝি ত ওই বিষের হাঁড়ী, একটা কুৎসা যদি বাহির হয়,—তবে যে সর্ব্বনাশ হইবে! অতবড় মেয়ে ঘরে!—হাঁ—ঘরে চালে খড় নাই—বর্ষা আসিতেছে—তা তিনি না হয় লুকাইয়া তাঁহার হাতের কঙ্কণ বেচিয়া টাকা দিতেন। ওরা টের পাইলে তাঁকে দু কথা শুনিতে হইত। কিন্তু তাও যে ইহা অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল। তাইত! অভাগী বড় অবিবেচনার কার্য্যই করিল!

(১১)

পরদিন সকালে প্রাতঃশৌচাদি সমাপনান্তে কাঁধে গামছা হাতে গাড়ু লইয়া হরিঘোষাল যখন বোসেদের পুকুর ঘাট হইতে বাড়ীর পথে আসিয়া উঠিলেন,—একটি দুষ্টলোক আসিয়া দুঃসংবাদ দিল, গাঙ্গুলী পাড়ায় তাঁদের পুরাণ পুকুরটা ছেলেরা সব দল বাঁধিয়া সাফ করিতেছে!

হরিঘোষাল লাফ দিয়া উঠিলেন "সাফ কচ্চে! কে—কোন্ হারামজাদারা?"

"গাঁয়ের সব হারামজাদারা—কেউ বাদ নেই বড়।"

"বটে? সব হারামজাদার জড় ওই নিবে গুওটা আছে বুঝি?"

"সে ত আছেই।—দলের সর্দ্দারই ত সে।"

বড় কটু একটা গালি দিয়া হরিঘোষাল হাতের গাড়ু আছড়াইয়া মাটিতে ফেলিলেন—তারপর উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিলেন।

নিবারণের মতলব ছিল, রাত্রি প্রভাতে ঘোষালবাড়ী সংবাদ পৌছিবার আগেই কাজ একেবারে শেষ করিয়া ফেলে। পরে হরিঘোষাল যাই করুক, কাজের সময় আসিয়া তাহা হইলে আর কোনও বাধা দিতে পারিবে না। লোকজন জুটাইতে সহসা না পারুক, সে একাই যে গোলমাল উপস্থিত করিবে তাহা সামলানও নিতান্ত সহজ হইবে না। দুইচারি জন এমনও জুটিতে পারে, যারা এই জবরদস্তীর বিরুদ্ধে হরিঘোষালের পক্ষ নিবে। কারণ এরূপ জীর্ণ পুকুরের মালিক গ্রামে আরও আছে, যারা সেই জীর্ণতার স্বত্বাধিকারে চাপিয়া বসিয়া থাকিতেই চায়। অপর কাহারও পক্ষ হইতে কোনও সংস্কারের প্রয়াস এই স্বত্বে অনধিকার প্রবেশ এবং তাহা হইতে ভবিষ্যতে একটা দাবীর সূচনা হইল বলিয়াও তারা মনে করে। আবার এই জবরদস্তী সংস্কার পুকুর ছাড়িয়া পগাড়ে গিয়াও পড়িতে পারে। এমন লোকও গ্রামে দুর্লভ নয়, যারা বাড়ীর সীমানা দুই চারি অঙ্গুলি করিয়া ক্রমে পগাড়ের মধ্যে দুই [illegible]

পঞ্চায়েতের সংস্কার চেষ্টার প্রাণপণে ইহারা বাধা দিয়া আসিতেছে,—কিন্তু গাঁয়ের ছেলেরা দল বাঁধিয়া গিয়া পড়িলে এই সীমানার প্রসার তাহাদিগকে সঙ্কুচিত করিতেই হইবে।

হরিঘোষাল বেজায় জেদী মাথাভাঙ্গা আর ধড়িবাজ-লোক,—তাকে সম্মুখে পাইলে এরূপ অনেকেই নিজ নিজ ভাবী স্বার্থের কথা মনে করিয়া তার পিছনে দাঁড়াইতে পারে। ছেলেদের কারও কারও গুরুজনও ইহাদের মধ্যে আছে,—সুতরাং তারাও পিছাইয়া যাইবে।

তাই নিবারণ ভাবিয়াছিল, হরিঘোষাল আসিয়া বাদী হইবার আগেই কাজ সারিয়া ফেলিবে। কিন্তু তা হইল না। কাজ কম নয়। চারি পাড় ভরা—অগাছার জঙ্গল,—পুকুরের মধ্যে বহু বৎসরের সঞ্চিত ঘন পানা দাম। অতি প্রত্যুষেই তারা বিশ পঁচিশজনে আসিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু আধাআধি হইতেই কিছু বেলা হইয়া পড়িল।

হরিঘোষাল ছুটিয়া যখন পুকুরপাড়ে আসিয়া পৌছিলেন,—দুই পাড়ের জঙ্গল সাফ করিয়া ছেলেরা পানা দাম প্রায় সব তুলিয়া ফেলিয়াছে। বাকী আর দুই পাড়ের জঙ্গল সাফ করিতে আরম্ভ কেবল করিয়াছে!

হরিঘোষাল দুই হাত তুলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন,—"দোহাই কোম্পানীবাহাদুরের! দোহাই মহারাণীর! দোহাই লাটসাহেবের!"

বলিতে বলিতে ছুটিয়া নিকটেই কয়েকজন ছেলে যেখানে দা লইয়া জঙ্গল কাটিতেছিল, সেইখানে গিয়া একেবারে আড় হইয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন! ছেলেরা থমকিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। নিবারণ একটু দূরে ছিল, ছুটিয়া আসিল। "ক'চ্ছেন কি ঘোষালমশাই? একেবারে জঙ্গলে এসে শুয়ে প'ল্লেন!—জোঁকপোকে ভয়—সর্ব্বনাশ! ওই যে কোমরে একটা জোঁক—"

যতই দুর্দান্ত হউন, জোঁকে হরিঘোষাল বড় ভয় পাইতেন।

"কোমরে জোঁক! ও বাবা রে!" এই বলিয়া তিনি একেবারে লাফ দিয়া উঠিয়া, পা ঝাড়িতে ঝাড়িতে প্রায় উলঙ্গ হইয়া নাচিতে আরম্ভ করিলেন। ছেলেরা হাসিয়া উঠিল।

"হাসছিস্? ওরে হারামজাদারা! হাসছিস্? ভারি আমোদ পেয়েছিস্ সব! আচ্ছা, থাক্ থাক্!—মগের মুলুক পেয়েছিস্? জেলে গিয়ে যখন পচ্‌বি—তখন মজা টের পাবি। ওহে!—তোমরা সব সাক্ষী হে!"—এই বলিয়া কাপড় আটিয়া পরিতে পরিতে ঘোষাল পাশেই রাস্তার দিকে একবার চাহিলেন। দুইচারিজন লোক আসিয়া রাস্তায় তখন জমিতেছিল,—কয়েকজন স্ত্রীলোকও আসিয়াছিল,—সাক্ষীর নামে তাহারা দৌড়িয়া পলাইল।

নিবারণ কহিল, "সাক্ষী দরকার হবে না ঘোষাল মশাই,—মামলা যদি হয়—আমরাই একরার ক'র্‌ব—ফাঁকি দেব না। তা আপনি এখন স'রে যান,—অল্পই বাকী আছে, কাজটা হ'য়ে যাক্!"

"কাজটা হ'য়ে যাবে? তা যাবে বই কি? নইলে পুরো দখল হবে কিসে? কেমন হয় তা দেখাইব? দাঁড়া হারামজাদারা!"

এই বলিয়া হরিঘোষাল আবার নিকটবর্ত্তী যুবকদের উপরে গিয়া পড়িলেন,—তাদের একজনের হাত হইতে দা কাড়িয়া, নিয়া তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া সেই দা তুলিলেন। নিবারণ অবিলম্বে ছুটিয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিল,—টানিয়া তাঁহাকে সরাইয়া আনিতে আনিতে কহিল, "কি ক'চ্চেন ঘোষাল মশাই? একেবারে পাগল হ'য়েছেন? একটা খুনোখুনি ক'রে ফাঁসি যাবেন শেষে?"

"ছেড়ে দে শুওর ব্যাটা! ছেড়ে দে ব'ল্‌ছি! ফাঁসি যাব—যাই যাব! তোর কিরে পাজি! ছাড়্ ব'ল্‌ছি! আজ দেখাব—জোর ক'রে পরের পুকুর দখল ক'ত্তে এসেছিস্—মজা দেখাব!"

নিবারণ সাপটিয়া ধরিয়া হরিঘোষালকে টানিয়া কিছু দূরে আনিল,—যুবকদের ডাকিয়া কহিল, "ওরে তোরা সেরে ফেল তাড়াতাড়ি যদ্দূর পারিস্—আমি এঁকে দেখ্‌ছি।"

"সেরে ফেলবে! ও হারামজাদা! ও শুওর ব্যাটা! ওরে নির্ব্বংশ হবি—নির্ব্বংশ হবি—নির্ব্বংশ হবি! বামুনের সর্ব্বনাশ ক'চ্চিস্—কিছু থাক্‌বে না—কিছু থাক্‌বে না—থাক্‌বে না! সব উড়ে পুড়ে ছারখার হবে! ওহে তোমরা দেখ হে দেখ! জোর ক'রে অনধিকার প্রবেশ ক'চ্চে—আমার সম্পত্তি দখল ক'চ্চে—আবার আমাকে ধ'রে

মারপিট ক'চ্ছে! ফৌজদারী—ফৌজদারী—ফৌজদারী! একেবারে মগের মুলুকের ফৌজদারী! ওরে আমাকে খুন করেছে! ওরে কে কোথায় আছিস্‌রে! ওরে বেহ্মহত্যে হয় আজ কেষ্টপুরের গাঁয়ে-তোরা কে কোথায় আছিস্ রে ——!"

চিৎকারে পাড়ার লোক আসিয়া জমিল—স্ত্রী-পুরুষ অনেকেই আসিল। কেহ কেহ দূরে দাঁড়াইয়া গলা বাড়াইয়া দেখিতে লাগিল—পাছে কাছে আসিলে ফৌজদারী মোকদ্দমায় সাক্ষী দিতে হয়। আর যদি খুনোখুনিই একটা হয়—তবে ত সর্ব্বনাশ হইবে!

ভবানীঠাকুরাণী, শিবুর মা, শিবুর বাবা সর্ব্বানন্দ গাঙ্গুলী—পাড়ার স্ত্রীপুরুষ আরও কেহ কেহ একেবারে কাছে আসিয়া পড়িলেন।

ভবানী কহিলেন, "ওরে সর্ব্বনেশে! কচ্ছিস্ কি? ছেড়ে দে—ছেড়ে দে! সত্যি একটা বেহ্মহত্যেই ক'র্‌বি নাকি! ওরে ছাড়্—ছাড়্! কি সর্ব্বনাশ হ'ল রে! ওরে আমি কি মাথায় বারী দিয়ে ম'র্‌ব নাকি তোর জ্বালায় হতভাগা গোঁয়াড়!"

"এখানে কেন তুমি মা? সরে যাও ব'ল্‌ছি! এখনই ছাড়বার যো নেই, তা হ'লে খুনোখুনি একটা হবে। আমার হাতে ঘোষাল ম'র্‌বে না—ভয় নেই।"

ভবানীঠাকুরাণী সর্ব্বানন্দের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "বলি ও ন'ঠাকুরপো! দোহাই তোমার—সর্ব্বনাশ হ'ল—দাঁড়িয়ে দেখছ—ছাড়িয়ে দেও না! ওই গোঁয়াড়টাকে ধ'রে কেন ওদিকে নিয়ে যাও না! ওরে বাছারা! তোরা এখন থাম্ না! দেখিছিস্ না, কি ফৌজদারী বেধে উঠল—যদ্দূর হ'য়েছে—সেই ঢের! দোহাই তোদের এখন নাম্!"

ছেলেরা কেহই ভবানীর এই অনুরোধে কর্ণপাতও করিল না। তারা সেনাপতির আদেশ পাইয়াছিল,—খপ খপ ঝপ ঝপ শপ শপ শব্দে অতি ক্ষিপ্রহস্তে জঙ্গল সাফ করিতে লাগিল।

সর্ব্বানন্দ কহিলেন, "নিবারণ! বাবা, এখন ছেড়ে দে—ছেড়ে দে! যদ্দূর হ'য়েছে—ঢের হ'য়েছে! বিষম একটা ফৌজদারী হাঙ্গা শেষে বাধাবি?"

নিবারণ উত্তর করিল, "ফৌজদারী যা বাধাবার তা বেধেই গেছে—ন কাকা! কাজ আর এখন বাকী রাখবার দরকার নেই।"

ঘোষাল কহিলেন, "দোহাই গাঙ্গুলী! তুমি বেয়াই, রক্ষে কর—রক্ষে কর! হারামজাদা যে একেবারে খুন ক'রে ফেল্লে আমায়। ওরে ছাড়্ ছাড়্! ওরে নির্ব্বংশের ব্যাটা! ছেড়ে দে ছেড়ে দে—ব'ল্‌ছি আমায়!"

হরিঘোষালের প্রাণপণ মুক্তিলাভের চেষ্টায় বলিষ্ঠ নিবারণ পর্য্যন্ত হয়রান হইয়া উঠিল। গড়াইতে গড়াইতে দুই জনে একেবারে সর্ব্বানন্দের পায়ের কাছে আসিয়া পড়িল। সর্ব্বানন্দ ভয়ে দুই পা পিছাইয়া গেলেন। ভবাণী কহিলেন, "ওরে নিবে! ও হতভাগা! এখন থাম্ থাম্! ছেড়ে দে ছেড়ে দে—দোহাই তোর ছেড়ে দে! হাঁ, নঠাকুরপো! দাঁড়িয়ে দেখছ কি? ছাড়িয়ে দেও না। কাঁটা বনে জড়াজড়ি ক'রে দুটোতেই ম'রবে নাকি শেষে?"

সর্ব্বানন্দ কহিলেন, "নিবু! বাবা, লক্ষ্মী আমার! ছেড়ে দে ছেড়ে দে এখন! কাঁটায় যে দুজনের গা একেবারে ছিঁড়ে গেল—রক্তারক্তি হ'য়ে গেলি!"

নিবারণ হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, "ছেড়ে দিতে পারি কাকা! আপনি ব'লছেন, ছেড়ে দেব। কিন্তু উঁনি বলুন, কোনও গোলমাল এখন ক'রবেন না। ইচ্ছে হয় থানায় গিয়ে এজাহার দিন, আদালতে গিয়ে দরখাস্ত করুন, কিন্তু এখন কোনও গোলমাল ক'ত্তে পার্‌বেন না।"

"না—তা ক'রবে না—ঘোষাল—ঘোষাল! এস আমার সঙ্গে। ওরা যা ক'র্‌বার তা ত ক'রেই ফেলেছে——"

এই বলিয়া তিনি ঘোষালের হাত ধরিলেন,—নিবারণ ছাড়িয়া দিল। ঘোষাল রাগে ও ক্ষোভে কাঁদিয়া কহিলেন, 'ক'র্‌বার যা—তা ত করেই ফেলেছে—হায় হায়! একেবারে আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছে! সাত পুরুষের এই পুকুর—হতভাগা জোর ক'রে তা দখল ক'রে ফেলেছে!"

"পাগল! দখল কি অমনিই হয়? তুমি ত এসে বাদী হয়েছ? তারপর পঞ্চায়েত আছে, সালিশ মধ্যস্থ আছে, আদালত আছে,—পুকুর তোমার যাবে কোথা?"

"যাই দেখি তারিণীবাড়ুয্যের কাছে—কেমন পঞ্চায়েত সে একবার দেখি গিয়ে! টেক্সো নেবেন—আর জবরদস্তী করে আমার পুকুর দখল ক'ত্তে আসে তার বিচার কিছু ক'রবেন না?"

এই বলিয়া হরিঘোষাল উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—সহসা শরীরের দিকে দৃষ্টি পড়িল। স্থানে স্থানে কাঁটায় ছিড়িয়া,

গিয়াছিল—রক্তও পড়িতেছিল। হরিঘোষাল চিৎকার করিয়া উঠিলেন !

"দেখেছ—দেখেছ ! একেবারে রক্তারক্তি করেছে রে ! সারাগায়ে জখম করেছে—হায় হায়রে ! ওহে সবাই তোমরা সাক্ষী দেখেছ দেখেছ—কেমন ক'রে আমায় জখব ক'রেছে ? আমার পুকুর দখলক'ত্তে এসেছিল,—আমি বাদী হ'য়েছিলাম, তাই আসামী মেরে আমায় চিৎক'রে ফেলে কাঁটাবন দিয়ে টেনে নিয়ে গেছে। সাক্ষী দিতে হবে—সবার সাক্ষী দিতে হবে। বেহ্মরক্ত পাত ক'রেছে—মিথ্যে সাফাই কেউ দেও—সর্ব্বনাশ হবে সর্ব্বনাশ হবে !"

সর্ব্বানন্দ কহিলেন, "তা হবে—হবে,—যখন হবে—তা হবে ! তুমি এখন চল তারিণীবাড়ুয্যের কাছে—চল, দেখি সেই বা কি বলে।"

"তারিণীবাড়ুয্যের বাড়ী যাব—সেথায় গিয়ে কি হবে ? তলে তলে সেই এই বজ্জাতি চাল চেলেছে ! ওদের উস্‌কে দিয়েছে ! না গাঙ্গুলী, বাড়ুয্যের ওখানে যাব না—আমি থানায় যাব !—এই রক্ত নিয়ে আর জখম নিয়ে থানায় গিয়ে এজাহার দেব ! মনে থাকে যেন হে—সবাই সাক্ষী ! ওই সনাতন গাঙ্গুলীর ছেলে নিবে গাঙ্গুলী জোর করে আমার সম্পত্তি দখল ক'ত্তে এসেছিল, আর আমি বাদী হওয়াতে মেরে আমায় কাঁটাবন দিয়ে টেনে এই জখম ক'রেছে—রক্তপাত ক'রেছে।"

এই বলিয়া হরিঘোষাল থানার অভিমুখে ছুটিলেন। গ্রাম হইতে মাইল পাঁচেক দূরে থানা ছিল।

সকলে কিছুকাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শেষে সর্ব্বানন্দ কহিলেন, "ক'ল্লি কি নিবারণ ব'লত !—অনধিকার প্রবেশ—জুলুম—জখম—গোঁয়াড়তুমী ক'রে কি সর্ব্বনেশে একটা ফৌজদারী বাধালি ব'লত ? বুড়োমানুষ—এসব আমাদের একটু ব'লতে হয় ?"

"ব'লব আবার কি কাকা ? ব'ল্লে কি আর কাজটা হ'ত ? ফৌজদারী ক'রবে—করুক না ? দেখা যাক্ কি হয় ? ওর পুকুর দখল কত্তে ত আসিনি,—সাফ ক'রে দিইছি। কি ক্ষতি হ'য়েছে তায় ? ওকে ত মারিনি আমি ? কাঁটা বন দিয়েও টেনে নিইনি,—বিনয়কে দা তুলে খুন ক'ত্তে উঠেছিল—তাই ঠেকাতে গিয়ে সাপটা-সাপটি কিছু হ'য়েছে,—কাঁটাবনে দুজনেই প'ড়ে গড়াগড়ি ক'রেছি। ওর গা কাঁটায় ছিঁড়েছে—আমার ছেঁড়েনি ? আমার রক্ত পড়েনি ?"

প্রতিবেশী একজন কহিলেন, "শোন্ নিবারণ,—মামলা বড় সোজা হবে না।—তুইও গিয়ে রক্তমাখা কাটা গা নিয়ে থানায় এজেহার দে। একটা পাণ্টা নালিশ কর্—তা হ'লে সুবিধে হবে !"

নিবারণ হাসিয়া উঠিল, কহিল, কিছু দরকার নেই খুড়ো ! গায়ে এই রক্ত নিয়ে এখন থানায় ছুটে যাব নালিশ ক'ত্তে। রামঃ ! আমি কি হরিঘোষাল ?"

এই বলিয়া নিবারণ উঠিয়া পুকুরের কিনারায় গিয়া বসিল, হাতে জল তুলিয়া গায়ের রক্ত ধুইতে আরম্ভ করিল। ভবানীঠাকুরাণী এতক্ষণ বিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থর থর কাঁপিতেছিলেন,—এতক্ষণে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। ছুটিয়া গিয়া নিবারণের কাছে বসিলেন,—রক্ত ধুইয়া দিয়া আঁচলে মুছাইতে মুছাইতে কহিলেন, "আহা, বাছা আমার ! গায়ে আর যায়গা নেই ? একেবারে রক্তারক্তি হয়েছে। এম্‌নি ধারা গোঁয়াড়তুমী ক'ত্তে হয়রে পাগল ?"

রক্ত ধুইয়া গা পুছিয়া নিবারণ পুকুরপাড়ে আসিয়া দাঁড়াইল। যতীন কহিল, "নিবুদা, কাজ ত হ'য়ে গেল, একেবারে সাফ !"

নিবারণ কহিল, "যা, তোরা এখন স্নান ক'রে ঘরে যা। ভয় করিস্‌নে কিছু।"

ছেলেরা সব উল্লাসে চিৎকার করিয়া পুকুরে ঝাঁপাইয়া পড়িল,—নিবারণও সামলাইতে পারিল না,—গায়ের বেদনা ভুলিয়া গেল,—সেও লাফাইয়া পুকুরে পড়িল।—বহুদিনের জঞ্জালযুক্ত পুকুর আজ যুবকগণের উদ্দাম জলক্রীড়ায় যেন ক্রীড়া রঙ্গে উন্মত্ত হইয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

সাগরের ডাক।

(১)

অকূলে যদি ভাস্‌তে চাস্‌
"জয় মা" বলে ভাসা তরী,
তুফান যদি এসেই থাকে
'কি হবে আর বৃথা ডরি' !
নাচ্‌বি সুখে ঢেউর তালে,
পাগল হাওয়া লাগ্‌বে পালে,
গাইবি গান পরাণ খুলে
প্রলয়েরি ছন্দ ধরি' !
অকূলে যদি ভাস্‌তে চাস্‌
"জয় মা" বলে ভাসা তরী।

(২)

অকূলে তুই খুঁজ্‌বি কূল
আশা রাখিস্‌ মনে মনে,
ভাবিস্‌ কেন ? একলা চল্‌—
নাইবা রলি কারো সনে।
ডুব্‌তে যদি নেহাৎ হয়,
ডুব্‌বি একা কিসের ভয়,—
ডুব্‌বি সে যে আমার বুকে
শান্তি যেথা আছে ঘেরি'।
অকূলে যদি ভাসতে চাস্‌
"জয় মা" বলে ভাসা তরী।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

জাপানে প্রণয় ও পরিণয়ের রীতি।*

জাপ-রমণীরা সর্ব্বত্র অবাধে চলাফিরা করে। পূর্ব্বেও তাহারা নাম মাত্র আবরু মানিয়া চলিত। সমাজে তাহাদের বিস্তর আধিপত্য, সাহিত্যের প্রতি পৃষ্ঠায় তাহাদের বর্ণনা। প্রতি কলানৈপুণ্যের মধ্যে তাহাদের প্রতিমূর্ত্তি। জাপানের দৈনন্দিন জীবনপ্রবাহের সর্ব্বত্র শান্ত সৌম্য জাপ-রমণীগণ বিরাজ করিতেছে। পার্শী-রমণী ও ব্রহ্মদেশের রমণী ভিন্ন এসিয়ার অন্য কোন দেশের রমণীরাই বাহিরে এরূপ অবাধ গমনাগমন করে না। কিন্তু কোথাও জাপ-রমণীদিগের উপস্থিতি বেমানান বা বিরক্তিজনক হয় না। তাহারা তাহাদের বিচিত্র পোষাক পরিয়া এমন শোভন গতিতে চলাফিরা করে যে তাহাদিগকে ঠিক মনুষ্যরূপী প্রজাপতি বলিয়া মনে হয়। তাহাদের স্বরও খুব কোমল এবং মিষ্ট।

জাপ-রমণীদিগের ব্যবহার অত্যন্ত ভদ্র। তাহারা অতিমাত্রায় বুদ্ধিমতী নহে। কাহারও প্রখর বুদ্ধি থাকিলেও সে তাহার বুদ্ধিমত্তা ফলাইবার জন্য ব্যস্ত হয় না। তাহাদের স্বভাবে ও ব্যবহারে কোমল রমণী-প্রকৃতিই প্রকট। তাহারা মনের শক্তিতে, শিক্ষায় ও উচ্চাকাঙ্ক্ষায় জাপানী পুরুষ অপেক্ষা অনেক নিম্নে রহিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু জাপানী পুরুষদিগের স্বভাবে কোমলতা ও রমণীয়তার খুব অভাব। আবার জাপ-রমণীদিগের স্বভাবের স্নিগ্ধতা মনোমুগ্ধকর।

ধর্ম্মসাধনার প্রতি জাপানীদিগের আগ্রহ নাই। পিতৃপুরুষের অর্চনা ভিন্ন জাপানীদিগের অন্য কোন ধর্ম্ম নাই বলিলেও চলে। কিন্তু জাপ-রমণী-সম্প্রদায়ের একটি স্বয়ংসিদ্ধ ধর্ম্ম আছে। সে ধর্ম্মসাধনায় তাহারা প্রকৃত সন্ন্যাসিনীগণ অপেক্ষা কম তৎপর নহে। সে ধর্ম্ম—তাহাদের মনোমুগ্ধকারিতার অনুশীলন। এই ধর্ম্মের কোন নেতা নাই, কোন প্রচারক নাই, কিন্তু তথাপি ইহা সর্ব্বত্র প্রচারিত, সর্ব্বত্রই ইহার চর্চ্চা। কি করিয়া সকলকে আনন্দিত করা যায়, বিস্মিত ও মুগ্ধ করা যায়, ইহা শিখিবার চেষ্টাতেই তাহারা সর্ব্বদা ব্যস্ত।

* এই প্রবন্ধের উপকরণ Louise Jordan Miln এর গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

লোককে সন্তুষ্ট করা, লোককে শান্তি, উৎসাহ ও আনন্দ প্রদান করা এবং নিজেদের দুর্ব্বলতাকে পুরুষের শক্তিমত্তা অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী করা জাপ-রমণীদিগের প্রধান আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা। কিন্তু এই চেষ্টার মধ্যে চপলতা বা অভদ্রতা কোথাও দেখা যায় না। রুচির উৎকর্ষ এবং সুরুচি-সঙ্গত ব্যবহার জাপানীদিগের চরিত্রের একটি বিশেষত্ব। এখানেও তাহারই আধিপত্য। জাপানীদিগের চরিত্রে দোষসম্পর্ক নিতান্ত কম এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু তাহাদের সুরুচি-সঙ্গত ব্যবহারের আবরণে তাহাদের দোষ বহু পরিমাণে চাপা পড়িয়া যায়। সুরুচির অনুশীলন জাপানীদিগের শিল্প, সমাজ এবং রাষ্ট্রগত উন্নতির একটি প্রধান হেতু। এই সুরুচির বশেই জাপ-রমণীগণ বুঝিতে পারে যে একজন শক্তিমান পুরুষের হৃদয়াধিকারিণী হওয়া অপেক্ষা রমণীর আর উচ্চপদ নাই, সন্তান সন্ততির প্রতি স্নেহ অপেক্ষা রমণীর আর অলঙ্কার নাই।

জাপ-রমণীগণের প্রণয় ও পরিণয় নানা বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। তাহাদের পরিণয়োৎসবও চমৎকার। কিন্তু ইহার মধ্যে কোথাও বিন্দুমাত্র অসভ্যতা নাই। কি ধনীর প্রাসাদে, কি দরিদ্রের কুঁড়ে ঘরে বিবাহোৎসবে সমস্ত ব্যাপারই সম্পূর্ণ রুচিসঙ্গত।

জাপানীদিগের বিবাহে তিনটি বিষয় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ তাহাদের সুরুচিসঙ্গত রীতি নীতি। দ্বিতীয়তঃ কতকগুলি বিষয়ে প্রাচীন রোমাণদিগের সহিত তাহাদের ঐক্য। তৃতীয়তঃ জাপানী ক'নের শুভ্র পোষাক। প্রাচ্যদেশ সমূহের সর্ব্বত্রই বিবাহোৎসবে ক'নের পোষাক লাল। কিন্তু জাপানে ক'নের পোষাকও মস্তকাবরণ সাদা।

বিবাহোৎসব দেশ ভেদে নানা প্রকারে বিচিত্র। কিন্তু প্রণয়-কাহিনী প্রায় সর্ব্বত্রই একরূপ। অবশ্য আমাদের দেশ এবং এসিয়ার অন্য যে সব দেশে অবরোধ প্রথা আছে সে সব দেশে অধিকাংশ স্থলেই প্রণয়েতিহাসের ঘটনা সমূহ বিবাহের পরে ঘটিতে আরম্ভ করে। অন্য সব দেশেই প্রণয়-কাহিনী বিবাহের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনামূলক। জাপ-রমণীদিগের প্রণয়ব্যাপার অনেকটা ইংরেজ-রমণী বা ইটালীদেশীয় রমণীদিগের ন্যায়।

জাপ-রমণীরা তাহাদের প্রণয়ার্থীর কোমল দৃষ্টিপাতেই তাহাদের মনের সমস্ত কথা নিঃশেষে বুঝিয়া লয়। যখন কোন জাপরমণী তাহার কোন সখীর বিবাহোৎসবে যোগ দিবার জন্য উন্মুক্ত শিবিকাতে আরোহণ করিয়া যাত্রা করে, তখন তাহার প্রণয়প্রার্থী পুষ্পবিশেষের তোড়া অতি শান্ত ও ভদ্রভাবে তাহার শিবিকাতে ফেলিয়া দেয়। যদি রমণী সেই তোড়া শিবিকাতে না রাখিয়া মাটিতে ফেলিয়া দেয়, তবে বুঝিতে হইবে যে প্রণয়প্রার্থী প্রত্যাখ্যাত হইলেন। আর যদি ফুলের তোড়া তৎকর্তৃক কটিবন্ধনীতে রক্ষিত হয় তবে বুঝিতে হইবে যে তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য নহে। জাপানের কোন কোন ভাগে প্রণয়প্রার্থী যুবক রাত্রিযোগে রমণীর বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাদের দরজার উপরে ফুলের তোড়া বাঁধিয়া রাখিয়া আসে। যদি সে ফুলের তোড়া বাড়ীর ভিতরে নীত হয় বা ছড়াইয়া দেওয়া হয় তবে বুঝিতে হইবে, যে রমণী তাহারই অঙ্কশায়িনী হইবে। আর, যদি উহা সেখানেই শুকাইয়া যায় বা সেখান হইতে পড়িয়া নষ্ট হইয়া যায় তবে বুঝিতে হইবে যে সে প্রত্যাখ্যাত হইল!

জাপানীদিগের সকল প্রণয়কাহিনীই যে এরূপ কাব্যপূর্ণ, তাহা নহে। জাপানীরা হিসাবীও কম নয়। জাপানীরা ফরাসীদিগের মত যেমন উপরে সরল ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ, তেমন ভিতরে তাহাদের হিসাবের বুদ্ধি, তাহাদের গণিতজ্ঞানও কম নয়। কাজেই জাপান ও ফরাসী উভয় জাতিরই পরিণয়গুলি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সফল ও সুখপূর্ণ। জাপানে বিবাহের সর্ত্তগুলি ঘটকের সাহায্যে নির্দ্ধারিত হয়। ঘটকের কাজ কেবল পুরুষদিগের উপরই ন্যস্ত। বিবাহের কথা কথন সমস্ত স্থির হইলে বর ঘটকের দ্বারা ক'নেকে কিছু উপঢৌকন প্রেরণ করেন। সেই উপঢৌকন গ্রহণ করিলেই বুঝিতে হইবে যে সম্বন্ধ পছন্দ হইয়া গেল। ইহার পরে আর কন্যাপক্ষ বা ক'নে ঐ সম্বন্ধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না। তারপর বর ক্রমাগত নানা উপঢৌকনের বর্ষণ করিতে থাকেন। সে সমস্তের বর্ণনা করা অতি কঠিন ব্যাপার। তাহাকে ৬০ রকমের নির্দ্দিষ্ট উপঢৌকন দিতেই হয়। নির্দ্দিষ্ট আয়তনের এবং নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ভাজ করা কয়েকখানি রেশমী পরিধেয় বস্ত্র, নির্দ্দিষ্ট ফেশনের এবং নির্দ্দিষ্ট নিয়মে থালার উপর রক্ষিত কতকগুলি পোষাক, কতকগুলি চাউল পূর্ণ, কতকগুলি মেঠাইপূর্ণ রেশমী থলে, কতকগুলি মদ্যপূর্ণ বোতল প্রভৃতি দিতে হয়; ক'নেকে

সেই মদের বোতলগুলি তাহার পিতামাতাকে দিতে হয়, আর তাহারা উহা সুদৃশ্য পাত্রে ঢালিয়া পান করে।

আরও দুইটি জিনিষ বরকে ক'নের উদ্দেশ্যে পাঠাইতে হয়। বিবাহোৎসবের জন্য ক'নের একটি কটিবন্ধ; ইহাতে জরির কাজ থাকে। আর একখণ্ড সাদা রেশমী বস্ত্র; তাহা দিয়া ক'নে তাহার পছন্দমত বিবাহের পোষাক তৈয়ার করিয়া লয়। ইতিহাসে দেখা যায়, প্রাচীন রোমাণদিগের বিবাহেও ক'নে সুদৃশ্য পা'ড়যুক্ত সাদা পোষাক এবং কটিবন্ধ পরিধান করিত। জাপানী পাত্রীদিগের মস্তকাবরণও সাদা। প্রাচীন রোমান পাত্রীদিগের মস্তকাবরণ ছিল হলদে। জাপান ভিন্ন এশিয়ার অন্য সর্ব্বত্রই কিন্তু ক'নের মস্তকাবরণ লাল।

আমাদের দেশে জ্যোতিষীরা বিবাহের দিন নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। প্রাচীন রোমে গণকেরা বিবাহের দিন বাছিয়া দিত। জাপানেও গণকেরা বিবাহের দিন বাছিয়া দেয়। জাপানী পঞ্জিকাতে বিবাহ সম্বন্ধে নিষিদ্ধ দিনের অন্ত নাই। আধুনিক উন্নতির দিনেও জাপানীরা এই সব সংস্কার সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিতে পারে নাই।

জাপানে বরকে তাহার ভাবী শ্বশুরশ্বশ্রূর জন্যও সাধ্যানুযায়ী উপঢৌকন প্রেরণ করিতে হয়। পূর্ব্বে জাপানে কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহের প্রথা প্রচলন ছিল। তাহার চিহ্নস্বরূপেই ঐ উপঢৌকন দেওয়ার প্রথা এখনও বর্ত্তমান আছে। ঐ উপঢৌকন উৎকৃষ্ট শিল্পদ্রব্য বা উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য হওয়া চাই। এস্থলেও জাপানের রুচির উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। বিবাহের ব্যাপারে ঘুষ দেওয়ার প্রথার মত ঘৃণিত প্রথাকেও তাহারা সুরুচির সাহায্যে ভদ্রসঙ্গত করিয়া লইয়াছে।

পাত্রী বরকে বিবাহের সম্বন্ধ-সূচক কোন উপহার প্রেরণ করে না। কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। জাপানের কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে অসভ্যতা বর্ত্তমান আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদের সমাজতন্ত্রে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা স্বপ্নেরও অতীত। বিবাহের পূর্ব্বে কোনরূপ উপঢৌকন বা প্রেমোপহার প্রদান না করিলেও বিবাহের দিন পাত্রী বরকে মূল্যবান উপহার ও প্রেমজ্ঞাপক দ্রব্যাদি প্রেরণ করে।

অন্য সব জিনিষ দিতে অক্ষম হইলেও বরকে ক'নের জন্য কটিবন্ধ প্রেরণ করিতেই হইবে। পাশ্চাত্য দেশে যেমন ক'নের অঙ্গুরীয়, আমাদের দেশে যেমন অধিবাসের কৌটা, জাপানেও সেরূপ পাত্রীর কটিবন্ধ। প্রাচীন রোমেও পাত্রীর কটিবন্ধ বিবাহের উপকরণের মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল। দেশ ও কালের এত বিভিন্নতার মধ্যে প্রথাবিশেষের এরূপ ঐক্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

বিবাহের রাত্রের আচার অনুষ্ঠানগুলি অতি দীর্ঘসময়ব্যাপী। সূর্য্যাস্তের পরই পাত্রী তাহার স্বামীর বাড়ীতে যাত্রা করে। বর ও পাত্রী উভয়ের বাড়ীর সম্মুখেই এক এক খণ্ড লম্বা মাদুর পাতিয়া রাখা হয়। পাত্রী তাহার পোষাক পরিয়া শিবিকাতে আরোহণ করে। সময় সময় এই শিবিকা অতি সাদাসিদে রকমের থাকে; দুইজন বেহারা ইহা বহন করিয়া নেয়। আবার কখনও কখনও ইহা অতিশয় জাকজমক-পূর্ণ হইয়া থাকে। তখন ইহা একদল অনুচর আরদালীর পোষাক পরিয়া বহন করিয়া নেয়। কন্যাযাত্রীর দল সারি বাধিয়া শান্তভাবে ও সসম্ভ্রম গতিতে চলিতে থাকে। সময় সময় কন্যাযাত্রীর সঙ্গে বাদ্য থাকিলেও সে বাদ্য খুব জমকাল হয় না। উহা খুব মৃদু ও মিষ্টস্বরবিশিষ্ট। মশাল ঝাড় প্রভৃতিও সেরূপ জমকাল নয়।

উপহার-দ্রব্য বাহকেরা পাত্রীর অনুগমন করে। তাহাদের প্রথমে একটি লোক একধামা ঝিনুক জাতীয় মৎস্য লইয়া যায়। পাত্রী বরের জন্য আর কিছু নিতে পারুক বা না পারুক, তাহার জন্য বিবাহের পোষাক এবং এক ধামা ঝিনুক জাতীয় মৎস্য তাহাকে নিতেই হইবে। মৎস্য-বাহকের পোষাক অতি জমকাল থাকে; আর কন্যাযাত্রীদিগের মধ্যে কন্যার ঠিক পশ্চাতেই তাহার স্থান।

মৎস্যের ঝোল জাপানীদিগের একটি প্রধান আহার্য্য। বিশেষ শামুক ও ঝিনুক জাতীয় মৎস্য তাহাদের অত্যন্ত প্রিয়। অবশ্য, কেবল এইজন্যই যে প্রত্যেক বিবাহের ভোজে এই মৎস্যের আয়োজন থাকে তাহা নহে। ইহার অন্য একটি কারণও আছে। যে বর ও ক'নে একত্রে ঐ মৎস্যের ঝোল আহার করে, তাহারা দীর্ঘজীবী হইয়া একত্রে সুখে বাস করে এবং যে ক'নে ঐ মৎস্য লইয়া স্বামীর নিকট যায় তাহার সুন্দর ও কর্ত্তব্যপরায়ণ সন্তান জন্মে। মৎস্য-বাহকের পশ্চাতে পাত্রীর আত্মীয়বর্গ বা অন্যান্য বাহকেরা

বরের জন্য পাত্রীর দেয় দ্রব্যসম্ভার বহন করিয়া লইয়া যায়। এই বাহকগণের সসম্ভ্রম চলনভঙ্গী এবং ঐ সব দ্রব্যাদির প্রতি অনাবশ্যক শ্রদ্ধা ও অসতর্কতার ভাব অতি আশ্চর্য্য। সাত খানা পকেট বই, একখানা সূক্ষ্ম কারুকার্য্য পূর্ণ তরোয়াল, একখানা পাখা, দুইটি কটিবন্ধ এবং বরের পোষাক এইসব জিনিস কন্যার নিয়া যাওয়া অত্যাবশ্যকীয়। এই বরের পোষাকটি খুব জমকাল জিনিশ। ইহা অতি সতর্কতার সহিত প্রস্তুত হইয়া থাকে। চীনদেশবাসী ও জাপানীগণ এই পোষাকটিকে অতি মূল্যবান্ বলিয়া মনে করেন। অবশ্য বিবাহ ভিন্ন অন্য সময়ে ঐরূপ পোষাক পরিধান করিবার অধিকার সকলের নাই। কেবল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গেরই আছে। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ পরবর্ত্তী জীবনে প্রত্যেক স্মরণীয় দিন উপলক্ষেই ঐ বিবাহের পোষাকটি পরিধান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে যখন জাপানের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে উদর বিদীর্ণ করিয়া আত্ম-বিনাশের প্রথা প্রচলিত ছিল, তখনও তাহারা উক্ত কার্য্যের পূর্ব্বে বিবাহের পোষাক পরিয়া লইতেন। কন্যাযাত্রীদিগের মধ্যে মৎস্যবাহকের পরেই এই পোষাকবাহকের স্থান।

পাত্রীকে অভ্যর্থনা করার উদ্দেশ্যে বরের বাড়ীর দরজার দুইদিকে দুইটি বড় মশাল জলিতে থাকে। প্রত্যেক মশালের নীচে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক বসিয়া চাউল গুড়া করিতে থাকে। দরজার সম্মুখভাগে যে মাদুর বিস্তৃত থাকে সেখানে শিবিকাবাহকেরা পাত্রীর শিবিকা নামায়। পাত্রীকে শিবিকা হইতে উঠাইয়া নেওয়া হইলে যখন পাত্রী বাড়ীতে প্রবেশ করিতে থাকে, তখন বামদিকের চাউল ডানদিকের চাউলের সহিত মিশ্রিত করা হয়। ইহাকে 'অন্ন মিশ্রণ' বলে। পাত্রী যখন চৌথাটু অতিক্রম করিতে থাকে, তখন বরের কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আসিয়া দুইদিকের মশাল দুইটি একত্র করিয়া বাঁধিয়া জ্বালাইতে থাকে। উক্ত প্রথা দুইটি বরবধূর শরীরে শরীরে ও আত্মায় আত্মায় মিলনের সূচনা জ্ঞাপন করে। মশাল দুইটি কতক সময় একত্র উজ্জলভাবে জ্বালাইয়া শেষে নিভাইয়া ফেলা হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে বর ও বধূ যেন একত্রে জীবনযাপন করিয়া আবার একত্রই দেহত্যাগ করিতে পারে। যে স্ত্রী তাহাকে প্রাচ্যদেশমাত্রেই অতিশয় ভাগ্যবতী বলিয়া মনে করা হয়।

জাপানী বিবাহে এরূপ আচার অনুষ্ঠানের অন্ত নাই। কিন্তু তাহাতে ধর্ম্মবিহিত কোন ক্রিয়াকলাপের চিহ্নও নাই, তবে বর ও বধূ একে অন্যের পিতামাতাকে ও পূর্ব্বপুরুষদিগের সমাধির উপরিস্থিত প্রস্তরফলক সকলকে প্রণাম করিতে বাধ্য। এই প্রণামের পূর্ব্বে বিবাহ-ভোজ সমাধা করিতে হয়। বর পাত্রীকে বাড়ীর দরজার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া লইয়া একত্র ভোজে যাইয়া উপস্থিত হয়। এই ভোজের খাদ্যদ্রব্য সমূহ নানারূপ বিচিত্র; কিন্তু প্রত্যেকটিই অতি যত্নের সহিত প্রস্তুত করা হয় এবং অতি পরিচ্ছন্নভাবে পরিবেশন করা হয়। খাইতেও প্রত্যেকটিই বেশ সুস্বাদু। আর, এই বিবাহভোজে খাওয়ার রীতিটিও বাবুয়ানা রকমের। অন্ততঃ তিন রকম মাছের ঝোল হওয়া চাই-ই। ঝিনুক জাতীয় মৎস্যের ঝোল, এক প্রকার পুকুরের (লোণাজলের নয়) মাছের ঝোল, আর মাছের লেজের ঝোল। ভাতও নানারকমের—কতক মসল্লাদি যুক্ত, কতক বা নুন তৈলাদি যুক্ত, কতক বা পুষ্প, লতা, পক্ষী প্রভৃতির আকারে সজ্জিত। বিবাহ-ভোজে মদ্য ও 'সকী'ও পান করা হয়। কিন্তু উহাদের পাত্র এত ক্ষুদ্র যে দরজীরা সেলাই করিবার সময় আঙ্গুলে যে একরূপ টুপী ব্যবহার করে সেইরূপ বলিয়া মনে হয়। চীনামাটির কেট্‌লিতে মদ্য রাখা হয় এবং তাহা হইতেই পরিবেশন করা হয়। ঐ কেট্‌লীতে তিনটি বা ততোধিক কাগজের তৈয়ারী এবং সুচিহ্নিত প্রজাপতি বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ওগুলি ঠিক জীবন্ত প্রজাপতির মতই সুন্দর। ঐরূপ প্রজাপতি বাঁধিয়া দিবার অর্থ এই যে বিবাহ যেন সফল হয় এবং সন্তানগণ যেন সুন্দর ও মেধাবী হয়। ঐ কেট্‌লীগুলির মধ্যে একটি থাকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সুন্দর। উহা বর ও বধূর জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে। উহার দুইটি লম্বা নল থাকে। বধূর কোন সখী উহা তুলিয়া ধরে এবং বর ও বধূ দুইজনে দুইদিকের নলে মুখ দিয়া একত্র উহা হইতে পানীয় গ্রহণ করে। উহার অর্থ এই যে জীবনের সুখ দুঃখ উভয়ে একত্রে সমভাবে ভোগ করিবে।

করিয়া একে অন্য-কর্ত্তৃক প্রদত্ত বিবাহের পোষাক পরিধান করে। তারপর বর বধূকে তাহার পিতামাতার ঘরে নিয়া যায়। এখানেও সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাত্রে মদ্যপান ও নমস্কারের ধুম লাগিয়া যায়। যদি পিতা মাতার মধ্যে কেহ বা উভয়েই জীবিত না থাকেন, তবে তাহাদের সমাধির নিকট আরও বেশী করিয়া নমস্কারাদি করিতে হয়। যদি বরের ঠাকুরদাদা বা ঠাকুরমা জীবিত থাকেন, তবে তাহার নিকট বধূকে যে কত নমস্কার করিতে হয় তাহার অবধি নাই।

জাপানীদিগের দাম্পত্য-জীবনের আরম্ভটি বড় সুন্দর। বধূর ঘর প্রভৃতি সাজাইবার জন্য বরের মাতার দায়িত্ব নাই। বরের বাড়ীর চাকর চাকরাণীদের কেহও সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে না। বর ও বধূর সখীরা একত্রিত হইয়া সেই কাজ সম্পাদন করে। তুরস্কেও নাকি এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু জাপানে সখীরা এই কাজে মিলিত হইয়া কোনরূপ উচ্চহাস্য, শ্লীলতাবহির্ভূত আলাপ বা রসিকতা করে না। তাহারা সুন্দর পোষাক পরিয়া নিঃশব্দে ইতস্ততঃ চলাফিরা করিতেছে, একে অন্যের নিকট দিয়া যাইতে হইলে নমস্কার জ্ঞাপনের জন্য একেবারে নুইয়া পড়িতেছে এবং অন্যকে রাস্তা দিবার জন্য একেবারে দেয়ালের গায়ে যাইয়া লাগিয়া দাঁড়াইতেছে। একে অন্যের সহিত আনন্দিতভাবে আলাপ করিতেছে এবং সকলে একমত হইয়া কাজ করিতেছে। কোনরূপ তাড়া নাই, বিশৃঙ্খলা গোলমাল বা বাদবিসম্বাদ নাই। সকলেরই অমায়িক ভাব। সকলেই সন্তুষ্ট। ঘরে আসবাবের স্তূপ নাই, অথবা সূক্ষ্মশিল্প ও চাকচিক্যের ছড়াছড়ি নাই। রীতিমত সজ্জিত জাপানী ঘর খুব আরামের জিনিষ। আসবাব সামান্য থাকিলেও যে কয়খানা থাকে তাহা খুব উৎকৃষ্ট। ঘরের শোভাসম্পদও সামান্য যাহা থাকে তাহা শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর। কোথাও চাপাচাপি করিয়া বা স্তূপীকৃত-ভাবে জিনিষ রাখা হয় নাই, স্থানাভাববশতঃ এক জিনিষ অন্য জিনিষের মধ্যে রহিয়াছে এমন ব্যবস্থাও নাই। ঘরের মধ্যে বেশ খোলা মেলা জায়গা থাকে। যেখানে বধূ তাহার প্রজাপতির মত পোষাক লইয়া স্বচ্ছন্দে চলাফিরা করিয়া আরাম পায়।

যেসব জাপানীলোক প্রাচীন সংস্কার এবং প্রাচীন আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া থাকিলেও প্রাচীন রীতিনীতি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে নাই, তাহাদের বিবাহোৎসবের বর্ণনাই উপরে প্রদত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে জাপানী মেয়েরা নাকি মিশি দিয়া দাঁত কাল করিত এবং ভ্রূ কামাইয়া ফেলিত। এখন সে সব প্রথা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। গায়ে উল্কি পরার দাগ এখনও মধ্যে মধ্যে খুব দেখা যায়।

জাপানী রমণীদিগের কতগুলি আশ্চর্য্য সংস্কার আছে। যে পাত্রীকে বিবাহ যাত্রার সময় পথে কোন সম্মান-প্রদর্শনার্থ প্রস্তুত তোরণের মধ্যদিয়া যাইতে হয়, সে ভাগ্যবতী। যে পাত্রী কোনও মন্দিরের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় সিণ্টো পুরোহিতকে দেখিতে পায় সে ভাগ্যবতী। যে পাত্রী বিবাহযাত্রার সময় কোনও মন্দিরের নিকট বা বাগানে শিবিকা হইতেই কোন পালিত হরিণের মস্তকে হাত বুলাইতে পারে সে দ্বিগুণ ভাগ্যবতী। আর, যে পাত্রী কোনও কুমারী কর্ত্তৃক তুষারাবৃত স্থান হইতে সমাহৃত পুষ্প ধারণ করিয়া যাইতে পারে সে ততোধিক ভাগ্যবতী।

জাপানী রমণীরা আদর্শগৃহিণী। বসিবার ঘর ও রান্নাঘর উভয়ত্রই তাহারা সমান পটুতা দেখাইতে পারে। জাপানের প্রত্যেক খাদ্যদ্রব্যেরই চলিত দাম তাহাদের জানা থাকে। সেখানে অতি সম্ভ্রান্ত মহিলারাও তরিতরকারী কিনিতে পারে এবং তাহা রাঁধিতে ও পরিবেশন করিতে জানে।

জাপানী মেয়েদের বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে পিতামাতা তাহাদের সমস্ত খেলনা পুড়াইয়া ফেলেন। ইহার অর্থ এই যে খেলার জীবন শেষ হইয়া গেল, কর্ত্তব্যের জীবন আরম্ভ হইল।—অনেক সময় তাহাদের বাল্যজীবনের পুত্রকন্যা-দিগকে এইরূপে দাহ করিতে দেখিলে কষ্ট হয় এবং ইহা নিতান্ত অনাবশ্যক বলিয়া মনে হয়। এগুলি তখন এক-জায়গায় সরাইয়া রাখিয়া পরে নষ্ট করিয়া ফেলিলেও অনায়াসে চলিতে পারে। প্রাচীন রোমে ক'নে তাহার পুতুলগুলির নিকট হইতে রীতিমত বিদায়গ্রহণ করিত এবং বিবাহের দিন সেগুলি দেবতাদের নিকট উৎসর্গ করিত।

জাপানী স্ত্রীলোকগণ দেখিতে হাল্কা বটে, কিন্তু তাহাদের মনের শক্তি খুব বেশী। আর একটি কথা জাপানী স্ত্রীরা স্বামীর উপর অত্যাচারও কম করে না,

অধীনস্থ প্রজার মতই হয়তঃ মনে করে। কিন্তু জাপানী স্বামীরা বোধ হয় তাহা অনুভব করিতে পারে না। কারণ, জাপানী স্ত্রীদিগের অত্যাচার থাকিলেও ঝঙ্কার নাই, তাহাদের অত্যাচারও হাস্যমিশ্রিত।

শ্রীপ্রশান্তভূষণ গুপ্ত।

মাতৃশ্রাদ্ধ।

(১)

আনন্দ অমৃতলোকে সত্য মাঝে ছিল তব স্থিতি ;
কৃষ্ণযবনিকা-ঢাকা সূতিগৃহে তব হে প্রসূতি,
তখনও জাগেনি আলো, জাগেনিক অনাদি ওঙ্কার,
সৃজন বীণার তারে ওঠেনিক সজীব ঝঙ্কার ;—
ব্রাহ্মীশক্তি ছিল স্পন্দহীন,
তোমাতে নিলীন।

(২)

লীলায় সৃজিলে আলো, বর্ণে, গন্ধে ভ'রে গেল ব্যোম,
ধরণীর প্রান্তে প্রান্তে ধ্বনিয়া উঠিল মহা-ওম,
বিস্মিত আদিম মনু মুগ্ধনেত্রে দেখিল চাহিয়া—
বর্ণে, রসে, গন্ধে, গানে চিত্র এক উঠিছে জাগিয়া !
বিশ্বযোনি হে মহাপ্রভবা,
অযোনি-সম্ভবা।

(৩)

সেই দিন হ'তে নিত্য সসীম হইয়া দেও দেখা
সসীম মানব-মাঝে জাগাইতে পুণ্য-জ্ঞান-লেখা ;
স্পর্শে তব, হে কল্যাণী, বিশ্বের সকল ক্ষুধা মিটে,
হৃদয়ের শতদল পাদস্পর্শে শিহরিয়া ফুটে !
হে বৈষ্ণবী, করুণাশালিনী,
জগৎ-পালিনী।

(৪)

এ দাসের গৃহে তুমি এতদিন শরীরিণী ছিলে,
কর্ম্ম অন্তে হে নিঠুরা, দীনপুত্রে তেয়াগিয়া গেলে !
সকল ইন্দ্রিয় বর্গ ফেরে আজি আকুল ক্রন্দনে,
শ্মশানের রুদ্ধ হাহা জাগে ছিঁড়ি হিয়ার বন্ধনে !
সত্যে গেছ ফিরে হে অমরী,
যাই যে পাশরি !

(৫)

শক্তি দেও হৃদে দেবী রুধিতে এ বিলাপ অবাধ ;
ক্ষুদ্র ক'রে দেখেছি মা তোমায়, ক্ষম এ অপরাধ ;
আমার অন্তর চোখে বিশ্বরূপা হ'য়ে জেগে রও ;
নিখিলের বাণী মাঝে বাণী তব আমারে শুনাও ;
বিশ্বগীতে শুনি যেন নিতি,
তোমার উদ্গীতি !

(৬)

ভ'রে যাক্, বিশ্ব মাতা, বিশ্ব আজ মধুর-প্লাবনে ;
মিথ্যা দুঃখ, শোক, তাপ লুপ্ত হো'ক প্লাবন পীড়নে ;
আজিকে এ শ্রাদ্ধদিনে শ্রদ্ধার মঙ্গল আলিপন ;
চর্চ্চিত করুক, দেবী, এ হৃদয়ভবন-অঙ্গন ;—
হেথা হো'ক আসন তোমার—
জননী আমার !

শ্রীমতী ভবানী পণ্ডিত।

উকীলের বিপদ

শ্রীযুক্ত——মৌলিক হাইকোর্টের মস্ত পসারওয়ালা উকীল। মামলার জটিল বিবরগুলি বুঝিতে এবং বুঝাইতে কাহারও কাহারও মতে রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের পরেই তাঁহার স্থান। মৌলিক মহাশয়ের দপ্তরখানা নানাজাতীয় আইনের পুস্তকে. আর রিপোর্টের আলমারিতে ও র‍্যাকে ঠাসা।

তাঁহার পঁচিশ বৎসর বয়সের ছোট কেতাবী ব্যূহটি ক্রমেই পরিধিতে বাড়িতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সম্ভব হইলেও এখন এই ব্যূহ ভেদ করিয়া বাহির হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, কারণ 'ফী'এর অঙ্কটা বিলক্ষণ ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। হাইকোর্টে সকলেই বলেন, তিনি ক্ষুরধার-বুদ্ধি,—আর তাঁহার গৃহিণী বলেন ভোঁতা কাটারী। কারণ

সংসারের সকল কাজেই তাঁহার গৃহিণী "সচিবঃ সখী" এবং তিনি তাঁহার "প্রিয় শিষ্যঃ।"

সেবার বাঙ্গালার বাহিরে কংগ্রেস এবং সভাপতি একজন সুবিখ্যাত বাঙ্গালী। কয়েক বৎসর কংগ্রেসে বাঙ্গালীর উৎসাহ মোটেই জাগে নাই। বাঙ্গালা খবরের কাগজগুলি নানারকমের ব্যঙ্গ চিত্র আঁকিয়া ইহাকে ভ্যাং-চাইয়াছে। যাহারা সারা-বছর-জোড়া কাজ চায় তাহারা বলিয়াছে, "তিনদিনের বারোয়ারী," আর যাহারা শুধু দলাদলি চায় তাহারা বলিয়াছে—"উহারা ঠেকো, উহাদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিব না"—ইত্যাদি।

এবার বঙ্গদেশ হইতে অধিক সংখ্যায় প্রতিনিধি না গেলে বাঙ্গালীকে সকলের খোঁটা সহিতে হইবে, বাঙ্গালার নেতাদের মাথা হেঁট হইয়া যাইবে। সুতরাং ডিসেম্বরের গোড়া হইতেই ডেলিগেট সংগ্রহের চেষ্টা আরম্ভ হইল। অতদূরে প্রথম অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া দিয়া যাওয়া আসা প্রভৃতি সকলের খরচ সামর্থ্যে কুলায় না, কাজে কাজেই বাছিয়া বাছিয়া লোক ঠিক করিতে হইবে। হাইকোর্টের বার লাইব্রেরিতে কংগ্রেসের পাণ্ডারা যে তালিকা প্রস্তুত করিলেন, তাহাতে মৌলিক মহাশয়ের নামও বাদ গেল না। ব্রিফ আইন আর নজিরের বাহিরে যাহা কিছু আছে তাহা গৃহিণীর হাতে ছাড়িয়া দিয়া, ভদ্রলোক নিশ্চিন্তে বৎসরের পর বৎসর কাটাইয়াছেন, সুতরাং এ প্রস্তাবে তিনি বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ব্যাকুল আপত্তিতে একজন সমবয়সী কংগ্রেসওয়ালা সিনিয়র উকীল বলিলেন, "মৌলিকভায়ার জজিয়তি কাঁচিয়ে দিও না হে। কংগ্রেসে যোগ দিলে উনি আর 'মিষ্টার জষ্টিস্' হ'তে পারবেন না। কি বল মৌলিক, আসল ব্যাপারটা ত এই ?" উপরোধটা কখনও বা বিনয়ের কোমল মূর্ত্তিতে কখনও বা বিদ্রূপে সুতীক্ষ্ণ হইয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

গিন্নি শুনিয়া বলিলেন, "বেশ ত গা, যাও না। পাঁচটা দেশ দেখতেও কি ইচ্ছে হয় না ? বন্ধুবান্ধবেরা বলচে একবার বেড়িয়েই এসো গে না! কেবল বই আর কাগজ পত্তরই চিনেছ। পশ্চিম বেশ ভাল যায়গা ; আমি সেবার মধুপুরে গিয়ে দেখে এসেচি। আর ও ত বর্দ্ধমানের কাছে। আসবার সময় বর্দ্ধমানে বড় বৌমাকে দেখে এসো, আর ছেলেদের জন্যে সীতাভোগ মিহিদানা এনো।" গিন্নির বিশ্বাস ছিল বঙ্গের বাহিরে সবই পশ্চিম, আর পশ্চিমের সব যায়গাই বর্দ্ধমানের কাছাকাছি। মৌলিক মহাশয় ঘরের ও বাহিরের তাড়নায় অগত্যা বড়দিনের ছুটিতে কংগ্রেসে যাইতে স্বীকৃত হইলেন।

(২)

হাবড়া ষ্টেশনে বন্ধুবান্ধবেরা করমর্দ্দন করিয়া, রুমাল উড়াইয়া, 'হুররে' 'হুররে' বলিয়া, জাতীয়মহাসভার প্রতি-নিধিদের 'send off' দিয়া গেলেন। সভাপতি মহাশয়, সুরেন্দ্রবাবু প্রভৃতিও সেই গাড়ীতে কক্ষান্তরে ছিলেন। বাঁকিপুর হইতেই সম্বর্দ্ধনা সুরু হইল। প্রবাসী বাঙ্গালীরা দল বাঁধিয়া মাল্য চন্দন দিয়া নেতাদের বন্দনা করিলেন। পশ্চিমের বড় বড় ষ্টেশনে ক্রমেই অভ্যর্থনার ঘটা বাড়িতে লাগিল। মৌলিক মহাশয়ের এই অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ নূতন। ইহার উত্তেজনায় তাঁহার মনের সমস্ত অবসাদ দূর হইয়া গেল।

অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণের সৌজন্য, স্বেচ্ছাসেবক-মণ্ডলীর আন্তরিক সেবা এবং প্রথম দিনের অধিবেশনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন-ধর্ম্মী বিভিন্নভাষী ও বিচিত্র-বেশ-ধারী জনগণের সম্মেলন তাঁহার চোখে বড়ই সুন্দর লাগিল। তিনি একবার ভাবিলেন, ব্যাপারটা তিনদিনের হইলেও ইহা একেবারে অনর্থক নয়! তাঁহার সেই সিনিয়র বন্ধুটি বলিলেন, "কি মৌলিক, হাঁ কোরে কি দেখছ ? তুমি যে ম'জে গেলে হে!"

মৌলিক মহাশয় স্বীকার করিয়া আসিয়াছিলেন প্রত্যহ বাড়ীতে তার পাঠাইবেন। সন্ধ্যাবেলা খবর পাঠাইলেন— "Arrived safe, Excellent arrangements, Grand ovation.—নিরাপদে পৌঁছিয়াছি। বেশ সুবন্দোবস্ত। বিরাট অভ্যর্থনা।"

বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতিতে তাঁহার নাম পাঠান হইল; তিনি আপত্তি করিলেন না। এই অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতার ঔৎসুক্য ও উত্তেজনা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলি-য়াছিল। বাঙ্গালী বক্তার সংখ্যা এবার বড়ই অল্প। ব্যবসা প্রভৃতিতে পরাস্ত হইলেও বাঙ্গালী বক্তৃতায় চিরদিনই জয়মাল্য পাইয়া আসিয়াছে। বঙ্গের চিরদীপ্ত গৌরবপ্রভা বুঝিবা এতদিনে ম্লান হইয়া যায়। একা সুরেন্দ্রনাথের বাগবিভূতিতে আর কত কাল চলে? ক্রমশঃ প্রকাশ্য

প্রতিনিধিরা মৌলিক মহাশয়কে বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধ ও অবশেষে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তিনি কাতরভাবে পুনঃ পুনঃ জানাইলেন "মশায়! আমি কখনও বক্তৃতা করিনি।" সেই সিনিয়র বন্ধু বলিলেন, "না হে, মৌলিক কখনও বক্তৃতা করেননি। উনি মামলার সময় হাকিমকে ইসারা করেন, বক্তৃতা ত কই ক'রতে শুনিনি।" আর একজন সিনিয়ার উকিল হাসি চাপিয়া বলিলেন, আহা, "খালি পকেটে বক্তৃতা করার অভ্যাস মৌলিকের কোনও কালেই নেই। পকেটে গোটাকতক মোহর না পড়লে মৌলিক ভায়ার বোল ফোটে না।" ভদ্রলোক নিরুপায় হইয়া একটা প্রস্তাব উত্থাপন করিতে স্বীকৃত হইলেন।

ন্যাটসেন কোম্পানীর কেতাব ঘাঁটিয়া সকালে বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে Facts and figures চুম্বক করিয়া লইয়া দ্বিতীয়দিন জলযোগের পর অপরাহ্ন অধিবেশনে মৌলিকমহাশয় বক্তৃতা করিলেন। দশমিনিটের মধ্যে কাজের কথা গুছাইয়া চমৎকার ইংরাজীতে বেশ প্রাঞ্জলভাবে তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলেন। শব্দাড়ম্বর বা উচ্ছ্বাস না থাকিলেও তাঁহার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে অনেক জানিবার বিষয় ছিল। বলিবার ভঙ্গীটিও বেশ সহজ এবং সুন্দর হইয়াছিল। তবে একবার কি দুইবার তিনি অভ্যাসবশে "Mr. President" (সভাপতি মহাশয়) এর স্থলে "My Lord" (হুজুর) বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে ও উপসংহারে "Hear hear" এবং অট্ট করতালির ঢেউ উঠিয়া বারংবার তাঁহার শরীর ও মন নাড়াইয়া দিয়াছিল। তিনি সন্ধ্যার পর বাড়ীতে তার পাঠাইলেন—"Keeping well. Made speech at Congress—ভাল আছি ; মহাসমিতিতে বক্তৃতা করিয়াছি।"

শেষদিনে বিদায়ের পালা। সে দিন এই ত্রিবাসরিক উৎসব ভাঙ্গিবে। ধন্যবাদ, অভিবাদন প্রভৃতির ভিতর দিয়া বিদায়ের করুণ রাগিণী সকলের প্রাণ স্পর্শ করিল। মৌলিক মহাশয়ের প্রাণ ভিজিয়া গিয়াছিল। পণ্ডিত মালবীয় আসিয়া তাঁহাকে সানন্দে বলিলেন "You should not hide your light under a bushel —আপনি আর আপনার আলো ঢাকিয়া রাখিবেন না।" সুরেন্দ্রবাবু গদ্‌গদ-কণ্ঠে বলিলেন—"Mr. Moulick will prove a priceless acquisition to the Congress camp মৌলিক মহাশয়কে পাওয়া কংগ্রেসের দলের একটা মহামূল্য লাভ।" কয়েকজন আরও কত কি বলিলেন। সেই সিনিয়ার বন্ধু বঙ্গের সুরে গান ধরিলেন—

"ফুটিলে ফুটিতে পারিত গো ব্রিফেতে রহিল ঢাকা
করিলে করিতে পারিত গো কেবলি লুটিল টাকা।"

তারপর তল্পিতল্পা বাঁধিয়া যে যাহার বাড়ীর দিকে পাড়ি দিলেন। বাঙ্গালার প্রতিনিধিগণকে লইয়া মেলগাড়ী বাঁশি ফুকিয়া হাবড়ার অভিমুখে ছুটিল।

(৩)

গাড়ী তাহার অভ্যস্তপথে ছুটিয়া ক্রমে বর্দ্ধমানের কাছাকাছি আসিল। মৌলিক মহাশয় তাঁহার সিনিয়ার বন্ধুকে বলিলেন, "আমার বেডীং আর ব্যাগটা তুমি সঙ্গে নিয়ে যাও। আমাকে একবার বর্দ্ধমানে নামতে হবে।" বন্ধু আবৃত্তি করিলেন, 'অঁা। 'একা যাবে বর্দ্ধমান করিয়া যতন!' বল কি হে, বেডিং ব্যাগ নিয়ে তোমার বাড়ী গিয়ে যখন ব'লব তুমি বর্দ্ধমান র'য়ে গেছ, তখন মৌলিক-গিন্নী 'মরিব মরিব সখী নিশ্চয় মরিব' বলতে বলতে মূর্চ্ছা যাবেন। তোমার এনে দেখছি ভাল কাজ করা হয়নি।"

মৌলিক মহাশয় উত্তর করিলেন "আঃ! তুমি বড় জ্বালাতন কর। এখানে আমার বেয়াই বাড়ী। বাড়ীতে ব'লে দিয়েছিল, ফেরবার মুখে একবার বড়বৌমাকে দেখে যেতে। তুমি খবর পাঠিও—আমার ছেলেরা কেউ এসে তোমার বাড়ীথেকে ওগুলি নিয়ে যাবে।" গাড়ী ছাড়িবার সময় সিনিয়ার বন্ধু বলিলেন "ভায়া! দেখো—স্থান বর্দ্ধমান।"

মৌলিক মহাশয় বেহাই বাড়ী গিয়া দেখিলেন, প্রায় সকলের ম্যালেরিয়া জ্বর। তাঁহার পুত্রবধূ কয়েকবার জ্বরে ভুগিয়াছে। তিনি প্রস্তাব করিলেন বউমাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবেন। ডাক্তার ও স্থান পরিবর্ত্তনের কথা বলিয়াছেন, সুতরাং কাহারও অমত হইল না।

বৈবাহিক গৃহে দিনের বেলা আহার ও বিশ্রামে কাটাইয়া এক্সপ্রেস ধরিবার জন্য মৌলিক মহাশয় সন্ধ্যার পর পুত্রবধূকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। ষ্টেশনে পৌছিয়া দেখিলেন, তখনও গাড়ী ছাড়িবার প্রায় আধঘণ্টা বিলম্ব। তিনি হুইলারের বুকষ্টলে "ইংলিসম্যান" "ষ্টেটসম্যান" "ডেলিনিউস" ও "বেঙ্গলী" কিনিয়া মহা আগ্রহে কংগ্রেসের সংবাদ পড়িতে লাগিলেন।

গাড়ী আসিয়া বর্দ্ধমান থামিলে তাঁহার সীতাভোগ 'মিহিদানা' কিনিবার হুস হইল। গাড়ী দশ মিনিট দাঁড়ায়, তাহার ছয় সাত মিনিট কাটাইয়া তিনি স্ত্রীলোকদের বিশ্রামের ঘরের কাছে গিয়া "বউমা, ওগো বউমা, এস এস শীগ গির শীগ্ গির! বলিয়া চীৎকার করিয়া কুলীর মাথায় তাড়াতাড়ি তোরঙ্গ চাপাইয়া অবগুণ্ঠনাচ্ছন্ন বধূকে লইয়া প্রথম শ্রেণীতে উঠিলেন। গাড়ীও আবার বংশীধ্বনি করিয়া ছুটিল।

মৌলিকমহাশয়কে তাঁহার গৃহিণী চিরদিনই "লটবহরের" (Luggage) সামিল বলিয়া অপবাদ দিয়া আসিয়াছেন। আচ্ছা এবার? তিনি যখন ছয় হাঁড়ি খাবার এবং পুত্র-বধূকে লইয়া বাড়ীতে হাজির হইবেন, তখন? আর বারলাইব্রেরীর বন্ধুরা তাঁহাকে বরাবরই "কুনো" বলিয়াছে "বেঙ্গলী" কাগজে ত প্রায় তাঁহার গোটা বক্তৃতাটা (সাতটা Hear Hear এবং cheers বন্ধনী শুদ্ধ) বাহির হইয়াছে। তারপর বধূটিকে বলিলেন "বউমা, গায়ের কাপড়খানা ভাল ক'রে মুড়ি দিয়ে বস, ঠাণ্ডা লাগিতে পারে। তুমি বড়ই কাহিল হয়ে গিয়েছ। বর্দ্ধমান জায়গাটায় এত ম্যালে-রিয়া! লজ্জা ক'রোনা মা। একধারে জড় সড় হ'য়ে বসে আছ কেন? তুমি এই বার্থটায় না হয় শোও। পরের ষ্টেশনে সোডা কিনে দিবো, খেও। ম্যালেরিয়ায় বড় তেষ্টা পায়। আর আমরা পৌছুলুম ব'লে!"

মৌলিকমহাশয় ভাবিলেন, তিনি যে কত কর্ম্মতৎপর এবং সাবধানী বউমা তাহার শ্বাশুড়ীর কাছে নিশ্চয়ই সে সব কথা বলিবে। গিন্নী এবার বুঝিবেন, তিনি নেহাৎ "লটবহর" বা "ভোতা কাটারী" নন। গাড়ী আসিয়া ব্যাণ্ডেলে থামিল।

মৌলিকমহাশয় মুখ বাড়াইয়া সোডার সন্ধান করিতেছেন, এমন সময় একজন সার্জ্জেণ্ট দুইটি রেলওয়ে পুলিশ সঙ্গে করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি একটি স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া বর্দ্ধমান হইতে আসি-তেছেন?" মৌলিকমহাশয়, বলিলেন, "হাঁ। তোমার তাহাতে প্রয়োজন?" সার্জ্জেণ্ট উত্তর করিল, "মাপ করিবেন। আপনাকে এবং সেই স্ত্রীলোকটীকে এখানে নামিতে হইবে। এই দেখুন বর্দ্ধমান হইতে আপনাদের গ্রেপ্তার করিবার হুকুম আসিয়াছে! নামুন, বিলম্ব করিবেন না।" মৌলিকমহাশয় বলিলেন,"আমার কার্ড নেও —আমি হাইকোর্টের উকীল। কলিকাতায় পুলিশকে তার পাঠাও, আমি খরচ দেব। এখন আমার সঙ্গে এই মহিলা রহিয়াছেন।" সার্জ্জেণ্ট একটু কড়া সুরে বলিল "শীঘ্র নামুন। গাড়ী ছাড়িতে আর দেরী নাই। আমায় হুকুম তামিল করিতে হইবে। আপনার পদমর্য্যাদার কথা বর্দ্ধমানে যত খুসী বলিতে পারেন। এখন নামুন।"

মৌলিকমহাশয় বৌটিকে লইয়া নামিয়া পড়িলেন। পুলিশের লোক তাড়াতাড়ি তোরঙ্গটা নামাইয়া লইল। বউটি কাঁদিতে লাগিল। তিনি ও ভাবনায় ও আতঙ্কে অবাক্ হইয়া গেলেন। এই বিপদ—তাহাতে আবার বৌমা সঙ্গে! তাইত কংগ্রেসে এমন কি বলিলাম? আচ্ছা সভাপতিমহাশয় ত একজন সেরা আইনজ্ঞ; তাঁহাকে সাক্ষী মানিলেই সব খোলসা হইবে। আর কাগজে ত রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। না, না, ও কিছু নয়। তবে ব্যাপারটা কি? এই জন্যই ত ছাই কোথাও যেতে চাই না।

কিছু পরেই বর্দ্ধমানের গাড়ী আসিল। পুলিশ-পাহারা দিয়া তাঁহাকে বউ শুদ্ধ বর্দ্ধমানে পাঠান হইল।

বর্দ্ধমানে গাড়ী থামিতেই চার পাঁচজন লোক আসিয়া মৌলিকমহাশয়কে ঘিরিয়া বাঙ্গালা হিন্দি এবং ইংরাজীতে ব্যাকরণের এবং শিষ্টতার নিয়ম সম্বন্ধে বে-পরোয়া হইয়া বজ্রনাদে তর্জ্জন আরম্ভ করিল। পুলিশের লোক মাঝে পড়িয়া তাঁহাকে চড়চাপড়ের হাত হইতে রক্ষা করিল। একজন ছোকরা আসিয়া বউটীর হাত ধরিয়া বলিল, "ভয় কি বুড়ী? তুই কাঁদচিস্ কেন? এই বেহায়া বুড়োকে এবার শ্রীঘরে পাঠাব।" বউটিও বেশ তাহাদের কাছে গিয়া দাঁড়াইল! ব্যাপার কি? মৌলিকমহাশয় আরও অবাক্ হইয়া গেলেন। রেলওয়ে পুলিশ আসিয়া যবানবন্দী লিখিবার জন্য তাঁহাকে আফিসে লইয়া গেল।

(৪)

পরদিন সকালবেলা মৌলিকমহাশয়ের পুত্রগণ সকল রকমের ইংরাজী খবরের কাগজ কিনিয়া কংগ্রেসের সংবাদ বিশেষ করিয়া তাহাদের পিতার বক্তৃতা, পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। হঠাৎ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রটি চেঁচাইয়া উঠিল "বড়দা, মেজদা, দেখো একটা বড় মজার খবর বেরিয়েছে।"

সে পড়িতে আরম্ভ করিল "A distinguished Congresswalla in trouble. Caught redhanded while decimping with a young beautiful purda woman. Very smart arrest by the police. Great sensation at Burdwan—বিখ্যাত কংগ্রেসওয়ালার বিপদ। ভদ্রঘরের সুন্দরী যুবতী স্ত্রী লইয়া পলায়নের সময় বামালশুদ্ধ গ্রেফ্‌তার। পুলিশ খুব বাহাদুরীর সহিত ধরিয়াছে। বর্দ্ধমানে হুলুস্থূল।"

বড়ভাই বলিলেন, "কংগ্রেসে যাওয়াই বা কেন, আর এসব ঢলাঢলিই বা কেন? সাহেবেরা কি মনে করিবে? Character is the first thing needful—আগে চরিত্র চাই। পড় পড়, গুণধরটিকে দেখা যাক্!" ছোট ভাই বিস্তৃত বিবরণ পড়িতে লাগিল। খানিক দূর পড়িয়া সে আতঙ্কে চেঁচাইয়া উঠিল, "বড়দাদা! এ যে বাবার নাম লিখেছে।" বড়ভাই তাড়াতাড়ি কাগজখানা কাড়িয়া লইয়া দেখিল, সত্যই তাই! তাহাদের মুখ ভয়ে কালি হইয়া গেল। বড়ভাই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বাড়ীর ভিতরে খবর শুনাইতে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিল, তারপর তাহার পিতার সেই সিনিয়র বন্ধুর বাড়ীর দিকে সাইকেল ছুটাইয়া চলিল।

(৫)

এদিকে তাঁহার সবিশেষ পরিচয় পাইয়া রেলওয়ে পুলিশ বর্দ্ধমানে মৌলিকমহাশয়কে সে রাত্রিতে প্রথম শ্রেণীর বিশ্রাম কক্ষে নজরবন্দী রাখিয়া সকালবেলা সাত পাঁচ ভাবিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠিতে লইয়া গেল। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রথমে সেই বউটির এহাজার গ্রহণ করিলেন। সে বলিল, তিনি তাহার গহনা ও কাপড়ের ট্রাঙ্কটা টানিয়া তাঁহার দিকে লইয়া গিয়াছিলেন; ম্যালেরিয়া ট্যালেরিয়া কি সব বলিতেছিলেন; তাহার চেহারা খারাপ হইয়া গিয়াছে এবং তাহাকে সোডা কিনিয়া খাওয়াইবেন বলিয়াছেন এবং তাহাকে পুনঃ পুনঃ ঘুমাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাহার পর একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলিলেন, তাহার বাড়ী ভদ্রেশ্বরে। তিনি জ্ঞাতিসম্পর্কে বউটির জ্যাঠশ্বশুর, ভেলেনী পাড়ার জুটমিলে কাজ করেন। বউটির শাশুড়ীর ব্যারাম, স্বামী ছুটী না পাওয়ায় তিনি সেই দিন বিকেলে ইহাকে লইতে আসিয়াছিলেন। এক্সপ্রেস ভদ্রেশ্বরে থামে না, সুতরাং প্যাসেঞ্জার ছাড়িবার সময় মেয়েদের ঘরে গিয়া বউটিকে না পাইয়া পুলিশে সংবাদ দেন। পুলিশ আসিয়া দুই একটি স্ত্রীলোকের মুখে এবং একটা কুলীর কাছে খবর পাইয়া তার পাঠায়। তাহার পর এই ভদ্রলোকটি গ্রেপ্তার হইয়া আসেন।

যুবকটি এজাহার দিল, বউটি তাহার মাসতুতো বোন। দুইদিন আগে সে তাহার মাসীর সঙ্গে কাশী হইতে আসে। ইহার জ্যাঠশ্বশুর ইহাকে লইতে আসিয়াছিলেন। রাত্রিতে পুলিশ একটা কুলী পাঠাইয়া তাহাকে ডাকাইয়া আনে।

ম্যাজিষ্ট্রেট জানিতে চাহিলেন, আসামী এখন কিছু বলিতে ইচ্ছা করেন কিনা। মৌলিকমহাশয় জবাব দিলেন 'তিনি হাইকোর্টে ৩০ বৎসর ওকালতী করিতেছেন। তাহার বর্ত্তমান নিবাস ভবানীপুরে,— ষ্ট্রীটে। তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে কংগ্রেস হইতে ফিরিতেছিলেন। পথে বর্দ্ধমানে নামিয়া তাঁহার পুত্রবধূকে সঙ্গে লইয়া এক্সপ্রেসে কলিকাতায় যাইতেছিলেন। তাঁহার পুত্রবধূর মুখ তিনি মাত্র দুই একবার দেখিয়াছেন। তিনি তাহাকে সনাক্ত করিতে পারেন না। এই বধূটি যাহা বলিয়াছে তাহার সবই সত্য।'

ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলিকমহাশয়ের পুত্রবধূর পিতার নাম এবং তিনি কোথায় থাকেন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার বৈবাহিকের নাম শুনিয়া অনেকেই চোখোচোখি আরম্ভ করিল। সাহেব বলিলেন, "তিনি ত এখানকারবারের একজন বড় উকীল। বোধ হয় ব্যাপারটা একটা "honest mistake—অসদুদ্দেশ্যহীন ভুল।" তিনি মৌলিকমহাশয়কে চেয়ার দেওয়াইলেন এবং সেদিনকার "ইংলিশম্যান্" লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

প্রায় আধঘণ্টা পরে তাঁহার বৈবাহিক আসিয়া সাহেবকে "গুড্ মর্ণিং" বলিয়া ঘরে ঢুকিলেন। তিনি ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?" ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখে সংক্ষেপে মোকদ্দমার বৃত্তান্ত শুনিয়া ভদ্রলোক উত্তর করিলেন, "আমার মেয়ে কাল রাত্রে একলা গাড়ী ক'রে বাড়ী ফিরে এসেছে। সে ব'ল্লে, ওয়েটিংরুমে ঘুমিয়ে প'ড়েছিল, তারপর জেগে দেখে শেষ গাড়ীখানা তখন সবে ছেড়ে গিয়েছে। তারপর কুলীকে দিয়ে গাড়ী ডাকিয়ে বাড়ী চ'লে

আসে। সে ব'লছিল বটে, কাদের বউ হারিয়েছে। কাল-রাত্রে আমার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র থানায় এবং হাঁসপাতালে খবর নিয়েছিল। আজ সকালে কলিকাতায় তার পাঠান হ'য়েছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট্ হাসিয়া বলিলেন, "Wrong identification (সনাক্তের ভুল)" এর দরুণ গোলমালটা হ'য়েছে বোঝা যাচ্ছে। যান, ইনি খালাস।"

বউটি তাহার জ্যাঠশ্বশুর ও মাসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে চলিয়া গেল।

মৌলিকমহাশয় খালাস পাইয়াই গাড়ী করিয়া ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হইলেন; বৈবাহিক-গৃহে ভোজন এবং বিশ্রামের নিমন্ত্রণে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখনই কলিকাতায় ফিরিবার গাড়ী ছিল। গতবারের "সীতাভোগ" "মিহিদানা" রেলের গাড়ীতেই রহিয়া গিয়াছিল। এবার আর মেঠাই কিনিবার কথা মনে স্থান পাইল না।

বেলা তিনটার সময় তিনি যখন বাড়ী পৌঁছিলেন, তখন দেখিলেন কাহারও খাওয়া হয় নাই। তাঁহাকে দেখিয়া কতকগুলি আতঙ্কে মুমূর্ষু প্রাণীর নির্জ্জীব দেহে যেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল! তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ব্যারিষ্টার লইয়া বর্দ্ধমানে চলিয়া গিয়াছিল।

* * * * *

পরদিন গৃহিণী চুপিচুপি বলিলেন, "হ্যাঁগা—থানিটানিয়ে তেলটেল ভাডিয়ে নেয়নিত? ধানে চালে খেতে দেয়নি ত? আমি তো বাবু শুনে ভয়ে মরি। মা কালীকে জোড়া-পাঁঠা মানসিক ক'রেছি। পশ্চিমের লোক সবাই টের পেয়েছে? খোকা ক'দিন আগে ব'লছিল সেখানে সভাতে নাকি সবাই তোমায় ধন্যি ধন্যি কচ্ছিল।" তারপর তিনি আবার হাসিয়া বলিলেন—"মাগো! কি ঘেন্নার কথা! আর এই বুদ্ধি নিয়ে এত বড় উকীল, এত নাম ডাক!"

শ্রীরমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

শিল্পী।

তোমরা কিসের ভিত পাত গো
ইঁট গাঁথ গো একটানা,
শেষ কোথা তার লেশ জান না
গেঁথেই চল আন্‌মনা।

রচবে কোথা বারদ্বারির
তালের টাটের আটচালা,
হয় যে তাহা মচ্ছিভবন
ধর্ম্মশালা পাঁচতালা।

কি হতে যে কি হয় তোমার
কর্ণিকেরি কর্ত্তনে,
তোমার দেউল উঠ্‌বে কোথা
বুঝতে নার পত্তনে।

ভাবছ তুমি রচবে কুটীর
হয় যে তাহা রাজবাড়ী,
ছেলে খেলার গড় খাই এতে
সৈন্য এসে দেয় সারি,

খেলার খাতে গঙ্গা আসে
লোকে তোমার যশ গাহে,
নিজেই দেখ অবাক হয়ে
ফস্কা তোমার নক্সা হে।

পাথর কেটে পুতুল গড়
দেবতা এসে বাস করে,
তোমরা নিজেই চিন্‌তে নার
ভাস্করেরি ভাস্করে।

নামেই কেবল গড়নেওয়ালা
সেই গড়ে লয় হাত ধরে,
ইঙ্গিতে তাঁর সৃষ্ট ভুবন
এ ত্রিভুবন বাধ্য রে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

সুধীবচন।

(১)

"লোকসমাজে ঘন ঘন কথা বলিও, কিন্তু এক সঙ্গে দীর্ঘকাল কথা বলিও না। তোমার কথায় কেহ খুসী না হউক, ত্যক্ত বোধ তাহা হইলে করিবে না।"

লর্ড চেষ্টার ফিল্ড।

"কথাবার্ত্তার সময় কাহারও জামা টানিয়া, হাত টানিয়া, গা ঠেলিয়া কথা বলিবে না।—কথার গুণে তোমার কথা যদি কেহ না শোনে, তবে চুপ করিয়া থাকাই ভাল।" ঐ

"কাহাকেও অবজ্ঞা করিও না। কাহাকেও আজ যত হীন বলিয়াই মনে কর, তাহার সহায়তাও কোনও কাজে তোমার দরকার হইতে পারে। অন্য দুর্ব্ব্যবহার লোকে মার্জ্জনা করিতে পারে, কিন্তু অবজ্ঞা কখনও মার্জ্জনা করে না। আত্মমর্য্যাদার বোধ সকলেরই কিছু না কিছু আছে। ইহার অবমাননা লোকে সহজে ভুলিতে পারে না।" ঐ

"কেহ যে তোমা অপেক্ষা পদে, সম্পদে বা জ্ঞানে হীনতর, ইহা তোমার ব্যবহারে তাহাকে বুঝিতে দিও না। শিষ্টতা ও সহৃদয়তা নীচকে উচু করিয়া তুলিতে চায়, কাহাকেও ঘৃণায় খাট করিয়া রাখিতে চায় না। এইরূপ শিষ্ট ও সহৃদয় ব্যবহারে বন্ধুর সংখ্যা বাড়ে, শত্রু কমে। অন্যথা ইহার বিপরীত হয়।" ঐ

"পাঁচজনের মধ্যে কাহারও কোনও ক্রটী বা দুর্ব্বলতা বিশ্লেষণ করিয়া লোক হাসাইবার চেষ্টা করিও না। তখন বেশ আমোদ ইহাতে হয়, নিজের বাহাদুরীও হয়। কিন্তু যাহাদের এরূপ বিদ্রূপভাজন করিলে, জানিও মনে মনে তারা তোমার শত্রু হইয়াই রহিল। তোমাকে জব্দ করিবার কোনও সুযোগ তারা ছাড়িবে না—রসিকতা যদি তোমার থাকে, কাহারও প্রাণে ব্যথা না দিয়া, অন্য উপায়ে সকলকে আনন্দিত করিবার চেষ্টা করিবে।" ঐ

"যে কথা সহজে বলিলেই লোকে বিশ্বাস করিতে পারে, না করিবার কোনও কারণ নাই, তাহা যদি কেহ অনেক শপথ দিব্য করিয়া বলিতে থাকে, বুঝিবে সে মিথ্যা কথা বলিতেছে এবং তোমাকে সেই মিথ্যা বিশ্বাস করাইবার গূঢ় কারণ কিছু তার আছে।" ঐ

"মনসা চিন্তিতং কর্ম্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ।
অন্যলক্ষিত কার্য্যস্য যতঃ সিদ্ধির্ন জায়তে॥"

কি কাজ করিবে, তাহা মনে মনে চিন্তা করিবে, বাক্যে কখনও প্রকাশ করিবে না, অন্যে তোমার যে কাজ লক্ষ্য করিবে, তাহাতে সিদ্ধিলাভ ঘটে না।

"অস্তি পুত্রো বশে যস্য ভৃত্যো ভার্য্যা তথৈব চ।
অভাবে সতি সন্তোষঃ স্বর্গস্থোঽসৌ মহীতলে॥"

যার পুত্র, ভার্য্যা ও ভৃত্য বশে আছে, অভাবে যার সন্তোষ আছে,—এই পৃথিবীতে তাকেই স্বর্গবাসী বলা যায়।

"মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্য্যাচাপ্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথাগৃহম্॥"

গৃহে যার মাতা নাই, ভার্য্যাও অপ্রিয়বাদিনী। তার,—বনে যাওয়াই উচিত। তার বনও যেমন, গৃহও তেমন।

"কোকিলানাং স্বরোরূপং নারীরূপং পতিব্রতং।
বিদ্যারূপং কুরূপাণাং ক্ষমারূপং তপস্বিনাম্॥"

কোকিলের রূপ তার স্বর, নারীর রূপ তার পাতিব্রত্য, কুরূপের রূপ বিদ্যা, আর তপস্বীর রূপ ক্ষমা।

"দুর্ব্বলস্য বলং রাজা, বালানাং রোদনং বলং।
বলং মূর্খস্য মৌনিত্বং চৌরাণামনৃতং বলম্॥"

দুর্ব্বলের বল রাজা, বালকের বল রোদন, মূর্খের বল মৌন, আর চোরের বল মিথ্যা কথা।

"সমুদ্রাবরণা ভূমিঃ প্রাকারাবরণং গৃহং।
নরেন্দ্রাবরণা দেশাশ্চরিত্রাবরণা স্ত্রিয়ঃ॥"

সমুদ্রই ভূমির আবরণ (রক্ষার উপায়), প্রাচীর গৃহের আবরণ, দেশের আবরণ উত্তম রাজা, আর স্ত্রীজনের আবরণ তাহাদের চরিত্র।

"পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনং।
কার্য্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্॥"

পুথিগত বিদ্যা—আর পরহস্তগত ধন,—কার্য্যকালে সে বিদ্যাও বিদ্যা নয়, ধনও ধন নয়।

"ষড়্ দোষাঃ পুরুষেণেহ হাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা।
নিদ্রাতন্দ্রাভয়ং ক্রোধ আলস্যং দীর্ঘসূত্রতা॥"

মঙ্গলকামী পুরুষ এই ছয়টি দোষকে বিনষ্ট করিবে—যথা,—নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য এবং দীর্ঘসূত্রতা।

পাড়াগেঁয়ে।

"পাড়া গেঁয়ে" নামটি তাদের পল্লীতে বাস করে ব'লে,
নগরবাসী মুখটি বাঁকায় নামটি শুনে ঘৃণার ছলে!
অসভ্যটা তারা বড় পরে না'ক চসমা নাকে—
"চপ্ কাট্‌লেট" খায় না তারা তৃপ্ত সদা অন্নে শাকে!
'চুরট' তারা দেয় না মুখে দায়ে কেটে তামাক খায়,
সন্ধ্যাবেলায় 'চাটা' পেতে রামায়ণের যাত্রা গায়।
"রোমিও" আর "জুলিয়েটকে" চিনে নাক মোটেই তারা
সীতা রামের কথা শুনে আছে তারা পাগলপারা।
দেখা হ'লে হাতটি তুলে নমস্কারের সভ্য রীতি,
করে না'ক কারেও তারা দেখাইতে বিশ্বপ্রীতি!
ঠাকুর বামুণ দেখলে পরে সাষ্টাঙ্গেতে পড়ে লুটে,
লাগলে কারো ঘরে আগুন দলে দলে সবাই ছুটে,
পরের বিপদ আপন জেনে সবাই তারা ছুটে আসে,
সান্ত্বনা দেয় কতশত ভাইয়ের মত মধুর ভাষে।
সুখটি পরের দেখলে পরে মুখে হাসি ধরা ভার,
এমনি সরল এমনি তরল ছেলে যেন একটি মা'র।
হাসি দিয়ে কান্না কিনে কান্না দিয়ে হাসি যাচে,
"পাড়াগাঁয়ের" ইতিহাসে অসভ্যতা এমনি আছে।
আরো আছে বদ্‌গুণ রে উচ্চ হেসে কথা কয়,
স্বার্থ মাখা দ্ব্যর্থ ভাষায় অভ্যস্থ ত মোটেই নয়।
"চা"য়ের কাপে মারে নাক ত্রিসন্ধ্যাটি নিত্য তারা
নব্য যুগের সভ্যরীতি যাহে আজি জগৎ ভরা
বলতে গেলে অনেক আছে অসভ্যতার তাদের কথা,
ভুল করে হায় চিরুণীটি ঘুরে না'ক তাদের মাথা।
"পাড়াগেঁয়ে" ভূত—তাইত সহরবাসী তাদের বলে,
সভ্যতাটি চায় না কভু শিখতে তারা গেলেও ম'লে।

শ্রীসনৎকুমার সেন

সৎমা।

বিমলার অনুরোধে রতিকান্ত যখন দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন, বড়ছেলে লালমোহনের বয়স তখন পাঁচ বৎসর, ললিত দুইবৎসরের শিশু। সতীনকে চিররুগ্ন দেখিয়া কনকলতা ছোটছেলেটিকে বুকে ধরিয়া মানুষ করিয়াছেন। ললিত তাঁহাকেই "মা" বলিয়া জানে। বিমলাও কনকলতাকে "ললিতের মা" বলিয়া অনেকের কাছে পরিচয় দিতে গর্ব্ব অনুভব করেন।

অপরাহ্নে স্কুল হইতে বাড়ী আসিয়া মেজের উপর বইগুলি ফেলিয়া অভিমানের স্বরে ললিত ডাকিল—"মা!" রান্নাঘরের ভিতর কনকলতা ছেলের জন্য দুধ গরম করিতেছিলেন। ললিত আসিয়াছে জানিয়া তাড়াতাড়ি উনান হইতে কড়াখানা নামাইয়া বলিলেন—"যাই বাবা।" বাটীতে দুধ ঢালিয়া ঘর হইতে বাহির হইবার জন্য যেমন তিনি উঠিবেন, অমনি ললিত আসিয়া তাঁর কাপড়ের ভিতর মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ছেলের কাতরতা দেখিয়া তাহাকে কোলে লইয়া ব্যাকুলভাবে কনকলতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে বাবা? কাঁদ্‌ছ কেন?" ললিত কোন উত্তর দিল না। কেবল কাঁদিতে লাগিল। মায়ের প্রাণ অস্থির হইল। তিনি ভাবিলেন, নিশ্চয়ই কেউ তারে মেরেছে। আঁচলে মুখ মুছাইয়া, কপালে চুম্বন দিয়া ব্যাকুলিত কণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে ললিত. কেউ তোরে মেরেছে?" ললিত পূর্ব্বের মত নীরবে গণ্ড দুইটি ভাসাইতে লাগিল। তার মুখখানি রক্তবর্ণ, চুলগুলি ঘামে সিক্ত। বারংবার হতাশ হইয়া ক্ষুব্ধচিত্তে কনকলতা ছেলেকে ঠেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন—"তবে তুই কাঁদ্, আমি চল্লুম।" ললিত মাকে আরও শক্তভাবে জড়াইয়া ধরিয়া প্রবলবেগে কাঁদিতে লাগিল। দুর্ভাবনায় কনকলতার বুকে আঘাতের পর আঘাত পড়িতেছিল। ছেলের এই নিরতিশয় আত্ম-নির্ভরতা দেখিয়া এইবার তিনি একেবারে ভাঙ্গিয়া

পড়িলেন। অভিমানের কারণ না বুঝিয়া তাঁর বড় কষ্ট হইতেছিল। কিছুক্ষণ পুত্রের মুখপানে চাহিয়া সস্নেহে দুধের বাটীটি ধরিয়া বলিলেন, "এই নে একটু দুধ খা।" রাগে অধীর হইয়া ললিত তার মায়ের হাত থেকে বাটি ফেলিয়া দিল। বিমলা তখন কি কাজের জন্য ঘরের ভিতর আসিয়াছিলেন। ললিতের কাণ্ড দেখিয়া একটু বিস্মিত হইয়া কনকলতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে লো! ছেলে অমন কর্‌ছে কেন?" "কি জানি দিদি! পোড়া ছেলে কিছুই বলে না—" বলিয়া প্রাণের যাতনায় ললিতের পিঠে একটা চড় মারিয়া কনকলতা কাঁদিয়া ফেলিলেন। ছেলেকে সতীন এত যত্ন করে দেখিয়া বিমলা আনন্দভরে রহস্য করিয়া বলিলেন—"তোর ছেলেটা বড় দুষ্টু। আমার ছেলে কেমন লক্ষ্মী বল দেখি।" বড়মার কথা শুনিয়া ললিত একটু ধৈর্য্য ধরিল। দুঃখের সময় সান্ত্বনা দিলে দুঃখ বাড়িয়া যায়, কনকলতা একথা জানিতেন না। দিদির তিরস্কারে ছেলেকে সহসা নীরব দেখিয়া তিনি একটু অবাক হইয়া গেলেন। পরে তার মুখখানি তুলিয়া আবার একটি চুম্বন দিয়া আদর করিয়া বলিলেন—"আমার পাগলা ছেলে গো! তোমরা কিছু বলো না। আজ একটু ক্ষেপেছে।" মায়ের সহানুভূতি পাইয়া ললিত পুনরায় কাঁদিতে আরম্ভ করিল। বিমলা বলিল—"অন্যদিন ত দাদার সঙ্গে আসে, আজ কেন একা এসেছে বল দেখি? নিশ্চয়ই লালমোহনের সঙ্গে ঝগড়া হ'য়েছে।" অশ্রুপূর্ণ নয়নে কনকলতা বলিল—"স্কুল থেকে এসে অবধি এই রকম কর্‌ছে দিদি।" এতক্ষণ পরে লালমোহন আসিয়া স্কুলের কাপড় জামা খুলিয়া মার কাছে আসিয়া বলিল—"ক্ষিদে পেয়েছে মা।" বড়ছেলেকে দেখিয়া বিমলা জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁ লালমোহন, ললিতের কি হ'য়েছে?" লালমোহন হাসিয়া বলিল—"ওরে আজ আমি জব্দ করেছি মা।" ছেলের কথা শুনিয়া বিমলা বিস্মিতভাবে তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। লালমোহন বলিতে লাগিল—"আজ মাষ্টার মশাই পড়াতে পড়াতে আমাদের বল্লেন 'মাকে ভক্তি করা উচিত, সকালে উঠে সকলে মার পায়ের ধূলা নেবে।' কাল থেকে আমি তোমার পায়ের ধুলো নেবো মা।" ছেলেকে নিজের কথা কহিতে দেখিয়া বিমলা একটু বিরক্তির স্বরে বলিল—"আচ্ছা, তারপর কি হ'ল।" লালমোহন বলিল—"তাই আমি মাষ্টার মশাইকে বলে দিলুম—ললিত তোমায় ভক্তি করে না। মাষ্টারমশাই তারে জিজ্ঞাসা করতে, সে মিথ্যা কথা বলেছিল——"

কনকলতা এতক্ষণ স্থির হইয়া সব শুনিতেছিলেন। লালমোহনের কথা শেষ হইলে, একটা অজানা আবেগে তাঁর বুক ভরিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন—"আজ আমি মা না হইয়াও মা হ'য়েছি। ললিত আজ সকলের কাছে আমায় "মা" বলে মার খেয়েছে।" তাঁর সর্ব্বশরীর আনন্দে রোমাঞ্চিত হইল। পরক্ষণেই বড়ছেলের কথার অর্থ বুঝিয়া একটু ক্ষুণ্ন হইয়া পড়িলেন। বিমলা হাসিয়া বলিল—"ব্যাপার কি শুন্‌লি, বউ?" কনকলতা বিরক্তির স্বরে বলিল—"তোমার ছেলেরই ত দোষ। ললিত কি আমায় অভক্তি করে? লালমোহন ভারী মিথ্যাবাদী।" কনকলতা মুখভার করিয়া বসিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিল—"আমি আর ও স্কুলে ললিতকে পড়াব না। মাষ্টার নয় ত একটা আস্ত গরু।" বিমলা বুঝিলেন লালমোহনের কথায় কনকলতা ব্যথা পাইয়াছে। ছেলেকে লইয়া নিঃশব্দে তিনি ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

(২)

কনকলতা এখন ললিতকে সম্পূর্ণ স্নেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু লালমোহনের প্রতি তাঁর বিরক্তি আসিল। সামান্য কারণে উভয়ের মধ্যে প্রায়ই বিবাদ হয়। আজ রবিবার। স্কুলের ছুটি। দুপুরবেলা লালমোহন আসিয়া ডাকিল—"ললিত খেল্‌তে যাবি?" কনকলতা তীব্র স্বরে বলিলেন—"না, ও খেলতে যাবে না।"

"কেন ছোট মা? আজ ত ছুটি।"

"তুই যা, ও যাবে না।"

ছোটমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া ললিতের দিকে চাহিয়া লালমোহন বলিল—"আয় না রে। আজ একজন লাঠি খেল্‌তে আস্‌বে।" দাদার কথায় আনন্দ প্রকাশ করিয়া ললিত মায়ের মুখপানে চাহিল—"আমি যাব মা।" কনকলতা তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন—"কোথা যাবি? পড়াশোনা করতে হবে না?" মায়ের তিরস্কারে ললিত ভয় পাইল না। অভিমানের স্বরে কাঁদিয়া বলিল—"আজ ত ছুটি।" লালমোহন ও ছোট ভা'য়ের পক্ষ সমর্থন করিয়া

বলিল—"একবার ছেড়ে দাও না ছোট মা? আমরা এখনি ফিরে আসব।" বড়ছেলের পানে রোষকষায়িত কুটিল দৃষ্টিতে চাহিয়া কনকলতা বলিল—"দাঁড়া, তোর বাবা আসুক। সব কথা বলে দেবো! লেখাপড়ার নাম নেই, কেবল খেলা।" লালমোহন সাহসভাঙ্গা হইয়া পড়িল। ললিতও বাপের ভয়ে মাকে আর বিরক্ত করিল না। ভা'য়ের জন্য ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া ক্ষুব্ধচিত্তে লালমোহন ফিরিয়া গেল। ছেলের মুখখানি ম্লান দেখিয়া কনকলতা তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আদরভরে বলিলেন—"লাঠি-খেলা তুই শিখবি ললিত?" বাষ্পভারাক্রান্ত স্বরে ললিত বলিল—"না আমি শিখব না। আমায় তুমি যেতে দিলে না।" ললিতের চক্ষু দু'টি অশ্রুপূর্ণ হইল। ছেলেকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কনকলতা বলিলেন—"তোর বাবা আসুক—কত লাঠিখেলা তোরে দেখিয়ে আনবে।"

প্রাঙ্গণের মধ্যস্থল হইতে চিৎকার আসিল—"কোথা গো দিদিমণি—বাড়ীর সব ভাল ত?" পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া কনকলতা বাহিরে আসিয়া দেখিলেন বাপের বাড়ী হইতে তত্ত্ব আসিয়াছে। পুলকিত কণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন—"ক্ষ্যামাদিদি যে-এস, উঠে এস। বাবা ভাল আছেন ত?" ললিতের পোষাকের জন্য কনকলতা বাপের কাছে অনেকবার আবদার করিয়াছিলেন। এবার পূজার সময় তিনি তাই দিয়া পাঠাইয়াছেন। প্রফুল্লতায় কনকের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ললিত আসিয়া মায়ের পিঠের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পোষাক দেখিতে লাগিল। আনন্দোচ্ছ্বাস কোন মতে চাপা দিয়া কনকলতা নম্রকণ্ঠে ডাকিলেন—"দিদি, একবার এদিকে এস ত।" ললিত জিজ্ঞাসা করিল—"এ সব কার জন্যে মা?" জননী আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"তুই পরবি!" ইচ্ছা থাকিলেও ক্ষ্যামাদিদিকে দেখিয়া ললিত মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিল না। ছেলেকে নীরব দেখিয়া কনকলতা একটি একটি করিয়া তার গায়ে পোষাক পরাইতে লাগিলেন।

মখমলের উপর জরির কাজগুলি চিক্-চিক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। দূর হইতেই বিমলা বুঝিলেন, ব্যাপার বড় সাংঘাতিক। কাছে আসিলে ললিতকে উদ্দেশ করিয়া কনকলতা বলিলেন—"বড়মাকে প্রণাম কর।" বিমলার প্রাণে দুশ্চিন্তা ভরিয়া উঠিল। কনকলতার পানে চাহিয়া বলিলেন—"এ সব কি ছোট বউ? আর কি কেউ বাপের মেয়ে হয় না?" কনক ভাবিয়াছিলেন—বিমলা খুব আনন্দ প্রকাশ করিবেন। এখন তার বিপরীত দেখিয়া একটু বিস্মিতভাবে বলিলেন—"কেন দিদি?" তীব্র প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছাকে রুদ্ধ করিয়া বিমলা বলিলেন—"বাপের গলায় যে কোপ দিতে বসেছিস্।" ক্ষ্যামাদিদি কনকলতার বাপের বাড়ী কাজ করিয়া চুল পাকিয়েছে। সকলেই তারে ভালবাসে। বিমলার কথা শুনিয়া একটু গম্ভীর-ভাবে বলিল—"কথাই ত রয়েছে বড় দিদিমণি—'মেয়ে হয় নিতে আর ছেলে হয় দিতে।' এই পোষাকের জন্যে দিদিমণি কি বাবুকে কম ব্যস্ত করেছিল?" অন্য সময় রাগ না করিলেও এবার কিন্তু কনকলতা রাগিয়াছিল। রুক্ষস্বরে বলিল—"তোমার অত কথায় কাজ কি ক্ষ্যামাদিদি?" "তাই ত, তাই ত, সেই কথাই ত বলছি—" বলিয়া তাড়াতাড়ি কথা উল্টাইয়া একটু টানাসুরে ক্ষ্যামাদিদি বলিল—"আজ বুঝি আমাদের জামাইবাবু এখনও আসেন নি?" "সন্ধ্যা নাগাত আসবেন" বলিয়া বিমলা হাতে চারি আনার পয়সা দিয়া ক্ষ্যামা-দিদিকে বিদায় করিলেন।

নূতন পোষাক পরিয়া ললিত তখন অজানিত গর্ব্বে ঘরের এদিক-ওদিক করিয়া বেড়াইতেছিল। বিমলা তাহা লক্ষ্য করিলেন। ভাবিলেন—লাল-মোহনকে তিনি কি দিয়া শান্ত করিবেন? ছোট ব'য়ের কি বুদ্ধি কম? এক সংসারে কি এত তারতম্য করতে আছে? কনকলতাকে তিরস্কার করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইলেন। হঠাৎ ললিতের পানে চাহিয়া তার হর্ষোৎফুল্ল উজ্জ্বল মুখখানি দেখিয়া স্নেহকোমল মাতৃহৃদয় বিগলিত হইল। কনকলতা বলিল—"বেশ মানিয়েছে, না দিদি?" বিমলার যেন চমক ভাঙ্গিল। মাতৃস্নেহ উদার হইলেও উচ্ছৃঙ্খল নয়। মায়ের কর্ত্তব্যের উপর সৃষ্টির সামঞ্জস্য রক্ষা হইতেছে। স্নেহের স্বার্থপরতায় তাঁর এমন মতিচ্ছন্ন হইলে ত সর্ব্বনাশ। বিমলা একেবারে দৃঢ়চিত্ত হইয়া একটু ক্ষুণ্নস্বরে বলিলেন—"ভাল ত মানায় নি! ঐ কি জামা? এখানটা উঁচু হয়ে আছে, ওখানটা নীচু হয়ে আছে"—বলিয়া বিমলা একটু মুখভঙ্গী করিলেন। পোষাকটা দিদির মনের মত হয় নাই দেখিয়া কনকের উজ্জ্বল মুখখানি

কালো ছায়ায় ঢাকিয়া গেল। একটু নীরব থাকিয়া ক্ষুব্ধস্বরে কনকলতা বলিলেন—"আয় ললিত, তোর পোষাক এখন খুলে রেখে দিই। যখন মামার বাড়ী যাবি, ভাল করে তৈরী করিয়ে দোবো।" ললিত সে কথা শুনিল না। পোষাক ছাড়িতে সে রাজী নয়। বিমলা তার কাছে গিয়ে স্নেহভরে বলিলেন—"দেখি বাবা, তোমার পোষাক কেমন হয়েছে?" ললিত বড়মাকে ভয় করে বলিয়া কিছু বলিতে পারিল না। সুযোগ বুঝিয়া বিমলা তার পোষাক খুলিয়া নিজের ঘরে লইয়া গেলেন।

(৩)

সন্ধ্যাবেলা বাড়ী আসিয়া বিমলাকে সম্মুখে পাইয়া রতিকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন আছ গো?" অতীত ঘটনায় বিমলার চিত্ত স্থির ছিল না। তিনি ভাবিলেন—"চিররুগ্ন বলিয়া স্বামী তাঁরে উপহাস করিতেছেন।" কুপিত-কণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন—"রোজ রোজ এক কথা ভাল লাগে না। আমি ম'লেই তুমি বাঁচ, তা জানি।" বিমলার মুখখানি ভারাক্রান্ত হইল। যদিও প্রথমটা একটু স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, তবু রহস্য করিবার ইচ্ছায় রতিকান্ত একটু রাগান্বিতভাবে বলিলেন—"জান ত, কিন্তু মর কই? কত পাপ যে করেছি।" বলিয়া একটি কৃত্রিম দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। বিমলা চঞ্চল হইলেন। উদ্দাম বাষ্পোচ্ছ্বাস তাঁর নয়নপথে ছুটিয়া আসিল। অনর্থক কষ্ট দিবার প্রয়োজন নাই বুঝিয়া চকিতে তিরস্কারের কণ্ঠে রতিকান্ত বলিলেন—"ছিঃ! একটা পরিহাসও বুঝ্তে পার না? এত বড় নিদারুণ কথা কি মানুষ বল্তে পারে? যাক, আজ আমার একটা শিক্ষা হ'ল!" প্রাণের আবেগ সহসা ধাক্কা পাওয়ায় বিমলা যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। স্বামীর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন ভাবিয়া একটু লজ্জিতাও হইলেন। কিন্তু নিজের দুর্ব্বলতা অপ্রকাশ রাখিবার জন্য ম্লান হাসিয়া বলিলেন—"তা আমি বুঝ্তে পেরেছি। তুমি যে আমায় অযত্ন করনা তা আমি খুব জানি।" পরিহাস-বিভ্রাটে উত্তীর্ণ হইয়া রতিকান্ত মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া একটু হাসিলেন। বিমলা বলিলেন—"একবার ঘরে এস—একটা নূতন জিনিষ দেখাই।"

ললিতের পোষাকটা হাতে করিয়া শঙ্কিত মৃদুকণ্ঠে বিমলা বলিলেন—"ললিতের মার কাণ্ড দেখ্ছ? একেবারে ছেলেমানুষ। কি জন্যে এত পয়সা নষ্ট করেছে বল দেখি?" বিমলা স্বামীর মুখপানে চাহিলেন। রতিকান্ত বিস্মিত চক্ষে পোষাকটিকে দেখিতে লাগিলেন। বিমলা আবার বলিলেন—"এ সব কি আমাদের ঘরে মানায়? তা ছাড়া, ছেলেমানুষকে যা শেখাবে, তাই শেখে! এখন যদি এসব পর্‌তে পায়, বড় হ'লে আর ছেঁড়া কাপড় পর্‌তে চাইবে না। আর একটা কথা—লালমোহন কি মনে কর্‌বে? সেও ত ছেলেমানুষ বটে। সংসারের মধ্যে এখনি একটা মনোমালিন্য এসে পড়্বে।" রতিকান্ত একটু হাসিয়া বলিল—"ললিতের মার কথা ব'লোনা। সেদিন দেখলুম লালমোহনের সঙ্গে সে ছেলেমানুষি ঝগড়া কর্‌ছে।" স্বামীর কথায় একটু গর্ব্ব অনুভব করিয়া গলা খাট করিয়া বলিলেন—"এ পোষাক আমি তুলে রাখ্‌ব—এখন আর বার কর্ব্ব না।" বলিয়া আলমারি খুলিয়া বিমলা তাহা তুলিয়া রাখিলেন। রতিকান্ত বলিলেন—"ললিতের মা, তোমার উপর রাগ কর্ব্বে না ত?"

"করে কর্‌বে। এত অসদৃশ—লোকে দেখ্‌লে কি বল্‌বে?"

(৪)

আজ কনকলতার ভাইপো বিভূতির উপনয়ন। তার দাদা ইন্দুভূষণ নিজে আসিয়া অনেক করিয়া বলিয়া গেছেন। সকালে উঠিয়া গৃহকাজ সারিয়া কনকলতা বিমলাকে বলিলেন—"দিদি, তা হ'লে কি হবে?"

বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিসের কি হবে?"

"দাদার ছেলের যে পৈতে—"

"ওঁকে বলেছিস্?"

"আমি কিছু বলিনি। যা বল্‌তে হয় তুমি বল।"

রকের উপর বসিয়া রতিকান্ত মুখ ধুইতেছিলেন। বিমলা তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"ওগো, ললিতের মাকে যে তাঁর বাপের বাড়ী রেখে আস্‌তে হবে।"

"আমার সময় কই?" বলিয়া রতিকান্ত এক কথায় সমস্যার মীমাংসা করিতে চাহিলেন। বিমলা একটু বিরক্তির স্বরে বলিলেন "বেশ কথা তঁ। তোমার সময় নেই বলে ওর যাওয়া হবে না? নিজের সুখটি ত তুমি বেশ বুঝতে পার।" স্ত্রীর কথায় রতিকান্ত উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া দু-একবার কাসিলেন। কোন প্রতিবাদ করিলেন না। বিমলা আবার বলিলেন—"তবে কি তুমি যাবে না?"

রতিকান্ত একটু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"বলছি ত আমার সময় নেই। অন্য কাউকে সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দাও।" স্বামীর কথায় বিমলা ভয় পাইলেন না। বলিলেন, "সেটা কি ভাল দেখায়? কুটুম্বিতের স্থলে একটুতে কথা ওঠে। আজ যদি তুমি না যাও তাঁরাও তোমার কোন কাজে আস্‌বেন না।" কনকলতা দিদির সম্মুখে স্বামীর সহিত কথা কহিতেন না। দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া এতক্ষণ সব শুনিতেছিলেন। রতিকান্তের কথায় তাঁর অভিমান আসিল। হাত নাড়িয়া ইঙ্গিতে বিমলাকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন—"আমি যাব না দিদি। তুমি আর ঝগড়া ক'রোনা।" বিমলা হাসিয়া বলিলেন—"তোর ভয় কি? উনি ঝগড়া করতে পারেন, আর আমরা করলেই দোষ? কেন, মেয়েমানুষ হয়েছি বলে কি এত অপরাধ?" উদাসভাবে রতিকান্ত বলিলেন—"আমি কি তা বলছি? যতক্ষণ ইচ্ছা হয় ঝগড়া কর। একাজে আমি বড় পটু নই।" বিমলা একটু অপ্রস্তুত হইলেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—"পাঁচজনের সঙ্গে আপনা আপনি রাখাটা কি তুমি তুলে দিতে চাও? কত যত্নকরে তাঁরা বলে গেলেন, তুমি বলছ—যাব না। এটা কি ভাল দেখায়? সকলকে যদি এত পর ভাব, সংসারী হ'য়েছ কেন? গায়ে ছাই মেখে সন্ন্যাসী হয়ে যাও না?"

রতিকান্ত এইবার হাসিয়া ফেলিলেন। বিমলা আবার বলিলেন—"যদি একলা থাক্‌তে পার, তা হলে কোন কথাই নাই। কিন্তু, পরের সুখ চাইতে হ'লে, পরকে সুখী করা চাই। যাও, একখানা গাড়ী নিয়ে এস। আর বিলম্ব ক'রোনা।" দ্বিরুক্তি না করিয়া, কাপড় ছাড়িয়া রতিকান্ত বাহিরে চলিয়া গেলেন। কনকলতা বলিলেন—"দিদি, ললিতের পোষাকটা বার করে দাও। তার গায়ের মাপ দিয়ে ঠিক ক'রে আনব। বিমলা একটু বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"কর্ম্মবাড়ীতে কি তুই এই সব কর্‌তে যাবি? লোকে শুনলে যে হাস্‌বে। আর তোর বাপমাই বা কি মনে করবেন? এখন থাক, আর এক সময় গিয়ে করিয়ে আনিস।" পোষাকের কথা শুনিয়া, ছুটিয়া আসিয়া ললিত বলিল—"মা, পোষাক পরব।" এই সময় লালমোহন আসিয়া সেথায় উপস্থিত হইল। কনকলতা ক্ষুব্ধচিত্তে মাটীর দিকে চাহিয়া নীরবে রহিলেন। বিমলাও দেখিলেন—সম্মুখে বিপদ। ললিত আব্দার করিয়া আবার বলিল—"মা, বড়মাকে বলনা—আমি পোষাক পরব।" কৌতুহল প্রকাশ করিয়া লালমোহন জিজ্ঞাসা করিল—"কিরে ললিত?" ললিত বলিল—"জাননা দাদা? আমার যে পোষাক এসেছে।" লালমোহন মুখখানি উজ্জ্বল করিয়া বিমলার পানে চাহিল—"আমারও এসেছে মা?" বিমলার প্রাণে প্রচণ্ড আঘাত লাগিল—উদ্দাম আবেগে চীৎকার করিয়া বলিলেন—"দেখ্ দেখি ছোটবউ, তোর কাজটা কত খারাপ হয়েছে।" কনকলতা বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিলেন। বিলম্বে ললিত অস্থির হইয়া পড়িল। কনকলতার কাপড় ধরিয়া ক্ষুদ্র হস্তে একটি টান দিয়া বলিল—"ওমা, বড়মাকে বলনা—" কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বিমলা তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন—"কেন অমন করছিস্? পোষাক আবার কোথা হ'তে এল?" বড়মার কথায় ললিত ভয় পাইল এবং নিরুৎসাহ হইয়া কনকলতার কাপড়ের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। রতিকান্ত আসিয়া খবর দিলেন—গাড়ী এসেছে। "আমি যাবনা" বলিয়া মর্ম্মাহত কনকলতা পুত্রকে লইয়া নিজের ঘরে যাইয়া দাররুদ্ধ করিলেন।

বেলা হইল। ছোটবউ দ্বার খুলিল না। ললিতের ক্ষুধা পাইয়াছে ভাবিয়া বিমলা ডাকিলেন—"ললিত ভাত খাবি আয়।" অনেকক্ষণ অতীত হইল, কেহ কোন উত্তর দিল না। মায়ের প্রাণ অস্থির হইয়া পড়িল। চীৎকার করিয়া বিমলা নিজের মনে বলিতে লাগিলেন—"নিজে দোষ করবে, আবার আমার উপর রাগ। এক সংসারে থাক্‌তে গেলে কি এসব চলে? এটি আমার ছেলে, ওটি পরের ছেলে করলেই, ক্রমে ছেলেতে ছেলেতেও আপনা আপনি থাকবে না।" ঘরের ভিতর হইতে উত্তরের প্রতিক্ষায় বিমলা একটু থামিলেন। পরে আবার বলিতে লাগিলেন—"তুই বুড়ো মাগী, রাগ করে পড়ে থাক্‌তে পারিস, ও ত ছেলে মানুষ বটে।" এইবার কনকলতার অন্তর্দাহ উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন—"আজ ললিত যদি তাঁর পেটের ছেলে হইত, কেউ তার উপর জোর করিতে পারিত না। বিছানায় শুইয়া তিনি গুমারাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন! বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া বিমলা দরজায় করাঘাত করিয়া রুক্ষস্বরে বলিলেন—"আমার উপর রাগ করে, ছেলেটাকে কি মেরে ফেল্‌বি? ওরে ছেড়ে দে, ভাত খেয়ে আসুক। কনকলতার

আর সহ্য হইল না। বেদনায় বুক ভরিয়া উঠিল। ললিতকে বাহির করিয়া দিয়া আবার দ্বার রুদ্ধ করিলেন। দুয়ারে পড়িয়া ললিত কাঁদিতে লাগিল। বিমলা তাহাকে স্নেহভরে কোলে তুলিয়া বলিলেন—"এস, বাবা এস। চল, ভাত খাইয়ে আনি।" বড়মার কোল হইতে ছিটকাইয়া পড়িয়া উচ্চস্বরে ললিত কাঁদিয়া উঠিল—"ওমা, দোর খুলে দাও।" সহস্র চেষ্টাতেও কোন ফল হইল না। বিমল হার মানিলেন। পেটের ছেলে যে পর হইয়া যাইতে পারে এ ধারণা তাঁর ছিল না। বিস্মিতভাবে পুত্রের পানে চাহিয়া তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। দরজার গায়ে ললিতের প্রত্যেক করাঘাত কনকলতার বুকের ভিতর এক একখানি পাঁজর ভাঙ্গিয়া দিতে লাগিল। তিনি বিশেষভাবে মনকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন—"কে আমার—কার জন্যেই বা মায়া?" কিন্তু মাতৃস্নেহ অভিমানের মর্য্যাদা রাখিল না। দোর খুলিয়া ললিতকে কোলে লইয়া দ্রুতপদে কনকলতা রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

(৫)

বিমলার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া, কয়দিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কনকলতা আজ বাপের বাড়ী আসিয়াছেন। ভগ্নীকে আনিতে যাইয়া ইন্দুভূষণ বিমলার মুখে অনেক কথা শুনিয়া আসিলেন। জননীকে দেখিয়া তিনি ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলে—"রতিকান্তের বড় বউ দেখ্‌তে ঠিক মড়ার আকার হয়ে গেছেন। এ সময় তাঁর ঘাড়ে সংসার ফেলে আসা কনকের ভাল হ'ল না! তিনি যে কত দুঃখ করলেন মা, তা কি বল্‌ব?" কনকের মা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন রে! কনক বুঝি খুব ঝগড়া করে?" সতীনের ব্যবহারে কনকলতা পূর্ব্ব হইতেই বিরক্ত ছিলেন। এখন দাদার মুখে, মার মুখে, তারই দোষারোপ শুনিয়া একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। মুখ ভঙ্গি করিয়া বলিলেন—"সবই আমার দোষ! তোমরা কি জান বল ত?" মৃদুস্বরে জননী বলিলেন—"আমরা কি তোরে কিছু বলেছি? অত রাগ করছিস কেন?" ইন্দুভূষণ বলিলেন—"মা, তোমাকেও তিনি বল্‌তে বলেছেন। সংসারে যখন দুটি ছেলে, একজনকে তিনি অমন পোষাক পাঠান কেন?" দাদার কথা শেষ হইতেই কনকলতা বলিলেন—"দেখছ মা, দিদির কি রকম হিংসে। যেদিন তুমি পোষাক পাঠিয়ে দিলে, সেইদিনই ছেলেটার গা থেকে তা খুলে নিয়ে আলমারিতে তুলে রাখ্‌লে।" ইন্দুভূষণ একটু হাসিয়া বলিলেন—"শুনছ মা—তোমার মেয়ের কথা। ছেলেকে সুখী দেখ্‌লে মার প্রাণে কখন হিংসে আসে? ললিত যদি তোর ছেলে হ'ত, তা হলেও বা কথা ছিল।" জননী বলিলেন—"তোর দিদি ঠিক কথাই বলেছেন। আমারও লজ্জা হচ্ছে। আগে এতটা তলিয়ে বুঝ্‌তে পারিনি।" ইন্দুভূষণ বলিলেন—"কনকের সতীন—যেমন রূপে তেম্‌নি গুণে। কথাগুলি এমন মিষ্টি, কি বলব! তোমার মেয়ে তার একটা পায়ের আঙ্গুলেরও যোগ্য নয়।" জননী বলিলেন—কনকের মুখেও ত অনেকবার শুনেছি—দিদি তারে বড় যত্ন করে।" কনকলতা এতক্ষণ মুখ ভার করিয়া বসিয়াছিলেন। মার কথা শেষ হইলে বলিলেন—"আমি ত এখনও বল্‌ছি—তিনি আমায় খুব যত্ন করেন। আসল কথা তোমরা বুঝতে পারছ না,—লালমোহনকে আমি ভালবাসি না বলে তাঁর হিংসে হয়েছে।" জননী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন ভালবাসিস্ না?" কনকলতা বলিলেন—"সেও আমার কাছে আস্‌তে চায় না।" তাঁর চক্ষে জল আসিতেছিল। সকলে কেবল তারই দোষ দেখে! কনকের মুখপানে চাহিয়া, কথাটা পাল্টাইবার জন্য মা বলিলেন—"হ্যাঁ রে, তোর ছেলে এলো না?" আবেগভরা রুদ্ধ কণ্ঠে কনকলতা বলিলেন—"আমার আবার ছেলে কে? যার ছেলে, তার কাছেই আছে।" মেয়েকে সান্ত্বনা দিবার জন্য আবার বলিলেন—"তুই আসবার সময় সে কাঁদলে না?" কথাটা কনকলতার বুকের ভিতর যেন বিঁধিয়া গেল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। দ্রুতপদে ঘরে যাইয়া শুইয়া পড়িলেন,—মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—ললিত এখন কি করছে! নিশ্চয়ই তাঁর জন্যে কাঁদছে। কেউ তারে শান্ত করতে পারবে না, আসবার সময়ও সে বড় কেঁদেছিল। করুণ মুখখানি তুলে সজল নয়নে তাঁর পানে চেয়েছিল, যথাশক্তিতে তাঁর কাপড় ধরে দাঁড়িয়েছিল। দিদির উপর রাগ করিয়া সে তার মনে নিদারুণ কষ্ট দিয়েছে। সে ত জানে না, যে সে তাঁর ছেলে নয়। সে তাঁকে "মা" বলেই যে জানে। একদিন সকলের সাম্‌নে "মা" বলে সে মারও খেয়েছে। তার জন্যে সে যদি এতটা সহ্য করতে পারে, তিনি কি

এইটুকু সহ্য করতে পারেন না ? চিন্তার গভীরতার সঙ্গে প্রাণের আবেগও প্রবলতর হইল। পরিতাপে সংজ্ঞাশূন্য-প্রায় হইয়া মাটীতে পড়িয়া কনকলতা কাঁদিতে লাগিলেন।

(৬)

কনকলতার অভাবে কয়টা দিন অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া বিমলা সম্প্রতি শয্যাশায়ী হইয়াছে। আজ সন্ধ্যাবেলা রতিকান্ত বাড়ী আসিয়া, গৃহকাজ সারিয়া উনানে আগুন দিতে রান্নাঘরে ঢুকিলেন। স্বামী আসিয়াছেন জানিয়া বিমলা তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন—"ওগো, একবার এদিকে আসবে।" একদণ্ডও বিলম্ব না করিয়া রতিকান্ত সেথায় উপস্থিত হইলেন। বিমলা বলিলেন, "এমন করে আর ক'দিন চলবে ? ললিতের মাকে খবর দাও।" রতিকান্ত বিমলাকে বড় ভালবাসেন। কনকলতার ব্যবহারে তিনি মর্ম্মপীড়িত ছিলেন। মনের দুঃখে কি একটা বলিতে যাইয়া কথা পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, "আজ কেমন আছ ?" স্বামী পাছে অতিরিক্ত চিন্তাকুল হইয়া পড়েন, বিমলা মিথ্যা কহিয়া বলিলেন—"একটু ভাল আছি।" রতিকান্ত বিছানার পার্শ্বে বসিয়া স্ত্রীর কপালে হাত দিয়া চমকিয়া উঠিলেন। বুঝিলেন—আজ জ্বর বেশী হইয়াছে। প্রাণের ভিতর একটা প্রবল আকুলতা আসিয়া উপস্থিত হইল। হতাশভাবে বলিলেন—"এবার দেখছি তুমি যাবে !" বিমলা একটু হাসিয়া বলিলেন—"এমন ভাগ্যি কি করেছি ? তোমার কোলে মাথা রেখে মরতে পারলে ত বাঁচি।" স্ত্রীর এই কথায় স্বামীর প্রাণে স্নেহের উচ্ছ্বাস নয়নদুটিকে ভরিয়া দিল ! রতিকান্ত কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—"তুমি বাঁচবে বটে, আমার কি হবে ?" বিমলা বলিলেন "কনককে একটু শিখিয়ে নিও, কোন কষ্ট হবে না।" রতিকান্ত কোন প্রতিবাদ করিলেন না। দুর্ভাবনায় তাঁর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে দেখিয়া বিমলা আবার বলিলেন—"তোমার যত বাজে আশঙ্কা। আমি কি এখনই যাচ্ছি ? এমন অসুখ ত অনেকবার হয়েছে।"

লালমোহন আসিয়া ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন আছ মা ?" ছেলের করুণ কথাগুলিতে বিমলার চক্ষু দুটি অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি বুঝিয়াছিলেন—এবার আরোগ্যলাভ অসম্ভব। তাঁর অভাবে লালমোহনের দুর্দ্দশা হইবে ভাবিয়া প্রাণের ভিতর স্নেহের কষাঘাত হইতে লাগিল। ছেলেকে বুকের উপর টানিয়া বিমলা বলিলেন—"ভয় কি বাবা ? আমি শিগ্‌গিরই সেরে উঠবো।" কিছুক্ষণ সকলেই নীরব। রতিকান্তের পানে চাহিয়া বিমলা বলিতে লাগিলেন—"ললিতের জন্য আমি ভাবি না। ভগবান তার উপায় করে দিয়েছেন। এর জন্যেই আমার ভাবনা। ছোটবউকে তুমি নিয়ে এস। লালমোহনের জন্যে তারে কিছু বলে যাই।" লালমোহন বিস্ময়ের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কি মা ?" বিমলা কথা চাপা দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"পূজোর সময় তোর কি চাই, লালমোহন ?" "কিছু চাই না মা, তুমি ভাল হ'য়ে ওঠ।" রতিকান্ত এতক্ষণ গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। পুত্রের মুখে এত বড় কথা শুনিয়া যেন সুপ্তোত্থিত হইলেন। বিমলাও স্বামীর পানে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

কতকক্ষণ পরে লালমোহন বলিল—"মা, ছোটমাকে আনতে যাব ?" ছেলের ব্যাকুলতা লক্ষ্য করিয়া উভয়েই চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। বিমলা বলিলেন—"ছোটমাকে তুই ভালবাসিস্ লালমোহন ? "লালমোহন ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল—"ছোটমা যে আমার সঙ্গে ঝগড়া করেন মা !" রতিকান্ত বুঝিলেন, কনকলতার অযত্ন লালমোনের বুকে গভীরভাবে আঘাত দিয়াছে। বিমলার অভাবে তাহাকে সান্ত্বনা দেওয়া দুরূহ হইবে। বিমলাও স্বামীর মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন "তুই বুঝি ছোটমাকে ভক্তি করিস্ না লালমোহন ?" লালমোহন নীরব রহিল। বিমলা আবার বলিলেন—"ছোটমাকে ভক্তি ক'রো বাবা। দেখছ ত ললিতকে কত তিনি যত্ন করেন। তুমি ভালবাসলে, তোমায়ও ঐ রকম করবেন।" লালমোহন বলিল—"তিনি কবে আসবেন মা ?" বিমলা রতিকান্তের পানে চাহিয়া বলিলেন—"যাও না, ললিতের মাকে নিয়ে এস।" রতিকান্ত বিষাদভরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তারে এনে কি হবে ?" বিমলা বলিলেন—"তোমার যে বড় কষ্ট হয়ে পড়েছে।" লালমোহন বলিল, "কাল ভাত রাঁধতে গিয়ে বাবা হাত পুড়িয়া ফেলেছিলেন মা।" স্বামীর পানে সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমায় ত কিছু বল নি ?" কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবেগভরা কণ্ঠে আবার বলিলেন—"কত মহাপাপ করেছি, একদিনের তরে তোমায় সুখী করতে পারলুম না।" রতিকান্ত হতাশভাবে বলিলেন, "সেটা তোমার

পাপ নয়, আমার অদৃষ্ট। মানুষে মানুষের কিছু করতে পারে না। আমাকে সুখী করতে তুমি যথেষ্ট চেষ্টা করেছ, কিন্তু কপাল আমার বড় মন্দ।" রতিকান্ত অবসাদভরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বিমলার বুকের ভিতর ঝঞ্ঝা বহিয়া গেল। প্রাণের আবেগে রতিকান্ত আবার বলিতে লাগিলেন—"যে কষ্ট দেখে তুমি কনককে এনেছিলে, সে কষ্ট আমার গেল না কেন? শুধু তাই নয়, সে কষ্ট এখন দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে। তার উপর যদি তুমি যাও—।" ভবিষ্যৎ বিরহ আশঙ্কায় রতিকান্তের স্বর ভারাক্রান্ত হইল। লালমোহনের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই উচ্ছৃঙ্খল মনের ভাবকে তিনি সংযত করিলেন। বিমলার প্রাণেও প্রচণ্ড আঘাত লাগিল। তিনিও ধীরে ধীরে একটি উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। ক্ষণকাল পরে স্বামীর পানে চাহিয়া আবার বলিলেন—"ললিতের মাকে নিয়ে এস। আমার একটা অনুরোধ রাখ। আর কখন তোমায় বিরক্ত করবো না।" বিমলার কথায় রতিকান্ত উদ্দীপ্ত হইয়া বলিলেন—"কি বলছ তুমি? এই বিপদে যে ফেলে গেল, তার কাছে গিয়ে ভিক্ষা চাইব? আমার দ্বারা তা সম্ভব নয়।"

বিমলা বলিলেন, "তবে একখানা চিঠি লিখে দাও?"

"কি লিখব?"

"লিখে দাও—আমার অসুখ করেছে। সে যেন শীগ্‌গির চলে আসে।" রতিকান্ত চলিয়া গেলেন।

বিছানায় শুইয়া বিমলা ভাবিতে লাগিলেন—"এই দুটো কাজ শেষ হ'লেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি। স্বামীর সঙ্গে কনকের মিলন, লালমোহনের সঙ্গে তার মাতৃত্ব।"

(৭)

রতিকান্ত যে দিন ললিতকে লইয়া শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছিলেন স্ত্রীর সহিত একটিও কথা কহেন নাই। স্বামীর এই নীরব অবহেলায় কনকলতা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। আজ তাঁর চিঠি পাইয়া বিরক্তিভরে খুলিয়া দেখিলেন তাতে দুইছত্র লেখা—"তোমার দিদির অসুখ বেড়েছে। যদি ইচ্ছা হয়, আসিও।" কনকলতার শরীরে শোণিতস্রোত বেগে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। ক্ষিপ্রহস্তে চিঠিখানিকে ছিঁড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন। তারপর বিরক্ত মনে ভাবিতে লাগিলেন—বেশ, আমি যদি এত মন্দ, আর সেথায় যাব না। দুটো পেটের ভাত হেথাই জুটবে। যদি না জোটে ললিতের হাত ধরে ভিক্ষে করে বেড়াব। দাসীর মত খেটে মরি, তাই না স্ত্রী বলে আদর করা। অমন আদর নাই বা করলেন? আমি তার জন্যে ত কেঁদে বেড়াচ্ছি না। এত রাগ কেন? সে দিন এলেন একটা কথাও কইলেন না। আজ চিঠি দিয়েছেন, তাও ঐ রকম। কেন, আমি তাঁর কি করেছি?

কনকলতার মা কি দরকারে ঘরে আসিয়া মেয়ের অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমন করে যে বসে আছিস্?" জননীকে হঠাৎ এরূপ প্রশ্ন করিতে দেখিয়া কনকলতা একটু হতবুদ্ধি হইয়া বলিয়া ফেলিলেন—"দিদির অসুখ বেড়েছে মা।" বিস্ময়ের স্বরে জননী বলিলেন, 'আবার অসুখ করেছে। আহা, এবার বোধ হয় সে আর বাঁচবে না।" মায়ের মুখে নিদারুণ কথা শুনিয়া কনকলতার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল। শঙ্কিতস্বরে বলিলেন—"অমঙ্গল কথা কেন বল মা? এমন অসুখ দিদির অনেকবার হয়েছে।"

"কি জানি মা। তোর দাদা যে বল্লে—সে মড়ার আকার হ'য়ে গেছে। ভাল হয়ে উঠলেই ভাল! আমি বলি—তুই যা। এ সময় তোর দেখা উচিত।" কনকলতার যাইবার ইচ্ছা হইল বটে, কিন্তু স্বামীর চিঠিখানির কথা ভাবিয়া বলিলেন "এখন আমি যাব না। এই ত দুটো দিন এসেছি। অসুখ বাড়াবাড়ি হলে দিদি নিজে খবর দিতেন।" জননী আর কোন কথা না বলিয়া আপনার কাজে গেলেন। কনকলতা আবার ভাবিতে লাগিলেন—দিদির উপর রাগ করে চলে আসাটা ভাল হয় নি। অসুস্থ শরীরে পরিশ্রম করেই বোধ হয় তাঁর অসুখ বেড়েছে। আমায় তিনি বড় ভালবাসেন। সে'বার যখন আমার মাথা ধরা ব্যায়রাম হয়েছিল, মরতে মরতে নিজের হাতে তিনি সব করেছিলেন। তার উপর সারা রাত জেগে আমার মাথা টিপে দিতেন। সে সব কথা আমি কখন ভুলতে পারব না। সামান্য কথায় রেগে উঠি, আমার মরণই ভাল। যাই হোক, এবার আমি তাঁকে তুষ্ট করব। মাকে বলে লালমোহনের জন্যেও একটা পোষাক তৈরী করে নিয়ে যাব, দেখলে তিনি নিশ্চয়ই সুখী হবেন।

মনে মনে মতলব আঁটিয়া কনকলতা উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন

—"মা, একটা কথা বলি শোন।" পাশের ঘর হইতে আসিয়া জননী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি কথা রে?"

"লালমোহনের জন্যে একটা পোষাক তৈরী ক'রে দেবে?"

"তা দেব বই কি—দেবই ত। যে দিন যাবি, নিয়ে যাস্।"

"তৈরী ক'রে পাঠাও মা। হ'লেই আমি নিয়ে যাব।"

(৮)

তিন চারি দিন পরে বড়ছেলের পোষাক লইয়া সুখের নানাবিধ কল্পনা করিতে করিতে কনকলতা শ্বশুরবাড়ীর সম্মুখীন্ হইলেন। গাড়ী থামিবামাত্র ললিতের হাতে লালমোহনের পোষাক দিয়া উল্লাসভরে তিনি দিদির সহিত দেখা করিতে ছুটিলেন। পায়ে সংস্রবার বাধা লাগিল, তবুও জ্রক্ষেপ নাই। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতেই বুকের পাঁজরগুলি হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল। সাড়া নাই, শব্দ নাই, কোন লোকজনও নাই। সব যেন ফাঁকা। একটু এদিক ওদিক করিয়া পরে দেখিলেন, একটি ঘরের কোণে দু'এক জন প্রতিবেশী বসিয়া আছেন। কনকলতাকে দেখিয়া তাঁরা বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিলেন। সহসা বাহিরের দুয়ারের কাছে বড়ছেলের করুণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া কনকলতা ফিরিলেন। কাছা গলায় দিয়া মাতৃহারা লালমোহন কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁর পায়ের তলায় লুটাইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—"ছোটমা গো!" ব্যাপার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। ভগ্নহৃদয়ে কনকলতা লালমোহনকে বুকে ধরিয়া মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্য।

সঙ্কল্প।

সখি, সরে দাঁড়া, সরে দাঁড়া, বলিস্‌নে আর কথা,
তোরা কিছু বুঝবি না'ক, দিস্‌নে মোরে বাধা।
গিয়াছে সে কোন্ কাননে,
প্রাণ যে আমায় সেথায় টানে,
হিয়া মাঝে কাঁদ্‌ছে আজি যত গোপন ব্যথা;
সখি, সরে দাঁড়া, সরে দাঁড়া, বলিসনে আর কথা!

জোছ্‌না নিশায় দাঁড়াল সে ঝুলন-কুঞ্জতল,
হাসির মাঝে পড়্‌ল ঢলে আকুল নয়ন-জল।
চাইনু যখন মুখের পানে,
প্রাণের কথা রইল প্রাণে,
হাস্য দিয়েই দিইনু বিদায় অশ্রু র'ল পড়ে;
আজি সে সব সুপ্ত ব্যথা লুটিয়ে কেঁদে মরে।

সখি, তোদের পায়ে ধরি দিস্‌নে মোরে বাধা
আজকে তারে বল্‌তে হবে প্রাণের যত কথা
মুখের পানে চাইব না আর
ব্যথার ডালি দিবই এবার
চন্দ্র আনন পড়্‌লে চোখে সব হবে যে মিছে
ব্যথা আমার রইবে পড়ে হাস্যরোলের পিছে।

শ্রীপ্রিয়কান্ত সেনগুপ্ত।

সেকালের যুদ্ধের কথা।

আমাদের এই ভারতভূমি ব্রহ্মচর্য্যের দেশ। সেকালের মুনিঋষি সাধু সন্ন্যাসী হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ গৃহী পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য ও স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় নিয়ম পালন করিয়া যুগোচিত দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া নিজ নিজ জ্ঞান ও বিদ্যাবুদ্ধির আলোচনা দ্বারা দেশের মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে দিন আর নাই। এখন ইংরাজ প্রভৃতি জাতির

মধ্যে "Quite a youngman of fifty "অর্থাৎ 'পঞ্চাশ বৎসরের যুবাপুরুষ' এইরূপ কথা শুনা গেলেও ভারতীয়—বিশেষতঃ বাঙ্গালীযুবকেরা ৩০ বৎসরে পা দিতে না দিতেই বলিতে থাকেন, "আর কি মশায়! আর ক'দিন?" যেন তাহারা চিতার কাষ্ঠের উপর শায়িত, একটু অগ্নিসংযোগ করিবার অপেক্ষা মাত্র। অভিজ্ঞেরা বলেন ইহা শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনেরই ফল। সুতরাং দেশের এই অবস্থায় কোথায় কোনও দীর্ঘজীবী সবল সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম ব্যক্তির সন্ধান পাইলে আমরা তাঁহাকে দর্শনীয় ব্যক্তি বলিয়াই মনে করি। বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত খুলনার নবতিপর বৃদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত গদাধর ঘোষ মহাশয় এইরূপ একজন দর্শনীয় ব্যক্তি। তাই গত ১৩২২ সালে ৩রা আষাঢ় শুক্রবার আমরা তাঁহার খুলনার বাসাবাড়ীতে তাঁহাকে দেখিতে—তথা তাঁহার দীর্ঘজীবনের কাহিনী শুনিতে গিয়াছিলাম। আমাদিগকে পাইয়া ঘোষ মহাশয় যথেষ্ট সমাদর করিয়া বেলা ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত আমাদের প্রশ্নের উত্তরে নিম্নলিখিত কথায় তাঁহার দীর্ঘজীবনের কাহিনী বলিয়াছিলেন।

"খুলনা জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত গোনালীগ্রামে ১২৩০ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের এক শনিবারে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি। বর্ত্তমানে আমার বয়স ৯৩ বৎসর *। আমার প্রপিতামহ অনন্তরাম ঘোষ—১২০ বৎসর বয়সে ও পিতামহ বাবুরামঘোষ ১১০ বৎসর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। পিতামহদেব জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বেশ সবল সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম ছিলেন। যেদিন দুপুর বেলা তাঁহার মৃত্যু হয়, সেই দিন প্রাতঃকালে তিনি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া ৩।৪ মাইলের মধ্যে যত আত্মীয় স্বজন পরিচিত ও অনুগত লোক ছিলেন, সকলের নিকট যাইয়া, "আমি আজই যাইব" বলিয়া বিদায় লইলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া আত্মীয়বর্গ প্রথমে হাসিয়া উঠিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখের গাম্ভীর্য্য ও স্বরের দৃঢ়তা দেখিয়া তাঁহারা আর তাঁহার কথা অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। গ্রাম ভাঙ্গিয়া ছেলে বুড়ো সকলই তাঁহার পশ্চাতে ছুটিলেন, পিতামহ আত্মীয়স্বজন পরিবেষ্টিত হইয়া বাড়ী আসিয়াই—প্রাঙ্গণে শয়ন করিয়া পুত্রদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার অন্তর্জ্জলের ব্যবস্থা কর।" এই বলিয়া নিজেই তারকব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। উপস্থিত আত্মীয়বর্গ উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি দিতে লাগিলেন দেখিতে দেখিতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। আমার পিতা ৺গোলোকচন্দ্র ঘোষ ৭৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। পিতার অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে মৃত্যু হইবার কারণ আমার মধ্যম ভ্রাতা রামনারায়ণ ঘোষের অকালমৃত্যু। মেজদাদার মৃত্যুদিনে পিতা যে শয্যাগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই তাঁহার শেষ শয্যা।

"আমার বয়স যখন ৫ বৎসর তখন আমি বিষমজ্বরে আক্রান্ত হই। সেই জ্বর হইতে ক্রমে প্লীহা ও অগ্রমাংস হইয়া আমার পেট জালার মত ফুলিয়া উঠে। দীর্ঘ চারিবৎসর কালপর্য্যন্ত আমি ঐ রোগে শয্যাশায়ী ছিলাম। আত্মীয় স্বজনগণ আমার জীবন বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়াছিলেন। মাতা সদাসর্ব্বদা আমাকে কোলে করিয়া কাঁদিতেন। কিন্তু আমার পিতামহ মাতাকে বলিতেন, "মা, তুমি কাঁদিওনা। আমি বলিতেছি, তোমার ছেলে মরিবে না, অধিকন্তু আমার আয়ু পাইবে।" পিতামহের আশ্বাসবাক্যে অন্যলোকে কতটুকু আশ্বস্ত হইয়াছিলেন বলিতে পারি না, আমার কিন্তু তাঁহার কথাতে খুব বিশ্বাস হইয়াছিল। পিতামহের কথা সত্য হইল—আমি বাঁচিয়া উঠিলাম। কিন্তু ঔষধ খাইয়া নয়, পাঁঠার মাংস খাইয়া। কথাটা অদ্ভুত বটে কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য।

"একদিন আমাদের বাটীতে একটি পাঁঠা বলি হয়। সেই পাঁঠার অর্দ্ধেক মাংস দ্বিপ্রহরে বাটীর সকলে আহার করেন, বাকী অর্দ্ধেকটা রান্না করিয়া বিকালের জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়। সুযোগ পাইয়া সকলের অজ্ঞাতসারে পাত্র ধরিয়া সেই মাংস লইয়া রান্নাঘরের পিছনে গিয়া আমি সবটুকুই খাইয়া ফেলিলাম। মা আসিয়া দেখিয়াই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। আমাকে আনিয়া বারান্দায় রাখা হইল। সকলে আমার জীবনে হতাশ হইয়া আমাকে লইয়া সমস্ত রাত্রি 'জাগরণ' দিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি মরিলাম না। শেষ রাত্রি হইতে আমার দাস্ত

* ১৩২২ সালের আষাঢ় মাসে আমরা ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে তাঁহার জীবনের কথা লিখিয়া লইয়াছিলাম, সে আজ তিন বৎসরের কথা; সুতরাং এখন তাঁহার বয়স ৯৬ বৎসর। এখনও সুস্থ ও জীবিত। 　　লেখক।

হইতে লাগিল। পরদিন বেলা একপ্রহর পর্য্যন্ত দাস্ত হইল। দাস্তের সঙ্গে সঙ্গে পেট কমিতে লাগিল। সেই সঙ্গে আবার প্লীহা অগ্রমাংস ও জ্বর সব চলিয়া গেল। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলাম। এই সময় আমার বয়স ৯ বৎসর। ইহার পর কয়েক বৎসর বেশ সুস্থই ছিলাম। আমার কোনই রোগপীড়া হয় নাই। ১২৪৮ সালে ১৮ বৎসর বয়সের সময় আমার কলেরা হয়। সেবারও ডাক্তারী কিম্বা কবিরাজী কোন ঔষধই ব্যবহার করি নাই। গ্রাম্য ''পাতামুঠা" চিকিৎসাতেই আরোগ্য-লাভ করিয়াছিলাম।

''আমার যখন ৪০ বৎসর বয়স তখন আমি মাথাধরা ও শিরঃশূল রোগে পীড়িত হই। প্রায় দুই বৎসর যাবৎ ইহাতে আমি বড় কষ্ট পাইয়াছিলাম। ঔষধপত্র একটু আধটু ব্যবহার না করিয়াছিলাম এমন নয়, কিন্তু কিছুতেই কোন স্থায়ী ফল হয় নাই। অবশেষে যশোহর চাঁচড়ার রাজা বরদাকণ্ঠের উপদেশে বিনা তৈলে স্নান করিয়া সেই রোগ হইতে মুক্ত হই।

''২৪ বৎসর পূর্ব্বে ট্রেন ধরিবার জন্য খুব দৌড়াদৌড়ি করায় আমার হাঁপানির সূত্রপাত হয়। এই রোগে বহুদিন কষ্ট পাইয়াছি। সময় সময় হাঁপানির কষ্টে—সারা দিনরাত বসিয়া কাটাইতে হইয়াছে। অসহ্য যন্ত্রনায় অনেক সময় আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা হইত। এই অবস্থার একদিন বড় কষ্টে কাঁদিতে কাঁদিতে শেষরাত্রে একটু তন্দ্রা আসিল। তন্দ্রাঘোরে স্বপ্ন দেখিলাম যেন মহাদেব আসিয়া বলিতেছেন, ''এই কুশোর মূল ধর, ইহাতেই তোর ভাল হইবে।'' কিন্তু তন্দ্রা ভাঙ্গিলে দেখিলাম, কিছুই পাই নাই—মনে বড় দুঃখ ও ধিক্কার উপস্থিত হইল। তখন রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছে। আমি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। এমন সময় পূর্ব্বদিক হইতে একটি সন্ন্যাসীগোছের লোকে আমার হাতে একটু শিকড় দিয়া বলিলেন, ''এই কুশোর মূল ধর, ইহাতেই তোর ভাল হইবে।'' বাস্তবিক হইলও তাই—সেই ঔষধ ধারণ করিবার পর হইতে আমি আর হাঁপানি টের পাই নাই। এখন ভালই আছি।

''গত ১৩১১ সালে এই খুলনাতেই আমার রক্ত-আমাশয় ও অবিচ্ছেদী জ্বর হয়। সেবারকার অসুখ এমন সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়াছিল যে আমার আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেই আমার মৃত্যু স্থির করিয়া আমাকে শেষবিদায় দিয়াছিলেন। সেনহাটী নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিচরণ সেন তখন খুলনার ভারপ্রাপ্ত সিভিলসার্জ্জন ছিলেন। তিনি কিছুদিন দেখিয়া পরে বলিলেন, "ঘোষমহাশয়, এখন আর এখানে না থাকিয়া আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের নিকট বাড়ী চলিয়া যান''—আমি বাড়ী চলিয়া গেলাম। আমার অবস্থা দেখিয়া সকলেই নিরাশ হইলেন। কিন্তু আমার স্ত্রী (চতুর্থপক্ষের স্ত্রী) বলিলেন—"যে যাহা বলিতে হয় বলুক, আমি বলিতেছি তুমি কিছুতেই এবার মরিবে না। আমার পূর্ব্বে তুমি যাইতে পারিবে না।" বাড়ী যাইয়া ভাণ্ডারপাড়ার কবিরাজ শ্রীযুক্ত হীরালাল রায় মহাশয়কে দেখান হইল। তাঁহাকে আমি বলিলাম, "কবিরাজ মহাশয় আমার অবস্থা দেখিতেছেন, ঔষধ আপনি দিতে হয় দেন, কিন্তু পথ্যের ব্যবস্থা আমার নিজের হাতে থাকিবে। তিনি বলিলেন "সে কি কথা—তাহা কি করিয়া হইবে?'' কিন্তু আমার স্ত্রীর অনুরোধে এবং হয়ত বা আমার জীবনের আর আশা নাই—মনে করিয়াই তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন। আমি তাঁহার ঔষধ ও নিজের ব্যবস্থামতে ঠিক্‌রির ডাইল, বেগুণ দিয়া সজনার ফুল, কাঁকড়া মাছ ও ঘন আওটা দুগ্ধ পথ্য করিয়া সেই রক্ত আমাশয় ও অবিচ্ছেদী জ্বরকে দূর করিয়া দিয়া বাঁচিয়া উঠিলাম। যে বন্ধুবর্গ আমাকে শেষ বিদায় দিয়াছিলেন, আবার তাঁহাদের নিকট আসিয়া মোক্তারী করিতেছি। ইহার পর এ পর্য্যন্ত আমার আর কোন অসুখ হয় নাই।

"আমার বিশ্বাস যে নিয়ম পালন করিলে লোকে দীর্ঘ-জীবনলাভ করিতে পারে। আমি প্রত্যহই অতিপ্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া বিনাতৈলে স্নান করি। দুপুরবেলায় স্নান করিবার সময় পূর্ব্বে তৈল ব্যবহার করিতাম, কিন্তু পঞ্চাশ বৎসরের উপর হইল, আর তাহা করি না। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা বারমাস ত্রিশদিনই আমি দুইবার স্নান করি। পূর্ব্বে দৈনিক দুইবার অন্নাহার করিতাম, মধ্যে কিছুদিন রাত্রে দুধ রুটী বা লুচি খাইতাম, কিন্তু ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্ত্তী উপদেশ দেন যে 'বাঙ্গালী দুইবেলা অন্নাহার না করিলে শরীর টিকিবে না।' তাই পুনরায় ১২৭০ সাল হইতে দুইবেলাই অন্নাহার করিতেছি।

কোনও দিন খাওয়ার হ্রাস বৃদ্ধি হয় নাই, তবে স্বল্পাহারী। মৎস্য ও মাংসে যথেষ্ট স্পৃহা আছে। ঘৃত প্রত্যহ খাই। দুধ না হইলে একবেলাও চলে না। প্রতি বেলাতেই দুইসের দুধ ঘন আওটা করিয়া খাই। বর্ত্তমান কলা আমি বড় ভালবাসি। ডাইলের মধ্যে ছোলা ও ঠিকুরি আমার বড় প্রিয়। টক্ও প্রত্যহ খাই। প্রাতে ফলমূলাদি কিছু জলযোগ করি। বিকালে কাছারী হইতে আসিয়াও কিছু জলযোগ করি। ইহা-ব্যতীত ক্ষুধা পাইলেই আমি কিছু না কিছু খাই। ফল পাইলে অন্য আর কিছু খাই না। বারে বারে খাই বটে, কিন্তু যাহা খাই তাহা খুব কম পরিমাণে ভাল করিয়া চিবাইয়া খাই। আমার দাঁত একটিও পড়ে নাই। এখনও বেশ সবল ও সুস্থ আছে।

"আমার দৃষ্টিশক্তি বেশ আছে। চোখে চশমা ব্যবহার করিতে হয় না—কোনদিনও ব্যবহার করি নাই। আমি প্রত্যহই কাছারী যাই। মোকদ্দমার ছলজবাব করিতে আমার কোন কষ্ট হয় না। এই বয়সেও আমি বিনাক্লেশে ৮ মাইল হাঁটিতে পারি। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে আমি এই খুলনার নিম্নস্থ ভৈরব নদ সাঁতার দিয়া পার হইয়া আবার ফিরিয়া আসিতাম—কিন্তু এখন সাহস হয় না। রৌদ্র উত্তাপ আমি খুব সহ্য করিতে পারি। রাত্রে আমার ঘুম খুব হয়। ইচ্ছা করিলে রাত্রি জাগিতেও পারি—তাহাতে কষ্ট হয় না। দিবানিদ্রা অভ্যাস নাই। দিবানিদ্রা আয়ুক্ষয়-কারক ও তাহাতে অলক্ষ্মীর বার হয়। মাদকদ্রব্যের মধ্যে একমাত্র তাঁমাক ব্যবহার করিতাম। ১৬।১৭ বৎসর হইল, তাহাও ছাড়িয়া দিয়াছি। আমি চ্যবনপ্রাশ ঘৃত নিত্য ব্যবহার করি—সেটা মাদকদ্রব্য কিনা বলিতে পারি না। কাছারী যাইবার সময় কিম্বা স্থানান্তরে যাইবার সময় ব্যতীত প্রায় অন্য সব সময় আমি খড়ম ব্যবহার করি। পূর্ব্বে ১২ দিন অন্তর মলত্যাগ করিতাম—পরে ৭ দিন অন্তর, এখন প্রত্যহই মলত্যাগ করি। ইন্দ্রিয়দোষ আমার কোনদিনই ছিল না। এখনও নাই। স্মরণশক্তি আমার এখনও যথেষ্ট আছে।

"পশু পক্ষী পালনে ছোটকাল হইতে আমার বেশ আগ্রহ আছে। পূর্ব্বে আমি বন্দুক দিয়া বাঘ ও কুমীর শীকার করিয়াছি।

"সকলের ৫ বৎসর বয়সে হাতে খড়ি হয়—আমার তাহা হয় নাই; কারণ ৫ হইতে ৯ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমি পীড়িত ছিলাম, তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ৯ বৎসর বয়সের সময় আমি গ্রামস্থ বাঙ্গলা পাঠশালে পড়িতে যাই। তখন পড়িবার কোন নির্দ্দিষ্ট পুস্তক ছিল না। গুরুমহাশয় সমস্ত মৌখিক শিখাইতেন। প্রথমতঃ ক খ ও ফলা ও পরে শুভঙ্করীর অঙ্ক শিক্ষা দেওয়া হইত ও নামতা পড়ান হইত। সর্দ্দার পড়ুয়া আর ২।৩টী বালক সঙ্গে লইয়া একদিকে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে যে নামতা পড়াইত, আর সমস্ত বালক অন্যদিকে সারিদিয়া দাঁড়াইয়া ততোধিক উচ্চৈঃ-স্বরে আবার তাহাই পড়িত। গুরুমহাশয় বেতহাতে মধ্য-স্থলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। পড়াইতে বা পড়িতে যে বালক ভুল করিত, গুরুমহাশয়ের বেত সপাসপ্ তাহারই পিঠে পড়িত বেত্রহস্ত গুরুমহাশয়কে আমরা যমের মত ভয় করিতাম। ইহার কিছুকাল পরে দেশে সার্কেল স্কুলের সৃষ্টি হইল। বছর তিনেক পাঠশালে পড়িয়া ১২ বৎসর বয়সে পাঁজিয়া গ্রামে যাইয়া একটু ইংরাজি ও পারসি পড়িতে আরম্ভ করি। তখনও দেশে পারসির আদর ছিল। কিন্তু পড়াশুনা আমার অদৃষ্টে ছিল না, তাই এই সময় আমার মধ্যমভ্রাতার মৃত্যুশোকে পিতা শয্যাশায়ী হইলে আমি লেখাপড়া ত্যাগ করিয়া তাঁহার সেবাশুশ্রূষার জন্য বাড়ী আসিয়া বসিলাম। আমার লেখাপড়া এই পর্য্যন্ত শেষ হইল। পিতা আর উঠিলেন না-আমার যখন ২৩।২৪ বৎসর বয়স তখন তাঁহার মৃত্যু হইল—আমিও অবসর হইলাম, কিন্তু তখন ত আর আমার পড়াশুনার বয়স ছিল না। তাই চাকুরীর চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

"তখনকার লোকে চাকুরীটা বড় সম্মানের মনে করিতেন না—চাকুরীর বাজারও এত কড়া ছিল না। বিশেষতঃ আমার দাদা নীলমণি ঘোষ তখন যশোহরের একজন প্রধান মোক্তার ছিলেন। সুতরাং আমার মত পণ্ডিতেরও এক চাকুরী জুটিয়া গেল। আমার প্রথম চাকুরী হইল চিরুলিয়া মধুদিয়া ও রাংদিয়া পরগণা ত্রয়ের নায়েবী। এখানে দুই বৎসর থাকিয়া পরে ৮।১০ বৎসর যাবৎ রেলি-সাহেবের কুটী, সিন্দুরিয়াকুটী প্রভৃতির নায়েবী কার্য্য করিয়াছি। ইহার পর যশোহর ফৌজদারী আদালতে কিছুদিন মোহরের কার্য্যও করিয়াছিলাম।

"এই সময় আমার দাদার মৃত্যু হয়। দাদার বহু মক্কেল

আমাকে মোক্তার হইতে অনুরোধ করিলে ১২৭০ সালে আমি মোক্তারী আরম্ভ করি। তখন মোক্তার হইতে হইলে কোন পরীক্ষা দিতে হইত না। মাথায় পাগ বাঁধিয়া আদালতে উপস্থিত হইলেই হইত। ১৮৬৫ সালের ১লা জানুয়ারীর ২০ আইন অনুসারে প্রথম মোক্তারী পরীক্ষার সৃষ্টি হইল। পূর্ব্ববর্ত্তী "পাগবাঁধা" মোক্তারগণকে জেলার জজসাহেব পরীক্ষা করিয়া, তাহাদিগের মধ্যে উপযুক্ত লোক বাছিয়া সনন্দ দিতেন। আমাকেও সেই পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। তখন জজ ম্যাজিষ্ট্রেট ও সদরওয়ালা নূতন পরীক্ষার্থীদিগের পরীক্ষা লইতেন। লিখিত ও মৌখিক উভয় প্রকারেই গৃহীত হইত। প্রথম কয়েক বৎসর ২৪ পরগণা, বরিশাল এমন কি ঢাকা হইতেও পরীক্ষা দিতে লোক যশোহরে আসিত। কেন আসিত এখন বলিতে পারি না, ঐ সব স্থানে পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল কিনা তাহাও বলিতে পারি না। ধুতি, চাপকান্ ও হাতে বাঁধা পাগড়ি তখনকার মোক্তারদিগের পোষাক (uniform) ছিল।

"আমি মোক্তারী ও রেভেনিউ পরীক্ষায় পাশ করিলাম, ১৮৬৬ সালের ৫ই জুন। যশোহরে আমি ২০ বৎসর মোক্তারী করিয়াছি। পরে ১৮৮২ সালের জুনমাসে খুলনা জিলা হওয়ায় ঘরজিলা বলিয়া এখানে আসিয়া কার্য্য করিতেছি।

"পূর্ব্বে যশোহরে ৮টা কাজির আদালত ছিল। প্রত্যেক কাজির মাসিক বেতন ছিল ২৫৲ টাকা ; তাঁহারা ছোট ছোট ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিতেন। দায়রায়ও ঐ কাজীদের দুই জন আসেসর হইতেন।

"আমার ছোটকালে চাউল ১৲ টাকা, তৈল ৩৲ টাকা লবণ ১৲—১॥০ মন বিক্রয় হইত। লবণ তখন দেশেই তৈয়ারী হইত। পূর্ব্বের লোকে এখনকার লোকের অপেক্ষা সরল ও সত্যবাদী বেশী ছিলেন।

"আমার সময় নীলকুটীরে সাহেবগণ প্রকৃতই অত্যাচারী ছিলেন। দাদন লইলে আর কাহারও রক্ষা থাকিত না— একেবারে ভিটামাটী উৎসন্ন যাইত।

"যশোহর ও খুলনায় আমার সমসাময়িক কেহই জীবিত নাই।

"পারিবারিক জীবনে আমি সুখী নহি। এক এক করিয়া আমি চারিটি বিবাহ করিয়াছি। প্রথম তিনস্ত্রীর কোন ছেলেপেলে হয় নাই। শেষ পক্ষের ৩টি ছেলে ও ৪টি মেয়ে হইয়াছিল। তন্মধ্যে মাত্র দুইটি মেয়ে জীবিত। বড় মেয়ে মনোরমার কাটীপাড়ায় শ্রীমান ভূপতি বসুর সহিত বিবাহ হইয়াছে।—তাহার একটি ছেলে মাত্র। ছোট-মেয়ে সুশীলার বিবাহ হইয়াছে বাসাবাটী, শ্রীমান জনার্দ্দন নাগের সহিত—তাহার ৩টি ছেলে ও ২টি মেয়ে বর্ত্তমান।

"ধর্ম্মমতে আমি হিন্দুশাক্ত, এখনও দীক্ষিত হই নাই, তবে গুরুর প্রতি ভক্তি আছে। আমি কিছুদিন পরে কাশীধাম যাইব, ইচ্ছা আছে। আমি এখনও আরও কয়েক বৎসর বাচিব, এ বিশ্বাস আমার আছে।"

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

নীচ ও উচ্চ।

(সংগৃহীত)

করুক যতই উচ্চে গৃধ্র বিচরণ,
নিবদ্ধ তাহার দৃষ্টি গো-শ্মশান পানে
নীচাত্মা যতই বিদ্যা করুক অর্জ্জন,
ঘৃণিত লালসা তারে নীচেতেই টানে।

নিয়ে ভূমিতলে যত করুক নিবাস
ভরত পক্ষীর দৃষ্টি উর্দ্ধপানে ধায়
মহাপ্রাণ হোক্ কেন মূখ অপ্রকাশ
চিত্ত তার স্থিত উচ্চে মহামহিমায়।

শ্রীকালিদাস রায়।

বঙ্গীয় সামাজিক হিতসাধন মণ্ডলীর প্রদর্শনী।

(স বনী হইতে উদ্ধৃত)

শিক্ষাপ্রসঙ্গ।

সংখ্যামূলক ও অপর নানা প্রকার চিত্রদ্বারা হিতসাধন মণ্ডলী কলিকাতার অধিবাসীদের সম্মুখে শিক্ষা স্বাস্থ্য বাণিজ্য কৃষি প্রভৃতি বিষয় স্পষ্ট করিবার জন্য এক প্রদর্শনী করিয়াছিলেন। প্রায় ২ সপ্তাহকাল ঐ প্রদর্শনী খোলা ছিল। কলিকাতার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিমাত্র ঐ প্রদর্শনীতে গমন করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। সাধারণের অবগতির জন্য আমরা উহার তথ্য ক্রমশঃ প্রকাশ করিব। উক্ত প্রদর্শনী ভারতবাসীর বিশেষতঃ বঙ্গদেশবাসীর শিক্ষার দুর্গতি যেন চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। শিক্ষার প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ সকলের তলায় পড়িয়া রহিয়াছে, চিত্রে অতি সুন্দরভাবে তাহা অঙ্কিত করিয়া দেখান হইয়াছে। ভারতে শতকরা ৫ জনের মাত্র অক্ষর পরিচয় হইয়াছে। অন্যদেশ ভারতবর্ষের কত উর্দ্ধে রহিয়াছে। ১০০ জন মধ্যে :—

আমেরিকায় ৯৯.২ ; ইংলণ্ডে ৯৯ ; জাপানে ৯৫ জনের অক্ষর পরিচয় হইয়াছে, ঐ স্থানে ভারতবর্ষে ৫ জন মাত্র। বাঙ্গালীর মূর্খতাও অতি ভয়ঙ্কর, বঙ্গদেশে এতকালে শতকরা ৭.৭ জনের বর্ণশিক্ষা হইয়াছে।

ভারতবর্ষের মধ্যে দেশীয় নৃপতিদের রাজ্যে কোন্ কোন স্থানে শিক্ষার কিঞ্চিৎ উন্নতি হইয়াছে :—

শতকরা—ত্রিবাংকুরে ১৫ জনের ও বরদায় ১০ জনের বর্ণবোধ আছে। ব্রিটিশ ভারত ইহাদের তুলনায় শিক্ষায় বহু পশ্চাতে রহিয়াছে।

বঙ্গদেশ।

বঙ্গদেশের অবস্থা কি। এই দেশের ৭ জন পুরুষের মধ্যে ৬ জনে এবং ৯৯ জন স্ত্রীলোক মধ্যে ১ জনে অক্ষর পড়িতে জানে। এই দেশে কোন ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে শিক্ষা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা দেখুন। ১০০ জন মধ্যে

হিন্দু	১১.৮	ব্রাহ্ম	৭৮.২
মুসলমান	৪.১	খৃষ্টান	৪৬.৪

জনের অক্ষর পরিচয় হইয়াছে। অন্যভাবে বঙ্গদেশে কোন জাতির মধ্যে লেখাপড়া কতদূর প্রসার লাভ করিয়াছে নিম্নের তালিকায় তাহা দেখুন :—শতকরা

বৈদ্য	৭১.৯	ব্রাহ্মণ	৬৪.৩
ব্রাহ্ম	৮৬.৬	কৈবর্ত্ত	২০.৭
কায়স্থ	৫৬.৮	নমঃশূদ্র	.০৯

১৯১১ সালের আদমসুমারী অনুসারে উক্ত হিসাব দেওয়া হইয়াছে। তখন এই দেশে বৈদ্য ৮৮৩২৪, ব্রাহ্মণ ১১৮৫১৭০ ব্রাহ্ম ১৫২৯, কৈবর্ত্ত ২০[illegible]৬১২৯, কায়স্থ ১১০৭৩৩১ এবং নমঃশূদ্র ১৮৬০৭০৫ ছিল।

বঙ্গদেশে ১০০ জন মধ্যে ১ জন ইংরাজী ভাষায় কথা বলিতে পারে।

জাপান ও ভারতবর্ষ।

ভারতবর্ষকে জাপানের সহিত তুলনা করিলে এই দেশের দুর্গতি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। জাপানে ১০০ জন বালক মধ্যে ৯৯ জনে এবং ১০০ জন বালিকা মধ্যে ৯৮ জনে পড়িতে জানে, ভারতবর্ষ ১০০ বালক মধ্যে ২৩ এবং ১০০ বালিকা মধ্যে ৩ জনে পড়িতে শিখিয়াছে।

বঙ্গের জিলা অনুসারে হিসাব।

বঙ্গদেশের জিলাগুলিতে শতকরা কত জনে লেখাপড়া শিখিয়াছে তাহা দেখিয়া প্রত্যেক জিলা স্ব স্ব মূর্খতার পরিমাণ বুঝিয়া লউন :—

১।	দারজিলিং	১০	২।	জলপাইগুড়ি	৬
৩।	কোচবিহার	৭।০	৪।	দিনাজপুর	৬
৫।	রঙ্গপুর	৪।০	৬।	মালদহ	৫
৭।	রাজসাহী	৫	৮।	বগুড়া	৬
৯।	ময়মনসিংহ	৫	১০।	ঢাকা	৮
১১।	পাবনা	৫	১২।	নদীয়া	৬
১৩।	মুর্শিদাবাদ	৬	১৪।	বীরভূম	৮
১৫।	বর্দ্ধমান	১০	১৬।	বাঁকুড়া	৯
১৭।	মেদিনীপুর	৯	১৮।	হুগলী	১১

১৯।	হাওড়া	৩০	২০।	চব্বিশপরগণা	১২
২১।	যশোহর	৭	২২।	ফরিদপুর	৬
২৩।	খুলনা	৮	২৪।	বরিশাল	৯
২৫।	নোয়াখালি	৬	২৬।	ত্রিপুরা	৭
২৭।	পার্ব্বত্য ত্রিপুরা	৪	২৮।	পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	৭
২৯।	চট্টগ্রাম	৬	৩০।	কলিকাতা	৩২

বিভিন্ন জাতির শিক্ষার উন্নতি।—ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণেতর হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার কিরূপ প্রসার হইতেছে ইহা অবগত হইবার জন্য বাবু ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ব্যবস্থাপক সভায় এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তদুত্তরে বলিয়াছে :—

বিদ্যালয়ে——	ব্রাহ্মণ ছাত্র	ব্রাহ্মণেতর হিন্দু ছাত্র	মুসলমান ছাত্র
১৯১২	২৮৫০৫	১৬৩০৪৬	২২৯৯৭২
১৯১৩	২৯১১২	১৬৯৮০৬	২৩৬২৫৯
১৯১৪	২৯৬১০	১৭০৯৩৫	২৫৭৭৫৫
১৯১৫	৩০৬৯৪	১৭৩৩৮৯	২৬৯২৩৪
১৯১৬	৩২৬৫৩	১৮১২০৩	২৮৩৫৩০

অনেকেই বলেন বঙ্গদেশে হিন্দুদের মধ্যে যেমন বিদ্যা চর্চ্চা হইতেছে মুসলমানদের মধ্যে তেমন নয়। জন সংখ্যার তুলনায় তেমন হয় নাই বটে, কিন্তু মোটের উপর স্কুলের ছাত্র সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানই বেশী। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন। ১৯১২ সালে মুসলমান ছাত্র সংখ্যা যত ছিল, ১৯১৬ সালে তাহা অপেক্ষা ৫৩৬১ বেশী হইয়াছে। ব্রাহ্মণেতর হিন্দু সংখ্যা ১৮১৫৭ ও ব্রাহ্মণ ছাত্র সংখ্যা ৪১৪৮ বাড়িয়াছে। বিদ্যাশিক্ষার জন্য মুসলমানদের মধে যে উৎসাহ দেখা যাইতেছে, তাহাতে শীঘ্রই মুসলমান ছাত্র সংখ্যা হিন্দুর দ্বিগুণ হইবে। হিন্দু সাধারণতঃ নির্ব্বীর্য্য ও অলস, মুসলমান তেজীয়ান ও কর্ম্মী। এই পার্থক্য হেতু হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের উন্নতি দ্রুততর হইতেছে।

নারী-প্রসঙ্গ।

বৈধব্য

ভারতে মোট নারী-সংখ্যা ১৫ কোটি ২৯ লক্ষ ৯৬ হাজার ৯১৯। এতন্মধ্যে ২ কোটি ৬৪ লক্ষ ২১ হাজার ২৬২ জন বিধবা। অর্থাৎ ৬ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে ১ জন বিধবা। শতকরা ১৭·৩ বিধবা।

বিবাহ ও বৈধব্য।

নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বাল্য ও শিশু-বিবাহের ভীষণতা স্পষ্ট হইবে।

১৫ বছরের নীচে ৯০, ৭৭, ৬৭৭
১০ „ „ ২৫, ২২, ২০৩
৫ „ „ ৩, ০২, ৪০৫ বিবাহ হইয়াছে।

নিম্নলিখিত তালিকা বাল্যবিধবাদের সংখ্যা জ্ঞাপন করিবে :—

৫ বছরের নীচে ১৭, ৭০৩।
১০ „ „ ১, ১১, ৯৭৩।
১৫ „ „ ৩, ৩৫, ০১৫।

কলিকাতা নগরের পতিতা।

১৯১১ সালের আদম স্থমারি অনুসারে কলিকাতা নগরে ১২৮৪৮ জন পতিতা নারী বাস করিতেছে। ১৯১৮ সালে ঐ সংখ্যা ১৬০০০ হইয়াছে। এই নগরে ১০ বছরের নিম্ন বয়স্ক ১০৯৬ বালিকা ঐ বৃত্তি শিক্ষা পাইতেছে। কলিকাতার ২০ হইতে ৫০ বর্ষ বয়সের যত স্ত্রীলোক আছে তাহার ১২ জনের মধ্যে ১ জন পতিতা।

নগরে নারী সংখ্যা।

নগরে স্ত্রী পুরুষ সংখ্যায় বৈষম্য দৃষ্ট হয়। বোম্বাইনগরে ১০০০ পুরুষে ৫৩০ জন স্ত্রী, হাওড়ায় ১০০০ পুরুষে ৫৬ জন স্ত্রী বাস করিতেছে। কৃষ্ণনগরে নরনারীর সংখ্যা তুল্য।

কুলি চালানে নারী-সংখ্যা।

কুলি চালানে প্রত্যেক ৫ জন পুরুষে ২ জন স্ত্রী চালান দেওয়া হয়। ইহার ফলে নারীদের অনেকে পতিতা হয়।

ভারতবাসীর বৃত্তি।

ভারতবর্ষে শতকরা :—

শিল্পী	১০	বণিক	·২
কৃষক	৭০	ভিক্ষুক	১৩
ছোট দোকানদার	৬	যাজক বা পুরোহিত	·৯

অর্থাৎ ৩ কোটী ১৫ লক্ষ শিল্পীর, ৭ লক্ষ ৪৪ হাজার ৭০৪ বণিকের, ১৯ কোটি ১৬ লক্ষ ৯১ হাজার ৭৩১ জন কৃষকের, ৪২ লক্ষ ২২ হাজার ২৪১ জন ভিখারির, ১৮ লক্ষ ৩৪ হাজার ৯৫৮ জন ক্ষুদ্র দোকানীর এবং ২৭ লক্ষ ২৮ হাজার ৮১২ জন পুরোহিতের বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে।

যৌথ কারবার।

১৯০২ সালে ভারতে :—

১৩৭৮টা যৌথ কারবারে ৩৭ কোটী ৯০ লক্ষ ৯৯ হাজার ৬৯৫ টাকা খাটিত। ঐ কারবার বাড়িয়া ১৯১২ সালে কারবার সংখ্যা ২৪০৯ এবং মূলধন ৬৯ কোটী ৩ লক্ষ ৫৭ হাজার ৪৮০ টাকা হয়।

মৃত্যু।

এই কলিকাতা নগরে গড়ে ৩১০ বোম্বাই নগরে ভদ্র পল্লীতে ৩১০, নগরের ইতর সাধারণদের অঞ্চলে ৪৫৫ জন্ম মরিতেছে, লণ্ডন নগরে হাজারে কেবল ১০০ মরে।

মৃত্যুর সংখ্যায়ও বাঙ্গালী পৃথিবীর অন্য সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের অন্য সকল প্রদেশে জন্ম হার মৃত্যু হইতে অধিক কিন্তু বঙ্গদেশে যত মরে তত জন্মে না। ভারতবর্ষের মৃত্যুহার ফ্রান্সের ২ গুণ, ডেনমার্কের ৩ গুণ, সুইডেনের ৩ গুণ এবং ইংলণ্ডের ২ গুণ।

গ্রেট ব্রিটনে শতকরা	১৫.৪	জর্ম্মণী	১৮.৪
ফ্রান্স	১৯.৭	ভারতবর্ষে	৩২.০১

১৯১৫ সালের ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে হাজার করা জন্ম মৃত্যুর তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল, উহা হইতে দেখা যাইবে যে বাঙ্গালী মৃত্যুরদিকেই চলিয়াছে, অন্য প্রদেশের লোক-সংখ্যা মোটের উপর বাড়ে, কেবল বঙ্গদেশেই বাড়ে না।

হাজার করা হিসাব।

	জন্ম	মৃত্যু
বঙ্গদেশ	৩১	৩২
বিহার	৪০ এর বেশী,	৩২ এর নীচে
আসাম	৩২ এর উপর,	৩০ এর কাছাকাছি
মান্দ্রাজ	৩০	২০
পাঞ্জাব	৪৫	৩৫
যুক্ত প্রদেশে	প্রায় ৪৫	৩০ এর নীচে
মধ্যপ্রদেশও	প্রায় ৫০	প্রায় ৩৫
উত্তর ব্রহ্মদেশ	৩৫ এর উপর	৩০ এর উপর
নিম্ন ব্রহ্মদেশ	৩০ এর উপর	২৫ এর নীচে

মৃত্যু ও চিকিৎসা।

যে দেশে এতলোক মরে সে দেশে সর্ব্বত্রই চিকিৎসক থাকা উচিত কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে ভারতবর্ষের একের তিন অংশ স্থানের লোকেই চিকিৎসকের সহায়তা পায় না। এই দেশের লোক সাধারণতঃ বসন্ত কলেরা আমাশয় প্লেগ ও জ্বরে বেশী মরে।

শতকরা হিসাব।

জ্বরে	১৭.৬৩ মৃত্যু	প্লেগ	৩.০৭
কলেরা	১.৪৮	আমাশয়	১.০৬
বসন্ত	.২৫		

অর্থাৎ ভারতবর্ষে জ্বরে প্রতিবৎসর প্রায় ৪ কোটি ২০ লক্ষ ৭৩ হাজার, প্লেগে ৭ লক্ষ ৩৩ হাজার, কলেরায় ৩ লক্ষ ৫৪ হাজার, বসন্তে ৫৮ হাজার ৫ শত মরিয়া থাকে।

কলিকাতা নগরের মৃত্যুর সংখ্যা।

প্রধান প্রধান রোগে কলিকাতা নগরে ১৯১৫ ও ১৯১৬ সালে যত লোক মরিয়াছে তাহার তালিকা এই :—

রোগ	১৯১৫।	১৯১৬।
ব্রঙ্কাইটিস	৩১৫০ প্রায়	৩১৫০ প্রায়
বসন্ত	২৩৫০	২৩৫০ প্রায়
যক্ষা	১৫০০	প্রায় ১৫০০
আমাশয়	১৬৫০	১৯৫০
কলেরা	১৩৫০	১৩৫০
জ্বর	১৩৫০	প্রায় ১৩৫০
ম্যালেরিয়া	১২০০	১৩৫০
নিউমোনিয়া	৯০০ প্রায়	প্রায় ১০০০
টিটেনাস অর্থাৎ ধনুষ্টঙ্কার	৯০০ এর উপর	৭৫০ এর উপর
প্রসব জন্য	প্রায় ৪৫০	প্রায় ৪৫০

ভারতে শিশু-মৃত্যু।

ইংলণ্ডে শিশু মৃত্যু কমিয়াছে। ১৯১৬ সালে এক বছর ও তাহার নীচের হাজার শিশুর মধ্যে ৯১ জন মরিয়াছে। ঐ স্থলে এই কলিকাতা নগরে প্রত্যেক হাজারে ৩১০ জন শিশু মরে। অর্থাৎ কলিকাতা সহরে এক বৎসর পার না হইতেই ৯টি শিশুর মধ্যে ৩টি মরে।

পাইওনিয়র বলেন যে, জ্ঞানের প্রসার, অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও সমাজ হিতৈষীদের শুভ প্রচেষ্টার ফলেই ইংলণ্ডে শিশুদের অতিমৃত্যু নিবারিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের শিশুদের অতিমৃত্যুতে পাইওনিয়র আতঙ্ক প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ

অতিমৃত্যুর হিসাব পড়িলে প্রত্যেক বুদ্ধিজীবীরই ভীত হইবার কথা।

কলিকাতার যোড়াসাঁকো ও বড় বাজার অঞ্চলে যত শিশু জন্মে উহার মধ্যে হাজার করা ৬৭৫ জন এবং আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীটে ও রাধাবাজারে ৫০৫ মরিয়া থাকে। লণ্ডনে ১ হাজারে ১ শত জন মাত্র শিশু মরে। কলিকাতা-নগরে শিশু মৃত্যু অতি ভীষণ সমস্যা। এই নগরে ৯ জন শিশু জন্মিলে ৩ জন মরিবেই তাহা একরূপ জানা কথা। ভারতবর্ষে নানা অঞ্চলের শিশুমৃত্যুর সহিত ইয়োরোপের কতিপয় রাজ্য ও জাপানের মৃত্যু তুলনা করুন :—

হাজার করা শিশু মৃত্যু :—

ইংলণ্ড	১২৭	স্কটল্যাণ্ড	১১৬
ফ্রান্স	১৩২	জর্ম্মণী	১৮৬
অষ্ট্রীয়া	২০৭	রুষিয়া	২৬০
জাপান	১৬০	বঙ্গদেশ	২১০
মাদ্রাজ	১৯৯	বোম্বাই	৩২০
পাঞ্জাব	৩০৬	যুক্তপ্রদেশ	৩৫২
বিহার	৩০৪	ব্রহ্মদেশ	৩৩২

অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা ইংলণ্ডের ২৷৷, ৩, কি ৪ গুণ।

ভারতবর্ষের কি পল্লী, কি নগর, কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, কি ধনী, কি নির্ধন কোথায়ও কেহ শিশুদের প্রাণ রক্ষার জন্য কোন প্রকার সুব্যবস্থা করেন না, অথচ আমাদের মত সন্তান-স্নেহপ্রবণ জাতি আর নাই। আমাদের স্নেহটা ভাবে প্রকাশ পায়, কার্য্যে নহে। আমাদের স্নেহ চক্ষের জলে, রোগ নিবারণে নহে।

আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশে মাতারা কিরূপ গৃহে সন্তান প্রসব করেন তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। পল্লীগ্রামে সন্তান প্রসব জন্য "আতুর ঘর" নামক অতি ক্ষুদ্র স্যাঁতস্যাঁতে যে ঘর প্রস্তুত করা হয় উহাতে আলোক ও বায়ু প্রবেশের কোন ব্যবস্থা নাই। ঐরূপ ঘরে পরিবারের সুস্থ ও বলিষ্ঠ লোককে বাস করিতে হইলে তাহারও স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইবার কথা। এইরূপ ঘরে নবজাত শিশু ও প্রসবক্লিষ্টা জননীকে বাস করিতে হয়। জননীরা এই ঘরেই অনেক শিশু হারাইয়া থাকেন।

তার পরে অশিক্ষিতা ধাত্রীদের দোষে অনেক শিশু মরিয়া থাকে। সদ্যোজাত শিশুর নাড়ী ছেদন করিতে হয়। অশিক্ষিতা ধাত্রীরা যে ছুরির দ্বারা উহা ছেদন করে তাহা গরম জলে ভিজাইয়া কিংবা কোন ঔষধ দ্বারা শোধন করিয়া লয় না। উহা তাহারা জানে না। অনেক সময়ে ছুরির পরিবর্ত্তে বাঁশের চটা দ্বারাও নাড়ী ছেদন করা হয়। তাহা আরও ভয়ানক। এই ক্রিয়ার সময়ে অনেক শিশুর অঙ্গে বিষ প্রবেশ করে এবং শিশু উহারই ফলে ধনুষ্টঙ্কার রোগে প্রাণত্যাগ করে। অশিক্ষিতা ধাত্রীদের দোষে অনেক জননীকে "আতুর ঘরেই" বক্ষের নিধি শিশুরত্নকে হারাইতে হয়।

ভারতবর্ষের বড় বড় নগর গুলিতে শিশু মৃত্যু আরও অধিক। হাজার করা কলিকাতায় ৩১০, বোম্বাইতে ৩৮৮, বোম্বাই নগরের ইতর অংশে ৪৫৫, নৈনীতালে ৩৪৮ জন মরে। লোক-বহুল নগরের সাধারণ বাড়ীগুলিতে বিশুদ্ধ বায়ু দুর্লভ। এইরূপ স্থান গৃহের আলোকহীন বাতাস-হীন জঘন্যতম কক্ষে জননীকে সন্তান প্রসব করিতে হয়। সুতরাং মুক্ত আকাশের আলোক দর্শনের পূর্ব্বেই নগরের শিশুরা ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করে।

শিশুদের এই অতিমৃত্যু নিবারণ প্রত্যেক সমাজ হিতৈষীর চিন্তার বিষয় হউক। এই অমঙ্গলের প্রতি দেশের প্রত্যেক লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য ব্যূহবদ্ধ চেষ্টার প্রয়োজন।

ভারতবাসীর আয়।

ভারতবাসীর আয় দিন দিন কিরূপ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে "Prosperous British India" গ্রন্থে উইলিয়ম ডিগবী সি, আই, ই তাহা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনার ফল তিনি সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারতবাসীর মাথাপিছু দৈনিক আয়।

১৮৫০ সালে (সরকারী হিসাবমতে)	৵০
১৮৮২ সালে (সরকারী গণনামতে)	৴১০
১৯০০ সালে (সর্ব্বপ্রকার গণনা দ্বারা)	৻১৫

পয়সার কম।

মিঃ ডিগ্‌বী এই হিসাব যেরূপভাবে করিয়াছেন তাহা নিম্নে দেখান গেল :—

কৃষির আয়।

১৯০০ সালে বঙ্গের লোকসংখ্যা ৪ কোটি ৯৮ লক্ষ ৮ হাজার ৬৪৭ ছিল; কৃষি হইতে মোট আয় ৮০ কোটি ৮৯ লক্ষ ৫৭ হাজার ২ শত টাকা। ইহাতে মাথা পিছু আয় বার্ষিক ১৬।০ টাকা হয়। এইরূপে ভারতের সকল প্রদেশের মাথাপিছু বার্ষিক কৃষি আয় বাহির করা হইয়াছে। উহা এই:—

বাঙ্গালা	১৬।০	মাদ্রাজ	১১॥/০
বোম্বাই	১৯॥৵০	উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা	২০৮/০
পঞ্জাব	১২/০	মধ্যপ্রদেশ	১৭।০
ব্রহ্মদেশ	২৪৮৵০	আসাম	২৬৮০

এই সকল প্রদেশের সব মোট অধিবাসীর সংখ্যা দ্বারা মোট কৃষি আয়কে ভাগ করিলে আয় মাথাপিছু বৎসর ১৭৲ টাকা দাঁড়ায়।

অপর আয়।

কৃষি ভিন্ন অপর যে সকল প্রকারে অর্থাগম হইতে পারে উহা হইতে মাথাপিছু কোন্ প্রদেশে কত আয় হয় তাহা এই।—

বঙ্গদেশ	১২৮/০	মাদ্রাজ	১৮/০
বোম্বাই	৪৭৮৵০	উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা	১০৮৶০
পঞ্জাব	১৩৮/০	মধ্যপ্রদেশ	১৮৲
ব্রহ্মদেশ	৭৲১৫	আসাম	৯৲

মোট আয়কে লোকসংখ্যার দ্বারা ভাগ করিলে এই আয় মাথাপিছু বার্ষিক ২৪॥৶০ হয়।

উপরে যে আয় দেখান হইল উহা হইতে শাসন ও সামরিক ব্যয় বাদ দিয়া ব্রিটিশ ভারতের ২২ কোটি ৬৫ লক্ষ লোকের বার্ষিক আয় ৩৪০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা হয়। অর্থাৎ মাথাপিছু বার্ষিক আয় ১৫৮৫ পনর টাকা বারো আনা এক পয়সা হয়। ইহাতে মাথাপিছু দৈনিক আয় ৲১৫ তিন পয়সারও কম হয়।

সামাজিক হিতসাধনমণ্ডলীর প্রদর্শনীতে ভারতবাসীর বার্ষিক মাথাপিছু আয় ৩ শত বলা হইয়াছে। উহা হইতে লোকের মনে আমাদের যথার্থ অবস্থা সম্বন্ধে ভুল ধারণা জন্মিতে পারে বলিয়া আমরা উপরের হিসাব উপস্থিত করিলাম।

ভারতবর্ষের জনকরা বার্ষিক আয় ৩ শত টাকা ধরিয়া হিতসাধনমণ্ডলী গত প্রদর্শনীতে যে চিত্রদ্বারা অপর দেশসমূহের আয়ের তুলনা করিয়াছেন আমরা উহা ভ্রান্ত বলিয়া মনে করি।

মিঃ ডিগ্‌বী তাঁহার গ্রন্থের প্রারম্ভে ১৯০০ সালের পৃথিবীস্থ নানা দেশের তুলনামূলক রেখা চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। উহাতে তিনি সকল দেশের আয়ই স্থূলতঃ পাউণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের আয় ১৫৮৫ উহা ১ পাউণ্ডেরই মত। অপর দেশসমূহের আয় ভারতবর্ষের কত গুণ তাহা নিম্ন তালিকা হইতে বুঝিয়া লউন:—

ভারতবর্ষ	১ পাউণ্ড।	ইংলণ্ড	৪৫ পাউণ্ড।
রুষিয়া	১১ "	ইটালী	১২ "
অষ্ট্রীয়া	১৫ "	স্পেন	১৬ "
সুইজারল্যাণ্ড	১৯ "	নরওয়ে	২০ "
হল্যাণ্ড	২২ "	জর্ম্মণী	২২ "
কানাডা	২৬ "	ফ্রান্স	২৭ "
মার্কিন যুক্তরাজ্য	৩৯ "	অষ্ট্রেলিয়া	৪০ "

পৃথিবীর কোন দেশে কত গম জন্মে।

মার্কিন যুক্তরাজ্য প্রায় ১৬৬১৫০,০০০ মণ।
রুষিয়া ১৪২৩৭৫,০০০ মণ; ফ্রান্স ৭৭৬২৫,০০০।
অষ্ট্রীয়হাঙ্গারী ৫৭৩২৫,০০০; ভারতবর্ষ ৫৭২৭৫,০০০।
ইটালী ৩৭৭০০,০০০; জর্ম্মণী ৩৪৬,০০,০০০।
ইংলণ্ড ১৪৪২৫,০০০।

শিক্ষার বিস্তার।

প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান দেশসমূহে ৫ জনে একজন স্কুলে যায়—শতকরা ২০'৬।
এসিয়ায় ১০০ জনে ১ জন—শতকরা '১।
চীনে ২৫০ জনে ১ জন শতকরা '৪।
ভারতবর্ষে ৫০ জনে ১জন—শতকরা ২।

বঙ্গের গৃহপালিত পশু ও লাঙ্গল।

১৯১১ সালে বঙ্গদেশে—

ষাঁড়	৪৪২১০৩	গাভী	৪৩৭৬৫৩১
মহিষ	২৩৪৬৬০	লাঙ্গল	২২৮৬২৭০০

পৃথিবীর গাভী।

ভারতবর্ষ	৯,১৩,৬৬,৩৬১।
মার্কিন যুক্ত রাজ্য	৭,১২,৬৭,০০০।
রুষিয়া	৪,৩২,০৪,০০০।
জর্ম্মণী	২,০৫,৮৯,০০০।
অষ্ট্রোহাঙ্গারী	১৬,২৪,৯৩১।
ফ্রান্স	১,৪১,১০,৪৮০।
গ্রেটব্রিটন	১,১৬,৯৬,৯৬৩।

নদীয়ার নদীতে নৌকা।

১৯০৯।১০	১৭২৩১	১৯১০।১১	১৭৫৭২
১৯১১।১২	১৭০৮০	১৯১২।১৩	১৬১০০
১৯১৩।১৪	১৩১১৩	১৯১৪।১৫	৯০৬৭

নৌকার ব্যবহার ক্রমশঃ কমিতেছে।

কো-অপারেটিভ সোসাইটী।

নিম্নলিখিত তালিকায় ১৯০৭ সাল হইতে ৯১৭ সাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের কো-অপারেটিভ সোসাইটী সমূহে যত টাকা গচ্ছিত হইয়াছে তাহা দেখান হইয়াছে :—

১৯০৭	১৮,০৫৬ টাকা।	১৯০৮	৩৩,১৮৬ টাকা
১৯০৯	৪৬-১৩৭ „	১৯১০	১,১৯,৭৫৩ „
১৯১১	১,৯৫,৭২৭ „	১৯১২	৫,৩৬ ৯৮১ „
১৯১৩	৭,৭১,০৮৫ „	১৯১৪	১২,৪৯,৪৭১ „
১৯১৫	১৪,৯৯,০২০ „	১৯১৬	১১,৯৮,৫৫৮ „
১৯১৭	১৪,১৯,৩৩১ „		

মোট কারবার।

১৯১৭ সালে বঙ্গদেশে কো-অপারেটিভ কারবারে মোট ১ কোটি ৫০ লক্ষ মুদ্রা খাটিয়াছে।

কো-অপারেটিভ সোসাইটির মজুত টাকা।

১৯০৭	১২,৭৮৯ টাকা।	১৯০৮	২৪,২৬০ টাকা।
১৯০৯	২৮,৯৭৩ „	১৯১০	৬৫,০৩৭ „
১৯১১	১,২১,১৬৩ „	১৯১২	১,৬০,৬৫৩ „
১৯১৩	২,৮১,৫৭৯ „	১৯১৪	৪,১৯,৮৯১ „
১৯১৫	৫,৯৫,০৭৫ „	১৯১৬	৮,২৪,৬২১ „
১৯১৭	১০,৬৬,৯৭২		

সভ্যসংখ্যা।

১৯০৭ সাল হইতে ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত ১১ বৎসরে বঙ্গে কো-অপারেটিভ সোসাইটি সমূহে সভ্যসংখ্যা ১ লক্ষ ৫ হাজার হইয়াছে।

বঙ্গের অধিবাসীদের ধর্ম্ম।

হিন্দু ২ কোটি ৪ লক্ষ।	মুসলমান ২ কোটি ৪২ লক্ষ।
বৌদ্ধ ২॥ লক্ষ।	খৃষ্টান ২ লক্ষ ৩৩ হাজার।
জড় পূজক ৭ লঃ ৩৩ হাঃ।	জৈন ৭ হাজার।
ব্রাহ্ম ৩ হাজার।	শিখ ২ হাজার।
অপর ধর্ম্মাবলম্বী ১ হাজার।	

জন-সংখ্যা ও জনকরা আয়।

পৃথিবীর কতিপয় রাজ্য।

চীন—জনসংখ্যা ৪০ কোটি। জনকরা আয় ৩০০ টাকা।

ভারতবর্ষ—জনসংখ্যা ৩১॥ কোটি। জনকরা আয় ৩০০ টাকা। (১৩৩ পৃষ্ঠায় "অপর আয়" অংশ দ্রষ্টব্য।)

রুষিয়া—জনসংখ্যা ১৭ কোটি ৩০ লক্ষ। জনকরা আয় ১২৮৮ টাকা। ভারতবর্ষের ৪ গুণ।

জাপান—জনসংখ্যা ৬ কোটি ৭০ লক্ষ। জনকরা আয় ৭৫০। ভারতবর্ষের ২॥ গুণ।

মার্কিন যুক্তরাজ্য—জনসংখ্যা ১০ কোটি। জনকরা আয় ৫৮৯৫। ভারতবর্ষের ১৯ গুণের বেশী।

জর্ম্মণী—জনসংখ্যা ৬ কোটি ৫০ লক্ষ। জনকরা আয় ৩৭০০ টাকা। ভারতবর্ষের ১২ গুণের অধিক।

গ্রেট ব্রিটন—জনসংখ্যা ৪ কোটি ৫০ লক্ষ। জনকরা আয় ৫৭০০। ভারতবর্ষের ১৯ গুণ।

ফ্রান্স—জনসংখ্যা ৪ কোটি। জনকরা আয় ৩৭৫০। ভারতবর্ষের ১২॥ গুণ।

বঙ্গে সর্পদংশনে মৃত্যু।

১৯০৩—৪	১০,৩৯৪	১৯০৮—৯	৭,৪০২
১৯১৩—১৪	৪,৪৯১	১৯১৫—১৬	৪,৭০৯

স্বাস্থ্য বিধির সুফল।

কলিকাতা নগরে স্বাস্থ্যরক্ষার সুব্যবস্থা করায় এই নগরে মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। নিম্নের তালিকায় [illegible]

১৯০০	৪৫ এর কাছাকাছি।
১৯০৫	৩৫ হইতে ৪০ মধ্যে।
১৯১০	৩০ হইতে ৩৫ মধ্যে।
১৯১৫	২৫ হইতে ৩০ মধ্যে।

ভারতের চাষযোগ্য জমি।

ভারতের পরিমাণ ফল ১৮০২৬২৯ বর্গ মাইল, ইহার এক তৃতীয়াংশ জমি কর্ষণযোগ্য, এই দেশে ৪২ সহস্র মাইল জমি আছে।

জাপানের পরিমাণফল ১৪৮৭৫৬ বর্গ মাইল কিন্তু কর্ষণ-যোগ্য জমি এক ষষ্ঠাংশ।

রেলওয়ে।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান রাজ্যের রেলওয়ে :—

মার্কিন যুক্তরাজ্য	২৫৫০০০	মাইল।
রুষিয়া	৪৪৯৫০	„
জর্ম্মণী	৩৭০২৬	„
ভারতবর্ষ	২৩৪৮৪	„
কানাডা	২৫৪০০	„
ফ্রান্স	২৪১৯১	„
ইংলণ্ড	৭৩৩৮৭	„
চীন	৬০০০	„
জাপান	৬০০০	„

পৃথিবীর বাণিজ্য।

জাপান—১৩৪ কোটি ১৭ লক্ষ ৩৫ সহস্র টাকা।

চীন—১৫১ কোটি ২৭ লক্ষ ৮০ সহস্র টাকা।

বেলজিয়ম—৩৭০ কোটী ৭২ লক্ষ ৯০ সহস্র টাকা।

ভারতবর্ষ—৪৩৫ কোটী ৮৮ লক্ষ ৮৪ সহস্র ২২৫।

(আমদানী—১৯৭ কোটি ৫২ লক্ষ ৬২ হাজার ৮৫০ ও রপ্তানি—২৩৮ কোটি ৩৬ লক্ষ ২১ সহস্র ৩৬৫)

হল্যাণ্ড—৬৬৪ কোটি ৮৩ লক্ষ।

ফ্রান্স—৬৭৭ কোটি ৬ লক্ষ ৪০ সহস্র।

মার্কিন যুক্তরাজ্য—৯৫২ কোটি ২৪ লক্ষ ৬৫ সহস্র।

জর্ম্মণী ১১৩৯ কোটি ৩৪ লক্ষ ৭ সহস্র।

ইংলণ্ড ১৬৩২ কোটি ৬৬ লক্ষ ২৫ সহস্র।

মাতলামির জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত।

বঙ্গে।

১৯১০—১১	৯২৮৭
১৯১৫—১৬	৯৩৭৮
১৯১৬-১৭	৯৮৬৫

কলিকাতায়।

১৯১০—১১	৮২১৬
১৯১৫—১৬	৬৭৬৩
১৯১৬—১৭	৬৯৬৫

কলিকাতার ছোট চুরি ও বিড়ির দোকান।

কলিকাতায় বিড়ির দোকান যত বাড়িতেছে মোট ছোট চুরির সংখ্যা তত কমিতেছে।

	দোকান	চুরি
১৯০৫	২০০	২৩৪৬
১৯১০	৮০০	২০২৪
১৯১৫	১৩০০	১৮৮৪
১৯১৬	২৪০০	১৪৩৬

বঙ্গে মাদক দ্রব্যের কাটতি

মদের কাটতি।	গাঁজা।
১০১৫—৩১৩৯৫০০ সের।	১৯১৫—৯২০১৬ সের।
১৯১৬—৩০১০০০০ সের।	১৯১৬—৭৩২৯৮ সের।
১৯১৭—৩১৮৫০০০ সের।	১৯১৭—৭৫১৯৩ সের।

আফিং।

১৯১৫—৫২৮২৩ সের।	১৯১৬—৪৩৪৭৯ সের।
১৯১৭—৩৮১১৮ সের।	

অর্থাৎ বাঙ্গলা দেশে গাঁজা খোর আফিং খোর কমিতেছে কিন্তু মাতালের সংখ্যা বাড়িতেছে।

নানারোগ।

প্রত্যেক ১৫ ব্যক্তির মধ্যে ৬ জনের চক্ষু খারাপ। প্রত্যেক ৫ জন মধ্যে ১ জনের দাঁত খারাপ। প্রতি ৬ জন মধ্যে ২ জন টন্‌সিল এবং ৭ জন মধ্যে ১ জন স্ক্রুফুলা রোগে ভুগিতেছে।

চিনি।

ভারতবর্ষে প্রত্যেক বৎসর ১১ কোটি ৯৭ লক্ষ ৩১ সহস্র

৪৮০ টাকার চিনি বিদেশ হইতে আইসে; ১৪ লক্ষ ৬৫ সহস্র ৫৭৫ টাকার চিনি বিদেশে প্রেরিত হয়।

যক্ষ্মা।

ভীষণ মৃত্যু

ব্রিটিশ ভারতে যক্ষ্মারোগে প্রত্যেক বৎসর ৬ লক্ষ লোক মরে, গ্রেট বিটনের বার্ষিক মৃত্যু সংখ্যা ৬০ সহস্র। এই নিবার্য্য ব্যাধিতে ভারতে:—

বৎসর ৬ লক্ষ, মাসে ৪৩ সহস্র ২ শত,
দিনে ১৪৪০ জন, ঘণ্টায় ৬০ জন,
মিনিটে ১ জন লোক—

মরিতেছে। অর্থাৎ এই সুবৃহৎ নগরে যতলোক বাস করে ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যেক বৎসর উহার প্রায় ⅓ লোক মরিতেছে। কি ভীষণ মৃত্যু! এই মৃত্যুর কথা ভাবিলে কি স্তম্ভিত হইতে হয় না? মনে রাখিবেন এই মৃত্যুর গতিরোধ করা যাইতে পারে।

এড়াইবার উপায় কি?

যক্ষ্মা রোগের আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে কি করিতে হইবে শুনুন:—

১। অমিতাচার বর্জ্জন।

২। অতিরিক্ত পরিশ্রম বর্জ্জন।

৩। রুদ্ধ গৃহে—(দরজা জানলা বন্ধ করিয়া) শয়ন না করা।

৪। যে ঘরে অধিক লোক আছে সেই ঘরে শয়ন না করা।

৫। নাক মুখ ঢাকিয়া শয়ন না করা।

৬। শ্বাসের সঙ্গে ধূম গ্রহণ না করা।

৭। দেহে বা আহার্য্য ও পানীয় দ্রব্যে যাহাতে মাছি না পড়ে তাহা করা।

৮। মুখ দ্বারা শ্বাস গ্রহণ না করা।

৯। মেজের উপর থুথু না ফেলা।

১০। যক্ষ্মা রোগীর সংশ্রব হইতে দূরে থাকা।

১১। ধূলিময় স্যাঁত স্যাঁতে ও অন্ধকার গৃহে বাস না করা।

১২। যাহাতে দেহ দুর্ব্বল হয় এমন কিছু না করা।

১৩। শীতল বিশুদ্ধ বায়ু অথবা নৈশ বায়ুকে ভয় না করা।

১৪। যে খাদ্য উপাদেয় ও পুষ্টিকর নহে তাহা গ্রহণ না করা।

১৫। খাদ্য দ্রব্য যেন পর্য্যাপ্ত হয়।

মাতা বৈরী।

জননী যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত, তিনি সস্নেহে তাহার পুত্র-মুখ চুম্বন করিতেছেন। কিন্তু হায়, ঐ চুম্বন দ্বারা তিনি আপন দেহের ব্যাধি পুত্রদেহে সঞ্চারিত করিলেন।

শিশুদের দ্বারা রোগ প্রসার।

অনেক শিশু স্লেটে থুথু দেয়, হাতের থুথু পুস্তকের পৃষ্ঠায় লাগাইয়া পাতা উল্টাইয়া থাকে, অন্য শিশু ঐ থুথু মাখান স্লেট বা পুস্তক হইতে তাহার রোগের বীজাণু গ্রহণ করে।

পানওয়ালী।

রুগ্না পানওয়ালীর নিকট হইতে পানের সহিত এই রোগ অনেকে গ্রহণ করে।

বাজারে মিঠাই।

বাজারের মিঠাইর মধ্যে সকল প্রকার অপবিত্রতাই থাকিতে পারে। ঐ মিঠাই হইতে এই রোগ ব্যাপ্ত হয়।

এক হুকায় তামাক খাওয়া।

এক জনে যে হুকায় তামাক খায় স্বজাতিরা সেই হুকায় তামাক খাইতে সংকোচ বোধ করেন না। এইরূপ এক জনের থুথু অন্যে গ্রহণ করায় এই রোগ একজনের দেহ হইতে অন্যের দেহে প্রবেশ করে।

ঐরূপ একজনের মুখের জিনিষ অন্যে খাইলে একবাসনে খাইলে এই ব্যাধি সংক্রামিত হইয়া থাকে।

কেমন করিয়া রোগ ছড়াইয়া পড়ে।

যক্ষ্মা রোগী থুথু ফেলিল, ঐ থুথুর উপর মাছি বসিলে মাছি উড়িয়া যাহার উপর পড়িবে তাহারই ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার কথা। আবার মেথর ঐ থুথু ঝাটার দ্বারা ধূলির সহিত মিশাইয়া উড়াইয়া দিল, নিকটে যে শিশু খেলিতে ছিল তাহার দেহ ঐ ধূলির দ্বারা ধূসর হইল, ঐরূপে সে ঐ রোগের বীজাণু গ্রহণ করিল।

আহ্লেদে প্রশস্তি।

(নব্য দিঙনাচার্য্য প্রশস্তির অনুকরণে)

কুহু ডেকে বলছে ওকে
আমার সাথে পাল্লা দে।
গব্ধরেরি ফব্ধর ওঃ
ও পাড়ারি আহ্লেদে।

উঠান চসে দর্ষে বুনে
ছিল ফুলের সওদাতে
খোট্ ধরেছে বৃদ্ধ খোঁকা
উঠ্‌বে হাতীর হাওদাতে।

চক্ষে দেখে অভ্র আবীর
অন্ধ হ'ল সত্য কি
দগ্ধ ধনের আহ্লাদে এ
বিত্ত পেলে ক'ত্ত কি ?

ইলেকটিরি ফুরিয়ে গেছে
ছুইস্ টেপা ছাড়না রে,
বৃথায় ত্বালিস দিয়েশেলাই
নেইকো যে গ্যাস বার্ণারে।

চঞ্চল কুমার।

কর্পূরমঞ্জরী।

[কবি রাজশেখর বিরচিত 'কর্পূরমঞ্জরী' নাটকের গল্পাংশ সঙ্কলন]

(১)

বসন্ত আসিয়াছে। মহারাজ চন্দ্রপাল মহিষী বিভ্রমলেখার সঙ্গে রাজউদ্যানে বেড়াইতে আসিলেন। সঙ্গে বিদূষক আসিল, আর রাণীর সহচরী বিচক্ষণাও আসিল। চারিদিকে ফুটনোন্মুখ বসন্তের শোভা দেখিয়া রাজা হাসিয়া কহিলেন, "দেবী! একটা সুখের সংবাদ তোমাকে দিব, ওই দেখ বসন্ত আসিয়াছে!"

রাণী ও বিভ্রমলেখাও মধুর হাসিয়া রাজার সেই কথার প্রতিধ্বনি করিলেন।

অদূরে বৈতালিকগণও স্তুতি আবৃত্তি করিল, "চম্পক-নগরের চম্পকরূপ কর্ণভূষণ যিনি তাঁহার জয় হউক! যিনি রাঢ়দেশ আর কামরূপ দেশ অনায়াসে জয় করিয়াছেন, তাঁহার জয় হউক! বঙ্গে যিনি রঙ্গে * ক্রীড়া করেন, তাঁহার জয় হউক! সুবর্ণের বর্ণ জিনিয়া যাঁহার রূপ, সেই রূপবানের জয় হউক! নব বসন্ত আসিয়াছে—ইহা সকলের সুখকর হউক!"

এই বলিয়া প্রথম বৈতালিক গাহিল, "মলয়-শিখরবাসী শীতল সমীরণ কি সুন্দর মন্দ মন্দ বহিতেছে! তাহাতে পাণ্ড্য-দেশের রমণীদের গণ্ডে পুলকের আভা ফুটিয়া উঠিতেছে, মানিনী কাঞ্চিনারীগণের মান টুটিতেছে, চপলা চোল-ললনাগণ রঙ্গে মাতিয়া উঠিতেছে, কর্ণাটকামিনীদের কুঞ্চিত কুন্তলরাশি চঞ্চল হইয়া টলিতেছে, কুন্তল দেশ-বাসিনীরা নিবিড় স্নেহে কান্তের সঙ্গে মিলিতেছে।" *

দ্বিতীয় বৈতালিক গাহিল,—"ওই দেখ, কুঙ্কুমরসে লিপ্ত মহারাষ্ট্ররমণীর কপোলের শোভা ধরিয়া কেমন চাঁপা ফুটি-য়াছে। আর মল্লিকাগুলি ফুটিয়াছে—যেন মৃদু মৃদু আলোড়িত দুধের মত কান্তিভূষিতা সারি সারি রূপসীনারীরা—গোড়ায় শ্যামলবৃন্ত, আর মাথায় অলি—কিংশুক ফুলগুলির মধু যেন দুইদিক হইতে মধুপেরা পান করিতেছে!"

* বঙ্গের নাম 'হরিকেলীয়' বলিয়া মূল গ্রন্থে উল্লেখ আছে। হরি-এখানে কেলী বা ক্রীড়া করেন এই অর্থে দেশের নাম 'হরিকেলীয়'—অভিধানে এই অর্থ পাওয়া যায়।

* পাণ্ড্য, চোল, কাঞ্চি, কর্ণাট, কুন্তল প্রভৃতি দেশগুলি দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত।

রাজা কহিলেন, "বিভ্রমলেখা! আজ সবই আনন্দময়। তুমি আমার আনন্দ, আমি তোমার আনন্দ, আবার কাঞ্চনচণ্ড আর রত্নচণ্ড দুই বৈতালিকও সুমধুর রসে বসন্তের মধুর প্রভাব বর্ণনা করিয়া আমাদের আনন্দ বৃদ্ধি করিতেছে! আহা, যে বসন্ত তরুণীর চিত্তে বিলাসের বিহ্বল আবেশ আনিয়া দেয়, মলয়হিল্লোলে লতাকে নাচায়, কলকণ্ঠ কোকিলের পঞ্চম স্বর আরও মধুর করিয়া তোলে, চুতমঞ্জরীর শোভায় ও সৌরভে মানিনীর মান দূর করে, বসুন্ধরার প্রিয় বন্ধু সেই বসন্ত আজ চারিদিকে তার মোহন সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিতেছে! দেবী, বসন্তের এই উৎসব আজ নয়ন ভরিয়া দেখ!"

রাণীও মধুর আবেগ ভরে কহিলেন, "আহা, সত্যই আজ কি মধুর মলয়সমীরের স্পর্শ পাইতেছি। মহর্ষি অগস্ত্যের (১) আশ্রমে চন্দনতরু, আর কর্পূরলতাকে আন্দোলিত করিয়া, তাম্রপর্ণী (২) নদীর শীতলজল চুম্বন করিয়া কি মধুর চৈত্রের বায়ু বহিতেছে! পিককুল মধুর পঞ্চমে গাহিয়া যেন এই কথাই ঘোষণা করিতেছে—"মানিনী! মান ছাড়,—কান্তের পানে চাহিয়া দেখ, যৌবনের আনন্দ আজ আছে কাল নেই,—ইহাকে অবহেলা করিও না।'"

বসন্ত-মাধুরীতে মুগ্ধ রাজা ও রাণীর চিত্তে যখন এইরূপ মধুময় কবিত্বরসের উচ্ছ্বাস বহিতেছিল, বিদূষক কপিঞ্জল বলিয়া উঠিল, "তোমরা ওসব কি বলিতেছ? পণ্ডিত এখানে কেবল আমি। আমি কি যেমন তেমন পণ্ডিত? আমার শ্বশুরের শ্বশুর পণ্ডিতের ঘরে পুঁথি বহিতেন!"

সহচরী বিচক্ষণা হাসিয়া কহিল, "তোমার পাণ্ডিত্য দেখিতেছি তবে কুলপরম্পরাগত!"

এই বিদ্রূপে বিদূষক বড় রাগিয়া উঠিল,—গালি দিয়া কহিল, "কি, দাসীর বেটী! কুট্টিনী! অলক্ষণে! অবিচক্ষণে! কুসঙ্গিনি! রথ্যাবলুণ্ঠিনি!(৩) তুইও আমাকে উপহাস করিস্!"

বিচক্ষণা উত্তর করিল, "তাই বটে! কোন্ অশ্ব কেমন চলে, তা দেখিলেই লোকে বোঝে,—কাহাকেও তা বলিয়া দিতে হয় না।—আচ্ছা, তুমি ত বড় কবি,—বসন্ত বর্ণনা করিয়া একটি কবিতা বল ত?"

বিদূষক উত্তর করিল, "তুমি ত পিঞ্জরের পাখীর মত, বাজে বুলী ছাড়,—কবিতার কি বুঝিবে? আচ্ছা, আমি বয়স্যের কাছে আর দেবীর কাছে আমার কবিতা বলিব। কস্তুরী কুগ্রামে কি বনে কখনও বিক্রয় হয় না। কষ্টি-পাথর ছাড়াও সোণার পরীক্ষা হয় না।"

রাজা হাসিয়া কহিলেন, "বেশ, তুমি আমার কাছেই তোমার কবিতা বল।"

বিদূষক একটি কবিতা আবৃত্তি করিল,—তার মর্ম্ম এই;——

নিসিন্দা গাছে ফুল ফোটে যেন—কলমা চাউলের ধব-ধবে ভাতগুলি, তাই তা আমি বড় ভালবাসি। আর মল্লিকা গাছে ফুল ফোটে—সে যেন মহিষের দুধের মতই চমৎকার। তাও আমি খুব ভালবাসি।"

বিচক্ষণা হাসিয়া উঠিল,—কহিল, "হাঁ, এই কবিতাটি তোমার গৃহিণীর কাছে বলিও,—তাঁরই খুব ভাল লাগিবে।"

বিদূষক রাগিয়া কহিল, "বলি ও মধুরভাষিণী! তুমি একটি কবিতা বল না শুনি!"

বিভ্রমলেখা কহিলেন, "বিচক্ষণা, সত্যই তোমার নিজের একটি কবিতা মহারাজকে শোনাও,—কেবল আমাদের শুনাইয়া লাভ কি? সভায় যা পড়া যায় সেই কবিতাই কবিতা, কষ্টিপাথরে যার পরীক্ষা চলে তাই সোণা, স্বামীর যে আনন্দদায়িনী সেই গৃহিণী, আর কুল যে উজ্জ্বল করে সেই পুত্রই পুত্র।"

রাণীর আদেশে বিচক্ষণা বড় মধুর ছন্দে রচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করিল, ভাবটি মৌলিক ও চিত্তগ্রাহী। কবিতাটির মর্ম্ম এইরূপ——

'মলয়সমীর লঙ্কার গিরিমেখলা হইতে স্খলিত হইয়া আসিতে আসিতে ভোগক্লান্ত ভুজঙ্গের গ্রাসে পড়িয়া ক্ষীণ হইয়া গেল। তখন বিরহিণীগণের দীর্ঘশ্বাসে আবার তাহা পরিপূর্ণ যৌবনে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল।"

রাজা ও রাণী দুইজনেই বিচক্ষণার কবিত্বকৌশলের বড়-প্রশংসা করিলেন। বিদূষক কপিঞ্জল ইহাতে বড় চটিয়া উঠিল।

(১) মহারাষ্ট্রদেশে মলয়পর্ব্বতের নিকটে অগস্ত্যের আশ্রম। দণ্ডকারণ্যে এই আশ্রমে অগস্ত্যের সঙ্গে রামের সাক্ষাৎ হয়।

(২) কর্ণাট দেশের নদী বিশেষ। নাটকের নায়ক এই রাজাও কর্ণাটের অধিপতি ছিলেন। স্পষ্ট উল্লেখ কিছু নাই,—তবে নানা প্রসঙ্গ হইতে এইরূপ আভাষ পাওয়া যায়।

(৩) রথ্যা—রাস্তা,—রথ্যাবলুণ্ঠিনী—চরমদুর্দ্দশায় রাস্তায় যে লুণ্ঠিত হয়।

বিচক্ষণা কহিল, "ঠাকুর অত চটিও না। ঘরে নিজের কান্তার কাছে যতই মনোজ্ঞ হউক, সুকুমার কবিত্বকলায় নিজের উদরপূরণের কোনও প্রসঙ্গ থাকাটা বড় নিন্দার কথা। লম্বোদরীর কাঁচুলী পরা, বৃদ্ধার কটাক্ষহানা, কেশ-হীনা বালিকার মাথায় মালতীর মালাপরা, আর কাণার চোকে কাজল দেওয়া যেমন বিসদৃশ, কবিতায় এসব কথাও তেমনই বিসদৃশ জানিও।"

কথায় কথায় বিচক্ষণার সঙ্গে কপিঞ্জলের বিকট এক বাগ্‌যুদ্ধ বাধিয়া গেল। হেঁয়ালীতে ছড়া কাটিয়া উভয়ে উভয়েকে গালি দিতে লাগিল।

কপিঞ্জল কহিল, "দাঁড়া, তোর অঙ্গে যুধিষ্ঠিরের বড় ভাই (১) যে দুইটা আছে তা আমি টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিব।"

বিচক্ষণা উত্তর করিল, "আমিও উত্তরফল্গুনীর পরে যে নক্ষত্র (২) তোমার গায়ে কাছে, তা ভাঙ্গিয়া দিব। তুমি সেইখানে যাও, যেখানে আমার প্রথম সাড়ীখানি গিয়াছে!"

"তুই সেইখানে যা, আমার মার প্রথম দাঁতগুলি যেখানে গিয়াছে। এই রাজবাড়ীর কখনও ভাল হইবে না যেখানে একটা দাসী ব্রাহ্মণের সঙ্গে সমান স্পর্দ্ধা করে—মদ আর পঞ্চগব্য যেখানে এক ভাঁড়ে রাখা হয়, কাচ আর মাণিক যেখানে সমান অলঙ্কার বলিয়া সকলে মনে করে।"

বিচক্ষণা কহিলেন, "এই রাজবাড়ীতে তোমার ঘাড়ে তাই পড়ুক যা মহাদেব তাঁর মাথায় ধারণ করেন (৩)। তাই দিয়া তোমার মুখ ভাঙ্গা হউক, যা দিয়া অশোক গাছের সাধ দেওয়া হয়?" (৪)

বিদূষক কহিল, "হতভাগী দাসী! এত বড় কথা আমাকে বলিস। ফাল্গুন মাসে সজনে গাছের যে দশা লোকের হাতে হয়, তোর তাই হ'ক। ষাঁড়েরা পামরদের কাছে যা পাইয়া থাকে তুই যেন তাই পাস্ (৫)।

বিচক্ষণা কহিল, "উত্তর আষাঢ়ার পরে যে নক্ষত্র (৬) তোমার মাথার দুইধারে আছে, তা আমি ছিঁড়িয়া দিব জান?"

কপিঞ্জল এবার বড় রাগিয়া কহিল, "না এমন

(১) কর্ণ। (২) হস্ত হাত। (৩) অর্দ্ধচন্দ্র।
(৪) পদাঘাত। (৫) নাক ফুটাইয়া দড়ী বাঁধা।

রাজবাড়ীতে আমি আর থাকিব না। ইহা অপেক্ষা ব্রাহ্মণী বসুন্ধরার চরণ সেবা করাও ভাল।"

এই বলিয়া কপিঞ্জল বাহিরে চলিয়া গেল।

রাণী কহিলেন, "তাই ত, কপিঞ্জল ঠাকুর যে রাগ করিয়া চলিয়াই গেলেন!"

কপিঞ্জল বাহির হইতে চেঁচাইয়া কহিতে লাগিল—"না, আমি কখনও আর যাইব না! রাজা অন্য বয়স্য দেখিয়া নিন। না হয় ইপ্সরকর্ণী ওই দাসীটাকে মাথায় উষ্ণীষ পরাইয়া আমার কাজে নিযুক্ত করুন।"

বিচক্ষণা কহিল, "ওকে এখন আদর করিবেন না মহারাজ। কপিঞ্জলঠাকুর শান্তভাব দেখিলেই উষ্ণ হন, আবার উষ্ণতা দেখিলে শান্ত হন। জল দিয়া ভিজাইলে শণের দড়ীর গিঠ আরও শক্ত হয়।"

একটু পরেই কপিঞ্জল আবার ত্রস্তভাবে ছুটিয়া আসিল।

"আসন দেও,—আসন দেও!"

"আসন কেন?"

"ভৈরবানন্দ আসিতেছেন।"

ভৈরবানন্দ! যাঁহার অলৌকিক সিদ্ধির কথা শুনিয়াছি—তিনি?"

"হাঁ, তিনিই বটেন।—"

"যাও সখা, শীঘ্র তাঁহাকে লইয়া আইস।"

কপিঞ্জল বাহিরে গিয়া ভৈরবানন্দকে লইয়া আসিল। ইনি তান্ত্রিক কৌল সম্প্রদায়ের একজন সিদ্ধ যোগী।

সকলে তাঁহাকে যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আসন দিলেন।

ভৈরবানন্দ কহিলেন, "মহারাজের কি আদেশ বলুন।"

রাজা উত্তর করিলেন, "আশ্চর্য্য কোনও ঘটনা দেখিতে ইচ্ছা করি।"

"বলুন, কি করিব? চন্দ্রকে পৃথিবীতে নামাইয়া আনিতে পারি, আকাশ পথে সূর্য্যের গতি রুদ্ধ করিতে পারি, যক্ষ দেব সিদ্ধ প্রভৃতির দিব্যাঙ্গনাদের আনিয়া দেখাইতেও পারি।"

রাজা কপিঞ্জলের দিকে চাহিয়া করিলেন, "সখা! অপূর্ব্ব সুন্দরী কোথাও তুমি দেখিয়াছ?"

"হাঁ, দেখিয়াছি—কুন্তলদেশে বিদর্ভনগরে। যোগী

রাজাও সেই ইচ্ছা জানাইলেন।

যোগী মন্ত্র পড়িলেন,—দেখিতে দেখিতে অপূর্ব্ব সুন্দরী এক যুবতী তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন! যুবতী স্নান করিতেছিলেন,—একখানি মাত্র আদ্র বসনে দেহ আবৃত, সিক্ত আলুলায়িত কুন্তলদল দুই বাহু ভরিয়া লুঠিয়া পড়িয়াছে,—সলজ্জ ত্রস্তভাবে একখানি হাতে বক্ষের বসন আর একখানি হাতে কটির বসন ধৃত। এমন অবস্থায় দেবদুর্লভ সৌন্দর্য্যময়ী এই যুবতীকে দেখিয়া রাজা মুগ্ধচিত্তে চাহিয়া রহিলেন। যুবতীও সলজ্জদৃষ্টিতে রাজার দিকে একবার চাহিয়া আরক্ত মুখখানি নত করিলেন।

রাজা নির্ণিমেষ মুগ্ধ দৃষ্টিতে যুবতীর দিকে চাহিয়া তার প্রতি-অঙ্গের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সতৃষ্ণনয়নে নিরীক্ষণ করিতে করিতে মৃদু গদ্‌গদ স্বরে কপিঞ্জলের নিকটে তাহার বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

রাণী একটু বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, "আর্য্য কপিঞ্জল! আপনি জিজ্ঞাসা করুন ইনি কে?"

কপিঞ্জল অগ্রসর হইয়া তাহার উত্তরীয় মাটিতে পাতিয়া দিয়া যুবতীকে বসিতে বলিলেন,—তারপর তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, যুবতী উত্তর করিলেন, "কুন্তল দেশে বিদর্ভ নগরে বল্লভরাজ নামে একজন রাজা আছেন——"

রাণী মনে মনে কহিলেন, "তিনি যে আমার মাতৃ-স্বস্‌পতি।"

যুবতী কহিলেন, "আমি তাহার রাণী শশিপ্রভা——"

রাণী চমকিয়া উঠিলেন,—এই শশিপ্রভাই যে তাঁহার মাতৃস্বসা।"

যুবতী কহিলেন, "আমি তাঁহাদের কন্যা।"

রাণী বলিয়া উঠিলেন, "তুমিই তবে কর্পূরমঞ্জরী! আমার মাতৃস্বসা শশিপ্রভার কন্যা তুমি। আহা, তাই বটে! শশিপ্রভার গর্ভে ব্যতীত এমন রূপরাশি কি আর কোথাও জন্মে? বৈদূর্য্যমণির গর্ভ ব্যতীত বৈদূর্য্যশলাকা আর কোথায় হয়?"

কর্পূরমঞ্জরী সলজ্জ সম্ভ্রমে উঠিয়া রাণী বিভ্রমলেখাকে প্রণাম করিলেন।

স্নেহে ভগ্নীকে আলিঙ্গন করিয়া বিভ্রমলেখা কহিলেন, "আর্য্য ভৈরবানন্দ! আপনার প্রসাদে আজ কর্পূরমঞ্জরীকে দেখিয়া বড় সুখী হইলাম। পনর দিন আর আমাদের নিকটে ইনি থাকিবেন। তারপর ধ্যানের বিমানে তুলিয়া আবার ইহাকে আপনি লইয়া যাইবেন।"

"আচ্ছা, তাই হইবে দেবী।"

রাজা অনুমোদন করিলেন। রাণী কর্পূরমঞ্জরীকে লইয়া অন্তঃপুরে গেলেন।

(২)

অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া বিভ্রমলেখা কর্পূরমঞ্জরীকে উত্তম বসন ভূষণে তাঁহাকে সাজাইলেন। চতুরা এবং বিবিধ কলা-বিদ্যায় নিপুণা বিচক্ষণাকে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করিলেন। দেখিবামাত্র কর্পূরমঞ্জরীর সঙ্গে বিচক্ষণার 'তারামৈত্রী'* জন্মিয়াছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই দুইজনে বড় অন্তরঙ্গ সখিভাব হইল। বিচক্ষণা বুঝিতে পারিল, দর্শন মাত্রই কর্পূরমঞ্জরী রাজার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছেন। রাজাও যে তাঁহার রূপমুগ্ধ হইয়াছিলেন, ইহাও বিচক্ষণা বেশ বুঝিয়াছিল। সে ভাবিল, যোগ্যে যোগ্য এই অনুরাগ বিফল না হয়, তাহা করিতে হইবে; কর্পূরমঞ্জরীকে বলিয়া ইঙ্গিতে তাঁহার চিত্তের বেদনা প্রকাশ পায়, এমন একটি কবিতা সে লিখাইল,—সেই কবিতার নিম্নে নিজেও তার টিপ্পনী করিয়া আর একটি কবিতা লিখিল। তাহার ভগ্নী সুলক্ষণাও ঐরূপ আর একটি কবিতা লিখিল,—এই তিনটি কবিতা লইয়া বিচক্ষণা বাহির হইল।

রাজার সঙ্গে এসম্বন্ধে কোনও আলোচনা করিতে হইলে বিদূষকের সহায়তা প্রয়োজন। বিচক্ষণা অবিলম্বে গিয়া বিদূষকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল,—তাহার সঙ্গে বিবাদ মিটাইয়া সন্ধি করিয়া নিল। বিচক্ষণার নিকটে সকল সংবাদ শুনিয়া বিদূষকও যারপরনাই আনন্দিত হইল। রাজার বড় অন্তরঙ্গ বন্ধু সে, মুগ্ধ রাজাও যে একেবারে অধীর হইয়া রহিয়াছেন, তা সে বেশ জানিত। কর্পূরমঞ্জরীর সঙ্গে রাজার প্রণয় যাহাতে পরস্পরের সাক্ষাতে আরও পাকিয়া উঠে, এজন্য যেমন বিচক্ষণার, তেমন তাহারও বিশেষ আগ্রহ হইল। একটা পরামর্শ স্থির করিয়া দুইজনে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চলিল।

রাজা তখন উদ্যানে অধীরভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। কবিতা তিনটি পড়িয়া আনন্দের উচ্ছ্বাসে তাঁহার

* চোকে চোকে দেখা হইবামাত্র পরস্পরের প্রতি প্রীতিসঞ্চারকে 'তারামৈত্রী' বলে।

দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। বিচক্ষণার নিকটে কর্পূরমঞ্জরীর সকল সংবাদ তিনি শুনিলেন। শেষে বিচক্ষণা কহিল, "যাই হউক, আমরা শেষে একটি বুদ্ধি স্থির করিয়াছি।—কপিঞ্জল, মহারাজকে বল না সে কথা?"

কপিঞ্জল কহিল, "আজ দোল চতুর্থী,—দেবী কর্পূরমঞ্জরীকে গৌরী সাজাইয়া দোলায় চড়াইবেন। আমরা স্থির করিতেছি, তুমি মরকতকুঞ্জে থাকিয়া সেই দোলন দেখিবে।"

যারপরনাই পুলকিত চিত্তে রাজা বিদূষকের সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট সেই কুঞ্জের দিকে গেলেন,—বিচক্ষণাও নিজের কাজে চলিয়া গেল।

কুঞ্জের মধ্যে স্ফটিকমণির উচ্চ বেদী ছিল,—রাজা তাহার উপরে গিয়া বসিলেন। কপিঞ্জল হস্ত তুলিয়া কহিল, "সখা ওই দেখ পূর্ণিমার চাঁদ!"

রাজা দেখিয়া কহিলেন, "আহা, ওই যে আমার প্রিয়া দোলায় উঠিয়াছেন! সত্যই যে পূর্ণিমার চাঁদ ওই সমবেত পুরনারীগণের মুখশোভা আচ্ছন্ন করিয়া উদয় হইয়াছে। লাবণ্য জ্যোৎস্নাসলিলে গগনতল ভাসাইয়া সকলের রূপগর্ব্ব একেবারে খর্ব্ব করিয়া, টলমল দোলায় ঢল ঢল ওই যে চন্দ্রবদনখানি—আহা, কি শোভাই বিকাশ করিতেছে!"

দোলা দুলিতে আরম্ভ করিল—যেন কোনও সুরনারীকে লইয়া একখানি বিমান আকাশে উঠিতে নামিতে লাগিল। চরণের রত্ন নূপুর, বক্ষের হার, মেখলার কিঙ্কিণী, প্রকোষ্ঠের বলয়াবলী মধুর রুণুঝুণু বাজিতে লাগিল। আহা, চন্দ্রাননা ললনার এই হিন্দোল-লীলা কার চিত্ত না হরণ করে? রাজা একেবারে বিমুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন!

দোলখেলা শেষ হইল,—কর্পূরমঞ্জরী দোলা হইতে নামিলেন, পুরনারীগণের সঙ্গে চলিয়া গেলেন।

রাজা কহিলেন, "আহা, খেলা শেষ হইল!—শূন্য ওই দোলা! শূন্য আমার এই হৃদয়পুরী! শূন্য এখন আমার এই নয়ন দুটি!"

রাজা একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। অদূরে বিচক্ষণাকে দেখা গেল। বিদূষক ছুটিয়া তাহার নিকটে গেল।

বিচক্ষণা কহিল, "মহারাজ কোথায়?"

"ওই ত মরকত কুঞ্জে আছেন।"

"আর একটু অপেক্ষা করিতে বল, কর্পূরমঞ্জরী দেবীর আদেশে এইদিকে আসিতেছেন।"

"দেবীর আদেশে! কেন? কোথায়?"

"ওই যে দেবীর তিনটি ফুলের গাছ ওখানে আছে দেখিতেছ—কুরুবক, তিলক আর অশোক?"

"হাঁ, তার—কি?"

"সুন্দরীর আলিঙ্গনে কুরুবকে, দর্শনে তিলকে, আর পদাঘাতে অশোকে ফুল ফোটে। দেবী কর্পূরমঞ্জরীকে গাছগুলির সাধ * দিতে আদেশ করিয়াছেন।"

বিদূষক কহিল, "বটে! তা হ'লে আমরা কাছেই গাছের আড়ালে আসিয়া দাঁড়াই। আরও ভাল করিয়া সব দেখা যাইবে!"

বিদূষক ছুটিয়া কুঞ্জের মধ্যে গেল। রাজাকে লইয়া গাছের আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইল।

রুণুঝুণু মধুর নূপুর বাজিয়া উঠিল। উজ্জ্বল রত্নভূষণে এবং সুবর্ণ-সূত্র-খচিত সূক্ষ্ম চারু বসনে সুসজ্জিত হইয়া কর্পূরমঞ্জরী আসিলেন।

কর্পূরমঞ্জরী ডাকিলেন, "বিচক্ষণা! কোথায় তুমি সখী?"

যেন মধুর ঝঙ্কারে বীণা বাজিয়া উঠিল। বিচক্ষণা কাছে গিয়া কহিল, "এই যে সখী—এস! এই যে এইদিকে সব ফুলের গাছ।"

কর্পূরমঞ্জরীর হাত ধরিয়া বিচক্ষণা ফুল গাছগুলির কাছে লইয়া গেল।

"এখন দেবীর আদেশ পালন কর সখী! এই যে কুরুবক।"

একটু মধুর হাসিয়া কর্পূরমঞ্জরী কুরুবক গাছটিকে আলিঙ্গন করিলেন,—গাছের ছোট ছোট শাখাপ্রশাখা ভরিয়া ফুল ফুটিয়া উঠিল।

"আর এই তিলক।"

কর্পূরমঞ্জরী মৃদু হাসিয়া মোহন কটাক্ষে তিলকের দিকে চাহিলেন। সুন্দর ফুলগুলি গাছ ভরিয়া ফুটিয়া উঠিল, যেন সেই কটাক্ষে পুষ্পতরুর পুলকিত দেহ ভরিয়া রোমাঞ্চ উঠিল!

"এই যে অশোক।"

কর্পূরমঞ্জরী রুণুঝুণু চরণ দুটি ফেলিয়া অশোকের নীচে

* এইরূপ সব উপায়ে অকালে গাছে ফুল ফোটানর চেষ্টাকে গাছের সাধ দেওয়া বলা হইত।

গিয়া দাঁড়াইলেন। এক হাত তুলিয়া একটি পল্লবিত শাখা ধরিলেন। তারপর একটু হেলিয়া হাসিমুখে বিচক্ষণার দিকে মোহন গ্রীবাভঙ্গীতে চাহিয়া অলক্ত রঞ্জিত একখানি পা তুলিয়া অশোকের মূলে আঘাত করিলেন—ঝুন্ করিয়া নূপুরে বড় মধুর বাজিল—গাছ ভরিয়া স্তবকে স্তবকে রক্ত কুসুমগুচ্ছ হাসিয়া উঠিল!

অন্তরালে রাজার পুলকচঞ্চল প্রাণ ভরিয়াও গুচ্ছে গুচ্ছে তেমনই যেন সব কুসুম ফুটিয়া উঠিল!

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। বৈতালিকগণ সন্ধ্যার গাথা গাহিয়া রাজার সুখসন্ধ্যা কামনা করিল।

কপূর্রমঞ্জরী কহিলেন, "সন্ধ্যা হইল সখী! চল, এখন যাই।"

বিচক্ষণার সঙ্গে কপূর্রমঞ্জরী চলিয়া গেলেন। রাজার চক্ষে কেবল নয়, প্রাণের মধ্যেও দিনের আলো তার সেই মধুর রক্তিম ছটা লইয়া যেন একেবারে নিভিয়া গেল!

(৩)

"আপন মনে স্ত্রৈণ ভাবুকের মত ওসব কি বলিতেছ সখা?"

বিরহ সন্তপ্ত রাজা উত্তর করিলেন, "কাল যাকে স্বপ্নে দেখিয়াছি, তার কথাই ভাবিতেছি, তার কথাই বলিতেছি।"

"বটে! কি স্বপ্ন দেখিয়াছ?"

"শুইয়া আছি, দেখিলাম যেন কপূর্রমঞ্জরী আমার কাছে বসিয়া তাঁর সেই পদ্মনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া আছেন। আমি হাত তুলিয়া তাঁর আঁচল করিলাম, কিন্তু হায়, তখনই তিনি আমার হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেলেন,—আমারও ঘুম অমনই ভাঙ্গিয়া গেল।

বিদূষক কহিল, "আমিও কাল দিব্য একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি।"

"কি স্বপ্ন সখা—কি স্বপ্ন?"

বিদূষক বলিতে আরম্ভ করিল, "আমি যেন গঙ্গার স্রোতের উপরে শুইয়া আছি,—আর সেই গঙ্গার জলে আমার সর্ব্বাঙ্গ ধুইয়া ধুইয়া একেবারে জল হইয়া গেল।"

"বটে! তারপর?"

"শরতের একখণ্ড মেঘ আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। তারপর সূর্য্যদেব যখন স্বাতিনক্ষত্রে গেলেন * তখন সেই মেঘ তাম্রপর্ণী নদীর মোহনায় যে সমুদ্র, সেই সমুদ্রের উপরে গেল—আমিও তার সঙ্গে সেইখানে গেলাম। সেইখানে সেই মেঘ স্থূল বৃষ্টিবিন্দুতে পরিণত হইয়া সমুদ্রে পড়িল,—আমিও তার সঙ্গে কাজেই সমুদ্রে পড়িলাম।"

"আশ্চর্য্য স্বপ্ন বটে! তারপর?"

"সমুদ্রে অনেক ঝিনুক ছিল।—তারা সব মুখ খুলিয়া সেই সব জলবিন্দু পান করিল,—সঙ্গে আমাকেও পান করিয়া ফেলিল।"

"তাই নাকি? তারপর?"

"তারপর চৌষট্টিটি ঝিনুকের পেটে সেই সব জলবিন্দু আর সেই জলবিন্দুর সঙ্গে মিশান আমি, চৌষট্টিটি বড় সুন্দর মুক্তা হইলাম।"

"তারপর?"

"অনেক দিন গেল,—সেই ঝিনুকগুলি তুলিয়া শেষে ডুবরীরা মুক্তা বাহির করিল। লক্ষস্বর্ণ দিয়া একজন শ্রেষ্ঠী সেই মুক্তা কিনিয়া নিল!"

"কি বিচিত্র স্বপ্ন! তারপর?"

"সেই শ্রেষ্ঠী একজন বেধকার ডাকিয়া সেইগুলিকে ছিদ্র করিল,—তখন একটু ব্যথাও পাইলাম।"

"আহা, তারপর।"

"সেই মুক্তায় সে মালা গাঁথিল, দশমাষা ওজনের এক একটি মুক্তা—মালার দাম হইল কোটি সুবর্ণ।"

"বটে! কে সেই মালা কিনিল?"

"এক বণিক কৌটায় পুরিয়া সেই মালা পাঞ্চালদেশে কান্যকুব্জনগরে লইয়া গেল। রাজা বজ্রায়ুধ কোটিসুবর্ণ দিয়া সেই মালা কিনিয়া নিলেন।"

"সে মালা কে পরিল?"

"রাজার আদরের রাণী—আর কে পরিবে? রাজা তার গলায় মালাটি পরাইয়া দিলেন,—বুকের উপর মাথাটি ঢুলিয়া পড়িল,—আহা, সে যে কি শোভাই হইল!"

"আ—হা। তারপর! তারপর!"

"রাণীকে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। রাজা চাহিয়া তাঁকে বুকে জড়াইয়া চাপিয়া ধরিলেন।"

* স্বাতিনক্ষত্র তুলারাশিতে অবস্থিত, কার্ত্তিক মাসে সূর্য্য তুলা রাশিতে প্রবেশ করেন।

"আহা ——হাঁ!—তারপর? তারপর?"

"তারপর——সেই চাপে আমার মুখ ভাঙ্গিয়া গেল।"

রাজা হাসিয়া কহিলেন, "সখা? আমার স্বপ্ন যে অলীক তা আমি নিজেই মনে মনে বুঝিতেছি। তুমি পাল্টা এই স্বপ্নের কথা বলিয়া আমাকে কি তাই বুঝাইতে চাও?"

বিদূষক উত্তর করিল, "ভ্রষ্টরাজা, ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ অসংযত বালবিধবা, আর বিরহাতুর যুবা—ইহারা আশার মোদকে আত্মপ্রতারণা করে, তাই বলিতেছিলাম। তা যাক্, তোমার এদশা কিসে হইল বলিতে পার?"

রাজা নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, "প্রেমে!"

"কেমন প্রেম বুঝি না,—দেবীতেই তোমার প্রেম এত দিন ক্রমেই বাড়িতেছিল, দেখিতেছিলাম। এখন সেই প্রেমের বশে একেবার তন্ময় হইয়া কর্পূরমঞ্জরীকে দেখিতেছ। কেন, দেবী কি সত্যই রূপে গুণে তাঁর অপেক্ষা কম?"

রাজা উত্তর করিলেন, "সখা! প্রেম রূপে জন্মে না। প্রেম যদি হয়, প্রেমিক সেই প্রেমের চক্ষেই প্রেমের পাত্রে সৌন্দর্য্য খুঁজিয়া নেয়।"

"সেই প্রেম তবে কি বুঝাইয়া দিতে পার?"

রাজা কহিলেন, "মদনের আদেশে মিলিত নরনারীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি যে দৃঢ় অনুরাগের বন্ধন জন্মে, পণ্ডিতেরা তাকেই প্রেম বলেন। এই প্রেমে আত্মায় আত্মায় এমন একটা সরল ভাবের সম্বন্ধ হইয়া যায়, যাহাতে উভয়ের চিত্তে পরস্পরের প্রতি কোনও সংশয়—কোনও মালিন্য আর থাকে না।"

"কেমন করিয়া তা বুঝা যায়?"

রাজা কহিলেন, "দুইজনে দুই জনের দিকে চায়, সকল চিত্ত সেই দৃষ্টিতে অপাঙ্গ পর্য্যন্ত বিলুণ্ঠিত হয়, মধুর রসে উচ্ছ্বসিত মনের সকল কামনা তাহাতেই প্রকাশিত হয়। প্রেমময় প্রাণের সকল বিলাস-বিভ্রম অন্তরের বস্তু, প্রাণের মাধুরীই তার প্রধান ভূষণ। দুর্লক্ষ্য অন্তরের বস্তু হইলেও প্রেমের লীলা যে বাহিরে প্রকটিত হয়, প্রেমদেবতার ইন্দ্রজাল বলিয়াই তাহা আমরা জানি।"

বিদূষক কহিল, "অন্তরের প্রেমই যদি অনুরাগ হয়, প্রেমিক প্রেমিকার তবে ভূষণের এত আড়ম্বর কেন?"

এসব কি য়। রমণীতে অন্য এমন কিছু আছে, যা প্রেমিকের মের সৌভাগ্য সে লাভ করে। নৃত্য গীত, মদিরাসেব কুঙ্কুম লেপন, ধরা ভরা অশেষ সৌন্দর্য্যের উপকরণ ব বৃথা সখা—সব বৃথা! প্রেমের সমান মধুর আর কি হইতে পারে? চক্রবর্ত্তী রাজার রাণী কি সামান্য গৃহস্থের গৃহিণী—প্রেমে কি ইহাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য আছে? রত্নভূষণ, চারুবসন, কুঙ্কুমলেপন, ইহাতে কি আর প্রেম হয়? চঞ্চল নয়ন, চন্দ্রের মত বদন—পীন বক্ষ—প্রেমে এসবের কিছু প্রয়োজন নাই। এসব ছাড়া আর এমন কিছু আছে, যাহাতে প্রেম চিরদিন প্রেমের পাত্রীকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখে।"

বিদূষক উত্তর করিল, "তাই হইবে।—ভাল, বলিতে পার কৌমারে নারীর যে সৌন্দর্য্য যৌবনে তা অনেক বেশী হয়—কেন হয়?"

রাজা উত্তর করিলেন, "বোধ হয় দুইজন বিধাতা আছেন,—একজন কুমারী অঙ্গ গঠন করেন, আর একজন যৌবনের মাধুরীতে আর সকল সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তোলেন।"

কথা বলিতে বলিতে দুইজনে একটি নিভৃত কুঞ্জের কাছে আসিলেন। কুঞ্জমধ্যে মধুর করুণস্বরে কে বলিতেছে—"সখী কুরঙ্গিকা! তোমার শীতল উপচারেও আমার ক্লেশ হইতেছে। মৃণাল যেন গরলের মত দেহে জ্বালা দিতেছে। তালবৃন্তের অনিল যেন অনল বৃষ্টি করিতেছে। ধারাযন্ত্রের জলে যেন আগুনের মত শরীর জ্বলিয়া উঠিতেছে। আর চন্দন, সে ত বিড়ম্বনার মতই মনে হইতেছে!"

বিদূষক কহিল, "আহা, শুনিলে সখা! বিরহতাপে কর্পূরমঞ্জরী কতদূর উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তোমার স্বপ্ন আজ সফল হইবে। আশ্বস্ত হও! দুঃখ তাপ দূর কর,—তোমার রূপ, তোমার কণ্ঠস্বর মধুর হউক! চল আমরা কুঞ্জের মধ্যে যাই।"

উভয়ে কুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভাবের আবেশে কম্পিত দেহে কর্পূরমঞ্জরী আপন মনে কহিলেন, "একি! পূর্ণিমার চন্দ্র সহসা কি আকাশ হইতে নামিল? মহাদেব কি তুষ্ট হইয়া কন্দর্পকে আবার তাহার কান্তদেহ ফিরাইয়া দিলেন? না, এই কি তিনি—আমার হৃদয় যার চিন্তায়

সেই তিনিই আমাকে দেখা দিলেন ? সখী কুরঙ্গিকা ! একি ইন্দ্রজাল ?"

কুরঙ্গিকা কহিল, "সখী ভয় পাইও না। আশ্বস্ত হও! ওঠ! মহারাজকে সম্বর্দ্ধনা কর।"

অলস মন্থরভাবে কর্পূরমঞ্জরী উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলেন। রাজা ত্রস্ত কাছে গিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া কহিলেন, "আহা, উঠিও না—উঠিও না,—উঠিতে ক্লেশ হইতেছে,—দেহ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।—উঠিও না। যেমন আছ বসিয়াই থাক। এইভাবে তোমাকে দেখিয়াই নয়নের বাসনা আমার পরিতৃপ্ত হউক!"

কাছে বসিয়া রাজা প্রেমগদ্‌গদ স্বরে আদর করিয়া কত কথাই কর্পূরমঞ্জরীকে বলিতে লাগিলেন। কর্পূরমঞ্জরী লজ্জায় নতমুখে বসিয়া রহিলেন।—

সহসা বাহিরে বড় কোলাহল উঠিল।

"কিসের ও কোলাহল সখা ?"

বিদূষক কহিল, "দেবীকে বঞ্চনা করিয়াছ, বোধ হয় তাহারই ফল।"

কুরঙ্গিকা ছুটিয়া বাহিরে গিয়াছিল। সে দ্রুত ফিরিয়া ত্রস্ত ভাবে কহিল, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে! মহারাজ যে এখানে দেবী তা কেমন করিয়া জানিতে পারিয়াছেন। অন্তঃপুরচারী কুব্জ, বামন, কিরাত, বর্ষধর (খোঁজা) কঞ্চুকী—যত লোকজন আছে, সকলকে লইয়া দেবী এইদিকে আসিতেছেন। কোলাহল তারাই করিতেছে।"

কর্পূরমঞ্জরী ত্রাসে উঠিয়া কহিলেন, "মহারাজ তবে বিদায় দিন, এই সুরঙ্গপথে আমি রক্ষাগৃহে যাই *। তাহা হইলে আর দেবী কিছুই জানিতে পারিবেন না।"

অবিলম্বে সুরঙ্গ পথে কর্পূরমঞ্জরী অদৃশ্য হইলেন। রাজাও বিদূষকের সঙ্গে কুঞ্জের বাহিরে চলিয়া গেলেন।

(৪)

রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "সখা! কর্পূরমঞ্জরীর সংবাদ কিছু আর পাইলে কি ?"

"পাইয়াছি বই কি ? সেই সুরঙ্গের দ্বার দেবী পাথর চাপা দিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। রক্ষাগৃহে এখন কর্পূরমঞ্জরী বন্দিনী হইয়া আছেন। অনঙ্গসেনা, কলিঙ্গসেনা, কামসেনা, বসন্তসেনা আর বিভ্রমসেনা—সেনানামে বেত্রধারিণী এই পাঁচজন দাসী করবালধারী প্রহরীদের লইয়া পূর্ব্বদিক রক্ষা করিতেছে। অনঙ্গলেখা, চিত্রলেখা, চন্দ্রলেখা, মৃগাঙ্কলেখা, বিভ্রমলেখা—লেখানাম্নী এই পাঁচজন সৈরিন্ধ্রী ধনুর্ব্বাণধারী প্রহরীদের লইয়া দক্ষিণদিক রক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছে। কুন্দমালা, চন্দনমালা, কুবলয়মালা, কাঞ্চনমালা, বকুলমালা, মঙ্গলমালা, মাণিক্যমালা—সাতজন তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী কুন্ত * অস্ত্রধারী প্রহরীদের লইয়া পশ্চিমদিক পাহারা দিতেছে। আবার মদিরাবতী, কেলীবতী, কল্লোলবতী, অনঙ্গবতী, কনকবতী,—এই পাঁচজন স্বর্ণবেত্রধারিণী বতীনাম্নী কুমারী উত্তরদিক রক্ষা করিতেছে।"

রাজা নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, "অন্তঃপুরে দেবীর এই প্রভাব—এই পরিজন বল—দেবীরই উপযুক্ত বটে!"

দাসী সারঙ্গিকা আসিয়া অভিবাদন করিয়া কহিল, "মহারাজ! দেবী বলিলেন, আজ এই চতুর্থীতে বট-সাবিত্রীর উৎসব হইবে। কেলিবিমান প্রাসাদে উঠিয়া আপনি এই উৎসব দেখুন, দেবীর এই ইচ্ছা।"

"দেবীর আদেশ শিরোধার্য্য।" এই বলিয়া রাজা বিদূষকের সঙ্গে 'কেলিবিমান' প্রাসাদের উপরে গিয়া উঠিলেন।

উৎসবে বড় বিচিত্র নৃত্যাদি হইতেছিল।

একস্থানে চর্চ্চরীবাদ্য বাজিতেছিল,—নর্ত্তকীরা তালে তালে নাচিতেছিল। নৃত্যের বিরাম হইল,—নর্ত্তকীরা মণিময় পাত্র হইতে ধারাযন্ত্রে † রঙ্গিন জল তুলিয়া পরস্পরের গায়ে তাহা ছিটাইয়া দিতে লাগিল।

আর একদিকে বত্রিশজন নর্ত্তকী বিচিত্র বন্ধনে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাদ্যের তালে অনুগত সংযত চরণে নাচিতেছিল—আর একদল নর্ত্তকী কাঁধে কাঁধে মাথায় মাথায় হাতে হাতে বাহুতে বাহুতে যেন একেবারে রেখার ন্যায় সমান দুইসারি হইয়া নাচিয়া নাচিয়া পরস্পরের দিকে অগ্রসর হইতেছে, আবার পিছাইয়া যাইতেছে। আরও একদল নাচিয়া নাচিয়া চারিদিকে ধারায় রঙ্গিলজল নিক্ষেপ করিতেছে। আবার একদল গায়ে কালি মাখিয়া, শিখিপুচ্ছে সাজিয়া বিকটভঙ্গীতে নৃত্য

* অন্তঃপুরের কারাগৃহ। অন্তঃপুরবাসিনী কেহ বড় অপরাধ

করিতেছে,—দেখিয়া লোকে হাসিতেছে। ওদিকে আরও একদল নিশাচরী রাক্ষসীর বেশ ধরিয়া মহামাংস লইয়া, শৃগালীর মত বিকট চিৎকারে শ্মশানদৃশ্যের অভিনয় করিতেছে। অন্য একদল উচ্চকণ্ঠে গান করিয়া যোগিনীর নাচ নাচিতেছে,—কেহ কেহ বা মোহনবেণু বাজাইতেছে!

নৃত্য-উৎসব দেখিয়া রাজা মরকতকুঞ্জে কদলীবনে গিয়া বসিলেন। তখন সারঙ্গিকা আবার আসিয়া বলিল, "মহারাজের জয় হউক্! দেবী বলিলেন, আজ সন্ধ্যার সময় তিনি আপনার বিবাহ দিবেন।"

"বিবাহ! সেকি? কি ব্যাপার খুলিয়া বল ত সারঙ্গিকা?"

সারঙ্গিকা কহিল, "গত চতুর্দ্দশীতে গৌরীদেবীর পদ্মরাগ-মণিময়ী এক প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া যোগী ভৈরবানন্দের দ্বারা দেবী তার প্রতিষ্ঠা করেন। নিজেও যোগীর কাছে দীক্ষিত হন। দেবী যখন গুরুদক্ষিণা দিতে চাহিলেন,—যোগী বলিলেন, 'আমি আর কিছু গুরুদক্ষিণা চাহি না। দেবী মহারাজকে একটি কন্যাদান করুন।' তাহাতেই আমি পরিতুষ্ট হইব। লাট দেশের রাজা চন্দ্রসেনের ধনসার-মঞ্জরী নামে একটি কন্যা আছেন। দৈবজ্ঞেরা বলিয়াছেন, এই কন্যা রাজচক্রবর্ত্তীর মহিষী হইবেন। ইঁহার সঙ্গেই দেবী মহারাজের বিবাহ দিন। মহারাজ রাজচক্রবর্ত্তী হইবেন, দেবীর পক্ষে ইহাও একান্ত কাম্য বটে। গুরুদেবের আজ্ঞায় দেবী আজই সেই কন্যার সঙ্গে মহারাজার বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। প্রমোদ উদ্যানের মধ্যে চামুণ্ডাদেবীর মন্দিরে এই বিবাহ হইবে। ভৈরবানন্দ আর দেবী সেখানে আসিতেছেন। মহারাজও আসুন।"

এই বলিয়া সারঙ্গিকা চলিয়া গেল। রাজা কহিলেন, বয়স্য, আমার মনে হয় ইহার মধ্যে বিশেষ রহস্য আছে। সবই আচার্য্য ভৈরবানন্দের কৌশল।—তা, চল যাই, দেখি।"

বিদূষকের সঙ্গে রাজা চামুণ্ডার মন্দিরের দিকে চলিলেন।

ওদিকে ভৈরবানন্দ চামুণ্ডা-মন্দিরের সম্মুখে আসিলেন। চামুণ্ডাদেবীকে প্রণাম করিয়া করজোড়ে কহিলেন, "মহাকাল কল্পান্তের কেলিনিকেতনে বসিয়া বিধাতার কপাল-চষকে মহানন্দে ঝলকে ঝলকে যিনি পুরাতন রক্ত-সুরা পান করেন, সেই চণ্ডিকাদেবীর জয়!"

দেবী প্রতিমার অন্তরালে একটি সুরঙ্গের দ্বার ছিল। এই সুরঙ্গটি রক্ষগৃহের সঙ্গে সংলগ্ন। কর্পূরমঞ্জরী সেই দ্বার পথে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন—ভৈরবানন্দকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "গুরুদেব! আপনাকে প্রণাম করি।"

"যোগ্যবর লাভ কর। এইখানে বস মা।"

কর্পূরমঞ্জরী উপবেশন করিলেন। একটু পরেই রাণী আসিলেন।

কর্পূরমঞ্জরীকে দেখিয়া তিনি যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। একটু কি ভাবিয়া ভৈরবানন্দের কাছে গিয়া তিনি কহিলেন, "গুরুদেব! বিবাহের সামগ্রী সব আমার গৃহে রাখিয়া আসিয়াছি, এখন লইয়া আসিব কি?"

"হাঁ, আন।" রাণী দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। ভৈরবানন্দ বুঝিলেন, কর্পূরমঞ্জরী রক্ষাগৃহে আছেন কিনা তাই দেখিবার জন্যই রাণী আবার ফিরিয়া গেলেন। তিনি কর্পূরমঞ্জরীকে কহিলেন, "মা, এই সুরঙ্গের দ্বারে আবার তুমি রক্ষাগৃহে চলিয়া যাও। রাণী দেখিয়া ফিরিলেই আবার এখানে চলিয়া আসিবে।—"

কর্পূরমঞ্জরী তৎক্ষণাৎ সেই সুরঙ্গপথে অদৃশ্য হইলেন। রাণী রক্ষাগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কর্পূরমঞ্জরী শয্যায় শুইয়া আছেন। তাইত! মন্দিরে তবে তিনি কাহাকে দেখিলেন! সেত ঠিক এই কর্পূরমঞ্জরীরই প্রতিমূর্ত্তি!

সহচরীদিগকে বিবাহের দ্রব্যাদি লইয়া আসিতে আদেশ দিয়া বিভ্রমলেখা আবার মন্দিরে আসিলেন,—দেখিলেন, কর্পূরমঞ্জরী সেইখানে তেমনই বসিয়া আছেন। কি আশ্চর্য্য! কি রহস্য এ? আবার পরীক্ষা করিতে হইবে। তিনি কহিলেন, "গুরুদেব! বিবাহদ্রব্যাদি লইয়া সহচরীরা বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে। কিন্তু ধনসারমঞ্জরীর অলঙ্কারগুলি আনিতে ভুলিয়া গিয়াছি, আমি আবার যাই। সেইগুলি লইয়া আসি।"

দ্রুতপদে বিভ্রমলেখা আবার রক্ষাগৃহে আসিলেন। দেখিলেন, কর্পূরমঞ্জরী সেখানে তেমনই সেই শয্যায় শুইয়া আছেন। আবার তিনি মন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন দেখিলেন, কর্পূরমঞ্জরী মন্দিরে বসিয়া!"

বিভ্রমলেখা বড় বিস্ময়ে আপন মনে কহিলেন, "এই কি তবে ধনসারমঞ্জরী? গুরুদেব কি তাকেই ধ্যানের বলে এখানে আনিয়াছেন? কিন্তু আশ্চর্য্য সাদৃশ্য! কর্পূরমঞ্জরী আর ধনসারমঞ্জরী—একেবারে এক রূপ এক মূর্ত্তি! বেশভূষাও এক—কিছু পার্থক্য নাই! একদৃষ্টিতে তিনি কর্পূরমঞ্জরীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার অতুলন রূপশোভায় নিজের নয়নমনও একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িল,—চিত্তের কঠোরতা দূর হইয়া স্নেহময় প্রীতিতে পরিপূর্ণ হইল। আহা, সকল মধুররসের মূর্ত্তি ইনি! যেন পূর্ণিমার চাঁদের দিবস-সঞ্চারিণী জ্যোৎস্না! যেন রক্তকুসুমের বসন্তলক্ষ্মী! বিশ্বজয়ী এই মনোহর রূপ যে দেখিবে সেই মুগ্ধ হইবে।"

রাজা ও বিদূষক প্রবেশ করিলেন, সহচরীরাও বৈবাহিক বসন-ভূষণ ও মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি লইয়া প্রবেশ করিল। কর্পূরমঞ্জরীকে দেখিয়া রাজা যারপরনাই বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন। তিনি এখন বুঝিলেন, সকলই ভৈরবানন্দের কৌশল। রাজচক্রবর্ত্তিত্ব তিনি লাভ করিতে পারেন, তাই তাঁহার একান্ত হিতকামী এই যোগী এত কৌশল করিয়া শেষে স্বয়ং দেবীর সাহায্যেই এই সুলক্ষণা কন্যার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ ঘটাইলেন! আনন্দের উচ্ছ্বাসে তাঁহার প্রাণ পরিপূর্ণ হইল.—দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

বিভ্রমলেখা কহিলেন, "কুরঙ্গিকা, তুমি আর্য্যপুত্রকে বরের বেশভূষায় সাজাইয়া দেও। আর সারঙ্গিকা, ওই যে সব বসনভূষণ রহিয়াছে, তুমি ধনসারমঞ্জরীকে সাজাও।"

বরকন্যা সাজান হইল। কপিঞ্জল পুরোহিত হইলেন।—বরকন্যার উত্তরীয় প্রান্তে গ্রন্থি বাঁধিয়া দিয়া কপিঞ্জল কহিলেন, "সখা, এখন তোমার হাতে কর্পূরমঞ্জরীর হাতখানি তুলিয়া ধর।"

রাণী বিভ্রমলেখা চমকিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "কর্পূরমঞ্জরী! কর্পূরমঞ্জরী কে? কোথায় সে?"

ভৈরবানন্দ একটু হাসিয়া বিদূষকের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ধনসারমঞ্জরী নামেই বিবাহ দিতে পার। কর্পূরমঞ্জরীর আর একটি নাম ধনসারমঞ্জরী!"

বিভ্রমলেখা আর কোনও কথা বলিলেন না। প্রাণে বোধ হয় বড় একটি আঘাত তাঁহার লাগিয়াছিল। কিন্তু নারীধর্ম্মের যে শক্তিতে স্বামীকে তিনি অপরকে দান করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, সে শক্তি এখনও তাঁহার প্রাণে স্থির ছিল। সেই অপর যে স্বামীরই প্রেমের পাত্রী কর্পূরমঞ্জরী, তাহা জানিয়া প্রাণ একবার বড় বেদনায় চঞ্চল হইয়া উঠিল।—কিন্তু অজেয় সেই শক্তিবলে তখনই তিনি সে চাঞ্চল্য সংযত করিলেন। স্থির প্রশান্তভাবে দাঁড়াইয়া তিনি বিবাহ অনুষ্ঠান দেখিলেন, অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে,—স্বামীকে অভিবাদন করিয়া নিজের সহচরীদের লইয়া বিভ্রমলেখা ধীরপদে প্রস্থান করিলেন।

ভৈরবানন্দ কহিলেন, "মহারাজ! আপনার আর কি প্রিয় কার্য্য করিব বলুন।"

রাজা কহিলেন, "কুন্তলরাজকুমারীকে পাইলাম, আর তাঁহার ভাগ্যবলে রাজচক্রবর্ত্তীর পদও লাভ করিলাম। ইহার উপরে আর কি প্রিয় আমার হইতে পারে?—তবু এই প্রার্থনা করি সাধুরা সকলে যেন সত্যে আনন্দলাভ করেন, দুষ্টবুদ্ধি দুর্জ্জনেরা যেন নিয়ত দুঃখে পীড়িত হয়। রাজ্যের ব্রাহ্মণগণ সকলে সত্যাশিষ হউন, মেঘ সর্ব্বদা সুশস্যের উপযুক্ত বারি বর্ষণ করুক, সকল লোক লোভ-বিমুক্ত হউক,—ধর্ম্মে সকলের মতি হউক।"

রাজার মুখে উচ্চারিত এই 'ভরতবাক্যে' নাটকের এই কাহিনী সমাপ্ত হইল।

মূকত্বের অভিমান।

বর্ষা সময়ে নীরবি কোকিল করিয়াছে ভাল' কাজ,
ভেকেরা যেখানে বক্তা সেখানে উচিত বোবার সাজ।

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ।

অবাধ বাণিজ্য-বনাম-রক্ষানীতি।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অনেক লোকের সহিত কথায় এবং এদেশের অর্থনৈতিকগণের লেখা হইতে বুঝিতে এবং দেখিতে পাইতেছি অবাধ বাণিজ্য (Freetrade) এবং রক্ষা নীতি (Protection) এই উভয় মতেরই সমর্থনকারী এদেশে আছেন। অবাধ বাণিজ্য নীতির সমর্থকদিগের মধ্যে ভারতবাসী হইতে ইংরেজ অর্থনৈতিকগণের সংখ্যাই অধিক। ভারতবাসিগণের মধ্যে যাঁহারা এ বিষয়ে চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই ভারতে রক্ষানীতি প্রবর্ত্তনের সমর্থক। বর্ত্তমান যুদ্ধাবসানে সমস্ত পৃথিবীতে বাণিজ্য ঘটিত ব্যবস্থার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইবে। বাণিজ্য-নীতির উপর দেশের সমস্ত আর্থিক মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে এবং বর্ত্তমান যুদ্ধের গূঢ় কারণও এই বাণিজ্যের প্রতিযোগিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সুতরাং পৃথিবীর সকল সুসভ্য দেশেই যুদ্ধের পর এ বিষয়ে কিরূপ ব্যবস্থা হইবে, সে সম্বন্ধে আলোচনা এবং আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। ভারত এ বিষয়ে স্বাধীন না হইলেও দেশের এই নীতির উপর যখন ইহার ভবিষ্যৎ আর্থিক অবস্থা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে, তখন আমরা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। কিন্তু এদেশে এবিষয়ে কোন সুচিন্তিত লোকমত গঠন করিবার কোন চেষ্টা দেখা যাইতেছে না। রাজনৈতিক আন্দোলন করিয়া মোটামুটি আমরা সে বিষয়ে একটা লোকমত স্থির করিয়াছি, সেটি আমাদের কংগ্রেস-লিগ সিদ্ধান্ত। ভারতীয় রাজনৈতিকগণের মতে এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শাসন-সংস্কার হইলেই বাণিজ্য-নীতি প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ের সংস্কার আমাদের আয়ত্তাধীন হইবে। তখন আমরা আবশ্যকীয় অন্যান্য সংস্কারের বিষয় চিন্তা করিব। কথাটা অনেক পরিমাণে সত্য হইলেও একেবারে সঠিক নহে। উক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে বাণিজ্য-নীতির আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা বিষয়ে আমাদের মতামতের চাপ গবর্ণমেণ্টের উপর দিবার ক্ষমতা, আমাদের হাতে আসিলেও, ভারতের উপযোগী করিয়া ঐ ব্যবস্থা প্রণয়নে আমাদের কোন ক্ষমতা হইবে না। সুতরাং ইংলণ্ডের সহিত আমাদের রাজনৈতিক সম্বন্ধের মারাত্মক পরিবর্ত্তন না করিয়া বাণিজ্য-নীতি-পরিচালনে আমাদের বর্ত্তমানে কতটুকু স্বাধীনতার আবশ্যক সে বিষয়ে এই সময় হইতেই আলোচনার আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু এ দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এই বাণিজ্য-নীতি বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট এবং সঠিক ধারণা আছে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং প্রারম্ভে অবাধ বাণিজ্য এবং রক্ষানীতি বিষয়টা কি সংক্ষেপে বলা আবশ্যক।

দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক অবস্থা, অধিবাসীগণের বিশেষ প্রকৃতি প্রভৃতি নানা কারণে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য উৎপাদনের সুবিধা হইয়া থাকে। কোন বিশেষ দ্রব্য কোন দেশে যেরূপ আয়াসে এবং খরচে উৎপন্ন হইতে পারে, আর কোন দেশে হয়ত বহু আয়াসে এবং দ্বিগুণ খরচেও উহা উৎপন্ন করা যায় না। এইরূপ প্রতি দেশেরই বিশেষ বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনে একটা বিশেষত্ব থাকে। অবাধ-বাণিজ্য-বাদিগণ বলেন, এই সকল দ্রব্যের উপর কোন প্রকার রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রয়োগে আর্থিক বাধা উপস্থিত না করিয়া যত সস্তায় সম্ভব ইহাদের উৎপত্তির ব্যবস্থা করা উচিত এবং যাহাতে এরূপ কোন বাধা উপস্থিত না হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র অতি সহজে ঐ সকল দ্রব্য রপ্তানি হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা সঙ্গত। ইহাতে যে দেশে যে দ্রব্য উৎপাদনের বিশেষ সুবিধা থাকে, সেই দেশে সেই দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে সস্তায় উৎপাদিত হইয়া পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ে এবং এই উৎপাদনের ও বিনিময়ের সুবিধা পরম্পরায় পৃথিবীর সকল দেশই উহার উপযোগী যথেষ্ট দ্রব্য সস্তায় উৎপাদন এবং রপ্তানি করিয়া ধনী হইয়া উঠে। অথচ যে দেশে যে দ্রব্য উৎপাদনের সুবিধা নাই, অপর দেশোৎপন্ন ঐ দ্রব্য সেই দেশে সস্তায় পাইয়া লাভবান্ হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে আডাম স্মিথ এই মতের প্রথম প্রবর্ত্তক। পরে করডেন ইহার পৃষ্ঠপোষকতা এবং প্রচলন করিয়া গিয়াছেন। ইংলণ্ডে এখনও এই মতের প্রাধান্য রহিয়াছে এবং এই জন্য ইংলণ্ড এখনও এই নীতির অনুসরণ করিতেছেন, কিন্তু বর্ত্তমানে এ বিষয়ে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে।

রক্ষানীতি-বাদিগণ বলেন, অবাধ বাণিজ্যের সুবিধার জন্য কোন কোন দেশ একবার সুবিধা পাইয়া যে সকল দ্রব্যে

পৃথিবীর বাজার ছাইয়া ফেলিতেছে, পৃথিবীর অপর কোন দেশে ঐ দ্রব্য উৎপাদনে ঐ প্রকার কিম্বা তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে সুবিধা থাকিলেও প্রথমোক্ত দেশ এ বিষয়ে অধিক পরিমাণে অগ্রবর্ত্তী হইয়া পড়ায় উহা তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতায় অক্ষম হইয়া রহিয়াছে, এবং ঐ দেশের সেই দ্রব্য উৎপাদনে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা থাকিলেও পৃথিবীর বাজারে স্থান না পাইয়া ঐ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের আবশ্যকীয় ব্যবহার করিয়া উহা ধনবান্ হইতে পারিতেছে না। সুতরাং পৃথিবীর প্রত্যেক দেশ যখন সমান পরিমাণে এ বিষয়ে তাহাদের সম্পূর্ণ সুবিধা ভোগের অবসর পাইবে অর্থাৎ পূর্ণমাত্রায় তাহাদের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সুবিধার বিকাশ ঘটিবে, তখন অবাধ বাণিজ্য নীতি চলিতে পারিলেও পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায় উহা উপযোগী নহে। প্রত্যেক দেশকেই সেই দেশে উৎপাদনের উপযোগী দ্রব্য উৎপাদনে সুবিধা দেওয়ার জন্য সাহায্য করিতে হইবে। অর্থাৎ অপর দেশের পূর্ণ বিকশিত ঐ দ্রব্যের ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতায় দেশের ঐ দ্রব্য উৎপাদনে ব্যাঘাত না ঘটে, এজন্য বিদেশী দ্রব্যের এবং দেশের কাঁচামালের উপর শুল্ক স্থাপন করিয়া দেশীয় ঐ ব্যবসায়কে রক্ষা করিতে হইবে। হ্যামিল্টন, লিষ্ট, ক্যারী এবং প্যাটেন প্রভৃতি অর্থনৈতিকগণ কেহবা আংশিকভাবে কেহবা সম্পূর্ণরূপে এই মতের প্রতিপোষক। পৃথিবীর নানা দেশে এই মতের আরও অনেক সমর্থক রহিয়াছেন এবং ইংলণ্ডে বহুদিন হইতে অবাধ বাণিজ্যনীতি অনুসৃত হইলেও, প্রায় ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় মিষ্টার জোসেফ চেম্বার্লেন (বর্ত্তমান মন্ত্রী মিঃ অষ্টিন চেম্বার্লেনের পিতা) যে মত প্রচার করেন, তাহা এই নীতিরই আংশিকভাবে সমর্থক। বর্ত্তমানে মিঃ ব্যালফোর মিষ্টার চেম্বার্লেনের মতের প্রধান প্রতিপোষক। ইংলণ্ড এখনও অবাধ বাণিজ্য নীতির অনুসরণ করিতেছেন এবং এই নীতি অনুসরণ করিয়া ইংলণ্ড গত এক শতাব্দির মধ্যে প্রভূত পরিমাণে ধনবান্ হইয়াও উঠিয়াছেন। কিন্তু পৃথিবীর অপরাপর অধিকাংশ সভ্য দেশ সমূহ এই নীতির একেবারেই অনুসরণ করিতেছেন না। ফ্রান্স, জর্ম্মাণী, জাপান, ইউনাইটেড ষ্টেট্স্ এমন কি ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ব্রিটিশ উপনিবেশ সমূহও রক্ষানীতি অবলম্বন করিয়াছেন এবং আমদানী দ্রব্যের উপর যথেষ্ট পরিমাণে কর স্থাপন করিয়া দেশীয় শিল্পের অভাবনীয় উন্নতিসাধন করতঃ ক্রমশঃ অতিশয় ধনবান্ হইয়া উঠিতেছেন। ইংলণ্ড যদিও ঐ সকল দেশ হইতে আমদানী দ্রব্য বিনা বাধায় দেশে আনিতে দিতেছেন, কিন্তু ইংলণ্ড হইতে ঐ সকল দেশে আমদানী দ্রব্যের উপর ঐ হারে ডিউটি বসিয়াছে, ইহার ফলেই ইংলণ্ডে মিঃ চেম্বারলেন এবং ব্যাল্‌ফোরের দলের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহারা Retaliation, Preferential Tariff প্রভৃতি নানা প্রকার নামে রক্ষানীতিরই বিভিন্ন ভাবের সমর্থন করিতেছেন। এই সমস্ত বিষয়ের এখানে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ভারতের এ বিষয়ে কোনই স্বাধীনতা নাই। ইংলণ্ড যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, ভারতের এ বিষয়ের তাহাই নীতি। ভারতগভর্ণমেণ্টকে ইংলণ্ডের আদেশ মত এই সকল বিষয়ের ব্যবস্থা করিতে হয়। ইংলণ্ড যখন অবাধ বাণিজ্য নীতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক, তখন ভারতেরও সেই গতি। ইংলণ্ডে চেম্বারলেন এবং ব্যাল্‌ফোর প্রমুখ যে Tariff সংস্কারের নূতন প্রস্তাব উঠাইয়াছিলেন তাহাতে কেবল উপনিবেশ সমূহের কথাই শুনিয়াছিলাম, ভারতের তাহাতে কোন স্থান ছিল বলিয়া মনে পড়ে না। বর্ত্তমান যুদ্ধাবসানে কি রীতি অবলম্বিত হইবে, সে বিষয়ে যে আলোচনা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে ভারতের কাঁচামালের কথা অনেক দেখিতে পাই ; কিন্তু এ বিষয়ে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং সাম্রাজ্যবাদনীতি অব্যাহত রাখিয়াও ভারতকে কি ক্ষমতা দেওয়া হইবে সে বিষয়ে একটা সঠিক প্রস্তাব খুঁজিয়া পাই নাই। এ বিষয়ে কোন আন্দোলন ভারতেও একেবারে দেখি না। কিন্তু এই সময় আমাদের এ বিষয় একটি লোকমত সংঘটিত করা অতিশয় আবশ্যক, নতুবা সম্মুখের পরিবর্ত্তন বিবর্ত্তনের দিনে আমাদের যদি নূতন অসুবিধা না আসে, তবুও বিশেষ নূতন সুবিধা আসিবে বলিয়া মনে হয় না। স্বীকার করি, ইংলণ্ডের স্বার্থে আমাদেরও স্বার্থ আছে। কিন্তু উহা ভিন্ন আমাদের একটা স্বতন্ত্র স্বার্থের বিদ্যমানতাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেটা আমাদিগকেই দেখিতে হইবে।

ইংলণ্ডে এখনও অবাধ বাণিজ্যনীতি চলিতেছে। সুতরাং বিদেশী দ্রব্যের উপর ইংলণ্ডের কোন রক্ষাশুল্ক (Protective duty) নাই। কিন্তু ইংলণ্ডের সকল দ্রব্যের উপরেই, যে সকল দেশ রক্ষানীতি অবলম্বী, তাহারা এই শুল্ক

বসাইয়া তাহাদের নিজ নিজ দেশে ঐ সকল দ্রব্য উৎপাদনের সাহায্য করিতেছে। ইহা স্বত্বেও ইংলণ্ড অবাধ বাণিজ্যনীতি পরিত্যাগ করেন নাই। উহাতে মোটের উপর ইংলণ্ডের কোন ক্ষতি হয় নাই, পরন্তু সুবিধাই হইয়াছে। কিন্তু গত এক শতাব্দীর মধ্যে ইংলণ্ড এই নীতি সত্ত্বেও যে অতিশয় ধনী হইয়া উঠিয়াছেন, তাহার কারণ আছে। ইংলণ্ড শিল্প প্রধান দেশ। উহার ধনাগমের প্রধান উপায়—শিল্প। অন্যদেশে শিল্পোৎপন্ন দ্রব্য পাঠাইয়া রক্ষাশুল্ক সত্ত্বেও ইংলণ্ড লাভ না করিতেছেন এরূপ নহে; তবে এই শুল্কের জন্য কেবল কতকগুলি বিশেষ পণ্য ভিন্ন অন্যান্য অনেক উৎপন্ন দ্রব্যের বাণিজ্যে ইংলণ্ড তেমন সুবিধা করিতে পারিতেছেন না। ইংল্যাণ্ডে যে খাদ্য এবং কাঁচামাল (Raw materials) উৎপন্ন হয়, তাহাতে ইংলণ্ডবাসীর আহার এবং শিল্পের কাজ একবারেই চলে না। সুতরাং এই সকল দ্রব্য তাহাকে বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। অবাধ বাণিজ্যনীতির ফলে এই সকল দ্রব্যের আমদানীর উপর ইংলণ্ডের কোন রক্ষাশুল্ক নাই; সুতরাং কাঁচামাল এবং খাদ্য তথায় সস্তায় পৌছিতে পারে। রক্ষা-নীতি অবলম্বিত হইলে, খাদ্য এবং কাঁচামাল দুর্মূল্য হইয়া ইংলণ্ডের অসুবিধা ঘটিবে বলিয়া ইংলণ্ড অবাধ বাণিজ্য-নীতির কোন পরিবর্ত্তন আবশ্যক বোধ করিতেছেন না। কিন্তু ইংলণ্ডের উপনিবেশগুলি পর্য্যন্ত এই নীতি পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব দেশের শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি করিয়া ফেলিয়াছে।

এখন এ বিষয়ে ভারতবর্ষের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা বিবেচনা করা দরকার। ভারতের এ বিষয়ে কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। রাজনৈতিক ভাষায় ভারত ইংলণ্ডের উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইংলণ্ডের পার্লা-মেন্টের মত অনুসারে ভারত গভর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে ব্যবস্থা করিতে হয়; সুতরাং ভারতের এ বিষয়ে কোনই স্বাধীনতা নাই। ফল স্বরূপ এ দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির কোন বিশেষ ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা এ দেশের গভর্ণমেণ্টের নাই।

ভারতের এক সময় যথেষ্ট শিল্প-গৌরব ছিল। কিন্তু বিদেশী কলকারখানার প্রতিযোগিতা হইতে উহাকে রক্ষা করিতে কিম্বা এ দেশেও ঐ সকল উন্নততর প্রণালী অবলম্বন করিতে কোন চেষ্টা করা হয় নাই। ফলতঃ ভারতের অধিকাংশ প্রাচীন শিল্প নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভারতে প্রচু পরিমাণ কাঁচামাল উৎপন্ন হয়। এ জন্য অবাধ বাণিজ্যনীতি সত্ত্বেও ঐ সকল কাঁচামাল হইতে এ দেশে এত শিল্পোৎপ দ্রব্য জন্মিতে পারে, যে সমস্ত পৃথিবীর বাজার আমরা ছাই ফেলিতে পারি। কিন্তু বর্ত্তমান উন্নততর প্রণালী এখনও এদে যথেষ্ট রূপ অবলম্বিত হয় নাই,—ইহার চেষ্টা হইতেছে ব কিন্তু বিদেশী প্রতিযোগিতার জন্য আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছিনা। নূতন কার্য্য পুরাতনপ্রতিষ্ঠিত কার্য্যে সহিত সাধারণতঃ প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য্য হইতে পারে না সুতরাং উদীয়মান ভারতীয় শিল্পকে বাঁচাইতে হইলে তাহা রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার দরকার। ভীমকায় মল্লে সহিত অপরিণত বালককে যুদ্ধে নিয়োগ করিতে হই তাহাকে বিশেষ অস্ত্রে সজ্জিত করা প্রয়োজন, নতুবা তাহা ফল কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা বলিবার আবশ্যক নাই রক্ষাশুল্ক সেই অস্ত্র। রক্ষানীতি-বাদিগণ ভারতীয় শিল্পকে এই অস্ত্রে সজ্জিত করিতে চান।

কিন্তু অপরাপর দেশ ইংলণ্ডের পণ্যের উপর শু বসাইয়া তাঁহার বাণিজ্যক্ষেত্র সঙ্কোচ করিয়া রাখায়, ইংলণ্ডে পণ্য বাঁচাইবার প্রধান বাজার হইয়াছে ভারতবর্ষ। ভারতে ঐ নীতি অবলম্বিত হইলে ইংলণ্ডের শিল্পবাণিজ্যের গুরুত অন্তরায় উপস্থিত হয়। সুতরাং ইংলণ্ড কোন ক্রমে ভারতকে অবাধবাণিজ্য নীতি হইতে বিচলিত হইতে দিতে পারেন না। ফল স্বরূপ পৃথিবীর অনান্য দেশও বিন রক্ষাশুল্কে ভারতে তাহাদের দ্রব্যসম্ভার পাঠাইয়া এ দেশে ব্যবসায়ের সুবিধা পাইয়াছেন এবং ভারতের অনেক শিশুশি তাহাতেও মারা যাইতে বসিয়াছে। রক্ষানীতি-বাদিগণের মতে এদেশে রক্ষাশুল্ক বসাইয়া বিদেশী দ্রব্যের মূল্য বাড়াইয়া দিলে গভর্ণমেণ্টের যথেষ্ট অর্থাগম হইয়া এদেশে ট্যাক্সে ভার লঘু হইয়া আসিবে, এ দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের যথে উন্নতি হইয়া দেশ ক্রমশঃ ধনবান্ হইবে এবং লোকের সমস্ত কষ্ট দূর হইয়া যাইবে।

অবাধ বাণিজ্যনীতি-বাদিগণ বলেন, কথাটা শুনিতে বেশ বটে কিন্তু ঐ নীতি অবলম্বিত হইলে দেশের লোকে কষ্ট বাড়িবে বই কমিবে না। উহাতে ট্যাক্সের ভার ল হইবে না। ট্যাক্স আরও বাড়িবে। দেশে যথেষ্টপরিমা শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হইবার জন্য যে মূলধন, শিল্পজ্ঞা

কার্য্যদক্ষতার দরকার তাহার এখনও অভাব আছে। সুতারং বিদেশী পণ্যের উপর রক্ষাশুল্ক বসিলেই ঐ সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে এদেশে উৎপন্ন হইতে পারিবে না। ফলতঃ বিদেশী শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবহার উহাতে কমিবে না। কিন্তু রক্ষাশুল্কের ফলে ঐ পরিমাণ অধিক মূল্যে ভারতবাসীকে উহা কিনিতে হইবে, অর্থাৎ ঐ শুল্ক এদেশবাসীকে দিতে হওয়ায় উহা একটি নূতন ট্যাক্স স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে। কাপড় প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যই অনেক বিদেশ হইতে আমদানী হয়, উহার মূল্য চড়িয়া যাওয়ায় সাধারণ প্রজার কষ্ট বাড়িবে। দেশে যথেষ্ট মূলধন না থাকায় উহা এদেশে যথেষ্ট উৎপাদনের ব্যবস্থা হইতে পারিবে না। আর যদিও বা শুল্কের দ্বারা বিদেশী দ্রব্য আমদানীতে আমরা বাধা দিতে সমর্থ হই তাহা হইলেও ঐ সকল শিল্প ভারতবাসীর হাতে আসিবে না কারণ বিদেশী মূলধনের এবং বিদেশী শিল্পীর আমদানী আমরা বন্ধ করিতে পারিব না। বিদেশী ধনী এবং বিদেশী শিল্পী যখন দেখিবে যে বিদেশে পণ্য উৎপাদন করিয়া এদেশে পাঠাইতে আর যথেষ্ট লাভ হইতেছে না, তখন এদেশেই তাহারা ঐ সকল দ্রব্য উৎপাদনের কলকারখানা বসাইবে। ইহাতে আমাদিগের শিল্প শিক্ষার এবং শ্রমজীবিদিগের অর্থাগমের কিছু সুবিধা ঘটাইয়া দেশের উপকার করিলেও আমরা অবাধ বাণিজ্য-নীতি পরিত্যাগের সম্পূর্ণ সুবিধা পাইব না। সুতরাং ভারতের পক্ষে যথেষ্ট কাঁচামাল উৎপন্ন করিয়া পৃথিবীর বাজারে উহা চাপাইয়া ধনবৃদ্ধির চেষ্টা করা উচিত এবং অবাধ বাণিজ্যনীতি বজায় রাখিয়া যাহাতে সস্তায় আবশ্যকীয় বিদেশী শিল্প দ্রব্য পাওয়া যায়, সেই ব্যবস্থা করাই দরকার। দেশে প্রচুর মূলধন এবং সুদক্ষ শিল্পীর আবির্ভাবের পূর্ব্বে অন্যরূপ ব্যবস্থায় কেবল দেশের অনিষ্টই করিবে। এই উভয় পক্ষের কথার মধ্যেই যথেষ্ট সত্য আছে। কিন্তু ইহারা নিজ নিজ মতের এতদূর গোঁড়া যে অপর দলের কথা একেবারে অলীক বলিয়াই উড়াইয়া দিতেছেন। শুল্ক দ্বারা শিশুশিল্পের রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া গত ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যে জাপান, জর্ম্মণী, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স প্রভৃতি কিরূপ ধনবান্ হইয়া উঠিয়াছে এবং অবাধ বাণিজ্য-নীতি অবলম্বী ইংলণ্ডকে অনেক স্থলে পৃথিবীর বাজারে কিরূপে পরাস্ত যখন কাঁচামাল অন্য দেশ হইতে সস্তায় পাইবার সুবিধা আছে, তখন চেষ্টা করিলে অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও কতকগুলি শিশুশিল্পকে বর্দ্ধিত করিয়া তোলা যাইবে না এরূপ মনে করিবার হেতু নাই। আবার বর্ত্তমানে রক্ষাশুল্ক বসাইলে যে ঐ শুল্ক বর্দ্ধিত মূল্যের আকারে আমাদিগকেই দিতে হইবে এবং হঠাৎ আমাদিগের সমস্ত শিল্প বাড়িয়া উঠিবে না, সে কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ফলতঃ এই দুই দলের কোন মতই সম্পূর্ণভাবে ভারতের পক্ষে খাটে না। ভারতের বিশেষ বিশেষ শিল্পের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন। কোন প্রমাণবিহীন স্থির বিশ্বাস (dogmatic assertion) আমাদিগের ধরিয়া থাকিলে চলিবে না। হঠাৎ রক্ষানীতি অবলম্বিত হইলে যেমন দেশের পক্ষে নানা অসুবিধা ঘটিবে, অবাধ বাণিজ্য-নীতি বর্ত্তমান আকারে বহাল রাখিলেও সেইরূপ নানা ক্ষতি হইবে। সুতরাং বিশেষ বিশেষ কার্য্যে আবশ্যকীয় ব্যবস্থার দ্বারা দেশের হিতসাধন করাই এ ক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্ত্তব্য।

ষ্টেটের চেষ্টায় যে দেশের কিরূপ উন্নতি হইতে পারে, তাহার একটা উদাহরণ জর্ম্মাণীর "ওয়ারাটম্বার্গ" রাজ্য। এই দেশে এক সময় কৃষি ভিন্ন কোন কাজ ছিল না। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট গত ৫০ বৎসরের মধ্যেই উহাকে পৃথিবীর মধ্যে একটি প্রধান শিল্পপ্রধান রাজ্যে পরিণত করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট ব্যবসায় শিক্ষার জন্য প্রথমতঃ দেশে বিস্তর স্কুল প্রতিষ্ঠা করিলেন, পরে শিল্পপ্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট অর্থসাহায্য প্রদান করিতে লাগিলেন। ষ্টেট হইতেও নানা রূপ শিল্পের কুঠী স্থাপিত হইল এবং বহু সংখ্যক শিল্পী উন্নততর আধুনিক প্রণালী শিক্ষার জন্য বিদেশে প্রেরিত হইল। ইহার ফলে এই রাজ্য অল্পদিনেই কিরূপ সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে, তাহা অনেকেই দেখিতে পাইতেছেন। পৃথিবীর সমস্ত দেশের গভর্ণমেণ্টের পক্ষেই এইরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভবপর। তবে সেই ব্যবস্থার ক্ষমতা এবং ইচ্ছা গভর্ণমেণ্টের থাকা চাই।

এইরূপ উন্নতির আর একটি উদাহরণ বর্ত্তমান জাপান। জাপান গভর্ণমেণ্ট দুর্ব্বল শিল্পের উন্নতির জন্য যথেষ্ট অর্থসাহায্য করিয়াছেন, এবং সিমেণ্ট, কাঁচ, সাবান, কাগজ, অক্ষর এবং যন্ত্রাদি প্রস্তুতের কার্য্য অনেক চেষ্টা করিয়া

চেষ্টায় ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিলে আজ জর্ম্মাণী, জাপান প্রভৃতির দেশের অন্যপ্রকার অবস্থা দেখিতে পাইতাম। আবার অবাধ বাণিজ্য-নীতি অবলম্বনে ইংলণ্ড কিরূপ ধনবান্ হইয়া উঠিয়াছেন তাহাও ভুলিয়া গেলে চলিবে না। রক্ষা-নীতি সত্ত্বেও ইংলণ্ডের বিশেষ অবস্থা এবং বিশেষ ব্যবস্থাই ইহার কারণ।

এদেশে জর্ম্মাণী কিম্বা জাপানের মত সাহায্য গভর্ণমেণ্ট দেশীয় শিল্পকে করিতেছেন না। বিট-চিনি কিরূপ সস্তায় এদেশে বিক্রয় হইত, তাহা সকলেই জানেন। অষ্ট্রিয়া এবং জর্ম্মাণী হইতে সাধারণতঃ উহা আমদানী হইত এবং ঐ সকল দেশের গভর্ণমেণ্ট রাজস্ব হইতে ঐ সকল চিনির কারখানাগুলিকে এত অধিক পরিমাণে অর্থসাহায্য Bounty প্রদান করিতেন যে ভারতে উহা যে মূল্যে বিক্রয় হইত, গভর্ণ-মেণ্টের উক্ত সাহায্য ব্যতিরেকে তাহাতে লাভ দূরের কথা, উহা প্রস্তুত করিবার খরচই কুলাইত কিনা সন্দেহ। তাহাদের গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে এই সব শিশু ব্যবসায় বৃদ্ধি পাইয়া ভারতের চিনি ও গুড়ের ব্যবসায় একেবারে নষ্ট করিয়া দিলেও অবাধ বাণিজ্য নীতির জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট ইহার কোন প্রতিকার করিতে পারেন নাই। রাজস্বের উদ্দেশ্যে লর্ড কর্জ্জনের সময় উহার উপর সামান্য শুল্ক বসিলেও, ইহাতে দেশীয় চিনির ব্যবসায়কে রক্ষা করিতে পারে না এবং দেশীয় ঐ ব্যবাসায়কে অন্য প্রকারে সাহায্য করিয়াও গভর্ণমেণ্ট উহাকে সজীব রাখিবার চেষ্টা করেন না। পরন্তু ১৯১ খৃষ্টাব্দে ষ্টেট সেক্রেটারী মহাশয় এইরূপ কোন কার্য্যে রাজস্ব হইতে কোন প্রকার সাহায্য না করা হয় এই মর্ম্মে এক আদেশ জারী করেন। ফলতঃ জর্ম্মাণী এবং অষ্ট্রিয়ার সহিত প্রতিযোগিতায় আমাদের আত্ম-রক্ষার কোন ক্ষমতা না থাকায়, আমাদের চিনির ব্যবসায়ের ভয়ানক দুর্গতি ঘটে। বর্ত্তমান যুদ্ধের বাজারে বিদেশী চিনির আমদানীতে বাধা পড়ায় গভর্ণমেণ্টের উক্ত নীতির ফল আমরা বিলক্ষণ রূপে বুঝিতে পারিতেছি।

(পর সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র।

জ্যৈষ্ঠে

(১)

শরতের প্রাতে এসেছিলে তুমি
স্নিগ্ধ মধুর দরশন্,
মুগ্ধ কোমল পরশন্।
আজ এলে যবে হেরি চোক তুলি,
হাসিমাখা সাজ ফেলিয়াছ খুলি,
জ্বালাময়ী সাজে সাজিয়া এসেছ
জ্যৈষ্ঠের খর বরষণ্।
কোথায় কোমল পরশন্!

(২)

তখন তোমার চরণ পরশে
ফুটিয়া উঠিত ফুলদল,
তটিনী গাহিত ছল ছল।
সারাদিন ভোর পিক আনমনে
গাহিত লুকায়ে ঘন ফুল বনে,
আজ হা হা রব সারা বনময়
শুষ্ক কঠিন ধরাতল।
নাহি তটিনীর কল কল্।

(৩)

কোথায় লুকালে এমন সহসা
শেফালিকা ভরা সাজিখান!
দিক মুখরিত পিকগান!
দেখেছিনু যেন নীলবাস খানি
মাথার উপরে দিয়াছিলে টানি,
কেন ফেলে দিলে সে বসন আজ
কোথায় শারদ হাসিখান!
দিক মুখরিত পিকগান!

(৪)

তবু দেখি আজ হস্তে তোমার
দোদুল দুলিছে ফলভার,
বক্ষে শোভিছে ফলহার।

নূতন শোভার উৎস খুলিয়া
নূতন হাসির লহর তুলিয়া,
সহসা আমার সমুখে দাঁড়ালে
বহিয়া মোহন উপহার,
দোদুল দুলিছে ফলভার।

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত।

ইয়োরোপের কথা।

নবম পরিচ্ছেদ।

ফিউডালিজ্‌ম্ বা সামন্ততন্ত্র।

উদ্ভব।

রোমীয় সাম্রাজ্যের ধ্বংসের আরম্ভ হইতে সার্লম্যানের সময় পর্য্যন্ত একটা ঘোর বিপ্লবের যুগ ইয়োরোপে আসে। সার্লম্যান্ বিপ্লব-বিধ্বস্ত ইয়োরোপকে একটা সাম্রাজ্য-শাসন-বিধির অধীনে আনিতে চেষ্টা করেন। চেষ্টা সফল হয় না। যাহা হউক, তাঁহার তিরোধানের কিছুকাল পর হইতে নূতন এক যুগের আরম্ভ হয়। এ যুগ সাধারণতঃ মধ্যযুগ নামে পরিচিত। ফিউডাল বা সামন্ত তন্ত্র এ যুগের সমাজ ও রাষ্ট্র বিধানের বিশেষত্ব। এই অধ্যায়ে আমরা সেই ফিউডাল তন্ত্রের আবির্ভাব ও মোট প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

'রোমীয় সম্রাট্' এই উপাধি গ্রহণ করিয়া রোমীয় উন্নত শাসননীতির অনুকরণে সার্লম্যান্ তাহার বহু বিস্তৃত সাম্রাজ্য আপন কর্ত্তৃত্বাধীনে সমান এক শাসনশৃঙ্খলায় বাঁধিয়া রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু তখনও জর্ম্মাণ জাতির মধ্যে দুর্দ্দান্ততা উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বতন্ত্রপ্রভুত্বপ্রিয়তা এত প্রবল ছিল, উন্নত সামাজিক বুদ্ধিতে তাঁহারা এত পশ্চাৎপদ ছিলেন, যে কোনও রাষ্ট্রশাসনপ্রণালীর বশ্যতা স্বীকার তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সার্লম্যানের অসাধারণ প্রতিভা ছিল, অনন্যসুলভ কর্ম্মশক্তির অধিকারী তিনি ছিলেন,—কখনও যুদ্ধে, কখনও শাসনে, কখনও বিবিধ বিধিব্যবস্থার প্রণয়নে, কখনও সাম্রাজ্যের প্রদেশসমূহের পরিদর্শনে, দীর্ঘরাজত্বকাল ভরিয়া তিনি অক্লান্ত-ভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন। তাহাতেও সর্ব্বত্র সকল শ্রেণীর প্রজাকে তিনি একেবারে আপন শাসন-বিধির অধীনে আনিতে পারেন নাই। তবু তাঁহার রাজত্বকালে কতক শৃঙ্খলা ছিল, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর সমগ্র মধ্য-ইয়োরোপ-বিস্তৃত তাঁর বৃহৎ সাম্রাজ্য ভরিয়া আবার একটা ভীষণ বিশৃঙ্খল অবস্থা উপস্থিত হইল। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী ভরিয়া এই বিশৃঙ্খল অবস্থা চলিল। এক বাহুবল ব্যতীত কেহ কাহাকেও কোনওরূপ নিয়মের অধীন রাখিতে পারেন, এমন সম্ভাবনা কোথাও রহিল না। সার্লম্যান সকল শক্তিকে এক শাসন কেন্দ্রের অধীনে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন, এখন পরস্পর বিচ্ছিন্ন একটা স্বাতন্ত্র্যভাব সর্ব্বত্র প্রবল হইয়া উঠিল। সার্লম্যান নিজে ফ্রাঙ্ক ছিলেন, কিন্তু বহু বিভিন্ন জর্ম্মাণ সম্প্রদায়কে তিনি যুদ্ধে জয় করিয়া আপন সাম্রাজ্য-ভুক্ত করেন। ইঁহাদের অধিপতিগণকে সার্লম্যান একেবারে পদচ্যুত করিতে পারেন না, নিজের অধীন সামন্তরূপে গ্রহণ করেন। এই সব সামন্ত সাধারণতঃ ডিউক নামে পরিচিত ছিলেন। নিজ নিজ অধীনস্থ সম্প্রদায়গুলির

উপরেও ইঁহাদের প্রভুত্ব যথেষ্ট ছিল। বংশানুক্রমেই ইঁহারা এই প্রভুত্ব পরিচালনা করিতেন। ইঁহাদের শক্তি অতিশয় বৃদ্ধি না পায়, এই উদ্দেশ্যে সার্লম্যান সর্ব্বত্র নিজের কর্ম্মচারী বা নায়েব প্রেরণ করিতেন, এই সব নায়েব কাউণ্ট নামে পরিচিত ছিলেন।

সার্লম্যানের মৃত্যু হইল। তাঁহার উত্তরাধিকারিরা কেহই তাঁহার মত শক্তিমান্ ছিলেন না। জমিদারীর সম্পত্তির মত সাম্রাজ্য ইঁহাদের মধ্যে বিভক্ত হইতে লাগিল। যিনি যখন সম্রাট্ উপাধিলাভ করিতেন, অন্য সকলে নামতঃ তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিলেও কার্য্যতঃ স্বাধীনই ছিলেন। তারপর পরস্পরে অবিরত যুদ্ধবিগ্রহও হইত। এরূপ অবস্থায় ডিউকদের সম্বন্ধে ত কথাই নাই, কাউণ্টদের উপরেও কোনওরূপ রাজকীয় প্রভুত্ব ইঁহারা কেহ রাখিতে পারিলেন না। যে ভূভাগে যিনি রাজার কর্ম্মচারীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সেই ভূভাগ তিনি দখল করিয়া বসিলেন, বংশানুক্রমেই এই দখল চলিল। রাজাদের অধীনে সর্ব্বত্র এইরূপ সামন্তের আবির্ভাব হইল। ইঁহারা রাজাকে বা সম্রাট্‌কে প্রভু বলিয়া মানিতেন,—কিন্তু নিজ নিজ অধিকৃতপ্রদেশ রাজার মতই শাসন করিতে চেষ্টা করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে এবং ইঁহাদের অধীনস্থ প্রধান প্রজাদের মধ্যেও কোনও শাসনশৃঙ্খলা ছিল না,—সকলেই সমান দুর্দ্দান্ত, সমান উচ্ছৃঙ্খল, সমান রণদুর্ম্মদ! সর্ব্বত্র সকলের মধ্যে অবিরত যুদ্ধ বিগ্রহ চলিত। প্রবল দুর্ব্বলকে যথেষ্ট উৎপীড়ন করিত। এরূপ অবস্থায় প্রবলের শরণাগত হওয়া ব্যতীত দুর্ব্বলের আর গতি ছিল না। যারা দুর্ব্বল, প্রতিকারে অশক্ত হইয়া উৎপীড়নের ভয়ে তারা নিকটবর্ত্তী প্রবল ভূম্যধিকারীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল।

অতি প্রাচীন কাল হইতে গ্রামবাসী জর্ম্মাণ গৃহস্থগণ সকলেই স্বাধীন গৃহস্থ ছিল। প্রত্যেক গৃহস্থ নিজেই তার জমির মালিক,—কাহাকেও খাজনা দিয়া বা কোনওরূপ সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া তাহাকে জমি নিতে হইত না। দলপতি, রাজা বা প্রধান যাঁহারা ছিলেন, ভূস্বামী বলিয়া সাধারণ গৃহস্থগণের উপরে কোনও দাবী তাঁহাদের ছিল না। বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের উপরে তাঁহারা যুদ্ধে ভূমির উপস্বত্বই তাঁহাদের সম্পদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। রাইয়ত ছিল না, রাইয়তের খাজনাও ছিল না।

কিন্তু এখন, এই দেশবিপ্লবে সর্ব্বত্র প্রবলের উৎপীড়নের মধ্যে, স্বাধীন গৃহস্থগণের পক্ষে আত্মরক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। রক্ষার আশায় তাহারা নিকটবর্ত্তী ভূ-স্বামীদের হাতে আপন আপন জমি ছাড়িয়া দিয়া, আবার তাঁহাদেরই অধীন ও আশ্রিত সেবকরূপে প্রভুর দানের ন্যায় সেই জমি পুনঃ গ্রহণ করিতে লাগিল। এইরূপে স্বাধীন গৃহস্থগণ বড় বড় ভূস্বামীদের আশ্রিত প্রজায় পরিণত হইল।

বহুদিন হইতেই আবার জর্ম্মাণসমাজে একটা নূতন প্রথামত বড়তে ছোটতে একটা সামাজিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। যুদ্ধ করিতে হইলে, কেহ একা যুদ্ধ করিতে পারে না,—পাঁচজনে দল বাঁধিতে হয়। একজন বড় দলপতির নেতৃত্ব ছাড়া এমন দলও বাঁধে না। তাই রণপ্রিয় যুবকগণ বড় কোন বীরের নেতৃত্বগ্রহণ করিতেন,—দল বাঁধিয়া তাঁহার অনুচররূপে তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেন। বড় বড় বীরেরা এইরূপে এক একটা যোদ্ধৃদলের প্রভু হইলেন। দলস্থ যোদ্ধৃগণ আপনাদিগকে দলপতি প্রভুর সমরানুচর বলিয়া মনে করিবেন, যখনই ডাক পড়িবে, নিজ নিজ অস্ত্র লইয়া তাঁর নেতৃত্বাধীনে যুদ্ধে যাইবেন,—দলপতির সঙ্গে দলস্থ যোদ্ধৃগণের এইরূপ একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। সানুচর দলপতি কোন ভূভাগ অধিকার করিতে পারিলে, সেই ভূভাগের কতক অংশ নিজে রাখিতেন, কতক অনুচরদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতেন। অস্ত্রধারী প্রজাদের লইয়া যখন প্রয়োজনে যুদ্ধে প্রভুর সহায়তা করিতে উপস্থিত হইবেন, প্রধানতঃ এই নিয়মেই এই সব জমির বন্দোবস্ত হইত।

এখনও, দুর্ব্বল যাঁহারা প্রবলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন, এই প্রথার অনুবর্ত্তনে এই নিয়মেই তাঁহাদের সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট হইতে থাকিল। শতাধিক বৎসর যাবৎ সার্লম্যানের সাম্রাজ্য এবং সাম্রাজ্যের প্রান্তিক দেশগুলি ভরিয়া যে নিয়ত যুদ্ধবিগ্রহের বিশৃঙ্খলতা চলিল, তার মধ্যে সর্ব্বত্রই প্রবলে দুর্ব্বলে এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে লাগিল। বড় বড় ডিউক ও কাউণ্টদের সঙ্গেও তাঁদের অধীনস্থ ভূম্যধিকারিগণের সম্বন্ধ এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল,—তাঁহারাও

ক্রমে এইভাবের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নীতি অনুসারে প্রবল দুর্ব্বলে, বড়তে ছোটতে, রাজায় প্রজায়, এই সম্বন্ধ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, দশম শতাব্দীতে নূতন এক রাষ্ট্রগত সমাজতন্ত্র ইয়োরোপে প্রতিষ্ঠিত হইল,—ইহাই ফিউড্যাল বা সামন্ততন্ত্র নামে পরিচিত।

ফিউডাল নীতি।

এখন ফিউডাল তন্ত্রের মোট মোট নীতিগুলি কিরূপ ছিল, এবং ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রে ও সমাজে তাহার প্রভাব কি হইল, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

দেশের সম্পদব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা —এই তিনদিক হইতে ফিউডাল তন্ত্র এবং তার নীতির কথা আমরা আলোচনা করিতে পারি।

১। সম্পদ ব্যবস্থা—দেশের ভূমি এবং ভূমিজাত শস্যাদিই তখন দেশের প্রধান সম্পদ লোকের ছিল, ভূমির বিলিব্যবস্থা সম্বন্ধে ফিউডাল নীতি যেরূপ হইল তাহার মোট কথা এই।—

মূল ভূস্বামী ঈশ্বর এবং ঈশ্বর হইতে দেশের ভূস্বামিত্ব রাজা লাভ করিয়াছেন, ইহাই হইল গোড়ার কথা। রাজার নিজের প্রয়োজনে কতক ভূসম্পত্তি খাসদখলে থাকিত,—বাকী সব নিজের প্রধান প্রধান অনুচরদের মধ্যে বিভক্ত হইত। ইহারা রাজার 'ভ্যাছাল' (Vassal) বা অধীন লোক নামে পরিচিত হইতেন। জন সমাজে ইঁহারা খাস জমিদার বা ব্যারণ নামে অভিহিত হইতেন। ভূমিস্বত্ব ভোগের জন্য রাজাকে কোনও রূপ রাজস্ব ইঁহাদের দিতে হইত না। রাজা ডাকিলে রাজদরবারে গিয়া তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করিতে হইবে, যুদ্ধের সময় অধীনস্থ সকল লোকজন লইয়া রাজার সাহায্য করিতে হইবে, রাজার অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকিতে হইবে, এবং কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট রাজকীয় অনুষ্ঠানে রাজাকে কিছু কিছু অর্থসাহায্য করিতে হইবে,—মোটামোটি এই সব সর্ত্তে রাজার 'ভ্যাছাল' বা ব্যারণগণ রাজার নিকট হইতে সম্পত্তি লাভ করিয়া তাহা ভোগ করিতেন। রাজার এই খাস ব্যারণগণের ভূসম্পদ দেশের বড় একটি ভূভাগ বা প্রদেশের মতই হইত।

এই খাস ব্যারণগণ আবার এই ভূসম্পদের কতক অংশ নিজেদের খাসদখলে রাখিয়া বাকী সব তাঁহাদের অধীনস্থ প্রধান লোকদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতেন। রাজার সঙ্গে তাঁহারা যে সব নিয়মে বদ্ধ হইতেন,—ইহাদের অধীনস্থ ভূস্বামিগণও তাঁহাদের সঙ্গে সেই নিয়মেই বদ্ধ হইতেন। বড় বড় খাস ব্যারণদের অধীনে ইঁহারা ছোটব্যারণ হইতেন।

ভূমির বিভাগ এইখানেই শেষ হইত না,—এই ছোট ব্যারণরাও একই নিয়মে একই সর্ত্তে আপনাদের অধীনস্থ আরও ছোট ছোট জমিদারদের মধ্যে জমি ভাগ করিয়া দিতেন। দেশের বা প্রদেশের আয়তন ও সাধারণ অবস্থা অনুসারে পর পর এইরূপ অনেক ভাগ হইত। উপরওয়ালা প্রভুর সামরিক আনুগত্য এবং যুদ্ধের সময় অধীন লোকজন লইয়া প্রভুর সহায়তার জন্য প্রভুর অধীনে যুদ্ধযাত্রায় বাধ্যকতা, ইহাই ভূমির বড় মালিকের সঙ্গে অধীন ছোট মালিকের প্রধান সম্বন্ধ ছিল। তখনকার সেই বর্ব্বরযুগে নিয়ত যুদ্ধ বিগ্রহ যখন হইত, তখন রাজা হইতে পর পর বিভিন্ন শ্রেণীর জমীদারদের মধ্যে এইরূপ সামরিক আনুগত্যের সম্বন্ধই যে স্বাভাবিক একথা স্বীকার করিতে হইবে।

সার্লেমানের পর তাঁহার বংশধর রাজগণের সঙ্গে অধীনস্থ ডিউক ও কাউন্টদের আপনা হইতেই এরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হইতেছিল। ক্রমে তাহা হইতেই এই সব নীতি নির্দ্দিষ্ট হইল,—এই সব নীতিই বৈধ ফিউডাল ব্যবস্থা বলিয়া সর্ব্বত্র গৃহীত হইতে লাগিল।

নূতন কোনও দেশ বিজিত হইলে অথবা অন্য কারণে ভূমির নূতন কোনও ব্যবস্থা করিতে হইলে, গৃহীত এই ফিউডাল বিধি অনুসারেই তাহা করা হইত। রাজার খাস ব্যারণ বা ব্যারণের ছোটব্যারণ যিনিই হউন, প্রভুর নিকট হইতে নূতন ভূসম্পত্তি গ্রহণের সময় অথবা অধিকৃত ভূসম্পত্তির জন্য নূতন কাহারও প্রভুত্বের অধীনতা গ্রহণের সময়—একটি বিশেষ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে হইত। এই অনুষ্ঠানের নাম ছিল, 'হোমেজ' বা অধীনতা স্বীকার। প্রভুর সমক্ষে ভ্যাছালকে জানু পাতিয়া বসিয়া তাঁহার করচুম্বন করিতে হইত,—আর শপথ করিতে হইত, বিশ্বস্তভাবে তিনি এই সম্বন্ধের সকল নিয়ম পালনে প্রভুর আজ্ঞাধীন হইয়া থাকিবেন।

বিশ্বাসঘাতকতা করিলে, অথবা প্রভুর বিধিসঙ্গত আদেশ পালনে অবহেলা করিলে, ব্যারণ বা ভ্যাছাল

তাঁহার ভূসম্পত্তির অধিকারে বঞ্চিত হইতেন। নতুবা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে এক এক ব্যারণবংশে এক একটি বড় ভূসম্পত্তি স্থায়ী হইয়াই থাকিত। এইরূপে ইয়োরোপ ভরিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর অভিজাত বংশের সূচনা হইল।

এই রকম সামরিক সহায়তা দানের সর্ত্তেই রাজা হইতে জমিদার, জমিদার হইতে ছোট জমিদারের মধ্যে ভূমির বিলিব্যবস্থা হইত। আর্থিক রাজস্ব বা খাজনার কোনও কথা ছিল না।

আমাদের দেশে আমরা দেখিতে পাই ভূমির রাজস্বই রাজকোষের প্রধান আয়। ভূমির মূল মালিক রাজা বা রাজসরকার,—প্রজারা রাজসরকার হইতে ভাগে ভাগে ভূমি লইয়া তাহাতে শস্য উৎপাদন করে। উৎপাদিত শস্য বা শস্যমূল্যের নির্দ্দিষ্ট এক অংশ রাজসরকারের প্রাপ্য, বাকী সব প্রজা ভোগ করিবে। রাজসরকারের প্রাপ্য এই অংশই "রাজস্ব' অর্থাৎ রাজার নিজের প্রাপ্যধন। আমাদের দেশে এখন যে সব জমিদার আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা ভূস্বামী নন, রাজার পক্ষ হইতে নিযুক্ত রাজস্ব আদায়ের একরূপ এজেন্ট বা গোমস্তা মাত্র। রাজস্ব তাঁহারা আদায় করিবেন, আদায়ের কমিশনস্বরূপ একভাগ নিজেরা ভোগ করিবেন, বাকীটা রাজসরকারে জমা দিবেন। এদেশের জমিদারী প্রথার মূলতত্ত্ব এই। বাঙ্গলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়ায় বাঙ্গালার জমিদারগণ এরূপ স্থায়ী ভূস্বামীর স্থানই অধিকার করিয়াছেন।

যাহা হউক, মধ্যযুগে ইয়োরোপে রাজা ভূমির মালিক বলিয়া স্বীকৃত হইলেও ভূমির উৎপাদিত শস্যের বা শস্যমূল্যের অংশবিশেষ কখনও রাজস্ব বলিয়া প্রদত্ত হইত না।—অধীনস্থ ভূম্যধিকারিবর্গের দেয় সামরিক সহায়তাই ছিল তখনকার রাজস্ব।

কিন্তু এই 'রাজস্বে' যুদ্ধের সময় যতই উপকার হউক, অন্য প্রয়োজন কিছুই চলে না। তাহাতে ধনের প্রয়োজন। ধন কোথা হইতে আসিত? শিল্পবাণিজ্য ব্যবসায়াদি তখন অতি সামান্য ছিল—তাহার কর বা শুল্ক হইতে অতিঅল্পই পাওয়া যাইত। তবে প্রভু ভূস্বামীদের খরচপত্র চলিত কি প্রকারে?

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে রাজা এবং নিম্নতর অন্যান্য ভূস্বামীরা সব জমিই ভাগবাটরা করিয়া দিতেন না,—কতক নিজেদের প্রয়োজনে খাসদখলে রাখিতেন এই সব খাসদখলভুক্ত জমি তাঁহারা নিজেদের কর্ম্মচারী রাখিয়া তাহাদের পরিদর্শনাধীনে চাষবাস করাইতেন,—এবং তাহার উপস্বত্ব হইতেই তাঁহাদের প্রয়োজনীয় খরচপত্র চলিয়া যাইত। এই সব পরিদর্শকদের সাধারণ নাম ছিল বেলিফ (bailiff)। তখনকার জীবনযাত্রার প্রণালী এমন ছিল যে প্রচুর খাদ্য এবং মোটা কাপড় হইলেই দিন একরূপ চলিয়া যাইত। রাজাদের বেতনভোগী পৃথক সৈন্য ছিল না, শাসন কার্য্যের দায়িত্বও অতি যৎসামান্য ছিল, সুতরাং ইহাতেও অর্থের বেশী প্রয়োজন হইত না।

খাস দখলের জমিতে ছোট ছোট চাষী গৃহস্থেরা বসতি করিত। কতক জমি চাকরাণের মত তাহাদের মাথা ভাগ করিয়া দেওয়া হইত, আর কতক মালিকের নিজের থাকিত গৃহস্থগণ সপ্তাহে নির্দ্দিষ্ট কয়দিন নিজেদের জমিতে কাজ করিত,—আর কয়দিন মালিকের জমিতে কাজ করিত এখানেও খাজনার ব্যবস্থা ছিল না। কাজ দিয়াই গৃহস্থের আপন আপন জমি ভোগ করিত। মালিকের বেলিফরা এই গৃহস্থগণের নিকট হইতে কাজ আদায় করিত।

এই চাষী গৃহস্থগণ বড় কড়া নিয়মে মালিকের অধীন হইয়া থাকিতে বাধ্য হইত। বংশানুক্রমে তাহারা নিজ নিজ জমিতেই আবদ্ধ থাকিয়া বাঁধা নিয়মে নিজেদের ও মালিকের জমিতে কাজ করিবে, জমি ছাড়িয়া অন্য কোনও কাজে অন্যত্র কেহ কখনও যাইতে পারিবে না,—এইরূপ কঠোর ব্যবস্থা ছিল। ইহাদের নাম ছিল, সার্ফ বা ভিলেন। একরূপ জমির দাসের মতই বংশানুক্রমে ইহাদের জীবন যাপন করিতে হইত। জীবনের বৃত্তি নির্ব্বাচনে—অন্য বৃত্তি অন্বেষণে স্থানান্তরগমনে ইহাদের কোনও স্বাধীনতা ছিল না। যথেচ্ছাচারী দুর্দ্দান্ত প্রভুদের হস্তে আরও অনেক রকম লাঞ্ছনা ইহাদের সহিতে হইত।

২। **সামাজিক ব্যবস্থা**।—সর্ব্বপ্রধান রাজা, তার পরেই তাঁহার খাস ব্যারণগণ, তাঁহাদের পরে তাঁহাদের অধীন ছোটব্যারণগণ, এইরূপ পর পর বিভিন্ন শ্রেণীর ভূম্যধিকারীদের লইয়া বহু শ্রেণীতে সমাজ বিভক্ত হইয়া পড়িল। প্রভু ও তাঁহার অধীন অনুগত জন—এই ভাবে ইঁহাদের সামাজিক সম্বন্ধ নিরূপিত হইল। বিভিন্ন শ্রেণীর সামাজিক পদমর্য্যাদাও পর পর এই নিয়মে নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল। ভূমির

মালিকান স্বত্ব কাহারও ব্যক্তি জীবনেরই শেষ হইত না—বংশানুক্রমেই স্বত্বভোগের অধিকার চলিত। সুতরাং বিভিন্ন শ্রেণীর পদমর্য্যাদা বংশগত হইয়া পড়িল। অভিজাত ভূম্যধিকারীগণের উচ্চ সামাজিক সম্মান ও প্রতিপত্তি,—বংশগত পদমর্য্যাদা-পরম্পরায় বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ উচ্চতর শ্রেণীর প্রভুত্বে নিম্নতর শ্রেণীর আনুগত্য,—মধ্যযুগে ইয়োরোপীয় সমাজের একটি প্রধান বিশেষত্ব ছিল। এখনও বংশ ও পদমর্য্যাদার তারতম্যে বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগের প্রভাব ইয়োরোপীয় সমাজে বেশ দেখা যায়। এখনও আপন শ্রেণীর নিয়ে সহজে কেহ বিবাহ করিতে চান না,—আহারবিহারেও শ্রেণীর ব্যবধান তাঁহারা যথেষ্ট মানিয়া চলেন। ফিউডালতন্ত্র ইয়োরোপীয় সমাজে এই যে দৃঢ় প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সাম্যবাদ তাহা দূর করিতে পারে নাই। সামাজিক জীবনে ইয়োরোপবাসীরা মোটের উপরে পুরাতন ফিউডাল যুগের শ্রেণী বিভাগের অধীনই আছেন,—খৃষ্টনীতি মানিয়া সকলে সমান হইয়া সমান সামাজিক জীবনযাপন করেন না।

জমির দাস সার্ফ বা ভিলেনগণ, সমাজের নিম্নতম শ্রেণী বলিয়া পরিগণিত হইত। তাহারা যে কিরূপ হীনাবস্থ ছিল, তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে।

ভূমিস্বত্ব সংসৃষ্ট ফিউডাল সমাজই প্রধান সমাজ ছিল বটে,—কিন্তু ইহার বাহিরে নগরবাসী বণিক ও শিল্পীদের লইয়া একটি পৃথক ভাবের সমাজও তখন গড়িয়া উঠিতেছিল। ইঁহাদের কথা পৃথকভাবে অন্য পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে। ভূমিবিভাগ-সম্পর্কিত সাধারণ ফিউডালতন্ত্রের সঙ্গে ইঁহাদের বিশেষ কোনও সম্বন্ধ ছিল না।

৩। রাষ্ট্রব্যবস্থা :—সামরিক সহায়তা দান, মধ্যে মধ্যে নির্দিষ্ট কোনও রাজকীয় অনুষ্ঠানে অর্থসাহায্য দান, রাজার আহ্বানে মধ্যে মধ্যে রাজদরবারে উপস্থিতি—মোটামুটি এই কয়েকটি নিয়মে ব্যারণ বা ভ্যাছালগণ রাজার অধীনতা স্বীকার করিতেন। কিন্তু অন্য সকল বিষয়েই আপন আপন ভূভাগে তাঁহারা স্বাধীন রাজার মত চলিতেন, স্বাধীন রাজার মতই আপন আপন অধিকৃত ভূভাগে শাসন ও বিচারাদি কার্য্য করিতেন। নিজেদের আইনও অনেক সময়ে নিজেরা করিয়া লইতেন। বড় বড় ব্যারণ অনেকে আপনাদের নামেই মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া আপন শাসিত ভূভাগে তাহাই চালাইতেন। ইহাই তখনকার সাধারণ রাষ্ট্রীয়নীতি ছিল,—রাজাও এই নীতি মানিয়া চলিতেন। নিজের খাসদখলভুক্ত ভূভাগ ব্যতীত আর কোনও স্থানের শাসনের দায়িত্ব রাজার হাতে ছিল না। কেবল বিচার সম্বন্ধে এই নিয়ম ছিল যে, কোনও ব্যারণের অধীনস্থ ছোট ব্যারণ বা প্রজা কেহ স্বীয় প্রভুর বিচারে সন্তুষ্ট না হইলে, রাজদরবারে আপিল করিতে পারিতেন, এবং রাজা সেই আপিলের বিচার করিতেন। কিন্তু বিশেষ শক্তিমান্ বড় বড় ব্যারণ অনেকেই রাজার এই বিচার-প্রভুত্ব মানিতেন না। রাজারও এমন শক্তি কিছু ছিল না, যাহার বলে এইরূপ কোন প্রবল অবাধ্য ব্যারণকে আপনার বিচার গ্রহণে বাধ্য করিতে পারেন।

আবার, রাজা ছিলেন কেবল খাস ব্যারণদেরই প্রভু, ব্যারণের অধীনস্থ কাহারও প্রভু নন। খাস ব্যারণকেই শপথ করিয়া রাজার আনুগত্য স্বীকার করিতে হইত,—কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ ভূম্যধিকারী বা প্রজা যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের আনুগত্যের সম্বন্ধ কেবল সেই প্রভু ব্যারণের সঙ্গেই স্থাপিত হইত। তাঁহার উপরে রাজার প্রভুত্ব তাঁহারা কেহ মানিতেন না। রাজার বিরুদ্ধেও কোনও খাস ব্যারণ যদি কখনও যুদ্ধ করিতেন, তাঁহার অধীনস্থ জনগণকে তাঁহারই প্রভুত্ব ও নায়কত্ব স্বীকার করিতে হইত,—রাজার বিরুদ্ধেই অস্ত্র ধরিতে হইত। ইহাতে রাজদ্রোহিতার অপরাধ তাঁহাদের হইত না,—কারণ তাঁহারা রাজার প্রজা নন, ব্যারণেরই প্রজা।

অনেক ব্যারণ বিশেষ বড় বড় ভূভাগের অধিপতি ছিলেন। কখনও এমনও দেখা গিয়াছে, যে রাজার অধিকৃত ও শাসিত ভূভাগ অপেক্ষা তাঁহার অধীন কোনও কোনও ব্যারণের অধিকৃত ও শাসিত ভূভাগ বৃহত্তর। এরূপ সব ব্যারণের প্রতাপ যে অনেক সময় রাজার প্রতাপকে অভিভূত করিয়া রাখিত,—ইহা বলাই বাহুল্য।

ইয়োরোপে সর্ব্বত্রই ফিউডাল যুগে ব্যারণদেরই প্রাধান্য ছিল,—রাজার শক্তি এই প্রাধান্যের উপরে বড় উঠিতে পারিত না।

স্বাধীন রাজার মত ব্যারণগণ আবার পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহও করিতে পারিতেন। ইহাতে দেশে শান্তির

শৃঙ্খলা কখনও বড় থাকিত না। এক একটি দেশ ব্যারণদের শাসিত বহু খণ্ড রাজ্যে একরূপ বিভক্ত ছিল।

রাজশক্তির অধীনে এক কেন্দ্র হইতে পরিচালিত কোনও শাসন-প্রণালী সমস্ত দেশের প্রজামণ্ডলীর উপরে প্রতিষ্ঠা করা কোনও রাজার পক্ষেই সহজ-সাধ্য ব্যাপার হইত না। শক্তিমান্ রাজারা কেহ কেহ চেষ্টা করিতেন, কিন্তু ব্যারণগণ নিয়তই তাহাতে বাধা দিতেন। রাজার ও ব্যারণসম্প্রদায়ে অবিরত এইরূপ একটা বিরোধ চলিত। দেশের শান্তি তাহাতে আরও ব্যাহত হইত।

রাজার সঙ্গে তাঁহার খাস ব্যারণদের যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, খাস ব্যারণদের সঙ্গেও তাঁহার অধীনস্থ ছোট ব্যারণদের সম্বন্ধও মোটের উপর সেইরূপেই নির্দ্দিষ্ট হইত। তবে অধিকৃত ভূভাগে যাঁহার যত ছোট, প্রভুর সঙ্গে বিরোধ করিয়া চলা, তাঁহার পক্ষে স্বভাবতঃই তত কঠিন হইত। সুতরাং ক্ষুদ্রতর ভূমধ্যকারিগণ অনেক পরিমাণে আপন আপন প্রভুদের শাসনাধীন হইয়াই বলিতেন। এই সুযোগও রাজা অপেক্ষা ব্যারণদের অধিক ঘটিত।

রাজার স্থায়ী কোনও বাঁধা সেনা (standing army) ছিল না। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে খাসদখলের প্রজারা তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া জড় হইত। ইহারাই হইত রাজার নিজের সেনা। তা ছাড়া, ব্যারণরা তাঁহাদের লোকজন লইয় আসিতেন,—ইহারা নিজ নিজ প্রভু ব্যারণের অধীনেই যু করিত। বিশেষ প্রয়োজন হইলে ব্যারণগণ মধ্যে মধে রাজাকে অর্থসাহায্য করিতেন,—নাগরিক বণিকদের নিকট হইতেও অর্থ কিছু আদায় হইত। এই অর্থ সাহায্যে রাজারা দরকার হইলে, কিছু সৈন্য ভাড়া করিয়াও নিতেন্। অস্ত্র বিদ্যায় নিপুন এবং কিছু অর্থ পাইলে যে কোনও প্রভুর অধীনে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত, এইরূপ অনেক লোক তখন মিলিত। যুদ্ধের সময় ইহাদিগকে রাজারা ভাড়া করিয় নিতেন, আবার যুদ্ধ হইয়া গেলেই ছাড়াইয়া দিতেন।

রাজারা যে ব্যারণদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না,—তার আরও একটি কারণ এই সেনাবলের অভাব একে ত অর্থের অভাব যথেষ্ট ছিল,—তার উপরে স্থায়ী সেনা বল সুশিক্ষিত করিয়া সুনিয়মে রাখিতে যেরূপ উন্নত রাষ্ট্রী শাসনের বুদ্ধি ও শক্তির পরিপক্কতা প্রয়োজন, মধ্যযুগে ইয়োরোপীয় সভ্যতার সেরূপ উন্নতি হইয়াছিল না। দেশ বিস্তৃত সুনিয়ন্ত্রিত শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাও এ অবস্থায় সম্ভব নহে। খাস ব্যারণ বা সর্দ্দারদের আপন আপন অধিকৃত ভূভাগে শাসনকর্ত্তৃত্ব ব্যতীত আর কোনও ব্যবস্থা সহজে সম্ভবও হইত না। (ক্রমশঃ)

পরিণতি।

(১)

সার্থক হয়েছে মোর নয়নের জল
যত ব্যথা, ক্ষতি, দুঃখ হয়েছে সফল।
একি দেখি আজি নাথ তব কণ্ঠদেশে
মণিমালা হয়ে' অশ্রু উঠিতেছে হেসে।

(২)

হৃদয়ের ক্ষত-মুখে যত রক্ত-ধারা
ঝরিয়াছে দিবারাতি বাধাবন্ধহারা
একি দেখি আজি তব চরণ-কমলে
অলক্তক হয়ে' তাহা গরবে উজলে!

(৩)

আমার কালিমা যত তোমার নয়নে
অঞ্জন হইয়া শোভে নিকষ বরণে
কাতর বিলাপ মোর তোমার বীণায়,
রাগিণী হইয়া বাজে সুখ-বেদনায়!

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন।

যৌতুক।

(সমালোচনা)

আজকাল বড় উপন্যাসের চেয়ে ছোট গল্পেরই বেশী চলন। লেখকেরও সুবিধা, পাঠকেরও আনন্দ। কিন্তু বড় উপন্যাস রচনা অপেক্ষা ছোট গল্প রচনায় কৃতিত্ব বেশী দরকার। নামে "ছোট" গল্প, কিন্তু কার্য্যে একেবারেই ছোট নয়, বরং অনেক বড়।

স্বল্প পরিসরে, অল্প সময়ের মধ্যে, কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে চিত্রটিকে ফুটাইয়া তুলিতে হয়, সুতরাং ছোট গল্প রচনা প্রকৃত শিল্পীর কাজ।

আলোচ্য গ্রন্থখানিও সাতটি ছোট গল্পের সমষ্টি। প্রথম গল্প 'যৌতুকে'র নামানুসারেই গ্রন্থের নাম যৌতুক হইয়াছে।

শরৎবাবু ইতিপূর্ব্বে আরও একখানি ছোট গল্পের বই রচনা করিয়াছেন, সেখানি বঙ্গ-সাহিত্যে সাদরে অভিনন্দিত হইয়াছে। 'বারুণী' লিখিবার বহুকাল আগে হইতেই তিনি বঙ্গীয় মাসিকপত্রে ছোট গল্প লিখিতেন—তখন হইতেই আমরা তাঁর ছোট গল্পের পক্ষপাতী হইয়া পড়ি। সুতরাং "বারুণী" শরৎবাবুকে পাঠক ও লেখক উভয়-সমাজেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

তাঁহার গল্পের প্রচার অধিকাংশই করুণ রস সিক্ত। আর এই রস অবতারণা করিতে তিনি মামুলী plotএর কোথাও আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। শরৎবাবুর গল্প রচনার ভঙ্গী, বিষয়, ঘটনা গ্রন্থন—সবই মৌলিক অভিনব এবং বিচিত্র। অথচ কোথাও একটু অবাস্তবতা অস্বাভাবিকতা বা অসাধারণতা নাই। বাঙ্গালীর সুখদুঃখপূর্ণ গৃহস্থ ঘরের দৈনন্দিন ঘটনা পরম্পরার ভিতরেই, তার ঘাতপ্রতিঘাতেই গল্পগুলি ফুটান। কোথাও কষ্ট কল্পনা বা অতিমানুষিকতাকে আশ্রয় করা হয় নাই। ইহাই ইঁহার বিশেষত্ব।

গল্প রচনায় ঔপন্যাসিকের মানব চরিত্রে যেরূপ জ্ঞান, বিশ্লেষণী শক্তি এবং মনের খুঁটিনাটী জানা আবশ্যক—শরৎবাবুর তাহা সম্পূর্ণ আত্তাধীন। শিল্পীর ইহাই সাধনা।

লেখক মহাশয়ের মতে বোধ হয় যৌতুকই এ গ্রন্থের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গল্প, তাই এইটিকেই তিনি সর্ব্বপ্রথমে দিয়া উক্ত নামে গ্রন্থেরও নামকরণ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের মতে 'শুষ্কপত্র' গল্পটি যৌতুকে শুধু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নহে, বঙ্গীয় শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পের মধ্যে একটি। Ptotটি সম্পূর্ণ নূতন—বাংলায় ইহার মত ঘটনা গ্রন্থন আর পড়ি নাই। প্রতাপের মত জীবনও সাহিত্যে বড় বেশী নাই। তাহার উদ্দাম, কোমল, স্নেহপ্রবণ, বন্ধুবৎসল, অকপট হৃদয়ের পরিচয় যে লেখক নানা বিচিত্র কার্য্য পরম্পরায় ফুটাইতে পারেন—মানব-চরিত্রে যে তাহার দখল কত, তাহা সহজেই বোঝা যায়। আর তার শেষ কার্য্য—যেমন মহৎ ত্যাগ মণ্ডিত প্রীতি মধুর যেমনি স্বাভাবিক তেমনই করুণ! তবে এক জায়গায় আমাদের কিন্তু একটু খট্‌কা লাগিয়াছে। "সে দিন বৃষ্টির দিন রাতে তোমাদের বাসার কাছে গেলুম। সামনের বাড়ীর দেয়ালে লতার দিকে চেয়ে দেখি, শেষ পাতাটি ঝরে গেছে।—তখন আমার রংয়ের বাক্স, তুলি, আর একখানা মই নিয়ে গিয়ে লতার গায়ে একটা পাতা আঁক্‌লুম!" অন্ধকার রাত্রে ঝড় বৃষ্টির দুর্য্যোগ, মইএ চড়িয়া লতার গায়ে পাতা আঁকাটা নিতান্তই অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে। গ্রন্থকার মহাশয়—প্রতাপকে দিয়া বাসায় বসিয়া আঁকাইয়া সেই ঝরা পাতার স্থানে যদি বাঁধাইয়া দেওয়াইতেন—তাহা হইলে বোধ হয় চারিদিকই বজায় থাকিত।

'যৌতুক' গল্পে ভ্রাতৃপ্রীতি আদর্শ স্বরূপ অথচ কোথাও অস্বাভাবিকতা নাই। ঝরঝরে'—পরিস্কার। সাধারণতঃ একটা আদর্শ ফুটাইতে গেলে আজকালকার বলিয়া শুধু নয়, পৌরাণিক কালেও—লেখকেরা একটা অমানুষিক অথবা অসম্ভব রকমের কাণ্ডকারখানা কল্পনা করিয়া লইতেন। বঙ্কিমবাবুর মত ব্যক্তিও উক্ত কল্পনার আশ্রয় লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। এই আদর্শ সৃষ্টির ব্যগ্রতায় জোনা-ইব্‌সেন অসম্ভব অতিরঞ্জনের সাহায্য লইয়াছেন—টলষ্টয় দৈববল এবং রূপকের শরণ ল'ন; ইয়োরোপেও আদর্শ লইয়া এম্‌নি মারামারি চির দিন চলিয়া আসিতেছে। তবে প্রভেদ এই যে তাহাদের জীবন যাত্রা যেমন নানা স্বাধীন বিচিত্রপথে বহে—আমাদের তাহা নয় বলিয়া—

উঁহাদের জীবনের আদর্শও দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আমাদের জীবন পুকুরের জলের মত—এক জাগায় বদ্ধ। চলা নাই, স্রোত নাই, গতি নাই, নূতনত্ব নাই, বিচিত্রতা নাই! আমাদের জীবন—থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়। কাজেই আমাদের আদর্শ অনেকটা ঠিক হইয়াই আছে। তবু ইহারই মধ্যে গল্প উপন্যাসের মালমশলা খুঁজিয়া লইতে হইবে। আর এই বিষয় নির্ব্বাচনে এবং সেটিকে নূতন করিয়া ফুটাইয়া তোলাই বাঙ্গালী শিল্পীর কাজ; আর একাজ ইয়োরোপীয় শিল্পীর চেয়ে সকল বিষয়ে শক্ত।

"নাগপাশ" গল্পটিতে একটি সম্পন্ন উচ্ছৃঙ্খল মুসলমান যুবকের আত্মকাহিনী বিবৃত হইয়াছে। এই কালো জমির উপর কাসেম আলি এবং ফাতেমার দাম্পত্য প্রেমচিত্র অতি সুন্দর এবং করুণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। লেখক মহাশয় এই প্রসঙ্গে আইন আদালতের কার্য্যকলাপের যেরূপ আভাষ দিয়াছেন—সেটি এত উপভোগ্য যে গল্পটি না পড়িলে সে হাস্যরস কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম হইবে না। শরৎবাবুর এ শ্লেষ—আমরা জজের রায় বলিয়া, মোকদ্দমা-প্রিয় ব্যক্তিগণকে বলিতে পারি—"বোঝ লোক যে জান' সন্ধান।"

"হাঁসপাতাল"—গল্পে লেখকের ভারতীয় হাঁসপাতালের বিধিব্যবস্থা বিষয়ে যে অতি সুন্দর ও সত্য ধারণা আছে—তাহাই প্রকাশ পায়। জীবনবাবু নূতন চরিত্র। মুখে কোনও বাড়াবাড়ি নাই, এমন কি মুখটা অতি কর্কশ, বাহ্যত যেন নির্ম্মম—কিন্তু অন্তরটি পাকা আঙ্গুরের মত সমবেদনা ও করুণার রসে ভরা। লেখক দুইচারিটি কথায়—তাঁহার চিত্র আঁকিয়া, তাঁহার অনন্যসাধরণ ক্ষমতারই পরিচয় দিয়াছেন।

"বিপ্রগন্ধ"—অতিলোভে তাঁতি ডুবিল। কিন্তু এই যে অতিলোভ ব্যাপারটি, ইহাতে উক্ত তাঁতির উপর পাঠকের অশ্রদ্ধা জন্মাইবারই কথা; কিন্তু ঘোষালমহাশয়ের রচনা নৈপুণ্যে সে হতভাগ্যের উপর পাঠকের সহানুভূতিই আকর্ষণ করে। ইহা একটা মস্ত বাহাদুরী।

"ডাক্তারীর ঝকমারী" একটা চিত্র (Sketch), গল্প নয়। এটি আদ্যোপান্ত না পড়িলে—রস পূর্ণমাত্রায় উপভোগ্য হইবার নয়। অতি চমৎকার চিত্র। নিরীহ ডাক্তার-[illegible] উঠিয়াছে—

সেইটি পরম রমণীয়। পল্লীর প্রতিবাসী, প্রতিবাসী আত্মীয় আত্মীয়ের নির্ম্মম আব্দার! অযৌক্তিক বাঞ্ছা, স্বার্থ সিদ্ধির ব্যাঘাতে অনিষ্ট চিন্তা, গ্রাম্য বৈদ্য—প্রভৃতি চিত্রগুলি একটি একটি রেখাপাতে হীরকখণ্ডের মত জ্বলিতেছে।

"মালেকা"—আব্দুলের প্রেম, মালেকার হৃদয়, করুণ সুচিত্রিত এবং পবিত্র। ইহাদের পাশেই আমিনার ব্যবহার যতই নিষ্ঠুর মনে হউক—কিন্তু তাহাও তাহার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। মালেকার কন্যাকে আব্দুল তবু যে তাহার চিরদিনের সঞ্চিত সম্বল দিয়া কৃতার্থ হইল,—ইহার কারণ বলিয়া বুঝাইবার নয়। যে জীবনে কখনও একজনকেও ভাল বাসিয়াছে, সেই বুঝিতে পারে, অনে পারিবে না!

"যৌতুকে"র সাতটি গল্পেরই যৎসামান্য পরিচয় দিলাম মাত্র। ছোট গল্পের আসরে শরৎবাবু এইবার পাকা হইয়া বসিয়েছেন।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ত্যাগ—শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত—মূল্য ৷৷৵ ও বাঁধাই ৸০।

গ্রন্থখানি ত্যাগ ধর্ম্মের মহিমা-প্রচারোদ্দেশ্যে লিখিত হিন্দুশাস্ত্র হইতে বহু উৎকৃষ্ট উপদেশ মূলক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহার বাঙ্গলা অনুবাদের সাহায্যে প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনার চর্চ্চা করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে আলোচনা বহুস্থলেই নিতান্ত অসম্বদ্ধ এমন কি প্রগল্ভ পোক্তির ন্যায় হাস্যোদ্দীপক। গ্রন্থকার অকৃতদার এবং একজন আদর্শ সংযমী বলিয়া আত্মপরিচয় দেওয়াইয়াছেন, কিন্তু তাঁর ভাষা পড়িয়া তাঁহাকে সংযমী বলিয়া আদৌ মনে হয় না। তিনি অকৃতদার বলিয়াই বোধ হয় নারীজাতির প্রতি অতি কঠোরভাষা ব্যবহার করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। কিন্তু তাঁর মনে রাখা উচিত ছিল যে তিনি স্বামী না হইলেও পুত্র ভূঁইফোড় নহেন। যাহারা বৈরাগ্যের বহর বাড়াইতে মাতৃজাতির প্রতি অসম্মানের ভাষা ব্যবহার করে, তাহারা কৃপার পাত্র!

গ্রন্থের প্রথমেই 'সরস্বতী—বন্দনা'। ইহার বাঙ্গলা অংশ আগাগোড়া—না বলিয়া পরের দ্রব্য গ্রহণ করাকে যাহা বলে, তাই। কবি মানকুমারীর কাব্য-কুসুমাঞ্জলি হইতে শিবপূজাটিকে গ্রন্থকার যে ভাবে আত্মসাৎ করিয়াছেন

তাহাকে ত্যাগের নিদর্শন কোন মতেই বলা চলে না। গ্রন্থের শেষভাগে তিনজন সাধুর জীবন-কথা সন্নিবিষ্ট করিয়া গ্রন্থকার 'বন্দনা' ঘটিত পাপের কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। পুস্তকের যে যে অংশ গ্রন্থকারের স্বলিখিত তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু উদ্ধৃত অংশগুলিতে মণি-মুক্তার অভাব নাই।

কাজের কথা।

গরম সিরকা (ভিনিগার) দিয়া রগড়াইলে কাচের রঙ সহজে উঠিয়া যায়।

লবণ জলে হাত ধুইয়া ফেলিলে পেঁয়াজের গন্ধ যায়।

পচা পাওরুটি ভিনিগারের সঙ্গে মিশাইয়া পুল্টিসের মত করিয়া রাত্রিতে লাগাইয়া রাখিলে দুই দিনের মধ্যেই কড়া উঠিয়া যায়।

মেথিলেটেড স্পিরিটে ন্যাকড়া ভিজাইয়া পুছিলে আলোর চিমনি হইতে ধোঁয়ার কালী ও সব দাগ উঠিয়া যায়।

কেরসিন তেলের দুর্গন্ধ সরিষার তেল মাখিলে একেবারে দূর হয়।

রক্তজবার কুঁড়ি বা কচিপাতা পুরাতন তেঁতুলের সঙ্গে পিশিয়া ন্যাকড়ার পটির সঙ্গে ফোঁড়ায় লাগাইয়া রাখিলে সহজেই ফাটিয়া যায়।

বৃদ্ধ।

অশীতিপর শীর্ণ বৃদ্ধে
চল্‌তে দেখে পথে,
তরুণ যুবক শিহরি কহে
"কি ঘৃণ্য আকার!"

বৃদ্ধ তারে হাসিয়া কহে
"বাছা এখন হতে—
তৈরী থেকো মাথায় নিতে
এ প্রশংসা-ভার।"

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

হিন্দু সমাজ ও পতিতা নারী।

সেদিন কলিকাতায় বড় শোচনীয় একটি মোকদ্দমা হইয়া গেল। কোনও ব্রাহ্মণগৃহের একটি কিশোরী কুলবধূ গত শারদীয় পূজার সময় শাশুড়ী মা প্রভৃতি পরিজনগণের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে গিয়াছিল। লোকের ভিড়ে হারাইয়া যায়। মুখে ঘোমটা ছিল,—শাশুড়ী ও মায়েদের পশ্চাতে সে আসিতেছিল। কতক্ষণ পরে আর সে তাঁহাদের দেখিতে পাইল না। ছোট কুলের বউটি, ঘরের বাহির

কখনও হয় নাই, লেখাপড়া কিছু শেখে নাই,—বাড়ীর ঠিকানাও জানিত না। হারাইয়া গিয়া পথে দাঁড়াইয়া বউটি কাঁদিতে ছিল। এমন সময় দুইটি বারাঙ্গনা (তারা মা ও মেয়ে—কুলত্যাগিনী ব্রাহ্মণ-কন্যা)—তাহাকে দেখিতে পায়, বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবে বলিয়া বউটিকে তারা ভুলাইয়া লইয়া যায়,—নিজেদের বাড়ীতে নিয়া তাকে আটকাইয়া রাখে,—তারপর তার সর্ব্বনাশ করে। অনভিজ্ঞা বালিকা—নিরুপায় হইয়া ইহাদের হাতে পড়িয়াছিল—ইহাদের কঠোর তাড়নায় ভীত অবসন্ন হইয়া শেষে পাপে আত্মদান করিল।

কয়েক মাস পরে পুলিশ সন্ধান পাইয়া বালিকাকে উদ্ধার করে,—এবং এই পাপে নিয়োগের জন্য বালিকা-হরণের অভিযোগে হাইকোর্টের দায়রায় বারাঙ্গণা দ্বয়ের বিচার হয়,—বিচারে তাহাদের ৭ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। অভাগী বধূ কুলভ্রষ্টা ও পতিতা বলিয়া শ্বশুরগৃহে গৃহীত হয় নাই,—কোনও খৃষ্টান মিশন আশ্রমে সে নাকি আশ্রয়লাভ করিয়াছে।

এরূপ ঘটনা অহরহ ঘটিতেছে। বারাঙ্গণারা একটু বয়স হইলেই এইরূপ অনভিজ্ঞা বালিকাদের ভুলাইয়া নিয়া যায়,—নানা প্রলোভনে ও তাড়নায় বশীভূত করিয়া তাহাদের বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োজিত করে,—তারপর ইহাদের এই পাপের উপার্জ্জন নিজেরা ভোগ করে।

তীর্থস্থানে ইহারা নিয়ত এইরূপ সুযোগ অনুসন্ধান করে,—কখনও গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়াও নানাছলে কুমারী, বধূ ও বালবিধবাদের ভুলাইয়া আনে। কাহারও প্রলোভনে কোনও অভাগী যদি কুল ত্যাগ করে, অচিরে তাহারাও ইহাদের হাতে পড়ে। যার সঙ্গে তারা কুলের বাহির হইয়া আসে, সে দুর্ব্বৃত্তেরা প্রায়ই তাহাদের ত্যাগ করিয়া যায়; এমন স্থানে এমন অবস্থায় ত্যাগ করিয়া যায় যে, ইহাদের হাতে তাহাদিগকে পড়িতেই হয়। তখন নিরুপায় হইয়া তারাও ইহাদের বশীভূত হয়, এই দারুণ দুঃখময় ঘৃণিত পাপবৃত্তি অবলম্বন করে। শিশু বালিকাদের পর্য্যন্ত ইহারা চুরী করিয়া আনে,—তাহাদের প্রতিপালন করে,—বড় হইলে এই পাপ ব্যবসায়ে শেষে নিযুক্ত করে।

কত এমন ঘটনা হইতেছে,—আহা কত বালিকার, কত অভাগী কুলবধূ ও বালবিধবার সর্ব্বনাশ হইয়া যাইতেছে। সম্প্রতি এই একটি এবং আরও কয়েকটি ঘটনা ধরা পড়িয়াছে,—মোকদ্দমা হইয়াছে,—অপরাধীরা আদালতে বিচারে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

ইহারা পাকাপাপী, দণ্ড বিধিতে শাস্তির ব্যবস্থা ইহাদে[র] জন্য আছে,—ধরা পড়িলে শাস্তি পায়। কিন্তু যে সব বালিক[া] ইহাদের পাপচক্রান্তে কুলভ্রষ্টা হইয়া পড়ে, তাহাদে[র] উপায় কি? তাহারা কোথায় যাইবে, কি করিবে, কা[র] আশ্রয় গ্রহণ করিবে? কি অবলম্বন ধরিয়া জীবন কাটাইবে[?] সমাজ যদি ইহাদিগকে সকল সাধুআশ্রয় হইতে বহিষ্ক[ৃত] করিয়া দেয়, সাধুজীবন যাপন করিবার কোনও উপায় য[দি] ইহারা না দেখিতে পায়, তবে এই ঘৃণিত পাপ জীবন ব্যতী[ত] ইহাদের গতি আর কি হইতে পারে?

কুলোকের প্রলোভনে, দুষ্টের তাড়নায় অথবা নিজেদে[র] দুর্ব্বল চিত্তের মোহ ভ্রান্তিতে যদি অপরিণত-বুদ্ধি, অনভিজ্ঞা শিক্ষায় সদসৎ বিবেচনায় অশক্তা বালিকা একবার ধর্ম্ম স্খলিতা হয় ও কুলভ্রষ্টা হইয়া পড়ে, তবে যতই পরিতপ্ত [হ]উক, যতই আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইয়া পাপ পথ হইতে ফিরিতে আকাঙ্ক্ষা তার হউক, কোনও সুযোগ পাইবে না, সাধুআশ্র[য়] হইতে চিরজীবনের মত বহিষ্কৃত থাকিয়া, ঘৃণিত গ্লানিক[র] পাপপঙ্কেই তাকে নিমজ্জিত হইতে হইবে, ইহা অপেক্ষা অবিচার, সমাজনীতির আর কি হইতে পারে জানি না।

এই যে ব্রাহ্মণের কুলবধূ কুলোকের হাতে পড়িয়া কুলভ্রষ্টা হইল,—রাজদণ্ডে সেই অপরাধী কুলোকের শাস্তি হইল বটে কিন্তু এই বালিকার সুগতি রাজদণ্ডের সাধ্যায়ত্ত নহে খৃষ্টান মিশনে সে আশ্রয়লাভ করিয়াছে - মিশনের চরণে শত নমস্কার করি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাবিয়া লজ্জায় মরিয়া যাই যে আমাদের হিন্দুসমাজ এ সম্বন্ধে এতই উদা[]সীন, যে বালিকা তার সহায়তায় কোনও সাধু আশ্রমে সাধুজীবন যাপন করিবার অবসর পাইল না। ধিক্! কিসে[র] গৌরব আমরা করি?

বধূকে তার শ্বশুরগৃহে নিবে না। সহজে এরূপ অবস্থা[য়] কেহ তাহা চায়ই না। অসাধারণ উদার করুণায় কেহ য[দি] চায়ও, সাহস পায় না,—কারণ শ্বশুর বা স্বামী গ্রহণ করিলেও সমাজ তাহাকে গ্রহণ করিবে না,—বরং তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য সেই শ্বশুর বা স্বামীকেই পরিত্যা[গ] করিবে। বালিকার পিতামাতা স্বাভাবিক স্নেহবশত তাহাকে গ্রহণ করিতে যতই ইচ্ছা করুন, তাহারাও সমাজে[র]

ত্তয়ে পারিবেন না। তারপর দয়া করিয়া গৃহে কেহ স্থান দিলেও সমাজে কোনও স্থানই তাহার হইবে না,—চির-জীবন এই কলঙ্কে চিহ্নিত হইয়া সকলের ঘৃণা ও বিরাগের পাত্রী হইয়া অস্পৃশ্য কোনও অশুচি দ্রব্যের মতই তাকে থাকিতে হইবে। এ অবস্থা কেহ সহিতে পারে না। যতদিন আত্মগ্লানি অতি তীব্র থাকে, ততদিন পারিতেও পারে। কিন্তু বিধাতার করুণা পাপকলঙ্কিতকেও ত্যাগ করে না। পাপ যত বড়ই হউক, পাপপথ ত্যাগ করিলে, চিরদিন কেহ আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হয় না। আত্ম-গ্লানির তীব্রতা যত কমিয়া আসে, এই অতি ঘৃণিত অমর্য্যাদার বেদনা তাকে ততই পীড়িত করিতে থাকে,—শেষে তারই ফলে তার চিত্তে সমাজদ্রোহ ও ধর্ম্মদ্রোহের একটা ভাব জাগাইয়া তোলে। সেই দ্রোহ তাকে আবার পাপের পথে পরিচালিত করে। যাহা হউক,—এইটুকু অবসরই বা কোথায় কে পায়? কুলভ্রষ্টা নারীকে কোন্ হিন্দুগৃহস্থ আপন গৃহে আশ্রয় দিয়া থাকেন?

কোনও নরপশু হয়ত তাহার ক্ষণিক পাপ লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য অসহায়া কোন বালিকাকে পাপের পথে কুলের বাহির করিয়া নিয়াছে,—সে এই কলঙ্কের সংস্পর্শে থাকিয়াও সকল সামাজিকের গৃহে আর পাঁচজন সামাজিকেরই সঙ্গে সমান আসন পাইতেছে, সমান আদরে গৃহীত হইতেছে, কিন্তু এই বালিকা সহস্র পরিতাপে দগ্ধ হইয়া সাধুপথে ফিরিতে চাহিলেও কোনও সামাজিক তাহাকে দয়া করিয়া হীন একটু আশ্রয়ও দিবেন না।

কোনও সামাজিকের গৃহে ইহারা আশ্রয় পাইবে না। সে আশ্রয় না পাইয়াও ইহারা সাধু জীবন যাপন করিতে পারে, এমন আর কোনও ব্যবস্থাও সমাজের নাই। সুতরাং যদি এসম্বন্ধে উদারতর ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী কাহারও আশ্রয় তাহারা না পায়, তবে গত্যন্তর না থাকায় পাপেই আত্মবিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হয়।

হিন্দু সমাজ এ পর্য্যন্ত এই সব বালিকাদের উদ্ধার সাধনে একান্ত উদাসীনই আছেন। কিন্তু থাকা আর উচিত নয়। যদি সামাজিক দায়িত্ব বোধ কিছু থাকে, ধর্ম্ম ও ন্যায়ের মর্য্যাদা রাখিতে কোনও আগ্রহ বর্ত্তমান এই যুগে হিন্দুসমাজের হইয়া থাকে,—ইহার একটা ব্যবস্থা সমাজনেতৃ-সমাজের নেতৃত্ব পুরুষেরই হাতে এবং তাহাই স্বাভা-বিক বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্তু তাই বলিয়া নারীর সম্বন্ধে এত বড় একটা অবিচারে তাঁহাদের এমন উদাসীন থাকা উচিত নয়। বস্তুতঃ ধর্ম্মবুদ্ধি—ন্যায়বুদ্ধি জাগ্রত হইলে এ অবিচার থাকিতে পারে না, কারণ ধর্ম্মের এত বড় গ্লানি আর কিছুতে কোনও সমাজে হইতে পারে না। এই গ্লানি যে আছে, প্রতিকারের কোনও চেষ্টা নাই, তাহা আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধির জড়তারই পরিচায়ক,—সামাজিক দায়িত্ব বোধে আমরা অতি দীন, সামাজিক কর্ত্তব্য পালনে যারপরনাই আগ্রহহীন, জড়বৎ গতানুগতিক ভাবেই আমরা চলিতেছি।

একটি কথা আমাদের সকলের বিবেচনা করা উচিত। এই যে সরলা অনভিজ্ঞা বালিকারা কুলধর্ম্ম হইতে পতিত হয়, কেন? কে তাদের পাতিত করে? কেন করে? দুর্ব্বৃত্ত পুরুষের পাপলালসায় ইন্ধন যোগাইবার জন্য নয় কি? হয় তারা নিজেরা অথবা তাহাদেরই জন্য পাপবৃত্তিতে অভ্যস্তা নারীরা। সর্ব্বদা সাক্ষাৎভাবে নিযুক্তা না হইলেও পরোক্ষভাবে ইহারা এই সব লম্পট পুরুষেরই পাপদূতী! যাহারা কুলত্যাগ করে, অধিকাংশই পুরুষের প্রলোভনে ভুলিয়া করে। স্বেচ্ছায় স্বীয় পাপলালসার চরিতার্থতার জন্য কুলত্যাগিনী নারীর সংখ্যা অতি অল্প। সর্ব্বত্রই বাল-বিধবা যুবতী আছে; ইহারা বিধবা হইয়াই ঘরে থাকে, খায় দায়, বেড়ায়। সুশিক্ষালাভ করিয়া ইহারা সৎকর্ম্মে সংযত সাধু জীবনযাপন করিতে পারে, তার কোনও ব্যবস্থাই সমাজে কোথাও দেখা যায় না। তারপর, প্রতিবেশী, গ্রামবাসী এমন কি গ্রামান্তরাগত দূরসম্পর্কিত আত্মীয় পুরুষদের মধ্যে এরূপ দুষ্টস্বভাবের লোক অনেক আছে, যাহারা এই অভাগীদের পাপপথে প্রলোভিত করিবার জন্য অবিরত কত কৌশল—কত ছলনা করে। স্নেহপরায়ণ সতর্ক অভিভাবক যেখানে দুর্ল... অনেক অভাগীর পক্ষেই সেখানে এই প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করা দুঃসাধ্য হয়। যদি একবার কেহ মোহে ভুলিয়া ঘরের বাহির হইল,—আর তার উপায় নাই। ... বাহির করিয়া আনিল, সে হয়ত দুদিন পরেই তাকে ফেলি... আবার দিব্য ঘরের ছেলেটি হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসি... সমাজে একজন সামাজিক হইয়া গিয়া বেশ জুড়িয়া বসি... যেন সে কিছু করে নাই। আবার যদি সে ধনবান্ হই... তবে ত সমাজের উপরে প্রভুত্বই সে করিতে পারিবে

বড় বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও অম্লানবদনে তার গৃহে ভুরি-ভোজন করিয়া, দক্ষিণা ও বিদায় লইয়া আসিবেন।

লোকে অবশ্য আড়ালে কিছু নিন্দা করে,—কিন্তু সে নিন্দায় তার কি আসিয়া যায়? সামাজিক কোনও শাস্তি তাহাকে পাইতে হয় না। ধনবল ও পদবল থাকিলে বরং সেই দরিদ্র সাধু পাঁচজনকে শাস্তি দিতে পারে!

আর সেই অভাগী পরিত্যক্তা বালিকা! দুইদিন কাঁদিয়া, দারুণ দুঃখগ্লানিতে পুড়িয়া শেষে আর উপায়ান্তর না দেখিয়া পুরুষান্তরেরই পাপলালসার পণ্য হইয়া পথে দাঁড়ায়!

পুরুষের পাপলালসার জন্য নারীরা কুলভ্রষ্টা হইতেছে, সেই পুরুষ যে সমাজে কোনও শাস্তিই পায় না, আবার সেই পাপে রত থাকিয়াই সামাজিক সকল অধিকার ভোগ করিতেছে।—আর সেই অভাগী নারী কোনও মতে সমাজে সাধু আশ্রয় পাইয়া সাধুজীবন যাপন করিবার সকল পথ তার রুদ্ধ! ইহা অপেক্ষা সামাজিক ধর্ম্মের গ্লানি কি হইতে পারে, তা জানি না। সমাজ-নেতৃগণের কি ইহা ভাবিয়া একটু লজ্জাও কখনও হয় না? এই সব দুর্ব্বৃত্ত পুরুষদের কোনও শাস্তিবিধান যদি তাঁহারা করিতে পারিতেন, তবু যাহউক কিছু কথা ছিল।

সমাজের ও পরিবারের কল্যাণের জন্য নারীজীবনের পবিত্রতার আদর্শ অতি উচ্চ হওয়া আবশ্যক। এ সম্বন্ধে পুরুষের ত্রুটী যত অনিষ্টকর হয়, নারীর ত্রুটী তার অপেক্ষা অনেক বেশী অনিষ্টকর হয়,—বস্তুতঃ মাতৃজীবনের পবিত্রতার উপরে পারিবারিক জীবনের অস্তিত্বই নির্ভর করিতেছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই জন্য পবিত্রতা নারীধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া সকলদেশের সমাজ-নীতিতেই স্বীকৃত হইয়াছে। এবং নারীধর্ম্মের এই ব্যভিচার সমাজনীতি একরূপ অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়াই সর্ব্বত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে। কোথাও এই পবিত্রতার আদর্শ অতি কঠোর, কোথাও বা তার কঠোরতা অপেক্ষাকৃত কম। বিভিন্ন সমাজে এই যা পার্থক্য দেখা যায়।

পক্ষান্তরে পুরুষের পক্ষে এই ব্যভিচার নিন্দনীয় হইলেও একেবারে অমার্জ্জনীয় বলিয়া কোথাও বিবেচিত হয় না।

হিন্দু সমাজে নারী-জীবনের এই পবিত্রতার আদর্শ অতি কঠোর এবং এইজন্য এই পবিত্রতা হইতে বিচ্যুতি ঘটিলে সে নারীকে শ্রদ্ধার চক্ষে কেহ দেখিতে পা[রে] না,—হেয়তম পাপেই তাকে কলঙ্কিত বলিয়া সকলে ম[নে] করে। কুলের বাহির কেহ হইলে, তার এই কলঙ্কে[র] কথা সমাজে ঘোষিত হয়,—সকলেই তাকে ঘৃণার চ[ক্ষে] দেখে, তার কোনও সংস্পর্শে আসিতে ঘৃণাবোধ করে[ন]। সমাজে তাহার কোনও স্থান হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে[।] বহুকাল হইতে পুরুষ পরম্পরায় এই সংস্কার এমনই সকলে[র] মনে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে যে, কুলভ্রষ্টা কোনও বালিকার অন[...] পর্য্যন্ত তাহাকে স্পর্শ করিতে ঘৃণাবোধ করেন।

কিন্তু একটি কথা আমাদিগকে বিবেচনা করিতে হইবে[।] নারীর পবিত্রতার আদর্শের উচ্চতা যতই সমাজের কল্যা[ণে] প্রয়োজন হউক, নারীধর্ম্মের ব্যভিচার যত বড়ই গুরু[তর] অপরাধ নারীর পক্ষে হউক, স্বেচ্ছায় ব্যভিচারে আস[ক্তি] এক কথা, আর অসহায়া কোনও বালিকার পক্ষে প্রতিকূ[ল] অবস্থার গতিকে কুলভ্রষ্টা হইয়া পড়া, আর এক কথা। স্বেচ্ছ[ায়] ব্যভিচারে আসক্তি অমার্জ্জনীয় বলিয়া সামাজিকগণ ম[নে] করিতে পারেন, বস্তুতঃ সমাজ ও পারিবারিক জীবনে[র] প্রকৃত অমঙ্গল ইহাতেই ঘটে। কিন্তু শেষোক্ত অবস্থ[ায়] তাহার অপরাধ কখনও অমার্জ্জনীয় বলিয়া মনে করা সঙ্গ[ত] নয়। ইহারা যখন উদ্ধার পায়, যদি চিত্তের বিকৃতি [না] ঘটিয়া থাকে, পরিতাপে পুড়িয়া সত্যই যদি তাহারা সাধুপ[থে] থাকিতে চায়, তবে সমাজে তাহাদিগকে গ্রহণ ক[রা] সামাজিকগণের বড় একটি কর্ত্তব্য। যদি খুঁৎখুঁতি থা[কে] হয়, দেহশুদ্ধির জন্য কোনও শুদ্ধি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা তাঁহা[রা] করিতে পারেন।

তারপর প্রলোভনে মোহভ্রান্ত হইয়া যদি নারী কুলত্যা[গ] করে, তাহাদের কথা। ইহারা অনেকেই কুলত্যাগে[র] পরেই যারপর নাই পরিতপ্তা হয়,—ফিরিবার উপায় থাকি[লে] ফেরে। তবে ইহাদের সমস্যা অপেক্ষাকৃত কঠিন। সহ[জে] ইহারা সমাজে আবার সাধুশীলা কুলনারীদের সমান স্[থান] পাইলে ইহাদের দৃষ্টান্তের প্রভাবে নারীজীবনের পবিত্র[তার] আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া একেব[ারে] ইহাদিগকে সাধুজীবনের বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়াও ন্যায়-স[ঙ্গত] হইতে পারে না। তবে নিজ নিজ গৃহে পূর্ব্বের স্থান ইহ[ারা] গ্রহণ করিতে না পারুক, সমাজে থাকিয়াই সৎপথে ইহ[ারা] প্রতিপালিতা হইতে পারে,—সাধুকর্ম্মে আত্মনিয়োগে জী[বন]

চরিতার্থতার শাস্তিভোগ করিতে পারে, তার ব্যবস্থা সমাজকে করিতে হইবে।

ইহাদের জন্য এমন সব আশ্রম হওয়া আবশ্যক, যেখানে ইহারা সুশিক্ষালাভ করিয়া কোনও সাধুবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে,—ধর্ম্মসাধনায়, সেবাব্রতে জীবন উৎসর্গ করিবার সুযোগ পায়। নির্দ্দিষ্টকাল সাধুব্রতে জীবন যাপন করিবার পর, গৃহে তাহাদের স্বামী পিতা বা ভ্রাতা প্রভৃতি কেহ যদি তাহাদিগকে গ্রহণ করে, তবে সমাজের তাহাতে অনুমোদন করাই উচিত।

আর একটি কথা। যে সব পুরুষের প্ররোচনায় কোনও কুলকন্যা বা কুলবধূ গৃহত্যাগ করে, তাহাদের অতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা সমাজে হওয়া প্রয়োজন। ন্যায় ধর্ম্মে ইহাদের পাপ এই সব নারীর পাপ অপেক্ষা অনেক বেশী।

ইহাদের যথোচিত শাসন হইলে সমাজে এইরূপ কুল-ত্যাগের ঘটনাও ক্রমে কমিয়া আসিবে।

কিন্তু আধুনিক হিন্দুসমাজ এ সম্বন্ধে এতই উদাসীন যে আমরা একটি দৃষ্টান্ত জানি, একটি সদ্বংশজাত সম্ভ্রান্ত পরিবারের যুবক তাহার কোনও বালবিধবা আত্মীয়াকে কুলের বাহির করিয়া নিয়া যায়। সেই বিধবার সঙ্গেই সে থাকে, বিধবার সন্তানও হইয়াছে। কিন্তু তার পিতৃশ্রাদ্ধে সে গৃহে যায়,—জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়া শ্রাদ্ধ সেই করে। সামাজিক-গণ, ব্রাহ্মণগণ, সকলে সেই শ্রাদ্ধে যোগদান করেন, এবং তার গৃহে আহার করেন। তার এই ঘৃণিত আচরণ সম্বন্ধে একটি কথাও হয় না। অথচ তার নিন্দা সকলেই করেন। কিন্তু এই নিন্দায় এরূপ লোকের কি আসিয়া যায়?

আধুনিক সমাজের অবস্থা এ সম্বন্ধে যতই নিন্দনীয় হউক,—হিন্দুসমাজ চিরদিন এমন ন্যায়বিরোধী ছিল না,—শাস্ত্রও ন্যায় ধর্ম্মের ব্যবস্থায় কৃপণ ছিল না।

কিছুদিন পূর্ব্বে—"ধর্ষিতানারী" নামে মালঞ্চে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল (১৩২৪, কার্ত্তিকের সংখ্যা ৫৭১ পৃষ্ঠা) তাহাতে পতিতা নারীদের সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান কি, কিসে তাহারা পরিশুদ্ধ হইয়া সমাজে পুনঃগৃহীত হইতে পারে,—তাহার আলোচনা স্মরণ না থাকিলে পাঠকবর্গ আবার পড়িয়া দেখিতে পারেন।

সম্প্রতি হিতবাদীতে এ সম্বন্ধে একটি আলোচনা বাহির হইয়াছে,—নিম্নে তাহা আমরা প্রকাশিত করিলাম।

শাস্ত্র ও সমাজ।

(হিতবাদী হইতে উদ্ধৃত।)

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫।

* * * * *

এখন কথা হইতেছে শ্রীমতী সুভাষিণীকে হিন্দুসমাজে পুনর্ব্বার গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না? আমরা বলি,—শাস্ত্রসঙ্গত ব্যবস্থানুসারে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে, নতুবা নহে। যদি শাস্ত্র সুভাষিণীর প্রায়শ্চিত্তান্তে গ্রহণের ব্যবস্থা দেন,—আর, সামাজিকগণ অন্যায় বিচারে তাহাকে গ্রহণ না করেন, তবে অধর্ম্মের ভার সমাজের মস্তকে পড়িবে। * *

ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিগণ হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রণেতা। লোকের মঙ্গল চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন স্বার্থ-সাধনোদ্দেশ্যে তাঁহারা সামাজিক বিধিপ্রণয়ন করেন নাই। তাঁহাদের শাস্ত্রে যেমন লোকহিতৈষিতা আছে, তেমনি উদারতাও আছে। লোকে অনভিজ্ঞতা ও অধর্ম্ম প্রবণতার বশে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়াও যখন প্রায়শ্চিত্তান্তে সমাজে বাস করিতে পারে, তখন দস্যুতস্করের হাতে পড়িয়া যদি কোন উপায়হীন স্ত্রী বা পুরুষ শাস্ত্রবিগর্হিত কার্য্য করিতে বাধ্য হয়, শাস্ত্র তাহার প্রায়-শ্চিত্তের ব্যবস্থা যেমন দিবেন, তেমনি সমাজে প্রবেশের অধিকারও দিবেন, একথা কোন মতেই অযৌক্তিক নহে। কিন্তু, এস্থলে আমরা যুক্তি দেখিব না, শাস্ত্র কি বলেন, তাহাই দেখিব।

বঙ্গের প্রধান প্রধান পণ্ডিতবর্গ শ্রীমতী সুভাষিণীকে পুনরায় সমাজে গ্রহণ সম্বন্ধে ব্যবস্থা দিয়াছেন, সুতরাং সুভাষিণীকে যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তাহা হইলে সমস্ত হিন্দু সমাজ তাহাকে সাদরে সমাজে গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন এই আমাদের বিশ্বাস।

সুভাষিণীর নিজের কোন অপরাধ নাই। সাধারণতঃ লোকে যাহা করিয়া থাকে, সেও তাহাই করিয়াছিল, শাশুরীর সঙ্গে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিল। দৈবাৎ সে শাশুরীর সঙ্গচ্যুত হয়—পথহারা হইয়া যখন ঘুরিতেছিল, তখন দুই পিশাচীর হাতে পড়ে। এবিষয়ে সামান্য অনবধানতা ভিন্ন তাহার অন্য কোন গুরুতর ত্রুটী লক্ষিত হয় না। তাহার রক্ষার ভার স্বামী ও শ্বশুর শাশুরীর উপর ন্যস্ত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ রক্ষকগণ সুভাষিণীকে

রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। সেইজন্ত যে অনর্থ ঘটিয়াছে তাহার ফলে সুভাষিণীকে মৃত্যুযন্ত্রণারও অধিক কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে।

অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহাত ঘটিয়াছেই, এখন যদি সে আবার তাহার শ্বশুর শাশুরীর স্নেহ পায়, স্বামীর আদরে বঞ্চিত না হয়, সমাজের চক্ষে হেয় না হয়, তাহা হইলে তাহার দুঃখদগ্ধ হৃদয়ে একটু শান্তি আসিতে পারে। এই কুলললনাকে প্রায়শ্চিত্তান্তে হিন্দুসমাজে পুনর্ব্বার গৃহীত দেখিলে সকলেই সুখী হইবে।

সুভাষিণীর দুর্দ্দশার কথা যে শুনিতেছে,—সেই তাহার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিতেছে। শাস্ত্রও তাহার সমাজে গ্রহণের অনুকূল ; এ অবস্থায় তাহাকে গ্রহণ করিলে তাহার শ্বশুর, স্বামী কি আত্মীয়বর্গ সমাজে কাহারও নিকট নিন্দিত বা অপমানিত হইবেন না, বরং উদারতা, সদাশয়তা এবং মনস্বিতারই পরিচয় দিবেন। সুভাষিণীকে গ্রহণ না করিলে কেবল যে শাস্ত্র-বিধির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হইল এমন নহে, সমগ্র হিন্দুসমাজের অভিপ্রায়ের প্রতি অনাদর প্রদর্শন করা হইল। নিরপরাধে কুলাঙ্গনার প্রতি অন্যায় অত্যাচারে যাঁহারা প্রশ্রয় দিবেন, তাঁহারা কেবল যে সতীর অভিসম্পাতের পাত্র হইবেন এমন নহে,—বিধাতার নিকট অপরাধী হইবেন।

আমরা নিম্নে বঙ্গের প্রধান প্রধান পণ্ডিতবর্গের ব্যবস্থা মুদ্রিত করিলাম। আশা করি, আমরা অচিরেই প্রায়শ্চিত্তান্তে সুভাষিণীর সমাজে গ্রহণের সংবাদ পাইয়া আনন্দ লাভ করিতে সমর্থ হইব।

ব্যবস্থা।*

(১)

বলাদবিজ্ঞাতজাতিকপত্যক্তপুরুষোপভুক্তয়া ব্রাহ্মণ্যা তৎপাপক্ষয়ার্থং তৃতীয়-ভাগহীন-জ্ঞানকৃতাস্ত্যজাত্যন্তি-গমন-জনিতপাপপ্রায়শ্চিত্তং ষোড়শ বার্ষিক ব্রতং তত্রাশক্তৌ চত্বারিংশদধিকদ্বিশতধেনুদানং তত্রাপ্যশক্তৌ বিংশত্যধিক সপ্তশতকার্ষাপণাদ্যন্যতমরজতাদিদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং কর্ত্তব্যং। অস্ত্যজগমনস্যানুপাতকত্বেন তদভ্যাসে ন প্রায়শ্চিত্ত যুক্তিঃ ; কিন্তু সকৃৎকৃতপ্রায়শ্চিত্তেনাভ্যাসজনিতপাপানামপি নাশস্তত্র-ন্যায়াৎ বহুব্রাহ্মণবধপাপনাশবৎ। কৃতে চ প্রায়শ্চিত্তে তস্যাঃ সর্ব্বথা ব্যবহার্য্যতা ভবত্যেবেতি সতাম্মতম্।

অত্র প্রমাণং

বলাদুপভোক্তুর্জাত্যজ্ঞানাৎ ব্রাহ্মণাদিজাতিবিশেষোল্লিখিতব্যভিচারপ্রায়শ্চিত্তব্যবস্থাপনাসম্ভবেন সর্ব্বতো গুরু প্রায়শ্চিত্তং চতুর্ব্বিংশতিবার্ষিক ব্রতং, বলাৎকারিত্বেন পাপস্য কিয়ল্লাঘবাৎ তৎতৃতীয়ভাগহীনং ষোড়শবার্ষিকব্রতং ব্যবস্থাপয়িতুমুচিতম্। বলাৎকারিতচণ্ডালান্নভক্ষণে রঘুনন্দনেন তথা ব্যবস্থাপিতত্বাৎ। জ্ঞানতশ্চণ্ডালান্নভক্ষণে চান্দ্রায়ণ ব্রতং তদশক্তৌ সার্দ্ধসপ্তধেনুদানং বলাৎকারিতভক্ষণে পরাক ব্রতং তদশক্তৌ পঞ্চধেনুদানং। অত্র জ্ঞানকৃত প্রায়শ্চিত্ততৃতীয়ভাগহ্রাসঃ। তথাচ প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বম্। যৎ তু বিষ্ণুবচনং 'চণ্ডালান্নং ভুক্ত্বা ত্রিরাত্রমুপবসেৎ সিদ্ধং ভুক্ত্বা পরাক ইতি। তদ্বলাদ্ভোজনবিষয়মিতি প্রায়শ্চিত্ত বিবেকঃ। বলাৎ প্রবর্ত্তমানস্য বিষয়জ্ঞানমস্ত্যেব স্বারসিকত্বাভাবাৎ তথাকারিত্বং, কিন্তু জ্ঞানকৃতপাপাৎ তত্র যুক্তং পাপাধিক্যমিত্যাশয়" ইতি।

মনুবচনং "চাণ্ডালান্ত্যস্ত্রিয়ো গত্বা, ভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ। পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রো জ্ঞানাৎ সাম্যন্তু গচ্ছতি" "ব্রতং যচ্চোদিতং পুংসাং পতিতস্ত্রীনিষেবণাৎ। তচ্চাপি কারয়েন্মূঢ়াং পতিতাসেবনাৎ স্ত্রিয়ং। ইত্যাঙ্গিরোবচনঞ্চ।

(স্বাক্ষর) মহামহোপাধ্যায়োপাধিক শ্রীশিবচন্দ্র সার্ব্বভৌমাণাং, শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ শর্ম্মণাম্, শ্রীঅজিতনাথ ন্যায়রত্ন শর্ম্মণাম্, শ্রীআশুতোষ তর্কভূষণ শর্ম্মণাম্, শ্রীকালীপ্রসন্ন দেবশর্ম্মাণাম্; ব্রাহ্মণসভাসম্মতেয়ং ব্যবস্থা শ্রী গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থানাং সম্পাদকানাং শ্রীদুর্গাসুন্দর শর্ম্মণাম্, কৃতিরোপাধিকানাং শ্রীহরিপদ মীমাংসাতীর্থ শর্ম্মণাম্, শ্রীদাশরথি দেবশর্ম্মণাম্, শ্রীহরিহর দেবশর্ম্মণাম্, শ্রীহরিদাস দৈবজ্ঞশর্ম্মণাম, শ্রীনিবারণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থানাম্।

(২)

মাসাদূর্দ্ধং সংবৎসরপর্য্যন্তং নীচকর্ত্তৃকবলাৎকারকারিতানির্দ্দিষ্টজাতিকপুরুষসম্ভোগতৎকর্ম্মণো নিরগ্নিব্রাহ্মণপত্ন্যাঃ

* আমরা সম্প্রতি খবর পাইলাম সুবিখ্যাত চিকিৎসক উন্নত-চেতা দেশহিতৈষী কর্ণেল ইউ, এন, মুখার্জ্জী মহাশয় শ্রীমতী সুভাষিণীকে নিজগৃহে আশ্রয় দান করিয়াছেন। অধ্যাপকগণের প্রায়শ্চিত্তের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ হিন্দু বাঙ্গালীমাত্রেরই যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত।

মালঞ্চ—সম্পাদক।

পাপক্ষয়ার্থং চান্দ্রায়ণব্রতাশক্তৌ ধেন্বষ্টকদানং তদশক্তৌ যোগ্যতমমূল্যদানং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়ং যোড়শবার্ষিক ব্রতাদিরূপগুরুতরপ্রায়শ্চিত্তাৎ তৎপাপক্ষয়োভবত্যেব কৃত-প্রায়শ্চিত্তায়াস্তস্যাশ্চ ব্যবহার্য্যতেতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

অত্র প্রমাণম্।

দাসীকৃতো বলান্ম্লেচ্ছৈশ্চাণ্ডালাদ্যৈশ্চ দস্যুভিঃ। অশুভং কারিতং কর্ম্ম গবাদেঃ প্রাণহিংসনম্। উচ্ছিষ্টমার্জ্জনঞ্চৈব তথা তস্যৈবভক্ষণম্ খরোষ্ট্রবিদ্ বরাহাণামামিষস্যৈব ভক্ষণম্। তৎস্ত্রীণাঞ্চ তথা সঙ্গং তাভিশ্চ সহ ভোজনং। বাসোষিত-দ্বিজগতৌ তু প্রাজাপত্যং বিশোধনম্। চান্দ্রায়ণং পরাকং বা চরেৎ সংবৎসরং দ্বিজ। ইত্যাদি বিবেকধৃতদেবলবচনং, ব্রতং যচ্চোদিতং পুংসামিত্যাদি বিবেকাদিধৃতাঙ্গিরোবচনং প্রায়শ্চিত্তে গুরৌ ভুক্তে লঘুপাপস্য সংক্ষয় ইত্যাদি স্মার্ত্ত সম্মতশ্চ।

(সাক্ষর) শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন দেবশর্ম্মণাম্।

যথার্থ প্রতিলিপি লিখিয়া দিলাম। ইতি

শ্রীতরঙ্গবিহারি মুখোপাধ্যায়।
প্রচারক বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা।

যুদ্ধের গতি—ভারতের আশঙ্কা।

প্রায় দুইমাস হইল, বৃটিশ সচিবের বার্ত্তা আসিয়াছিল, যুদ্ধের গতি এসিয়ার দিকে প্রবলভাবে আসিয়া মধ্য এসিয়াকে বিপ্লুত করিয়া ভারত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইতে পারে। সুতরাং এসিয়ার শান্তি রক্ষার জন্য, ভারত রক্ষার জন্য ভারতবাসী প্রজারা সচেষ্ট হউন,—ভারতরাজসরকারকে সর্ব্বপ্রকার সহায়তাদান করুন। বিপদের আশঙ্কায় ভারত-বাসীর নির্জ্জীব প্রাণেও একটা সাড়া তখন উঠিয়াছিল,—সকলে বুঝিয়াছিল, আত্মরক্ষার জন্য এবার অস্ত্র ধরিতে হইবে, প্রাণ দিতে হইবে। তারপর আরও কতদিন গেল,—বিশেষ-বিধান ও আয়োজনের চেষ্টা হইল না। যাহা হউক, তারপরে দিল্লীর মজলিস্ হইল, প্রাদেশিক মজলিস্‌ও অনেকগুলি হইল,—সেও আজ প্রায় একমাসের কথা। কিন্তু তারপর কৈ—তেমন কিছু আয়োজন উদ্যোগ ত দেখি-তেছি না। গবর্ণমেণ্টের মোটের উপরে তেমন একটা সাগ্রহ সচেষ্ট ভাব দেখা যাইতেছে না। দিল্লীর মজলিসে সংগ্রহ করিতে হইবে, আরও অনেক আয়োজন করিতে হইবে। প্রাদেশিক মজলিসেও সেই কথার প্রতিধ্বনি হইয়াছিল। এই সব মজলিসে—কর্ত্তৃপক্ষ যে সব আশার কথা বলিলে দেশময় একটা উৎসাহের সাড়া পড়িয়া যাইত, দেশের লোক যাহারা দেশের মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা করে তাহারা আগ্রহে দেশরক্ষার আয়োজনে গবর্ণমেণ্টকে সর্ব্বপ্রকার সহায়তা দান করিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অগ্রসর হইত—গবর্ণমেণ্ট তেমন কোন কথা বলেন নাই। তবু সিপাহীর বেতন বৃদ্ধি হইবে, ভারতবাসী কমিশনী নায়কের পদ পাইবে, এ ভরসা গবর্ণমেণ্ট দিয়াছিলেন। কিন্তু প্রায় একমাস গেল, আর কোনও সাড়াশব্দই এ সম্বন্ধে পাওয়া যাইতেছে না। মধ্যে মধ্যে খবরের কাগজে দেখিতে পাই মফঃস্বলে সরকারী কর্ম্মচারীদের নেতৃত্বে রংরুটসংগ্রহের জন্য সভা হইতেছে, কিন্তু রংরুট তেমন হইতেছে বলিয়া ত মনে হয় না। তার সম্বন্ধে বিশেষ কোনও খবরও বাহির হয় না।

যাহাহউক, কর্ত্তৃপক্ষের ভাবগতিক দেখিয়া এক একবার মনে হয় মধ্যএসিয়ায় বা ভারতে অশঙ্কার কারণ বুঝি দূর হইয়াছে। কিন্তু বিলাতের টাইম্‌স্ পত্রিকার একটি মন্তব্য সম্প্রতি বেঙ্গলীতে বাহির হইয়াছিল,—নিম্নে আমরা তাহার মর্ম্মানুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহা হইতে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন, আশঙ্কা যথেষ্ট আছে এবং বিলাতের দূরদর্শী রাজনৈতিকগণ তার জন্য ভারতের সত্বর প্রস্তুত হওয়া অতি আবশ্যক বলিয়া মনে করেন।

এশিয়ার সঙ্কট।

"সম্প্রতি ইংলণ্ডের পক্ষে এক নূতন বিপদের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। জর্ম্মাণীর সহিত সন্ধির পরে রুষ-সাম্রাজ্যের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ছোট ছোট প্রদেশ নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে। বিশাল রুষ সাম্রাজ্য এখন অন্তর্বিপ্লবে ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায় সুযোগ বুঝিয়া তুরস্ক আপনার নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেছে। তুর্কী সৈন্য বোধ হয় শীঘ্রই বেটু (Batum) নগরে আসিবে; হয়ত এতদিনে বেটু অধিকারও করিয়াছে। (বেটু ট্রান্সককেশীয় প্রদেশে কৃষ্ণসাগরের পূর্ব্ব উপকূলে

এর্জরুম (Erzrum) পুনরধিকার করিয়া সেই দিক হইতে পূর্ব্বদিকে কার্সের (Kars) দুর্গ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।*

এদিকে বেটু হইতে Trans Coucasian Railway আরম্ভ হইয়াছে, এবং কার্সের পশ্চিমে সারিকামিস্ (Sari kamish) হইতে আর একটি শাখা লাইন চলিয়া গিয়াছে। এই দুইটি স্থান যদি তুরস্ক অধিকার করিতে পারে, তবে এই রেল লাইন দুইটি সম্পূর্ণরূপে তুরস্কের করায়ত্ত হইবে। তাহা হইলে বিনাবাধায় অতিশীঘ্র তুর্কী সৈন্য কাস্পিয়ান সাগরের তীরে উপস্থিত হইতে পারিবে। যদি তুর্কী সৈন্য কাস্পিয়ান সাগর পার হইয়া রুষ অধিকৃত মধ্য এশিয়ায় উপস্থিত হইতে পারে, তাহা হইলে বিপদ অত্যন্ত গুরুতর হইবে। রুষ অধিকৃত মধ্য এসিয়ায় বহু ছোট ছোট মুসলমান রাজ্য আছে। তুরস্ক যদি ইহাদিগকে স্বপক্ষে আনিতে পারে, তাহা হইলে তুরস্ক হইতে আফগানিস্থানের সীমান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ তুরস্ক ও জর্ম্মাণীর করায়ত্ত হইবে। ইতিমধ্যে তুরস্ক হইতে প্রেরিত বহু গুপ্তচর এই মধ্য এসিয়ার মুসলমান রাজ্যগুলিতে গোলযোগ বাধাইবার চেষ্টা করিতেছে। এই স্থানের মের্ভ (Merv) সহর হইতে আফগান সীমান্তে অবস্থিত কুস্ক (Kuskh) সহর পর্য্যন্ত একটি রেল লাইন গিয়াছে। এই কুস্ক সহর হইতে আফগানিস্থানের হিরাত (Herat) সহর মাত্র দুই দিনের পথ, হিরাত সহরকে ভারতের দ্বার বলা হয়। ইহা ত গেল মধ্য এশিয়ার দিক হইতে বিপদের কথা।

মধ্য এশিয়ার কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্য দিক হইতেও বিপদের সম্ভাবনা আছে। আর্ম্মেনীয়া ও ট্রান্সককেসিয়া সম্পূর্ণরূপে তুরস্কের অধিকারে আসিলে তুর্ক-জর্ম্মাণ সৈন্যের পক্ষে পারস্যের পথ সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হইবে। তখন ণীও তুরস্কের মিলিত সৈন্য পারস্য আক্রমণ করিবে ইহা নিশ্চিত। পারস্য আক্রমণ করিতে বহু সৈন্যেরও বিশেষ প্রয়োজন হইবে না। কারণ দেখা গিয়াছে যে ইংরেজ সেনাপতি স্যার পার্সি সাইকস্ (Sir Percy Sykes) দুই বৎসর পূর্ব্বে মোটে ১৫০০ সৈন্য লইয়া দক্ষিণ পারস্যে উপস্থিত হইয়া সেইস্থানের গোলযোগ নিবারণ পূর্ব্বক শান্তিস্থাপন করেন। জর্ম্মাণরাও, পারস্য আক্রমণ কতদূর সহজসাধ্য, তাহা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছে। যুদ্ধের প্রারম্ভে জর্ম্মাণ সৈন্য প্রায় পারস্য রাজধানী তেহরান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া রুষসৈন্যকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিল। পারস্য আক্রমণে তাহাদের তিনটি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। প্রথমতঃ, তাহারা পুনর্ব্বার তেহরাণ অধিকার করিবার চেষ্টা করিবে। তেহরাণ অধিকার করিতে পারিলে পারস্য সম্রাট "সাহ" তাহাদের হাতে আসিয়া পড়িবেন। ইহা করিতে পারিলে জর্ম্মাণী প্রায় সমস্ত মুসলমান শক্তি আপনার পক্ষে আনিতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ, পারস্যের ভিতর দিয়া শত্রুসৈন্য অবাধে মেসপটেমিয়ায় প্রবেশ করিয়া জেনারেল মার্শালের বাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিয়া তাঁহাকেও অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত করিতে পারে। জেনারেল মার্শালকে পরাজিত করিতে পারিলে জেনারেল এলেনবিও প্যালেষ্টাইনে অত্যন্ত বিপদে পড়িবেন। তৃতীয়তঃ, জার্ম্মাণ সৈন্য কারুণ (Karun) নদের নিকট এংলো পার্শিয়ান কোম্পানীর বিস্তৃত পেট্রোলিয়মের খনি অধিকার করিয়া মিত্রপক্ষকে একটি অত্যন্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যে কতক পরিমাণে বঞ্চিত করিতে পারে।

যাহাহউক, মধ্য এশিয়ার দিকহইতেই আক্রমণের সম্ভাবনা অধিক বলিয়া মনে হয়। মধ্য এশিয়ার মুসলমান শক্তিকে নিজের পক্ষে আনিতে পারিলে জর্ম্মাণী আফগানদিগকে স্বপক্ষে আনিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিবে। আফগানিস্থানকে স্বপক্ষে আনিবার জন্য জর্ম্মাণী বহুদিন হইতে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু আমীর এখনও ইংরেজের সহিত বন্ধুত্ব ও সদ্ভাব রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু যদি জর্ম্মাণী আফগানিস্থানের দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান শক্তিকে নিজের পক্ষে আনিতে পারে, তবে ভারতবর্ষের বিপদ আরও ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়াইবে।

এই সব বিপদের সম্ভাবনা বুঝিয়া [redacted] বৃটিশশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের বিপুল চেষ্টা এখন হইতেই করা উচিত।"

বিপদ কেবল বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নয়, ভারতবাসী প্রজা আমাদেরও। শতাধিক বৎসর যাবৎ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের রক্ষণাধীনে নিশ্চিন্ত শান্তির আরামে থাকিয়া ভারতবাসী একেবারেই দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে,—[redacted] শাসন ও রক্ষণ প্রভৃতি বড় দায়িত্বের কার্য্যে ভারতবাসী কোনই কর্ত্তৃত্ব ছিল না,—এ সম্বন্ধে কোনও শক্তি দূরে থাক্, দায়িত্বের বুদ্ধি পর্য্যন্ত তাহার বিলুপ্ত হইয়াছে। সেই

* কার্স দুর্গ ট্রান্সককেশীয় প্রদেশে অবস্থিত।

ভারতবাসীকে আবার আত্মরক্ষার যোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে। একদিনে—এক কথায় ইহা হইবার নয়,—তাঁহাদের নির্জ্জীব প্রাণে জীবন্ত রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের বুদ্ধি জাগাইতে হইবে, নতুবা এই শক্তি তাহাদের হইবে না। এ জন্ত যে নীতি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের এখন অবলম্বন করা উচিত,—যেভাবে দেশের নেতৃবৃন্দকে ডাকিয়া—তাহাদের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, তাহাদের সহায়তা গ্রহণ করা উচিত,—তাহা অনেকবার আমরা বলিয়াছি। আরও অনেকে বলিতেছেন। কিন্তু হায়, এ পর্য্যন্ত তার তেমন কোনও আয়োজন চেষ্টা দেখিতেছি না। কেন, এমন হইতেছে, কে জানে?

মফঃস্বলে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী হাকিম দারোগা গ্রাম্য পঞ্চায়েত প্রভৃতির নেতৃত্বে রংরুট সংগ্রহের চেষ্টা কিছু হইতেছে। কিন্তু এই বিপদের মুখে আমরা সত্য গোপন করিব না। মফঃস্বলে সরকারী কর্ম্মচারীদের সাধারণ লোকে কিছু ভয়ের চক্ষেই দেখে; ভয়ে ও সম্ভ্রমে দূর হইতে ইঁহাদের সেলাম করিয়াই লোকে সরিয়া যাইতে পারিলে বাঁচে। রাষ্ট্রনীতি, রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য, দেশের সেবা, আত্মোৎসর্গ ইত্যাদি সব ব্যাপারের সঙ্গে ইঁহাদের বিরোধ বই, কোনও রূপ মিত্রতার সম্বন্ধ আছে, ইহা দেশের লোক কখনও কিছুতে মনে করিতে পারে নাই। একেই পূর্ব্ব হইতে একটা আতঙ্ক দেশ মধ্যে হইয়াছে যে গবর্ণমেণ্ট সিপাহীর জন্ত লোক ধরিয়া নিবেন। (বেঙ্গলী পত্রিকায় অসময়ে যে কনস্কৃপসনের ধুয়া উঠিয়াছিল,—তাহা ইহার জন্ত অনেক পরিমাণে দায়ী।) যাহা হউক—এই আতঙ্ক দূর হইতে না হইতেই হাকিম দারোগা প্রভৃতি সরকারী লোক নানাস্থানে সিপাহী সংগ্রহের জন্ত সভা করিতেছেন,—ইহাতে উৎসাহ অপেক্ষা আতঙ্কই বেশী হইবে বলিয়া আমরা আশঙ্কা করি।

ভয় হইলে, ভয় বাড়াইলে, লোক আসিবে না—পলাইবে। উৎসাহ চাই, দেশহিতৈষণায় প্রেরণা চাই, বিশ্বাস ভরসা চাই,—গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে প্রজার, বৃটনের সহিত ভারতবাসীর সমান রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধের, রাষ্ট্রীয় স্বার্থের, সমান রাষ্ট্রীয় মঙ্গলের অনুভূতি চাই।—দেশের রাষ্ট্রনেতৃবর্গের আগ্রহ ও উদ্যম ব্যতীত—সরকারী হাকিম দারোগা পঞ্চায়েতগণের দ্বারা কি তা হইবে? নেতৃবর্গকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদের অন্তর বুদ্ধি ও উপদেশ নিয়া (খয়েরখাঁদের স্বার্থভয়প্রণোদিত আত্ম তুষ্টিকর কথায় ভুলিয়া নয়), তাঁহাদের সঙ্গে একযোগে মিলিয়া রাজপুরুষগণ কাজ করুন,—শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উৎসাহ জাগাইয়া তুলুন—নেতৃবর্গের হাতে প্রধান বলই তাঁহারা—তবেই ভারতের সন্তুষ্ট ও সাগ্রহ জনবল তাঁহারা পাইবেন। নতুবা—কতদূর কি হইবে, বলিতে পারি না।

স্বায়ত্তশাসনের এক দফা—স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন।

সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট হইতে স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে এক মন্তব্য বাহির হইয়াছে। এই স্বায়ত্তশাসন Local Self government নামে পরিচিত। মিউনিসিপালিটী, ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ড, লোকালবোর্ড, গ্রাম্য পঞ্চায়েতী প্রভৃতি ব্যাপার এই স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্র। সমগ্রদেশের শাসনকার্য্যে নয়, জেলা মহকুমা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, সেই সেই স্থান বিশেষের বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্ত এই স্বায়ত্তশাসন, তাই ইংরেজি ইহার নাম লোকাল সেল্‌ফগবর্মেণ্ট হইয়াছে বাঙ্গলায় 'লোকাল' কথাটির তর্জ্জমা করিয়া ইহার নাম করা হইয়াছে, 'স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন'। যদিও এই নামটিতে ইহার বিশেষ অর্থ কিছুই সূচিত করে না, তবু প্রচলিত বলিয়া এই নামই আমরা ব্যবহার করিতেছি ও করিব,—যতদিন না অর্থ-সঙ্গত ভাল নাম একটা বাহির হয়।

বড়লাট লর্ডরিপণ প্রায় ত্রিশ্‌বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তন করেন। এই সব ব্যাপার ক্রমে স্থানীয় লোকের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির উপরেই একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে,—গভর্মেণ্ট উপর হইতে কাজ দেখিবেন, অন্যায় হইলে কৈফিয়ৎ নিবেন, প্রতিবিধান করিবেন,—তাছাড়া সাক্ষাৎভাবে কার্য্য পরিচালনায় হাত কিছু থাকিবে না,—ইহাই লর্ডরিপণের অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু তখন-কার শ্বেতাঙ্গ শাসকসম্প্রদায় (Civil Service) সিভিল্‌-সার্ভিস্‌ ইহার বিরোধী ছিলেন। আমরা আমাদের অবস্থা যে চক্ষে দেখি, আমাদের কথা যে ভাবে ভাবি,—ইঁহারা তাহা করেন না। ইঁহাদের একটা দৃঢ় সংস্কার আছে, এ দেশের লোকের হাতে স্বতন্ত্র ক্ষমতা কিছু দিলে তাহাতে ভাল হইবে না। কিন্তু কার ভাল হইবে না? ইঁহারা অবশ্য বলেন, এ দেশের লোকেরই ভাল হইবে না, কারণ তাহারা এসব ব্যাপার কিছু বোঝেনা জানেনা,—বুঝিবার, জানিবার এবং বুঝিয়া জানিয়া সুচারুভাবে কাজ চালাইবার

যোগ্যতাও ইহাদের নাই। শ্বেতাঙ্গবণিক্‌সম্প্রদায়ও এই মত পোষণ করেন। কিন্তু আমরা বলি তা নয়,—তোমরা আমাদের হাতে কোনও ক্ষমতা দিতে চাওনা, তার কারণ তোমরা নিজেদের হাতেই সকল প্রভুত্ব রাখিতে চাও,—আমাদের হর্ত্তা কর্ত্তাবিধাতা হইয়া তোমরা আছ, তাই থাকিতে চাও। আমরা যতটা পাইব, ততটা তোমরা তোমাদের লোকসান বলিয়া মনে কর। স্পষ্ট একথা না বল, কি স্পষ্ট করিয়া মনেই না তোল,—মনের তলে এই ভাবটিই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

যাহা হউক, লর্ডরিপণ যাহার সূত্রপাত করেন, তাহা প্রায় সেই সূত্রপাতেই রহিয়া গিয়াছে,—তেমন প্রসার এ পর্য্যন্ত হয় নাই। নূতন নূতন স্থানে এই স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে—কিন্তু ইহার উপরে আসল প্রভুত্ব যাহা তাহা বেসরকারী দেশীয় লোকের হাতে ক্রমে বাড়িয়া আসে নাই। কাজেই বলিতে হইবে, লর্ডরিপণের লক্ষ্য সাধিত হয় নাই।

সম্প্রতি ভারতগভর্ণমেণ্ট যে মন্তব্য পাশ করিয়াছেন, তাহার মোট কথা এই যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কর্ত্তৃত্ব প্রধানভাবে দেশীয় লোকের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতেই দেওয়া হইবে।

ইহাও বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু ইহাই মাত্র বাঞ্ছনীয় নয়। আসল যে জাতীয় স্বায়ত্তশাসন—দেশের শাসন কার্য্যের উপরে—সহজ কথায় শাসক সম্প্রদায় বা সিভিল সর্ভিসের এর উপরে দেশীয় লোকের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি সভার প্রভুত্ব,—সেই প্রতিনিধি সভার নিকটে সিভিল সার্ভিসের দায়িত্ব এবং এই নির্ব্বাচনের সন্তোষজনক প্রণালী,—ইহা কতটুকু কিপরিমাণে প্রবর্ত্তিত এখন হইবে, তার উপরেই বৃটিশ সাম্রাজ্যে ভারতীয় প্রজা কি স্থান—কি অধিকার লাভ করিতে পারে, তাহা আপাততঃ নির্ভর করিতেছে। সকলের শেষের কথা হইল, কোষের কর্ত্তৃত্ব (Finance) আর সামরিক কর্ত্তৃত্ব। তাহাই যে সিভিল বা অসামরিক শাসন কর্ত্তৃত্বের সকল শক্তির ভিত্তি, একথা রাষ্ট্রনীতিতে কিছু অভিজ্ঞতা যাহাদের আছে, তাহাদের আর বুঝাইবার দরকার হয় না।

যাহা হউক, এই যে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের কর্ত্তৃত্ব প্রজার প্রতিনিধিদের উপরে প্রধানভাবে অর্পিত হইবার কথা হইতেছে, সিভিল সার্ভিসের উপরে জাতীয় ব্যবস্থাক সভার প্রভুত্ব ব্যতীত ইহার সফলতা হইবার আশা বড় কম। সিভিল সার্ভিস্ যদি আন্তরিক ভাবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রসার ও উন্নতির পক্ষপাতী হইতেন, তবে কথা ছিল আলাদা। কিন্তু ইঁহারা যে ইহার বিশেষ পক্ষপাতী নন, তা বেশ বুঝিতে পারা যায়। অন্ততঃ, ইঁহারা যে পক্ষপাতী, তাহার বিশেষ লক্ষণ কিছু দেখা যায় না। দেশের লোক ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই ইঁহাদের কৃপাপ্রার্থী,—ব্যক্তিগতভাবে ইঁহাদের কৃপায় অনেকেই লাভবান্ হইতে পারেন, এবং সে প্রত্যাশাও করেন। ইঁহাদের সুদৃষ্টি রাখিতে এবং কুদৃষ্টি এড়াইতে অনেকেরই আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় সিভিল সার্ভিস যদি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের উন্নতির বিরোধী থাকেন, তবে স্বভাবতঃই ইহার সফলতার জন্য ইঁহাদের তেমন আগ্রহ কিছু হইবে না, বরং বিফলতা বা আশানুরূপ সফলতার অভাবই ইঁহাদের প্রার্থনীয় হইতে পারে। কারণ তাহাতেই এ দেশীয় প্রজার এ বিষয়ে অযোগ্যতার প্রমাণ হইবে। এই সামান্য স্বায়ত্তশাসন যাহারা অযোগ্য, উচ্চতর কোনও স্বায়ত্তশাসনে তারা আরও অযোগ্য নয় কি ? ইহারা যদি সেরূপ ইচ্ছা করেন, ইহাদের কৃপাপ্রার্থী লোকেরা ইহাদের ইঙ্গিতে এমন ভাবেই চলিতে পারে, এমনই সব কার্য্য করিতে পারে, যাহাতে স্বাধীনচেতা যোগ্যলোকের পক্ষে যোগ্যতা দেখান অসাধ্য হইবে।

একটা ছোট তুলনার কথা আমরা তুলিতে পারি। কোনও বড় পরিবারের কর্ত্তা যতই উদার ও সহৃদয় হউন, গৃহে বধূগণও আশ্রিত অন্যান্য পরিজনগণের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য যতই সুব্যবস্থা করিয়া দিন, বাড়ীর গৃহিণী যদি তাহাদের এই সুখ-স্বচ্ছন্দতার বিরোধিনী হন, তবে এমন কলটিপ তিনি চালিতে পারেন, যাহাতে কর্ত্তার সহস্র ব্যবস্থাও ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। কারণ এই সব ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিবার ভার এই গৃহিণীর হাতে।

উপরওয়ালা গবর্মেণ্ট এক্ষেত্রে কর্ত্তা, আর সিভিল সার্ভিস্ যেন গৃহিণী। পুলিশ সেই গৃহিণীর পেয়ারের খাসদাসী,—আর সি, আই, ডি কুদে ননদ, খয়েরখাঁরা সেই পরিজনদের মধ্যে মাছটা, কলাটা, দুধটুকু কিছু বেশী পাইবার প্রত্যাশায় সেই গৃহিণীর মনযোগানী দল। সকলে মিলিয়া তলে তলে বিরোধ চালাইলে, কর্ত্তা হাজার বলুন, হাজার করুন না,—সাধ্য কি তাঁহার ব্যবস্থানুরূপ সুখস্বচ্ছন্দতা সকলে ভোগ করিতে পারে ?

বসন সমস্যা।

লোকে বরং এক বেলা না খাইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু উলঙ্গ হইয়া গৃহে থাকাও কাহারও চলে না। কাপড়ের দুর্ম্মূল্যতায় তাই সর্ব্বত্র হাহাকার উঠিয়াছে। [illegible] আবরণ দিতে না পারিয়া কেহ কেহ আত্মহত্যা করিতেছে, এমন সংবাদও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়।

এমনও হইতে পারে এই দুঃসময়ের সুযোগ নিয়া—সূতা নাই, কাপড় আমদানী হয় না, দেশে প্রচুর কাপড় প্রস্তুত হয় না, এই সব ছুতা করিয়া মূল বস্ত্রব্যবসায়ীরা জোট বাঁধিয়া কাপড়ের দাম চড়াইয়া রাখিয়াছে। সর্ব্বসাধারণের দুর্গতি করিয়া নিজেরা খুব টাকা করিতেছে। যদি এরূপ হয়, তবে তার প্রতীকার গবর্ণমেণ্টের হাতে। কমিশন নিযুক্ত করিয়া সূক্ষ্ম অনুসন্ধানে তথ্য বাহির করিয়া, বস্ত্রের একটা দর তাঁহারা বাঁধিয়া দিতে পারেন।

কিন্তু বস্ত্রের বাস্তবিক অভাবই যদি এই দুর্মূল্যতার কারণ হয়, তবে এই অভাব দূর করিবারই চেষ্টা করিতে হইবে।

আমাদের মনে হয়, এই দুইটী কারণই এই দারুণ দুর্মূল্যতা ঘটাইয়াছে। ব্যবসায়ীদের জোট বাঁধায় যে পরিমাণ চড়াদর ঘটিয়াছে, তাহা নামাইতে গবর্ণমেণ্ট পারেন এবং অবিলম্বে তার জন্য ব্যবস্থা করা তাঁহাদের উচিত।

কিন্তু অভাবও দূর করিতে হইবে। বাস্তবিক, নিতান্ত যে পরিমাণ কাপড় চাই-ই—মোট কাপড় যদি সত্যই তার অপেক্ষা অনেক কম থাকে এবং কমই থাকিবে এমন অবস্থাই হইয়া থাকে, তবে কাপড়ের পরিমাণ না বাড়াইলে আর উপায় নাই। কিন্তু বাড়াইবারই বা উপায় কি? বেশীর ভাগ কাপড় মানচেষ্টর হইতে আসিত,—তা আর তেমন আসিতেছে না, শীঘ্র আসিবেও না। নূতন মেলাই কাপড়ের কল দেশে বসান এখনই সম্ভব নয়। কল কোথায়? টাকা কোথায়? লোক কোথায়?

অনেকে হাতে চরকার প্রচলন করিবার কথা তুলিতেছেন,—কিন্তু দেশে চরকা নাই। তাই নূতন করিয়া চরকা প্রস্তুত করিবার এবং ঘরে ঘরে মেয়েদের চরকায় সূতা কাটা শিখাইবার কথা হইতেছে। কিন্তু চরকা যেন হইল, মেয়েরাও সূতা কাটিতে শিখিল,—(যদি ও দুদিনেই তাহা হইয়া উঠা যে বড় সহজ তা নয়।) কিন্তু সূতার কার্পাস কোথায়? সূতা কাটা হইলেই ত হইবে না? এই সূতা লইয়া এত কাপড় বুনিয়া দিবে কে? দেশে ত সেকালের তাঁতী জোলা এখন এত নাই যে হাতে কাপড় বুনিয়া এ অভাব দূর করিয়া দিতে পারে। আবার ঘরে যে সূতা হইবে তাহা তাঁতী জোলাদের হাতে দিয়া তাঁহাদের দ্বারা সস্তা কাপড় বুনাইয়া গ্রামে গ্রামে সরবরাহ করান, তার জন্যও যথোচিত ব্যবস্থা – রীতিমত organisation চাই। তা কি হইবে? মেয়েদের হাতে চরকায় সূতা কাটাইয়া এখন এই অভাব দূর করা বড় মুখের কথা নয়।

তবু নিশ্চেষ্ট থাকিলেও চলিবে না, কতদিন আর এই যুদ্ধ থাকিবে, কে জানে? দুই চারি বৎসর আরও চলিলে, কাপড়ের ব্যবস্থা কিছু একটা করিতেই হইবে। এ সম্বন্ধে মোটা দুই কথা আমরা বলিতে চাই।

যতই আমরা চেষ্টা করি প্রচুর কাপড় যে জুটিবে, তার ভরসা বড় কম। সুতরাং কাপড় যাহাতে বাঁচে, বৎসরে এখন অপেক্ষা কম কাপড়ে চলে, তার জন্য প্রত্যেক গৃহস্থকেই বিশেষ যত্ন করিতে হইবে। পুরুষরা বাড়ীতে ছোট ছোট মোটা কাপড় পরিয়া থাকিতে পারেন, এবং সেই কাপড় ধোবা বাড়ী কাঁচিতে না দিয়া ঘরে নিজেরা সাজি মাটি ব সাবান দিয়া কাঁচিয়া নিতে পারেন। ধোবা বাড়ী কাপ দিলে, কাপড় বেশী লাগে, ধোবারা অযত্নে যথেচ্ছভাবে ফেলিয়া রাখে, নিজেরা পরে, ইহাতে কাপড় বড় শীঘ্র জী হইয়া যায়। তারপরে আজকাল যে সোডায় ধোবারা কাপ কাচে তাতে কাপড় বড় শীঘ্র একেবারে পচিয়া যায়। তা পরে ছেলে পিলেদের জন্য শক্ত কাপড়ের ছোট পায়জাম ব্যবহার করিলে সুবিধা হয়। সকলের পক্ষেই জামা গেঞ্জি জ্যাকেট ব্লাউস প্রভৃতি যত কম ব্যবহার করিয়া পারা যা ততই ভাল। পুরাতন কাপড় সকল গৃহেই অনর্থক, যাতে তাতে নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। এটা এখন বিশেষ একট অপব্যয় বলিয়াই সকলের মনে করা উচিত। এই সব কাপ জুড়িয়া তাড়িয়া ঘরে পরা যায়,—কাঁথা সেলাই করিয় বিছানার চাদরের বদলে ত বেশ ব্যবহার করা যায়।

এই সব উপায়ে কাপড় অনেক বাঁচান যাইবে, যদি গৃহস্থ গণ সকলেই মনোযোগী হন। কিন্তু অভাব পূরণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। চরকার প্রচলনে কতব পরিমাণে তা হইতে পারে। এইস্থলে একটি কথা আমাদে বিশেষ ভাবে মনে রাখিয়া চলিতে হইবে, ঘরে ঘরে প্রচুর চরকার সূতা হইবে আর গাঁয়ে গাঁয়ে তাঁতী জোলারা তাঁত দ্বারা কাপড় বুনিয়া গাঁয়ের কাপড় যোগাইবে, এরূপ স্থায়ী ব্যবস্থা আর যে কখনও দেশে এযুগে হইবে সে আশা বৃথা। যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলেই আবার যখন কলের সূতা আর কলের কাপড় প্রচুর মিলিবে, আর সস্তা হইবে, তখন ঘরের চরকায় কাটা সূতা আর গাঁয়ের তাঁতের কাপড় আবার উঠিয়া যাইবে,—যেটুকু এখন আছে এই মাত্র থাকিবে। সুতরাং চরকার সূতা আর তাঁতের মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা যথাসম্ভব সাময়িক ব্যবস্থার মতই আমাদের করিতে হইবে। কার্পাস তুলা দেশে যা মিলে, বিছানার জন্য তার ব্যবহার কমাইয়া সূতায় তাহা চালাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। যেখানে যাহারা পারেন, মেয়েদের দ্বারা চরকায় সূতা কাটাইয়া গাঁয়ে তাঁতী জোলা যদি থাকে, তবে তাহাদের দ্বারা কিছু কাপড় তৈয়ারি করাইয়া নিতে পারেন। তবে ইহাতে যে সর্ব্বত্র খুব বেশী পরিমাণে অভাব পূর্ণ হইবে, তা মনে হয় না। তবে যেখানে যতটুকু হয়, তাহাও অবহেলা করা উচিত নয়।

প্রধানতঃ নানা উপায়ে যতদূর সাধ্য কাপড় বাঁচাইয়া আমাদের চলিতে হইবে।



[illegible]

([illegible])

৫ম বর্ষ　　আষাঢ়—১৩২৫।　　৩য় সংখ্যা

লেখিকা।

(গল্প)

প্রথম ভাগ।

দরিদ্রকে অযাচিতভাবে আশাতীত দান করিলে সে যেমন সন্দিগ্ধচিত্তে দাতার মুখের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে ও ভাবে—এ বুঝি একটা রহস্য, একটা কৌতুক—নব্য মেজাজী ভগ্নীপতির পত্র পাঠে প্রিয়ঙ্করবাবুও সেইরূপ অসম্ভব সন্দিহান দৃষ্টিতে পত্রের প্রতি চাহিয়া রহিলেন! এতকাল পরে যে তাঁহার একমাত্র ভগিনী পরিত্যক্তা গিরিবালার অদৃষ্টের গতি ফিরিল, তাহার স্বামী তাহাকে গ্রহণ করিয়া কর্ম্মস্থান কলিকাতার বাসাবাটীতে লইয়া যাইবে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, এ যেন তাঁহার নিকট মস্ত একটা অযাচিত অনুগ্রহের দান বলিয়াই মনে হইতে লাগিল।

নিশীথ পিতার একমাত্র পুত্র। গ্রাম্য ইংরাজি স্কুলের পাঠ শেষ করিয়া কলিকাতায় কলেজে ভর্ত্তি হইল। সে যখন চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িত সেই সময় তাহার পিতামাতা উভয়েই ইহ সংসারের কর্ত্তব্য শেষ করিয়া পরপারে চলিয়া যান। নিশীথের পিতা গিরিবালাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিয়া, তাঁহার বৈবাহিককে গৌরীদানের পুণ্যলাভের অবসর দিয়া, নিজেও কিছু পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সে আজ অনেক দিনের কথা। নিশীথের আপনার বলিতে আর কেহই ছিল না। পৈতৃক ভিটা মাটি শুভাকাঙ্ক্ষী জ্ঞাতিবন্ধুরা মিথ্যা মোকদ্দমার সাহায্যে ভাগাভাগি করিয়া লইয়া হতভাগ্য নিশীথকে পথে দাঁড়াইবার সুপ্রশস্ত পথ করিয়া দিলেন। কলিকাতার 'মেস্' বা 'মোসাফির-খানা' ভিন্ন তাহার আর দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। সকাল সন্ধ্যায় ছেলে পড়াইয়া সে বি-এ পাশ করিল। বলা বাহুল্য, কলিকাতার 'আব-হাওয়া' তাহার যাদুমন্ত্রের ছাঁচে ফেলিয়া, নিশীথকে ঠিক আদর্শ নব্যবাবু বা সাহেব অথবা Mr. Mukerjee—এইরূপ ধরণের একটা কিছু গড়িয়া তুলিতে লাগিল।

ছেলে পড়াইয়াই নিশীথ এম্ এ পাশ করিল। এতদিন একটানা সোজা পথে চলিয়া, এক্ষণে সম্মুখে আঁকাবাঁকা পথ দেখিয়া নিশীথ থমকিয়া দাঁড়াইল। মনে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু সহায়সম্বলহীন যুবকের পক্ষে সে আশা পূরণের ক্ষমতা কই? কি লক্ষ্য করিয়া যে সে চলিয়া যাইবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। অগত্যা কিছুদিন সে হ্যাটকোট পরিয়া বন্ধুগণের টী পার্টিতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল।

নিশীথ বুঝিয়াছিল—কি ব্যর্থ তাহার জীবন! এই বন্ধুবর্গের স্ত্রীগণ—কিরণ রায়, স্নেহ বোস, ইঁহারা সকলেই সুশিক্ষিতা ও আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের এক একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠা লেখিকা। আর গিরিবালা! পূর্ব্ববঙ্গের কোন্ নিভৃত পল্লীর অনক্ষরা অসভ্যা ক'নে বৌ! সেত কোন দিনই নিশীথের মনে এতটুকু স্থান পায় নাই! কি অসামঞ্জস্য এই মিলন। কি ভাগ্যবান্—এই লেখিকাগণের স্বামিবৃন্দ! ধিক্ নিশীথের বিস্তার!

নিশীথ সমস্ত মাসিক পত্রের ও পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। যখনই সে কিরণ রায়ের ছোট গল্প ও স্নেহ বোসের কবিতা পাঠ করিত, তখনই তাহার গিরিবালার উপর একটা বিদ্বেষ ও ঘৃণা জাগিয়া উঠিত।

জীবনটাকে কি কোন নূতন পথে চালাইয়া পন্থময় করা যায় না? নিশীথ অনেক দিন হইতে মনে মনে একটা মস্ত আশা পোষণ করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু যে দিন সে জানিতে পারিল যে, বহুদিন পূর্ব্বে তাহার এক পল্লী-বালিকার পাণিপীড়নের কথা তাহার বন্ধুবর্গ সকলেই অবগত আছেন, সেইদিন হইতে নিশীথ বুঝিয়াছে,—তাহার জীবনের নূতন সাধ মিটিবার নহে। সঙ্গে সঙ্গে—"স্ত্রী বর্ত্তমানে পুনর্বিবাহ নিষেধ"—সমাজের এই অন্যায় নিয়মের মূলচ্ছেদ না হওয়ার জন্য মনে মনে বড়ই ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইল। কি নির্দ্দয় এই সমাজ!

বিদ্বান্ হইয়া কেহ জন্ম গ্রহণ করে নাই। একরাত্রে কেহ লেখক বা লেখিকা হইতে পারে না। শিক্ষা চাই, সময় চাই। গিরিবালাকে কি নিজের কাছে রাখিয়া শিক্ষা দিলে, সে এঁদের মত হইতে পারে না? অবশ্যই পারে। সেওত মানুষ! কিন্তু কি বিশ্রী ঐ নামটা 'গিরিবালা'!

নিশীথ অনেক চেষ্টায় একটি কলেজের প্রফেসারী পদ সংগ্রহ করিল ও পৃথক একটি বাসার ব্যবস্থা করিয়া, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া গিরিবালাকে কলিকাতায় লইয়া আসিবে মত জানাইয়া প্রিয়ঙ্করবাবুকে পত্র লিখিল।

(২)

"কিজন্য যে তোমাকে আমার কাছে এনেছি, তুমি বোধহয় তা বুঝতে পারনি।"

"স্বামী যখন নিজস্ত্রীকে কাছে নিয়ে আসে, তখন স্ত্রী একবারও বুঝবার চেষ্টা করে না যে সেই 'কাছে আনাটার' মধ্যে কোন 'কারণ' বা 'কেন' আছে কি না,—সেটা এতই স্বাভাবিক। তবে তুমি যে হঠাৎ আমাকে এতদিন পরে দয়া ক'রে কাছে ডেকেছ এটার মধ্যে বোধ হয় কিছু কারণ থাকিতে পারে, তবুও সেটা আমার বুঝবার কোন আবশ্যক নেই। কিন্তু প্রাণে বড় ভয় হোচ্ছে,—এসুখ বুঝি বা আমার অদৃষ্টে সহ্য হবে না।"—গিরিবালা বলিতে বলিতে মাথা নিচু করিল।

নিশীথ ক্ষণকাল নীরবে গিরিবালার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া মনে মনে ভাবিল,—বাঃ! এ অনক্ষরা এত কথা শিখিল কোথায়? তাহার পর উৎফুল্লস্বরে প্রকাশ্যে বলিল—"বাঃ তোমার তো বেশ কথার বাঁধুনি! তুমি এত কথা কোথায় শিখেছ? লেখা পড়া কিছু শিখেছ কি?"

"কিছু না। বৌদি আমার খুব লেখা পড়া জানেন। তিনি আমাকে অনেক ভাল ভাল বই পড়িয়ে শুনিয়েছেন। আমাকে লেখা পড়া শেখাবার জন্যে তিনি অনেক চেষ্টা ক'রেছেন। কিন্তু আমি শিখিনি। তিনি বলেন—আমার খুব স্মরণ শক্তি আছে।"

নিশীথ সন্তুষ্ট হইয়া ভাবিল—হ্যাঁ, গিরিবালা সরলা বটে।

"তা বেশ। তবে শেখনি কেন? শিখ্‌তেই হবে। তোমাকে আমার কাছে আন্‌বার উদ্দেশ্যও তাই। একবার চেষ্টা ক'রে দেখবো।—তুমি আমার যোগ্য হোতে পার কি না!"

"আমি যে তোমার যোগ্য হ'তে পার্‌ব, সে আশা ক'র্‌তে আমি সাহস করি না। তবে কি ক'রলে আমি তোমার যোগ্য হ'তে পারি, তুমি যদি তা দয়া ক'রে ব'লে দাও—আমি একবার প্রাণপণ ক'রে দেখতে পারি।"—জিজ্ঞাসুনয়নে গিরিবালা নিশীথের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

"বেশ, তাই হবে। তবে প্রথমতঃ তোমাকে এক কাজ ক'র্‌তে হবে,—তোমার ও গিরিবালা নামটা ত্যাগ ক'র্‌তে হবে। আজ থেকে তোমাকে আমি একটি নূতন নাম দেব।"

গিরিবালার মুখখানা যেন কেমন হইয়া গেল। সে মুখচ্ছবিতে প্রকাশ পাইল যেন অকস্মাৎ অনেকগুলি কথা একত্রে নিজ নিজ স্থান অধিকার করিয়া লইবার জন্য গিরিবালার মনটাকে লইয়া কাড়াকাড়ি বাধাইয়া দিয়াছে। সে ভাবিতেছিল—'গিরিবালা'—এ যে আমার মায়ের দেওয়া নাম! মা মৃত্যুকালেও একবার ডাকিয়াছিলেন—'দুখিনী গিরিবালা—মা আমার!'—সে মাত্র এই বছর খানেকের কথা। গিরিবালার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। আর বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনটাও সেই ভাবনার আঁচে গলিয়া লাল ও তরল হইয়া গিয়াছিল,—তাই বুঝি তাহার মাথাটিও ধীরে ধীরে নোয়াইয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িল। সে ধীর ও

কম্পিত-কণ্ঠে বলিল—"তুমি যে নাম ধ'রে ডেকে সুখ পাও—তাই ব'লেই তুমি ডেকো।" গিরিবালা কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

নিশীথ টেবলের উপর ঝুঁকিয়া, পেন্সিলের পিছনে কুঞ্চিত কপাল ঠুকিতে ঠুকিতে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভাবিতে লাগিল—অরুণা করুণা, বেণু রেণু, প্রাণী, রাণী;—কোন্‌টা? কোন্ নামটা পছন্দ করি? না এর একটাও মনে ধ'রছে না। আচ্ছা কলেজ থেকে এসে দেখা যাবে।

(৩)

এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সূর্য্যদেব পশ্চিমাকাশে আগুন লাগাইয়া নিঃশব্দে কোথায় সরিয়া পড়িয়াছেন। আর সেই আগুনের ঝলকা যেন সমস্ত কলিকাতায় ও আকাশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কলেজ হইতে বাসায় আসিতে নিশীথকে অনেকটা পথ ট্রামে আসিতে হয়। ট্রামগাড়ীতে বসিয়া নিশীথ ভাবিতেছিল,—দুনিয়ার ছেলেদের শিক্ষা দিয়ে মানুষ ক'চ্ছি; আর স্ত্রীকে যদি শিক্ষাদানে নিজের সমান স্তরে তুলে না নিতে পারিলাম তবে আর আমার কিসের বিদ্যা? সমান স্তর কি? কিছু উঁচুই বরং। নিজের চেয়েও কিছু উঁচু করতে পারলে, তবেই আমার বিদ্যা, আমার শিক্ষা সব সার্থক হয়। ক'রতেই হবে। এই ঘোর জমায়েৎ সাহিত্যের হাটে তাকে যদি একজন শ্রেষ্ঠ লেখিকা ক'রে তৈয়ের করতে পারি, তবে সে গর্ব্ব আমার কত বড়! স্ত্রী আমার লেখিকা,—লেখিকার স্বামী আমি—এ ত নেহাৎ কম গৌরবের কথা নয়! আকাশ-কুসুম বাবুর গর্ব্ব—কিরণরায়। আর মলয় বাবুর গর্ব্ব—স্নেহ বোস। স্ত্রী তাঁদের লেখিকা—এই গর্ব্বের ছায়ায় ব'সে, তাঁরা বুক ফুলিয়ে যেন ঘৃণার হাসিতে আমাকে উড়িয়ে দিতে চান। কেন না—আমার স্ত্রী পাড়াগেঁয়ে গিরিবালা। উঃ—বাবা কি ভুলটাই কোরে গেছেন! তবুও একবার প্রাণপণ ক'রে দেখব যে বনের ফুল এই সহরের মাটীতে ফোটে কিনা। আমার সমস্ত শিক্ষা তার শিকড়ের মূলে 'সারের' মত ঢেলে দিয়ে দেখবো—সেই ফুলের গন্ধে সহরের মানুষ মাতে কি না!

নিশীথ নিজের কক্ষে প্রবেশ করিয়াই উৎসাহিত-কণ্ঠে ডাকিল—"কবিতা, কবিতা!"

গিরিবালা হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিল—"ওকি? তুমি ও কাকে ডাকছ?"

নিশীথও মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল—"তোমাকে, আজ থেকে তোমার ঐ নাম, শ্রীমতী কবিতাময়ী দেবী। আজ সমস্ত দিনটা কলেজে বোসে শুধু তোমার নামই খুঁজেছি।"

"শেষে ওনাম কোথায় পেলে?"

"কলেজের পর আসছি, দেখি কলেজের বাগানে একটা গোলাপ গাছের গোড়ায় কতকগুলো ঝরা শুকনো পাপড়ি ঢাকা ঐ ছোট্ট নামটি চাপা প'ড়ে আছে। আস্তে আস্তে তুলে বুক পকেটে ক'রে এনে,—এই তোমায় দিলাম।"

নিশীথ তাহার কবিত্বময় কথার একটি সুন্দর জবাব পাইবার আশায় উৎফুল্ল দৃষ্টিতে গিরিবালার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু গিরিবালা নিশীথের কথার ভাব উপলব্ধির জন্য কোনরূপ আনন্দের বা নিরানন্দের চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া, মাত্র ধীরে ছোট্ট একটি 'বেশ' বলিয়াই মস্তক নিচু করিল দেখিয়া নিশীথ একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল—হায়রে! কাকে কি ব'লছি! এ যে বেণাবনে মুক্তা ছড়ান!—তারপর একটা কাগজের বাণ্ডিল খুলিয়া একখানা বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ ও অপর একখানা দ্বিতীয়ভাগ বাহির করিয়া গিরিবালার সম্মুখে ধরিয়া বলিল—এই নাও আজ থেকে সুরু কোরে দাও। দুমাসের মধ্যে শেষ করতে হবে মনে থাকে যেন। রান্না বান্না চুলোয় যাক্। আমি ঠাকুরের ব্যবস্থা ক'চ্ছি।"

গিরিবালা—প্রথম ভাগের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিল—"ঠাকুরের রান্না আমি খাব না।"

বিস্মিত নিশীথ গিরিবালার নতমুখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিয়া বলিল—"কেন?" ক্ষণকাল উভয়েই নীরব রহিল। নিশীথ ক্ষিপ্রহস্তে গায়ের কোট খুলিতে খুলিতে দৃঢ় স্বরে বলিল—"দেখ, এখানে ওসব অন্ধ বিশ্বাস চলবে না, ~~সব ছেড়ে~~ ফেলে দিতেই হবে। আজ না খাও—কাল তোমাকে খেতেই হবে। তুমি যে সেই রান্নাঘরের কালীমাখা কাপড়ে এসে দূর থেকে পৌরাণিক সুরে বোলবে—'তুমি আমার সর্ব্বস্ব'—তা আমি শুনতে চাই না। তোমাকে আমি ঠাকুর চাকরের কাজ করবার জন্য এখানে আনিনি। যে জন্যে এনেছি তা ত তোমায় একদিন ব'লেছি। যদি আমার যোগ্য হ'তে চাও, তবে শিক্ষায় আমার সমকক্ষ হ'তে হবে বিদ্যার বিনিময়ে গর্ব্ব ও গৌরব কিনতে সহায় হ'তে হবে এখন ভেবে দেখ তা পারবে কি না।"—নিশীথ কোটটাকে

সজোরে বিছানায় নিক্ষেপ করিয়া জানালার দিকে মুখ করিয়া নেক্‌টাই খুলিতে লাগিল।

গিরিবালার বুকটার ভিতর কাঁপিয়া উঠিল। কারণ কথাগুলি নিশীথ বড়ই দৃঢ় ও গম্ভীর স্বরে বলিয়াছে। স্বামীর যোগ্য হওয়া, স্বামীর কাজের সহায় হওয়া,—এযে বড়ই কঠিন কাজ! আমি সামান্য মেয়ে মানুষ, বিদ্যায় কি করে তাঁর সমান হব? এ যে অসাধ্য কাজ। বুঝি যায়। গিরিবালার সব সাধ বুঝি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গুড়া হইয়া যায়। গিরিবালার কান্না আসিতে লাগিল। সে ভীতস্বরে বলিল—"না না, তুমি রাগ ক'রোনা,—আমি আজ থেকে প'ড়বো।"

(৪)

একমাস পরে একদিন দ্বিপ্রহরে গিরিবালা খোলা জানালায় বসিয়া আছে। সম্মুখে কোলের কাছে, নিশীথ প্রদত্ত দ্বিতীয় ভাগের 'চক্র বক্রের' পাতা খোলা ছিল। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে পাশের গলিপথ দিয়া মাঝে মাঝে কাঁসর বাজাইয়া বাসন-বিক্রেতা যেন অনিচ্ছায় চলিয়া যাইতেছিল। আর যাইতেছিল—মাঝে মাঝে একটা উদাস করুণ সুরের হাঁক ছাড়িয়া—'ব্রোস্'। দূরে বড় রাস্তার মোড়ে পানের দোকানে একটা লুঙ্গি পরা ছেলে বসিয়া নিবিষ্ট মনে বিড়ি পাকাইতেছিল আর গাহিতে ছিল—"আম্না কর, জ্যারা কয় দেও শ্যাম্‌লিয়া সে।" গিরিবালা ভাবিতেছিল,—কাছে এলাম কত আশা ক'রে। বৌদি ব'লতেন—রমণী জীবনের সার্থকতা—স্বামী সেবায়। কিন্তু এ আমার কোন্ অদৃষ্ট? দিন রাত বই পড়। লেখা পড়া শিখে তাঁর সমান হ'তে হবে। নইলে তাঁর জীবনের আশা মিটবে না। কিন্তু আমি যে কি, আমাতে কি আছে, তাত' কই তিনি একবার ... ... ক্ষমতায় আমি তাঁর আশা মেটাব? বৌদিদিই ব'লতেন—সুখের জ্বালা ঠিক ফুলের কাঁটা।—এ বুঝি আমার তাই।

গিরিবালার চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া ক্রমে দুফোটা গড়াইয়া পড়িল।

মস্ মস্ জুতার শব্দ করিয়া নিশীথ কক্ষে প্রবেশ করিল। গিরিবালা শত সাবধানেও চক্ষুজল গোপন করিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি জানালার নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আজ যে এত সকালে এলে? ও আজ বুঝি শনিবার?"

নিশীথ গিরিবালার কথা যেন কিছুই শুনিতে পাইল না। অবাক্-দৃষ্টিতে ক্ষণকাল গিরিবালার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"ওকি! তুমি কাঁদছিলে কেন? কথা ব'লছ না যে?"

গিরিবালা মাথার কাপড়টা ঈষৎ টানিয়া দিয়া, ইংরাজি 'এন্' অক্ষরের নাকছবি খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল—"আজকের পড়াটা বড় শক্ত।"

উপহাসের হাসি হাসিয়া নিশীথ বলিল—"এ হে-হে-হে! তুমি দেখ্‌ছি নেহাৎ ছেলে-মানুষ। তা কাঁদছিলে কেন? আমার বেতের ভয়ে?"

গিরিবালা একবারের জন্য নিশীথের চোখে চোখ মিলাইয়া মৃদু হাসিল।

নিকটস্থ একখানা চেয়ারে বসিয়া নিশীথ গিরিবালার নিকট হইতে দ্বিতীয়ভাগখানা লইয়া বলিল—"দেখি কেমন শক্ত আজকের পড়া? আচ্ছা বানান কর দিকি—'পরাক্রম'?"

দক্ষিণহস্তে বামহস্তের অঙ্গুলি মর্দ্দন করিতে করিতে গিরিবালা বলিল—"ওখানটা আজ পড়িই নি।"

"সারা দুপুরটা তবে ক'ল্লে কি? আচ্ছা হাতের লেখা কই দেখি?"

একখানি বালির কাগজের লম্বা চওড়া খাতা বাহির করিয়া গিরিবালা নিশীথের সম্মুখে রাখিল। বিস্ফারিত নেত্রে খাতার লেখা দেখিতে দেখিতে নিশীথ বলিল—"বাঃ, হাতের লেখার পূর্ব্ব নমুনা ত নেহাৎ মন্দ মনে হ'চ্ছে না। তবে এই 'গণেশের' 'শয়ের' পুঁটুলি দুটো এত ছোট ক'রেছ কেন? আর একটু বড় হবে। তারপর এই 'পাইল'র 'পয়ে'র ঠ্যাংটা এত লম্বা হবে না। যাক্, লেখাটা মোটের উপর মন্দ হয়নি। তারপর পুরোণো—পড়া। আচ্ছা বানান কর দিকি—অসহ্য?"

গিরিবালা আঙ্গুল মট্‌কাইতে মট্‌কাইতে বলিল—"অসহ্য? স্বরে-অ, দন্ত-স,—" তারপর যে কি, গিরিবালার কিছুতেই তাহা স্মরণ হইল না। সে একবার নিশীথের মুখের দিকে, একবার গৃহের আসবাব পত্রের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিতে চাহিতে বলিল—"তোমার মুখখানা অত শুকিয়ে গ্যাছে কেন?"

"রোদ্দুরে এসেছি—সেই জন্যে। তুমি বল—বল—অ-স-হ্য!"

"হাতে মুখে একটু জল দিয়ে এসো না ?"

"দেবো-খন। তুমি বল, বল !"

গিরিবালার বুক কাঁপিতে লাগিল। কারণ সে জানে—পড়া বলিতে না পারিলে নিশীথ নীরব অভিমানে দুই একদিন কাটাইয়া দেয়। গিরিবালা কিছু জিজ্ঞাসা করিলে কোন জবাব পায় না। গিরিবালার বুকে সেটা বেত্রাঘাত অপেক্ষা অনেক বেশী বাজে। তাই সে কয়েক দিন সে কাঁদিয়া কাটাইয়া দেয়।

গিরিবালার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। সে ইয়ার-রীংয়ের উপরিস্থিত—কয়েক গাছা অশান্ত চুলকে তাহাদের স্বস্থানে পাঠাইয়া দিয়া, অন্যমনস্কভাবে বলিয়া ফেলিল—"আর ঋ এ য-ফলা।"

ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া নিশীথও অকস্মাৎ বলিয়া ফেলিল—"তোমার মাথা, আর আমার মুণ্ডু!"

ছন্ করিয়া গায়ের সমস্ত রক্ত যেন জল হইয়া—গিরিবালার চোখের পিছনে আসিয়া দাড়াইল।

"স্মরণ-শক্তি আছে, না ছাই আছে। কাল প'ড়েছ, আর আজ তা হজম ক'রে ব'সে আছ। যাও—এক্ষুণি এই পড়া ক'রে দাও। যদি একটা ভুল যায় তবে,——"

তবে কি হবে শুনিবার জন্য গিরিবালা তাহার ছল ছল চক্ষু দুইটি তুলিয়া নিশীথের দিকে চাহিল। নিশীথ দৃঢ়স্বরে—"তবে ভাল হবে না" বলিয়া বইখানাকে সজোরে গিরিবালার পায়ের উপর নিক্ষেপ করিয়া শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

গিরিবালা বোধ হয় আরও কিছুক্ষণ সেইস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিত। কিন্তু তাহার অবাধ্য চোখের জল তাহাকে সে স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিল। বইখানাকে তুলিয়া লইয়া, টেব্‌লের নিকট গিয়া জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া সে হেঁট মাথায় বসিয়া পড়িল।

—ভাল হবে না। সত্যই আমার ভাল হবে না। লেখাপড়া শিখ্‌তে না পারলে যে আমার খুব মন্দ হবে, তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি। কিন্তু আমি কি করি? আমার সে ক্ষমতা কই? বউদি! কেন ম'র্‌তে তোমার কথা শুনিনি!—ঝর ঝর করিয়া চোখের জল গড়াইয়া গিরিবালার সম্মুখস্থ উন্মুক্ত পুস্তকে গিয়া পড়িল। দ্বিতীয় ভাগের নির্দ্দয় শক্ত বানানগুলা গিরিবালার উষ্ণ অশ্রুসিক্ত হইয়াও, কোন মতে সহজ সরল হইল না। উপরন্তু—ঐক্য, বাক্য, মাণিক্য—সমস্তই যেন তখন তাহার দৃষ্টির সম্মুখে কালীর পোঁচে একাকার হইয়া গিয়াছিল।

নিশীথ ভাবিতেছিল—নাঃ, আমার বৃথা চেষ্টা। কিন্তু কি ক'রে আমার আকাঙ্ক্ষা মেটাই! ওঃ—আজ যদি আমি single থাক্‌তাম। কিন্তু এক ধাক্কায় পিছিয়ে পড়াটাও পুরুষের কাজ নয়। অনেক সামলাতে হবে। রবার্ট ব্রুস্ বাইশবারের বার যুদ্ধে জয়ী হ'য়েছিলেন। অধ্যবসায়ের এ একটি অকাট্য প্রমাণ। নিশীথ উঠিয়া বসিয়া ডাকিল—"কবিতা, এখানে এস।"

গিরিবালা নিশীথের নিকট গিয়া দাঁড়াইল। নিশীথ তাহার দক্ষিণহস্ত ধরিয়া বলিল—"দেখ, লেখাপড়া বড়ই কঠিন কাজ, অন্ততঃ তোমার পক্ষে, তা আমি বেশ বুঝি। কিন্তু, এতে অবহেলা ক'র্‌লে কিছুই হবে না। আর এর জন্য যদি সময় অসময়ে কটুকথা বলি—তার জন্য রাগ ক'রো না। যেমন কটুকথা বলি, তেমনি মিষ্ট কথাও ত বলি। বস এইখানে, মন দিয়ে পড়।"

গিরিবালা নিশীথের পার্শ্বে বসিয়া ভাবিতে লাগিল,—যখন মিষ্টকথা বল—তখন তাহার মিষ্টতা বড়ই বেশী। আবার যখন কটুকথা বল—তখন তাহার আঘাত বড়ই দারুণ। মোটের উপর এই মিষ্ট কটুর আধিক্যের কৈফিয়ৎ কেটে দেখ্‌তে গেলে, হাত মজুতে কটুর ব্যথাটাই বড় বেশী বাকি থাকে। আর সেটা হাতমজুত নয়,—এই বুকের মজুত।

শিক্ষকের কঠিন শাসনাধীন ছাত্রের মতই গিরিবালা নিশীথের নিকট দিন অতিবাহিত করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় ভাগ।

(১)

তাহার পর কয়েক বৎসর গত হইয়াছে। আজকাল দেখিতে পাওয়া যায়—প্রায় প্রতিমাসেই সমস্ত প্রসিদ্ধ মাসিক পত্র ও পত্রিকায় 'কবিতাময়ী দেবীর' কবিতা, ছোট গল্প অথবা প্রবন্ধে অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। পাঠকপাঠিকা কবিতাময়ীর লেখা পড়িবার জন্য আকুল আগ্রহে মাসকাবারের অপেক্ষা করে। চারিদিকে কবিতাময়ীর লেখার ভূরি ভূরি প্রশংসা। পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সমালোচনা। সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা আগ্রহ উদ্বেগ—

এ কবিতাময়ী লোকটি কে, যাঁহার লেখা আজ আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে ?

সেদিন সন্ধ্যার সময় আকাশ-কুসুম-বাবুর বাড়ীর টী-পার্টিতে মলয়বাবু, স্নেহবোস, সুনীলবাবু, আমাদের নিশীথ ইত্যাদি আরও অনেক সাহিত্যিক, অসাহিত্যিক, বে-সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। আকাশ-কুসুম-বাবু ও কিরণ রায় যে উপস্থিত ছিলেন, সেটা বলাই বাহুল্য।

মলয়বাবু প্লেটে চা ঢালিতে ঢালিতে নিশীথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা নিশীথবাবু! কবিতাময়ীর লেখা আপনার কেমন লাগে ?"

নিশীথ একটু গম্ভীর সুরেই বলিল—"নেহাৎ মন্দ নয়।"

আকাশ-কুসুমবাবু কি বলিতে যাইতেছিলেন। তৎ-পূর্ব্বেই কিরণ রায় বলিলেন—up-to-date লেখায় কবিতা-ময়ীর লেখাকেই—সাহিত্যিকগণ শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন। বাস্তবিক তা দেওয়াও উচিত। আহাহা—কি মধুর! আপনারা বোধ হয় প'ড়েছেন,—এ মাসের 'প্রভাতীতে' বেরিয়েছে তাঁর একটি কবিতা—'দয়িত।' অতি মধুর।"—কিরণ রায়ের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া স্নেহবোস বলিলেন—"আর 'বিজলীতে' বেরিয়েছে গল্প 'পথহারা।' যেমন plot, তেমনি ভাষা।"

কবিতাময়ীর লেখার প্রশংসা শ্রবণে গর্ব্বে ও শ্লাঘায় নিশীথের যে বেশ একটু ভাবান্তর হইতেছিল, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছিল। কিন্তু তাহার মুখের মৃদুহাসি, ঈষৎ চাঞ্চল্যভাব, সমস্তই যেন বাঙ্গলার নাট্যশালার অভিনেতার বাহবা-বর্জ্জিত প্রাণহীন হাবভাবের মতই জ্ঞান হইতেছিল।

নিশীথের পার্শ্বোপবিষ্ট সুনীলবাবু নিশীথের দিকে একটু ঝুঁকিয়া টেবিলস্থিত অ্যাশ্‌ট্রেতে সিগারেটের ছাই ঝাড়িতে ~~ঝাড়িতে~~ বলিলেন,—"আচ্ছা নিশীথবাবু! কবিতাময়ী লোক-টিকে আপনি জানেন ?"

সুনীলবাবুর প্রশ্নের উত্তর শুনিবার জন্য সকলেই উৎসুক নয়নে নিশীথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নিশীথ এ প্রশ্নের কি জবাব দিবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল—"আমার ~~এক~~-টিকট আত্মীয়া।"

সকলেই বিস্ময়-ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলেন—"বলেন কি ? কই—এতদিন ত বলেননি! আপনার কে বলুন।" নিশীথকে সকলে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন।

অনেক অনুরোধের পর যখন নিশীথ জানাইল 'তাহারই স্ত্রী,'—তখন মুহূর্ত্তের জন্য বিস্ময়নির্ব্বাকে সেস্থ নিস্তব্ধ হইয়া গেল। শেষে চতুর্দ্দিকের ঘন ঘন করমর্দ্দ নিশীথ বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। তাহার সৌভাগে স্তুতি-গানে কলরব মুখরিত হইয়া উঠিল। কিরণরায় স্নেহবোস হাসিতে হাসিতে বলিলেন—এ সংবাদ এতদি তাঁহাদের না জানান নিশীথের বড়ই অন্যায় হইয়াে একজন দেশমান্যা লেখিকা তাঁহাদের এত কাছে থা সত্ত্বেও এতদিন দর্শনলাভ না হওয়াটা বড়ই দুর্ভাগ্যের বি তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব শীঘ্রই তাঁহা তাঁহাদের সে আশা মিটাইয়া—নিজেদের ধন্য ম করিবেন।

তদুত্তরে নিশীথ ভদ্রতার খাতিরেও কোন কথা ব না। কি জন্য কে জানে—তাহার বুকের স্পন্দন ত অস্বাভাবিক গতি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

(২)

"আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে, আপনি অনুমতি দেন,—তবে তাঁরও কোন আপত্তি থাকবে নিশ্চয়ই তিনি রাজি হবেন।" কিরণরায় ও স্নেহবে নিশীথের কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া পুনবায় ব লেন—"দেখুন আর সময়ও ত নেই!"

"আপনারা দিন স্থির ক'রেছেন ?"

"আজ্ঞে হাঁ,—এই ২৩শে এপ্রিল,———"

নিশীথ কি চিন্তা করিয়া বলিল—"আচ্ছা বেশ! তাঁর পক্ষে গৌরবের বিষয়। এতে আমার আপত্তি থাকব কোনই কারণ নাই!"

"তবে আমরা বিজ্ঞাপন দিতে পারি ?"

"হাঁ—তা,—তা দিতে পারেন বৈ কি!"

কিরণরায় ও স্নেহবোস সন্তুষ্টচিত্তে নিশীথকে বি দিলেন।

পরদিন দৈনিক সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন বাহির হইল "আগামী ২৩শে এপ্রিল অপরাহ্ণ ৫৷৷০ ঘটিকার সময় মহি পার্কে মহিলাগণের একটি সভার অধিবেশন হইবে। আধুি বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখিকা শ্রীমতী কবিতাময়ীদেবী অনু করিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছে সাধারণ মহিলাগণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।"

(৩)

"তোমার পায়ে পড়ি, আমায় মাপ কর। তা আমি কিছুতেই পারব না। ঘরে বসে তোমার সব কথা শুনব, কিন্তু জুতো মোজা পায়ে দিয়ে সংসেজে আমি বাইরে বেরোতে পারব না। এ অন্যায় অনুরোধ ক'রো না।"—কাতর নয়নে গিরিবালা নিশীথের দিকে চাহিয়া রহিল।

নিশীথ মিনতির স্বরে বলিল—"শুধু আজকের দিন। আর কখনও তোমায় এ অনুরোধ ক'র্‌ব না। আজকের কাজটা যদি সেরে আস্‌তে পার, তবে সমস্ত বাঙ্গলাময় নাম ছড়িয়ে প'ড়বে। বল দিকি—সেটা কি কম গৌরবের কথা? শুধু আজকের জন্যই ১৪৲ চৌদ্দ টাকা খরচ ক'রে তোমার জন্য জুতো এনেছি। আজকের দিনটা পায় দাও,—আর কখনও ব'লব না। স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকের সভায় যাবে তাতে আর লজ্জা কি? তুমি আজকের সভায় সভাপতি হবে ব'লে তাঁরা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন,—না যাওয়াটা বড়ই অন্যায় হবে। তাঁদের অপমান করা হবে। তাঁদের কাছে আমি আর মুখ দেখাতে পারব না।"

"আমি যদি এ সভায় যাই, তবে কি তোমার মুখ উজ্জ্বল হবে?"

"খুব উজ্জ্বল হবে। তা আজ তোমায় বোঝাতে পারব না। কাল যখন খবরের কাগজে এই সভার বিস্তারিত বিবরণ বেরোবে, তখন দেখবে,—তার প্রত্যেক লাইনে লাইনে, প্রতি কথায় কথায় আমাদেরই কতখানি গর্ব্ব মাথান আছে। নাও, আর দেরি কোরো না। প্রস্তুত হ'য়ে থাকো। এখনই আমার বন্ধুর স্ত্রী কিরণরায় তোমায় নিতে আসবেন।"

গিরিবালা মনে মনে ভাবিল—না, আমি কিছুতেই যাব না। স্বামী হ'য়ে নিজ স্ত্রীকে সভায় পাঠিয়ে দেওয়া—এ আবার কোন্ দেশী খেয়াল? কিন্তু, আমি গেলে—দশের কাছে ওঁর মুখ উজ্জ্বল হবে। প্রকাশ্যে বলিল—"আমি জুতো কিছুতেই পায়ে দেবো না। আর তুমি যদি যাও, তবেই আমি যেতে রাজি আছি। নইলে—"

ঠিক সেই সময় বাসার দরজায় একখানা মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। নিশীথ ব্যস্ততাসহকারে বলিল—"নাও—নাও আর পাগ্‌লামো কোরো না। ঐ তোমায় নিতে এসেছেন।"

(৪)

ভয়ঙ্কর একগুঁয়ে। অত্যন্ত অবাধ্য। কিছুতেই জুতো পায়ে দিলে না? এর চেয়ে যে না যাওয়াই ভাল ছিল! তারপর গেল কিনা—একখানা মোটা শাড়ি প'রে? আর গায়ে জড়িয়ে গেল—একখানা বোম্বাই চট্? আরে ছ্যাঃ! লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। সেই পোষাকে যখন সভায় গিয়ে বোসবে, তখন বক্তৃতার পূর্ব্বেই যে সেখানে বেজায় রকম ক্ল্যাপ্ প'ড়ে যাবে! —নিশীথ ভাবিতে ভাবিতে অস্থির হইয়া পড়িল। একাকী বাসায় সময় অতিবাহিত করা তাহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইল। সে হেদোর ধারে গিয়া পায়চারি করিতে করিতে আবার ভাবিতে লাগিল,—কিন্তু আসল কাজটা যদি কোন রকমে উদ্ধার ক'রে আসতে পারে—তবেই—সব মানিয়ে যাবে। এইত সাড়ে ছয়টা বাজে। এখনই হয়ত কবিতা সেই প্রবন্ধটা ব'লছে,—আর ঘন ঘন হাততালি প'ড়ছে। হুঁ, এইবার আকাশ-কুসুমবাবু আর মলয়বাবু, তোমাদের দেখাব, যে আমার গর্ব্ব—তোমাদের চেয়ে ছোট—কি বড়! নিশীথের মনটা একবার মুচ্‌কি হাসিল।

কতক্ষণে কবিতা বাসায় ফিরিয়া আইসে, তাহার নিকট সভার সংবাদ জানিবার জন্য কৌতুকে নিশীথের মন যেন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। শিশ্ দিয়া একটা ইংরাজি গৎ বাজাইতে বাজাইতে নিশীথ বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল। গৃহে প্রবেশ করিয়াই সে বিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়াইল। একি? কবিতা বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে কেন? নিশীথ ক্ষিপ্রহস্তে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া গিরিবালার নিকট গিয়া বসিয়া জলদ ভাষায় বলিল—"একি? তুমি চলে এসেছ? সভা এত শীঘ্র হ'য়ে গেল? তারপর সভার খবর কি? প্রবন্ধটা বেশ ব'লতে পেরেছ?"

গিরিবালা উঠিয়া বসিয়া অশ্রুসিক্ত চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল—"যাও, আমি তোমায় কিছু ব'লব না।"

কি একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় নিশীথের বুকটার মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—"কেন কি হ'য়েছে কি? ব্যাপার কি? তুমি কাঁদছ কেন?"

"কাঁদব না ? আমার ডাকছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হ'চ্ছে। এমনি কোরে লজ্জা দেবার জন্যেই বুঝি তুমি আমাকে সভায় পাঠিয়েছিলে ?"

"কেন, লজ্জা কিসের ? স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকের সভায় যাবে তাতে আর—"

গিরিবালা যেন ঠিক দুইহাতে নিশীথের মুখ চাপিয়া তাহার কথায় বাধাদিয়া বলিল—"হ'লেই বা স্ত্রীলোক। ওদের কি ? ওরাত খৃষ্টান।"

নিশীথ হাসিবে কি কাঁদিবে—কিছুই স্থির করিতে পারিল না। সে বেশ বুঝিল যে সভায় এমন একটা কিছু হইয়াছে, যাহাতে তাহার বন্ধুমহলে মুখ দেখান ভার হইবে। তথাপি সে হাসিতে হাসিতে বলিল—"ওরা খৃষ্টান কি ক'রে বুঝলে ?"

"না, খৃষ্টান না! পায়ে জুতো, চোখে চশমা, ইংরিজিতে কথা বলে।"

নিশীথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"যাও—তুমি হেসো না।" গিরিবালা অস্বাভাবিক রকম ঘোমটা টানিয়া দিল।

"তা বেশ ওরা খৃষ্টান। এখন তুমি, সভায় কি ক'রে এলে বল দিকি ? প্রবন্ধটা ব'লেছিলে ?"

"আমি কিছু বলিনি। তুমি আমায় আর বিরক্ত কোরো না। আমার ভাল লাগছে না।" গিরিবালা মুখ ফিরাইয়া শুইয়া পড়িল।

পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও গিরিবালা আর কোন কথা বলিল না। নিশীথের বড়ই বিরক্তবোধ হইতে লাগিল। বিরক্তি শেষ পর্য্যন্ত ক্রোধে পরিণত হইল।

সে রাত্রি উদ্বেগে কাটিয়া গেল। পরদিন প্রাতে, সভার সংবাদ জানিবার জন্য নিশীথ আকাশ-কুসুমবাবুর বাড়ী যাইবে বলিয়া প্রস্তুত হইল। কিন্তু, কিসের লজ্জা, কি একটা সঙ্কোচ তাহাকে নিরস্ত করিল। বৈকালে সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। বাহির হইয়া পড়িল।

হেদোর ধারে মাণিকতলা ষ্ট্রীটের মাথায় ট্রাম দাড়াইবা মাত্র খবরের-কাগজ বিক্রেতারা হাঁকিল—"মহিলা পার্কে বিরাট সভা। কবিতাময়ীর কেলেঙ্কারী। নিশীথবাবুর নূতন নেশা। লিনুবাবু—বসুমতী, নায়েক!" একজন কাগজওয়ালা একখানা কাগজ নিশীথের সম্মুখে ধরিল।

কবিতাময়ীর কেলেঙ্কারী ? কি সর্ব্বনাশ! নিশীথে রক্ত হিম—অসাড় হইয়া গেল। একখানা কাগজ লই তাড়াতাড়ি ট্রাম হইতে নামিয়া গিয়া ফুটপাথের রেলি হেলান দিয়া রুদ্ধশ্বাসে পড়িতে আরম্ভ করিল। একি লজ্জা নিশীথের মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। পায়ে তলায় পৃথিবী বুঝি বা সরিয়া গিয়া তাহাকে দুনিয়ার ব্যা চাহনির সম্মুখে, বিশ্বের বিদ্রুপের ফাঁসিকাঠে ঝুলাই দেয়! নিশীথ তাহার কম্পিত দেহটাকে রেলিংয়ের গা চাপিয়া ধরিল। একি ঘৃণা! জগতের চক্ষু যেন তাহা লক্ষ্য করিয়া উপহাস করিতেছে! মাথার উপর গাছে ডালে বসিয়া পাখিরা যেন তাহারই কথা লই মহা সোরগোল জমাইয়া দিয়াছে। আর তাহাদের উ হাসের তাচ্ছিল্য নিদর্শন—বিষ্ঠা-বিন্দু আসিয়া টপ্ করি নিশীথের হস্তস্থিত কাগজে পড়িল। নিশীথ দ্রুতপদে গি বাসায় প্রবেশ করিল।

গত কল্য হইতে গিরিবালা রাগে অভিমানে নিশীথে সহিত ভাল করিয়া কথা বলে নাই। এক্ষণে যে মূর্ত্তি নিশীথ গৃহে প্রবেশ করিল, তদ্দর্শনে গিরিবালার রা অভিমান কোথায় সরিয়া গেল। সে বেশ বুঝিল—এব সে আগুন জ্বলিবে, তাহা দূরস্থ আলেয়ার আগুন নহে যে আগুনের আঁচ তাহাকে সত্য সত্যই ঝলসিয়া মারিবে ইচ্ছা সত্বেও সে কোন কথা বলিল না। তবে তাহা অভিমানের মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য নহে। আশঙ্ক তাহার বুকের ভিতর কাঁপিতে লাগিল।

কাগজখানাকে সজোরে গিরিবালার গায়ের উ নিক্ষেপ করিয়া নিশীথ বজ্র-কঠোর-কণ্ঠে বলিল—"কাগ ভরা সুখ্যাতি! খুব নাম কিনে এসেছ কাল! বাঃ- খুব মুখ উজ্জ্বল ক'রেছ আমার! পড়—ঐ জায়গা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়।" ক্রোধে নিশীথ কি করিবে বুঝি পারিল না। জানালার বাহিরে দৃষ্টি ফেলিয়া নির্ব্বাক্ হই দাঁড়াইয়া রহিল।

"কেন, কেন ? কি হ'য়েছে ? আমি কি ক'রেছি ?- কম্পিত হস্তে কাগজখানা লইয়া গিরিবালা পড়িতে লাগিল- —"গত কল্য মহিলা-পার্কে মহিলাগণের একটি সভ অধিবেশন হইবার কথা ছিল। কিন্তু সব গোলমাল হই গিয়াছে। ফলে,—একটি শিক্ষিত যুবকের—আজগু

আকাঙ্ক্ষা, বিদঘুটে বাতিক ও নূতন ধরণের নেশার কথা প্রকাশ হইয়াছে। উক্ত সভায় আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখিকা শ্রীমতী কবিতাময়ী দেবী—সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন বলিয়া ইতিপূর্ব্বে আমরা বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম। সভাস্থলে অসংখ্য মহিলার শুভাগমন হইয়াছিল। কিন্তু সকলেই হতাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন।

শ্রীমতী কিরণরায়ের সহিত শ্রীমতী কবিতাময়ী সভাদ্বারে উপস্থিত হইলে মহিলাবৃন্দ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু কাহারও সহিত বাক্য বিনিময় করা দূরের কথা, কদলী-বধূর ন্যায় হস্তপরিমিত অবগুণ্ঠন টানিয়া নত মস্তকে কবিতাময়ী কিরণরায়ের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে সমগ্র মহিলামণ্ডলী বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিলেন। সভাস্থলে প্রবেশ করিয়াও তিনি পূর্ব্বাবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। সকলের নিতান্ত অনুরোধেও আসন গ্রহণ করিলেন না। একজন শিক্ষিতা মহিলার এই অস্বাভাবিক সঙ্কোচ দর্শনে সকলে নানারূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনেকে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাহাতে কবিতাময়ী অধিকতর সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন ও কিরণরায়ের কাণের কাছে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন—'আমি সভা টভার কিছুই জানি না। তোমাদের পায়ে পড়ি—আমায় বাসায় রেখে এস।' শত অনুরোধেও তিনি সেস্থানে আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা কিরণরায় তাঁহাকে বাসায় পৌছাইয়া দেন। বাসায় ফিরিবার সময় কিরণরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তিনি এরূপ করিলেন কেন? তাঁর মুখের দুইটা কথা শুনিবার জন্য এতগুলি ভদ্রমহিলা কতখানি আশা লইয়া সভায় আসিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইল। তাহাতে তিনি জানাইয়াছেন—তিনি ওসব কিছুই জানেন না। তিনি খুব সামান্যই লেখাপড়া জানেন। এতদিন তাঁর নামে যে সমস্ত গল্প কবিতাদি প্রকাশ হইয়াছে, তাহা সমস্তই তাঁর স্বামী নিশীথবাবুর নিজের লেখা। ইহাই গত কল্যকার সভার বিবরণ।

এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য এই,—নিশীথবাবুর এ কোন্ দেশী নেশা? নিজের নামটাকে চাপাচাপা দিয়া, স্ত্রীর নামটা সাধারণে প্রকাশ করিবার এত বাতিক কেন? পালক গুঁজিয়া ময়ূর হইবার এত সাধ কেন হে বাপু?—যাহা হউক, আমাদের শেষ বক্তব্য এই,—নিশীথবাবু এতদিন সাহিত্যসমাজে স্ত্রীর নাম দিয়া বাঙ্গলার পাঠকপাঠিকাগণকে যে প্রবঞ্চনা করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহার কোন কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত। আশা করি সাহিত্যরথীগণ এ বিচারের ভার গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিবেন না।"

গিরিবালার কাগজ পড়া শেষ হইল, কিন্তু সে আর মাথা তুলিতে পারিল না। হেঁটমাথায়, নখাগ্রে মেঝের উপর নিরাকার 'ক খ' লিখিয়া তাহার উপর ঘন ঘন দাগা বুলাইতে লাগিল।

"কি? চুপ ক'রে রইলে যে? সব মিছে কথা লিখেছে,—না?"—নিশীথের কর্কশকণ্ঠে গিরিবালা চমকিয়া চাহিয়া পুনরায় মাথা নিচু করিয়া বলিল—"না—মিছে কেন লিখবে—ঠিকই লিখেছে।"

"বটে! ঠিকই লিখেছে! ব'লতে মুখে একটু বাধ্‌ল না? দশের কাছে আমার মাথা হেঁট্ করালে? শেষে কিনা—সব প্রকাশ ক'রে এলে?" তীব্রদৃষ্টিতে নিশীথ গিরিবালার প্রতি চাহিয়া রহিল। সে চাহনি গিরিবালা সহ্য করিতে পারিলনা।

"আমায় জিজ্ঞাসা কোরলে তাই বোল্লাম। এতে আর আমার দোষ কি?"

"নাঃ, কিছু না। সব দোষ আমারই। তা বেশ ক'রেছ। এখন তুমি প্রস্তুত হ'য়ে থাক। যখনই ব'ল্‌ব, তখনই আমার ঘরখানি ক'রে দিতে হবে। তোমার দাদাকে আমি টেলিগ্রাম ক'রতে চ'ল্লাম।"

দ্রুতপদে সোপান বাহিয়া নিশীথ নামিয়া গেল। ফিরিবার অনুরোধ করিতেও গিরিবালা অবসর পাইল না। খোলা জানালা দিয়া নিশীথের গন্তব্য গলিপথের দিকে চাহিয়া দেখিল—নিশীথ চলিয়া গেল। দুই হাতে বুক চাপিয়া গিরিবালা সেই স্থানে বসিয়া পড়িল।

ক্রমে সন্ধ্যা তাহার আঁধার আঁচল নিঃশব্দে সহরের গায়ে বিছাইয়া দিল। আর মানুষ তাহাতে গ্যাস্ বিজলীর বাতি জ্বালিয়া উজ্জ্বল বুটী বসাইয়া দিল। জানালার গরাদের গায়ে মাথা রাখিয়া গিরিবালা অবিশ্রান্ত চোখের জল মুছিতে লাগিল। অদূরে মুখপোড়া কাগজওয়ালারা তখনও হাঁকিতেছিল—"কবিতাময়ীর কেলেঙ্কারী।"

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংকোচ।

সন্ধ্যা করে তোর সকাশে আস্‌তে আমি ভাই
লজ্জা বড় পাই!
কি জানি তুই মনে মনে
হাস্‌বি কিনা সঙ্গোপনে
ভাব্‌বি কিনা গোপন আমি
করেছি তোর ঠাঁই
আসল্‌ আমিটাই!
তাইত শুধু লজ্জা ক'রে
কিছুনা সাজ সজ্জা ক'রে
নিয়ে আসি তোর নিকটে
আপন নগ্ন তাই
লজ্জা পেয়ে ভাই!
ইচ্ছা করে মনের কথা সরল ভাবে ভাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই!
চোখের আড়ে মুচকে হেসে
ভাবিস যদি আমি এসে
বড়াই করে তোর কাছেতে
জানিয়ে দিতে চাই
নিজের যোগ্যতাই!

সেই ভয়ে তোর কাছে এলে
চোখের উপর ধরি মেলে
মনের যত আবর্জ্জনা
মনের যত ছাই
মনের মন্দটাই!
গান গেয়ে তোর হৃদয়খানা ভুলিয়ে নিতে ভাই
সাহস নাহি পাই!

রাঙ্গা দু'টি অধর পুটে
হাসির রেখা উঠ্‌বে ফুটে,
ভাব্‌বি, তোরে ভুলিয়ে নিতে
গান্‌টি আমি গাই
অন্য কারণ নাই!

তাইত হঠাৎ দেখ্‌লে তোরে
অমনি গান বন্ধ ক'রে,
মিথ্যা বলে বুঝাই তোরে,
প্রচার করি ভাই
আপন অজ্ঞতাই!

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ

উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত ভ্রমণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

টাঁক (Tank) ছাউনিতে প্রায় ২॥০ মাস থাকিতে হইয়াছিল। প্রথম ২।১ দিনেই সংসারের আবশ্যকীয় প্রায় সবই গুছান হইল। কিন্তু এখানকার ভয়ানক গরম ও এ সময়ের (July মাসের) "আঁধি" (ধূলার ঝড়) প্রায় রোজই হওয়ায় আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল। প্রথম কিছুদিন আমাদের পক্ষে গরম অত্যন্ত কষ্টকর হয়। এখানকার গরম কি ভয়ানক তাহা বাঙ্গলা দেশের লোকে সহজে অনুমান করিতে পারিবেন না। দিনে ২।৩ বার স্নান করিয়াও সমস্ত রাত্রি মুক্ত আকাশতলে শয়ন করিয়াও সুস্থ বোধ হইত না! আহারে রুচি নাই, রাত্রে নিদ্রা শেষে ডাক্তার ২।৩ বার গরম চা খাইতে বলিলেন। তা সরকারী 'খোরাক' (ration) মধ্যে পাওয়া যাইত। খাইয়া গরমের জন্য কষ্ট কিছু কম হইয়াছিল স্বীকার কিন্তু নানারকম অসুখ হইয়া বিব্রত হইলাম। সাধার সমস্ত দিনই সকলকে কাজ করিতে হইত সেজন্য কাল রংএর চশমা (Motor Goggles) ও মেরুদ

উত্তাপ হইতে বাঁচাইবার জন্য পিঠে তুলার প্যাড এবং হ্যাট হইতে পিছনে ঝোলান ঝালর সকলকেই পরিতে হইত। মধ্যে ২।১টী লোকের সর্দ্দিগরমী হওয়ায় সকাল হইতে ১০টা ও ৪টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত সাধারণতঃ বাহিরের কাজের সময় নির্দ্ধারিত হয়। ১৯শে জুলাই টাঁক ছাউনিতে থারমমিটার ছায়ায় ১৩০° ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, শুনিলাম সেইদিন বসরায় ১১৭° ডিগ্রি উত্তাপ হয়। বসরা খুব গরম দেশ শুনা যায়, কিন্তু মেসোপোটেমিয়া হইতে ফেরৎ অনেক সৈনিক বার বার স্বীকার করিয়াছেন যে টাঁকের গরম বসরা অপেক্ষা বেশী এবং সেখানে বদলী হওয়ার জন্য প্রার্থনাও জানাইয়াছেন। ক্রমে মানুষের সবই সহিয়া যায়। আমাদেরও কতক সহিয়া গিয়াছিল, কিন্তু কাহারও ফোঁড়া, শিরঃপীড়া, কাহারও অজীর্ণ এমন কি শেষ পর্য্যন্ত শূলের ন্যায় বেদনা ও পরে গায়ে গরমের জন্য রক্ত দূষিত হইয়া একরকম মাংস পচান ঘা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। শুনিলাম তাহার নাম Oriental sore বা Frontier sore (সীমান্ত প্রদেশের ঘা) তাহা ৬।৭ মাসের কমে এবং ঠাণ্ডা দেশে না গেলে সারে না। কাজেও তাহাই ঘটিতে দেখিলাম।

এখানে বৎসরে ৫।৬ দিন মাত্র বৃষ্টি হয়। ১১ই জুলাই প্রথম কিছুক্ষণ বৃষ্টিপাত হইয়া ধরিত্রী যেন শীতল করিয়াছিল, কিন্তু তাহা বেশীক্ষণ থাকিল না। পর্ব্বত মালার পাদদেশে টাঁকে এত গরম হইলেও একটু উত্তর পশ্চিমে পাহাড়ের মধ্যে জণ্ডোলা, খেজুরি কচ প্রভৃতি স্থানে বেশ ঠাণ্ডা ছিল।

টাঁক সহরটী খুব ছোট। সুলেমান পর্ব্বত শ্রেণীর ঠিক পাদদেশেই ওয়াজিরি স্থানের পূর্ব্ব সীমায় এই সহর, চারিদিকে প্রায় ১২ ফুট উচু ও ৭ ফুট গভীর মাটির প্রাচীর বেষ্টিত। পূর্ব্ব পশ্চিমে একটী মাত্র পথ সহরটিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। এই পথের মাঝামাঝি হইতে দক্ষিণে আর একটি পথ সহরের বাহিরে গিয়াছে। সহরে প্রবেশের এই তিনটি মাত্র ফটক, সন্ধ্যার পরে তাহা বন্ধ করা হয়। ১৮৭০ সালে পঞ্জাবের ছোটলাট স্যর হেনরী ডুরাণ্ড (Sir Henry Durand) হস্তিপৃষ্ঠে এই ফটকের নিচে দিয়া যাইতে আহত হইয়া পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং ডেরাতে সমাহিত হন। এই প্রাচীর বেষ্টিত স্থানের প্রায় পশ্চিমার্দ্ধ নবাবের বাগান এবং পূর্ব্বার্দ্ধ সহর। পথটির দুধারে নানাবিধ দোকানে সংসারের আবশ্যকীয় প্রায় সকল জিনিষই ন্যূনাধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, কেবল পাওয়া যায় না শাক সব্জী, তাহা এ অঞ্চলে জন্মে না। সহরে ভয়ানক ঘন বসতি। লোকসংখ্যা ৪৪০০ (১৯০১), হিন্দু ও মুসলমান অবিসম্বাদে একত্র এমন কি একই বাড়ীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে বাস করে। পাকা বাড়ী খুবই কম, আজ কাল ২।৩টি দোতালা বাড়ী হইতেছে। সাধারণ লোক বিশেষতঃ স্থানীয় মুসলমানেরা বড়ই নোংরা। আবর্জ্জনা ত্যাগ বা পরিষ্কার করার কোনই ব্যবস্থা নাই। মলত্যাগের স্থান ছাতের উপরে। জাম (Jam) পাহাড় হইতে একটি জলধারা নালায় ন্যায় (ravine) সহরের মধ্য দিয়া বহিয়া যায় তাহাই সমস্ত অধিবাসীর জলের অভাব পূরণ করে। এই নালাতেই কাপড় কাচা, বাসন মাজা স্নান করা ও সহরের পয়ঃপ্রণালীর কাজ হয়। এখানে বৃষ্টি কম হইলেও শীত ও গরম খুব বেশী, সাধারণ স্বাস্থ্য খুব ভাল। লোক প্রায় নিরোগী ও হৃষ্টপুষ্ট। এই সব স্থান দেখিলে মনে হয় প্রকৃতি দেবী নিজেই এখানকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ভার লইয়াছেন। উত্তর পর্ব্বতবাসীরা ও সমতলেও বহুদূরের অধিবাসীরা এই সহরে কেনা বেচার জন্য আসে। ডেরা ৪২ মাইল দূরে। তাহা ছাড়া ৪০।৫০ মাইল মধ্যে আর সহর নাই।

এই সহরের লাগ উত্তরেই নবাবের কেল্লা দীর্ঘে ও প্রস্থে প্রায় ২৫০ গজ হইবে। চারিদিকে পরিখা বেষ্টিত, প্রায় ৫০ ফুট উঁচু মাটির প্রাচীর (rampart) মধ্যে মধ্যে কামান বসাইবার স্থান (bastions and parapets) আছে। আজকাল বিনা মেরামতে বৃষ্টিতে স্থানে স্থানে মাটি গলিয়া যাওয়ায় দেখিতে সুশ্রী নয়, কিন্তু মাটির কেল্লার দৃঢ়তার প্রমাণ দিতেছে। কেল্লায় প্রবেশপথ একটি মাত্র। এখানকার নবাব বা তাঁহার পুত্র এখানে এখন বাস করেন না। বেগমরাই কেবল আছেন শুনিলাম। দ্বাররক্ষক বেশ অমায়িক লোক,—ভিতরে গিয়া দেখিবার জন্য আমাদের আহ্বান করিলেন, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। সহরের উত্তরে ও কেল্লার পূর্ব্বে আজকাল সুদৃশ্য একটি ইংরাজি স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। শুনিলাম এ জেলার মধ্যে এরূপ স্কুল আর নাই। ছাত্রসংখ্যা প্রায় ১৫০ হইবে। এখানে আমরা কয়দিন উটে চড়িয়া সহর ও ছাউনির বাহিরে ভ্রমণ করিয়াছিলাম। পার্ব্বত্য গিরিপথে উটই একমাত্র বাহন, অন্য কোনও জন্তু সে পথে ভার বহন করিতে পারে না। পথ

চলিতে উট ঘোড়া অপেক্ষা কম চলে না। প্রায় ২০টা উটের জন্য একজন মাত্র পরিচালক ও প্রতিপালক থাকিলেই চলে। উট বড় নিরীহ জীব। কিন্তু কাদায় একপাও চলিতে পারে না। নিতান্ত অসহায় শিশুর ন্যায় পিছলাইয়া পড়িয়া যায় ও হাত পা ছাড়িয়া দিয়া পড়িয়াই থাকে। এ অঞ্চলে একটি উটের দাম ২০০৲ টাকা। তাহার খোরাক মাসে প্রায় ১৫৲ টাকা লাগে।

প্রাচীনকালে এদেশে কোনও বসতি ছিল না। পরে পশ্চিম দিকের পর্ব্বত শ্রেণী হইতে পাঠানগণ ভারতবর্ষে আসিবার পরে তাহাদের এক শাখা দৌলত খেল বংশীয় কেহ এখানে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। দৌলত খেল হইতে সপ্তদশ পুরুষ কতাল্ খাঁই প্রথম এ অঞ্চলে একচ্ছত্র রাজত্ব স্থাপন করিয়া নবাব উপাধি ধারণ করেন। কতাল খাঁর পুত্র মরওর খাঁ মহাক্ষমতাশালী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহার দীর্ঘ রাজত্বকালে এই অনুর্ব্বর দেশে কৃষিশিল্পের বিস্তার ও নানাবিধ উন্নতি করিয়া সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধি ব্যবস্থার প্রচলন করেন। কিন্তু তাঁহার জীবন-সায়াহ্নে শিখগণ ডেরা অধিকার করিলে তাঁহাকেও বাধ্য হইয়া অধীনতা স্বীকার করিতে হয় ও বাৎসরিক ১২ হাজার টাকা কর নির্দ্ধারিত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই (১৮৩৬) তাহা ৪০ হাজারে বর্দ্ধিত হয় এবং তাঁহার পুত্র আলাহ্‌দাদ খাঁর সময় তাহা একলক্ষ টাকার দাবীতে দাঁড়ায়। আলাহ্‌দাদ তাহা না দিতে পারায় পশ্চিমে মামুদদের রাজ্যে পলাইয়া যান। তখন শিখ দরবার হইতে ঐ প্রদেশ বন্নুর শাসনকর্ত্তা নেহাল সিংকে জাইগীর দেওয়া হয়, কিন্তু আলাহ্‌দাদ সর্ব্বদা গোপন আক্রমণ ও লুটতরাজ করিতে থাকায় নেহাল সিং ঐ জাইগীর ত্যাগ করেন। এই সময় অন্য আর একই পাঠান সম্প্রদায়ের অধিনায়ক মালিক ফতে সিং তেওয়ানা আসিয়া টাঁক দখল করেন, কিন্তু শিখ শাসনকর্ত্তা দেওয়ান লাকিমলের পুত্র দৌলতরায় ফতেসিংকে তাড়াইয়া দিয়া ডেরার নবাব বংশের কাহাকেও এ অঞ্চল অর্পণ করেন। ইতিমধ্যে আলাহ্‌দাদের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র সাহ নেওয়াজ খাঁ নির্ব্বান্ধব অবস্থায় ১৮৪৫ সালে লেফটনেন্ট এডওয়ার্ডস্ (পরে Sir Herbert, যাঁহার নামে বন্নুর অপর নাম এডওয়ার্ডসাবাদ) এর সহায়তা লাভ করিয়া লাহোরে শিখ দরবার হইতে টাঁকের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। পরে পঞ্জাব ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইলেও এই ব্যবস্থা বলব ছিল। রাজ্যশাসনে সুশৃঙ্খলা না হওয়ায় ইংরাজরাজ কে নবাবসাহেবের বাৎসরিক আয় অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শাসনভা নিজহস্তে লইয়া এ প্রদেশ ডেরা জেলার অন্তর্গত 'তহশী' পরিণত করিয়াছেন। সাহ নেওয়াজ খাঁই শেষ স্বাধীন নবা তিনি ৮৮২ সালে মারা যান। এখন তাঁহার পুত্র ও পৌ জীবিত আছেন। টাঁক তহশীলের পরিমাণ ৫৭২ ব মাইল, তাহার মধ্যে ৭৮টি গ্রাম আছে। এখানকা অধিবাসীর সংখ্যা ৪৮৪৬৭ (১৯০১) এবং এ অঞ্চলের রাজ ৬৭০০০৲ টাকা।

ডেরা হইতে বন্নু যাওয়ার পথে এবং পুরাতন টাঁকসহ হইতে প্রায় ২ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে কিছু দিন পূর্ব্বে টাঁ তহশীলের (আমাদের দেশের মহকুমার ন্যায়) সদর কাছা খাজানাখানা, ডাকঘর, জেলখানা ও ডেপুটী কমিশনারে বাসবাড়ী মাত্র ছিল। এখন সেই বসতির চারিদিে প্রায় ১৷৷০ মাইল বিস্তৃত টাঁক ছাউনি। মধ্যস্থলে সৈনি কর্ম্মচারীদের আফিস ও বাসগৃহ, তাহার চারিদিকে অনে গুলি কেল্লা তারের বেড়া দিয়া ঘেরা। মধ্যে মধ্যে বড় ব রাজপথ ও চারিদিকে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে ঘোড়া, ভারবাহী খচ্চ ও উট থাকিবার সারি সারি স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। বহুদূর জা (Zam) পাহাড় হইতে টাঁক সহরের মধ্য দিয়া ও ছাউনি পাশ দিয়া জল প্রণালীতে ঝরণার জল বহিয়া যাইতেছে স্থানীয় লোকে এই জলই ব্যবহার করে। কিন্তু ইংরা রাজের সুব্যবস্থায় ছাউনির মধ্যে পানীয় এবং স্নানের জন্ জন্য পৃথক বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থানে স্থানে বড় বড় চ তারায় জল শোধিত হইয়া সমস্ত ছাউনীতে কলের পাইে সরবরাহ করা হইতেছে। ইহার তত্ত্বাবধান করার জ একজন ডাক্তার নিযুক্ত আছেন। পায়খানারও যত সম্ভব সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্থানে স্থানে সাধারণ পা খানা আছে মেথরে তাহা দুবেলা পরিষ্কার করিবার নিয়ম কেল্লার মধ্যে "অফিসার" শ্রেণীভুক্ত সকলেই ইচ্ছা করিে "কমোড" ব্যবহার করিতে পারেন। কেল্লার মধ্যে মেথ প্রথার ব্যবহারও আছে। ছাউনিতে পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যে জন্য কঠিন নিয়ম সর্ব্বদা অবলম্বিত হয়। এ প্রসঙ্গে দুই ঘটনার কথা মনে পড়িয়া গেল। আমাদের ছাউনি যুদ্ধক্ষে (Firing line) হইতে প্রায় ২৫।৩০ মাইল দক্ষিণ পূে

নিরাপদ স্থানের আড্ডা (Base Depot)। এথান হইতে রেলপথে বা সড়ক দিয়া অন্যত্র যাইতে হয়। যখন সৈন্যদল ক্রমে পাগড় হইতে নামিয়া আসিতে লাগিল, তখন তাহারা এই ছাউনিতে আসিয়া ২।১ দিন অথবা কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামান্তে পাথেয় সংগ্রহ করিয়া আপন গন্তব্যপথে চলিয়া যাইত। এইরূপ একটি রেজিমেণ্ট বিস্তৃত ছাউনির একপাশে একদিন কয়েক ঘণ্টার জন্য আশ্রয় পায়। সেথানে ২টা পায়খানা থাকা সত্ত্বেও একজন সৈনিক বহুবিস্তৃত মাঠে নিজেদের ছাউনি হইতে দূরে গিয়া মলত্যাগ করে। কিন্তু বেচারা দূরে অবস্থিত কোনও সতর্ক প্রহরীর দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। ফলে এই মাঠে মলত্যাগ করার জন্য তাহার সামরিক বিচারে (Court martial) কয়েক ঘা বেতের হুকুম হয়।

আর একদিনের কথা বলি। আগষ্ট মাসের শেষে কয়েকদিন অপ্রত্যাশিতভাবে বৃষ্টি হইয়াছিল। জলনিকাশের সুব্যবস্থা না থাকায় (ছাউনির মধ্যে অনেকগুলি নূতন কেল্লা ও পথ ৫।৭ মাসের মধ্যে তৈয়ারী হওয়ায় জল চলাচলের কিরূপ ব্যবস্থা আবশ্যক হইবে তাহা আগে স্থির হয় নাই, ক্রমে এ ত্রুটী সংশোধিত হইয়াছিল) ছাউনিতে বড় ম্যালেরিয়া জ্বর হইতেছিল। দিনে মাছি ও রাত্রে মশার ভয়ানক উৎপাত হইয়াছিল। স্বাস্থ্য বিভাগ এজন্য বড়ই বিচলিত হন। একদিন সকালে কোনও কাজের জন্য আমি কেল্লার বাহির হইয়া অন্যত্র যাইতেছি, দেখি লম্বা এক সারি প্রায় ২।৩ শত লোক দাঁড়াইয়া আছে, ও কয়েকজন মহাব্যস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। রোজই কুলিদের (Labour Corps ও Army Bearer Corps) ড্রিল ও প্যারেড হয় জানিয়া আমি পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছি, এমন সময় আমার একজন বন্ধু I. M. S. ডাক্তার দূর হইতে সঙ্কেতে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দৌড়িয়া আমার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "লাইনে দাঁড়াইয়া যান ও একদাগ ঔষধ খান" (Hallo ! Just fall to and have a dose.) আমি অবাক্! শেষে জিজ্ঞাসায় জানিলাম ম্যালেরিয়া হইতেছে বলিয়া ছাউনির সকল লোককে কুইনাইন খাওয়াইবার হুকুম হইয়াছে। রোজ এই রকম ২।৩ শত লোককে এক লাইনে দাঁড় করাইয়া ঔষধ খাওয়ান হয়। দেখিলাম ৩।৪ জন কম্পাউণ্ডার বড় বড় কাঁচের বোতলে (সেগুলিকে বোতল বলিলে বুঝিবা ভুল হয়। শুনিলাম এক একটিতে ৮।১০ গ্যালন ধরে কুইনাইন মিকশ্চার করিয়া আনিয়াছে (১ আউন্সে ১ গ্রেণ) এবং এই লাইনবন্দি লোকদের হাঁ করাইয়া অমৃত প্রায় সরবতের ন্যায় মুখে ঢালিয়া দিতেছেন। আর তাহারা ভাল লক্ষ্মী ছেলের মত সমস্তট গিলিয়া অম্লানবদনে সোজা দাঁড়াইয়া আছে। মুখধোয়ার জলটুকু পাইবে না, থুথু ফেলা ত নীতি-বিরুদ্ধ। কেহ কোনও রকম ওজর আপত্তি না করে তাই স্বয়ং লেফ্‌টেনেণ্ট সাহেব হাজির আছেন। একটু অবাধ্যতায় কোর্টমারসেল্ হইবে। সকলের খাওয়া হইলে ডাক্তার সাহেব হুকুম দিলেন, তখন চাট বি ও একবার 'রাইট' 'লেফ্‌ট' করিয়া যে যাহার কাজে যাইবে। শুনিলাম ইহার নাম মেডিকাল প্যারেড (Medical parade)। এইরূপে ছাউনির ৪।৫ হাজার লোককে ২।৩ বার কুইনাইন খাওয়ান হইয়াছিল। আমি মনে করিয়াছিলাম, আমরা চুনাপুঁটি আমাদের কোনও খোঁজ হইবে না, কিন্তু হিসাবে ভুল নাই। পরদিন S. M. O এক পত্র দিলেন যে ম্যালেরিয়ার জন্য কুইনাইন খাওয়ান ব্যবস্থা হইয়াছে। আমার লোকদের জন্য আমি ডাক্তারকে জানাইলে তিনি সব ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। মিলিটারি প্যারেডের বহর দেখিয়া এ সংবাদে আমরা প্রমাদ গণিলাম! শেষে পত্রে জানাইলাম যে ছাউনিতে ম্যালেরিয়া আরম্ভ হওয়া অবধি আমি ও আমার লোকেরা ডাক্তারের পরামর্শে প্রত্যহ প্রতি জনে এক হিসাবে ৫ গ্রেণ কুইনাইন খাইতেছি— ইহা মিথ্যা কথা নয়, বাজার হইতে কুইনাইনের বড়ি কিনিয়া খাইতাম। যখন আমাদের কেল্লায় ভয়ানক জ্বর আরম্ভ হইল, তখন ভয়ে আমরা রোজ ১০ গ্রেণ করিয়া খাইয়াছি। যাহা হউক এই রকমে medical parade হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম।

প্রথম ট্যাঙ্কে পৌঁছিয়া বাঙ্গালী দেখিতে পাই নাই। ছাউনিতে আমরাই ৩ জন মাত্র ছিলাম। কয়েকদিন পরে শ্রীরামপুর (হাবড়া) নিবাসী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ফিরোজপুর হইতে Supply and Transport (রসদ বিভাগে) এ কেরাণী নিযুক্ত হইয়া পৌঁছিলেন। তিনি আসায় আমাদের খুব আনন্দ হইল এবং আমরা একত্র আহারাদি করিতে লাগিলাম। শেষ পর্য্যন্ত একত্র বাসে

সকলেই সুখী হইয়াছিলাম। যখন অগ্রগামী সৈন্যগণ ফিরিতে লাগিল তখন কয়েকজন বাঙ্গালী ডাক্তার ও হাঁসপাতালের কেরাণী এই ছাউনি হইয়া গন্তব্যপথে যাইতে আমাদের সঙ্গে দেখা করিয়া যান। শেষ কয়েকজন I. M. S. অফিসার ছাউনিতে কিছুদিন থাকায় তাঁহাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপের সুযোগ হইয়াছিল। এই সুদূর বিদেশে স্বজাতিপ্রীতি আপনিই উথলিয়া উঠে। তাহার আকর্ষণ যে কত অপরিহার্য্য ও দৃঢ় তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না।

সিন্ধুপারে সমতল ভূমিতে ডেরা-ইসমাইল-খাঁই প্রাচীন ও বড় সহর। সহরে দেখিবার বিশেষ কিছু নাই। টাঁক সহর অপেক্ষা বড়, কিন্তু সেই রকমই ঘন বসতি ও অপরিষ্কার। বাজার বেশ বড়, অনেক দোকান আছে, আবশ্যকীয় সকল জিনিষই পাওয়া যায়। হিন্দু মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান, সকলেই গৌরবর্ণ ও বলিষ্ঠ। এখানকার স্কুলের হেডমাষ্টার শুনিয়াছিলাম বাঙ্গালী, কিন্তু সময়াভাবে তাঁর সন্ধান লইতে পারি নাই। ইংরাজ আমলে পুরাতন সহরের পাশে বিস্তৃত ছাউনি, হাঁসপাতাল, রাজকর্ম্মচারীদের বাসগৃহ আদালত ইত্যাদি আধুনিক প্রণালীতে সৃষ্ট এবং সুদৃশ্য। এখানে দেখিবার জিনিষ সিন্ধুনদ। শুনা যায় সহর হইতে সিন্ধু এক সময় ৭৮ মাইল দূরে ছিল। আজকাল জলস্রোত একেবারেই সহরের পাদদেশ ধৌত করিয়া বহিয়া যাইতেছে। গত কয়েক বৎসর যে গতিতে পাড় ভাঙ্গিয়াছে তাহাতে অদূরে যে এই সহরের অদৃশ্য হইয়া যাইবার আশঙ্কা নাই এরূপ বলা যায় না। উত্তরে মারী-কালাবাস ভিন্ন এখানেই কেবল সিন্ধুনদ পারাপার হওয়া যায়। তবে এখানে নদ এত বিস্তৃত যে অপর পার দেখা যায় না। শুনিলাম এখানে নদীগর্ভ ৭ মাইল বিস্তৃত এবং দিনের মধ্যে ডাক জাহাজ একবারমাত্র এপার হইতে ওপারে পৌছিতে পারে। ডেরাইসমাইল খাঁর অপর পারেই দরিয়া খাঁ, যেমন কলিকাতার অপর পারেই হাবড়া এবং গোয়ালন্দের অপর পারেই আরচা। কিন্তু এখানে জলের গতি এত দ্রুত যে বেলা ৮টায় ডেরা হইতে ডাক ষ্টিমার ছাড়িয়া বেলা ৩।৪টার সময় দরিয়াখাঁয় পৌছায়। অপর পার হইতেও এইরূপ একখানা ষ্টিমার ডাক ও যাত্রী লইয়া পার হয়। এ অঞ্চলের উত্তর ও পশ্চিমে পাহাড়, সেখানে একটু বৃষ্টি হইলে সেই বর্ষার জল পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী 'খাদে' নদী আকারে বহিয়া গরু মানুষ উট সমস্ত ভাসাইয়া লইয়া এই সিন্ধুতে আসিয়া পড়ে। তখন সিন্ধুর চিরলাল জলের প্রবল স্রোত বীর হৃদয়কেও কম্পিত করে। সে সময় এক একদিনে ডাকষ্টিমার পারাপার করিতে পারে না। সিন্ধুপারের সমস্ত ডাক এখানেই পারাপার হয়। সেজন্য টাঁকে থাকিতে অনেকদিন আমরা কলিকাতার ডাক নিয়মিত সময়ে পাই নাই। ডেরাইসমাইল খাঁ ষ্টিমার ঘাটে দেখিলাম উঁচু পাড় হইতে ষ্টিমারে উঠিবার জন্য নৌকার পুল (pontoon bridge) রহিয়াছে। বড় বড় চওড়া নৌকা একে অপরের সহিত দৃঢ় শিকলে আবদ্ধ ও দুইদিকে মোটা শিকলে টানা দেওয়া আছে। তাহা ছাড়া নৌকার উপরে মানুষ চলা পথের দুইপাশে বড় বড় কাঠের চকোর ৭।৮ ফুট উঁচু করিয়া সাজান আছে। নামিবার সময় মাথা উঁচু করিয়া আকাশ ও দুইপাশে কাঠ ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না। জল স্রোত প্রতিহত করায় শিকলের একটা ঝনঝনা শব্দ উঠিতেছে, তাহাতে নিকটে দাঁড়াইয়া পরস্পরের কথোপকথন শুনিতে দেয় না। যখন জলের নিকটে দাঁড়াইলাম তখন বুঝিলাম এই গুরুভার চাপান সত্বেও নৌকাগুলি এতই কাঁপিতেছে যে তাহার উপরে দাঁড়াইয়া থাকাও কষ্টকর। জলের দিকে চাহিলে মাথা ঘুরিয়া যায়, মনে হয় পরমুহূর্ত্তেই শিকল ছিঁড়িয়া নৌকা ও কাঠের চকোর সহিত আমরা বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া অতল জলে মিশিয়া যাইব। নদীর জলের এই ভীমবেগে প্রকৃতির এই আসুরিক লীলা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল এদৃশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। তাহার অনুমাত্র বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই। সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া নীলজলের তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়াছি। এই ভারতের পূর্ব্ব অঞ্চলে রুদ্রমূর্ত্তি ব্রহ্মপুত্র নদ, বর্ষা-যৌবনা মেঘনা পদ্মা হইতে পশ্চিম সীমান্তের সিন্ধু দেখিলাম, কিন্তু দিগন্তপ্রসারিণী গৈরিক জল—তাহাতে এই ভীষণ বেগ—যাহাকে ভগবানের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের বুদ্ধি কৌশল প্রতিহত করিতে পারে না—ইহা দেখিলে প্রকৃতিদেবীর প্রলয়ঙ্করীমূর্ত্তি মানসপটে স্বতঃই জাগরিত হয়। মহা পাষণ্ডও এখানে মূক হইয়া অজ্ঞাতসারে সেই অখিলব্যাপী ভূমা মহান্ শক্তির চরণতলে মস্তক অবনত করে।

কলিকাতা হইতে এ অঞ্চলে আসার সময় শুনিয়াছিলাম এদিকে আঙ্গুর বেদানা প্রভৃতি ফল প্রচুর পাওয়া যায়, কিন্তু দুইমাস মধ্যে কোথাও তাহা দেখি নাই। ডেরার বাজারে গিয়া ঐ জনশ্রুতির সার্থকতা কতক বুঝিলাম। ঠিক এ অঞ্চলে এ সব ফল না জন্মিলেও ডেরাতে সব পাওয়া যায় এবং অপেক্ষাকৃত সস্তা। চারি পয়সা করিয়া আমরা কয়েকটী ডালিম কিনিলাম, প্রত্যেকটী ওজনে একপোয়া দেড়পোয়া হইবে। ভিতরে দানাগুলি বাঙ্গলা-দেশের করমচার ন্যায় বড়, সুন্দর লাল ও সুস্বাদু। এরূপ ফল, আমরা কলিকাতায় দেখিতে পাই না। আন্দাজ বেলা ২টার সময় 'ঘরে' ফেরার উদ্যোগ করা গেল মোটরে ২ ঘণ্টায় যাওয়া যায়, পথ ভাল। পথে ২।১ স্থানে সৈনিক আড্ডায় ও হাঁসপাতালে অপেক্ষা করিয়া আন্দাজ ৫টার সময় ট্যাঁক ছাউনিতে পৌছিলাম। বাঙ্গালী জীবনে একদিনে প্রায় ১০০ মাইল (ডেরা সহরেও ৩।৪ ঘণ্টা ঘুরিয়া সহর দেখা হইয়াছিল) মোটরে চড়িয়াও সমস্ত শরীরের গ্রন্থি যেন শিথিল হইয়া গিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

সুবাদার মেজর—দ্বিজেন্দ্রলাল রায় চৌধুরী।

চিরসুন্দর।

বিশ্ব ভরিয়া তব রূপ রাজে
ওগো প্রিয়তম সুন্দর,
কুঞ্জে তোমার পুঞ্জ কুসুমে
সঞ্চিত হাসি নির্ঝর।
উজ্জ্বল চির কনক-কিরণে
উছলে তব কান্তি,
বিশ্বের বুকে বারিদ হইয়া
বিতরিছ সুধা শান্তি।
কল্লোল কল যমুনায় তব
ঝঙ্কারে প্রেম-মন্থর ;—
অন্তর মম আলোকিয়া রও
ওগো প্রিয়তম সুন্দর।

শ্রীহেমাঙ্গিনী ঘোষ

হীরের মা।

হীরা তাহার হারিয়ে গেছে
নাইক কণা তার।
আছে শিথিল সূত্র গাছি
নাইক ফুল হার।
মগ্ন তরীর ভগ্ন হা'ল ও
কলসী শ্মশানের
পূজার শেষে পড়ে আছে
ঠাটটী ভাসানের।
ভাঙা মেলার আটচালা ও
ভাঙন ধরা তট
পোড়া গাঁয়ের শেষ চিনা ও
অর্দ্ধ পোড়া বট।
দুখের ধ্বজা শোকের মিনার
বলি শেষের যূপ
স্মৃতির আগুন আঁশবটী ও
সর্ব্বনাশের স্তূপ।
নয়নজলে পথটী উহার
পিছল করিসনে,
ধীরে ধীরে মরণ পথে
চলুক ধরিসনে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

মস্‌জিনা।

(১)

রাজ কবির বজরা যখন তীরে আসিয়া লাগিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। গুড় গুড় করিয়া মেঘ ডাকিতেছিল। বিরাট নিবিড় অন্ধকার পৃথিবী-বক্ষ জুড়িয়া বসিতেছিল। সারা আকাশ একটা কঠিন পুরু কালো আবরণে ঢাকা পড়িয়া গেল। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিয়া একটা মহাপ্রলয়ের সুচনার দৃশ্য ক্রমেই ভীষণতর করিয়া তুলিল। তখন কবির ষোড়শী কন্যা মস্‌জিনা ভাব-নিমগ্ন বৃদ্ধ কবির কোল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বাবা বড় ঝড় উঠ্‌বে,—বড্ডো সাজসজ্জা ক'রেছে।"

"সত্যি মস্‌জিনা!" কবি যেন কোন কল্পনা নির্ম্মিত মায়াপুরী হইতে কন্যার শঙ্কিত কণ্ঠে হঠাৎ পড়িয়া গেলেন। তাই সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি গতস্বপনের রেখাবিষ্ট স্মৃতিটা সত্য জগতে ফিরিয়া আসিলেও যেরূপ একটা দ্বিধার ভাবে কতক্ষণ আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, কবিও তেমনি মোহাবিষ্টভাবে কন্যার কথায় চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন "সত্যি মস্‌জিনা!"

মস্‌জিনা পিতার এরূপ ভাবের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত বলিয়া একটুকুও বিস্মিত হইল না। পিতার আর একটুক কাছ ঘেঁসিয়া অপেক্ষাকৃত স্পষ্টস্বরে বলিল, "হাঁ বাবা; বাহিরে দেখ্‌বে এ'স।"

কবি আসন ছাড়িয়া উঠিলেন। কন্যার হাত ধরিয়া দুয়ারের গোড়ায় আসিতেই দেখিলেন, ভীষণ ব্যাপার! ধূম ঝড় ও বৃষ্টি একটা পাগ্‌লা ঘোড়ার মত প্রচণ্ডবেগে ছুটাছুটি করিয়া পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু ধ্বস্তনস্ত করিয়া দিতেছে। আর নিবিড় অন্ধকার সবটুকু যায়গা জুড়িয়া বসিয়াছে। কবি কন্যাকে আরো কাছে টানিয়া নিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "তোর ভয় করে মস্‌জিনা?" মস্‌জিনা পিতার বুকের কাছে নিঃশব্দে সরিয়া দাঁড়াইল। এমনি সময় একটা বিদ্যুৎ চমকিল। পিতাপুত্রী সেই স্পষ্ট চঞ্চল ক্ষণিক আলোকে দেখিল পৃথিবীটা এখনও লুপ্ত হইয়া যায় নাই। একটুকু আশ্বস্ত হইল। তারপর বিরাট গর্জ্জন। উভয়েই চমকিয়া উঠিল। মনে হইল গর্জ্জনের ঘায় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পাতালে ডুবিয়া গেল। বৃদ্ধ কবি বলিলেন, "চল্‌ মা, ভিতরে যাই। আমি আর সহ্য করতে পারি না।"

মস্‌জিনা পিতার হাত দুইখানি হঠাৎ শক্ত করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া ভয়-ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিল—"বাবা!"

"কি মা?"

"ওটা কি বাবা ঢেউয়ের তালে তালে উঠ্‌ছে নাম্‌ছে?"

বিদ্যুৎ আবার চমকিল। মস্‌জিনা চিৎকার করিয়া উঠিল "মানুষ,—মানুষ!"

"সে কি!" কবি শঙ্কিত ও উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বলিলেন—"সে কি!" মস্‌জিনা বিপুল উচ্ছ্বাসে জোরে পিতার হাত ছিনাইয়া নিয়া বলিল, "কি হ'বে!—রক্ষা ক'র—রক্ষা ক'র!" কবি দৌড়িয়া গিয়া কন্যাকে ধরিয়া বলিলেন, "র'স মা; শুধুশুধি ম'র্‌তে হবে—দেখি ঝড় ধরে কিনা।" মস্‌জিনা নিশ্চল ও নির্ব্বাকভাবে হতচেতনার ন্যায় পিতার বুকের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। কবি ডাকিলেন, "রহিম!—আমেদ!" দুই বলিষ্ঠকায় পুরুষ আসিয়া সেলাম দিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ হাজার টাকার তোড়া সাম্‌নে ধরিয়া বলিলেন, "ঐ মানুষ—তুলে দাও!—এই হাজার টাকা তোমাদের!" মস্‌জিনাও অমনি গলার হার খুলিয়া বলিল "আর এটিও তোমাদের।"

রহিম ও আমেদ ডিঙ্গা ভাসাইল। রহিম মাঝির ওস্তাদ, তাহার হাতে নৌকা কখনও ডুবিবেনা প্রবাদ ছিল। একটু ঝড়ও ধরিয়া উঠিল। পিতাপুত্রী আবার বিদ্যুতের আলোকে দেখিল "রহিম কি যেন একটা নৌকায় ধরিয়া তুলিতেছে।"

তখন মুষলধারে আরও বৃষ্টি নামিল। কবির বসন ভিজিয়া গেল। মস্‌জিনার সিক্ত উড়্‌নী বাতাসের ঝাপটায় পত্‌ পত্‌ শব্দে উড়িতে লাগিল। রহিম ও আমেদ ঝঞ্ঝাবাত ঠেলিয়া গর্জ্জিত তরঙ্গায়িত জলরাশির উপর দিয়া ছিপ্‌ আনিয়া বজ্‌রার সহিত লাগাইল। পরে ধীরে অতি সতর্কে উভয়ে ধরাধরি করিয়া শুভ্র দীর্ঘকায় উপবীতধারী এক যুবকের নগ্নদেহ মস্‌জিনার সুবাস-সজ্জিত শুভ্র-কোমল শয্যার উপর শায়িত করিল। মস্‌জিনা কণ্ঠ হইতে হিরক-হার খুলিয়া দিল। বৃদ্ধ কবিও সহস্র মুদ্রার তোড়া রহিমের হাতে দিয়া বলিলেন, "হাকিমকে ডাক; যুবক সংজ্ঞাহীন।"

(২)

লক্ষ্মীকান্ত শর্ম্মা রাজ-শিল্পী। তিনি চিত্রবিদ্যার অসামান্য

নিপুণতায় নবাব সরকারে যথেষ্ট খ্যাতি ও সম্মানলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পুত্র গোবিন্দ নিতান্ত নাবালক থাকায় তাঁহাকে রাজসরকারে পরিচিত করিয়া দিবার কোন তাঁহার সুযোগ ঘটে নাই। গোবিন্দের বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে তাহার পরিবারের অর্থাভাব বাড়িয়া উঠিল। সকলেই একবাক্যে বলিত, লক্ষীকান্ত নবাবের একান্ত অনুগৃহীত ও সম্মানিত ছিলেন,—অবশ্য সেখানে পিতার পরিচয়ে একটা সংস্থান তার হইবেই। কিন্তু গোবিন্দ এ সংস্থানের পক্ষপাতী ছিল না। পরন্তু যখনই ভাবিত, পিতার যশের খাতিরে নবাবসরকারে চাকরি করিয়া অন্ন সংস্থান করিবে, তখনই একটা ম্লানদুঃখের তীব্র বেদনা অস্পষ্টভাবে তাহার হৃদয়কে অভিভূত করিত। মনে মনে বলিত, পিতার যশ ও সম্মান কিছুতেই মলিন করিয়া দিতে পারিব না। ভাতের চেয়ে সম্মান বড়।' তারপর পিতার পুরাতন তুলিকাগুলি পরিষ্কার করিয়া নিয়া সে রং ফলাইতে চেষ্টা করিত।

কতদিন পরে যখন মাতার ও প্রতিবাসীদের উৎপীড়নে সে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল, তখন নবাব সরকারে যাচিয়া উপস্থিত হইতেই মনস্থ করিল। বিশেষতঃ যখন কয়েকজনে পিতার অঙ্কিত তস্‌বিরপার্শ্বে নিজের নীরব সাধনা-প্রসূত তস্‌বির দেখিয়া বলিল, 'লক্ষীর এ তস্‌বির ত' আরও সুন্দর ;—এতদিন কি লুকান ছিল ?'—তখন নিজের সাফল্যের পরিচয় পাইবার জন্য পরীক্ষার্থী হইবার আকাঙ্ক্ষাও তাহাকে কিছু উৎসুক করিয়াছিল। তাই সে রাজধানী অভিমুখে রওনা হইল। কেহই বুঝিল না কি তার উদ্দেশ্য,—সকলেই ভাবিল চাকরির উমেদারী।

তারপর মাতার মন্ত্রতন্ত্র ও আশীর্ব্বাদের রক্ষা কবচ ছিন্ন করিয়া যখন ঝড়ের মধ্যে নৌকা ডুবিল, গোবিন্দ তখন চীৎকার করিয়া উঠিল, 'সব গেল—'

পরদিন যখন চক্ষু মেলিল, গোবিন্দ দেখিল—তরুণ সূর্য্যের সোনালি রশ্মি তাহার চখে মুখে ও শয্যায় লুটাইয়া পড়িয়াছে। মস্তকোপরি উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়া থির থির করিয়া শীতল বাতাস, তাহার সকল শরীর জুড়াইয়া পালঙ্কোপরি সুচারু মিহি চাঁদনি কাঁপাইয়া সুসজ্জিত কক্ষময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মাথা তুলিতেই গোবিন্দ দেখিল, মাথার উপরে প্রশান্ত সুনীল নদীবক্ষে ধীরে ধীরে সূর্য্যদেব উঠিতেছেন।

পার্শ্বোপবিষ্ট বৃদ্ধকবি ধীর নম্রকণ্ঠে বলিলেন, "যুবক, তুমি এখনও সুস্থ হও নি ;—আরও নিদ্রা যাও।"

গোবিন্দ ধীরে ধীরে তাহার মস্তক নামাইয়া বিস্ময়-দৃষ্টিতে কবির দিকে চাহিয়া রহিল। পরে নিম্ন ও অস্পষ্টস্বরে বলিল, "আমি কোথায় ?—আমার মাঝি বেঁচেছে ?"

কবি তেমনিভাবে বলিলেন, "তুমি ঘুমোও,—ও সব কথা পরে হবে।" গোবিন্দ ধীরে ধীরে আবার বলিল, "এখন আর ঘুম হবে না।" তখন বৃদ্ধ ডাকিলেন, "মস্‌জিনা!" মস্‌জিনা আসিয়া পিতার হস্তে ঔষধপাত্র দিয়া অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। গোবিন্দ কবির হস্ত হইতে সসম্মানে ঔষধপাত্র গ্রহণ করিয়া পাত্রস্থ ঔষধ গলাধঃ করিল। পরে বৃদ্ধ বলিলেন, "যাও মস্‌জিনা, একটুক ঘুমোওগে যাও,—সবটা রাত্রি জাগা।" মস্‌জিনা চলিয়া গেলে গোবিন্দ পূর্ব্বের মতই বিস্ময়ে কবির দিকে চাহিয়া বলিল, "তিনি বুঝি কা'ল সমস্ত রাত্রি আমার এখানে জাগা ছিলেন ?" বৃদ্ধ কোন উত্তর করিলেন না। গোবিন্দও গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল।

ঔষধের মাদকতায় গোবিন্দ অনেকক্ষণ অচেতন হইয়া রহিল। যখন জাগিল দেখিল কক্ষান্তরে সে নীত হইয়াছে। তাহারই শয্যাসংলগ্ন একখানা কৌচে আহার্য্যাদি সাজান রহিয়াছে। যথেষ্ট ক্ষুধা বোধ থাকা সত্ত্বেও ঐ সব স্পর্শ করিতে গোবিন্দ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তখনই এক পাচক আসিয়া বলিল, "হাতে খেতে পার্ব্বেন না বোধহয় ?" গোবিন্দ ধীরস্বরে উত্তর করিল "না, আমি অনেকটা সুস্থ—কিন্তু—"

"কিন্তু কি বাবু ?"

"কিন্তু—আমি যে ব্রাহ্মণ ?"

"সন্ধ্যা আহ্নিক কর্ত্তে পার্ব্বেন কি ?"

"——— তুমি ব্রাহ্মণ ?"

"হাঁ।"

"তোমার জা'ত যায় নি ?"

"সে কি বাবু"

"আমার যায়নি ?" "না,—ওকথা বল্‌ছেন কেন ?" "এঁরা কি ব্রাহ্মণ ?—এঁরা ত ব্রাহ্মণ নন!" "তা নন বটে ; কিন্তু আমরা ব্রাহ্মণ, আমাদের আলাহেদা বজরা,—এ হাকিম সাহেবের, তিনি হিন্দু ব্রাহ্মণ। আপনার কোন

ভয় নেই।” গোবিন্দ তখন অর্দ্ধোত্থানাবস্থায় আহারে প্রবৃত্ত হইল। আহার করিতে করিতে বলিল, “এঁরা কারা আমার জীবন দান দিয়েছেন?” পাচক বলিল, “রাজকবি ও তাঁর কন্যা।” গোবিন্দ কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, “আমরা এখন কোথায়?” “নগরের ঘাটে।” “এখনও যে নগরে যাওয়া হয় নি?” “আপনি একটুক্ সেরে উঠ্‌লে যাবেন।” গোবিন্দ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, “এ ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ দয়া।”

(৩)

তিনদিন কাটিয়া গিয়াছে। গোবিন্দ প্রায় সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। মস্‌জিনার ঐকান্তিক যত্নে ও বৃদ্ধ কবির সাগ্রহ তত্ত্বাবধানে পুনর্জ্জীবন ও পূর্ব্বস্বাস্থ্য লাভ করিয়াছে। সন্ধ্যাহ্নিক সম্পন্ন করিয়া যখন গোবিন্দ গতজীবনের ঘটনাবলী মনে করিয়া কণ্টকিত হইতেছিল,—যখন তাহার সযত্ন-রচিত তস্‌বির, শ্রমলব্ধ তুলিকাগুলির কথা ভাবিয়া নৈরাশ্য ও হাহাকার হৃদয়খানিকে কাঁটার মত সহস্র বিদ্ধ করিতেছিল,—তখন একজন খোট্টা আসিয়া খবর দিল, কবিসাহেব সেলাম দিয়াছেন।

গোবিন্দ অমনই কবির বজরায় উপস্থিত হইল। কক্ষে ঢুকিয়াই দেখিল, কবি একখানি সুসজ্জিত পালঙ্কে উপবিষ্ট; আর পিতার পিছনে একখানি পুস্তক নিয়া অর্দ্ধশায়িতা মস্‌জিনা। দীপাধারে গন্ধদীপ জ্বলিতেছিল। উজ্জ্বল আলোকে সুসজ্জিত কক্ষের সুচারু কারুকার্য্যগুলি স্পষ্ট ও উজ্জ্বলতর দেখাইতেছিল। গোবিন্দ অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইলে কবি একখানা কৌচ নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, “ব’স।”

গোবিন্দ উপবেশন করিল। কবি আবার বলিলেন, “সুস্থ আছ ত?” গোবিন্দ উত্তর দিল, “হাঁ, অনেকটা সুস্থ।” কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গোবিন্দ বলিল, “আপনাদের কাছে আমি বড় ঋণী।” কতক্ষণ কেহ কোন কথা বলিল না। পরে গোবিন্দ নিঝুম স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আবার বলিল, “এখন আমি অন্যত্র যাইতে পারি।—আমাকে এখন বিদায় দিন।” বৃদ্ধ কবি কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন কোথায় যাবে?” “কোন নিশ্চয়তা নেই।” “সে কি, তুমি কোথাও যাচ্ছিলে না?” “হাঁ—কিন্তু”—বলিতেই গোবিন্দের স্বর ভার হইয়া উঠিল। মস্‌জিনা পুস্তক হইতে মুখ সরাইয়া গোবিন্দের দিকে চাহিল। কবি ঔৎসুক্যভরে জিজ্ঞাসা করিলেন “কিন্তু কি?—দ্বিধা ক’রোনা, বল।” গোবিন্দ ভরা ভরা গলায়ই বলিল, “না,—আমার সেখানে—যাওয়া হবে না।” “কেন হবে না? কোথায় যাচ্ছিলে?” “নবাব সরকারে।—কিন্তু আমার পরিচিত হ’বার সম্বলটুকু কেড়ে নিয়ে ঈশ্বর আমার অভিমান ও গর্ব্বের শেষ ক’রে দিয়েছেন।”

এই দিব্যকান্তি দীর্ঘকায় যুবকের আবেগ প্রমত্ত কণ্ঠস্বরে কবির হৃদয় মন্ত্রমুগ্ধ ফণীর মত ধীরে ধীরে আবিষ্ট হইয়া আসিতেছিল। কবি মুগ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নষ্টোদ্ধারের কি কোন প্রতিকার নেই?” “হাঁ আছে,—কিন্তু তা কেমন করে হ’বে?—আর ব্যর্থতায় ও নৈরাশ্যে আমার হৃদয় ভেঙ্গে গেছে। অত শক্তি আর হ’বে কি?”

মস্‌জিনা পিতার মুখের কাছে মুখ আনিয়া বলিল “কেন বাবা, তুমি ও’কে পরিচিত করে দিতে পার্ব্বে না?” গোবিন্দ অমনই ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল, “না, না,—তা’ হবে না। আপনাদের যথেষ্ট অনুগ্রহ আমি গ্রহণ করেছি, কিন্তু এ অনুগ্রহ গ্রহণ করা আমার অসাধ্য। আমাকে ক্ষমা করুন।”

যুবকের কণ্ঠস্বরে ও দীর্ঘদেহের সগর্ব্ব উত্তেজিত ভঙ্গিতে বৃদ্ধ হৃদয়ের কোন পুরাতন একটা তার যেন ঝনু করিয়া বাজিয়া উঠিল। বৃদ্ধ মুগ্ধবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে তুমি যুবক?”

গোবিন্দ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল; কি যেন বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া কবি বলিয়া উঠিলেন, “আমি যদি কোন উপকার করে থাকি, তবে মনে কর যুবক।”

তখন গোবিন্দ সলজ্জ নম্রকণ্ঠে বলিল, “আমার পিতা ছিলেন রাজশিল্পী লক্ষণ শর্ম্মা।”

কবি মুহূর্ত্তে উল্কাবেগে ছুটিয়া গিয়া গোবিন্দকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, “তোমার নাম?” গোবিন্দ লজ্জায় মাথা নোয়াইয়া বলিল, “গোবিন্দ।”

বৃদ্ধ তখন গোবিন্দকে নিয়া নিজের শয্যাপার্শ্বে বসিলেন। কতক্ষণ মৌনভাবে চিন্তা করিতে করিতে তাহার নয়নকোণে দুইবিন্দু অশ্রু দেখা দিল। কবি গদ্‌গদকণ্ঠে ডাকিলেন, “মস্‌জিনা—”

মস্‌জিনা এতক্ষণ স্বপ্নাবিষ্টের মত তাহাদের দিকে চাহিয়াছিল। সে যেন এক অভিনয়মঞ্চে আত্মহারা হইয়া তার ইন্দ্রজাল-মোহে মুগ্ধ হইয়া বাস্তব জগৎ ভুলিয়া গিয়াছিল। পিতার কণ্ঠস্বর তাহার কাণে পৌঁছিল না। পিতা আবার ডাকিলেন, "মস্‌জিনা!"

মস্‌জিনা উত্তর করিল "কি বাবা?" "মনে পড়ে মস্‌জিনা?" কবির নয়নপ্রান্ত হইতে জল ঝরিয়া পড়িল। মস্‌জিনা পিতার কণ্ঠ জড়াইয়া ভরাভরা গলায় বলিল, "কি বাবা? তুমি কাঁদ্‌ছ!"

কবি তেমনই গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন, "মনে পড়ে কন্যা তোর দাদার কথা?" মস্‌জিনার চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল। কবি বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "আজ যদি সে বেঁচে থাক্‌ত, তবে এত বড়টি হ'ত মস্‌জিনা। এমনি করে আমার বুক জড়িয়ে থাক্‌ত, এমনই গর্ব্বিত ভঙ্গিতে আমার পিতৃ-হৃদয়ে স্নেহের স্রোত বহাত।" কবি পরে গোবিন্দের দিকে ফিরিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "গোবিন্দ, তুমি আমার পুত্রস্থান অধিকার ক'রেছ। তোমার পিতা আমার বড় বন্ধু ছিলেন। তোমাকে আমি কখনও ভুল্‌তে পার্ব্বো না।"

গোবিন্দ সানন্দদৃষ্টিতে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "এ আমার পরম সৌভাগ্য, অফুরন্ত গৌরব, অটুট সম্মান।"

তখন কবি ধীরে ধীরে মস্‌জিনার হাতখানি অন্য হাতে ধরিয়া বলিলেন, "মস্‌জিনা, এ তোর বড় ভাই। একে সোদরের সম্মান দিস্ মস্‌জিনা।"

মস্‌জিনা চমকিয়া উঠিয়া মলিনমুখে অন্য হাতে বইখানি সজোরে টানিয়া নিল।

(৪)

গোবিন্দ কবির সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও পিতৃগৌরব রক্ষার উপযোগী না হওয়া পর্য্যন্ত নবাবসরকারে উপস্থিত হইতে স্বীকৃত হইল না। বৃদ্ধ কবি পরে অনন্যোপায় হইয়া গোবিন্দকে মস্‌জিনার চিত্রশিক্ষকরূপে রাখিবার যথোচিত বন্দোবস্ত করিলেন। গোবিন্দ লুপ্তোদ্ধারের এরূপ সুযোগ এবং এত বড় আশ্রয়টাকে তুচ্ছ করিতে পারিল না। আর এ সংসারের আত্মীয়তাটা ছিন্ন করিতেও সে ব্যথা পাইল। দিন দিনই যেন একটা গুপ্ত সজীব আকর্ষণ ইহাদিগের সহিত তাহাকে জড়াইয়া দিতেছিল।

গোবিন্দ দিনরাত্রিই প্রায় চিত্রানুশীলনে ব্যতিব্যস্ত। এ মদিরা তাহাকে বিহ্বল করিয়া রাখিত। কতকগুলি লোক নিজের মনোমত কাজ পাইলে বাহ্যজগৎ ভুলিয়া যাইতে পারে—গোবিন্দ তাহাদেরই একজন। মস্‌জিনা আসিত; কতক্ষণ তুলি নিয়া নাড়াচাড়া করিয়া দুই একটি আঁক দিত। পরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া গোবিন্দের চিত্র-নৈপুণ্য দর্শন করিত। অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া যখন দেখিত গোবিন্দের কোন সাড়াশব্দ নাই তখন বলিত, "আমাকে শেখাবে না?" গোবিন্দ মাথা না তুলিয়াই বলিত, "হাঁ, ব'স।" কিন্তু এমনই করিয়া আরও এক ঘণ্টা কাটিয়া যাইত।

আজও মস্‌জিনা "ছাই কিছু হ'ল না" বলিয়া তুলি ছুড়িয়া ফেলিয়া গোবিন্দের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। কতক্ষণ গোবিন্দের কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া পরে জোরে তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে বলিল, "বেশ দেখবে না বুঝি?" গোবিন্দ ফিরিয়া চাহিয়া পরে বলিল, "কি—হ'ল না?" মস্‌জিনা গম্ভীরস্বরে বলিল, "ছাই হ'য়েছে।"

তখন গোবিন্দ হাতে ধরিয়া মস্‌জিনাকে দেখাইয়া দিল। দুই তিন বার দেখান সত্ত্বেও যখন মস্‌জিনা সফল হইল না, তখন গোবিন্দ সরোষে হাতখানি ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "তোমার কিছু হ'বে না।" মস্‌জিনা গোবিন্দের অলক্ষ্যে মুচকি হাসিয়া বলিল, "কেন?"

গোবিন্দ নিজের ছবির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তেমনই ভাবে বলিল, "মাথা নাই ত' হবে কি ক'রে?"

মস্‌জিনা নিজের মস্তক লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া বলিল, "তবে এটা কি?" "একটা শূন্য খুলি।" "তবে ঐ দিনের কবিতাটির অত তারিপ কর্চ্ছিলে, কেন? সে ত এই শূন্য খুলি হ'তেই বেরিয়েছিল।"

গোবিন্দ কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "তোমার মত অমনোযোগী দু'টি সংসারে নেই।"

মস্‌জিনা আবার হাসিয়া বলিল, "তাই বুঝি তোমার চিত্রের কাছে অমনি করে দাঁড়িয়ে থাকি?" "তা হ'লেও—তোমার শিখবার একটুকুও একাগ্রতা নেই।" "তোমার মত বিহ্বল হ'য়ে থাক্‌তে বল বুঝি? যে যেমন ভালবাসে, অন্যকেও তেমন দেখলেই সুখী হয়।"

গোবিন্দ অপেক্ষাকৃত গম্ভীরস্বরে বলিল, "তা বেশ, থাক এখন—এ তর্কশাস্ত্র অনুশীলনের সময় নয়।"

মস্‌জিনা মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল, "কিন্তু——"

গোবিন্দ ক্রমেই উষ্ণ হইয়া উঠিতেছিল। সে অমনই বলিল, "তোমার কিন্তুর আর দরকার নাই। কিছু করবে ত কর।" মস্‌জিনা পূর্ব্ববৎ হাসিয়া বলিল "নয় ত——"

গোবিন্দ আর কোন উত্তর করিল না। গম্ভীরভাবে নিজের কার্য্যে মনোনিবেশ করিল। ইহা দেখিয়া মস্‌জিনা কপট ক্রোধে চিৎকার করিয়া বলিল, "কিছু করব না" গোবিন্দ অমনি চট্ করিয়া সাগ্রহে বলিল "তা হ'লে যাবে এখন?"

মস্‌জিনা তেমনইভাবে বলিল "না,—আমার পারা না পারার একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না ক'রে যাচ্ছি না।"

গোবিন্দ অমনি সকল সরঞ্জাম তুলিয়া রাখিল। পরে চাদরখানা টানিয়া নিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "আর একদিন হ'বে; আমার বাইরে দরকার আছে এখন।" এই বলিয়া সে গমনোদ্যত হইল। মস্‌জিনা অমনি দুয়ার আগলিয়া দাঁড়াইয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল। গোবিন্দ ক্রোধভরে রক্ত নয়নে বলিল, "এসব কি মস্‌জিনা?" মস্‌জিনা তেমনই হাসিতে হাসিতে বলিল "কি?" গোবিন্দ আরও রুক্ষস্বরে বলিল, "এ হাসি তামাসা—?" "তোমার শিক্ষকতার পটুতা দেখে।" এই বলিয়া মস্‌জিনা আবার হাসিতে লাগিল। গোবিন্দ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তীব্রকণ্ঠে বলিল "মনে পড়ে মস্‌জিনা?" "কি?" গোবিন্দ গম্ভীরস্বরে বলিল, "আমি তোমার বড় ভাই।"

শুনিয়া মস্‌জিনার মুখ একটুকু মলিন হইল। কিন্তু চকিতে পূর্ব্বভাব ফিরাইয়া আনিয়া বলিল, "পড়ে,—তা কি হবে?" "তবুও এ হাসি, তামাসা?" মস্‌জিনা স্থিরস্বরে বলিল, "আর করব না।" "তবে দোর ছেড়ে দাও।"

মস্‌জিনা জলদগম্ভীরস্বরে, "তোমার আর যেতে হ'বে না, আমিই যাচ্ছি—" এই বলিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেল।

(৫)

পাঁচ ছয়দিন কাটিয়া গিয়াছে। মস্‌জিনা আর গোবিন্দের কাছে যায় নাই। এরূপ মাঝে মাঝে প্রায়ই বাদ হয় বলিয়া গোবিন্দ দুই তিন দিন খেয়ালের মধ্যেই আনে নাই। বিশেষতঃ অত লক্ষ্যও তাহার নাই। তারপর মস্‌জিনাকে একেবারে না দেখিতে পাইয়া অসুখ করিয়াছে ভাবিয়া এক দিন তাহার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। মস্‌জিনা একখানা পুস্তক নিয়া শয়িতা অবস্থায় পড়িতেছিল। গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কোন অসুখ ক'রেছে মস্‌জিনা?"

মস্‌জিনা পুস্তক হইতে মুখ না সরাইয়াই বলিল, "না, কিছু না।" "তুমি ক দিন যাওনি—" মস্‌জিনা পূর্ব্ববৎ গম্ভীরস্বরে বলিল, "তা জানি।" "আর যাবে না?" "না——।"

গোবিন্দ মৃদু হাসিয়া বলিল "রাগ ক'রেছ?" সে মস্‌জিনার কক্ষে আসিয়াই লক্ষ্য করিয়াছিল,—তুলিগুলো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; কোনটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; কোনটা বা ময়লা পড়িয়া বিকৃত হইয়া রহিয়াছে। রঙ্গের সরঞ্জামগুলিরও একই দশা। সকলই বুঝিয়া কোমল হাস্যে ও নম্রকণ্ঠে গোবিন্দ বলিল, "ছিঃ বোন্! রাগ ক'রতে আছে?"

মস্‌জিনা একটু কঠোরস্বরে বলিল "যাও,—আর মোলায়েম কণ্ঠে হ'বে না।" গোবিন্দ বিস্মিতভাবে বলিল "সে কি?"

মস্‌জিনা কতক্ষণ মৌন থাকিয়া আবার তেমনই কণ্ঠে বলিল "দিনে দু'শবার ভাই বোন্ কথা কাণে না সেধোলেও বোধ হয় ঐ সম্পর্কটা উল্টে যাবে না।" গোবিন্দ স্থির ও তিক্তকণ্ঠে উত্তর করিল, "তা আমার অত স্পর্দ্ধা করাই অন্যায় বটে।"

কতক্ষণ উভয়েই চুপ করিয়া রহিল। পরে গোবিন্দ শান্ত ও স্থিরকণ্ঠে বলিল, "তুমি আর যাবে না তবে?" মস্‌জিনা চুপ করিয়াই রহিল। গোবিন্দ কোন উত্তর না পাইয়া কহিল, "তবে আর আমার এখানে প্রয়োজন কি?" এই বলিয়া দ্রুত নিজগৃহে চলিয়া গেল।

গোবিন্দ গৃহে আসিয়া আলোটা নিভাইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। ক্রমে তাহার অতীত ও বর্ত্তমান জীবনের ঘটনাবলী স্রোতের ঢেউয়ের মত একটির পর একটি আসিয়া তার হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। পিতার গৌরব ও সম্মান, শান্ত মাতার স্নিগ্ধ স্নেহাশীর্ব্বাদ এবং কবির অনুগ্রহ ও করুণা সব যেন একাকার হইয়া তাহার চক্ষের সম্মুখে একটা রহস্যজগৎ সৃষ্টি করিল। কিন্তু আজিকার কথা মনে হইতেই তার বড় অস্বস্তি জাগিয়া উঠিল। তার তস্‌বিরগুলি এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই; নবাবসরকারে পরিচিত না হইয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইয়াই বা কি হইবে? আর এখানেই বা অন্যত্র কে তাহাকে আশ্রয় দিবে? ইত্যাদি অনেক কথা ভাবিতে ভাবিতে আরও তার মনে হইল, কবি সাহেবের

আশ্রয়ে থাকিয়া নিজকে যতটা বড় মনে করিয়াছিল, সে তত বড় নয়। নিজকে যত মূল্যবান্ বলিয়া সে মনে করে, তাহার মূল্য তদপেক্ষা অনেক কম। এই সব চিন্তা করিতে করিতে জুতা জামা সহিতই সে ঘুমাইয়া পড়িল।

গোবিন্দ মস্‌জিনার নিকট হইতে চলিয়া আসিলে সহসা মস্‌জিনার মাথায় খেলিল, "কাজটা ভাল হয় নাই।" কতক্ষণ ভাবিতে ভাবিতে বুঝিল, সবচেয়ে যে বড় অত্যাচারটা সে তা'র উপর করিতে পারে, আজ খেয়াল বশতঃ সেইটাই সে করিয়া বসিয়াছে। বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পায়চারি করিতে করিতে তাহার প্রতিকারের উপায় ভাবিতে লাগিল। গোবিন্দের অভিমানী হৃদয় তাহার সম্পূর্ণ অজেয়। নিজের উন্নত মস্তক নত করিতে কিছুতেই সে রাজি নয়। এই সব ভাবিতে ভাবিতে সে গোবিন্দের দুয়ার-গোড়ায় যাইয়া উপস্থিত হইল। ঘর অন্ধকার দেখিতেই তাহার বুক দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। অমনই ছুটিয়া যাইয়া নিজেই আলো নিয়া আসিল। ঘরে ঢুকিতেই দেখিল গোবিন্দ নিদ্রিত; দেখিয়া আশ্বস্ত হইল। কিন্তু অমন অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাহাদেরই অনুগৃহীত নিঃস্ব প্রবাসী যুবকের এর চেয়েও দুরবস্থার কথা মনে হইতেই সহানুভূতিতে তাহার হৃদয় গলিয়া গেল।

সে অমনই ত্বরিতপদে পিতার গৃহে গেল। কবি অর্দ্ধশয়িতাবস্থায় কি চিন্তা করিতেছিলেন, মস্‌জিনা যাইয়া পিতার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিল। পরে ধীরে ধীরে পিতার মুখের কাছে মুখ আনিয়া আব্দারের স্বরে বলিল, "বাবা, আমি আর চিত্র শিখ্‌ব না।" বৃদ্ধ কন্যার মাথায় হাত দিয়া মৃদু হাস্যে বলিলেন, "কেন রে মস্‌জিনা?" "চোখটা যেন কয়দিন ধ'রে কেমন কন্ কন্ কর্‌ছে।" বৃদ্ধ ব্যস্তসমস্ত ভাবে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অ্যাঁ – এতদিন বলিস্‌নি! হাকিমকে খবর দিই?" "না বাবা, আমি ঔষধ ব্যবহার কর্‌ছি। কিন্তু——" "কিন্তু কি মস্‌জিনা?" "গোবিন্দ বোধ হয় থাক্‌বে না তবে।" কবি স্থির-স্বরে বলিল, "কেন?" "না, সে বলে তবে আর আমার প্রয়োজন কি? সে হয়ত কালই বা চলে যায়।"

বৃদ্ধ অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া পরে বলিলেন, "আমাকে কিছু কর্‌তে বল?" "তুমি তা'কে বুঝিয়ে বলে থাক্‌তে অনুরোধ ক'র। তোমার অনুরোধ হয় ত ঠেল্‌তে পার্‌বে না।" বৃদ্ধ ধীরে ধীরে বলিলেন, "ও'র আত্ম-সম্মান বোধ বড় বেশী। —আচ্ছা, ব'লে দেখব।"

গোবিন্দ সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া নিজের সাজসরঞ্জামগুলি গুছাইতেছিল, হঠাৎ কবিকে তাহার কক্ষে উপস্থিত দেখিয়া ব্যস্তসমস্তভাবে সসম্মানে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাড়াইল। বৃদ্ধ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "মস্‌জিনার চোখ্‌টা ভাল না; তার এখন একাজ না করাই ভাল।" গোবিন্দ ধীরে ধীরে বলিল "হাঁ, তাই সঙ্গত। কিন্তু মস্‌জিনা ত এ বিষয় কিছু বলে নি।" বৃদ্ধ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে নিজের ঘরের দিকে ফিরিলেন। তখন গোবিন্দ আর একটুক্ সম্মুখে সরিয়া বলিল, "আমি কালই যেতে চাই।" "সে কি?" "হাঁ, আমার আর দরকার কি?" "তা তুমি যাবে কোথা? এখানে থাক্‌তে কিছু বাধা আছে কি?" "ক্ষমা কর্‌বেন, আপনার ঋণ জন্মান্তরেও অপরিশোধনীয়। আর আমার উপরে ঋণের বোঝা চাপাবেন না।"

বৃদ্ধ ভরা ভরা গলায় বলিলেন, "কিন্তু গোবিন্দ তোমাকে যে আমি পুত্রের স্নেহই দিয়ে আস্‌ছি—"

গোবিন্দ বৃদ্ধের হাঁটুর কাছে বসিয়া গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিল, "আমি সেই অধিকারেই আপনার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা কর্‌ছি; —আমি যেন নিজের অন্ন সংস্থানের উপযুক্ত হই। পিতারও ত উচিত ছেলেকে আত্মনির্ভরশীল হ'তে দেওয়া।" বৃদ্ধ গোবিন্দকে হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, "তবে যে কয়দিন কোন যোগাড় না হয়, ততদিন থাক।" গোবিন্দ এই কথায় সম্মতি জানাইলে বৃদ্ধ ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

পরদিন মস্‌জিনা খুব ভোরে নূতন তুলি ও রং নিয়া গোবিন্দের গৃহে হাজির হইল। চিত্রবিদ্যায় মনঃসংযোগ করিল। গোবিন্দ ঘরে ঢুকিয়া অবাক্ হইয়া বলিল, "একি মস্‌জিনা, তুমি এখানে?" মস্‌জিনা গম্ভীরভাবে বলিল "হাঁ এই জায়গাটুকু একটু দেখিয়ে দাও ত।" "না তোমার এ কাজে আর দরকার নেই।" "কেন?" "তোমার চোখ ভাল নয়।" "কে বল্‌লে?" "তোমার বাবা।" "না, ও কিছু নয়।" "সে কি?" মস্‌জিনা গলার স্বরে জোর দিয়া বলিল, "নয় বল্‌ছি তবুও? যা'র গা তা'রই বোধ হয় বাথা বেশী জান্‌বার কথা।" "তা বটে, তবে কি তিনি—" গোবিন্দ একথা বলিতেই মস্‌জিনা মুখটাকে একটুকু বিকৃত

করিয়া তীব্র কণ্ঠে বলিল, "অত জবাবদিহি আমি কর্ত্তে পারব না।" "কিন্তু—" "কিন্তু কি?" গোবিন্দ কতক্ষণ চুপ করিয়া চিন্তা করিয়া পরে বলিল "আর কাউকেও খুঁজে নাও, আমার অসাধ্য।" "কেন?" গোবিন্দ স্থির স্বরে উত্তর করিল "ক্ষমা কর, এ বিষয়ে আর কিছু আমার জবাব নেই।"

মস্‌জিনার স্বর ক্রমেই শান্ত ও গম্ভীর হইয়া উঠিতেছিল। ধীরে ধীরে হাত হইতে তুলি রাখিয়া দিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি থাক্‌বে না?" গোবিন্দ দৃঢ়স্বরে বলিল "আমার থাকা অসম্ভব।" পরে মস্‌জিনা অসম্ভব ভারি গলায় বলিয়া উঠিল, "মনে কর গোবিন্দ সেই দিনের কথা।" "কোন দিনের?" "সেই ঝড়ের দিনের।"

গোবিন্দ শুনিয়াই চমকিয়া উঠিল। ব্যথিত স্বরে বলিল "ক্ষমাকর মস্‌জিনা—আমি বড় অকৃতজ্ঞ।" মস্‌জিনা কিছু বলিল না,—দ্রুত ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

* * * *

(৬)

তিন দিন ঘুরিয়াও যখন কোন সংস্থান হইল না, তখন গোবিন্দ অনন্যোপায় হইয়া অসম্পূর্ণ তস্‌বির নিয়াই পরীক্ষার্থ রাজ-সরকারে উপস্থিত হইতে কৃত-সঙ্কল্প হইল। চতুর্থ দিন আশা ও নৈরাশ্য নিয়া গোবিন্দ রাজ-সরকারে উপস্থিত হইল। তাহারা তসবির গ্রহণান্তে বলিল, তিন দিন পরে ইহার ফলাফল জানা যাইবে। এই কয় দিন সে রাজ অনুগ্রহের আশ্রয়ে থাকিতে পারে। গোবিন্দ আশাতীত সম্মান ও সৎ ব্যবহার লাভ করিয়া আনন্দিত হইল। পরে কবি ও মস্‌জিনার নিকট কাতর অনুরোধে বিদায় লইয়া নির্দ্দিষ্ট বাস-ভবনে আসিয়া স্থান লইল।

তিনদিন পরে ঘোষিত হইল, রাজশিল্পী লক্ষ্মীকান্ত শর্ম্মার পুত্র পরীক্ষান্তে রাজ-শিল্পীর পদ লাভ করিয়াছে। যখন কবি ও মস্‌জিনা বসিয়া গোবিন্দের সফলতায় হর্ষ প্রকাশ করিতে-ছিল, তখন গোবিন্দ ঝড়ের মত ঘরে ঢুকিয়া কবির কর-চুম্বন করিতে করিতে আকুল-আবেগে বলিতে লাগিল, "আমার সফলতা আপনারই দৌলতে। এ গৌরবমুকুট আপনারই দান।" কবি আনন্দে আত্মহারা হইয়া গোবিন্দকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিতে করিতে বলিলেন, "তুমি আমার মাথার মণি। ওকথা কেন বল্‌ছ?"

গোবিন্দ তখন মস্‌জিনার দিকে চাহিল। আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। সে অর্দ্ধোচ্চারিত স্বরে বলিল, "মস্‌জিনা!" মস্‌জিনার নয়ন কোণে অশ্রু দেখা দিল। গোবিন্দ আকুল কণ্ঠে বলিল, "মস্‌জিনা—তোমার চোখে জল!" মস্‌জিনা চক্ষু ঢাকিয়া বলিল, "না ও কিছু নয়; চোখে যেন কি একটা পড়্‌ল।" কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মস্‌জিনা আবার বলিল, "তুমি ত আমাদের ছেড়ে যাচ্ছ?" এই বলিয়া সে মুখ লুকাইল। গোবিন্দ ধীরে ধীরে বলিল, "মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমাদের ছাড়তে পারব না মস্‌জিনা।" "তবে আমাকে পূর্ব্ব অধিকার হ'তে বঞ্চিত করবে না?" "কি অধিকার?" "আমি তোমার শিষ্যা।" গোবিন্দ হাসিতে হাসিতে বলিল "এত আমার মঙ্গল-নির্ম্মাল্য।"

* * * *

তারপর কতদিন চলিয়া গিয়াছে। কোন কোন দিন গোবিন্দও আসিয়া মস্‌জিনাকে চিত্র দেখাইয়া যায়। কোন দিন মস্‌জিনাও সেখানে যাইয়া উপস্থিত হয়। যেদিনই মস্‌জিনা আসে, সে দিনই হাসি গল্পে সময় কাটাইয়া দেয়, না করে নিজের কাজ, না দেয় গোবিন্দকে কিছু করিতে। আজও তেমনি হাসি গল্প হইতেছিল,—গল্পেগল্পে তর্কও অনেক উঠিল। কতক্ষণ পরে গোবিন্দ বলিয়া উঠিল, "না, এবার ছাড় মস্‌জিনা। এসব তর্কে আমার রুচি নেই।" "এ দুটো কথার উত্তর দিতেই হ'বে। বল ইস্‌লাম ধর্ম্ম, তোমার ধর্ম্মের চেয়ে ছোট মনে কর কি না।" গোবিন্দ হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি ত পূর্ব্বেই বলেছি, এ দু'টো ধর্ম্মকে কখনও তুলনার চোখে দেখিনি। দেখা দরকারও মনে করিনি। বিশেষতঃ নিজেরটাই রতি পরিমাণও ভাবি না।" "কিন্তু আমি দেখ্‌ছি তুমি গোঁড়া হিন্দু। একবারও কি কোন কিছু ভাব না?" "দরকার?" "বিশ্বাসের ভিত্তি দৃঢ় করবার জন্য—" "যার দৃঢ় বিশ্বাস আছে তা'র তর্কের প্রয়োজন কি? তর্ক ত বিশ্বাসের জন্যই।" মসজিনা কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "মানি তোমার ধর্ম্ম মহৎ তোমা-দের বিশ্বাস অটুট। কিন্তু এ কি রকম ধারা—পতিতের উদ্ধার নেই; অন্যকে বুকে তুলে নেয় না!" "কিন্তু জানত মস্‌জিনা, সব জিনিসের নষ্টোদ্ধার হয় না—এ জিনিসটারও তাই। কক্ষচ্যুত নক্ষত্র আর কক্ষগত হয় না। আর

পৃথিবীর অনেক জিনিষ একে অন্যের সহিত মিশে না।" "কিন্তু পতিতকে মহৎই উদ্ধার করে।" "তা করে বটে,— আমার নিকট হ'তে আর একটি কথাও পাবে না।" এই বলিয়া গোবিন্দ গোঁ ধরিয়া বসিয়া আবার চিত্রবিদ্যায় মন দিল। মস্‌জিনা আরও দুই চারি কথা বলিল, দুই চারিটি ডাক দিল। কিন্তু গোবিন্দ কোন উত্তর দিল না। তখন মসজিনা উঠিয়া যাইয়া গোবিন্দের হাত হইতে তুলিটা কাড়িয়া নিয়া বলিল, "উত্তর দেবে না?" গোবিন্দ গম্ভীরভাবে আর একটি তুলি হাতে নিয়া দৃঢ় স্বরে বলিল, "না—" মস্‌জিনা তখন ছবিখানা হেচ্‌কা টানে নিয়া গেল। ছবিখানা টানিয়া নিতেই গোবিন্দের হস্তস্থিত তুলিকার একটা মোটা টান উহার উপর পড়িয়া গেল। গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ ক্রোধে আগুন হইয়া মসজিনার হাত হইতে ছবি টান দিয়া নিয়া বহুমূল্য ছবিখানি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল, পরে বলিল, তুমি আমার উপর অত্যাচার করতে কম ক'রলে না।" মসজিনাও ক্ষুব্ধ ও কুপিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "তুমিও শাস্তি দিতে কম দিলে না।" এই বলিয়া আর কোন দিক না চাহিয়া সে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

(৭)

বৃদ্ধ কবির হঠাৎ মৃত্যুতে সহায়হীনা মসজিনা বড়ই বিহ্বল হইয়া পড়িল। বৃদ্ধের যে বুকভরা স্নেহ শতমুখী হইয়া মস্‌জিনার মাতার অভাব পূরণ করিয়াও জগতের সকল দুঃখ দৈন্য এবং অভাব অভিযোগকে দূরে সরাইয়া বিপুল শান্তি ও কোমলতায় তারে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল, সহসা সেই স্রোত বন্ধ হওয়ায় সমস্ত সংসারটা যেন মসজিনার নিকট শূন্য, নীরস ও আশ্রয়হীন বলিয়া বোধ হইল। সেই নিবিড় আঁধারে একটি মাত্র তারা জ্বলিয়া নিবিয়া ভরসায় ও নির্ভরসায় তাহাকে উজ্জীবিত করিতেছিল। কিন্তু সে তারা খুব স্পষ্ট হইলেও যে বহুদূর, তাহা মসজিনা সবখানি হৃদয় দিয়া অনুভব করিল। মস্‌জিনা তাই ভাবিতেছিল। তখন গোবিন্দ ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল।

গোবিন্দকে দেখিয়া মসজিনার ব্যথিত চিত্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ঝর্ ঝর্ করিয়া দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। গোবিন্দ ব্যথিত স্বরে কহিল, "এত আকুল হয়ে পড়লে মসজিনা! শান্ত না হ'লে নিজকে চালাবে কি করে? "কিন্তু গোবিন্দ! আমার ত সংসারে দুটি অবলম্বন ছিল না।" "তা কি করবে বোন্, তাইত তোমাকে বেশী স্থির হতে হবে, তোমার নিজকে যে নিজেই চালাতে হবে।" "তা বুঝি গোবিন্দ, কিন্তু এ দুর্ভাগ্যের সহিত কোন দিনও যে পরিচিত নই।" এই বলিয়া মসজিনা আবার মুখ ঢাকিল। পরে একটুক শান্ত হইলে আবার বলিল, "আমি যে ঘোর অন্ধকারে মহাসমুদ্রে ভাসমানা। সংসারে একেবারে একা,— মাথার একটা বিরাট বোঝা।" গোবিন্দ গম্ভীর ও গদ্‌গদ কণ্ঠে ডাকিল, "মসজিনা!" মসজিনা বিস্ময় দৃষ্টিতে গোবিন্দের দিকে চাহিল। গোবিন্দ বলিল, "আমি কি তোমার কেউ নই? কোন অধিকার কি আমাকে দিতে চাও না?" মসজিনা দুই হাতে মুখ ঢাকিল, অনেকক্ষণ কাঁদিল। চক্ষের জলে হাত ভাসিয়া গেল। গোবিন্দও নীরবে সাশ্রুনয়নে দাঁড়াইয়া রহিল।

কতক্ষণ পরে মসজিনা চক্ষের জল মুছিয়া বলিল, "তুমিই যে এখন আমার একমাত্র অবলম্বন ও আশ্রয়—তা বাবা ছেড়ে যাওয়ার পর মুহূর্ত্ত হ'তেই বুঝতে পারছি। কিন্তু এ দাবী কি তত জোরের?" "সে কি?" "এ দাবী কি বরাবরই তুমি গ্রাহ্য করে নেবে?" "যদি গ্রাহ্য করবার অধিকার না বাতিল হয় তবে হয়ত পারি, কিন্তু তুমি কি চিরদিন পারবে?" "যদি পারি——" গোবিন্দ কথা কাড়িয়া নিয়া বলিল, "তোমার পারারও দরকার নেই, আমাকেও যেন দু'দিন বই স্বীকার করতে না হয়।" মসজিনা কতকক্ষণ গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকিয়া শেষে ধীরে, অপেক্ষাকৃত শান্ত স্বরে বলিল, "তোমার বাড়ী যাওয়ার কথা ছিল--তোমার মা কেমন আছেন?" "মা একটুকু ভাল। বাড়ী একবার শীগ্‌গিরই যাব। কিন্তু তুমি একটুক সুস্থ না হ'লে যাই কি ক'রে? আর তোমাকে একা রেখেই বা কি করে যাই? "আমি ত অনেক ঠিক হ'য়েছি। এর চেয়ে ঠিক হ'তে পা'রব কি? তুমি একবার এস গিয়ে।" "তুমি একা থাকবে?" "চিরদিনই কি তুমি আমাকে আবুরে রাখ্‌তে পারবে?" "বেশী দিন দরকার হ'বে না।"

(৮)

চারি বৎসর পর আসিয়া গোবিন্দ মাতার চরণ বন্দনা করিল। এই দীর্ঘ কয় বৎসরের রুদ্ধ স্নেহাবেগ সহস্রধারায় গোবিন্দের উপর ঝরিয়া পড়িল। রাজ-সম্মানে অলঙ্কৃত গোবিন্দ গ্রামবাসীদিগের নিকটও আজ উচ্চ সম্মান পাইল।

গোবিন্দের ভাগ্যলক্ষ্মী যে সকলের অলক্ষ্যে তার গৌরব-মুকুট সম্পূর্ণ করিয়া হঠাৎ তাহার মস্তক এরূপভাবে শোভিত করিবে, ইহা কাহারও ধারণা ছিলনা। সকলেই বিস্মিত হৃদয়ে অতিরিক্ত প্রশংসায় ও সৌজন্যে গোবিন্দকে সম্বর্দ্ধনা করিল।

কিছুদিন পরে মাতা পুত্রকে বুকের কাছে টানিয়া নিয়া বলিলেন, "এবার বৌ ঘরে আন গোবিন্, আমি কনে ঠিক্ করেছি।" গোবিন্দ চিরদিনই মাতার অনুগত। সে শান্ত ও কোমল স্বরে উত্তর দিল "তোমার ইচ্ছাই আমার শুভ আশীর্ব্বাদ। কিন্তু মস্‌জিনার মত না নিয়ে কেমন করে হয়? আর এর আগে তারও একটা ব্যবস্থা করা দরকার।" "তা দরকার বটে কিন্তু তুমি কি শীগ্‌গির কোন ব্যবস্থা করতে পারবে?" গোবিন্দ কতক্ষণ চুপ করিয়া চিন্তা করিল,—পরে বলিল "শীগ্‌গির ত দূরের কথা,—করে উঠতে পারি কিনা তাই বা কে জানে?" "কিন্তু দেখ্‌ছ ত আমার স্বাস্থ্য, আমার ইচ্ছায় আর এখন বাধা দিও না।" গোবিন্দ চুপ করিয়া রহিল। মাতা আবার বলিলেন, "আমি মস্‌জিনার মত নিয়ে নিই, তুমি আর অমত ক'র না।" কতক্ষণ পরে গোবিন্দ চিন্তা করিতে করিতে বলিল, "কিন্তু মস্‌জিনাকে না জানিয়ে, না এনে কি করে হবে?" "তাইত, তা হ'বে কি ক'রে?" "তোমার সমাজে বাঁধবে না?" "সেই রকম বন্দোবস্ত করব। তবুও যদি সমাজ গোল করে ত আমি সমাজ চাই না। সমাজের চেয়ে আমার কাছে মস্‌জিনা অনেক বড়।" এই বলিয়া মাতা উঠিয়া গেলেন।

* * * *

যথাসময়ে মস্‌জিনার মত আসিলে পুত্রের সম্মতি-ক্রমে গোবিন্দের মাতা বিবাহের আয়োজন করিলেন। এদিকে গোবিন্দ নিজে যাইতে না পারায় মস্‌জিনাকে আনিবার জন্য বিশ্বস্ত লোক পাঠাইল।

বিবাহের দিন, সমাগত জনসঙ্ঘের মধ্যে নহবৎ বাজিয়া উঠিল। উৎসব-বাঁশরী প্রত্যেকের প্রাণে উল্লাসলহরী জাগাইয়া তুলিল। মাতার অদম্য-উৎসাহ ও বিপুল আয়োজন কিন্তু গোবিন্দের চক্ষের সম্মুখে কালিমাখা একখানি মলিন চিত্রপটের মত মনে হইতে লাগিল। জ্যোৎস্নামাখা সারা বিবাহ বাসরখানি যখন উৎসব আমোদে উন্মত্ত, তখন কেমন যেন একটা অবসাদ-মাখা করুণরাগিণী অস্পষ্টভাবে তাহার মনটিকে একটুক্ ম্লান করিয়া দিতেছিল। মস্‌জিনা এখনও আসে নাই; কোন খবরও নাই। মস্‌জিনার এরূপ অবস্থায় নিজে যাইয়া অনুমতি না লইয়া আসাতে গোবিন্দ নিজকে অপরাধী মনে করিতেছিল। এখনও মস্‌জিনা আসিতেছে না দেখিয়া তাহার অপরাধের গুরুত্ব যেন গভীরতর মনে হইতে লাগিল। আর মনে হইল 'ছোটবোন—সেই ত তার একমাত্র আশ্রয়।'

বিবাহের লগ্ন প্রায় উপস্থিত। গোবিন্দকে এখনই বিবাহ-অঙ্গণে যাইতে হইবে। এমন সময় রহিম একটা বাক্স গোবিন্দের পায়ের কাছে রাখিয়া সেলাম দিয়া তাহার হাতে একখানি পত্র দিল। গোবিন্দ ভীষণ উৎকণ্ঠায় কাগজখানি হাতে নিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "কিরে—মস্‌জিনা এল না?" "না, তিনি আজ মক্কা চলে গেলেন।" শুনিয়া গোবিন্দের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। সে ধীরে ধীরে পত্রখানি খুলিল। খুলিয়া দেখে একখানা উইল,—মস্‌জিনা সমস্ত সম্পত্তি তাহার নামে উইল করিয়া দিয়া গিয়াছে। পরে অধীর ভাবে বাক্স খুলিয়া দেখিল—বাক্সভরা মস্‌জিনার সমস্ত গহনা; তাহার উপর একটুক্‌রা কাগজে লেখা——'বৌদিকে দিও।'

সম্পূর্ণ

শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র সেন গুপ্ত।

মাতৃস্তন।

স্বর্গে যখন অধিকার লয়ে বাধিল রণ—
বৈরির করে শূন্য আলয় সঁপিয়া স্বর্গ লইয়া ধন
পলায়ে আসিল মর্ত্তে,
মাগিল একটু লুকাতে গোপন ঠাঁই—
রমণী কহিল—"আয় বুকে মোর, নিরাপদ আর এ চেয়ে নাই!
স্বর্গও গেল গর্ত্তে!

দুইটি কুম্ভ ভরিয়া রাখিয়া আপন ধন
স্নেহ-দুরু-দুরু মাতৃবক্ষে যক্ষের মত সারাটি ক্ষণ
জাগে বসি দিবারাত্রি !

মায়ের নয়নে রচিয়া তোরণদ্বার
ছদ্মবেশে এ ভ্রমিছে স্বর্গ স্নেহসেবারূপে জগমাঝার
হইয়া জননীধাত্রী।

স্বর্গে রহিল কেবলি শুষ্ক 'স্বর্গ' নাম ;
শুষ্ক নদীর বুকের মতন—যে নদী গিয়াছে সাগরধাম—
কঙ্করময় তপ্ত।

আসল স্বর্গ রচিল এ মন্দির—
ত্যক্ত স্বর্গে চলিতে লাগিল বিলাসনৃত্য কিন্নরীর
করি চির অভিশপ্ত।

সোমে ও আসবে উন্মাদ ওরা হারালজ্ঞান,
মাতৃস্তন্যে হেথায় মোদের বিকশি উঠিল নবীনপ্রাণ
দুখে দুখহরা-হর্ষে !

নিখিল প্রাণের অচল উদয়গিরি
মাতার উচ্চস্তন—এ তুষারশুভ্র অখিল অভ্রচিরি
অমৃত গঙ্গা বর্ষে।

রচিল ঋষিরা মায়ের মহিম ঋক্ ও শ্লোক,
সপ্তস্বর্গ শিরোভূষা করি থাপিল মহীর মাতৃলোক।
ধরণী হইল ধন্য !

স্নেহ-রসপীন মাতার যুগল স্তন
বিশ্বশিশুর মুখচুম্বিত সুধার সত্র চিরন্তন
ঢালে অকাতর স্তন্য।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

নারীধর্ম্ম।

কথাটা পুরাতন, কিন্তু অনেক পুরাতন কথাও আবার নূতন করিয়া মধ্যে মধ্যে আলোচনা করিতে হয়। পুরাতনের হিসাবে নারীধর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার মূল ভিত্তি বা আশ্রয় পাতিব্রত্য—অথবা আরও একটু সহজ এবং কম 'আপত্তিজনক' কথায় পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে স্বামীর অনুগতি। পুরুষ হইতে নারীজীবনের বিশিষ্টতা এবং সেই বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে নারীজীবনের যে বিশেষ ধর্ম্ম তাহা এই অনুগতিকে কেন্দ্র করিয়াই তার চারিদিকে গড়িয়া উঠিয়াছে।

প্রাচীনকাল হইতে সকল দেশের ভব্য সমাজেই ইহাই নারীধর্ম্মের অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকাশ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে এবং পারিবারিক জীবন নারীধর্ম্মের এই বিশিষ্টতার উপরেই আশ্রিত হইয়া আছে।

ইহা যে কেবল ভারতে হিন্দুসমাজেই দেখা যায়, তা নয় ;—পৃথিবীর সকল দেশের সকল সমাজের নারীজীবনেই এই অনুগতির রীতি ও ব্যবস্থা অল্পবিস্তর আছে। এই অনুগতির প্রধান পরিচায়ক লক্ষণই এই, যে নারী বিবাহের পর স্বামীর গোষ্ঠীভুক্ত হইয়া স্বামীর গৃহে গিয়া গৃহকর্ম্মের ভারগ্রহণ করে—স্বামীর গৃহে স্বামীকর্ত্তৃক প্রতিপালিত ও রক্ষিত হয়। কোথাও স্বামী স্ত্রীর পিতৃগৃহে গিয়া শ্বশুরের গোষ্ঠীভুক্ত হয় না, স্ত্রীরদ্বারা প্রতিপালিত ও রক্ষিত হয় না। তারপর সন্তানসন্ততিও পিতৃপদবীতে পরিচিত হইয়া, পিতৃবংশীয় ও পিতৃগোষ্ঠীভুক্ত হয়,—মাতৃপদবী কেহ গ্রহণ করে না, মাতৃবংশ বা মাতৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তও কেহ হয় না। যদি কোথাও বিপরীত রীতি দেখা যায়, তাহা নিয়ম নয়, নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র।

যে পাশ্চাত্য সমাজ অধুনা সভ্যতায় সর্ব্বোচ্চ বলিয়া পরিচিত, যে পাশ্চাত্য সমাজের নারীজীবন সর্ব্ববিষয়ে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ বলিয়াই অনেকের ধারণা, সেই পাশ্চাত্য সমাজেও এইরূপ অবস্থা বর্ত্তমান। বিবাহের পর নারীর পিতার পদবী থাকে না, স্বামীর পদবীতে সে পরিচিত হয়,—পিতার গৃহ ত্যাগ করিয়া স্বামীর গৃহে আসে, স্বামীর প্রতিপালন ও পরিরক্ষণের অধীনে স্বামিগৃহের গৃহিণী হইয়া বসে। তারপর সন্তানগণও

পিতৃপদবীতে পরিচিত হইয়া পিতৃবংশীয় হয়,—মাতৃবংশীয় কোথাও কেহ হয় না।

খৃষ্টীয় বিবাহ-পদ্ধতিতে কন্যার সম্প্রদান বলিয়াও একটা ব্যাপার হইয়া থাকে। কন্যাপক্ষীয় কোনও ব্যক্তি কন্যাকে সম্প্রদান করেন। বিবাহের সময় কন্যাকে শপথ করিতে হয়, তিনি স্বামীর অনুগত হইয়া থাকিবেন, তাঁহার আদেশপালন করিবেন,—(I will obey you ইত্যাদি)। স্বামীকে শপথ করিতে হয়, তিনি স্ত্রীকে আদর করিবেন, পালন করিবেন, রক্ষা করিবেন। অন্যান্য শপথবাক্য বরকন্যার সমান,—কেবল এইখানেই তফাৎ এবং ইহাতেই স্বামীস্ত্রী সম্বন্ধে পুরুষ ও নারীর দায়িত্বের ও কর্ত্তব্যের বিশিষ্টতা লক্ষিত হইতেছে। নারীর পক্ষে এই বিশিষ্টতা প্রতিপালক, রক্ষক ও অভিভাবক বলিয়া স্বামীর অনুগতি। স্ত্রী যেখানে বিপুল পিতৃ-বিত্তের অধিকারিণী এবং স্বামী অর্থহীন দরিদ্র, সেখানেও এই মন্ত্র পড়িয়া এ শপথ করিয়াই বিবাহ হয়, এবং যদিও বিবাহের পর এরূপ স্থলে স্বামী স্ত্রীর সম্পদেই প্রতিপালিত হন, আইনে তিনিই স্ত্রীর রক্ষক ও প্রতিপালক বলিয়া বিবেচিত,—গৃহ স্ত্রীর পিতৃদত্ত হইলেও তিনিই গৃহকর্ত্তা। স্ত্রী তাঁহারই নাম গ্রহণ করেন, তাঁহারই গৃহিণী বলিয়া সমাজে পরিচিতা হন,—সন্তানাদি পিতার পদবী গ্রহণ করিয়া পিতৃবংশীয়ই হয়।

এই স্থলে বড় একটি উপযোগী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইংলণ্ডের অধীশ্বরী ভিক্টোরিয়ার বিবাহ হয় জর্ম্মণীর অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্ররাজ্যের এক রাজপুত্রের সঙ্গে। ইঁহার নাম ছিল কুমার এলবার্ট। ভিক্টোরিয়া আপন উত্তরাধিকার স্বত্বে রাজ্যশাসনকর্ত্রী রাণী, সুতরাং তিনি বিবাহের পর স্বামীর গৃহে যাইতে পারেন না, স্বামীকেই ইংলণ্ডে আসিয়া স্ত্রীর রাজগৃহে থাকিতে হইবে। তাহাই ব্যবস্থা হইল,—কারণ, এ অবস্থায় উপায়ান্তর নাই। তখন বিবাহপদ্ধতি সম্বন্ধে প্রশ্ন হইল, স্বাধীনা রাণী হইয়া ভিক্টোরিয়া কেমন করিয়া শপথ করিবেন যে এই স্বামীর অনুগত থাকিয়া তিনি তাঁহার আদেশপালন করিবেন। রাজধর্ম্ম ইহাতে ব্যাহত হইতে পারে। মন্ত্রীরা বলিলেন, 'পার্লামেণ্টে এক নূতন বিধি প্রণয়ন করিয়া 'আদেশপালন করিব'—এই কথাটি বিবাহের পদ্ধতি হইতে তুলিয়া দেওয়া হউক। কিন্তু ভিক্টোরিয়া আপত্তি করিলেন। তিনি বলিলেন, রাণী হইলেও তিনি নারী, অন্য সকল নারীর বিবাহ যে পদ্ধতিতে হইয়া থাকে, তাঁহার বিবাহও সেই পদ্ধতি অনুসারে হইবে। নারীরূপে গৃহজীবনে তিনি স্বামীর অনুগত থাকিয়া স্বামীর আদেশ পালনে ধর্ম্মতঃ দায়ী রহিবেন। কিন্তু রাজকার্য্যে তাঁহার পূর্ণস্বাধীনতা থাকিবে, তাহাতে তাঁহার স্বামী কোনওরূপ হস্তক্ষেপ করিবেননা। শেষে এই ব্যবস্থাই স্থির হইল। কুমার এলবার্ট অতি সুবুদ্ধি ও সুশীল পুরুষ ছিলেন, স্ত্রীর প্রতিও অসাধারণ অনুরাগ তাঁহার ছিল। রাজকার্য্যে কখনও তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন না, গৃহেও সুবুদ্ধিশালিনী ও সাধুশীলা ভিক্টোরিয়া স্বামীর সুখশান্তি ও সম্মানের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলিতেন। সুতরাং স্বামীস্ত্রীর এই অসমঞ্জস মিলনেও ইঁহাদের বিবাহিত জীবনে বিশেষ কোনও অশান্তি কখনও ঘটে নাই। আর একটি কথাও বলা আবশ্যক। ভিক্টোরিয়ার সন্তানগণকে তাঁহাদের পিতৃবংশের নামই গ্রহণ করিতে হইয়াছে,—রাণী বলিয়া মাতার বংশের নামে তাঁহারা পরিচিত হন নাই।

যাহা হউক, স্বামীর অনুগতিমূলক এই যে নারীধর্ম্ম, ইহার বিরুদ্ধ মতবাদও একটা আছে। আধুনিক যুগে এই বিরুদ্ধমতটা মধ্যে মধ্যে বিশেষ প্রবলভাবেই দেখা দিতেছে। সাম্য ও স্বাধীনতা আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলগত বড় একটি নীতি। এই নীতি অনুসারে স্বামীর অনুগতি নারীজীবনের পক্ষে বিশেষ হীনতার পরিচায়ক। এই মতবাদীরা বলেন, নর কি নারী যিনিই হুউন, সকল মানবই সমান এবং সমান স্বাধীনতার অধিকারী। সুতরাং স্বামীর অনুগতিকে আশ্রয় করিয়া নারীর কোনও বিশেষ ধর্ম্ম হইতে পারে না। অন্যায় পাশব বলে পুরুষ নারীকে তার অধীনে আনিয়া নারীধর্ম্মের একটা ভ্রান্ত ন্যায়বিরোধী সংস্কারের সৃষ্টি করিয়াছে এবং এখনও সেই সংস্কারের বশেই নারীকে রাখিতে চায়। নারী ইহাতে মানবসমাজে বড় হীন হইয়া আছে,—এই হীনতা হইতে তাহাকে মুক্ত করিয়া আপন স্বাভাবিক মানবত্বের অধিকারে তাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। পুরুষ ইহা করিবে না,—সুতরাং নারীদেরই দল বাঁধিয়া পুরুষের পাশবশক্তিকে পরাভূত করিয়া আপনাদের ন্যায্য অধিকার কাড়িয়া নিতে হইবে।

পাশ্চাত্য দেশে এই মতবাদের আবির্ভাব হইয়াছে,—

এবং আমাদের দেশেও তাহার প্রতিধ্বনি মধ্যে মধ্যে শোনা যায়।

এই প্রতিবাদী মত কতদূর যুক্তিযুক্ত, এবং সংসারে ও সমাজে নারীর স্বাভাবিক স্থান ও অধিকার কিরূপ, তাহার নিজের এবং সংসার ও সমাজের কল্যাণে পুরুষের সঙ্গে নারীর কিরূপ সম্বন্ধ বাঞ্ছনীয়,—তাহাই এই প্রবন্ধে আমরা যথাসাধ্য আলোচনা করিব। বিশেষ কোনও ধর্ম্ম, শাস্ত্র ও সমাজের বিশেষ দিক হইতে আমরা কোনও প্রমাণ বা যুক্তির অবতারণা করিব না। একেবারে সাধারণভাবে—পুরুষের সঙ্গে নারীর স্বাভাবিক সম্বন্ধ কি, এবং নারীধর্ম্ম বলিয়া আমরা যাহা বুঝি, যাহা সকল দেশে সকল সমাজেই অল্পবিস্তরভাবে স্বীকৃত হইয়াছে—তাহা সেই সম্বন্ধেরই পরিণতি কিনা,—তাহাই দেখিব।

কেহ কেহ বলেন, দৈহিক ও মানসিক শক্তিতে পুরুষ অপেক্ষা নারী হীন, সুতরাং নারীকে পুরুষের আশ্রিত ও অধীন হইয়া থাকিতে হইবে, তার আনুগত্য তাকে করিতেই হইবে, পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার সে ভোগ করিতে পারে না। তুলনায় নারীর এই হীনতাই পুরুষের রক্ষণাধীনতায় তার আশ্রয় গ্রহণের কারণ বলিয়া ইহাঁরা নির্দ্দেশ করেন। দেহতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বহু বৈজ্ঞানিক প্রমাণ উপস্থিত করিয়াও ইহারা নারীর হীনতা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করেন। আবার প্রতিপক্ষও ইহার উত্তরে আরও বহু প্রমাণ দ্বারা দেখাইতে চান, দৈহিক ও মানসিক-শক্তিতে নারীর স্বাভাবিক হীনতা কিছুই নাই,—যুগযুগান্ত ধরিয়া পুরুষের অধীন হইয়া সে আছে, উচ্চশিক্ষায় সে বঞ্চিত, গৃহগণ্ডীর বাহিরে বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে তার অধিকার কিছু নাই, পুরুষের বিলাস-বাসনার চরিতার্থতার জন্য বংশ-পরম্পরায় কমনীয়তা তার সৌন্দর্য্যের—নির্ভরশীলতা তার চরিত্রের আদর্শ করিতে সে বাধ্য হইয়াছে,—তাই এই হীনতা তাহাতে সংক্রামিত হইয়াছে। এই অধীনতা দূর হইলেই অধীনতাজাত হীনতা তাহাতে দূর হইবে। সর্ব্ববিধ শক্তিতে নারী পুরুষের সমান হইবে। এই অবস্থার মধ্যেও প্রতিভায় এবং বিবিধ কঠোর কর্ম্মশক্তিতে—এমন কি যুদ্ধে ও রাজ্যশাসনে পর্য্যন্ত—এমন বহু নারীর আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহারা কোনও অংশে পুরুষ অপেক্ষা হীন, একথা কেহই বলিতে পারিবেন না। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত ইহারা দেখান, নূতন বৈজ্ঞানিক প্রমাণে প্রতিপক্ষের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ কাটাইবার প্রয়াসও পান।

এসব বাদপ্রতিবাদের তেমন কোনও প্রয়োজন আমরা দেখিতে পাই না।—দৈহিক ও মানসিকশক্তিতে নারীর হীনতাই যে স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর অনুগতির, স্বামীর আশ্রয়ে স্বামীর গৃহে বাসের, স্বাভাবিক কারণ, একথা আমরা স্বীকার করিতে চাই না। তাহাতে বাস্তবিকই নারীর মর্য্যাদা—তার পত্নীত্বের ও মাতৃত্বের গৌরব ক্ষুণ্ণ করা হয়।

আর একথাও সত্য যে পুরুষের সমান শিক্ষা নারী যেখানে পাইয়াছেন, শিক্ষায় পরিপুষ্ট জ্ঞানের বা ধীশক্তির পরিচালনায় নারীতে পুরুষ অপেক্ষা হীনতা কিছু বড় দেখা যায় না। বাহিরের কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষনারীকে যেখানে সমানভাবে শ্রমসাধ্য কাজকর্ম্ম করিতে হয়, সেখানে দৈহিকশক্তিতেও নারী পুরুষের কাছে বড় হার মানে না। দূরে বিদেশে কোথাও যাইতে হইবে না,—আমাদেরই এই দেশে নিম্নতরশ্রেণীর মধ্যে কুলি মজুর, জালিয়া, বেদিয়া, বাগ্দী, বুনো প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, মেয়েরা আর পুরুষেরা সমানভাবে কাজ করিতেছে, মাথায় সমান বোঝা বহিয়া নিতেছে, সমান ক্ষিপ্রতায় বাড়ীবাড়ী বেসাতী ফিরি করিতেছে, বাজারে বেচাকেনা করিতেছে।

আবার স্বাভাবিক উচ্চ প্রতিভায়, উচ্চ কর্ম্মশক্তিতে, জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায়, ধর্ম্মসাধনায়, কবিত্বে, বাগ্মিতায়, লোকহিতকর অনুষ্ঠানে, রাজনীতি-দক্ষতায়, সামরিক শৌর্য্য-বীর্য্যে, পুরুষ অপেক্ষা হীন নহেন, এমন নারীর দৃষ্টান্তও পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক পাওয়া যায়।—আমাদের এদেশেও এসম্বন্ধে অন্য কোনও দেশ অপেক্ষা দীনতা কিছুই দেখা যায় না।

তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বিদ্যায়, জ্ঞান-প্রতিভায়, বহির্জ্জগতের কঠোর কর্ম্মক্ষমতায় ও দৈহিকশক্তিতে সমুন্নত পুরুষের সংখ্যার তুলনায় নারীর সংখ্যা অতি কম। তাহার কারণ যে নারীর স্বাভাবিক হীনতা, তা বলা যায় না, কারণ সাধারণতঃ নারীজীবন এই সব শক্তির বিকাশ ও পরিচালনার উপযোগী কর্ম্মক্ষেত্রসমূহের বাহিরেই যাপিত হয়। নারী ও পুরুষের দেহ ও মস্তিষ্কের পরীক্ষার ফলে তুলনায় যদি সাধারণতঃ পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব বাস্তবিকই

দেখা যায়,—তাহারও কারণ মোটের উপর সম্ভবতঃ ইহাই যে যুগপরম্পরায় পুরুষের কর্ম্মজীবন তাহার দেহ ও মস্তিষ্কের পরিপুষ্টির পক্ষে যেরূপ সহায়তা করিয়াছে, নারীর কর্ম্মজীবন তাহা করে নাই।

তাই বলিতেছিলাম, নারী ও পুরুষের স্বাভাবিক সম্বন্ধ কি হইবে, দৈহিক ও মানসিক শক্তিতে স্বভাবতঃ কে ছোট কে বড়, তাহার উপরে নির্ভর করিতেছে না,—করিতেছে সংসারযাত্রায় নারীপুরুষের বিধিনির্দ্দিষ্ট স্বাভাবিক কর্ম্মবিভাগের উপরে।

আর একটি বড় কথাও আছে। পুরুষের স্বাভাবিক কর্ম্মে দৈহিক ও মানসিক যেরূপ শক্তির প্রয়োজন, তাহাতে নারী পুরুষের সমকক্ষ কি না, তাহা লইয়া এত মাথা ঘামাইবারই বা প্রয়োজন কি? দৈহিক ও মানসিক শক্তির ব্যাপ্তি ও পরিমাণ কেবল তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তার বিচারের মাপকাঠিও কেবল তা নয়। স্বীকার করিলাম, যে সব দিকে—যে সব কর্ম্মে পুরুষে উন্নততর দৈহিক ও মানসিক শক্তির পরিচয় আমরা পাই, সেই সব দিকে, সেই সব কর্ম্মে নারীর দৈহিক ও মানসিক শক্তি পুরুষের তুলনায় কম। কিন্তু তাহাই মাত্র মানবের জীবনধর্ম্মের সকল দিক—সকল কর্ম্ম নয়। তাহার বাহিরে এমন অনেক দিক—অনেক কর্ম্ম আছে, যাহাতে নারীর তুলনায় পুরুষকেই অতি হীন বলিয়া মনে হইবে। রন্ধনাদি গৃহকর্ম্ম, পরিজনের সেবা, সন্তানপালন প্রভৃতি কার্য্যে নারীতে যে নিপুণতা - যে কঠোর-শ্রমক্লেশ-সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণ ও শক্তি দেখা যায়, কয়জন পুরুষে তাহা দেখা যাইবে? বাহিরে যতই কঠিন কাজ তাহারা করুক, গৃহস্থালী ও সন্তানপালনের দায়িত্ব গৃহিণীর রোগে বা মৃত্যুতে দুই দিন কাঁধে পড়িলেই অধিকাংশ পুরুষ চক্ষে অন্ধকার দেখে। নারী যে গৃহে নাই, হাজার চেষ্টা করিলেও দশজন পুরুষও সে গৃহে সহজে গৃহস্থালীর শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে পারে না। আবার স্নেহ কোমলতা করুণা প্রভৃতি চিত্তবৃত্তির অনুশীলনে, স্বামীপুত্রাদি পরিজনগণের সেবায় আত্মত্যাগে, সুকুমার শীলতায়, আরও কত মহৎগুণে নারী চরিত্রে ধর্ম্মের ও সুনীতির শক্তি যেরূপ দেখা যায়, কয়টি পুরুষে তার তুলনা মিলিতে পারে? মানবজীবনের এই সব বিশেষ বিশেষ বিভাগে, বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্যপালনে দৈহিক ও মানসিক শক্তির কম পরিচয় প্রকাশ পায় না। ইহাতে পুরুষের তুলনায় নারীরই শ্রেষ্ঠত্ব আমরা দেখিতে পাই। সুতরাং মোটের উপর শক্তিতে নারী পুরুষ অপেক্ষা হীন একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। স্বাভাবিক কর্ম্মবিভাগে বিভিন্নদিকে নারী-পুরুষের শক্তি বিকাশ পাইয়াছে। অনুকূল অবস্থা ও যথোচিত অনুশীলন যেখানে আছে,—সেখানে এক দিকেও নারী-পুরুষের সমান শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

এখন দেখিতে হইবে নারী-পুরুষের স্বাভাবিক কর্ম্ম-বিভাগ কিরূপ এবং তাহাতে নারী পুরুষের স্বাভাবিক সম্বন্ধ কি ভাবে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত।

প্রথমেই একটি কথা বলিয়া রাখি, আমরা অসাধারণ মনীষার অধিকারী অতিমানুষ বা অতিমানুষী কাহারও কথা এখানে বলি না। ইঁহারা সাধারণ সংসারের ধর্ম্ম পালনের জন্য পৃথিবীতে আসেন নাই, সংসারের বাহিরে অথবা সংসারেই একেবারে নির্লিপ্তভাবে থাকিয়া আপনাদের অধিকৃত অতিলৌকিক শক্তির প্রভাবে মানবসমাজের হিত-সাধন করিয়া থাকেন। ইহার জন্যই বিধাতৃ-প্রেরিত হইয়া ইঁহারা এই পৃথিবীতে আসিয়াছেন, এবং বিধাতার ইচ্ছায় পুরুষ ও নারী উভয়রূপেই এই অতিমানুষিক শক্তির মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই। এরূপ শক্তিকে সংসারধর্ম্মের সাধারণ নীতি আপন গণ্ডীর মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারে না। আমাদের যাহা কথা, তাহা সাধারণ নরনারীর (ইংরাজীতে যাহাদের Normal man and Normal woman বলা যায়) তাহাদের সম্বন্ধে।

সাধারণ নরনারী একত্র মিলিয়া সাংসারিক জীবন যাপন করে—সংসার ধর্ম্মপালন করে এবং তাহাতেই সৃষ্টি রক্ষা হয়, সুতরাং বলিতে হইবে, এই সংসার ধর্ম্ম সাধারণ স্ত্রীপুরুষের জন্য বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম। এক একটি মানব-পরিবার সংসারের এক একটি ক্ষুদ্রতম সমষ্টি! বহুবিধ সম্বন্ধে পরস্পরের সঙ্গে সম্বদ্ধ—পরস্পরের উপরে নানারকমে নির্ভরশীল বহু এমন পরিবার লইয়া এক একটি জাতি বা সমাজ সঙ্গঠিত হয়। সুতরাং সংসারধর্ম্মে যেমন নিজ নিজ পরিবারে প্রত্যেকের কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে, তেমনই আবার পরিবারের বাহিরেও জাতি বা সমাজের বহু ব্যাপারে অনেক কর্ত্তব্য সকলেরই রহিয়াছে।

সকলের আগে পরিবার লইয়া কথা। বিবাহ-বন্ধনে

মিলিত পুরুষ ও স্ত্রী এবং তাঁহাদের হইতে প্রসূত সন্তান সন্ততিদের লইয়া এক একটি মূল পরিবার হয়। কোথাও কোথাও একত্র প্রতিপালিত আর পাঁচজনকে লইয়া পারিবারিক জীবনের একটা বৃহত্তর প্রসারও আমরা দেখিতে পাই বটে, কিন্তু ক্ষুদ্রতম মূল পরিবার বলিতে ইহাই বুঝায়, এই মূল সমষ্টি একেবারেই অপরিহার্য্য।

এই পরিবারই সংসারধর্ম্মের প্রধান ক্ষেত্র, এই পারিবারিকজীবনের সঙ্গেই সংসারধর্ম্মের প্রধান প্রধান দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যগুলি সংসৃষ্ট রহিয়াছে, এবং ইহাতেই পুরুষ ও নারীর—স্বামীর ও স্ত্রীর—পিতার ও মাতার—স্বাভাবিক কর্ম্মবিভাগ আমরা দেখিতে পাই।

খাওয়া পরা চাই, আরও পাঁচ রকম সুখস্বচ্ছন্দতা চাই, বহু স্বাভাবিক বৃত্তির পরিতৃপ্তি চাই,—ছেলেপিলেদের মানুষ করিয়া তোলা চাই। তার জন্য কাজ করিয়া অর্থ-উপার্জ্জন আবশ্যক,—এবং সেই অর্থের যথোপযুক্ত ব্যবহারে গৃহে আহারপাণীয়ের সংস্থান. সুখস্বচ্ছন্দতার বিধান, এবং সন্তানগণের প্রতিপালন—এসবও আবশ্যক। পুরুষ বাহিরে কাজ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে,—স্ত্রী গৃহে থাকিয়া সেই অর্থের দ্বারা সকলের আহারাদির ব্যবস্থা, সুখস্বচ্ছন্দাদির বিধান, এবং খাওয়াইয়া পরাইয়া সন্তানদের লালনপালন করে। এক কথায় গৃহকর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝায়, তাই স্ত্রী করে,—আর সেই গৃহকর্ম্ম চলিতে পারে, তার জন্য বাহিরে খাটিয়া অর্থোপার্জ্জন পুরুষ করে। সর্ব্বত্র উন্নত পারিবারিক জীবনে আমরা কর্ম্মবিভাগের এইরূপ ব্যবস্থাই দেখিতে পাই।

ইহা ব্যতীত আরও একটি বড় দায়িত্ব সংসারধর্ম্মে আছে.—বাহিরের আপদ বিপদ হইতে পরিবারকে রক্ষা করা। উন্নত সমাজে একা কেহ এ কাজ করে না,. পাঁচজনে মিলিয়া করে,—কারণ এসব আপদ বিপদ যখন আসে, পাঁচজনের উপরে সমানভাবেই প্রায় আসে।

এই রক্ষার কার্য্যে যখন পাঁচজনে মেলে,—তখন কেবল রক্ষার কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়াই তাহারা নিশ্চিন্ত থাকে না, নানারকমে পাঁচজনের সমান ভাল হয়, সমানভাবে পাঁচজনের সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি পায়, এমন অনেক কার্য্যের অনুষ্ঠানও ইহারা করিয়া থাকে। এই সব কার্য্যই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের কার্য্য,—যে জনসঙ্ঘ যত উন্নত, এই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সমূহ তাহাদের তত ব্যাপক, তত বিচিত্র - তত জটিল, তত কঠিন।

এসব বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রের কাজ, আবার এই সব কাজই বহুলোকের পক্ষে অর্থ উপার্জ্জনেরও উপায় বটে! সুতরাং আপনা হইতেই সুবিধার নিয়মে স্বাভাবিক কর্ম্মবিন্যাসে এসব কাজ পুরুষদের হাতেই গিয়া পড়িয়াছে।

এইখানেই হইয়াছে যত গোলের কথা। পুরুষ বাহিরে কাজ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিবে, সমাজনেতৃত্ব করিবে, রাষ্ট্রশাসন করিবে,—আর নারী তাহার শক্তিতে আশ্রিত ও রক্ষিত হইয়া তাহাদের উপার্জ্জিত অর্থে প্রতিপালিত হইবে, গৃহে থাকিয়া গৃহকর্ম্ম ও সন্তানপালন করিবে। নারী এই হীনাবস্থা কেন হইবে? কেন সে পুরুষের এমন অধীন—এমন মুখাপেক্ষিণী হইয়া থাকিবে? সেই বা কেন বাহিরে কাজ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবে না? সমাজনেতৃত্ব ও রাষ্ট্রশাসনে পুরুষ সমান হইয়া সমানভাগ নিবে না, সমান অধিকার ভোগ করিবে না? এখন যে সে তা করিতে পায় না, তার কারণ পুরুষ তাকে অন্যায় পাশববলে তাকে গৃহের সঙ্কীর্ণসীমায় আবদ্ধ করিয় রাখিয়াছে। সুতরাং নারীদের কর্ত্তব্য হইতেছে—আপনাদের সমান স্বার্থে একত্র মিলিয়া পুরুষের হাত হইতে আপনাদের ন্যায্য অধিকার কাড়িয়া নেয়।

আমাদিগকে এখন দেখিতে হইবে, এই যে সংসারধর্ম্মে স্ত্রীপুরুষের কর্ম্মবিভাগ হইয়াছে, ইহাই স্বাভাবিক কিনা। যদি স্বাভাবিক হয়, তবে এই কর্ম্মবিভাগে নারীর বাস্তবিক হীনতা কিছু নাই। যদি তা না হয়, তবে নারীপুরুষে এই বিরোধ অতি অস্বাভাবিক ও অকল্যাণকর এবং সংসারধর্ম্মের স্বাভাবিক নীতির বিরুদ্ধ।

নারীকে সন্তান গর্ভে ধারণ করিতে হইবে, সন্তান প্রসব করিতে হইবে, প্রসবের পর শিশুকে পালন করিতে হইবে। শিশুর শ্রেষ্ঠ আহার স্তন্যও প্রসবের সঙ্গেই প্রাকৃতিক নিয়মে প্রসূতির বক্ষে সঞ্চারিত হয়। সন্তানের এই মাতৃত্ব এবং মাতৃত্বের এই সব দায়িত্ব যে বিধাতৃবিধানে নারীকেই বহন করিতে হইবে, ইহা স্বভাবসিদ্ধ, কাহারও অস্বীকার করিবার যো নাই। ইতর জন্তুর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রসবের পর অল্পদিনেই সন্তান বড় হইয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়—সন্তানপালনের দায়িত্ব হইতে মাতা শীঘ্রই নিষ্কৃতি

পায়। একটি সন্তান একেবারে ছাড়া হইয়া গেলে মাতা দ্বিতীয় সন্তান গর্ভে ধারণ করে। ইহার পূর্ব্বে গর্ভধারণই প্রাকৃতিক নিয়মে তার পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু মানুষের কথা আলাদা। একটি সন্তানের শৈশবাবস্থাতেই নারী অন্য সন্তান গর্ভে ধারণ করিতে পারে এবং করিয়াও থাকে। আবার মানব শিশু—ইতরজন্তুর শাবকের মত অল্পদিনেই সমর্থ ও স্বাধীন হইয়া বিচরণ করিতে পারে না,—আপনার ভার আপনি গ্রহণ করিতে পারে না; বহু বৎসর তাকে যত্নে রক্ষা ও প্রতিপালন করিতে হয়। সুতরাং এক সঙ্গে একাধিক —অনেক সময় ৪।৫টি পর্য্যন্ত—অপ্রাপ্তবয়স্ক ও অসমর্থ সন্তানের লালনপালনের ভার মাতাকে গ্রহণ করিতে হয়। একাধিক সন্তানের অন্নবস্ত্রাদির ব্যয় এবং রোগপীড়া হইলে চিকিৎসার ব্যয় বড় কম নয়,—তারপর শিক্ষাদানে তাহাদের মানুষ করিয়া তুলিবার ব্যয়ও যথেষ্ট আছে। বাহিরে কাজ করিয়া এই অর্থ উপার্জ্জন এবং গৃহে ইহাদের লালনপালন—দুইটি কাজই একা মাতার পক্ষে করা বড় সহজসাধ্য নহে। যেখানে নারীকে ইহা করিতে হয়, - সন্তানদের যত্ন হয় না, শিক্ষা হয় না, যে গৃহে তাহারা বাস করে তাহাতেও যারপরনাই বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। তারপর অন্য সময় কতক সম্ভব হইলেও গর্ভাবস্থায়, প্রসবের সময় এবং প্রসবের পরেও কিছুকাল পর্য্যন্ত বাহিরের কোনও কঠোর কর্ম্ম করা নারীর পক্ষে অতিদুঃসাধ্য। সুতরাং সংসারিণী নারী বাহিরের কঠোর জীবন সংগ্রাম হইতে দূরে শান্তিময় গৃহের আশ্রয়ে থাকিয়া, নিশ্চিন্ত মনে সন্তানপালনাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারিলেই ভাল হয়,—সংসারের পক্ষেও ভাল, সেই নারীর পক্ষেও ভাল। গৃহে থাকিয়া সন্তানপালনাদি কার্য্যই প্রধান গৃহকর্ম্ম,—আর যাহা তাহা উহার সঙ্গেই চলিয়া যায়। গৃহজীবনের প্রধান এই দায়িত্বটি যাহার হাতে,—অন্যান্য যত দায়িত্ব যত কার্য্যই হউক, সবই তাহার হাতে গিয়াই পড়িবে। গৃহিণীর সকল কার্য্যই নারীকে গ্রহণ করিতে হইবে।

নারী মাতা, মাতৃধর্ম্মে নারীকে গর্ভধারণ করিতে হয়, সন্তান প্রসব করিতে হয়। এই সময়ে নারী একেবারে অসহায়,—সুতরাং গৃহে আশ্রয় তাহার প্রয়োজন। তারপর, সন্তান হইলে, একাধিক সন্তানের পালনও মাতাকে করিতে হইবে,—ইহার জন্যও গৃহে তাহার আশ্রয় প্রয়োজন। নারী মাতা, মাতা বলিয়াই গৃহে নারীকে আশ্রিতা হইতে হয় এবং গৃহে আশ্রিতা হইতে হয় বলিয়াই গৃহিণী হইয়া গৃহকর্ম্মের ভারও তাহাকে নিতে হয়।

এখন গৃহে তাকে আশ্রয় কে দিবে? গৃহে থাকিয়া নিশ্চিন্তসুখে সে সন্তানপালন করিতে পারে—কোনও অভাব তার না হয়, গর্ভাবস্থায় এবং প্রসবের পরে তাহার যথোচিত রক্ষণাবেক্ষণ হয়, তাহা কে দেখিবে? কে তার জন্য বাহিরের কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে খাটিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবে?—ইহার একমাত্র উত্তর—পুরুষ এবং যে পুরুষ স্বেচ্ছায় ও সুখে এই দায়িত্ব গ্রহণ করিবে—করিতে ধর্ম্মতঃও বাধ্য—সে তার সেই সন্তানগণের পিতা।

সকল দেশেরই সমাজবিধি বা রাষ্ট্রবিধি বিবাহ অনুষ্ঠানে সেই পুরুষকে সেই নারীর পতিত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। পতির রক্ষণাবেক্ষণাধীনে পতির গৃহে আশ্রয় পাইলেই নারী নিশ্চিন্ত হইতে পারে,—তার মাতৃত্বের সকল দায়িত্ব—সকল কর্ত্তব্যপালন তার পক্ষে সহজসাধ্য হয়। ইহা অপেক্ষা অধিকতর কল্যাণ সংসারিণী নারীর জীবনে আর কিছু হইতে পারে না।—বিবাহ এবং বিবাহে লব্ধ এইরূপ কোনও আশ্রয় ব্যতীত নারীর পক্ষে সন্তানের ভার বহন করা অতি কঠিন ব্যাপার,—কারণ অবিবাহিতা স্বতন্ত্রা নারীর সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার করিয়া পিতার দায়িত্ব হয়ত কেহ গ্রহণ নাও করিতে পারে। স্ত্রীপুরুষ বিবাহবন্ধনে না মিলিয়া যদি স্বতন্ত্রভাবে বাস করে, তবে পুরুষের অপেক্ষা নারীর দায়িত্বের ভার সংসারে অনেক বেশী হয়,—কারণ, সন্তানপালনের দায়িত্বই সংসারের প্রধান দায়িত্ব এবং এ দায়িত্ব সে অবস্থায় একেবারেই নারীর স্কন্ধে পড়ে। কেবল আপনার গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতে পারিলেই পুরুষ নিশ্চিন্ত হইতে পারে। কিন্তু নারীকে কেবল আপনার নয়, সন্তানদেরও গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতে হইবে। সন্তান যখন সে গর্ভে ধরিবে, যখন প্রসব করিবে, তখন ত একেবারেই তাকে নিরুপায় হইয়া পড়িতে হইবে। কোনও দেশে বা সমাজে যদি এমন অবস্থা হয়, তবে এই দুঃসহভারে পীড়িত হইয়া নারীরা ক্রমে মাতৃত্বের দায় হইতে একেবারেই মুক্ত থাকিতে চেষ্টা করিবে। তাহার ফলে দুই এক পুরুষেই সেদেশ জনশূন্য হইবে,—স্ত্রীপুরুষের অধিকার লইয়া সকল দ্বন্দ্ব একেবারেই চুকিয়া যাইবে।

সুতরাং—সৃষ্টিধারা যদি রক্ষা করিতে হয়, এবং তাহার জন্য নারীকে যদি তাহার ভাগের যে কাজ তাহার ভার নিতে হয়,—তবে বিবাহ এবং বিবাহে পতির গৃহে পতির আশ্রয়লাভ ব্যতীত নারীর পক্ষে অধিকতর কল্যাণকর গতি আর কিছু হইতে পারে না।

পতি আশ্রয়দাতা, রক্ষক ও প্রতিপালক,—স্ত্রী আশ্রিতা, পরিরক্ষিতা এবং প্রতিপালিতা,—বিবাহবন্ধনে মিলিত—স্ত্রীপুরুষের ইহাই স্বাভাবিক সম্বন্ধ, এবং আশ্রয়দাতা ও প্রতিপালকের নিকটে আশ্রিত ও প্রতিপালিত যে—তাহার কিছু আনুগত্যও অবশ্যম্ভাবী। পতিগৃহের গৃহিণী হইয়া গৃহকর্ম্মের সকল ভার গ্রহণ করিয়া—স্ত্রী এই আনুগত্যের ধর্ম্মপালন করিয়া থাকে। সংসারজীবনে পতির নিকট হইতে সে যাহা পায়, তার বিনিময়ে তার গৃহিণী হইয়া গৃহে তার সুখস্বচ্ছন্দতার ব্যবস্থা নারী করিয়া থাকে।

আশ্রিতারূপে এই আনুগত্য নারীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম এবং ইহাতে নারীর পক্ষে হীনতা কিছু নাই। স্ত্রীকে ভালবাসিয়া, যারপরনাই স্নেহ করিয়া, স্বামী তাহাকে আশ্রয় দিয়া থাকে,—শ্রদ্ধায় তাহাকে গৃহিণীর পদে বরণ করিয়া রাখে, স্ত্রী ও সন্তানসন্ততিগণের পালনের ভার কখনও দুঃখকর ভার বলিয়া মনে করে না,—বাহিরের কোনও শাসনশক্তি এই ভার তাহার কাঁধে জোর করিয়া চাপাইয়া দিয়াছে, সুতরাং তাকে বহন করিতেই হইবে, এভাবে এভার সে বহন করে না। স্ত্রীর সঙ্গে মিলিয়া সন্তানসন্ততিদের লইয়া সংসারকরা পার্থিব জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা কাম্য সুখ বলিয়াই সে মনে করে। ইহাদের সুখে রাখিয়াই সে সুখী, ইহাদের প্রতিপালনের জন্য অবিরত সে আনন্দে পরিশ্রম করিতে পারে—করিয়াও থাকে। স্নেহময় প্রেমময় কোনও স্বামী আশ্রিতা, প্রতিপালিতা ও অনুগতা বলিয়া স্ত্রীকে হীন বলিয়াই মনে করে না। আবার স্ত্রীও স্বামীর আশ্রয়কে তাহার হীনতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করে না। স্বামী যেমন ভালবাসিয়া তাহাকে আপন আশ্রয়ে রাখে, রাখিয়াই সুখী হয়, স্ত্রীও তেমনই ভালবাসিয়াই স্বামীর আশ্রয়ে থাকে, এই আশ্রয়কেই সে তার বড় সুখ, বড় মান, বড় গৌরব বলিয়া অনুভব করে। বস্তুতঃ, পরস্পরের এই সম্বন্ধের মূল প্রাকৃতিক কারণ যাহাই থাক, সৃষ্টিধারা সুশৃঙ্খলায় রক্ষা করিয়া জনসমাজের কল্যাণে যে নীতি অনুসারেই সংসারজীবন ক্রমে এই বর্ত্তমানভাবে অভিব্যক্ত হইয়াই উঠুক, সে সবের বিশ্লেষণ করিয়া পরস্পরের স্বাভাবিক দায়িত্বে কার কি পাওনা, কার কি দেনা সে সব হিসাব করিয়া, সংসারে স্ত্রীপুরুষ আপনাদের এই সম্বন্ধ কখনও নিরূপণ করে না। স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি এমনই এক স্বাভাবিক প্রেমের ও স্নেহের আকর্ষণ আছে, (যাহাকে দাম্পত্য-প্রীতি বলে) যাহাতে এই স্বাভাবিক সম্বন্ধ উভয়ের পক্ষেই মধুময় হয়। সন্তানপালনের যে এমন গুরুভার, তাহাও পর্য্যন্ত স্বাভাবিক অপত্য-স্নেহে আনন্দময় হইয়া থাকে। স্বামী স্ত্রী একত্র মিলিয়া সুখেই সংসারী করে, এই সম্বন্ধই তাহারা মানিয়া চলে, ইহার মধ্যে অধিকারের কলহ তাহারা করে না, কোনও বিরোধ যে আছে বা থাকিতে পারে, তাহাও তাহাদের মনে কখনও হয় না। হইলে স্বামীস্ত্রী সুখে এমন সংসারী করিতে পারিত না।

কেবল স্ত্রী কেন, মাতা, ভগ্নী, কন্যা এবং মাতৃস্থানীয়া ভগ্নীস্থানীয়া এবং কন্যাস্থানীয়া আরও কত নারী—সকলকেই এইরূপ সস্নেহ শ্রদ্ধার চক্ষেই পুরুষ দেখে, ইহাদের মধ্যে প্রতিপাল্যা যাহারা আনন্দে তাহাদের প্রতিপালন করে, করিয়া নিজেকে কৃতার্থ ম[illegible] করে।

একেবারে পাশব-বল-প্রধান অতি বর্ব্বর সমাজে যাহাই হউক, সুনীতির আদর্শ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এমন যে কোনও সমাজেই সাধারণ মানুষের সাধারণ অবস্থা এই। তবে ব্যতিক্রমও আছে। কোনও কোনও পরিবারে দুশ্চরিত্র উচ্ছৃঙ্খল পুরুষ স্ত্রীর উপরে অনেক অত্যাচার করে দেখা যায়, এবং সুশীলা স্ত্রী সকল অত্যাচার নীরবে সহিয়া স্বামীর সংসারে থাকিয়াই স্বামীর গৃহকর্ম্মাদি সব নির্ব্বাহ করে। আবার এরূপ দৃষ্টান্তও বহু আছে, স্বামী অতি সুজন ও সুশীল, কিন্তু স্ত্রী যারপরনাই কুটীলস্বভাব, স্বার্থপরায়ণা ও কলহপ্রিয়া—দিবা রাত্রির মধ্যে কখনও স্বামীকে একটু স্বস্তিতে গৃহে তিষ্ঠিতে দেয় না,—অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনের সঙ্গেও সৌহার্দ্দের সম্বন্ধ রাখিয়া চলা তাহার দুষ্কর হইয়া উঠে। অথচ, সেই স্নেহময় শান্ত সুধীর স্বামী সব নীরবে সহ্য করিয়া স্ত্রীকে যত্নে প্রতিপালন করে তাহার মনস্তুষ্টি ও সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য নিয়ত চেষ্টিত থাকে। ভাল মন্দ, সুজন দুর্জ্জন, সুশীল দুঃশীল, স্ত্রীপুরুষ উভয়ের মধ্যেই আছে। দুঃশীলে দুঃশীলে যেখানে মিলন নয়, অবিরত কলহের অশান্তিতে সে গৃহ পূর্ণ থাকে—

স্ত্রী ও পুরুষ কেহই কারও কাছে হার মানে না,—পুরুষ যদি লাঠি তোলে, স্ত্রীও ঝাঁটা লইয়া ধাইয়া আসে। আবার অতিদুঃশীলে আর অতিসুশীলে যেখানে মিলন হয়, দুঃশীলের সকল অত্যাচার সুশীল ক্ষমা করিয়া নীরবে সহিয়া যায়। আর দোষে গুণে মোটের উপর দুজনেই যেখানে সমান, সেখানে কখনও ঝগড়া ঝাঁটি করিয়া, কখনও হাসিয়া মিশিয়া দুজনের দিন যায়,—মোটের উপর বনিবনাও একটু থাকে। তবে চণ্ডগুণে যে পক্ষ যতটুকু প্রবল, সংসারে সেই পক্ষ অপর পক্ষের উপরে ততটুকু হাপদাপ চালাইয়া থাকে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কেহ যদি লক্ষ্য করিয়া দেখেন, সর্ব্বত্রই প্রায় এই ভাবই দেখিতে পাইবেন।

যাহা হউক, ধর্ম্মের জন্যই বল, আর ভোগের জন্যই বল, সংসার করিতে হইলে নর-নারীকে এইরূপ পতি পত্নীর সম্বন্ধে মিলিত্তেই হইবে,—সংসারী হইতে হইলে পুরুষেরও স্ত্রী না হইলে চলে না, স্ত্রীরও স্বামী না হইলে চলে না। প্রতিপালক ও প্রতিপালিত, আশ্রয় ও আশ্রিত, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই সম্বন্ধই স্বাভাবিক। স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর আশ্রয়ে স্বামীর রক্ষণা-বেক্ষণাধীনে বাস করা হীন অধীনতার অবস্থা কিছুই নহে, বরং অতিকল্যাণকর সুখেরই অবস্থা। স্ত্রী-পুত্রাদিকে আপন গৃহে সুখে প্রতিপালন করা পুরুষের পক্ষে প্রধান সংসার-ধর্ম্ম, সাংসারিক সকল সুখেরও প্রধান অবলম্বন। আবার স্ত্রীর পক্ষেও স্বামীর আশ্রয়ে স্বামীর অনুগত হইয়া বাস করা, সন্তানসন্ততির লালনপালন করা, গৃহিণীরূপে স্বামীর গৃহ সুখের গৃহ করিয়া রাখা প্রধান সংসার ধর্ম্ম এবং আপনার সংসার-সুখেরও প্রধান হেতু। নারীর এই ধর্ম্ম এই সুখই সংসারে নারীর অধিকার, আর পুরুষের এই ধর্ম্ম এই সুখই পুরুষের অধিকার। বস্তুতঃ স্বামী-স্ত্রী এই ভাবেই সর্ব্বত্র সুখে সংসারী করিয়া থাকেন,—এইরূপ সংসারে অধিকারের অস্বাভাবিক বিরোধও কোথাও দেখা যায় না। কারণ সংসারে স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক এই কর্ম্মের বিভাগেই অধিকারের স্বাভাবিক বিভাগ হইয়াছে। কর্ম্ম যখন ঠিক এক নয়, সমান নয়, অধিকারও এক ও সমান হইতে পারে না।

কর্ম্মে ও অধিকারে এই পার্থক্য আমাদিগকে স্বীকার করিয়া নিতেই হইবে। পুরুষের সঙ্গে পুরুষের সম্বন্ধে কে ছোট, কে বড়—কেহ ছোট কেহ বড় কি না—এই তর্ক বিতর্ক যে সব নীতি বা যুক্তির অবলম্বনে হইয়া থাকে, স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধে তাহা চলে না,—তার কোনও প্রয়োজনও নাই। কারণ পুরুষে পুরুষে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মিলনের নীতি—সংসার-জীবনে স্ত্রী-পুরুষের মিলনের নীতি হইতে একেবারেই পৃথক্ বস্তু।

সৃষ্টিধারা রক্ষার প্রয়োজনে প্রাকৃতিক বিধানে নারী-জীবনের স্বার্থকতা তাহার মাতৃত্ব। এই মাতৃত্বধর্ম্মের অনুরোধেই নারীকে পত্নীরূপে পতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় এবং আশ্রিত বলিয়াই সংসার কর্ম্মে পতির অনুগতি তার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কেবল সংসারকর্ম্মে নয়—এই মাতৃত্বধর্ম্মের অনুরোধে যৌনসম্বন্ধেও স্বামীর একান্ত অনুগতি স্ত্রীর পক্ষে একেবারেই অপরিহার্য্য ধর্ম্ম বলিয়া সর্ব্বত্র উন্নত সমাজ-নীতিতে স্বীকৃত হইয়াছে। সাধারণতঃ 'সতীত্ব' বা chastity নামে এই ধর্ম্ম পরিচিত—এবং নারী-ধর্ম্মের ইহা সর্ব্ব প্রধান অঙ্গ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অন্য সকল গুরু অপরাধই সমাজ নারীকে ক্ষমা করিয়া থাকে, কিন্তু সতীত্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুতি সমাজে নারীর পক্ষে একরূপ অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য। তবে এই সতীত্বের আদর্শ সর্ব্বত্র সমান কঠোর নয়। অভাবে বা পতির সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ আইনের বিচারে বিচ্ছিন্ন হইলে, পুরুষান্তরকে পতিত্বে বরণ কোনও কোনও সমাজে অনুমোদিত, কোথাও অনুমোদিত নয়,—যেমন বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে। যাহাকে কোনও নারী একবার পতিত্বে বরণ করিয়াছে,—অথবা স্ত্রীরূপে যাহার হস্তে সম্প্রদত্ত হইয়াছে, ইহপরকালে তাহার প্রতিই অনুগতি সতীত্বধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া হিন্দুসমাজে গৃহীত। অন্য প্রায় সকল সমাজেই পত্যন্তরগ্রহণ সতীত্বধর্ম্মের বিরোধী বলিয়া গণ্য হয় না। তবে যে পুরুষ যখন কোন নারীর পতি, যৌন-সম্বন্ধে তাহারই একান্ত অনুগতি যে সেই নারীর পক্ষে প্রধান ধর্ম্ম—এ সম্বন্ধে ভিন্ন নীতি একরূপ নাই বলিলেও চলে। কচিৎ কোথাও ইহার ব্যতিক্রম যে দেখা যায়, তাহাও নিন্দনীয় বলিয়াই সকলে বিবেচনা করেন।

নারীমাতা, সন্তানসন্ততির ধাত্রী, গৃহিণীরূপে গৃহধর্ম্মের অধিষ্ঠাত্রীদেবী, যৌনব্যভিচারের মত অপবিত্রতা নারীর পক্ষে একেবারেই শোভা পায় না,—গৃহজীবনের পবিত্রতা তাহাতে থাকেনা। তাছাড়া, আরও একটি বড় কথা আছে। যৌনসম্বন্ধে স্বেচ্ছাচারিণী নারীর সন্তানের পিতৃনিরূপণ সহজে

হইতে পারে না। তার স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান, নিজের সন্তান, নিজেরই বংশধর, এই জ্ঞান, স্থির এই বিশ্বাস না থাকিলে কোনও পুরুষ তাহাদের পিতৃত্ব স্বীকার করিয়া স্নেহে প্রতিপালন করিতে পারে না,—তাহাদের সকল্ ভার স্বেচ্ছায় ও আনন্দে গ্রহণ করিতে পারে না। সন্তানগণের পিতৃত্ব স্থির ও নিঃসন্দেহ রাখিবার জন্যই সংসারিণী নারীর পক্ষে সতীত্বধর্ম্ম সমাজনীতিতে অপরিবর্জ্জনীয় ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

মোটের উপর সংসারধর্ম্মে—স্বামীর প্রতি এই অনুগতিই যে স্বাভাবিক নারীধর্ম্ম এবং ইহার ব্যতিক্রমে বা ব্যভিচারে পারিবারিক জীবন সম্ভব হয় না, সংসারধর্ম্ম চলে না,—ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

এখন পারিবারিক সংসারের বাহিরে বিস্তৃত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রের কথা। এই ক্ষেত্র অর্থোপার্জ্জনেরও প্রধান ক্ষেত্র। সংসারিণী নারীর অর্থোপার্জ্জনের জন্য বাহিরের কাজে না গিয়া পারিলেই ভাল হয়। কারণ, তাহাতে সন্তানপালনাদি গৃহকর্ম্ম সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করা সম্ভব হয় না,—তারপর বাহিরের কঠোর জীবন-সংগ্রামে নারীচিত্তের স্বাভাবিক কোমল বৃত্তিগুলি ক্ষীণ হইয়া পড়ে,—মাতৃত্বের ধর্ম্ম তাহাতে ব্যাহত হয়। তবে স্বামীর অভাবে অথবা স্বামী যেখানে প্রতিপালনের সকল ভার গ্রহণে অক্ষম হন, সেখানে সংসারিণী নারীর পক্ষেও অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজন অবশ্য হইবে। নারীত্বের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ না হয়, মাতৃত্বের ধর্ম্মপালনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কোনও ব্যাঘাত না হয়, এমন কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বৃত্তিই এই সব নারীর জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত।

তারপর জ্ঞানানুশীলন, লোকহিতসাধন প্রভৃতি মহত্তর কর্ম্মজীবনের কথা। সংসারী পুরুষকেও যেমন অর্থোপার্জ্জন করিতে হইবে, সংসারিণী নারীকেও তেমনই গৃহকর্ম্ম ও সন্তানপালন করিতে হইবে। সংসারে থাকিয়া ইহার অবহেলা কেহই করিতে পারেন না,—নিজ নিজ ভাগের যে কর্ম্ম—তাহা পালন করিয়া—অবসর সময় কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই শক্তি অনুসারে এই সব মহত্তর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন। তাহাতে স্বাভাবিক বাধা নারীর পক্ষে কিছু থাকিতে পারে না,—যদি কিছু থাকে, তাহা সামাজিক সুনীতির নয়, কুনীতিরই দৃষ্টান্ত।

এসব বাদে সামাজনেতৃত্ব রাষ্ট্রশাসন প্রভৃতি বড় দায়িত্বপূর্ণ অনেক কাজ আছে। পুরুষেরাই এই সব কার্য্যে প্রধান; কারণ এসব বাহিরের কাজ, কঠোর শক্তির কাজ, বহুস্থলে অর্থোপার্জ্জনেরও উপায়।—তা ছাড়া এই সব কার্য্যে অনেক সময় যেরূপ দীর্ঘকালব্যাপী অবিচ্ছিন্ন অভিনিবেশ প্রয়োজন হয়,—সংসারিণী নারীর পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না। কারণ, সেই নারী যখন গর্ভধারণ করিবে, প্রসব করিবে, স্তন্যপায়ী শিশুকে তার পালন করিতে হইবে, তখন বাহিরের এরূপ কোন কঠিন দায়িত্বপূর্ণ কাজ তাহার দ্বারা চলিতে পারে না।

পুরুষের সমান প্রতিযোগিনী হইয়া এ সব কার্য্যের ভার গ্রহণ সংসারধর্ম্মিণী নারীর পক্ষে সম্ভব নয়,—কল্যাণকরও নয়। তবে অবসর মত সকল কার্য্যেই পুরুষের সহযোগিনী নারীরা হইতে পারেন এবং হইয়াও থাকেন। ইহাতে নারীধর্ম্ম ব্যাহত হয় না, হয়—যদি নারীরা এই সব কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষের সমান প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইয়া নামেন। বাহিরের বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুষে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার, এই বিরোধের মত একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার আর কিছু হইতে পারে না। পুরুষ কি নারী, কি উভয়ের মিলিত সংসার, কাহারও পক্ষে এই বিরোধ সুখকর কি কল্যাণকর হইতে পারে না। এক সম্প্রদায়ের পুরুষ অন্য সম্প্রদায়ের পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কি বিরোধ করিতে পারে,—কারণ একে অপরকে বর্জ্জন করিয়াও চলিতে পারে। কিন্তু স্ত্রীপুরুষ এই সংসারে পরস্পরকে বর্জ্জন করিয়া কখনও চলিতে পারে না,—পরস্পরের প্রতি স্নেহ প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্বন্ধেই মিলিয়া তাহাদের সংসার করিতে হয়। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায়, অধিকারের বিরোধে স্ত্রীপুরুষের এই মধুর সম্বন্ধ কোথাও থাকিতে পারে না।

সঙ্গীহারা।

(১)

যেমন করে সাঁঝের হাওয়া গহন বনে লুটে যায়,
তেমনি করে বুকে আমার আয়রে ছুটে আয়রে আয়!
গলাটি মোর জড়িয়ে ধরে ওই ছুটি তোর কোমল করে
স্বপন মাঝে ডুবিয়ে মোরে টেনে আমায় নেনা ঘরে!
আবেশ ভরে ঘুমিয়ে পড়ি তোরই কোমল অঙ্কোপরি,
সকল বাধা সকল বিঘ্ন দূরে দূরে যাক্‌রে সরি'!

(২)

যেমন ক'রে তারার দল নিথর রাতে চেয়ে থাকে,
তেমনি করে এস আমার অন্তরের ফাঁকে ফাঁকে।
প্রাণের কথা তোমার সাথে কত দিন যে কইনি আমি!
ঘুমের ঘোরে পথ ভুলিয়ে এস আমার কুঞ্জে নামি'!
আর কি আমায় হয় না মনে দূরের সে ছায়ার দেশে!
মিছে কেন একটিবার এসেছিলে মধুর হেসে!

(৩)

তেমনি করে আজও হেথা বইছে নদী কূলে কূলে।
তেমনি করে গাছের পাতা আজও নাচে দুলে দুলে!
রাত্রি হলে চাঁদের আলো তেমনি করে ভেসে আসে।
ছড়িয়ে পড়ে ফুলের মত তরুলতার আশে পাশে।
তেমনিতর সবই আছে, তবুও কিছু নাই যে মোর!
তুমি আমার হারিয়ে দেছ কুল কিনারা রাত্রি ভোর!

(৪)

কোথায় যাব ঠিক জানি না তরী কিন্তু যাচ্ছি বেয়ে,
হয়ত তাহা লাগ্‌তে পারে তোমার চেনা ঘাটে গেয়ে!
সকাল সন্ধ্যা ডুবে থাকি তোমার গাওয়া সকল গানে,
হয়ত তাহা ভাগ্যবলে যেতে পারে তোমার কাণে!
নিরাশ হয়ে থাকার চেয়ে আশায় থাকা নয় কি ভালো,
যে দেশেতেই রওনা কেন, প্রাণের প্রিয় প্রদীপ জ্বালো!

(৫)

আকুল হয়ে পথিক বায়ু জানায় কিগো তোর বারতা
প্রাণে প্রাণে মিশায় বুঝি দুজনেরই প্রাণের কথা!
ওই যে চাঁদে দেখ্‌ছি যাহা তা' কি তোমার মধুর হাসি,
বাতাস কিগো বহে আনে তোমার রূপ-গন্ধরাশি!
বল মোরে আস্‌বে নাকি নীল সাগরে তরী বেয়ে!
হেথায় আমি বসে আছি তোমার আশার পথটি চেয়ে!

(৬)

যেমনি করে ধূলোয় পড়ে চেয়ে থাকে অশ্রুকণা,
তেমনি করে আমার প্রাণে কাঁদ্‌ছে সদা সেই ভাবনা!
তোমার কাছে চলে যাওয়া এতই কিগো শক্ত কাজ!
তোমার হয়ে অবশেষে ছড়িয়ে গেনু বিশ্বমাঝ!
আর কি মোরা দুয়ের কাছে একবারো না আস্‌বো ফিরে।
একলা হেথা রইব আমি,—তুমি থাকিবে অন্য তীরে!

শ্রীমণিমোহন দত্ত।

(১)

সে অনেক দিনের কথা। প্রায় ৪০ বৎসর হইতে চলিল, কিন্তু সে কথা এখনও আমি ভুলিতে পারিলাম না। তিন বৎসর জেলারের কাজ করিবার পর আমি আজিমাবাদ জেলে বদলি হইলাম। তখন আমার বয়স ২৫ বৎসর। কাজকর্ম্মে তখন আমার খুব উৎসাহ। প্রত্যহই জেল পরিদর্শনের সময় আমি কয়েদীদের খোঁজ লইতাম, কে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিতাম। কয়েদীমহলে আমার খুব সুখ্যাতি হইল। তাহারাও শান্তশিষ্ট হইয়া নির্ব্বিবাদে কাজ করিয়া আমাকে শান্তিতে বাস করিবার অবসর দিল।

সকল কয়েদীকেই বেশ হাসীখুসী দেখিতাম, যেন জেলখানাই তাহাদের বাড়ী ঘর। গৃহ বা পরিবার পরিজন বলিয়া তাহাদের কিছু আছে এমন মনে হইত না। কিন্তু বৃদ্ধ রহিম সেখ তাহাদের কোনও আনন্দেই যোগ দিত না। নীরবে গম্ভীরভাবে সে আপনার কাজগুলি করিয়া যাইত, কোনদিকে ফিরিয়াও চাহিত না। কয়েদীরা তাহাকে খুব শ্রদ্ধা করিত। অনেকবার আমি তাহার সহিত কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু রহিম দু একটি কথায় মাত্র আমার প্রশ্নের উত্তর দিত। প্রায় ৫ বৎসর হইল সে এই জেলে চালান হইয়া আসিয়াছে। শুনিয়াছিলাম, এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে কেহ তাহাকে একদিনও হাসিতে দেখে নাই। বৃদ্ধ রহিমের প্রচ্ছন্ন বেদনাক্লিষ্ট জীবনের অতীত-কাহিনী জানিবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহল হইল, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিয়া বিফল-মনোরথ হইলাম; শুধু জানিতে পারিলাম সে খুনী।

(২)

বর্ষাকাল। জেলে কয়েদীদের মধ্যে জ্বর দেখা দিল। রহিম জ্বরে পড়িল। বহুদিন হইতেই তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। জ্বরের আরম্ভেই তাহাকে জেল-হাসপাতালে পাঠাইলাম। আমি অবসর মত রোজই তাহাকে দেখিতে যাইতাম। জানি না আমি কেন তাহার প্রতি এত আকৃষ্ট হইয়াছিলাম।

প্রায় একমাস রহিম হাসপাতালে আছে। সে ক্রমেই অধিক পীড়িত হইয়া পড়িতেছিল। বুঝিলাম বৃদ্ধ আর অধিকদিন এ যন্ত্রণা ভোগ করিবে না। রহিমও ইহা বুঝিতে পারিয়াছিল। আমি দেখিতাম সে যেন উদ্‌গ্রীব হইয়া চিরমুক্তির অপেক্ষা করিতেছে। আমি এখন অনেক সময় তাহার কাছে বসিয়া থাকিতাম ও নানাপ্রকারে তাহাকে শান্তি দিতে চেষ্টা করিতাম। রহিম কোন কথা বলিত না, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিত আর কাঁদিত। মাঝে মাঝে বলিত, "বাবু, ভগবান্ আপনার মঙ্গল করিবেন।"

(৩)

সেদিন সকাল হইতেই খুব ঝড়বৃষ্টি হইতেছিল। কোনও রকমে কাজ সারিয়া বেলা ১২টার মধ্যে রহিমের কাছে আসিলাম। তাহার অবস্থা খুব খারাপ। ২।১ দিনের বেশী আর বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। আমি তাহার কাছে যাইতেই সে খুব প্রফুল্ল হইয়া বলিল, "বাবু আমার মুক্তির দিন আসিয়াছে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "রহিম, তোমার কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা হয়?" সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তর করিল, "সব ভুলিয়াছিলাম বাবু, আবার কেন মনে করাইলেন?" এই বলিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে খুব কাঁদিতে লাগিল। আমি তাহাকে কোন সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিলাম না, অবাধে কাঁদিতে দিলাম,—ভাবিলাম, যদি কাঁদিয়াই সে শান্তি পায়, তবে তাহার এ শান্তি আমি নষ্ট করিব কেন? কিছুক্ষণ কাঁদিয়া সে বলিল, "বাবু, আপনি আমার জন্য অনেক করিয়াছেন। যাইবার আগে আপনাকে আমার এই জীবনের পাপকাহিনী বলিয়া যাইব। তাহা না হইলে বুঝি আমি মরিয়াও শান্তি পাইব না।"

(৪)

কিছুক্ষণ থামিয়া থাকিয়া রহিম ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল, "চিরকাল আমার এমন যায় নাই। বড় ঘরেই জন্মিয়াছিলাম, সকলের কত আদরের ছিলাম। অনেক ব্রত উপবাসের পর মা আমাকে পাইয়াছিলেন। প্রচুর ধনশালী পিতামাতার একমাত্র সন্তান আমি, শৈশবকাল হইতেই অতিরিক্ত আদরে প্রতিপালিত হইয়া উঠিলাম। যাহা যখন চাহিতাম, তাহাই মা আমাকে অবিলম্বে আনাইয়া দিতেন। আমার আবদার সকলেই প্রাণপণে রক্ষা করিত। বাবা এতটা পছন্দ করিতেন না, মাঝে মাঝে বিরক্তিপ্রকাশ করিতেন। কিন্তু সকলেই তাঁহাকে বুঝাইত, আহা, ছেলেমানুষ, বড় হইলেই সব সারিয়া যাইবে। মা আমাকে জন্মদিবার পর হইতেই রুগ্ন হইয়া পড়েন। দুঃখ পাইবেন ভাবিয়া বাবা আমাকে বিশেষ কিছু শাসন করিতেন না। দশ বৎসর বয়সের সময় বাবা আমাকে স্কুলে পড়িতে দিলেন। পড়াশুনার প্রতি আমার কেমন একটা বিতৃষ্ণা হইয়াছিল,—কিন্তু বাবার ভয়ে স্কুল ছাড়িতে পারিলাম না, আমাকে লেখাপড়া করিতে হইত। ১৭ বৎসরের সময় মহাসমারোহে আমার বিবাহ হইয়া গেল; আমিও পড়াশুনার সহিত সম্বন্ধ একরূপ ছাড়িয়াই দিলাম।

এই সময় হইতেই আমার পতন আরম্ভ হইল। বড়লোকের ছেলে লেখাপড়া ছাড়িয়া যখন প্রমোদে মত্ত হইলাম তখন সময়োপযোগী নানাপ্রকারের সঙ্গীও জুটিয়া

গেল। আমি পাপের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বাবা সব জানিতে পারিয়া আমাকে অনেক বুঝাইলেন পরে তিরস্কার করিলেন, কিন্তু আমার মন কিছুতেই ফিরিল না। কিন্তু পিতার তিরস্কার যাহা করিতে পারিল না, স্নেহময়ী মাতার অশ্রুজল ও পত্নীর সকাতর অনুরোধ তাহা সম্পন্ন করিল। আমি সঙ্গীদিগের ছাড়িয়া দিলাম, সৎপথে চলিতে চেষ্টা করিলাম। বাবা খুসী হইয়া আমাকে বিষয়কর্ম্ম বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন, আমিও মনোযোগ দিয়া শিখিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময় আমি আমার স্নেহময়ী মাকে হারাইলাম। মাকে হারাইয়া আমি একেবারে পাগলের মত হইয়া গেলাম। সেই সময় দুঃখ ভুলিবার জন্য আবার পুরাতন পাপে গা ছাড়িয়া দিলাম। পুরাতন সঙ্গীরাও আবার জুটিল। পাপের স্রোতে অবাধে গা ভাসিয়া চলিলাম।

মায়ের মৃত্যুতে বাবা অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছিলেন। তারপর আমার এই ব্যবহার তাঁহার একেবারে অসহ্য হইয়া তুলিল। বাবা আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। অনেক অনুনয় করিলেন, কত বুঝাইলেন, তিরস্কার করিলেন, অবশেষে আমাকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবেন বলিয়া ভয়ও দেখাইলেন। আমি কিছুই গ্রাহ্য করিলাম না। কিছুকাল এইভাবে কাটিল। বাবা অন্যায় সহিতে পারিতেন না। আমার ব্যবহারও সহিলেন না। একদিন আমাকে ডাকিয়া অত্যন্ত তিরস্কার করিলেন। ক্রমে আমাদের মধ্যে বচসা আরম্ভ হইল। বাবা আমাকে সেই মুহূর্ত্তে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতে বলিলেন। আমিও প্রতিজ্ঞা করিলাম, এ বাড়ীতে আর জীবনে পদার্পণ করিব না।

(৫)

সেই দিনই রাত্রিতে বাড়ী হইতে চিরজন্মের মত বাহির হইলাম। আমার স্ত্রী আমার সঙ্গ ছাড়িতে চাহিলেন না। আমি তাহাকে সঙ্গে লইলাম। কিন্তু আমার ৩ বৎসরের কন্যাকে বাবা কিছুতেই আমার সঙ্গে দিলেন না। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, ইতিমধ্যে আমার এক কন্যা হইয়াছিল।

বাড়ী ত্যাগ করিবার কিছুদিন পরেই বুঝিতে পারিলাম, আমি কি অন্যায় করিয়াছি। অনেক পুরাতন সঙ্গীর বাড়ীতে গেলাম, কিন্তু এখন কেহই আমাকে আশ্রয় দিল না। আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিলাম। স্ত্রী এই সময় আমাকে অনেক সান্ত্বনা দিতেন, অনেক বুঝাইতেন। বাবার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে কত অনুরোধ করিলেন। কিন্তু আমিও পিতার জেদ খানিকটা পাইয়াছিলাম, পিতার সাহায্য ভিক্ষা কিছুতেই করিব না স্থির করিলাম। সৎপথে থাকিয়াই অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। লেখা পড়া শিখি নাই, কোথাও কিছু সুবিধা হইল না। স্ত্রীর গহনা বিক্রয় করিয়া কয়েক মাস কাটাইলাম, কিন্তু তাহাতে কতকাল চলিবে? ক্রমে অর্থাভাব হইল। দুইবেলা খাবারও জুটিত না। আমি পাগলের মত হইয়া গেলাম, কিন্তু তবুও বাবার কাছে গেলাম না। এই সময় প্রেমময়ী পত্নীর সান্ত্বনাই আমার একমাত্র শান্তি ছিল। কিন্তু এ শান্তিও আমার কপালে অধিকদিন টিকিল না। অন্নাভাবে ও অসহ্য পরিশ্রমে আমার স্ত্রীর শরীর কঙ্কালসার হইয়া পড়িয়াছিল। সে তাহা গোপন করিয়া হাসিমুখে কাজ করিয়া যাইত, যেন কিছুই হয় নাই। আমি সব বুঝিতাম! কিন্তু হায় কি করিব, উপায় নাই।

"বাবু, সেদিনও এমনি ঝড় বৃষ্টি ছিল। সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিয়া দেখিলাম, আমার স্ত্রী ছিন্ন মলিন শয্যায় চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া আছে। তাহার মুখ এত নিষ্প্রভ যেন কেহ মৃত্যুর কৃষ্ণ যবনিকা তাহার মুখের উপর টানিয়া দিয়াছে। আমাকে দেখিয়া ম্লান হাসিয়া অতি ক্ষীণ কণ্ঠে কাছে ডাকিল। আমি তাহার পাশে বসিলাম। আমার হাত দুখানি সে তাহার নিজের হাতের মধ্যে লইয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি চুপ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। ফোটা ফোটা করিয়া অশ্রু বাহির হইয়া আমার গণ্ডদেশ প্লাবিত করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে অতিকষ্টে ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, 'আমি চলিলাম, আমার জন্য কাঁদিও না, ভগবানে মতি রাখিও।" এই কয়েকটি কথা বলিয়া আমার হাত তাহার বুকের উপর রাখিয়া আমার পত্নী চিরজন্মের মত চক্ষু মুদ্রিত করিল। আমার বুক ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল, ইচ্ছা হইল চীৎকার করিয়া কাঁদি। কিন্তু আমার মুখ দিয়া একটি শব্দও বাহির হইল না। বাহিরে তখন তুমুল বেগে ঝড় বৃষ্টি হইতেছিল।

(৬)

স্ত্রীর মৃত্যুর পর আমি লক্ষ্যহারা হইয়া পড়িলাম। কি করিব কিছুই ভাবিয়া পাইতাম না। তখন মনে হইত,

আমার সেই শিশুকন্যার কথা। ভাবিতাম, তাহাকে পাইলে বুঝি খানিকটা শান্তি পাইব। কিন্তু তার কথা জোর করিয়া মন হইতে সরাইয়া দিলাম। সে দেশ ছাড়িয়া অন্যদেশে চলিয়া গেলাম। সমস্ত ভুলিব বলিয়া নিজের নাম বদলাইলাম। সেই সময় হইতে রহিম সেখ হইলাম।

কিছুদিন পর্য্যন্ত সদুপায়ে জীবিকার্জ্জন করিতে চেষ্টা পাইলাম; কিছুই সুবিধা হইল না। ক্রমে নানা অসদুপায় অবলম্বন করিলাম। কয়েক বৎসরের মধ্যেই আমি পাকা চোর হইলাম। প্রথম যখন চুরি করিতে আরম্ভ করিলাম, মনে বড়ই কষ্ট হইত। ক্রমে যতই অভ্যস্ত হইলাম, ততই সে কষ্ট চলিয়া গেল। কিছুদিন পরে চুরি করিতে যাইয়া ধরা পড়িলাম। বিচারে দুই বৎসরের জেল হইল। জেল হইতে বাহির হইয়া আবার পুরাতন ব্যবসা আরম্ভ করিলাম। কিন্তু শীঘ্রই আমাদের দলের প্রায় সব চোর ধরা পড়িল। সেবার আমি নিষ্কৃতি পাইলাম। কিন্তু দল ভাঙ্গিয়া গেল, কি করিব কিছুই ভাবিয়া পাইলাম না।

তখন বাঙ্গলাদেশে অনেক ডাকাতের দল ছিল। ভাবিলাম ডাকাতের দলে যাইয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া, এ ব্যবসা ছাড়িয়া পরে শান্তিতে বাস করিব। দল বাছিয়া লইতে বিশেষ কষ্ট হইল না। ডাকাতি করিতে আরম্ভ করিয়া মনে একটুও শান্তি পাইলাম না। যেখানেই ডাকাতি করিতে যাইতাম, সেইখানেই দেখিতাম, স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে ইহারা কি ভীষণ অত্যাচার করিত। মাঝে মাঝে মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিত; মনে করিতাম সব ছাড়িয়া দিব। কিন্তু যাহা মনে করিতাম, তাহা হইয়া উঠিত না। কেন যে এ মোহ ছাড়িতে পারিলাম না জানি না। বিশ্বাস করিবেন কি বাবু, পাপের পথে নামিয়া একদিনের তরেও শান্তি পাই নাই।

এই রকম করিয়া কয়েক বৎসর কাটিল, কিছুদিন এ ব্যবসা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে একবার আমাদের বাড়ীর খোঁজ লইয়া ছিলাম। জানিতে পারিলাম আমার গৃহত্যাগের এক বৎসরের মধ্যে বাবা ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন। সমস্ত সম্পত্তি আমার কন্যাকে দিয়া গিয়াছেন। আরও শুনিলাম দুই বৎসর আগে আমার কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাহারা নাকি খুব সুখে ও শান্তিতে আছে। কন্যার খোঁজ করিয়া গোপনে একদিন তাহাকে দেখিয়া আসিলাম। আমার কন্যার মুখখানি ঠিক তাহার মায়ের মতনই দেখিলাম। তাহাকে দেখিয়া আমার পত্নীর কথা মনে হইল। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া আমি সে স্থান ছাড়িয়া আসিলাম। মনে মনে ভগবানের কাছে তাহাদের জন্য আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলাম।

তারপর অনেক বৎসর চলিয়া গেল, অভাবের তাড়নায় আমি আবার ডাকাতি আরম্ভ করিলাম। একদিন নিকটেই কোনও এক গ্রামে এক ধনবানের গৃহে ডাকাতি করিব স্থির হইল। দলের একজন খোঁজ লইয়া জানিতে পারিল, যে সেদিন বাড়ীতে পুরুষ কেহ থাকিবে না। এ সুযোগ ছাড়া যায় না। রাত্রে প্রায় ১৫ জন আমরা বাহির হইলাম। নিবিড় অন্ধকার, আমার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল।

গভীর রাত্রি। চারিদিক নিস্তব্ধ। সহসা মশাল জালিয়া বিকট চীৎকার করিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম। আমরা ৫।৬ জন বাড়ীর একটি ঘরে ঢুকিলাম। সেই ঘরে একটি রমণী একটি ২।৩ বৎসর বয়স্ক শিশু পুত্র লইয়া শুইয়াছিল। আমাদের দেখিয়া শিশু মা মা বলিয়া কাঁদিয়া মাতার বুকের ভিতর আশ্রয় লইল। মা শিশুকে জড়াইয়া ধরিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। একজন ডাকাত সেই রমণীর গহনা লইবার জন্য তাহার গায়ে হাত দিল। রমণী চীৎকার করিয়া উঠিল। আমি পশ্চাতে ছিলাম, চীৎকার শুনিয়া সেই দিকে চাহিলাম। এতক্ষণ তাহার মুখ ভাল করিয়া দেখিতে পারি নাই। আমার হাতের মশালের আলো তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল, সেই আলোকে তাহার মুখ দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল, হাত হইতে মশাল পড়িয়া গেল। কিন্তু অল্পক্ষণেই আমি সামলাইয়া লইলাম। উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া আমি তাহাকে রক্ষা করিতে গেলাম। যে লোকটা আমার কন্যার গায় হাত দিয়াছিল, তাহাকে লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিলাম। আমার এই অদ্ভুত ব্যবহারে দলের লোক আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাহারা ক্রোধে আমাকে আক্রমণ করিল। আমি যথাসাধ্য তাহাদের প্রতিরোধ করিতে লাগিলাম। সহসা আমার মাথায় এক প্রচণ্ড আঘাত লাগিল, আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলাম।

যখন জ্ঞান হইল, দেখিলাম সেই ঘর লোকে ভরিয়া গিয়াছে। পুলিশ আমার হাতে হাতকড়ি পরাইয়া দিল।

দারোগাবাবু আমাকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রশ্নে বুঝিলাম—আমার কন্যা আর বাঁচিয়া নাই। শিশুটির কোন খোঁজই জানিতে পারিলাম না। বাবু, যখন জানিতে পারিলাম আমার কন্যা বাঁচিয়া নাই, তখন আমার মনের অবস্থা যে কিরূপ হইয়াছিল বলিতে পারি না। উঃ, আমার পাপের কি ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত!

আমি আমার পরিচয় দিব না বলিয়া খুন স্বীকার করিলাম। বিচারক দয়া করিয়া আমার যাবজ্জীবন দীপা-স্তর বাসের আজ্ঞা দিলেন। আমার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল।

১৫ বৎসর দ্বীপান্তরে ছিলাম। আজ প্রায় ৫ বৎসর এখানে আসিয়াছি। শীঘ্রই হয়ত জেল হইতে মুক্তি পাই-তাম। কিন্তু বাবু, এমুক্তি আমার প্রাণে শান্তি দিতে পারিত না। এই ২০ বৎসরের প্রতি দিনই আমার সেই রাত্রের কথা মনে হয়। কিছুতেই ভুলিতে পারিলাম না।"

আমি একমনে তাহার এই কাহিনী শুনিতে ছিলাম। হঠাৎ তাহার দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, তাহার মুখ কি এক অব্যক্ত বেদনায় বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমি তাহার মুখে একটু জল দিলাম। সে একটু সুস্থ হইল। রহিম আবার বলিল——

"বাবু, সেই ছেলের একবার খোঁজ করিবেন কি? সে যদি বাঁচিয়া থাকে, তবে আজ আপনার মতই হইবে। তার ডাক নাম ছিল 'মানু', ভাল নাম জানি না। তাহাকে আমার জীবনের কথা বলিবেন। সে যেন আমাকে ক্ষমা করে।"

'মানু' নাম শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। আমার পুরাতন কথা মনে পড়িল। আমি রুদ্ধ নিশ্বাসে, কম্পিত বক্ষে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রহিম, তোমার আসল নাম কি?" সে ধীরে বলিল, "শিবপ্রসাদ।" "আর সেই গ্রামের নাম?" "চন্দ্রগ্রাম।"

আমি আর থাকিতে পারিলাম না, চীৎকার করিয়া ডাকিলাম, "রহিম! দাদা! আমিই 'মানু'।" রহিম একটি অব্যক্ত শব্দ করিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিল। তাহার মুখ আনন্দে ভরিয়া উঠিল, তাহার শীর্ণ গণ্ডস্থল অশ্রুতে প্লাবিত হইল। অস্ফুটস্বরে শুধু একরূপ বলিয়া উঠিল "ভগবান্!" তারপর—তারপর সব শেষ হইল।

শ্রীনির্ম্মলেন্দু দাশগুপ্ত।

বিশ্বামিত্র।

("ব্রহ্মর্ষি" আখ্যালাভে।)

"ব্রহ্মর্ষি" "ব্রহ্মর্ষি" আমি! দৃপ্ত আত্ম-বলে
আহরিণু নবজন্ম আজি ভূমণ্ডলে
অচিন্ত্য অশ্রুতপূর্ব্ব! তীব্র তপস্যার
সফল সমাপ্তি আজি! জয়ী দুর্নিবার
ক্ষাত্রতেজঃ বসুধায়!
আজি পড়ে মনে
মহাঋষি বশিষ্ঠের শান্ত তপোবনে
আতিথ্যের বিনিময়ে সহসা কি মোহে
তুচ্ছ পয়স্বিনী লয়ে মেতেছিনু দ্রোহে
সসৈন্যে সদর্পে অতি! পরিণামে যবে
লভিলাম পরাজয় ব্রহ্মণ্য-গৌরবে
অটল সঙ্কল্পে কিবা বাঁধিয়া হৃদয়
মুহূর্ত্তেকে রাজৈশ্বর্য্য ত্যজি সমুদয়
আসিনু এ তপোভূমে হিমাদ্রি-শিখরে
সাধিতে অসাধ্য-ব্রত!
যুগ-যুগ ধরে
তারপর কত বিঘ্ন অন্তরে বাহিরে
কুটিল ভ্রূকুটি করি ডুবাতে তিমিরে
চাহিয়াছে মুহুর্মুহুঃ! রহি অচঞ্চল
আপনার ধ্রুব-লক্ষ্যে, রাখিয়া কেবল
বিশ্বাস নির্ভর নিজে, সব অন্তরায়
ফুৎকারে উড়ায়ে দিনু শুষ্ক তৃণপ্রায়

চরণে দলিয়ে বুঝি! এই হিমাচল
আপন মহিমা-গর্ব্বে নিস্পন্দ অটল
রহে যথা বজ্রাঘাতে, বক্ষ পাতি' মম
সেইমত বজ্রাঘাত নিত্য নিরুপম
ধরিয়াছি অকাতরে! সব প্রলোভন
আসিয়াছি অতিক্রমি'! আজি অতুলন
সিদ্ধকাম সত্য আমি!
সত্য মনে হয়
দীর্ঘ সুপ্তি পরে আজি জাগ্রত হৃদয়
অনন্ত আনন্দ-কূলে, সারা চিত্তে বয়
প্রশান্ত শান্তির ধারা! পূর্ণ-পরিচয়
ঘটেছে আত্মার সনে, সব আকাঙ্ক্ষার
সার্থক নির্ব্বাণ যেন। নাহি গ্লানি আর
বশিষ্ঠের দ্বন্দ্ব-জয়ে!
নিখিল ভুবন
বিস্ময়ে সম্ভ্রমে আজি বিস্ফারি নয়ন
বিধির বিধান পরে অপূর্ব্ব অতুল
নিরখিছে জয় মম! হয়ে শ্রদ্ধাকুল
কোটি কণ্ঠে কোটি ছন্দে মিলাইয়ে সুর
করিছে বন্দনা মম—গায়ত্রী মধুর
বিচরিত বিশ্বে আজ!
হের বিশ্ববাসি!
ওই জয়ধ্বনি মাঝে উঠিছে উদ্ভাসি'
পুরুষকারের দিব্য জীবন্ত বিগ্রহ
বিচিত্র মূরতি ধরি! দীপ্ত দুর্ব্বিসহ
মধ্যাহ্ন ভাস্কর সম! ওই স্তুতি-গান
এ বিশ্বামিত্রের নহে, মন্ত্র সুমহান্
সে যে ওই দেবতার! স্পষ্ট নব ঋক
অর্চ্চিতে সে নব দেবে! বিজয়ী নির্ভীক
সে মন্ত্রের ঋষি আমি!
বিমুগ্ধ মানব!
যদি চাহ মুক্তি কিংবা ঋদ্ধি অভিনব
মোর পাশে লহ দীক্ষা! পাল সে সাধনা
মৃত-প্রাণে ফিরে যাহে নবীন চেতনা!!

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত

অবাধ বাণিজ্য বনাম রক্ষানীতি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আর একদিক হইতে বিবেচনা করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাইব যে বর্ত্তমান চিনির বিষয়ে রক্ষানীতি অবলম্বিত হইলেই এই দেশের চিনির ব্যবসায় যে বিশেষভাবে উন্নতিলাভ করিবে তাহা নহে, যেহেতু নানাকারণে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের সহিত চিনির ব্যবসায়ে আমরা প্রতিযোগিতায় অক্ষম, এবং বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতে যে পরিমাণ চিনির আবশ্যক, তাহা ভারতে জন্মিতে পারে না। তাহা জন্মাইতে হইলে ইক্ষুর উৎপত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি প্রভৃতি নানারূপ প্রারম্ভিক বন্দোবস্তের প্রয়োজন। সুতরাং বিদেশী চিনির উপর ডিউটী বসিলে আমাদিগকে অধিকমূল্যে চিনি খরিদ করিতে হইবে সন্দেহ নাই। এজন্য বর্ত্তমান অবস্থায় চিনির ব্যবসায়ে পূর্ণমাত্রায় রক্ষানীতি অবলম্বনে কোন ফল হইবে না। ফলতঃ, আমাদের অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা থাকা দরকার। এই ক্ষমতা থাকিলে সস্তা বিদেশী চিনির আমদানী সত্ত্বেও এদেশের চিনির ও গুড়ের ব্যবসায়ের ক্ষতি নিবারণ করা যাইত এবং ক্রমশঃ এদেশে চিনির কারখানাগুলিকে বিদেশী কারখানার সহিত প্রতিযোগিতায় সমর্থ করিয়া তোলা অসম্ভব হইত না। কি উপায়ে তাহা করা যাইত তাহা এস্থলে আলোচনা করা সম্ভবপর নহে।

আবার কিছুদিন পূর্ব্বে রাজস্বের উদ্দেশ্যে বিদেশী কেরোসিন তৈলের উপর যে শুল্ক বসিয়াছে, তাহাতে ব্রহ্মদেশে

এবং ভারতের আরও ২।১ স্থলে কেরোসিন তৈলের উৎপত্তির বিশেষ সাহায্য করিয়াছে, এবং আমেরিকা ও রুসিয়া হইতে যত কেরোসিনের আমদানী হইত, তাহা যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া গিয়া ভারতের উৎপত্তির পরিমাণ ক্রমে বাড়াইয়া দিতেছে। এস্থলে রক্ষাশুল্ক না বসাইয়াও গভর্ণমেণ্ট দেশীয় কেরোসিন তৈলের ব্যবসাটীকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিয়াছেন। তামাকের বিষয়েও ঐরূপ ঘটিয়াছে। বিদেশী চুরুট, সিগারেট এবং প্রস্তুত তামাকের উপর রাজস্বের উদ্দেশ্যে শুল্ক বসাতে এদেশের তামাকের ব্যবসায়ের ক্রমোন্নতি দেখা যাইতেছে। বিদেশী তামাকের আমদানী কমিয়াছে এবং ভারতবর্ষের এই শুল্কের ফলে কয়েকটি সিগারেটের কারখানাও স্থাপিত হইয়াছে। এদেশে কাচা তামাকের যথেষ্ট চাষ হইয়া থাকে এবং কেরোসিন তৈলের খনিও আছে, সুতরাং এ বিষয়ে রক্ষানীতি অবলম্বিত হইলে এই দুই কার্য্যেরই ভারতে যথেষ্ট সুবিধা হইতে পারে। কেরোসিন তৈলের উপর রাজস্বের জন্য যে শুল্ক বসিয়াছে, তাহাতে ইংলণ্ডের বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নাই; কারণ প্রধানতঃ আমেরিকা ও রুসিয়া হইতে কেরোসিন তৈল আমদানী হইয়া থাকে। কিন্তু তামাকের কথা স্বতন্ত্র, কারণ ইহা ব্রীটিশদ্বীপ হইতেই এদেশে আসে। সুতরাং রাজস্বের জন্য হইলেও একদল লোক ইহার উপর স্থাপিত শুল্ককে রক্ষাশুল্ক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং যাঁহারা ভিতরের খবর রাখেন, তাঁহাদের অনেকের বিশ্বাস, যে এজন্য এদেশে প্রস্তুত তামাকের উপর পাণ্টাশুল্ক বসার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। ভারতের এবিষয়ের স্বাধীনতা থাকিলে এরূপ অনেক দেশীয় ব্যবসায়কে বিদেশী প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করা যাইত।

ভারতে এ বিষয়ে কি নীতি অনুসৃত হওয়া উচিত, সে বিষয়ে যে সকল মনস্বী ব্যক্তিগণ বিশেষভাবে চিন্তা করিয়াছেন, তন্মধ্যে অধ্যাপক লিস্ স্মিথের (Professor Lees Smith) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁহার "India and the Tariff Problem" নামক পুস্তক লিখিবার পূর্ব্বে বিশেষভাবে এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য এদেশে আসিয়াছিলেন। অনেক বিবেচনার পর তিনি এদেশের পক্ষে অবাধ-বাণিজ্য নীতিই উপযোগী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন আমেরিকা প্রভৃতি বিরুদ্ধনীতি-অবলম্বী দেশসমূহ ইতিপূর্ব্বেই তাহাদের ঐ নীতির কুফল উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তিনি ভারতের রক্ষানীতিবাদিগণকে এবিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক হইতে বলিয়াছেন।

অধ্যাপক লিস্ স্মিথের প্রধান সিদ্ধান্ত এই যে বিদেশী দ্রব্যের উপর শুল্ক বসাইলে ঐ শুল্ক সাধারণতঃ দেশের লোককেই বর্দ্ধিত মূল্যের আকারে দিতে হয় এবং তাহাতে বিদেশী ঐ শিল্পের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। অনেকস্থলে একথা ঠিক। কিন্তু যখন বিদেশী কাপড়ের উপর ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে রক্ষানীতির জন্য নহে, কিন্তু ভারতের রাজস্বের জন্য সামান্য শুল্ক বসিল, তখন লাঙ্কাসায়ারের কাপড়ের কলওয়ালাগণ এত হুলুস্থূল বাধাইল কেন এবং তাহার ফলে ভারতেই বা স্থানীয় উৎপন্ন কাপড়ের উপর পাণ্টাশুল্ক বসাইয়া অবস্থার সামঞ্জস্য করিতে হইল কেন? সুতরাং অনেকস্থলে সত্য হইলেও, অধ্যাপক মহাশয়ের কথাটা একবারে একটা সাধারণ স্বীকৃত বিষয় হইতে পারে না। অবাধ-বাণিজ্যনীতির সমর্থকগণও কোন দেশের রাজস্বের উদ্দেশ্যে স্থাপিত বিদেশীদ্রব্যের উপর শুল্ককে রক্ষানীতির অনুসরণ করা বলেন না। সুতরাং এদেশে রাজস্বের জন্য স্থাপিত শুল্কদ্বারা দেশের অন্যান্য করভারের লাঘব করা এবং আবশ্যকীয় দেশীয়শিল্পকে উৎসাহ দেওয়া চলে! সেজন্য এবিষয়ে ভারতের আবশ্যকীয় ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা থাকা দরকার।

অবাধ-বাণিজ্যনীতিবাদিগণও একথা অস্বীকার করিবেন না, যে ভারতে যথেষ্ট কাঁচা মালের উৎপত্তি হওয়ায় এদেশে অনেক শিল্পদ্রব্য অতিশয় সস্তায় প্রস্তুত হইয়া পৃথিবীর বাজারে রপ্তানি হইতে পারে এবং তাহাতে উক্ত নীতির স্বার্থকতাই সম্পাদিত হয়। কিন্তু বিদেশের মূলধন, কার্য্যদক্ষতা, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং সর্ব্বোপরি রক্ষানীতির প্রতিযোগিতা হইতে এদেশের শিশুশিল্পকে প্রথমতঃ বিশেষ ব্যবস্থার দ্বারা বাচাইয়া না রাখিতে পারিলে অঙ্কুরেই উহা নষ্ট হইয়া যাইবে, সুতরাং কোন দিনই উহা অবাধ-বাণিজ্য নীতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিবে না। ফলতঃ, চিনি তামাক কাগজ দেয়াশালাই চামড়া, নানাপ্রকার তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যবসায় এদেশে স্থাপিত করিতে হইলে, যেমন গভর্ণমেণ্টের উৎসাহ এবং সাহায্য দরকার, সেইরূপ বিদেশী

প্রতিযোগিতা হইতেও ইহাদিগকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন। ইহা একবার দাঁড়াইয়া গেলে তখন আর কোন বিশেষ ব্যবস্থার দরকার হইবে না। কিন্তু শিশুকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা না করিলে সে জীবন-সংগ্রামে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিবে না। এজন্য বিশেষ বিশেষ কার্য্যে ষ্টেটের বিশেষ বিশেষ সাহায্য দরকার! গভর্ণমেণ্টের সেই সাহায্য দিবার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক।

অধ্যাপক লিস্ স্মিথ বলিয়াছেন, শিশু-শিল্পকে একবার হাত ধরিয়া চালাইতে আরম্ভ করিলে উহা কোন দিনই হাটিতে শিখিবে না এবং উহা চিরকালই আদুরে "বৃদ্ধশিশু" হইয়া থাকিবে। অনেক ক্ষমতাশালী ব্যবসায়ীর স্বার্থ উহাতে বিজড়িত হইয়া পড়িবে, তখন গভর্ণমেণ্ট আর প্রদত্ত সাহায্যের প্রত্যাহার করিতে পারিবেন না। বাস্তবিক পক্ষে এরূপ অনেক "বৃদ্ধশিশু" অনেক দেশে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। অধ্যাপক মহাশয়ের একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু প্রথম হইতেই এই সাহায্যের সময় নির্দ্ধারণ করিয়া দিলে অর্থাৎ ২০।২৫ কিম্বা কোন নির্দ্দিষ্ট বৎসরের জন্য সাহায্যের সীমা নির্দ্দেশ করিবার ব্যবস্থা করিলেই এ আপত্তি মিটান যাইতে পারে। কিন্তু এইরূপ কোন ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা ভারতের নাই।

অবাধ বাণিজ্য নীতি যে ভারতে পূর্ণ মাত্রায় চলিতে পারে না, স্বর্গীয় মিষ্টার রাণাড়ে সর্ব্বপ্রথম সেকথা প্রচার করিবার চেষ্টা করেন এবং বলেন যে, ভারতে ইংরেজ রাজত্ব যখন ঐশ্বরিক বিধান তখন ইংরেজের ভারতরাজ্যশাসন সেই বিধানেই উপযুক্তভাবে অর্থাৎ ভারতের স্বার্থের দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া করা কর্ত্তব্য। ইংলণ্ডের সহিত সম্বন্ধ অব্যাহত রাখিয়া ভারতের সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ ইংরেজকে দেখিতে হইবে। সুতরাং কেবল অবাধ বাণিজ্য নীতির ধুয়া ধরিয়া ভারতের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির বিশেষ চেষ্টা না করিয়া বসিয়া থাকিলে ইংলণ্ডের কর্ত্তব্যপালন করা হইবে না।

মিষ্টার রাণাড়ে বলিয়াছেন :—

"Even if political Considerations forbid independent action in the matter of differential duties, the pioneering of new enterprises is a duty which the Government might more systematically undertake."

অর্থাৎ "রাজনৈতিক কারণে পক্ষপাতিত্বমূলক শুল্ক-স্থাপনে গভর্ণমেণ্টের স্বাধীনতা না থাকিলেও নূতন শিল্পের উন্নতিকল্পে গভর্ণমেণ্টের রীতিমত সাহায্যপ্রদান করা আবশ্যক।"

কিন্তু অধ্যাপক লিস্‌স্মিথ এইটুকু অগ্রসর হইতেও প্রস্তুত নন। তিনি বলেন, পাশ্চাত্যভাবে ভারতীয় শিল্পবাণিজ্য একদিনে হঠাৎ বাড়িয়া উঠিতে পারে না এবং গভর্ণমেণ্টের কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা সেরূপ চেষ্টাতে অনিষ্টই হইবে। ভারতের রক্ষণশীলতা দেশের সমস্ত উন্নতি বদ্ধ রাখিয়াছে, সুতরাং পূর্ব্বে সমাজসংস্কার, সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষা, শিল্পশিক্ষা, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, আর্থিক সমবায় প্রভৃতির দ্বারা দেশকে প্রস্তুত করিতে না পারিলে শিল্পবাণিজ্যে আমরা প্রতীচ্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিব না। কথাটা অনেক পরিমাণে সত্য। ভারতের শিক্ষিত এবং অগ্রণী নায়কদিগের মধ্যেও এখন আমরা বর্ণাশ্রমে ফিরিয়া যাইবার জন্য আন্দোলন দেখিতে পাইতেছি; কিন্তু এই রক্ষণশীলতা স্বত্বেও আমরা দেখিতেছি অধ্যাপক মহাশয়ের নির্দ্দিষ্ট পথে গত ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে আমরা অনেক অগ্রসর হইয়াছি। বিগত কয়েক বৎসরে পতিত-জাতির উদ্ধারে সামাজিকগণ বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়াছেন, অনেক কলকারখানা, ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স আফিস, কো-অপারেটিভ ক্রেডিট-সোসাইটী প্রভৃতি দেশে গঠিত হইয়াছে এবং সাধারণে ইহার উপকারিতা এখন বুঝিতে পারিয়াছেন। সুতরাং গভর্ণমেণ্টের এবিষয়ে যথোপযুক্ত সাহায্য করিবার সময় আসে নাই এরূপ মনে করিবার হেতু নাই।

তারপর রপ্তানি শুল্কের বিষয় একটা কথা বিবেচনা করিবার আছে। অনেক কাঁচামাল সাধারণতঃ আমাদের একচেটিয়া পণ্য। চাউল একেবারে একচেটিয়া না হইলেও ভারতের চাউল না হইলে অনেক দেশের চলে না, সুতরাং চাউলের উপর রপ্তানি শুল্ক আছে। এই শুল্কে যেমন এক দিকে রাজস্ববৃদ্ধির সাহায্য করিতেছে, অপর দিকে সেইরূপ চাউল রপ্তানিতে বাধা দিয়া বিদেশের পক্ষে মূল্য বাড়াইয়া দেশের ব্যবহারের জন্য উহার প্রাচুর্য্যের এবং মূল্য কমাইয়া রাখার ব্যবস্থা করিতেছে। পাট আমাদের একচেটিয়া পণ্য, উহার উপর যথেষ্ট রপ্তানি শুল্ক চলিতে পারে। কার্পাসের দাম পৃথিবীতে যেরূপ চড়িয়াছে এবং এদেশের কাপড়ের

কলগুলি যেরূপ উন্নতি করিয়াছে, তাহাতে রপ্তানিশুল্ক দ্বারা জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ভারতীয় কার্পাসের রপ্তানি কষ্টকর এবং অসুবিধাজনক করিয়া দিতে পারিলে ভারতীয় কলগুলি সস্তায় কাঁচামাল পাইয়া অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে কাপড় বিক্রয় করিতে পারে এবং বিলাতি কাপড়ের সহিত বর্ত্তমান বাজারে ভালরূপেই প্রতিযোগিতা করিতে পারে। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট সেরূপ কোন ব্যবস্থা করিতে অক্ষম। সুতরাং এই সুবিধার বাজারেও সস্তা কার্পাসের অভাবে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলি বিশেষভাবে মাথা উঠাইতে পারিতেছে না। আবার অন্য দিকে চামড়া, রেশম, পশম, কাগজ প্রভৃতির কার্য্যে এখন রক্ষানীতি চলিতে পারে না। কারণ এই সকল কার্য্য এখন রীতিমতভাবে এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই এবং গভর্ণমেণ্টের বিনা সাহায্যে শীঘ্র পারিবে এরূপ আশাও করা যায় না। সুতরাং এই সকল কার্য্যে রক্ষানীতি অবলম্বিত হইলে কেবল আমাদিগকে উহা অধিক মূল্যেই কিনিতে হইবে, কিন্তু তাহার ফলে ভারতে এই ব্যবসায়গুলি হঠাৎ প্রতিষ্ঠিত হইবে না। বিদেশী আমদানী অব্যাহত রাখিয়া "বাউণ্টি" দ্বারা ইহাদিগকে সজীব এবং বলিষ্ঠ করিয়া তোলাই বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এ বিষয়ে আমাদের নীতি হওয়া উচিত। এইরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

আরও একটি কথা এখানে বলা দরকার। আমাদের কাঁচামাল যে সকল দেশের শিল্পের জন্য দরকার। ঐসকল দেশ বিনা শুল্কে এসকল কাঁচামাল তথায় প্রবেশ করিতে দেয়, কিন্তু ভারতের শিল্পোৎপন্ন কোন দ্রব্য কিংবা যে সকল কাঁচামাল তাহাদের শিল্পের জন্য আবশ্যক নাই, তাহা ঐ সকল দেশে পাঠাইতে হইলেই আমাদিগকে অতিশয় অধিক হারে শুল্ক দিতে হয়। ঐ সকল বিদেশী রাজ্যের সহিত ভারতেরও ঐরূপ ব্যবহারের ক্ষমতা কেন থাকিবে না তাহা বুঝিতে পারা যায় না। করাচির মিষ্টার ওয়েবের "India and the Empire" নামক পুস্তকের ভূমিকায় ভারতের ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিব সার এডওয়ার্ড ল লিখিয়াছেন :—

They (the protectionist countries of the world) thus achieve their object of maintaining a cheap supply of raw materials for their own industries, while successfull obstructing industrial developments in India. It is their natural desire to keep the peoples of India in the positon of hewers of wood and drawers of water for their manufacturers. Ought such a situation to be tolerated when we hold the remedy in our own hands? Can we expect the people of India to accept it with equanimity?

অর্থাৎ "পৃথিবীর রক্ষানীতি পরিগ্রাহক রাজ্যগুলি এইরূপে তাহাদের শিল্পের আবশ্যকীয় কাঁচামাল সস্তায় পাইবার ব্যবস্থা রাখিয়া ভারতের শ্রমশিল্প পরিপুষ্টিতে বাধা দিতে কৃতকার্য্য হইয়াছে। ভারতবাসীদিগকে ঐ সকল দেশের শিল্পদ্রব্য উৎপাদকগণের কাঠ কাটিবার এবং জল তুলিবার কাজে নিযুক্ত রাখাই তাহাদিগের স্বাভাবিক ইচ্ছা। যখন আমাদের হাতেই ইহার ঔষধ রহিয়াছে তখন কি এ অবস্থা আমাদিগের সহ্য করিয়া থাকা উচিত? ভারতবাসিগণ এই অবস্থা সন্তুষ্টচিত্তে মানিয়া নিবেন, আমরা কি এরূপ আশা করিতে পারি?"

ইহার প্রতিবিধানের ক্ষমতা ভারত-গভর্ণমেণ্টের থাকা দরকার। প্রতিবিধান করিলে ইংলণ্ডের অসুবিধা হইতে পারে, কিন্তু ভারতের স্বার্থ ইংলণ্ডকে দেখিতে হইবে।

ফলতঃ, যে দিক দিয়াই বিবেচনা করা যা'ক না কেন, কেবল অবাধ বাণিজ্য-নীতির সুর ধরিয়া বসিয়া থাকিলে আর চলিতেছে না; ইংলণ্ডেও ইহার পরিবর্ত্তনের জন্য আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। যুদ্ধের পর ইংলণ্ডে বিশেষ ব্যবস্থাও এ বিষয়ে হইবে। আমরাও আমাদের ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা চাহিতেছি। ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় স্বার্থে গুরুতর কোন আঘাত না দিয়া এবং সাম্রাজ্যবাদের গণ্ডীর বাহিরে না গিয়া যতটুকু fiscal autonomy সম্ভব, ততটুকু আমরা যুদ্ধের পরে, যখন এ বিষয়ের ব্যবস্থা হইবে তখন পাইবার দাবী করি। আমাদের দেশে আমদানী মালের শতকরা ষাট ভাগ বৃটিশ দ্বীপ হইতে আসে, সুতরাং ভারতের স্বার্থ দেখিতে গেলে ইংলণ্ডের স্বার্থে যে কিছু আঘাত লাগিবে না এরূপ বলিতে পারি না। কিন্তু উভয় পক্ষের এবং বৃটিশ কলোনী সমূহেরও স্বার্থ উপযুক্ত রূপ এবং যথাসম্ভব অব্যাহত রাখিয়া একটা ব্যবস্থা করা কিছুই অসম্ভব ব্যাপার

নয়। যুদ্ধের পর যখন আমরা রাজনৈতিক অধিকারের প্রথম কিস্তি লাভ করিব, তখন আমরা এই অধিকারও তদুপযুক্ত পরিমাণে প্রাপ্তির আশা করিতেছি। স্যার ভ্যালেণ্টাইন চিরোল (Sir Valentine Chirole) তাঁহার "Indian Unrest" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"If we are to govern India in accordance with Indian ideas—a principle with which I humbly but fully agree—how could we justify the refusal to India of the fiscal autonomy for which there is a far more widespread and genuine demand than for political antonomy ?"

অর্থাৎ "যদি আমরা ভারতের ইচ্ছানুযায়ীভাবে ভারতশাসন করিতে চাই—যে নীতি আমি সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করি—তাহা হইলে ভারতবর্ষকে আমরা কিরূপে fiscal antonomy দিতে অস্বীকার করিতে পারি? ইহার জন্য রাজনৈতিক autonomy হইতে বিস্তৃততর এবং অধিকতর খাঁটী দাবী ভারতে বিদ্যমান আছে।"

সার ভ্যালেনটাইন চিরোল যে ভারতের রাজনৈতিক উচ্চ আকাঙ্ক্ষার বড় পক্ষপাতী নহেন, তাহা সকলেই জানেন। তিনিও এ বিষয়ে ভারতের উপর সুবিচার করিতেছেন,—একথা স্বীকার করিতেছেন। fiscal antonomy না থাকায় আমাদের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিকল্পে আমরা কোনরূপ ব্যবস্থাই করিতে পারিতেছি না। দেশের দুরবস্থা দূর করিতে হইলে, শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আমাদিগকে করিতে হইবে।

আমরা দেখিয়াছি অবাধ বাণিজ্য কিংবা রক্ষানীতির আজ্ঞাকারী সেবক হইয়া থাকিলে আমাদের চলিবে না। বর্ত্তমানে যে কার্য্যে যে ব্যবস্থা করিলে আমাদের শিল্পবাণিজ্যকে সঞ্জীবিত করিতে পারিব আমাদিগকে সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারতে, অবাধবাণিজ্যনীতির নির্দ্দিষ্ট বাঁধা পথে চলিলে আমাদের লুপ্ত শিল্পকে উদ্ধার করিতে পারিব না এবং শিশুশিল্পকেও বাঁচাইতে পারিব না। আবার রক্ষানীতির প্রবর্ত্তনও অনেক স্থলে আমাদের ক্ষতির কারণ হইবে। আমরা অবাধবাণিজ্যও বুঝি না এবং রক্ষানীতিও চাই না—আমরা চাই ইংলণ্ড এবং সমস্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহিত রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে। স্বর্গীয় মিষ্টার রমেশচন্দ্র দত্তের কথায় "I do not pin my faith to free trade and I do not pin my faith to protection, I hold that the policy most conducive to the prosperity and happiness of the people of India is the policy which should be adopted for India" অর্থাৎ "অবাধবাণিজ্য কিংবা রক্ষানীতি ইহার কোনটীর উপরই আমার বিশ্বাসকে বাঁধিয়া রাখিতে চাই না। আমি মনে করি, যে নীতিতে ভারতীয় জনসাধারণের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়, সেই নীতিই ভারতে অবলম্বন করিতে হইবে।"

যুদ্ধাবসানে কিংবা তৎপূর্ব্বে যখন ভারতীয় শাসনযন্ত্রের সংস্কার হইবে এবং আমাদের হাতে পূর্ণ ক্ষমতার এক অংশ আসিবে, তখন ঐ সঙ্গে আমরা সেই ক্ষমতারও এক অংশ চাই, যাহার বলে আমরা উপরোক্ত নীতি অবলম্বন করিতে সমর্থ হইব। Fiscal autonomy ভিন্ন political autonomy রাজনৈতিক অধিকার একরূপ উপহাসমাত্র। উহাতে দেশের সুখ কিছু বাড়িতে পারে, কিন্তু সমৃদ্ধি বাড়িবে কিনা সন্দেহ।

শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র।

ভিখারী।

সহসা একদা অতিথির মত
আসিয়া এ দীন ঘরে—
বলিলে আমায় "তব সব ভার"
বহিব আপন শিরে,

হাতটী ধরিয়া নিবলো তোমায়,
আঁধার হইতে আলোক-সভায়—
মুক্তি লভে গো দুঃখ যথায়
প্রেমের সিন্ধুনীরে,”
তোমারে তখন দেইনিক ধরা,
ভিখারীর মত তাই চলাফেরা,
ক্লান্ত চরণ, অবশ চিত্ত
নয়ন অন্ধ নীরে ;
করুণার লাগি তৃষিত এ হিয়া
সকল দুয়ার ফিরে।

শ্রীউমাপ্রসন্ন দে।

আলম্‌গীরের পত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

(১৮)

ভাগ্যবান্ পুত্র মহম্মদ আজাম, জাহেদ্‌বাণুর মত বৃদ্ধা রমণী আর কতকাল দুর্দ্দশা ভোগ করিবে? সে তোমায় লালনপালন করিয়াছে—স্তন্য দিয়া তোমায় মানুষ করিয়াছে। তোমার এবং আমার উভয়েরই উপর তার একটা দাবী আছে জানিও। তাহার পৌত্রগণ নিজ নিজ অপরাধের জন্য শাস্তিভোগ করিয়াছে। এখন তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা তোমার কর্ত্তব্য নয়। তোমার অবশ্যই স্মরণ আছে, জাহেদ্‌বাণুর পুত্র মীরবহ্ একদিন কিরূপে তোমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল? ফতেজঙ্গখাঁর হস্তী একদিন হঠাৎ ক্ষেপিয়া গিয়া তোমার উপর চড়াও করিয়াছিল, সেই সময় মীরবহ্ বীর রুস্তমের মত সাহস দেখাইয়া ক্ষেপা হাতীটাকে নিরস্ত করিল। আমি তাহাকে সম্মানের পরিচ্ছদ পুরস্কার দিতে গেলাম, কিন্তু সে সবিনয়ে বলিল, "আমি এই গৃহেই জন্মিয়াছি, সুতরাং আমি পর নই। অতএব নিজের ভাইয়ের প্রতি কর্ত্তব্য করিয়া কেন আমি তজ্জন্য মজুরী লইব?" খোদার দোহাই পুত্র, এই রমণীর প্রতি বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ কর। তুমি ছাড়া এই বৃদ্ধার এখন এমন আর কেহ নাই, যে তাহার দুঃখ দূর করিবে। পরিবারস্থ প্রাচীন-প্রাচীনাদের সহিত কখনও অসদ্ব্যবহার করিবে না, সর্ব্বদা তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবে। কারণ, জানিও পুত্র, যাহারা তোমার দ্বারা উপকৃত হইবে, তাহারা কদাচ তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না।

(১৯)

সুখী পুত্র আজাম, শুনিলাম তুমি তালীনদীতে মাসাবধি ধরিয়া হাঁস শিকার করিয়া বেড়াইয়াছ। শিকার জিনিষটা খুব আমোদজনক সন্দেহ নাই, আর ইহাতে রসনাতৃপ্তিকর আহার্য্যের ব্যবস্থাও হয়। কিন্তু, রাজকার্য্যের অবসানে যে সময়টুকু থাকে, তাহা এই শিকারে অপব্যয়িত না করিয়া রাজোচিত কার্য্যে নিয়োজিত করা আবশ্যক। কারণ, রাজোচিত কার্য্যই মুখ্য এবং অবশ্য কর্ত্তব্য জানিও। দেশ বিদেশের ইতিহাস শ্রবণ, বিভিন্ন প্রদেশের বিবিধ তথ্য-সংগ্রহ প্রভৃতি কার্য্য রাজার পক্ষে যারপরনাই প্রয়োজনীয় এবং অতীব লাভজনক। এক প্রদেশের শাসন-কার্য্য সুনিয়ন্ত্রিত হইয়াছে বলিয়া যদি তোমার মনে হয়, তবে খাঁ জাহান, আকেল খাঁ, সুজাত খাঁ, মহম্মদ বেগ প্রভৃতি অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণের কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিতেছ না কেন? শিকার করিতে পাইলে তুমি আনন্দ পাও, আমি কিন্তু বিদ্রোহীদিগকে দমন এবং দুর্গ অধিকার প্রভৃতি কার্য্যে অধিক আনন্দ পাই। হায় পুত্র, ইহজীবনে তোমার কি গতি হইবে, এবং পরজীবনেই বা কি হইবে? পরকে উপদেশ দেওয়ার লোক বিস্তর, কিন্তু নিজকে উপদেশ দেয়, এমন লোক কোথায়? জীবন দ্রুত চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু আমরা কোনও কাজ করিতে পারিলাম না। মৃত্যুর পর খোদার নিকট আমরা কি জবাব দিব, পুত্র? হে ন্যায়পরায়ণ খোদা, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও।

(২০)

সুখী পুত্র, ভগবান তোমাকে সতত রক্ষা করুন। শুনিতেছি, তোমার প্রাসাদরক্ষকের পুত্র নক্করখানায় বসিয়া জুয়া খেলিয়া থাকে। হায়, হায়, কি আপ্‌শোষ! তুমিই ত এই সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী। তবে কেন তুমি রাজকার্য্যে এত উদাসীন? তোমার চরগণ কেন তোমাকে সঠিক খবর দেয় না? নিশ্চয় তাহারা তাহাকে বাঁচাইবার জন্য এই বিষয় গোপন করিতেছে, কারণ সে তাহাদের বন্ধু। তুমি এই দণ্ডে নূতন চর নিযুক্ত কর এবং এইরূপ কার্য্য পুনরায় যাহাতে না হয়, সেজন্য তাহাদিগকে বিশেষরূপ সাবধান করিয়া দাও।

(২১)

প্রিয় পুত্র আজাম, গুজরাট প্রদেশের দুহাদনগর আমার, এই মহাপাতকীর জন্মস্থান। পুত্র, এই নগরের অধিবাসীগণের প্রতি তুমি বিশেষ অনুগ্রহদৃষ্টি রাখিবে। পীরমক্কাকে তুমি চেন, সে অনেক বৎসর ধরিয়া এই নগরে শাসনকর্ত্তার কাজ করিয়াছে। তাহাকে তুমি তাহার নিজপদে প্রতিষ্ঠিত রাখিবে। স্বার্থপর নিন্দুকের দল যা ইচ্ছা বলুক, অন্ততঃ পীরমক্কার খাতিরে ইহাদের কথা কাণে তুলিও না। এই সকল স্বার্থপর লোক যেমন কপট, তেমনই ভণ্ড। খোদা ইহাদের ভণ্ডামির ব্যাধি দিন দিন বৃদ্ধিই করিয়া দিতেছেন। পুত্র, রাজার সাধারণতঃ দুটি চক্ষু থাকে। একটি দুর্ব্বল এবং দুর্দ্দশাগ্রস্তকে দয়া করিবার জন্য। ইহা সাধারণ চক্ষু। এ ছাড়া যাহারা রাজার প্রিয়পাত্র, তাহাদিগকে অনুগৃহীত করিবার জন্য আর একটি চক্ষু থাকে। ইহা রাজার বিশেষ চক্ষু।

(২২)

সৌভাগ্যবান্ পুত্র, তোমার সৎ অভিপ্রায় সত্বেও তুমি তোমার অত্যাচারী কর্ম্মচারিগণের কার্য্যকলাপের প্রতি এ প্রকার উদাসীন কেন? কেন তুমি তাহাদিগকে রীতিমত সাজা দিতেছ না? গুজরাটের হাজিপুর, মির্জ্জাপুর জেলায় এবং আরও অনেক স্থানে প্রত্যহ দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং অত্যাচার ঘটিতেছে। অসভ্য কুলীগণ মীরগঞ্জ সহর প্রায়ই লুঠ করিতেছে। অথচ এই স্থান রাজকীয় সৈন্যাবাসের অতি নিকটবর্ত্তী। অসভ্য কুলীগণ আসিয়া সহরবাসিগণকে বাঁধিয়া লইয়া যায়, পথিকগণকে ধরিয়া লইয়া যায়। আমন আল্লাবেগকে তুমি নাভার প্রধান কোতোয়ালরূপে নিযুক্ত করিয়াছ। কিন্তু এই লোকটা তার নিজের যত সব বদ্‌মাইস কুটুম্বকে ধরিয়া গ্রাম্য 'পেটেল' নিযুক্ত করিয়াছে। লোকের আর 'টুঁ' শব্দটি করিবার যো নাই। কারণ, কে সাহস করিয়া তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিবে? হায় পুত্র, সময় ঠিক ঘূর্ণমান তলোয়ারের মত দ্রুত চলিয়া যাইতেছে আর সেই সঙ্গে প্রজাগণের অভিশাপজনিত ভয় অন্তরে বদ্ধমূল হইতেছে। পুত্র, কোতোয়ালের পদ একজন গুজরাটীকে দেওয়া উচিত। হয় মফদর খাঁ ইসানিকে, না হয় বালোল সেরবাণীর পুত্রগণকে এই পদ দাও। আমি স্পষ্ট বলিতেছি, পুত্র, এই সকল বদ্‌মাইস লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন জন্য এবং তাহাদের অত্যাচারের প্রশ্রয় দিবার জন্য খোদার নিকট আমাদিগকে জবাবদিহি করিতে হইবে। তুমি এই প্রদেশে দক্ষ এবং বিশ্বস্তচরগণকে প্রেরণ কর, এবং তাহাদের নিকট খবর পাইয়া তুমি কিরূপ হুকুমজারি করিতেছ তাহার প্রাত্যহিক বিবরণ আমার নিকট পাঠাইতে থাক। খোদার নিকট বিচারের দিন যখন আমার পাপের হিসাব পেশ হইবে, তখন তিনি তাহা দেখিয়া অন্য সকল পাপীর হিসাব ছিঁড়িয়া ফেলিবেন। কারণ, আমিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাপী। অন্যের পাপ আমার পাপের তুলনায় অতি সামান্য।

(২৩)

প্রিয়পুত্র আজাম, সুজাত খাঁ মহম্মদ বেগের অস্থিপঞ্জর ত এখনও পচিয়া গলিয়া যায় নাই—সে ত এই সেদিন মাত্র ইহধাম ত্যাগ করিয়াছে। তাহার যে সকল দাবী দাওয়া আছে সে সব তুচ্ছ করা উচিত নহে। তাহার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে দুজন জামাতা এবং একটি পোষ্যপুত্র বিদ্যমান। অতি সামান্য অপরাধে তাহার এই উত্তরাধিকারিগণকে কেন তুমি পদচ্যুত করিয়াছ? ভগবানই জানেন, তাহাদের অপরাধ সত্য কি মিথ্যা। পুত্র, একজন মুসলমানকে একজন হিন্দুর খাতিরে পদচ্যুত করা বড়ই অবিবেচনার কার্য্য।

(২৪)

ভাগ্যবান্ পুত্র, আমি তোমাকে বিচক্ষণ কার্য্যকুশল এবং ধীরবুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া জানি। জগদীশ্বর তোমার পবিত্র মুখখানিকে অসৎ দৃষ্টি হইতে রক্ষা করুন। বড়ই

আশ্চর্য্যের কথা, পুত্র, যে তুমি মহম্মদ বেগখাঁকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া সের আন্জাদখাঁকে সুরাটের ফৌজদার নিযুক্ত করিয়াছ। মানুষের যোগ্যতা এবং ব্যক্তিগত ক্ষমতা কখনও গোপন থাকে না। বাহ্যিক অবয়ব দেখিয়া মানুষের অন্তরের ভাব স্পষ্ট বুঝিতে পার৷ যায়। এই সুরাটেই মহানুভব কুতবউদ্দিন একদিন ফৌজদারের কাজ করিয়াছিলেন। সৈয়দ কমাল এবং সৈয়দ মোরাদকে যদি তুমি এই পদে অভিষিক্ত করিতে চাও আমার তাহাতে আপত্তি নাই। কারণ, ইহারা এই প্রদেশে কিয়ৎপরিমাণে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। যাহা হউক পুত্র, সুরাট এবং তৎসন্নিহিত কয়েকটি স্থান তোমাকে জায়গীর স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে, তুমি যাহাকে যোগ্য মনে করিবে তাহাকেই ফৌজদার নিযুক্ত করিতে পার। কিন্তু সে যেন ঐ পদের উপযুক্ত হয়। আমম্ আল্লা বেগ এবং বাহাদুর বেগ যদি তোমার কাছ ছাড়া হইতে চায়, তবে তাহাদিগকেই ঐ পদে নিযুক্ত কর। রাজ্য পরিচালনা কার্যে বিশেষতঃ রাজনীতি এবং অর্থনীতি ক্ষেত্রে সাধুতা এবং যোগ্যতাই প্রধান অবলম্বন। অযোগ্য ও স্বার্থপর ব্যক্তি শত সহস্র পাইবে, কিন্তু যোগ্য ও সৎলোক কয়টি আছে? সাহাম্ সা আকবরের প্রভুভক্ত এবং বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী অনেক ছিল। তিনি তাহাদের উপর যুদ্ধভার এবং অন্যান্য গুরুতর কার্য্যভার অর্পণ করিয়া সুফললাভ করিতেন। সাহান্‌সা সাজাহানের সময়েও বিশ্বাসী ভৃত্য, সুযোগ্য কর্ম্মচারী ও সাহসী যোদ্ধার অভাব ছিল না। তা সত্বেও সাহান্‌সা সমুদয় কার্য্য স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং সকল দিকে তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি ছিল। আমার স্মরণ হয়, সাহান্ সা মোরাদ বক্স্‌কে যখন বল্ক প্রদেশ অধিকার করিবার জন্য প্রেরণ করেন, তখন একজন সামরিক মুন্সীর আবশ্যকতা হইয়াছিল। আমার মনে পড়ে কুড়ি জন লোক এই পদটির জন্য উমেদার হইয়াছিল। আমি অনেকদিন হইতে ভাল লোক খুঁজিতেছি—বাঙ্গালাদেশে উজিরীর জন্যও কিন্তু একজনও পাইতেছি না। হায়, হায়, কাজের লোক কি দুষ্প্রাপ্য!

(২৫)

প্রিয়পুত্র আজাম, তুমি আমার শেষ হুকুমের অপেক্ষা না করিয়া যে লোকটাকে প্রধান রক্ষকের পদে বাহাল করিয়াছ, শুনিলাম সে লোকটা বেশ বুদ্ধিমান। কিন্তু, এখানে আমার কাছে যে আছে সে একট জায়গীর পাইয়াও নিজ অবস্থায় অসন্তুষ্ট। লোকটা তত খাঁটি নয়। ভৃত্যের প্রধান গুণ সাধুতা। দিলাবার খাঁর পুত্র আসাদউদ্দিন এখন তোমার নিকটেই আছে। সে কি বুদ্ধিমান? লোকটা সৎ কিনা লিখিও। তা যদি হয়, তবে তাহাকে আমি নিজের কাছে আনিয়া এই পদে বাহাল করিব। পুত্র, আমার হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পাইতে বসিয়াছে, লালসা বাড়িয়াই চলিয়াছে। আমি সৎলোক পাইবার কত চেষ্টাই করিতেছি, কিন্তু পাইতেছি না। আমার মনে হয় 'সৎলোক' বলিয়া কোন জিনিষ সংসারে নাই, এটা কেবল কথার কথা মাত্র—যেমন 'উন্‌কা' বলিয়া কোন পাখী সত্য সত্যই কেহ কখনও দেখে নাই, কেবল নামটা চলিয়া আসিতেছে মাত্র। 'সৎলোক' কথাটি ঠিক এই 'উন্‌কার' মত বলিয়াই আমার মনে হয়। একজন দার্শনিককে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "স্বার্থপরতা রোগের ঔষধ কি?" দার্শনিক উত্তর দিয়াছিলেন, "স্বার্থপরতা গুণ মানুষের আজন্মলব্ধ। ভৃত্যের এই গুণ থাকিলে মনিবকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হয়। বিচক্ষণ মনিবের উচিত সতত লক্ষ্য রাখা যাহাতে ভৃত্যের সাধুতাগুণ অভাবের পঙ্কিল জলে পড়িয়া নষ্ট না হইয়া যায়।"

(২৬)

ভাগ্যবান্ পুত্র সওদাগর মহম্মদ আনোয়ারকে আসলাম্বুর সমুদ্র বন্দরের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়াছিলে। কিন্তু তাহার কোন যোগ্যতাই নাই দেখিতেছি। এই ব্যাপার হইতে বুঝা গেল, যে তোমার কার্য্যকুশলতা, তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধি এবং গভীর বিবেচনা শক্তি থাকা সত্বেও তুমি একজন তস্করকে চৌকিদারের পদে নিযুক্ত করিয়াছ। এই প্রকার নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ ভবিষ্যতে আর যাহাতে তুমি না কর, সে বিষয়ে সাবধান হইবে।

(২৭)

সুখী পুত্র আজাম, মান্দেশ্বর তোমাকে জায়গীর স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে। ইহা মালবদেশের মধ্যে একটি প্রধান জেলা। পূর্ব্বে এস্থানে সরবুলন্দ খাঁ, হাসান আলি খাঁ প্রভৃতির ন্যায় দক্ষ কর্ম্মচারিগণ শাসনকর্ত্তার কাজ করিয়াছেন। পুত্র, এইস্থানে একজন অতি বিচক্ষণ, নির্ভীক এবং সৎপ্রকৃতির লোককে তোমার প্রেরণ করা কর্ত্তব্য।

একদিন সাহান্‌সার (সাজাহান) দরবারে কথা উঠিল—সায়েদ আল্লাখাঁর যে এত অধিক ধন সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য এবং প্রাসাদের যে বিপুলতা ও শোভাসৌন্দর্য্য, এ সকলই তাহার সুযোগ্য কর্ম্মচারী আবদুল নবীর কার্য্যনৈপুণ্যের ফল। খাঁ স্বয়ং কেবল বিষয়কার্য্য লইয়া ব্যস্ত থাকেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে সাহান্‌সা (সাজাহান) তাহাকে বলিলেন, "খাঁ, আমি শুনিয়াছি,' তোমার কাছে পরশপাথর আছে। আমাকে কি সেটা তুমি উপহার দিবে ?" খাঁ উত্তর করিলেন, "খোদাবন্দ্, পরশপাথর আমার একটি আছে সত্য, কিন্তু সেটি জিনিষ নয়—সে একটি মানুষ। আবদুল নবীই আমার পরশপাথর। তাহার গুণেই আমার সব জিনিষ সোণা হইয়া যায়।" সাহান্‌সা জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন এবং প্রশান্তভাবে কহিলেন, "এজন্য আমি তোমাকে সাধুবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এই লোককে তুমি চিরদিনের জন্যই গ্রহণ কর। বুদ্ধিমান, সৎ এবং ধর্ম্মভীরু-লোক জগতে দুষ্প্রাপ্য। মানুষ ত জগতে বিস্তর রহিয়াছে, কিন্তু মানুষের যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণ, অর্থাৎ সাধুতা, সেইটিই দুর্লভ।" এই কথার পর খাঁ নতজানু হইয়া সাহান্‌সাকে সেলাম্ করিলেন।

(২৮)

প্রিয়তম পুত্র আজাম, তরুণবয়স্ক পুত্র তাহার বৃদ্ধ পিতাকে মোটেই ভালবাসে না। কিন্তু বৃদ্ধ পিতার সে পরম স্নেহের ধন। এস আমার নয়নের মণি, শীঘ্র এস। তোমার সন্তাপিত বৃদ্ধপিতার হৃদয় শীতল কর।

(২৯)

সুখী পুত্র, সায়েদ আল্লা খাঁ একদিন সাহান্‌সার (সাজাহানের) দরবারে কিছু বিলম্ব করিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সাহান্‌সা তাহাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে খাঁ উত্তর দিয়াছিল, "আমি একখানা কেতাব পড়িতেছিলাম। খোদাবন্দ্‌কে দেখাইবার জন্য আমি উহার কয়েকস্থল নকল করিয়া আনিয়াছি। এই দেখুন, ইহাতে এই কয়টি উপদেশ আছে।—"রাজার ন্যায় বিচারের উপর সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। বীরত্ব এবং দান এই দুইটি বস্তু হইতে সাম্রাজ্য উন্নত এবং সমৃদ্ধিশালী হয়। সর্ব্বদা জ্ঞানী এবং বিদ্বান্ লোকের সহবাস করিবে। নির্ব্বোধের সংসর্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। বিবেক-বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করা এবং বিপদে অবিচলিত থাকা জ্ঞানবানের কর্ত্তব্য। সাংসারিক বিধি-ব্যবস্থায় আনাড়ীর মত কার্য্য করিবে না, নিজের বুদ্ধি বিবেচনার উপর বিশ্বাস রাখিবে। পারিবারিক সুখসম্পদের জন্য ভগবানকে সতত ধন্যবাদ দিবে। অনাথা বালকবালিকাকে দয়া করিবে। যদি কখনও অভাবগ্রস্ত হইতে না চাও, তাহা হইলে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির সর্ব্বদা মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবে। রাজকার্য্যের সুপরিচালনযোগ্য মন্ত্রিগণের মন্ত্রনা'র উপর নির্ভর করে এবং জয়লাভ ও সাফল্য তাপসগণের আশীর্ব্বাদের উপর নির্ভর করে। যদি স্বয়ং রোগমুক্ত হইতে চাও, তবে যাহারা রোগ-পীড়িত তাহাদিগকে রোগমুক্ত করিবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাও। যদি পরমেশ্বরের নিকট স্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা পাইতে চাও, তাহা হইলে প্রথমে অপরাধিগণকে মুক্তি দান কর।". সাহান্‌সা সায়েদ আল্লাখাঁর কথায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহার শির-শ্চুম্বন করিলেন এবং তাহাকে সুবর্ণখচিত বহুমূল্য পরিচ্ছদ উপহার দিলেন। পুত্র, আমার মনে হইল, এই অমোঘ উপদেশগুলি আমার একার সঞ্চয় করিয়া রাখা কর্ত্তব্য নয়। সুতরাং আমি আমার প্রিয়পুত্রকেও তাহা বিদিত করিলাম। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তুমি যেন এই উপদেশগুলি মানিয়া চলিতে পার।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযামিনীকান্ত সোম বিদ্যারত্ন।

মরণানুভূতি।

দিবসের আঁখি পরে, নিদ্রা ব্যাধি হানি'
যায় যবে রক্তরবি ; বিশ্ব দেয় টানি

গাঢ় কৃষ্ণ-যবনিকা, বিচিত্রতাময়
অগণন দৃশ্য 'পরে, করে সমুদয়

একীভূত, এক শুধু মহা অন্ধকারে -
তখনি হৃদয় নিজের অজ্ঞাতসারে
কম্পিত হইয়া উঠে ভয়ে কি বিস্ময়ে ;
মুদি' আসে আঁখি, বাণী যায় মূক হয়ে'
থেমে আসে যেন ধীরে প্রাণের স্পন্দন
মরণেরে অনুভব করে এ জীবন !

কথক—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন।

লেডী ডাক্তার।

(১)

আসন্নপ্রসবা পত্নী সুখময়ীকে বড় রুগ্ন ও দুর্ব্বল দেখিয়া ধীরেশবাবু যারপরনাই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। প্রথম দুইটি সন্তান—একটি পুত্র ও একটি কন্যা—বেশ নির্ব্বিঘ্নে ও সহজে হইয়াছিল। কিন্তু এবার কেন এমন হইল ?

তিনি একদিন কহিলেন, "বড় যে দুর্ব্বল হ'য়ে প'লে সুখো,—আমার বড় ভয় হ'চ্চে।"

সুখময়ী রক্তহীন পাংশুমুখে একটু হাসিয়া কহিলেন, "ভয় কি ? এমন কত হয়ে থাকে।"

"কত খারাপও ত হয়। না—না, আর তোমার কথা শুনব না। আজই জীবনবাবুকে ডেকে দেখাই।"

"ওমা, সে আমি পারব না। ছি! ডাক্তার এসে কি দেখ্‌বে ? ভয় নেই কিছু তোমার,—"

ধীরেশবাবু কহিলেন, "তবে ভাল একজন লেডী ডাক্তারই বরং দেখাই। কি জান, আগে থেকে সাবধান হওয়া ভাল। হয় ত কোর্টে থাক্‌ব কি বাহিরে কোথাও যাব—হঠাৎ একটা গোলযোগ কিছু হ'লে বড় বিপদ হবে শেষে।"

সুখময়ী কহিলেন, "তা বরং দেখাতে পার, তবে পুরুষ ডাক্তার কাউকে ডেকো না কিন্তু। সে আমি প্রাণ গেলেও কাউকে দেখাতে পারব না।"

"তেমন অবস্থা হ'লে তাও দেখাতে হবে বই কি ? তবে এখন ভাল একজন লেডী ডাক্তারই দেখাই।"

"কাকে দেখাবে ?"

"জানি নে ত কিছু। এসব দায়েও আর কখনও ঠেকিনি —তবে জীবনবাবু ব'লছিলেন, গঙ্গাদাসীর কথা—"

"গঙ্গাদাসী। ওমা, সে আবার কে ?"

"ভাল একজন লেডী ডাক্তার—বৌবাজারের ওদিকে থাকে।"

"গঙ্গাদাসী। ওমা, এমন নাম ত কোথাও শুনিনি।"

ধীরেশবাবু একটু হাসিয়া কহিলেন, "কত এমন নাম আছে,—হরিদাসী, রামদাসী, কালিদাসী, ধর্ম্মদাসী—"

"সে ঝি টিদের থাকে,—লেডী-ডাক্তারের নাম আবার গঙ্গাদাসী! ভদ্দরলোক কেউ মেয়ের নাম রাখে গঙ্গাদাসী ?"

"তা হয়ত কোনও ঝি টিরই মেয়ে হবে। ঝিও দুই এক জন এমন আছে, লেখাপড়া শিখিয়ে ক্যাম্বেলে মেয়েকে পড়িতে দেয়। আর না হয়, এও হ'তে পারে, কারও মরুঞ্চে মেয়ে, গঙ্গার কাছে মানত টানত ক'রে বাঁচিয়েছে—"

"সে ডাক নাম হ'তে পারে। ভাল নাম কি আর মেয়ের কেউ গঙ্গাদাসী রাখে ? অমন নামে যে মেয়ের বিয়েই হবে না।—যে শুনবে মুখ বাঁকিয়ে পিছিয়ে যাবে, দেখতেও চাইবে না।" ও ভদ্দর লোকের মেয়ে নয়,— আর ভদ্দর লোকের মেয়ে লেডীডাক্তার হ'লে সে হবে খৃষ্টেন কি বেহ্মদের কারও মেয়ে। তারা কিছু আর গঙ্গাদাসী নাম রাখ্‌তে যাবে না। ও—ওই যা ব'ল্লে কোন ঝির মেয়ে টেয়েই হবে।" এই বলিয়া সুখময়ী একটু মুখ বাঁকাইলেন।

ধীরেশবাবু কহিলেন, "তা হ'লই বা ঝির মেয়ে—কি হ'লই বা নাম গঙ্গাদাসী। তাকে নিয়ে ত ঘর করে যাব না ? ডাক্তারীতে যদি ভাল হ'ল, আমাদের সেই ভাল,—এখন সে ঝির কন্যে কি রাজার কন্যে যাই হ'ক, নাম তার গঙ্গাদাসীই হক্, কি সরোজবাসিনী কনকনলিনীই হ'ক।

"হাঁ, ঝির মেয়ে—নাম গঙ্গাদাসী, সে যা ভাল ডাক্তার হবে, তা মা গঙ্গাই জানেন।"

ধীরেশবাবু হাসিয়া উঠিলেন,—কহিলেন, "দেখদেখি কি পাগলামো! ঝির মেয়ে আর নাম গঙ্গাদাসী, তাই ব'লে সে ভাল ডাক্তার হবে না! জীবনবাবু ত নামকরা ডাক্তার—আর প্রসবের কাজে তাঁর অভিজ্ঞতা খুব আছে। তিনিই বলেন,—গঙ্গাদাসীর হাতে কোন 'কেস্' দিয়ে তিনি যেমন নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, এমন আর কারও হাতে দিয়ে পারেন না। তা তোমার যদি শ্রদ্ধা না হয়, তবে জীবনবাবুকেই দেখান যাক্।"

"ওমা, না না, সর্ব্বনাশ! তাতে কাজ নেই। তার চাইতে গঙ্গাদাসীই ভাল। গঙ্গা পাওয়াতে সেই ভাল পার্‌বে।"

"এই ত! তোমার দেখ্‌ছি মোটেই শ্রদ্ধা হ'চ্চে না এর উপর। থাক্ তবে, জীবনবাবুকে জিজ্ঞাসা করি,—আর যাকে বলেন, ডেকে দেখাই।"

"না গো! তুমি ওই গঙ্গাদাসীকেই ডাক। ও একটু রঙ্গ ক'রে ব'লছিলাম বই ত নয়?—জীবনবাবু যখন ব'লেছেন খুব ভাল, তখন ভালই অবিশ্যি হবে। আর কেউ হয়ত তার মত ভাল হবে না। আর কে জানে—সত্যি গঙ্গা পেতেই যদি হয়,—তার হাতেই সুবিধে বেশী হবে,—সে এগিয়ে দিলে গঙ্গা এগিয়ে এসেই কোলে নেবেন।"

সুখময়ী আবার হাসিয়া উঠিলেন।—

ধীরেশবাবু কহিলেন, "সেটা বোঝ। ওকে যদি সত্যিই মনে না ধরে,—তা হ'লে আর কাউকে ডাকাই ভাল। রোগীর যদি ডাক্তারের উপর ভরসা না থাকে——"

"না গো না! তুমিও যেমন। ভরসা কেন থাক্‌বে না? জীবনবাবু ব'লেছেন,—তাঁর চাইতে কি আমরা বেশী জানি? তুমি ওকেই ডাক।"

"আচ্ছা, তবে যাই, খবর পাঠিয়ে দিইগে।"

"এক্ষুনি!—ওমা, এত ব্যস্ত কেন? যাক্ না আর দুদিন—দেখ কেমন হয়—"

"না—না! আর দেরী ক'রে কাজ নেই। দেখ্‌ব আবার কি? যা দেখছি—তাতে একদিনও আর দেরী করা উচিত নয়।"

ধীরেশ উঠিয়া বাহিরে গেলেন—একখানি চিরকুটে লিখিলেন,—মিসেস্ ডি রায়,......নং......ষ্ট্রীট্।

সেই চিরকুটখানি কেরাণীর হাতে দিয়া লেডী ডাক্তার গঙ্গাদাসীর বাড়ীতে পাঠাইলেন।

(২)

বৈকালে লেডী ডাক্তারের গাড়ী দরজার কাছে আসিয়া থামিল। ধীরেশবাবু ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বাহিরে আসিলেন।

"আসুন! নমস্কার!" এই বলিয়া ধীরেশবাবু ব্যাগটি নামাইবার জন্য হাত বাড়াইলেন। গঙ্গাদাসী প্রতিনমস্কার করিয়াই মাথার কাপড় একটু টানিয়া নামাইয়া দিলেন,—তারপর অন্যদিকে একটু ফিরিয়া ব্যাগটি শক্ত করিয়া ধরিয়া নতমুখে বসিয়া রহিলেন। ধীরেশবাবু দেখিলেন, লেডী ডাক্তারের মুখশ্রী গভীর বসন্তের দাগে অতি বিকৃত, চোকে নীলরঙ্গের ঠুলী চশমা। কিন্তু এত লজ্জা কেন? বিকৃত এই মুখশ্রীর জন্য কি? ধীরেশবাবুর একটু হাসি পাইল। যাহা হউক, হাসিটুকু চাপিয়া তিনি কহিলেন, "আসুন, নেমে আসুন,—ব্যাগটি আমার হাতে দিন।"

গঙ্গাদাসী ধীরেশবাবুর দিকের মাথার কাপড় আরও একটু টানিয়া অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, "আপনি ওদিকে যান, ব্যাগ আমিই নিয়ে যাচ্ছি।"

ধীরেশবাবু অগত্যা সরিয়া দাঁড়াইলেন। গঙ্গাদাসী ব্যাগটি হাতে লইয়া গাড়ী হইতে নামিলেন।—ধীরেশবাবুর প্রদর্শিত পথে ভিতরে প্রবেশ করিলেন, ধীরেশবাবু ডাকিয়া কহিলেন, "ঝি, ও ঝি, উনি এসেছেন, ওঁকে উপরে নিয়ে যাও।"

ঝি আসিয়া গঙ্গাদাসীকে উপরে লইয়া গেল। ধীরেশবাবু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, গঙ্গাদাসীর পায়ে জুতা নাই; বেশ মাত্র সেমিজ ও জামার উপরে কালপেড়ে একখানি মোটা কাপড়; অলঙ্কার—হাতে দুইগাছি রূপার চুড়ী মাত্র।

বেশভূষা দেখিয়াও ধীরেশবাবু কিছু বিস্মিত হইলেন। নাম গঙ্গাদাসী, বেশভূষা এই, আবার এত বড় নামজাদা লেডী ডাক্তার—মাসে পাঁচ ছয় শত টাকার কম নাকি রোজগার করে না,—আশ্চর্য্য বটে!

প্রায় একঘণ্টা পরে গঙ্গাদাসী নামিয়া আসিলেন; সিঁড়ির নীচেই দরদালানের একপাশে দাঁড়াইয়া ঝিকে কহিলেন, "বাবুকে ডাক।"

ধীরেশবাবু আসিলেন। গঙ্গাদাসী আবার তেমনই মাথার কাপড় একটু টানিয়া দিয়া অন্যদিকে একটু ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। ধীরেশবাবু দরদালানের বাহিরেই দরজার কাছে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দেখ্‌লেন?"

গঙ্গাদাসী মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন, "খুব ভাল নয়। প্রসবের সময় আশঙ্কার কারণ আছে।"

ধীরেশবাবুর মুখ শুকাইয়া গেল,—ভীত শুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আশঙ্কার কারণ আছে! কি রকম? প্রসূতির না সন্তানের?"

"দুজনেরই।"

"কেন? কিসে?"

"সন্তান যে অবস্থায় আছে, প্রসব সহজে হবে না। প্রসূতিও রুগ্ন, আর বড় দুর্ব্বল।"

"তা—কি ক'র্ত্তে বলেন এখন?"

"প্রসব বোধ হয় আর দু তিন দিনের মধ্যেই হবে। তখন খুব সাবধানে থাকতে হবে। যদি ইচ্ছা করেন, বড় কোনও ডাক্তারের সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে রাখ্‌তে পারেন।"

"উনি যে তাতে বড় নারাজ। আপনি কি——পারবেন না? জীবনবাবু ত ব'লেছিলেন——"

"যদি ভরসা ক'রে আমার হাতে রাখেন, আমার সাধ্য মত চেষ্টার ক্রটী ক'রব না। তবে জীবনবাবুকেও বলে রাখবেন। যদি নিতান্ত দরকার হয়, তাঁকেও ডাক্‌তে হবে। ওঁর কোনও আপত্তি তখন চলবে না। তবে একথা এখনই ওঁকে বলবার কিছু দরকার নেই। উনি ভয় পাবেন।"

"আর যোগাড় টোগাড় ক'রে কি রাখ্‌তে হবে?"

"সে সব আমি লিখে রেখে এসেছি,—সব আজই যোগাড় ক'রে রাখ্‌বেন। আর ওঁকে খুব ভরসা দেবেন—ব'লবেন কিছু ভয় নেই।"

"কাল একবার আসবেন কি? রোজই একবার এসে দেখ্‌লে ভাল হয়।"

"হাঁ, তাই আসব। এখন তবে আসি, নমস্কার।"

"এই আপনার ফি"—ধীরেশবাবু চারিটি টাকা গঙ্গাদাসীর সম্মুখে ধরিলেন।

গঙ্গাদাসী কহিলেন, "আজ থাক্‌। উনি মঙ্গলে প্রসব করুন,—তখন যা হয় দেবেন।"

এই বলিয়াই ত্বরিতপদে গঙ্গাদাসী নামিয়া আসিয়া একেবারে গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। ধীরেশবাবু অনুনয় করিতে করিতে ছুটিয়া পশ্চাতে আসিলেন। গাড়ীর দরজা ধরিয়াও টাকা কয়টি হাতে দিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু গঙ্গাদাসী কিছুতেই টাকা নিলেন না। কহিলেন, "আজ থাক না? প্রসব ত আমিই করাব। একেবারেই তখন দেবেন।"

ধীরেশবাবু অগত্যা ক্ষান্ত হইলেন। কোচম্যান আদেশ পাইয়া গাড়ী হাকাইয়া দিল।

ধীরেশবাবু দ্রুত উপরে ছুটিয়া গেলেন। দেখিলেন সুখময়ী বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।

"কি গো?"

"বেশ লোকটি। বড্ড ভাল। যেন কত পুরোণো মমতার জন।—কি মিষ্টি কথা, আর কত সাবধানে কত যত্ন ক'রে দেখ্‌লে। তা হ'লই বা নাম গঙ্গাদাসী—মাগী লোক ভাল—বোঝে সোঝেও বেশ—তাই না এত বড় পশারটা হ'য়েছে। ওই ত ও বছর বিনোদিদিকে একটা মেয়ে ডাক্তার দেখ্‌তে এসেছিল,—কি ক্যাট্‌ ক্যাট্‌ কথা—নাক ত সিকেয় তুলেই রইল—খুকী গিয়ে কাছে দাঁড়াল, একটা ধমক দিয়েই তাকে সরিয়ে দিল। আর সে কি ঘিন্‌ঘিনি—যেন মেথর মুদ্দোফরাসের ঘরে ঢুকেছে! সেই থেকে আমার ত ওই জাতটার পরেই একটা রাগ হ'য়ে গিয়েছিল। হাঁ—তা কি বলে গেল?"

ধীরেশবাবু ঢোক গিলিয়া কহিলেন, "না, তা ভয় কিছু নেই,—তবে প্রসবের সময়—ব'ল্লে খুব সাবধানে থাক্‌তে হবে।—ও নিজেই প্রসব করাবে,—আর যদ্দিন না হয়, রোজ এসে দেখ্‌বে।"

"তা বেশ হবে। ও যদি থাকে, আমার কিছু ভয় টয় ক'রবে না। আর যা দেখ্‌লাম শুনলাম,—তাতে ত সত্যিই মনে হ'ল, এসব ডাক্তারীতে ও পাকাই বটে!"

ধীরেশবাবু কহিলেন, "কিন্তু একটা মুস্কিল যে হ'ল বড়,—টাকা নিলে না।"

"টাকা নিলে না। ওমা, সে কি!"

"বল্লে আমিই ত প্রসব করাব—ভাল হ'ক, শেষে যা হয় দেবেন—"

"তা—আজ প্রথম দিনটা—না দেওয়া ভাল হ'ল না। তুমি ছাড়লে কেন? জোর ক'রে কেন হাতে গুঁজে দিলে না?"

"মেয়েমানুষ, হাতে গুঁজে কি টাকা দেওয়া যায়? আরও যে লজ্জা, দেখে ত খানিকটে ঘোমটা টেনেই দিল,—কথা কইল মুখ ফিরিয়ে—খুব আস্তে আস্তে।"

"তা যাই বল—বড্ড ভাল মেয়ে। তা হ'ক না গঙ্গাদাসী নাম, ঝি টির মেয়ে ও নয়। আর বেহ্ম খিষ্টেনের ঘরের মেয়েও নয়। তাদের ত পুরুষ দেখ্‌লে ঘোমটা দিতে ব'য়ে গেছে।—তা এক কাজ ক'রো. কাল যখন আস্‌বে, টাকা আমার কাছে রেখে দিও,—আমি গছিয়ে দেব। একটা ভিজিট ত নিক—তার পরে না হয় হ'লে থুলে শেষে থোকা একটা ধ'রে নেবে।"

ধীরেশ কহিলেন, "না না! সে রকমই কিছু নয়। কেমন যেন আমার মনে হ'ল, একটা ছুঁতো ক'রে এড়িয়ে গেল। টাকা নেবার মতলবই ওর নেই।"

"না, মতলব নেই! তোমার যেমন কথা! কেন. ওকি তোমার রূপ দেখে ভুলেছে যে টাকা নেবে না?" সুখময়ী হাসিয়া উঠিলেন।

ধীরেশবাবুও হাসিয়া কহিলেন, "ভুল্‌লে তোমার রূপ দেখেই ভুলেছে। তবে মেয়েমানুষ—এই যা কথা।"

"ভুলে যদি কিছু ছাড়ে ত মেয়েমানুষই ছাড়ে। পুরুষ-জাত তোমরা বড় শক্ত। কোনও ডাক্তার—কই এমন ত শুনিনি—সুন্দর মেয়েমানুষ রোগী কাউকে দেখে টাকা কখনও ছেড়েছে।"

"যাক্! কেন তবে ও টাকা নিল না? কি তোমার মনে হয়?"

সুখময়ী উত্তর করিলেন, "তা—বুদ্ধিসুদ্ধি খুব আছে,—দেখে শুনে হয়ত তার মনে হ'য়েছে, এমনি রোজকার হিসেবে যা পাবে, শেষে খুসী হ'য়ে তুমি দিলে তার চাইতে বেশীই দেবে——"

"না—না! তা নয়—তা নয়! ওই ত তোমাদের মেয়েমানুষের সঙ্কীর্ণ মনের দোষ।"

সুখময়ী একটু চক্ষু টানিয়া কহিলেন, "তা তোমাদের পুরুষমানুষের দরাজ মনে কি হয়? তোমায় দেখে ভুলেই টাকাটা তবে ছেড়ে দিয়ে গেল?"

"যাও—যাও, ও সব কি বিশ্রী কথা ব'লছ?"

"তুমিই বা কি সুশ্রী কথা ভাব্‌ছ?"

ধীরেশবাবুর একটু হাসি পাইল,—কহিলেন, "কি আর ভাব্‌ব? সুশ্রী ওতে কিছু ভাববার নেইও কিছু। ওর ঘোমটা টানা দেখে আমার কি মনে হ'চ্ছিল জান?"

"কি?"

"যেন ওই সুশ্রী মুখখানা ঢাকবার জন্যেই অত লজ্জা?"

"হাঁ, পুরুষের দরাজ মনের মতই কথাটা বটে।"

স্ত্রীর এই বড় কাটা বিদ্রূপে একটু অপ্রস্তুত হইয়া ধীরেশবাবু কহিলেন, "না—না, সত্যিই কি আর তা ভেবেছি? তবে প্রথমটা একবার তাই মনে হ'য়েছিল বটে। সে রকম মেয়েমানুষ ও নয়,—তা হ'লে সাজসজ্জার পরিপাটি খুব থাক্‌ত। তা—কি কি আন্‌তে হবে লিখে রেখে গিয়েছে—কই, সে কাগজখানা কোথায়?"

"ওই যে টেবিলের উপর আছে। ও গুলো আজই সব আনিয়ে রাখ্‌তে ব'লে গেল।"

"হাঁ, আমাকেও তাই ব'লে গেছে।"

ধীরেশবাবু টেবিলের কাছে গিয়া তালিকাটি দেখিলেন। তারপর জামা উড়ুনী পরিয়া, দেরাজ হইতে টাকা বাহির করিয়া নিয়া, নিজেই কেরাণীকে সঙ্গে করিয়া জিনিষগুলি দেখিয়া আনিতে গেলেন।

(৩)

পরদিন বৈকালে গঙ্গাদাসী আবার আসিলেন। যথা-রীতি পরীক্ষাদি হইল। প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র যাহা কেনা হইয়াছিল, সেগুলি একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখি-লেন,—তারপর কহিলেন, "হাঁ, সব ঠিক আছে। কাল পরশুর মধ্যেই বোধ হয় হবে। তা আপনি ত একা,—আতুড়ে থাক্‌বেন, ছেলেপিলেদের কে দেখ্‌বে?"

"ঐ ঝি আছে, পুরোণো লোক,—আর আমার মাকেও খবর দেওয়া হয়েছে—কাল সকালেই এসে পৌছবেন।"

"আপনার শ্বশুরবাড়ীতে বুঝি আর কেউ নেই?"

সুখময়ী কহিলেন, 'শ্বশুর নেই,—শাশুড়ী এখন কাশীতে থাকেন। তা তাঁকে আর টেনে আনা যায় না।—ন'ড়ে চ'ড়ে কিছু ক'ত্তেও তিনি এখন পারেন না।"

"যা ননদ কেউ আছেন না?"

'বড় যা বিধবা, কাশীতে শাশুড়ীর কাছেই থাকেন,—তাঁকে একা ফেলে তিনিও আস্‌তে পারেন না। ছোট যা দেওরের কাছেই থাকে,—তা সেও পোয়াতী, কি ক'রে আস্‌বে? আর আছে দুই ননদ। তা দেখুন—হাজার হ'লেও তারা এখন পর—নিজেদের ঘরসংসার র'য়েছে—আমরা ব'ল্লেই কি আর ছেড়ে আস্‌তে পারে? তাই, মাকেই আসতে লেখা হ'য়েছিল।"

"হুঁ—তা হ'লে—শ্বশুরবাড়ী থেকে বুঝি কেউই আসছেন না ?"

"না,—খুড় শাশুড়ী দেশে আছেন, তাঁর ছেলে বউটউদের নিয়ে ;—তা তাঁরা এখন এক রকম আলাদার মতই থাকেন। তাঁদের কাউকে লেখাও হয়নি।"

ঝি আসিয়া তখন আসন পাড়িয়া—বড় একখানি কাঁসার রেকাবে নানাবিধ খাবার সাজাইয়া আনিয়া রাখিল। গঙ্গাদাসী একটু হাসিয়া কহিলেন, "ও সব আর কেন আনছেন ?—আমি খাবার টাবার কিছু খাই না।"

"কিছু একটু মুখে দেবেন না ?"

"মাপ ক'রবেন, আমি ওসব কিছু ছুঁইও না।"

"এক পেয়ালা চা ক'রে এনে দেবে ?"

"চা আমি খাইনে কখনও !"

"চাও খান না! ওমা, সে কি !—তা বিকেলে তবে কি খান ?"

"বিকেলে আর কিছু খাইনে।—দরকারও হয় না।"

"তা দরকার না হ'ক, একটু কিছু মুখে দিলে বড় সুখী হ'তাম—"

গঙ্গাদাসী একটু হাসিয়া খাবারের রেকাবের দিকে চাহিলেন,—আঙ্গুলে একটুখানি পেপে তুলিয়া মুখে দিলেন,—দিয়া কহিলেন, "আপনার মান রাখলাম,—আর আমায় কিছু বলবেন না। আমি ও সব কিছুই খাই না।"

গঙ্গাদাসীর কথায় ও ব্যবহারে কেমন একটা সবিস্ময় কৌতূহলের ভাব সুখময়ীর মন ভরিয়া উঠিতেছিল। ইহার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি সব কথা জানিবার জন্য মনটা বড় উস্‌খুস্‌ করিতে লাগিল। নূতন পরিচয়, বেশী কিছু জিজ্ঞাসা করা যায় না,—তবে কতকটা প্রসঙ্গক্রমে যায় বই কি ? একটুকাল চাহিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, "আপনি রাত্তিরে কি খান ? ভাত না লুচি ?"

গঙ্গাদাসী একটু হাসিয়া কহিলেন, "তা জেনে আর কি হবে ? রাত পর্য্যন্ত ত এখানে থাকব না।"

সুখময়ী একটু অপ্রস্তুত হইয়া কহিলেন, "না—না,—তার জন্যে নয়,—এমনিই কথায় কথায় মনে হ'ল, তাই জিজ্ঞাসা ক'ল্লুম,—তা ব'লতে যদি কোনও আপত্তি—"

"আপত্তি আর কি ? অথাদ্যি কিছু খাইনে যে কাউকে ব'লতে কিছু সঙ্কোচ হবে।" এই বলিয়া গঙ্গাদাসী একটু হাসিলেন।

সুখময়ীর কৌতূহল একেবারে অদম্য হইয়া উঠিল।

"কি তবে ? বলুন না ?"

"রাত্তিরে—কিছু খাইই না।"

সুখময়ী একেবারে হা করিয়া চাহিয়া রহিলেন !—

"ও কি !—আপনি অমন চেয়ে রইলেন যে ?"

"কিছু খাননা! কেন ?—না খেয়ে কি ক'রে এত খাটেন ? রেতেও ত রোগীটোগী দেখতে হয়—"

গঙ্গাদাসী কহিলেন, "তা বাঙ্গালীর মেয়ে—একবেলা খেয়ে কাজকর্ম্ম করা—এটা কি আর তার পক্ষে বেশী কঠিন কিছু ?"

সুখময়ী কহিলেন, "হাঁ, তা বিধবারা একবেলাই ত খায়, আর কাজও কত করে। তবে বিকেলে জলটল ত খায়—"

"সবাই কি তা খেতে পায় দিদি ? কত বিধবা আছে, রেতে জলখেতে একমুঠো চালও তাদের জোটে না।"

"তা আপনি কেন খান না ? আপনার ত পয়সা আছে।"

"কেমই বা খাব ? ইচ্ছেও হয় না, দরকারও হয় না। যাক্‌, তা হ'লে আজ আসি ভাই,—নমস্কার !"

এই বলিয়া গঙ্গাদাসী উঠিলেন। সুখময়ীও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া কহিলেন, "আসুন,—নমস্কার !"

সুখময়ী ভাবিয়াছিলেন, কাল স্বামী পারেন নাই, আজ টাকাটা তিনি গছাইয়া দিবেনই। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনও কথাই তিনি তুলিতে পারিলেন না,—কেমন যেন বাধবাধ ঠেকিতে লাগিল। যেন বহুকালের পরিচিত অতি ঘনিষ্ঠ কোনও আত্মীয়ের মতই এমন বড় একটা জোর এই লেডীডাক্তারের তাঁহাদের উপরে আছে, যাহাতে এসব দেনা পাওনার কথা মুখেও আনা যায় না, এমনই একটা অবস্থা যেন তিনি মনে মনে অনুভব করিলেন। কিন্তু কেনই বা এমন হইল ? কোথাও কখনও ইহাকে তিনি চক্ষেও দেখিয়াছেন, এমন ত মনে পড়ে না। উনি কি তবে আর জন্মে বড় আপন কেহ তাঁহার ছিলেন ?

স্বামী ঘরে আসিলে, সকল কথা তিনি বলিলেন। ধীরেশবাবু শুনিয়া কহিলেন, "বোধ হয় বিধবা হবেন—

স্বামীকে খুব ভাল বাসতেন,—তাই এমন কঠোরভাবে এখন চ'ল্‌ছেন।"

সুখময়ী মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "না—না, বিধবা নয়! তা হ'লে পাড়ওয়ালা কাপড় কেন পরা? হাতে চুড়ী কেন? তাও আবার ছাই ছুটো রূপোর চুড়ী—একেবারে শাদা!"

"তবে এগুলো একেবারেই বাতিক! কত এমন বাতিক কত লোকের থাকে।"

"এতটাকা মাসে রোজগার করে,—কিছু খরচ নেই। এক বেলা খায়,—তাও হয়ত একপাকে হবিষ্যিই করে। কে জানে, কত টাকা যে জমেছে—আরও জমবে। কি ক'র্‌বে এই টাকা দিয়ে—তাই ভাব্‌ছি।"

"তা—হয়ত কোনও ভাল কাজে দান ক'রে যাবে। টাকা কি আর কারও বৃথা যায়—যদি না কেউ তা বাবুগিরি ক'রে উড়োয়?"

সুখময়ী কি ভাবিতে ভাবিতে কহিলেন, "আহা, এম্‌নি ক'রে খেটে—মেলাই টাকা রোজগার ক'রে—নিজের সখে না উড়িয়ে এম্‌নি ভাল কাজে যারা দান ক'রে যেতে পারে—কতপুণ্যি—আহা, কত বড় ভাগ্যি যে তাদের!"

বীরু আর মনি (ইহাদের ছেলে মেয়ে ছুটি) ঠিক তখনই হাসিয়া নাচিয়া খেলা করিতে করিতে ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

"আমার মা!"—বলিয়া বীরু গিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিল।—

"আমার বাবা!" এই বলিয়া মণি গিয়া হেঁচড়াইয়া পিতার কোলে উঠিল।

ধীরেশবাবু কহিলেন, "আর এই পুণ্যি—এই ভাগ্যি—এটাই কি বড় ছোট সুখো?"

সুখময়ী ছল ছল চোকে—পুত্রের মুখে চুমো খাইয়া কহিলেন, "ছোট নয়! মোটেই ছোট নয়!—কিন্তু—তার মত অত বড় কি?"

(৪)

ছইদিন পরে সত্যই সুখময়ীর প্রসববেদনা উপস্থিত হইল। সংবাদ পাইয়া গঙ্গাদাসী তাঁহার সহকারিণী একজন ধাত্রীকে লইয়া আসিলেন। বড় জটিল ও কঠিন অবস্থাই হইয়াছিল। বৈকাল হইতে রাত্রি প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত দুইজনে অনেক খাটিলেন অনেক কৌশল করিলেন,—শেষে সুখময়ী মৃতবৎ একটি পুত্র প্রসব করিয়া একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।—

ধাত্রীর হাতে শিশুটিকে দিয়া গঙ্গাদাসী সুখময়ীর শুশ্রূষায় মনোনিবেশ করিলেন।

শিশু সহজেই পুনর্জ্জীবিত হইল।—ঔষধে ও অক্লান্ত নিপুণ শুশ্রূষায় রাত্রিশেষে সুখময়ীও অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিলেন,—একটু পরেই ঘুমাইয়া পড়িলেন।

বেলা প্রায় ৮টার সময় সুখময়ীর ঘুম ভাঙ্গিল। চক্ষু মেলিয়া তিনি চাহিয়া দেখিলেন, গঙ্গাদাসী শিশুটিকে কোলে লইয়া তাঁহার শয্যার পাশে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে সুস্থ ও জাগ্রত দেখিয়া প্রশান্ত হাসিমুখে শিশুটি তাঁহার কোলের পাশে শোয়াইয়া গঙ্গাদাসী কহিলেন, "এই নেও বোন্, তোমার এই সোণারচাঁদ কোলে নেও!—আহা, তোমার কোলে ওকে দিতে পারলাম, আমার সব শ্রম যেন সার্থক হ'ল।"

সুখময়ী দেখিলেন, গঙ্গাদাসীর চক্ষু ছুটি যেন ছল ছল হইয়া উঠিয়াছে। হাতখানি তুলিয়া গঙ্গাদাসীর হাত ধরিয়া সুখময়ী কহিলেন, "দিদি, তোমার ঋণ জন্মে কখনও শোধ দিতে পার্‌ব না।" এই বলিয়া শিশুটিকে একেবারে কোলে তুলিয়া নিবেন বলিয়া তিনি উঠিতে উদ্যত হইলেন।

"ও কি ক'চ্চ? উঠোনা—উঠোনা! পাশেই ছেলে শুয়ে থাক্,—মুখ ফিরিয়ে মুখ দেখ!"

সুখময়ী ধীরে ধীরে শিশুর মাথায় ও গায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

"আমরা তবে এখন আসি বোন্। আমি গিয়ে—দুপুরের আগেই একজন লোক পাঠিয়ে দেব। বিকেলে আমি নিজেই আস্‌ব।—এই যে মা, আসুন,—দেখ্‌বেন, উনি যেন ওঠেন না। আর খোকার মুখে একটু একটু মধু দেবেন। আমি একজন লোক পাঠিয়ে দিচ্চি গিয়ে,—ততক্ষণ আপনি এখানেই থাক্‌বেন।"

সুখময়ীর মাতা কহিলেন, "আহা, বেঁচে থাক মা,—বেঁচে থাক! তোমার সোণার অট্টালিকে হ'ক্! জামাই হাজার টাকা দিলেও তুমি যা ক'ল্লে—তার শোধ হবে না। এসগে মা তুমি,—আহা, সারাটি রাত ব'সে আছে। আমি যাব কেন? বাইরের কাজ—তুমি পাঠিয়ে দিলে—সব সেরেই

ত এলাম। তোমার লোক আসুক,—তখন গিয়ে চা'ন টান ক'রে পূজো আহ্নিক ক'র্‌ব। যাও, তুমি এখন এসগে!"

গঙ্গাদাসী তাঁহাকে প্রণাম করিলেন,—সুখময়ীকে আবার স্নেহসম্ভাষণ করিয়া শিশুটির মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া, বাহির হইলেন। ধাত্রী ইতিমধ্যে যন্ত্রপাতি সব গুছাইয়া ব্যাগে পূরিয়া নিয়াছিল। সেও ব্যাগটি লইয়া পিছনে আসিল।

মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া গঙ্গাদাসী তাঁহার সঙ্গিনীর সঙ্গে নীচে নামিয়া আসিলেন। ধীরেশবাবু তাঁহার আফিস ঘরে ছিলেন,—তিনিও তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া গঙ্গাদাসীকে নমস্কার করিলেন। গঙ্গাদাসী প্রতিনমস্কার করিয়া একটু ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে কহিলেন, "উনি ভালই আছেন এখন,—আর বোধ হয় ভয় কিছু নেই। তবু কয়দিন খুব সাবধানে থাক্‌তে হবে,—আমি রোজ এসেই একবার দেখব।"

ধীরেশবাবু উত্তর করিলেন, "আপনার দয়ার পার নাই!—আমার স্ত্রীর জীবন আপনি দিয়েছেন,—ছেলেটিকেও বাঁচিয়েছেন।"

গঙ্গাদাসী বিনীতভাবে কহিলেন, "এ আর বেশী কি? আমাদের কাজই ত এই। চেষ্টা কোথাও সফল হ'লে, সে আমাদেরও কম আনন্দের কথা নয়।"

"তা ঠিক। কিন্তু আপনি আমার স্ত্রীর জন্য যেরকম ক'রেছেন, সচরাচর এ রকম কেউ করে না।—নিতান্ত আপনার জনের কাছেও এতটা স্নেহমমতা—এমন যত্ন কেউ বড় পায় না। অর্থে আপনার এ উপকার কেউ শোধ ক'র্‌তে পারে না।"

গঙ্গাদাসী কহিলেন, "তাই যদি মনে করেন, তবে সে চেষ্টাও ক'র্‌বেন না।"

"সেকি! সেকি! একি ব'ল্‌ছেন আপনি? অবশ্য আপনার এ ঋণ শোধ দেবার নয়,—কিন্তু তা হ'লেও—আর আপনিও ত ব'লেছিলেন, উনি মঙ্গলে খালাস হ'লেই——তা আজ আপনাকে ছাড়ব না,—কোনও ছুঁতো আপনার শুন্‌তে পার্‌ব না—"

বলিতে বলিতে এক তাড়া নোট ধীরেশবাবু গঙ্গাদাসীর সম্মুখে ধরিলেন।

গঙ্গাদাসী কহিলেন, "আজ থাক্ না। আরও আমার আস্‌তে হবে। উনি একেবারে সুস্থ হ'য়ে উঠুন,—তখন যা হয় হবে।"

এই বলিয়াই গঙ্গাদাসী পাশ কাটিয়া বাহিরের দিকে চলিলেন।

"আমি বড় কষ্ট পাব—বড় দুঃখিত হব—এই সামান্য প্রতিদান—কেন এতে আমাকে বঞ্চিত কর্‌বেন?—আপনাকে আবার ডাক্‌তেও যে আমি বড় কুণ্ঠিত হব।"

ধীরেশবাবু পিছনে পিছনে ছুটিয়া আসিলেন,—গঙ্গাদাসী গাড়ীতে উঠিয়া কহিলেন, "আমি কিছু নেবনা তা ত বল্‌ছিনে,—উনি বেশ সুস্থ হ'য়ে উঠুন, তখন দেবেন। এতে কেন আপনি কুণ্ঠিত হবেন? আজ এটা মাপ ক'র্‌লেই আমি বড় সুখী হব।"

ধীরেশবাবু আর পীড়াপাড়ি করিতে বড় সঙ্কোচবোধ করিলেন,—একবার কহিলেন, "তা—আপনার সঙ্গে উনি এসেছেন—ওঁকে———"

"আজ থাক্,—এক সঙ্গেই দুজনকে বিদায় ক'র্‌বেন। ওঁর জন্যে কিছু কুণ্ঠিত হবেন না,—উনি আমার বোনের মত, সর্ব্বদাই আমার সাহায্য করেন। আসি তবে আজ—নমস্কার।"

গাড়ী ছাড়িয়া দিল।—ধীরেশবাবু বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। শেষ কথাগুলি বলিতে, বলিতে গঙ্গাদাসীর গলা যেন একটু ভার—একটু ভাঙ্গা ভাঙ্গা হইয়া আসিতেছিল। কে এ?—তাঁহাকে এত অনুগ্রহ কেন এ করিতেছে? কখনও কি ইহাকে চক্ষে কোথাও দেখিয়াছেন? ওই কণ্ঠস্বর—কখনও কি—কোথাও শুনিয়াছেন? কই, মনে ত পড়ে না।—তবু যেন—গলাটা—কেমন যেন চেনা চেনা—যেন কার মত একটু লাগে। কিন্তু———

ধীরেশবাবু ধীরে ধীরে বড় গভীর একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

(৫)

সুখময়ী বেশ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। প্রথম কিছুদিন রোজ—তারপর কয়েকদিন অন্তর অন্তর গঙ্গাদাসী আসিতেন। শেষে গঙ্গাদাসী একদিন কহিলেন, "আর আমার আসবার কোনও দরকার নেই বোন্।—আশীর্ব্বাদ করি, স্বামীপুত্র নিয়ে সুখে থাক। খোকার যদি অসুখ কিছু করে আমায় খবর দিও।—আর—আমাদের দরকার যেন

হয় না— তবু আবার যখন হবে —আমাকে খবর দিও।—”

“তুমি কি দিদি আর আস্‌বে না ? —”

“দরকার যদি কিছু না হয়—মেলাই কাজ—এসেই বা আর কি হ’বে ?” গঙ্গাদাসী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সুখময়ী কহিলেন, “এই ক’দিনে বীরু মণি পর্য্যন্ত মাসীমা মাসীমা ক’রে তোমায় কত ন্যাওটা হ’য়েছে।—তা—বল্‌তে ত পারিনে দিদি—”

“তা যদি বল—সময় হ’লে মাঝে মাঝে আসব। আর—যদি কখনও ওদের নিতে লোক পাঠাই—পাঠিয়ে দিও ভাই,—দিলে বড় খুসী হব।”

“সে অবিশ্যি দেব—যখন তোমার ইচ্ছে হয়, ওদের নিও,—মনে ক’রো ওরা যেমন আমার—তেমনি তোমরাও।”

গঙ্গাদাসী মুখ চাপিয়া বড় গভীর একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন,—চোকে তখন চশমা ছিল না,—সুখময়ী দেখিলেন, চক্ষু দুটি ছল ছল—দেখিতে দেখিতে অশ্রুর উচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠিল।

সুখময়ী কহিলেন, “দিদি, তুমি কাঁদছ ?”

আঁচলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে একটু হাসিয়া গঙ্গাদাসী কহিলেন, “মেয়েমানুষের মন দিদি—ছেলেপিলের মায়া বড় মায়া !—নিজের কিছু নেই—পরের ছেলেপিলের মায়াও ছাই এড়াতে পারি নে !”

“আহা, তোমার বড় মায়ার প্রাণ দিদি। তা—ছেলে-পিলে বুঝি কখনও হয়নি ?”

“না।”

“হাঁ দিদি, তোমাকে—বল্‌তে কি এখন নিজের মার পেটের বোনের মতই মনে হয়।—সর্ব্বদাই তোমার কথা ভাবি,—মনে হয়—তোমার যেন বড় কোন দুঃখ আছে।—তোমার সব কথা বড় শুন্‌তে ইচ্ছে করে,—তা যদি কিছু মনে না কর—”

“আমার আর কি এমন কথা বোন্‌ যে তাই শুনবে ? শুন্‌বার মত কিছুই নেই।”

“তোমার কি কেউ আর নেই ?”

“এই তোমরা পাঁচজন আছ,—আর কেউ নেই। তা—তাতে আর এমন কি দুঃখ ?”

“আপনার কেউ না থাকা—সেটা—বড় একটা দুঃখ বই কি ? তবে তোমরা নাকি পাঁচজনের উপকার ক’রে জীবন কাটাচ্চ, তাই বোধ হয় দুঃখ তেমন হয় না।”

গঙ্গাদাসী উত্তর করিলেন, “এই ব্যবসা করি, এতে যেটুকু যার উপকার হয়। নইলে আর কি কার করি ?”

সুখময়ী একটু ভাবিয়া কহিলেন, “তোমাকে—তা কিছু মনে ক’রোনা দিদি—আমি তোমার ছোটবোনের মত—তাই বড় জান্‌তে ইচ্ছে হয়—”

“কি বল ?”

“এই ব’ল্‌ছিলুম কি—তোমাকে ত বিধবা ব’লেও মনে হয় না—তা বিয়ে বুঝি কখনও করনি ?”

গঙ্গাদাসীর মুখে একটু ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল,—ধীরে ধীরে তিনি কহিলেন, “বিয়ে হ’য়েছিল বই কি ? ছেলেবেলায় হ’য়েছিল—”

“স্বামী তবে কোথায় ?”

“সেই ছেলেবেলা থেকেই তিনি নিরুদ্দেশ।”

“আহা, আর কোনও সন্ধান তাঁর পাওনি ?”

“না—” গঙ্গাদাসী একটু মুখ ফিরাইয়া নিলেন,—তার পর আবার কহিলেন, “ও পুরোণো কথায় আর কাজ কি বোন্‌ ?—সে আমার সব ফুরিয়ে গেছে। নিজেও কখনও কিছু ভাবিনে। এখন এতেই বেশ আছি।”

“তোমাকে ডাক্তারী কে শেখাল দিদি ? তিনি চ’লে গেলে কার কাছে ছিলে ?”

গঙ্গাদাসী একটু হাসিয়া কহিলেন, “তুমি দেখ্‌ছি ভাই ছাড়্‌বে না। আচ্ছা, আমার মোট কথা তোমাকে বল্‌ছি তবে। আমি গরীবের মেয়ে, বাপমাও তখন ছিলেন না, পরের বাড়ী থাক্‌তাম।—তখন ক’ল্‌কেতায় তাঁরা ছিলেন, আমার খুব বসন্ত হ’ল।—ক্যাম্বেলের হাঁসপাতালে তাঁরা আমায় পাঠিয়ে দিলেন।”

“আহা, তারপর ?”

“অনেক ভুগে শেষে সেরে উঠ্‌লাম। যাদের কাছে থাক্‌তাম, তারা আমার খোঁজ নিল না,—আমারও আর সেখানে যাবার ইচ্ছে হ’ল না, সেখানে সুখে ছিলাম না। এদিকে ব্যারাম সেরে গেল—হাঁসপাতাল থেকেও বিদেয় ক’রে দিল।”

“আহা, তারপর ! কোথায় গেলে ?”

"যাবার কোনও ঠাঁই ছিল না,—হাঁসপাতালের এক ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে কেঁদেকেটে তাঁর পায় ধ'রে পড়লাম। একজন ধাত্রী হাঁসপাতালে এসে কাজ ক'ত্তেন, তাঁর একটি লোকের দরকার ছিল।—ডাক্তারবাবুর কথায় তিনি আমায় তাঁর চাকরাণী ক'রে নিলেন।"

গঙ্গাদাসীর চক্ষে জল আসিল। সুখময়ী স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। একটু সামলাইয়া নিয়া গঙ্গাদাসী আবার বলিলেন, "এ আশ্রয় হারালে আর পাব না,—আমি খুব যত্ন ক'রে তাঁর কাজ করতাম, তাঁর সেবা ক'রতাম,—আর যাতে তিনি খুব সন্তুষ্ট থাকেন, তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতাম। তাঁর মনটা ভাল ছিল,—শেষে আমাকে খুব স্নেহ ক'ত্তেন। প্রায়ই তাঁর সঙ্গে কাজে আমাকে নিয়ে যেতেন। কাজেও আমার হাত মন্দ হ'ল না। এর মধ্যে অবসর যখন থাকত, বাঙ্গলা, ইংরাজী প'ড়তাম,—তাতে লেখাপড়ায়ও একটু দখল হ'ল। শেষে তিনিই আমাকে ডাক্তারী প'ড়তে দিলেন। খরচ তিনিই চালাতেন,—আমিও আগের মত বাড়ীতে তাঁর কাজকর্ম্ম সব ক'রতাম।"

সুখময়ী একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, "আহা, তিনি এখন আছেন?"

"না,—বছর দুই হ'ল মারা গেছেন। আমার মায়ের বড় তিনি ছিলেন,—একসঙ্গেই আমরা থাকতাম,—তাকে আর শেষে কাজকর্ম্মে যেতে দিতাম না,—তখন তাঁর বয়সও খুব হ'য়েছিল।"

সুখময়ী কহিলেন, "আহা, যত দুঃখই গোড়ায় পাও,—শেষে ভগবান তোমাকে খুবই দয়া ক'রেছেন ব'লতে হবে।"

"দুঃখীর একমাত্র সম্বল তিনিই বোন্,—তাঁর দয়া যদি পায় দুঃখীর সকল দুঃখ, পাপীতাপীর সব পাপতাপ ফুরিয়ে যায়। যার বড় অমঙ্গল আর হ'তে পারে না,—দেবতার দয়া যদি হয়—তার মধ্যেও কত মঙ্গল দেখা দেয়। এই ত বোন্, আমি দুঃখের চরমে গিয়েই প'ড়েছিলাম,—আর এখন কোনও দুঃখ আমার নাই,—বরং—পরম শান্তিতেই আছি।"

"আহা,—যদি এখন, সোয়ামীকে ফিরে পেতে,—সব একবারে ষোলআনা ভরা তোমার হ'ত।"

গঙ্গাদাসীর চোকে জল আসিল, মুখেও একটু হাসি ফুটিল;—একটি নিশ্বাসও উঠিল। ধীরে ধীরে তিনি কহিলেন, "আর তা হয় না বোন্,—এ জীবনে আর তা হয় না।—এজীবনে আর তা হ'তেও পারে না।"

"যদি দেখা পাও দিদি?"

"দেখা দিই না,—সরে যাই।—"

"তা কি পার দিদি?"

"পারতেই যে হবে। এতদিন পরে—জীবনের পথ এমনই দুজনের দুইদিকে আলাদা হয়ে গেছে—যে আর তা এক হ'য়ে মিলতে পারে না। তাঁর পথে—তাঁর যাত্রা সুখের হ'ক,—যদি দেখা পাই—এই কামনা ক'রেই নিজের পথে নিজে স'রে যাই।"

"বড় শক্ত দিদি,—মেয়েমানুষ কি কেউ তা পারে?"

"মেয়েমানুষকেই পারতে হয়।—আর তুমি যেমন ভাবছ বোন্, আমি ত তেমন ভাবতে পারি না? তোমার জীবন আর আমার জীবন—একেবারে যে আলাদা বোন্।"

সুখময়ী একটি নিশ্বাস ছাড়িলেন। গঙ্গাদাসী কহিলেন, "এই ত জীবনের কথা আমার ফুরিয়ে গেল। এখন—খুসী হ'লে ত?"

গঙ্গাদাসীর হাত দুখানি ধরিয়া সুখময়ী কহিলেন, "না দিদি,—সব চেয়ে বড় কথাটা যেন অজানাই র'য়ে গেল। সেই অজানাটুকু তুমি জানাতেও চাও না। আর সেই অজানা কথাটাই মনে হ'চ্চে তোমার সব চেয়ে বড় দুঃখের কথা। থাক্,—সেকথা তোমায় আর জিজ্ঞাসা ক'রব না।"

গঙ্গাদাসীও সুখময়ীর হাত দুখানি চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "সে দুঃখ অতলেই ডুবে গেছে, যাক্—আবার তা উপরে তুলে কাজ কি বোন্?—আসি তবে দিদি।"

"এস!"—সুখময়ী ভূমিষ্ঠ হইয়া গঙ্গাদাসীকে প্রণাম করিয়া তাঁর পদধূলি নিতে হাত বাড়াইলেন। চমকিয়া গঙ্গাদাসী পা সরাইয়া নিয়া সুখময়ীর হাত চাপিয়া ধরিলেন।—"ছি—ছি? ও কি ক'চ্চ।"

"তুমি যে দিদি।"

সুখময়ীকে আলিঙ্গন করিয়া গঙ্গাদাসী কহিলেন, "তা হই,—তবু পায় হাত দিতে নাই। ছি!"

শিশু একখানি দোলায় ঘুমাইয়া ছিল,—সহসা কাঁদিয়া উঠিল,—গঙ্গাদাসী তাকে কোলে তুলিয়া নিলেন। মুখে চুমো খাইয়া সুখময়ীর কোলে তাকে দিলেন।—পাশের

একঘরে সুখময়ীর জননী ছিলেন, বীরু আর মণিও তাঁহার কাছে বসিয়া গল্প শুনিতেছিল। গঙ্গাদাসী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বীরু ও মণির মুখে চুমো খাইয়া—তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় হইয়া গেলেন।——

কতক্ষণ পরে ধীরেশবাবু আসিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "টাকা কি দিয়ে দিতে পার্‌লে?"

"না।"

"না!—কেন? কি ব'ল্লেন।"

"ওকথা আমি তুল্‌তেই পার্‌লাম না।"

"তবে কি হবে?"

"টাকা উনি নেবেন না,—দেবার চেষ্টাও ক'রোনা। কি জানি—আমার উপর কেমন যেন আপন বোনের মতই একটা মমতা ওঁর হ'য়েছে,—আমারও তাই হ'য়েছে।"

"তাই বলে—"

"তা বরং ভাল কোনও জিনিষপত্তর কিনে দিও, তাই পাঠিয়ে দেব।"

"ভাল জিনিষপত্তরে ওর কি হবে? ব্যবহার ত কিছু করেন না?"

"টাকা দিয়েই বা কি হবে? তাও নিজের জন্যে খরচ বড় কিছু করেন না!"

"আচ্ছা, দেখি—কিই বা দেব!" এই বলিয়া ধীরেশ-বাবু বাহিরে চলিয়া গেলেন।

দিনদুই পরেই শিশুর একটু অসুখ হইল। অসুখ কঠিন কিছু নয়, কিন্তু এই উপলক্ষ পাইয়া সুখময়ী গঙ্গাদাসীকে সংবাদ পাঠাইলেন। গঙ্গাদাসী আসিলেন,—শিশুর জন্য কিছু টোটকা ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। যাইবার আগে সুখময়ী কহিলেন, "দিদি, তুমি কিছু নেও নি, কিছু দেবার কথাও মুখ ফুটে আমি এখন আর ব'ল্‌তে পারি না।—সে-ভাবে নয় দিদি,—তবে আমাদের শ্রদ্ধার একটু কিছু উপহার—আমাদের এত ভালবাস—একটু কিছু চিহ্ন যা দেখে আমাদের মনে প'ড়্‌বে—যদি কিছু নিতে দিদি,—তবে কৃতার্থ হতাম ——"

গঙ্গাদাসী কহিলেন, "তোমাদের মনে রাখ্‌তে কি এমন একটা চিহ্নই দরকার বোন্? তা হ'লে মনে এমন নাই থাক্‌ল,—ক্ষতি কি?"

"না—না, তা ব'ল্‌ছিনে দিদি,—তুমি কখনও আমাদের ভুলে যাবে তা ভাবিনি। তবু স্মৃতিচিহ্ন ত লোকে রাখে। এই ধর না,—সোয়ামীকে কে ভুল্‌তে পারে? তবু তার আঙ্গটিটি—ফটোখানি সবাই কাছে রাখে।"

গঙ্গাদাসী একটু কি ভাবিয়া কহিলেন, "তা, বেশ ত। তোমাদের একটা আংটি—আর দুই একখানা ফটো বরং আমাকে দেও।"——

"শুধু এই।"

"ভালবাসার উপহার—স্নেহের স্মৃতিচিহ্ন—এই কি যথেষ্ট নয় বোন্?"

"তা বটে—তা বটে!—আচ্ছা, তাই তবে নেও।"

দেরাজ খুলিয়া সুখময়ী বড় একখানা এলবাম এবং সুন্দর একটি কৌটা বাহির করিলেন।

"তোমাদের সবার এক সঙ্গে তোলা ফটো আছে?"

"ওমা, তা আছে বই কি? এই দেখ না——"

সুখময়ী এলবাম খুলিয়া তার মধ্য হ'তে একখানি ফটো বাহির করিয়া গঙ্গাদাসীর হাতে দিলেন।—

"আর কি কি ফটো আছে, দেখি।"

এলবামের পাতা উল্টাইতেই একখানি ফটো বাহির হইল।

গঙ্গাদাসী কহিলেন, "এ বুঝি বাবুর প্রথম বয়সের ফটো?"

"হাঁ।"

"আর পাশে—ও কে?—তোমার ছবি ত ও নয়?"

"না ও—আমার সতীন।"

"সতীন!"

"হাঁ,—তিনি এখন নেই,—আমাকে শেষে বিয়ে করেন।"

"ও! অল্পবয়সেই বুঝি মারা যান?"

"হাঁ।"

ওঁর নাম কি ছিল?"

"মায়া।—বেশ সুন্দর ছিল,—নয়?"

"তোমার চেয়ে নয়।—তা, বাবু কি এখনও ওঁকে মনে করেন?"

"তা কি—মানুষের প্রাণ থাক্‌লে একেবারে কেউ ভুল্‌তে পারে দিদি?"

"চেহারাটি আমার যেন চেনা চেনা লাগ্‌ছে,—কোথাও যেন দেখেছি—"

"দেখেছ !—কোথায় ?" সুখময়ী কেমন বিস্মিতভাবে গঙ্গাদাসীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

গঙ্গাদাসী চাহিয়া চাহিয়া কহিলেন, "হাঁ, আমার এক —বোন্ ছিল—মনে প'ড়্ছে—মুখখানা অনেকটা—এই রকম।—ফটো কি মোটে এই একখানা—না—আরও আছে ?"

"না, মোটে ওই একখানাই—কেন ?"

গঙ্গাদাসী কেমন সলজ্জ সঙ্কুচিতভাবে—অথচ একটু হাসিয়া কহিলেন, "বেশী থাকলে একখানা নিতাম—দেখে আমার সেই বোনকেই যেন মনে প'ড়ছে—কোনও চিহ্ন আর নেই———"

সুখময়ী কহিলেন, "মোটে ওই একখানাই আছে,— উনি বোধ হয়—তা ওঁকে ব'লে ওই ফটো থেকে আবার ফটো তুলে তোমায় একখানা পাঠিয়ে দেব।"

"তাই দিও ভাই ! উনি এখনও ফটোখানি রেখেছেন—রাখতেই বোধ হয় চান—ওখানা নেব না।—নতুন তুলেই একখানা দিও।—তবে—আর কাউকে দিয়ে তুলিও দিদি—ওঁকে যেন কিছু বলোনা,—ছি ! বড় লজ্জার কথা হবে সেটা।"

"আচ্ছা দেখি,—না ব'লে পারি ত বল্‌ব না। আর— এতে এমন লজ্জার কথাই বা কি ? তা ফটোত হ'ল,— আর একটা কিছু নেবে না ?"

"আর কি নেব বোন্, এই যে ঢের।"

না দিদি, এ ঢের হ'ল না।—জোর ক'রে আর একটা কিছু দেব—তা নিতেই হবে।—"

"যদি নি'—তোমার নিজের একটা জিনিষ কিছু নেব,—তোমার চিহ্ন ব'লে কাছে রাখ্‌ব।"

সুখময়ী যারপরনাই হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, "নেবে দিদি ? আচ্ছা। আমি তবে দেখে দিচ্ছি,—" এই বলিয়া সুখময়ী কৌটাটি খুলিয়া সোণার একটি সুন্দর কাজকরা হাতঘড়ী (wrist watch) বাহির করিলেন,—কহিলেন, "এই ঘড়ীটি নেও দিদি,—এটা আমারই—আমায় উনি কিনে দিয়েছিলেন।—ব্যবহার করো দিদি, তোমার কাজেও এটা লাগ্‌বে।"

"ঘড়ী থাক্, উনি আদর ক'রে দিয়েছেন,—ও তোমারই থাক্।—আর হাতে কি ওই ঘড়ী কখনও আমি ব্যবহার ক'ত্তে পারব ? বরং—তোমার গলায় যে হারটুকু আছে, তাই দেও।"

"রামঃ !—এ ত একটুখানি সরু একপেঁচি হার—এ দিয়ে কি ক'র্‌বে ?"

"ওই ভাল,—না হয়, তোমার খাতিরে মাঝে মাঝে গলায় পর্‌ব।"

"সত্যি পর্‌বে ?—আচ্ছা, তবে নেও !" এই বলিয়া সুখময়ী হারটুকু খুলিয়া গঙ্গাদাসীর গলায় পরাইয়া দিলেন।

গঙ্গাদাসী চলিয়া গেলেন। সুখময়ী সকল কথাই স্বামীকে বলিলেন। ফটোর কথাও গোপন করিলেন না। যাহা যখন ঘটিত, যাহা কিছু তিনি দেখিতেন বা শুনিতেন—তার খুঁটিনাটি সব তিনি স্বামীকে বলিতেন, না বলিয়া থাকিতেই পারিতেন না,—এটা তাঁহার একটা অভ্যাসের মতই হইয়া গিয়াছিল।—আবার যে কারণ দেখাইয়া গঙ্গাদাসী ফটোখানি চান, তার মধ্যেও এমন একটা রহস্যের ভাব আছে বলিয়া তাঁহার মনে হইল যে স্বামীর কাছে না বলিয়া থাকা তাঁহার অসাধ্যও হইল। মায়াকে নাকি তাঁর বোনের মত দেখায়,—স্বামী বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্, ওকালতী করেন,—এই সূত্র ধরিয়া গঙ্গাদাসীর পরিচয় একটাও হয়ত তিনি বাহির করিতে পারিবেন। গঙ্গাদাসী যে বারণ করিয়াছেন সে কেবল লজ্জায়,—তা এত লজ্জারই বা কি ইহাতে ! তারপর স্বামী যদি জানিতে পারেন, গোপনে তিনি ঐ ফটোর নকল নিতে কোথাও পাঠাইয়াছেন বা দৈবাৎ যদি হারাইয়া যায়,—তাহা হইলেও ত সেটা তাঁহার পক্ষে বড় দোষের কথা হইবে। যাহা হউক, ইত্যাদি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সুখময়ী স্বামীকে সব কথাই বলিলেন,—কিছুই গোপন করিলেন না।

ধীরেশবাবু সব শুনিলেন।—খানিকক্ষণ কেমন গম্ভীর ও আনমনাভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন,—ফটোখানি হাতে নিয়া অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন,—দেখিয়া আবার কি ভাবিতে লাগিলেন।—

সুখময়ী কহিলেন, "কি হ'ল গো,—অমন ভার হ'য়ে কি ভাব্‌ছ ব'সে ?—"

"না,—এমন কিছু নয় ?—এই ফটোটি উনি চাইলেন ?"

"হাঁ গো ! বল্‌ছ কি ? ওঁকে নাকি—ব'ল্লেন— তাঁর বোনের মত দেখায় !"

"হুঁ!—আর তোমার সেই হার—নিজেই তা চেয়ে নিলেন?"

"হাঁ!"

"গলায় পরিয়ে দিলে,—আপত্তি কিছু কর্‌লেন না?"

"না।"

কিছুকাল চুপ করিয়া ধীরেশবাবু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই হারের লকেটে না আমার মুখের ছবি ছিল?"

"ও মা, তাই ত! তা যে ভুলেই গেলাম।—কি হবে এখন? এখন ত আর লকেটটি ফিরিয়ে আন্‌তেও পার্‌ব না।"

"তার দরকার কিছু নেই,—আর একটা তৈরী ক'রে দিলেই হবে।"

কি ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ সুখময়ীর মুখখানি যেন কেমন হইয়া উঠিল।—

"তবে কি—লকেটটি নেবে বলেই হারটুকু চেয়ে নিল? —কে ও? তোমার চেনা কেউ?"

সুখময়ী স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন,—মুখ পাংশু—চক্ষেও কেমন তীব্র বেদনার একটা দৃষ্টি!

সুখময়ীর হাতখানি ধরিয়া একটু কাছে তাঁকে টানিয়া নিয়া ধীরেশ কহিলেন, "ছি সুখো! কি ভাব্‌ছ তুমি! কি সন্দেহ তুমি ক'চ্ছ।"

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া স্বামীর বক্ষে রাখিয়া সুখময়ী কাঁদিয়া কহিলেন, "কে তবে ও? কেন লকেটটি নিল?—কেন ফটো নিল?—কেন ওই ফটোখানি নিতে চাইল?" বলিতে বলিতে সুখময়ী বেদনাক্লিষ্ট ক্রন্দমান মুখখানি তুলিয়া আবার স্বামীর দিকে চাহিলেন।

স্নেহে স্ত্রীর অশ্রুমার্জ্জনা করিয়া ধীরেশবাবু কহিলেন, "কেঁদোনা! ছি, কেঁদোনা সুখো! এতদিনেও কি আমাকে চিন্তে পারনি? কি সন্দেহ ক'রে তুমি মনে ব্যথা পাচ্চ? কোনও স্ত্রীলোকের সঙ্গে এমন কোনও সম্বন্ধ আমার নাই—যাতে তোমার কাছে আমি এতটুকু লজ্জিত হ'তে পারি।"—

"কি এসব তবে?—কে ও?"

"শুন্‌বে সুখো?—কদিন থেকেই আমার একটু একটু সন্দেহ হ'চ্ছিল,—গলার সুরটাও চেনা চেনা লাগ্‌ছিল।—কিন্তু আজ আমি একরকম নিঃসন্দেহ। একরকম কেন—একেবারেই।—আর কেউ হ'তেই পারে না।"

"কে—কে তবে ও?"

"মায়া।"

"মা—য়া—! সে কি! কি ব'ল্‌ছ?"

স্তব্ধভাবে হা করিয়া সুখময়ী স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। ধীরেশবাবুর চক্ষু দুটি ছল ছল হইয়া উঠিল। সুখময়ী কহিলেন, "তিনি না মারা গেছেন—"

"তাই শুনেছিলাম,—সেই বিশ্বাসই এতদিন আমাদের ছিল—"

"সে কি?"

ধীরেশবাবু কহিলেন, "সে বড় একটা দুঃখের ঘটনা। কুলে পাছে একটা দাগা পড়ে—তাই সকলে তা একেবারে চেপে রাখেন।—তোমাকেও সেকথা কখনও আমি বলিনি।"

"সে কি? কি হ'য়েছিল?"

"তখন তার বয়স মোটে ১৩।১৪ বছর হ'য়েছিল—বড় শান্ত—বড় লক্ষ্মীমেয়েট ছিল—বড় সরল মিষ্টি চেহারা ছিল। তার মা বাবার সঙ্গে ক'ল্‌কেতায় এসেছিল। শেষ রাত্রে একদিন চন্দ্রগ্রহণ হ'য়েছিল—তারা গঙ্গাস্নানে যান,—মায়াও তাঁদের সঙ্গে যায়। বড় লোকের ভিড় হ'য়েছিল,—মায়া হারিয়ে গেল।"

"সর্ব্বনাশ! তারপর?"

"মায়ার শক্ত ব্যারাম হ'য়েছে ব'লে তাঁরা বাবাকে আর আমাকে খবর পাঠালেন। আমরা এসে সব শুন্‌লাম। ডিটেক্টিভ পুলিসের এক দারোগাকে গোপনে অনেক টাকা দিয়ে অনেক অনুসন্ধান করা হ'ল। ছমাস পরে—তার সন্ধান যা পাওয়া গেল—সে বড়ই ভয়ানক।"

সুখময়ীর মুখ শুকাইয়া গেল,—কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসিলেন,—"কি?"

"খারাপ একটি স্ত্রীলোকের হাতে সে প'ড়েছিল,—তারা খারাপ একবাড়ীতে নিয়ে তাকে আট্‌কে রাখে।—অনেক তাড়না ক'রে শেষে তার সর্ব্বনাশ করে। দারোগা বাবু তার সঙ্গে দেখা ক'রেছিলেন। ১৫।২০ দিন যাবৎ সে আত্মরক্ষা ক'ত্তে পেরেছিল, শেষে নাকি আর পার্‌ল না, তারপর একেবারে গা ছেড়ে দেয়,—তারা

যা ব'লত—তাই ক'ত্ত—আপত্তি কল্লেও মার খেত। খেতে দিত না—বড় শুকিয়ে না কি একেবারে কাঠ হ'য়ে গিয়েছিল,—সোণার রং একেবারে কালী হ'য়ে নাকি গিয়েছিল।"

ধীরেশবাবুর চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া গেল। "আহা,—তারপর—তোমরা কি কল্লে?"

ধীরেশবাবু কহিলেন, "সেই নরক থেকে তাকে উদ্ধার ক'র্‌বার জন্য কেঁদে সে দারোগাবাবুর পায়ে ধ'রে অনেক ব'লেছিল। কিন্তু গোপনে তাঁকে আমার বাবা আর শ্বশুর নিযুক্ত ক'রেছিলেন,—প্রকাশ্যে, পুলিশের সাহায্যে তাকে উদ্ধার ক'রে আন্‌লে ঘটনা চাপা থাক্‌বে না, ভদ্রপরিবারের একটা কলঙ্ক হবে,—তাই সেদিন তিনি কিছু ক'ত্তে পাল্লেন না। ওঁদের এসে খবর দিলেন। আমি সেদিন সেখানে ছিলাম না,—হুগলীতে একটি বন্ধুর ব্যারাম হ'য়েছিল—দেখ্‌তে গিয়েছিলাম।"

"ওঁরা কি ক'ল্লেন?"

"পরদিন ফিরে এসে শুন্‌লাম,—ওঁরা বন্দোবস্ত ক'রেছেন, দারোগার সাহায্যে কোনও কৌশলে তাকে বের ক'রে আন্‌বেন,—তারপর ঘরে আর নেওয়া যাবে না—কাশীতে কারও আশ্রয়ে তাকে খরচ পত্র দিয়ে রেখে দেবেন—তার দুর্গতি শুনে আমার প্রাণটা যেন একেবারে ভেঙ্গে মুচ্‌ড়ে যেতে লাগল,—একবার তার সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্য আমি পাগলের মত হ'য়ে উঠ্‌লাম।—তখনই ছুটে গিয়ে দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা ক'র্‌লাম।—দারোগাবাবু ব'ল্লেন, দিনে গেলে তাদের সন্দেহ হতে পারে, সন্ধ্যাবেলা তিনি আমাকে নিয়ে যাবেন।—সন্ধ্যাবেলা গেলাম,—কিন্তু গিয়ে দেখি—সেখানে সে নাই। যারা তাকে রেখেছিল, তারা কোথায় তাকে নিয়ে গেছে,—বাড়ীর আর কেউ তার কোনও সন্ধান ব'ল্‌তে পারল না। বোধ হয় দারোগাবাবুর সঙ্গে তার কথাবার্ত্তা তারা গোপনে শুনেছিল,—তাই পাছে কিছু গোল হয় ভেবে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।"

"আহা—তারপর?—আর কোনও সন্ধান পেলে না?"

ধীরেশবাবু কহিলেন, "দিন পনেরর মধ্যেও সন্ধান কিছু পাওয়া গেল না। তখন ওঁরা স্থির ক'ল্লেন, সে মারা গেছে ব'লেই সবাইকে জানান হ'ক। তারপর যদি কোনও সন্ধান মেলে—তার উদ্ধার করা যায়—তাকে কোথাও রেখে দেবেন—লোকে জান্‌বে সে ম'রেই গেছে। ওঁরা বাড়ীতে চ'লে গেলেন,—দারোগাবাবুর উপরে সন্ধানের ভার রইল। আমিও ক'ল্‌কেতায় রইলাম। বাড়ীতে যেতে ইচ্ছে হ'ল না। ভাবলাম দারোগাবাবুর সাহায্য ক'রব,—আর যদি সন্ধান মেলে—তখনই তাকে যে ভাবে পারি উদ্ধার ক'র্‌ব,—শেষে যাই হ'ক্‌।"

"তোমার শ্বশুরও চ'লে গেলেন?"

"তিনি বুড়োমানুষ, একেবারে ভেঙ্গে প'ড়েছিলেন,—থেকেই বা কি ক'র্‌বেন? আমিই ব'লে ক'য়ে তাকে পাঠিয়ে দিলাম।"

"তারপর? দিদির সন্ধান কি আর পেয়েছিলে?"

"হাঁ, ছ'মাস পরে অনেক অনুসন্ধান ক'রে জানা গেল, তারা তাকে বাইরে কোথায় নিয়ে যায়, আবার ক'ল্‌কেতায় নিয়ে আসে। শেষে বসন্ত হ'য়ে হাঁসপাতালে সে মারা যায়। দারোগাবাবু যে সব প্রমাণ সংগ্রহ করেন,—তাতে সন্দেহ ক'রবার—কোনও কারণ ছিল না। সেই বাড়ীতে দুই তিন জনের বসন্ত হয়,—সকলকেই তারা হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দেয়;—নাম টাম লেখানর সময় বোধ হয় ভুল একটা কিছু হ'য়েছিল। আর সেবার বড় বেশী বসন্ত হয়। হাঁসপাতালে রোজ অনেক রোগী যেত,—রোজ ম'র্‌তও মেলা।"

ধীরেশবাবু বড় একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সুখময়ীও একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, "তা হ'লে—ইনিই মায়াদিদি! নইলে কে আর তোমার জন্যে এত ক'র্‌বে? আহা!—" সুখময়ী ধীরে ধীরে আর একটি নিশ্বাস ছাড়িলেন,—তারপর আবার কহিলেন, "এখন আমি সব বুঝ্‌তে পাচ্চি। তাঁর যে সব কথা—যে সব ব্যবহার—আগে বুঝতাম না—আশ্চর্য্য হ'য়ে থাক্‌তাম—তা সব এখন বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি। না—না! আর কেউ হ'তেই পারে না। তিনি মরেন নি,—তিনিই আমার এই গঙ্গাদিদি!"

ধীরেশবাবু নীরবেই বসিয়া র'হিলেন।

সুখময়ী আবার কহিলেন, "তা এখন কি ক'র্‌বে?"

ধীরেশবাবু চমকিয়া উঠিলেন।

"কি ক'র্‌ব! কি ক'র্‌তে পারি?—কর্‌বার কি কিছু আছে আর?"

"কি ক'র্‌বে,—কি করতে পার—কি করলে ভাল হয়—

তা ঠিক বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি। কিন্তু তবু—এখন কি চুপ ক'রে থাক্‌তে পার? যদি চিন্‌লে, ব'ল্‌বে না তাকে চিনেছ? ব'ল্‌বে না তুমি তার কে?"

"আমি তার কে সে চিনেছে,—সে আমার কে আমিও চিনেছি——"

"এই চেনার একটা পরিচয় হবে না? সে পারে না। কিন্তু তোমার ত কোনও বাধা নেই।"

"বাধা—নেই কি—সুখো?"

"কি বাধা? আমি?—না, বড় ভুল বুঝ্‌ছ তবে। না,—আমি বাধা কিছু হ'তে পারি না,—হবার কোনও অধিকার আমার নাই। সে আগে, আমি পরে,—সে বড়—আমি ছোট। কেন তাকে ত্যাগ ক'র্‌বে? কোনও পাপ তাকে স্পর্শ করে নাই। মনে সে নিষ্কলঙ্ক, দেহে যাই পাপের স্পর্শ হ'য়ে থাক্—এত বৎসরের এই প্রায়শ্চিত্ত—এই ব্রত—এতেও কি তার শুদ্ধি হয় নাই?"

ধীরেশবাবু কহিলেন, "দুষ্ট লোকে নরকে তাকে টেনে নিয়ে ফেলেছিল,—বড় পুণ্যের বল ছিল, তাই সে এখন স্বর্গে গিয়ে উঠেছে। সে যেখানে এখন আছে, আমার এ সংসার থেকে সে স্থান অনেক উচ্চে। জীবনযাত্রায় আমার আশ্রয়ের—আমার রক্ষণাবেক্ষণের কোনও প্রয়োজন আর তার নাই। ব্রতধারিণী—ব্রহ্মচারিণী এখন সে,—আপনার ধর্ম্মের—মহৎকর্ম্মের শক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে আছে। এখন গিয়ে আমি তাকে কি ব'ল্‌তে পারি? কিসের দাবী ক'র্ত্তে পারি? ক'ল্লেও—তুমি কি মনে কর, তার এই ব্রত ছেড়ে, তোমার সপত্নী হ'য়ে আমার সংসারে এসে সে থাক্‌বে?"

"না——তা সে আস্‌বে না। নিজেই ত সে দিন ব'লেছিল, জীবনের পথ দুজনের একেবারে আলাদা হ'য়ে গেছে,—আর মিল্‌তে পারে না। যদি দেখাও কখনও পায়, ধরা দেবে না,—তোমার পথ তোমার সুখের হ'ক্—এই কামনা ক'রে সে স'রে যাবে। কথাগুলি আমার মনে যেন গাঁথা র'য়েছে। সব জেনে শুনেই ত কথাগুলি ব'লেছিল!"

"ঠিক মনের কথাই ব'লেছিল। আমারও মনে ঠিক তাই হয়। এ অবস্থায় অন্য কোনও পথ আর হ'তে পারে না।"

সুখময়ী কহিলেন, "তার প্রাণে হয়ত বড় একটা ব্যথা আছে।—যাই তার কপালে তখন ঘটে থাক্, সে যে পাপের নরকে ডুবে যায়নি—তোমার ঘৃণার পাত্রী হয় নি—ধর্ম্মে সে তোমারই আছে—কে জানে—হয়ত এই কথাটি তোমাকে জানাতে পার্‌লে প্রাণের এই ব্যথার ভার তার কেটে যাবে।"

ধীরেশবাবু কহিলেন, "এ সব দুঃখের অনেক উপরে সে এখন আছে। আমরা তাকে চিনেছি জান্‌লে—হয়ত সে দূরে কোথাও চ'লে যাবে,—আর কখনও দেখাও দেবে না। জীবনে এই যে কর্ম্মের সাধনায় সে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছে—সব ভেঙ্গে যাবে। আমাদের সঙ্গে এই সম্বন্ধটুকু রেখে যদি কিছু শান্তি—কিছু তৃপ্তি সে পায় তার পথও বন্ধ হ'য় যাবে।"

"তবে কি এইভাবেই চ'ল্‌বে? কিছু জান্‌তে তাকে দেবে না?"

"তাই ভাল। তারও ভাল, আমারও ভাল। সে কি আমি—যে দিন মর্‌ব—এ পরিচয় সেইদিনই হবে। সে যদি আগে যায়, যাবার দিন সব ব'লে তাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বিদায় দেব। আর আমি যদি আগে যাই—তার ক্ষমা চেয়ে বিদায় নেব। সে তার পথে চ'ল্‌ছে—নির্ব্বিঘ্নে চলে যাক্। আমিও আমার পথে যেমন চল্‌ছি চলে যাই। জীবনে এ দুটি পথ আলাদা—আলাদাই থাক্,—মরণে যদি মেলে ত মিল্‌বে। আর তোমরা দুজনে—চিনেও কেউ কারও চেনা না হ'য়ে—বাইরে পর অথচ প্রাণে বড় আপন দুটি বোনের মতই থেকো।"

রাজনৈতিক সুধীবচন।

"পৃষ্টো ব্রুতে ন সত্যং যঃ পরিণামে সুখাবহম্।
মন্ত্রী চেৎপ্রিয়বক্তা স্যাৎ কেবলং স রিপুঃ স্মৃতঃ;"

প্রশ্ন করিলে উত্তরে পরিণামে সুখাবহ-সত্য যে বলে না, এই-রূপ কেবল প্রিয়বক্তা মন্ত্রীকে শত্রু বলিয়াই মনে করিতে হইবে।

"সুলভাঃ পুরুষো রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ॥"

হে রাজন্, প্রিয়বাদী পুরুষ সততই সুলভ। অপ্রিয় হিতকথার (রোগীর যেমন সুপথ্য) বক্তা ও শ্রোতা দুই দুর্লভ।

"প্রজাপীড়নসন্তাপাৎ সমুদ্ভূতো হুতাশনঃ।
রাজ্ঞঃ কুলং শ্রিয়ং প্রাণান্নাদগ্ধ্বা বিনিবর্ত্ততে॥"

প্রজাপীড়ন-সন্তাপজাত অগ্নি রাজার কুল, শ্রী এবং প্রাণ দগ্ধ না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয় না।

"যথা বীজাঙ্কুরঃ সূক্ষ্মঃ প্রযত্নেনাভিবর্দ্ধিতঃ।
ফলপ্রদঃ ভবেৎ কালে তদ্বল্লোকাঃ সুরক্ষিতাঃ॥"

যত্নে বর্দ্ধিত বীজাঙ্কুরের ন্যায় সুরক্ষিত প্রজাও কালে সুফল দান করে।

"হিরণ্যধান্যরত্নানি গজেন্দ্রশ্চাপি বাজিনঃ।
তথান্যদপি যৎকিঞ্চিৎ প্রজাভ্যঃ স্যাৎ মহীপতেঃ॥"

হিরণ্য ধান্যরত্নাদি, গজবাজী এবং অন্য যাহা কিছু, সব প্রজাদের হইতেই রাজার লাভ হয়।

"মা তাত সাহসং কার্ষী বিভবৈর্গর্ব্বমাগতঃ।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥"

হে বৎস! অতি সাহস করিও না, সম্পদে গর্ব্বিত হইও না। বিপর্য্যয় উপস্থিত হইলে নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিও ভারের মত হয়।

"কিতবা যং প্রশংসন্তি যং প্রশংসন্তি চারণাঃ।
যং প্রশংসন্তি বন্ধক্যাঃ স পার্থ পুরুষাধমঃ॥"

শঠেরা যাহার প্রশংসা করে, চারণগণ যাহার প্রশংসা করে, কুলটারা যাহার প্রশংসা করে—হে পার্থ, সে পুরুষাধম।

"রাজানো যং প্রশংসন্তি যং প্রশংসন্তি বৈ দ্বিজাঃ।
সাধবো যং প্রশংসন্তি স পার্থ পুরুষোত্তমঃ॥"

রাজারা যাঁহাকে প্রশংসা করেন, দ্বিজগণ ও সাধুরা যাঁহাকে প্রশংসা করেন, তিনিই পুরুষোত্তম।

"প্রজাগুপ্ত-শরীরস্য কিংকরিষ্যন্তি সংহতাঃ।
গৃহীত-হস্তচ্ছত্রস্য বারিধারা ইবারয়ঃ॥"

প্রজারা যাঁহার শরীর রক্ষা করে, অরির সংহতি তাঁহার কি করিবে? হস্তে যাহার ছত্র আছে, বৃষ্টিধারায় তার কি হইবে?

"মা ত্বং তাত বলে স্থিত্বা বাধিষ্ঠাঃ দুর্ব্বলং জনং।
নহি দুর্ব্বলদগ্ধানাং কালে কিঞ্চিৎ প্ররোহতি॥"

হে বৎস! বলে স্থিত আছ বলিয়া দুর্ব্বলকে পীড়ন করিও না। দুর্ব্বলের অভিশাপে যে কালে কিছুতেই ভাল হয় না।

"যানি মিথ্যাভিভূতানাং পতন্ত্যশ্রূণি রোদতাম্।
তানি সংস্তাপকান্ ঘ্নন্তি সপুত্রপশুবান্ধবান্॥"

মিথ্যাবাক্যে অভিভূত রোরুদ্যমান্ ব্যক্তির যতগুলি অশ্রুজল পতিত হয় তাহারা পুত্র, পশু ও বান্ধবের সহিত সন্তাপককে বধ করে।

"মা তাত সংপদাগ্রমারূঢ়োঽস্মীতি বিশ্বসীঃ।
দুরারোহপরিভ্রংশ বিনিপাতোহি দারুণঃ॥"

হে বৎস! শ্রেষ্ঠ সম্পদে আরূঢ় আছি, এই বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত থাকিও না। দুরারোহ উচ্চতা হইতে পতন হইলে, সে পতনও বড় দারুণ পতন হয়।

প্রাচীন "পাড়াগাঁয়ের চাষার গীত।"

(সংগৃহীত)

নন্দের ঘরের কানাই
যমুনা সেনানে (১) চল যাই—(ধুয়াঃ)।

১। হইল দুইফর (২) বেলা
তাতিব পন্থের ধূলা
কিমতে হাটিব লাঙ্গা (৩) পাই (৪)

২। যাইব কিনা না যাইব ভাইয়া
কহ চিত্ত বুঝাইয়া
যমুনা কুলে শাম (৫) ভাই।

৩। যমুনার জল কালা
সেনান (৬) করিতে ভালা
সর্ব্ব অঙ্গ জলেতে মিশাই।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন।

(১) স্নানে (২) প্রহর দুই (৩) খালি (৪) পদ বা পা (৫) শ্যাম (৬) স্নান।

ইয়োরোপের কথা।

দশম পরিচ্ছেদ।

ব্যবহারে নির্ভীক ও তেজস্বী।

ভারতে ক্ষাত্রধর্ম্মের আদর্শ।

ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতেই ক্ষাত্রধর্ম্মের একটা উচ্চ আদর্শ আছে। রামায়ণে মহাভারতে বহুপুরাণে ও অন্যান্য আখ্যায়িকায় আদর্শ ক্ষত্রিয়বীরের অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় এবং ক্ষাত্রধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ গুণ কি তার সম্বন্ধেও অনেক কথা আমরা পাই।

দেহে শক্তিমান্, অস্ত্রবিদ্যায় কুশল, যুদ্ধে ভীমপরাক্রম রণক্ষেত্রে প্রাণদিতে অকুণ্ঠ, প্রথমেই ক্ষত্রিয়বীরকে এমনই হইতে হইবে। কিন্তু কেবল দৈহিক ও সামরিক এই সব গুণে ভূষিত হইলেই ক্ষাত্রধর্ম্ম কখনও পূর্ণ হইল না। ইহার সঙ্গে নৈতিক কতকগুলি বড় গুণও ক্ষত্রিয়বীরের থাকা চাই। ক্ষত্রিয়বীরকে সত্যপরায়ণ, প্রতিজ্ঞায় অটল হইতে হইবে,—সর্ব্বস্বপণেও ন্যস্ত বিশ্বাস রাখিতে হইবে। ঋষি ও ব্রাহ্মণগণকে সতত রক্ষা করিতে হইবে। তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারেন, তীর্থ ও যজ্ঞভূমি প্রভৃতি পুণ্যস্থান সমূহ নিরুপদ্রব থাকে, তাহা দেখিতে হইবে, ধর্ম্মদ্বেষী শত্রুদিগকে যখনই প্রয়োজন যুদ্ধ করিয়া দমন করিতে হইবে। আবার দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার জন্য সতত প্রস্তুত থাকিতে হইবে। নিরস্ত্র, পলায়নপর বা কৃপাপ্রার্থী শত্রুর দেহে অস্ত্রঘাত তিনি করিবেন না, শরণাগত বিপন্নকে প্রাণ দিয়াও রক্ষা করিবেন। প্রার্থীকে সাধ্যমত বিমুখ কখনও করিবেন না—দানে মুক্তহস্ত হইবেন। নারীকে অমর্য্যাদা কখনও করিবেন না, দুর্ব্বৃত্তের অত্যাচার হইতে তাঁহাকে সাবধানে রক্ষা করিবেন।

ইহাই ছিল প্রাচীন ভারতের ক্ষাত্রধর্ম্মের আদর্শ। পরবর্ত্তী যুগে রাজপুতজাতির মধ্যেও এই আদর্শের প্রভাব আমরা বিশেষভাবেই দেখিতে পাই।—রাজপুত জাতিকে আমরা বড় যোদ্ধার জাতি বলিয়াই জানি। যুদ্ধ ভিন্ন আর কোনদিকেই যে রাজপুত জাতির প্রতিভা বিশেষ প্রকাশ পাইয়াছে, তার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। ধর্ম্মসাধনা, বিদ্যালোচনা, উচ্চতর রাজনীতিকুশলতা, সমাজসমস্যার সমাধান-প্রয়াস, শিল্পবাণিজ্যের প্রসার—এসব কোনও দিকে কোনও বিষয়েই রাজপুত জাতির কোনও কর্ম্মপ্রচেষ্টার কথা রাজপুত জাতির ইতিহাসে নাই। কেবল যোদ্ধার জাতি—ক্ষাত্রধর্ম্মেরই অনুশীলন তাঁহারা করিয়াছিলেন।

সুতরাং ক্ষাত্রধর্ম্মের বিশেষ বিশেষগুণ গুলিই রাজপুত জাতির মধ্যে বিশেষ উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। একমাত্র এই গুণগুলিই রাজপুত জাতির মধ্যে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবার ও শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রাণে পূজা করিবার বস্তু।

রাজপুত ও ফিউডাল ফিরিঙ্গী* সমাজ।

রাজপুত বীরদের কাহিনী এদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত সকলেরই বিশেষ পরিচিত। রাজপুতীয় ক্ষাত্রধর্ম্মের একটা পরিস্ফুট চিত্রও সকলেই প্রায় মানসনেত্রে দেখিতে পান। মধ্যযুগের ইয়োরোপে—ফিউডাল সমাজে—অনেকটা এমনই এক ক্ষাত্রধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছিল, এই ক্ষাত্রধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াই তখনকার সেই দুর্দ্দান্ত ও যারপরনাই উচ্ছৃঙ্খল ফিরিঙ্গী যোদ্ধাগণের মধ্যে একটা সামাজিক সুনীতির বন্ধন গ্রথিত হইয়া উঠিতেছিল।

ইয়োরোপের এই ক্ষাত্রধর্ম্ম 'শিভাল্‌রী' নামে পরিচিত এবং এই ক্ষাত্রধর্ম্মী বীরগণের নাম ফরাসী দেশে 'শিভালিয়ার' এবং ইংলণ্ডে নাইট (Knight)। ফরাসী দেশেই এই ক্ষাত্রধর্ম্মের প্রধান অভিব্যক্তি হয়, সুতরাং ফরাসী শিভালিয়ার নাম হইতেই এই ক্ষাত্রধর্ম্মের নামও হইল 'শিভাল্‌রী'।

* ফ্রাঙ্কশব্দের অপভ্রংশ।—ইউরোপীয়েরা এই নামেই পশ্চিম এসিয়ায় সাধারণতঃ পরিচিত।

ইয়োরোপীয় ফিউডাল সমাজের সঙ্গে অনেক বিষয়ে রাজপুত ক্ষত্রিয় সমাজেরও একটা সাদৃশ্য আমরা দেখিতে পাই। ফিউডাল ইয়োরোপে রাজা ও তাঁহার ব্যারণদের মধ্যে যেরূপ ধরণের সম্বন্ধ ছিল,—রাজপুতানার যে কোন রাজা ও তাহার সর্দ্দারদের সঙ্গেও অনেকটা সেইরূপ সম্বন্ধই রাজস্থানের কাহিনীতে আমরা দেখিতে পাই। সর্দ্দাররা নিজ নিজ শাসিত ভূভাগে অনেকটা স্বাধীন রাজার মতই চলিতেন, আবার যুদ্ধের প্রয়োজনে ডাক পড়িলে আপনাদের লোকজন নিয়া রাজার অধীনে যুদ্ধ করিতে আসিতেন। রাজপুতনার ভাট ও চারণগণ রাজপুত বীরগণের বীরত্ব-কাহিনী, বীরনায়কগণের সুকুমার প্রেমের কাহিনী, গাথার ছন্দে রচনা করিয়া নানাস্থানে গান করিয়া বেড়াইতেন। যুবকবীরগণ অতি আনন্দে ও আগ্রহে তাহা শুনিতেন এবং এইসব বীরত্ব ও বীরোচিত প্রেমলীলার অনুকরণ করিতে প্রাণভরা স্পৃহা তাঁহাদের জন্মিত। ফিউডাল ইয়োরোপেও ঠিক তখন এমনই অবস্থা ছিল। ভাট ও চারণের ন্যায় সুগায়ক কবিগণ কত বীর চরিত-গাথা—তাঁহাদের কত প্রেমলীলার গাথা রচনা করিতেন, সর্ব্বত্র এই গাথা যোদ্ধারা আগ্রহে শুনিতেন, এই সব কীর্ত্তির অনুকরণে প্রয়াসী হইতেন। আরও একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রায় ঠিক একই সময় ভারতে রাজপুত জাতির এবং ইয়োরোপে ফিউডাল ফিরিঙ্গীসমাজের অভ্যুদয় হয়। তবে নানা অবস্থার সমবেত প্রভাবে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে ইয়োরোপে ফিউডালযুগের অবসান হইয়া নব্যযুগের নূতন উন্নতির সূচনা আরম্ভ হয়। কিন্তু রাজপুতেরা প্রবল মোগলসাম্রাজ্যের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে ক্রমে হীনবল হইয়া মোগলদের অধীনতা স্বীকার করেন,—পুরাতন ক্ষাত্রধর্ম্মের আদর্শ হইতেও শেষে স্খলিত হইয়া পড়েন। মধ্যযুগের ফিউডাল ইয়োরোপ সমগ্র ভারতবর্ষের মতই বিশাল ভূভাগ ছিল। ভবিষ্যতে যে উন্নতির বীজ সেই ইউরোপে নিহিত ছিল, ক্ষুদ্র মরুদেশ রাজপুতানায় তাহা সম্ভব হইতে পারে না,—বিশেষ সেই রাজপুতানাকে আত্মরক্ষার জন্য তার চারিধারে ঘেরা প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে যেমন নিয়ত যুঝিতে হইয়াছে,—ফিউডাল ইউরোপকে তাহা কখনও করিতে হয় নাই।

সাদৃশ্যের কারণ।

যাহা হউক,—ইয়োরোপীয় ফিউডাল সমাজ এবং রাজপুত সমাজ,—ইয়োরোপীয় নাইট এবং রাজপুতবীর—কোনও রূপ সংশ্রবের সম্ভাবনা ব্যতীতও ইহাদের মধ্যে এই যে একটা সাদৃশ্য আমরা দেখিতে পাই, তাহার কারণ কি?

শক্তিমান্ কোনও জাতির প্রথম অভ্যুদয়কালে যদি কোনওরূপ উন্নত রাষ্ট্রীয় সঙ্ঘ এবং রাষ্ট্রীয়শাসনতন্ত্রের গঠন বা পরিচালনার সম্ভাবনা না থাকে,—আর সেই জাতীয় লোকেরা যদি স্বভাবতঃই স্বাধীনচেতা নির্ভীক তেজস্বী ও চণ্ডভাবাপন্ন হয়,—তবে যুদ্ধ বিগ্রহই জীবনের প্রধান কর্ম্ম-জনসমাজের মধ্যে প্রধান ঘটনা হইয়া উঠে। সামরিক শৌর্য্যবীর্য্যই এ অবস্থায় উচ্চপদ ও উচ্চপ্রতিষ্ঠালাভের একমাত্র অবলম্বন হয়, এবং সম্ভ্রান্তবংশীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী-ব্যক্তিমাত্রেরই এ অবস্থায় কর্ম্মজীবনের প্রধান লক্ষ্য হয়—বীরত্বের অনুশীলন। উন্নত জীবননীতির কোনও বীজ যদি ইহাদের মধ্যে থাকে, অথবা উন্নতধর্ম্ম বা সুনীতির কোনও প্রভাব যদি ইহাদের মধ্যে আসিয়া পড়ে, তবে এইরূপ ক্ষাত্রধর্মের দিকেই ইহাদের চিত্তের গতি স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হইবে, এবং ইহাকে আশ্রয় করিয়াই সামাজিক ধর্ম্মনীতির আদর্শ গড়িয়া উঠিবে।

ইউরোপে মধ্যযুগের ফিরিঙ্গী এবং মুসলমান অধিকারের প্রারম্ভে ভারতের রাজপুত—উভয়ের অবস্থাই মোটের উপর এইরূপ ছিল। ক্ষত্রিয় নামধারী হইলেও তখনকার রাজপুত সম্প্রদায়কে যে নব-অভ্যুদিত এক জাতি বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা ভারতের প্রাচীন ক্ষত্রিয়বংশীয় কি না, এ আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। তবে প্রাচীন ক্ষত্রিয়সমাজের সঙ্গে যে তাঁহাদের অনেক পার্থক্য ছিল এবং নূতন অভ্যুদিত জাতির বিশিষ্টতাই যে তাঁহাদের মধ্যে বেশী দেখা যাইত, একথা তত্ত্ববিৎ সকলেই বলিয়া থাকেন।

ভারতের ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রাচীন ক্ষাত্রধর্ম্মের ভাবও স্বভাবতঃ রাজপুতদের চরিত্রে সঞ্চারিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণনেতৃগণ ধর্ম্মরক্ষার উদ্দেশ্যে এই নূতন ক্ষত্রিয়জাতির অভ্যুদয় ঘটান, তাঁহারাও এই ক্ষাত্রধর্ম্মের আদর্শই রাজপুত বীরগণের সম্মুখে ধরেন। ইহার ফলে রাজপুতবীর চরিত্র এই আদর্শেই গঠিত হইয়া উঠে।

তবে সামাজিক সভ্যতাসম্পর্কিত অন্যান্য অবস্থার পার্থক্য অনুসারে এই ক্ষাত্রধর্ম্মের মোট প্রকৃতি ও লোক-চরিত্রের উপরে তাহার প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে কতক পরিমাণে বিভিন্ন রকম হইবেই। প্রাচীনভারতের ক্ষত্রিয়ে এবং রাজপুতে এই পার্থক্য দেখা যায়। আবার রাজপুতবীরের চরিত্রে এবং ফিউডাল ফিরিঙ্গীবীরের চরিত্রেও পার্থক্য অনেক দেখা যায়। সংযম, ধীরতা এবং বীরোচিত কঠোর চণ্ডগুণের সঙ্গেই শান্ত সুকুমার গুণাবলীর সমাবেশ প্রাচীন ভারতের ক্ষত্রিয় চরিত্রে যেরূপ দেখা যায়, রাজপুত চরিত্রে তেমন দেখা যায় না,—ফিউডাল ফিরিঙ্গীবীরের চরিত্রে আরও কম দেখা যায়। অসংযত চণ্ডভাব—আচরণে সুকুমারশীলতার অভাব প্রভৃতি ত্রুটীও ইহার বিপরীত পর্য্যায়ে লক্ষিত হইবে।

ফিউডাল ফিরিঙ্গী সমাজে ক্ষাত্রধর্ম্মের উদ্ভব।

যাহা হউক,—এখন দেখিতে হইবে, ফিউডাল ইউরোপে এ উন্নত এই ক্ষাত্রধর্ম্মের আবির্ভাব কেমন করিয়া হইল?

ইহার কিছু বীজ ছিল,—কতকটা বাহিরের প্রভাবও আসিয়াছিল।

মধ্যযুগে ইয়োরোপ ভরিয়া যে ফ্রাঙ্কজাতিরই প্রাধান্য হয়, একথা পাঠকগণ অবগত আছেন। ফ্রাঙ্করা জর্ম্মাণ। যেখানে ফ্রাঙ্করা যায় নাই, অন্য কোনও জার্ম্মাণজাতি গিয়াছিল,—পশ্চিম ইয়োরোপের সকল দেশের প্রাচীন অধিবাসীদের সঙ্গেই জর্ম্মাণদের অল্পবিস্তর শোণিত সংমিশ্রণও ঘটিয়াছিল।—এই মিশ্রিত জাতিসমূহ বহুপরিমাণে রোমীয় প্রভাবের মধ্যে আসিলেও, জর্ম্মাণ স্বাভাবেরও অনেক দোষগুণ ইহাদের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল।

আর যতই দোষ থাক, বীরত্ব, সত্যপালনে প্রবৃত্তি, এবং নারীর প্রতি শ্রদ্ধা এইকয়টি গুণ আদিমকাল হইতেই জর্ম্মাণদের স্বভাবে দেখা যাইত। তারপর, যখন দলপতির অধীনে যোদ্ধার দল গঠিত হইতে লাগিল, তখন প্রভু দলপতির প্রতি তাঁহার সমরানুচরদের একটা বিশ্বস্ততা গুণও জন্মিতে লাগিল। ফিউডাল যুগে যে সমাজ গঠিত হইল, তাহাও সামরিক প্রভু ও সেবকের সম্বন্ধে পরস্পর বদ্ধ যোদ্ধা ভূম্যধিকারীদের সমাজ। এরূপ সমাজ শৌর্য্যবীর্য্যাদি সামরিক গুণের অনুশীলন সম্বন্ধে বিশেষ অনুকূল। প্রভুর প্রতি শপথে বদ্ধ সেবকের বিশ্বস্ততাও এই সমাজ বন্ধন রক্ষার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় ধর্ম্ম।

সুতরাং বীরত্ব, সত্যপালন, বিশ্বস্ততা এবং নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা—ক্ষাত্রধর্ম্ম বা শিভাল্‌রীর এই সব গুণ আপনা হইতেই ক্রমে ফিউডাল ফিরিঙ্গী সমাজে অভিব্যক্ত হয়।

ধর্ম্মরক্ষা, বিপন্নকে আশ্রয় দান, উৎপীড়িত দুর্ব্বলের সহায়তা প্রভৃতি গুণের আদর্শ খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রভাবে আসিয়াছে। রোমীয় ধর্ম্মগুরুরা প্রথম হইতেই বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন, উদীয়মান এই ফিরিঙ্গী সমাজ যথাসম্ভব উন্নত ও শান্ত খৃষ্টীয় ধর্ম্মনীতির অনুবর্ত্তী হয়, আর কিসে ইহাদের শৌর্য্যবীর্য্য খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সেবায় নিয়োজিত হইতে পারে।

এই সব অবস্থার সংযোগেই ক্রমে এই শিভাল্‌রী বা ক্ষাত্রধর্ম্মের আদর্শ ফিরিঙ্গী ফিউডাল সমাজে প্রবর্ত্তিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্ম্মের সংশ্রবে নানা রকম রীতি নীতিরও প্রবর্ত্তন হইল।

শিভাল্‌রীর রীতি নীতি—শিক্ষা ও দীক্ষা।

সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তি মাত্রকেই তখন যোদ্ধা হইতে হইত।—প্রতিষ্ঠালাভ দূরে থাক, বংশগত পদমর্য্যাদা রক্ষাও অন্যথা সম্ভব হইত না। যুদ্ধে বীরত্বের পরীক্ষা হইলেই যোদ্ধা শিভাল্‌রীতে দীক্ষিত হইয়া শিভালিয়ার বা নাইট্ উপাধিলাভ করিতেন। এই উপাধিলাভ প্রত্যেক বীর তাঁহার বীরত্বের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বলিয়া মনে করিতেন।

বাল্যাবধিই ইহার শিক্ষা আরম্ভ হইত। সম্ভ্রান্ত যোদ্ধৃ-বংশীয় বালকগণ কোনও নাইটের গৃহে পেজ (page) বা বালসেবকরূপে নিযুক্ত হইত তাহাতে শিভালরীর আদব কায়দা সব শিখিত।

বড় হইলে তাহারা সেই নাইটের সামরিক অনুচর (Squire স্কয়ার) হইত,—তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে যাইত, তাঁহার দেহ রক্ষা করিত, তাঁহার আদেশ পালন করিত। তখন কোনও যুদ্ধে তাহার শৌর্য্যবীর্য্যের বিশেষ পরিচয় পাইলে প্রভু নাইট তাহাকে শিভাল্‌রীতে দীক্ষা দান করিতেন। শিষ্য জানু পাতিয়া গুরুর সম্মুখে বসিত,—বীরত্ব, ধর্ম্মরক্ষা, সত্যপালন, নারীর সমাদর, বিপন্ন ও দুর্ব্বলের সহায়তা প্রভৃতি শিভালরীর নীতি সমূহ প্রাণপণে পালন করিবে, এই শপথ সে করিত। গুরু তরবারীর উল্টাদিকে তাহার

কাঁধ তিনবার স্পর্শ করিয়া সেই তরবারী তাহার হাতে দিতেন,—নাইট্ বলিয়া তাহাকে সম্বোধন করিতেন। ইহাই ছিল শিভাল্‌রীতে দীক্ষার সাধারণ নিয়ম। ক্রমে যাজকগণ ইহার সঙ্গে কতকগুলি ধর্ম্মানুষ্ঠানও যোগ করেন। দীক্ষার পূর্ব্বদিন শিষ্যকে উপবাস করিয়া থাকিতে হইত,—রাত্রিতে জাগ্রত থাকিয়া তরবারী সম্মুখে রাখিয়া প্রার্থনা করিতে হইত। তারপর রাত্রিপ্রভাতে যাজকদের সম্মুখে তাঁহার দীক্ষা হইত।

দীক্ষিত নাইট্ শিভাল্‌রীর নীতি সমূহ পালন করিবেন, এরূপ প্রত্যাশা অনেকেই করিতেন। কিন্তু সব যে পালিত হইত না,—একথা বলাই বাহুল্য। তবে যুদ্ধে বীরত্ব, ধর্ম্মরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণে অবিমুখতা, আর নারীর সমাদর সূচক কতকগুলি সৌজন্যের আদব কায়দা—এই কয়টি বিষয়ে দীক্ষিত নাইটদের ত্রুটী বিশেষ দেখা যাইত না। সত্যরক্ষা এবং বিশ্বাস রক্ষার দিকেও একটা আগ্রহ দেখা যাইত। এই সব বিষয়ে বড় কিছু অপরাধ ঘটিলে নাইট্-সমাজে অপরাধীকে বিশেষ লাঞ্ছিত হইতে হইত।

বেশভূষা।

নাইট্‌রা সকলেই অশ্বারোহণে যুদ্ধ করিতেন। বস্তুতঃ নাইট বলিলেই অশ্বারোহী বীর বুঝা যাইত। ফরাসী শিভালিয়ার কথাটির মূল অর্থ অশ্বারোহী—'শিভাল' বা অশ্ব এই শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন। ইংরেজি 'ক্যাভিলিয়ার' (অশ্বারোহী সুজন) এবং 'ক্যাভাল্‌রী' (অশ্বারোহী সেনা) কথা দুইটিও ঐ এক মূলশব্দ হইতে সঞ্জাত।

বর্শা, তরবারী, গদা (club) রণকুঠার (battle axe) এই সবই নাইটদের প্রধান অস্ত্র ছিল এবং এই সব অস্ত্রচালনাতেও নাইটরা বিশেষ কুশলতা অভ্যাস করিতেন। আত্মরক্ষার জন্য বড় বড় ঢাল তাঁহারা ব্যবহার করিতেন। আর যুদ্ধে আগাগোড়া লৌহনির্ম্মিতবর্ম্মে আচ্ছাদিত হইয়া যাইতেন। বর্ম্মাবৃত নাইটের অনেক চিত্র ইয়োরোপীয় ইতিহাসাদি গ্রন্থে পাওয়া যায়,—তাহা হইতে এই বর্ম্ম যে কিরূপ তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। বাল্যাবধি ব্যায়াম অনুশীলনে দেহে তাঁহারা এমনই দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হইতেন যে এই বর্ম্মের ভার অনায়াসে বহন করিয়া যুদ্ধে তাঁহারা ঐ সব ভারী ভারী অস্ত্র বেশ কৌশলে ও ক্ষিপ্রভাবে চালনা করিতে পারিতেন। তখন যে সব অস্ত্র যুদ্ধে ব্যবহৃত হইত, তাহা হইতে এই বর্ম্ম নাইটের দেহকে অনেক পরিমাণে রক্ষা করিতে পারিত। কিন্তু এখনকার কামান বন্দুকের গোলাগুলির আঘাত লৌহবর্ম্মও সহিতে পারে না,—তাই এ সবের ব্যবহার উঠিয়া গিয়াছে। শোনা যায়, কোনও কোনও নাইট এমনই বলশালী ছিলেন যে, তাঁহাদের হাতের কুঠারের আঘাত বর্ম্মাবৃত প্রতিপক্ষের দেহকেও একেবারে ছিন্ন করিয়া ফেলিত।

ক্রীড়ামোদ।

দৈহিক শক্তি ও ক্ষিপ্রকারিতা এবং অস্ত্রকুশলতা প্রকাশ পায়, এমন ক্রীড়াতেই যে এই সব বীরগণ বিশেষ অনুরক্ত হইবেন, একথা না বলিলেও চলে। বিশেষ সমারোহে একরূপ অস্ত্রক্রীড়া বা যুদ্ধের খেলাই ছিল তখনকার দিনের বীরদের প্রধান আমোদ। ইহার নাম ছিল—'টুর্ণামেণ্ট'। যখন যেখানে টুর্ণামেণ্ট হইত, বহু নাইট সমবেত হইতেন,—রাজা তাঁহাদের পারিষদদের লইয়া নিজে পর্য্যন্ত অনেক সময় উপস্থিত থাকিতেন।

বৃহৎ ক্রীড়াঙ্গন প্রস্তুত হইত। তার চারিধারে সারি সারি আসন স্তরে স্তরে সজ্জিত হইত। বহু নারীও এই ক্রীড়া দেখিবার জন্য আসিতেন।

বীরেরা কখনও দুজনে দুজনে, কখনও বহুজনে একত্র মিলিয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া নানা কৌশলে অস্ত্রচালনা করিতেন। ক্রীড়ায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার উত্তেজনা কখনও কখনও ভীষণ সাংঘাতিক আকারও ধারণ করিত। এক এক সময়ে অনেক বীর এই ক্রীড়াঙ্গনে হতাহতও হইতেন।

সম্ভ্রান্তবংশীয়া শ্রেষ্ঠ সুন্দরী কোনও নারীকে এই ক্রীড়াসভায় প্রধান আসন দেওয়া হইত। বিজয়ী বীরগণ তাঁহার সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিতেন, তাঁহারই হাতে বিজয়মুকুট গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইতেন।

আরও বড় প্রিয় একটি খেলা নাইটের ছিল, শ্যেন পাখীর খেলা। নাইটরা সকলেই শ্যেনপাখী পুষিয়া তাহাদের যত্নে শিক্ষা দিতেন। তারপর তাহাদের আকাশে উড়াইয়া দিয়া অন্য পাখী শিকার করাইতেন। এই শ্যেন পাখীর খেলাতেও নাইটের মধ্যে অনেক প্রতিযোগিতা হইত।

নারীর সমাদর ও তাহার প্রকৃতি।

নারীর সমাদর এবং তৎসংসৃষ্ট নানারকম সৌজন্যের আদব কায়দা শিভাল্‌রীর বড় একটি বিশেষত্ব ছিল। তবে এই সমাদরের মধ্যে সুকুমার মধুর রসের প্রাধান্যই দেখা যাইত। সদ্বংশীয় সুন্দরী যুবতীকে মধুর কমনীয় ব্যবহারে সন্তুষ্ট করিতে নাইটরা সর্ব্বদাই চেষ্টিত থাকিতেন। এরূপ কোনও নারী কোথাও বিপন্ন বা লাঞ্ছিত হইলে, তাঁহার প্রাণ বা মান রক্ষা করিতে পারিলে প্রত্যেক নাইট আপনার বীর-জীবন ধন্য হইল বলিয়া মনে করিতেন। বড় বড় নাইটগণ কোনও উচ্চবংশীয়া সুন্দরীকে আপনাদের নায়িকা বা প্রেমের রাণীর (ladylove এর) পদে বরণ করিতেন। ইঁহার সঙ্গে নাইটের কখনও বিবাহের সম্ভাবনা থাক্ বা না থাক্—তাহাতে এমন কিছু আসিয়া যাইত না,—ইহা নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়াও কেহ মনে করিতেন না। নাইট মনে মনে সেই রূপসীকে পূজা করিতেন,—তাঁহার নামে দুঃসাহসিক কর্ম্মসাধন করিতে অগ্রসর হইতেন,—সর্ব্বত্র তাঁহার সম্মান রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর থাকিতেন।

বীর নায়ক এবং রূপসী নায়িকা,—নায়িকার জন্য নায়কের কত বিচিত্র দুঃসাহসিক কর্ম্মসাধন, ইঁহাদের প্রেমের কত বিচিত্র লীলা—এই সব বিষয় লইয়া অনেক কাব্যকাহিনী তখন রচিত ও গীত হইত। এই সব কাব্যই তখনকার জনপ্রিয় সাহিত্য ছিল। এই সব কাব্য রচনার চেষ্টায় সাহিত্যেরও একটা উন্নতি তখন আরম্ভ হয়।

শিভাল্‌রীর যুগ বহুদিন গত হইয়াছে। কিন্তু এখনও ইয়োরোপীয় সমাজে নারীর প্রতি যে সাধারণ সমাদর দেখা যায়, তাহার মধ্যে এই ভাবটিই প্রধান এবং ইহা যে শিভাল্‌রীর এই রীতি হইতে আসিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যৌবন-সুলভ কমনীয় সৌন্দর্য্যে চিত্তাকর্ষিণী এই রকম একটা প্রশংসার ভাব কথায় ও ব্যবহারে প্রকাশ করা ইয়োরোপীয় সমাজে নারীর প্রতি সমাদরপ্রদর্শনের প্রধান উপায়। বর্ষীয়সী নারীরাও এই সমাদর লাভের আকাঙ্ক্ষায় নানাকৃত্রিম ও ক্লেশকর উপায়ে যাহাতে আপনাদিগকে মোহিনী যুবতীর মত দেখায় তার জন্য সর্ব্বদা বিশেষ চেষ্টা করেন। আমাদের দেশে নারীর প্রতি শ্রদ্ধার আদর্শ ইয়োরোপীয় এই আদর্শ হইতে একেবারে পৃথক রকম। নারীকে মাতার মত দেখিতে হইবে, ইহাই এদেশের নীতি। সাধারণতঃ 'মা' বলিয়া নারীকে সম্বোধন করাই এদেশের রীতি। মোহিনীভাবে কোনও নারীর সৌন্দর্য্যের দিকে পরপুরুষের দৃষ্টি নিতান্ত নিন্দনীয় বলিয়া আমাদের সমাজে পরিগণিত। কোনওরূপ কথায় ও ব্যবহারে এইরূপ ভাব প্রকাশ করা একেবারে অমার্জ্জনীয় অশিষ্টতা বলিয়াই সকলে মনে করেন। আর নারীরাও একটু বয়স হইলে—সন্তানসন্ততির জননীত্ব লাভ করিলে—আপনাদের সৌন্দর্য্যের মোহে কাহাকেও আকৃষ্ট করিবার চেষ্টার কথা মনেও আনিতে পারেন না;—তাঁহারা মনে করেন, কুলনারীর পক্ষে তার অপেক্ষা ঘৃণিত ব্যবহার আর কিছু হইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

খাঁচার রাণী।

রুদ্ধ কর মালিক আমার খাঁচার দুয়ারখানি;
মুক্তি তুমি দিবে না'ক জানি তা' বেশ জানি।
মুক্তি আমার নাই'ক লেখা,
শুধুই কেন খুলে রাখা
ছোট্ট দুয়ার খানি?
বাইরে থেকে সুনীল আকাশ,
মিষ্টি আলো, মৃদুল বাতাস,
দোলায় পরাণখানি।

তা'রা শুধুই বয়ে আনে নিরাশ আশার বাণী।
ভুলে গিয়ে নিজের দশা,
সবুজ গাছে বাঁধতে বাসা,
উধাও পরাণখানি।
ছুটে যেতে দুয়ার পানে,
শিকল মোরে পিছু টানে,
আমি হতাশ মানি।

কা'ন্না যেন পরাণ মাঝে করে কাণাকাণি।
চাইনা আমি সুনীল আকাশ,
চাইনা ওগো আলো বাতাস,
খাঁচার আমি রাণী।
মিছে কেন খুলে রাখ,
মুক্তি যখন দিবেই না'ক
জানি তা' বেশ জানি।
রুদ্ধ কর মালিক আমার খাঁচার দুয়ার খানি।

শ্রীব্রহ্মানন্দ সেনগুপ্ত।

পল্লীর-প্রাণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১৩)

পরের জমিতে অনধিকার প্রবেশের চেষ্টায়—দুইপক্ষে দুইজনে সামান্য একটু মারামারি হইয়াছে, খুনজখম বা গুরুতর শান্তিভঙ্গ কিছু হয় নাই। থানার দারোগা এজেহার লিখিয়া নিলেন,—কিন্তু এরূপ সামান্য ব্যাপারে সাক্ষাৎভাবে হস্তক্ষেপ করিতে চাহিলেন না। প্রতিকারের জন্য আদালতে নালিশ করিতে হরিঘোষালকে উপদেশ দিলেন। অনেক অনুনয় (এবং কিছু জলপানি কবুল) করিয়াও যখন নিবারণকে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দিতে দারোগাবাবুকে সম্মত করিতে পারিলেন না, তখন অগত্যা হরিঘোষাল গ্রামে আসিয়া তারিণীবাড়ুয্যেকে ধরিলেন। পঞ্চায়েত মোড়লের কথায় থানার দারোগা নিবারণকে চালান দিতে রাজি হইতে পারে। অথবা গ্রামে দাঙ্গা হইয়াছে, শান্তিভঙ্গ হইয়াছে, এ সংবাদ নিজে যদি তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের সমীপে রিপোর্ট করেন,—তবে হরিঘোষালের নালিশের গুরুত্ব বাড়িবে, মোকদ্দমা সঙ্গীন হইয়া উঠিবে। ওদিকে বড় উকীল বেণী বসু সহায় আছেন,—নিবারণকে তার ঔদ্ধত্যের জন্য অশেষ লাঞ্ছনা তিনি করিতে পারিবেন।

কিন্তু তারিণীবাড়ুয্যে কহিলেন, "কেন আর অত বড় একটা মামলার হাঙ্গামায় যেতে চাচ্চ ঘোষাল?—কি ক্ষতি হ'য়েছে তোমার?—নিবারণ ত পুকুরটা দখল ক'ত্তে আস্‌ছে না। বিনা খরচায় সাফ ক'রে দিয়ে গেল—ভালই হ'ল বরং।"

হরিঘোষাল চটিয়া কহিলেন' "কি! তুমি এমন কথা ব'ল্‌ছ—বাড়ুয্যে! কিছু ক্ষতি হয়নি! দখল আজ না করুক, দুবছর যদি উপরোউপরি এম্‌নি সাফ করে,—এরপর একটা দখলের স্বত্ব তার জন্মাবে না?—লোকে তাই সাক্ষী দেবে না?"

"সে যদি আবার সাফ ক'ত্তে যায়, তখন বোঝা যাবে।—সে ত' যাবেনা।—আমরাই বা যেতে কেন দেব?—আর সময় মত তুমি নিজে সাফ করিয়ে ফেলো,—কোনও গোল হবে না দেখো।"

"আমি সাফ করাব! কি গরজ প'ড়েছে আমার যে এতগুলো পয়সা আমি খরচ ক'ত্তে যাব? ওই পুকুরের জল ত আমার বাড়ীর কেউ ব্যাভার ক'ত্তে আসে না?"

বাড়ুয্যে কহিলেন, "ঘোষাল, পুকুর কি কেউ কেবল নিজের ব্যবহারের জন্যই রাখে? দশজনেই ব্যবহার করে, আর তার জন্যেই লোকে পুকুর করে।"

"সে যার খুসী সে করুকগে। অত পুণ্যির জন্যে আমি মরিনে। ওই গাঙ্গুলী পাড়ার লোকে জল খাবে, তার জন্যে আমি গেঁটের পয়সা খরচ ক'র্‌ব। ভারি যে আহ্লাদ!—তার জল খাবে, নিজেরা কেন পুকুর ক'রে নিক না?"

"কে নেবে? যায়গাই বা কোথায়? ওই একটা বড় পুকুর র'য়েছে—"

"র'য়েছে সে আমার পুকুর—আমার যায়গায়।—আমার পুকুর আমি যা খুসী ক'র্‌ব,—যেভাবে খুসী রাখব! তাদের কি?"

"তাদের প্রাণ যে উরি মধ্যে। জল নইলে কি আর কেউ বাঁচে?"

"তাদের প্রাণ গেল ত আমার ব'য়ে গেল! ভারি আহ্লাদ—ওরা জল খাবেন, চান ক'র্বেন, আমি দেব তার জন্যে তৈয়েরী পুকুর সাফ ক'রে রেখে। তা হ'লে তুমি কি ক'র্বে বাড়ুয্যে? গাঁয়ে যে এত বড় একটা অনধিকার প্রবেশের দাঙ্গা আর তাই নিয়ে এই শান্তিভঙ্গটা হ'ল—তুমি পঞ্চায়েতী কর আর মাজেষ্টরসাহেবকে তা জানাবে না?"

"কি এমন দাঙ্গা আর শান্তিভঙ্গ হ'য়েছে? আমি বল্ছি—ও ছেড়ে দেওগে!"

"ছেড়ে দেব! ওদের পক্ষ টেনে তুমি ব'ল্ছ—আর অমনি আমি ছেড়ে দেব! এত বড় অপমানটা আমায় ক'ল্লে—মেরে রক্তারক্তি করে দিলে—আর তাই ছেড়ে দেব!"

"হাঁ,—তা অপমান তোমার কিছু হ'য়েছে বই কি? আর কাঁটার হেঁচড় পেঁচড়ও কিছু লেগেছে। তা ছেলেমানুষ তোমার পায় ধ'রে বরং গিয়ে মাপ চাইবে এখন—"

"নাহে বাড়ুয্যে! ওসব কিছু হবে টবে না। গরু-মেরে জুতোদান! তা হ'লে তুমি দারোগাকে কিছু বল্বে না? মাজেষ্টরসাহেবের কাছেও রিপোর্ট দেবে না?"

তারিণীবাড়ুয্যে কহিলেন, "থানায় ত এজেহার দিয়েই এসেছ। আমি গিয়ে আর বেশী কি ব'ল্ব? এসব কি জান পুলিসচালানী মামলা একেবারেই নয়। আমার কথায় কি তারা একটা অসঙ্গত কাজ ক'র্বে?"

"তুমি বলেই কেন দেখ না? তোমার যা করা উচিত তা ত কর, শেষে অদেষ্টে যা থাকে হবে।—"

"তা থানায় গিয়ে একবার কথা ক'য়ে দেখ্তে পারি।"

"আর জেলায় মাজেষ্টর সাহেবের কাছে রিপোর্ট?"

"হাঁ, কাল একবার জেলায় যাব, মাজেষ্টর সাহেবের সঙ্গে দেখাও ক'র্ব,—তখন এঘটনার কথা না হয় বলা যাবে।"

"তা হ'লে আমাকে নিয়ে তুমি যাবে,—তুমিই আমাকে দিয়ে দরখাস্তটা দেওয়াবে।"

তারিণীবাড়ুয্যে কহিলেন, "সেটা—কি জান—ভাল হয়না ঘোষাল। পুকুরের স্বত্ব নিয়ে যদি ঝগড়ার কথা বল, সেটা আমাদের দেখ্বার কথা নয়।—তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় শান্তিভঙ্গ একটা হ'লে —তা এক সে রকম কিছু হয়নি। সামান্য একটু হাতাহাতি হ'য়েছে—এ নিয়ে কি আমি গিয়ে মামলার একটা পক্ষ হ'তে পারি? মাজেষ্টর-সাহেবও ভাব্বেন,—নিবারণের সঙ্গে শত্রুতা কিছু আছে ব'লেই আমি এই কচ্চি।—সেটা কি—আমার পক্ষেই ভাল হবে ঘোষাল?"

"হুঁ! হুঁ!—আসল কথা ভাগে হয়, তার বিপক্ষে কিছু ব'ল্বে না। আচ্ছা, আমিও দেখ্ব, কত বড় মাতব্বর তুমি! আর ভেবোনা, তুমি কিছু না ব'ল্লেই এ মামলা আমার চ'ল্বে না। তুমি যত বড়ই হও, বেণীবোস্ তোমার চেয়ে অনেক বড়।"

এই বলিয়াই হরিঘোষাল উঠিয়া হন্ হন্ করিয়া ছুটিয়া গেলেন।

"আরে শোন-শোন ঘোষাল—শোন! আরে তৈরী তামাকটা খেয়েই যাওনা হে!"

হরিঘোষাল সেদিকে কর্ণপাতও করিলেন না,—তেমনই হন হন করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেলেন।

পরদিন সকালে দুটি ভাতেভাত মুখে দিয়া হরিঘোষাল জেলার সহরে চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণপুর গ্রামটি জেলার সদর মহকুমার মধ্যে। কিন্তু সহরের পথ নিতান্ত সুগম নয়। অনেকখানি পথ নৌকায় গিয়া তারপর ষ্টীমার ধরিতে হয় ষ্টীমারেও দুই তিন ঘণ্টা লাগে,—তারও চলাচলের তেমন ভাল বাঁধা নিয়ম কিছু ছিল না।

যাহা হউক, সন্ধ্যার সময় হরিঘোষাল সহরে গিয়া পৌঁছিলেন—ভাই অম্বিকাঘোষালের নিকট সকল অভিযোগ জানাইলেন।

হরিঘোষাল অনেক কথাই বলিলেন,—অম্বিকাঘোষাল আইনের বুদ্ধিতে গুছাইয়া অভিযোগ তিনটি নম্বরে বা প্রস্তে ভাগ করিলেন।

১ নং। হারাণ দত্তের বেয়াদব পুত্র গোপাল দত্ত কর্তৃক বাজারে হরিঘোষালের অবমাননা,—নিবারণের তাহাতে গোপালদত্তের পক্ষ সমর্থন।

২ নং। তারকঘোষালের বিধবা স্ত্রীকে গোপনে দ্রব্যাদি পাঠাইয়া ও প্রকাশ্যে তাহার গৃহসংস্কারাদি করিয়া নিবারণের সাহায্য দান। ইহার গূঢ় উদ্দেশ্য তারকঘোষালের স্ত্রীকে বাধ্য করিয়া, তাহার দ্বারা পৈতৃক সম্পত্তি যাহা আছে তাহাতে একটা সরিকানার দাবী দায়ের করান.

এবং তদুপায়ে হরিঘোষালের ও অম্বিকাঘোষালের বৈষয়িক ক্ষতি সাধন-চেষ্টা।

৩ নং। দলবদ্ধ গ্রাম্য যুবকদের লইয়া বে-আইনী বলে তাঁহাদের পুকুর সাফ করার চেষ্টা,—এবং হরিঘোষালের ন্যায়তঃ ও আইনত তাহাতে বাধা হওয়ার অধিকার থাকা সত্ত্বেও বাধা হওয়ায় নিবারণ কর্ত্তৃক তাঁহাকে প্রহার। নিবারণের যে তাঁহাদের পুকুর দখল করিবার অভিপ্রায় ইহাতে কিছু আছে, তা নয়, - এটা একটা 'স্বদেশী' হুজুগ! তার সঙ্গে হরিঘোষালকে জব্দ করিবার একটা গৌণ অভিপ্রায়ও অবশ্য আছে।

এই গেল তিন নম্বর বিবাদমূলক ঘটনা,—তিনটিতেই ঘোষালপরিবারের প্রতি নিবারণের একটা দৃঢ় শত্রুতার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু এই শত্রুতার কারণ কি? কেন কি উদ্দেশ্যে নিবারণ তাঁহাদের অনিষ্ট করিতে চায়? সেটা এখনও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না। কিছুকাল পূর্ব্বে বিলাতফেরত সংক্রান্ত একটা দলাদলিতে নিবারণ কিছু লজ্জিত হয় এবং দলাদলির মোড়ল ছিলেন হরিঘোষাল। তাও একটা কারণ হইতে পারে। কিন্তু তাই কেবল কারণ নয়, আরও কিছু আছে, যাহা এখনই বুঝা যাইতেছে না,—পরে হয়ত বুঝা যাইবে। তবে কারণ ও মূল উদ্দেশ্য যাহাই থাক, নিবারণ যে কোমর বাঁধিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে লাগিয়াছে ইহা নিসংন্দেহ। সুতরাং নিবারণকে জব্দ করিতেই হইবে। হতভাগা অতি গোঁয়ার, নিষ্কর্ম্মা গুণ্ডার মতই গ্রামে বিচরণ করে। মুখে ওসব কথা কিছু না বলুক, সভাবক্তৃতা কিছু না করুক, কাজে কতকটা স্বদেশী হুজুগের ভাবও আছে। তাই গ্রাম্য যুবকদলও তার বাধ্য হইয়াছে। নানাকারণে তাঁহার অগ্রজও গ্রাম্য লোকের বিশেষ প্রিয়পাত্র নহেন। সুতরাং নিবারণকে বিশেষরূপে জব্দ না করিতে পারিলে মানসম্ভ্রম নিয়া তাঁহাদের গ্রামে তিষ্ঠান দায় হইবে।

আর একটি গুরুতর কথা ইহার মধ্যে দেখা যাইতেছে এই যে পঞ্চায়েত তারিণীবাড়ুয্যেও নিবারণের পক্ষে। গোপালদত্ত তারই লোক, হরিঘোষালকে এত বড় অপমান করিল,—কিছুই বলিল না। তবে এটা নিশ্চয়ই নিবারণের কারসাজিতে হইয়াছে। নতুবা গোপাল দত্ত তার কে?

আবার, নিবারণ এই পুকুর সংক্রান্ত ব্যাপারে এত বড় অপমানটা হরিঘোষালের করিল,—পঞ্চায়েত হইয়াও তারিণী বাড়ুয্যে তাহাতে উদাসীন ভাবেই থাকিতে চায় প্রার্থিত হইয়াও কোনও সাহায্য তাঁহাকে করিল না।—এই তারিণীবাড়ুয্যের জোরেই নিবারণের জোর,—নতুবা নিবারণের এত সাহস হইবে কেন? হাজার হউক, ছেলেমানুষও ত বটে।—আর সে গোঁয়াড়গোবিন্দ হইলেও —সরলপ্রকৃতির ছেলে,—কুচক্রী নয়। হুঁ! বুঝাই যাইতেছে বটে! আসল চক্রী ওই তারিণী বাড়ুয্যে। মূর্খ গোঁয়াড় নিবারণকে সে তার হাতের অস্ত্রের মত ব্যবহার করিতেছে! হুঁ! অস্ত্রখানিও শক্ত ও ধারাল বটে! এটিকে ভাঙ্গিতেই হইবে। তারিণীবাড়ুয্যে ভীরু লোক, মনে মনে যতই বজ্জাতি থাক্, প্রকাশ্যে তাঁহাদের সঙ্গে বিবাদ করিতে তার সাহসে কুলাইবে না। আর নিবারণ ত হাত পা ভাঙ্গা হউক, তখন দেখ যাইবে তারিণীবাড়ুয্যেই বা কত বড়, পঞ্চায়েতী সে কয়দিন করে?

হরিঘোষাল কহিলেন, "তা হ'লে নালিশের দরখাস্ত একটা কালই দিয়ে দেও অম্বিক।"

অম্বিকা কহিলেন, "হুঁ—তাই ভাব্‌ছি। নালিশ একটা রুজুকরা—সেটা আর শক্ত কথা কি? আর কলেজে পড়া ছেলের দল নিয়ে এই দাঙ্গা ক'রেছে,—স্বদেশী দলবাঁধার একটা কথা তুলে দিতে পাল্লে মামলাও বেশ সঙ্গীন হ'য়ে উঠ্‌বে।"

হরিঘোষাল আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন,—"বটে! বাঃ—বাঃ! তবে আর কথা কি? তাই লাগিয়ে দেও না অম্বিক! হায়, হায়, কথাটা আমার মনে ওঠেনি তখন, তা হ'লে ত থানার পুলিশকে দিয়ে কালই ওকে ধ'রে চালান দেওয়াতে পার্‌তাম। হায় হায়, কি ভুলটাই হ'ল! আর কথা নেই অম্বিক, এইকর, এইকর! হতভাগার পাঁচবচ্ছর জেল হবে তবে। বাঁদর ছেলেগুলোও খুব জব্দ হবে।"

অম্বিকাঘোষাল ভাবিতে ভাবিতে কহিলেন; "এর মধ্যে কথা আছে ঢের। বাবু বোধ হয় রাজি হবেন না সহজে। ওর ভাই যাদব যে র'য়েছে,—সে ওকালতী করে, বাবুর খুব অনুগত। তাকে খুব ভালও বাসেন, আর তাকে দিয়ে কাজও অনেক করান। সে এসে যদি ধ'রে বসে, তবে

কি বাবু নিবারণের নামে এমন একটা নালিশ আন্‌তে রাজি হবেন ?”

হরিঘোষালের মুখ এতটুকু হইয়া গেল। তিনি কহিলেন, “তা আমিও ত তোর ভাই অম্বিক, তুইও ত তাঁর কাজ ক’চ্চিস্ কতবছর ধ’রে। যেদো আর কদিনের লোক ? তার খাতিরে তোর মুখের দিকে চাইবেন না ? আমার যদি অপমান আর ক্ষতি হ’ল, সেটা ত তোরও হ’ল।”

“তা হ’লেও একটা ফৌজদারী মামলা,—যাদব তো আর চুপ ক’রে থাকতেও পারে না। ভায়ে ভায়ে যদি তাদের বড় সরিকী বিবাদ একটা থাক্‌ত তবে কথা ছিল আলাদা। নিবারণকে প্রতিপালন করে সে, মা র’য়েছে মাথার ওপর,—না, যাদব চুপ ক’রে থাক্‌তেই পারে না। আর সে এসে ধ’রে পড়লে বাবুও এড়াতে পার্‌বেন না।”

হরিঘোষাল কিছু উষ্ণ হইয়া কহিলেন, “তা হ’লে কি বল, নালিশ টালিশ কিছু হবে না ? থানায় গেলাম, কিছু হ’ল না। এই সাত সমুদ্দুর তের নদী খেইয়ে এখানে এলাম। এখন আবার লেজ গুটিয়ে ঘরে ফিরে যাব ? ওই নিবে যে ধ’রে আমারে মুখে জুতো মার্‌বে। ছেলেগুলো রাস্তায় বেরোলে গায় ঢিল ছুড়বে।”

“তার উপায় একটা ক’ত্তে হবে বই কি ? তবে নালিশে—আরও আপত্তি আছে। গাঁয়ের ছেলেগুলো দলে ছিল—কে কে ছিল ব’ল্‌তে পার ? শিবু ছিল না ত ?”

আবার হরিঘোষালের মুখ চুন হইয়া গেল, “শিবু—হাঁ—তা ছিল বই কি—ছিল বই কি ? তা সাক্ষীদের ব’লে দিলেই হবে তার নাম না করে।”

“তোমার সাক্ষীরা না বলুক,—ঐ নিবে ব’ল্‌বে,—শিবু নিজে এসে ব’ল্‌বে। নাঃ! নালিশ করাটা—দাদা ছেড়ে দিতেই হ’ল। ছেলে ভাল—সম্বন্ধটাও প্রায় ঠিক হ’য়ে এল।”

হরিঘোষাল গম হইয়া বসিয়া রহিলেন। নিবারণের বিরুদ্ধে এমন একটা সঙ্গীন মামলা, তাকে জব্দ করিবার এমন উপায়,—আবার ওদিকে ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ, ভ্রাতার উপরে নানারকমে নির্ভরও তিনি অনেক করেন। রাগে ও ক্ষোভে তাঁহার নিজের গা নিজের কামড়াইয়া খাইতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। মনে মনে নিবুর তার চেয়েও বেশী বোধ হয় নূতন বি এ পাশকরা শিবুর মুণ্ডপাত তিনি করিতে লাগিলেন।

অম্বিকা কহিলেন, “তা হ’লে কি করা যায় বল। বাবুও রাজি হবেন না—ঐ যেদো এসে ধ’রে পড়বে। আবার নিজেদেরও এত বড় ক্ষতি—এটাও ত ভাবতে হয়।”

সহসা শিরে বড় জোরে কয়েকটি করাঘাত করিয়া হরিঘোষাল কহিলেন, “তবে কি বল—তবে কি বল—এই বিষ্ঠা মুখে করে আবার গাঁয়ে ফিরে যাব—আর নিবারণের জুতো খাব ? তার চেয়ে এইখেনে আমার আত্মঘাতী মরাও যে ভাল আত্মঘাতী হ’য়ে মরাও ভাল—আত্মঘাতী হ’য়ে মরাও যে ভাল।” হরিঘোষাল আরও জোরে শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন।

অম্বিকা ত্রস্তে দাদার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, “আঃ! কর কি, কর কি! একেবারে পাগল হ’লে নাকি ?”

“পাগল হ’য়েছি বই কি! তোরাই কর্‌লি—তোরাই কর্‌লি! মামলা না ক’ত্তে পারিস্—ব’ল কি ক’র্‌বি! কিছু যদি না ক’র্‌বি—ও হারামজাদাকে খুন ক’রে আমি ফাঁসি যাব! তবু এ অপমান স’য়ে গাঁয়ে মুখ দেখাব না!”

“থাম—থাম! এত অধীর কেন হ’চ্চ! মামলা হ’ল না ব’লে কি নিবারণকে অম্‌নি ছেড়ে দেব ?——”

“কি ক’র্‌বি—কি ক’রবি—তাই বল—শুনে প্রাণটা একটু ঠাণ্ডা হ’ক্।”

“এই ধরনা, বাবুকে সব ব’ল্‌ব। যাদবকে তিনি চাপ দেবেন—সে তা ঠেল্‌তে পারবে না। আর নিবেকে সে যে বড় ভালবাসে, তাও নয়। গাঁয়ের সব লোক ডেকে—এই তিন দফা অপরাধ যে সে ক’রেছে—সবার সাম্‌নে নাকে খত দিয়ে সে মাপ চাইবে। আর কখনও এমন ক’র্‌বে না, তারকের বউকে কোনও প্রশ্রয় দেবে না—নারায়ণ ছুঁয়ে দিব্যি ক’র্‌বে,—যদি না করে, যাদব তাকে তাড়িয়ে দেবে। বাড়ীথেকে তাড়াতে নেহাৎ না পারে, তাকে আলাদা ক’রে দেবে,—কোনও সম্পর্ক আর রাখবে না। মাগ ছেলে নিয়ে না খেয়ে ম’র্‌বে—তার বিষদাঁত ভাঙ্গ্‌বে। যদি আর কোনও বাঁদরামো যাদু করেন, তখন একটি মামলার ফ্যাসাদে ফেলে তাকে লম্বা শ্রীঘরে পাঠাতে—কি লাগবে ?”

হরিঘোষাল একটু ভাবিলেন,—ভাবিয়া কহিলেন, “হাঁ, তা যদি পারিস্—তা হ’লে এ দুঃখ আমার যাবে! পার্‌বি ত অম্বিক ?”

“এটা আর বেশী কি ? আমাদের মান রাখ্‌তে এ

অনুরোধ বাবু এড়াতে পারবেন না। যাদবের পশার ত বাবুর হাতে। ফৌজদারী থেকে তার ভাইকে বাঁচালেন, এটা ত এখন ন্যায্য সামাজিক শাস্তি তার—যাদবের সাধ্য কি বাবুর কথা ঠেলে? চল, আজ রেতেই বাবুর কাছে যাই। সব তাঁকে বলি গিয়ে।"

দুই ভাই উড়ুনী জুতা পড়িয়া অবিলম্বে বাহির হইলেন।

(ক্রমশঃ)

বিবিধপ্রসঙ্গ।

আশা ও আশঙ্কা।

আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ফ্রান্সে যুদ্ধের অবস্থা সঙ্গীন,—ভারতের অভিমুখে তুর্কী জর্ম্মাণের পথ সমান মুক্ত এখনও রহিয়াছে। আবার সাইবেরিয়ায় জর্ম্মাণ-সহায় রুষেও জাপানে একটা সংঘর্ষের সূচনাও দেখা যাইতেছে। চীন এখন জাপানের মিত্র। সে সংঘর্ষ যদি উপস্থিত হয়, তবে তাহা সাইবেরিয়ার মধ্যদিয়া ইয়োরোপীয় রুষরাজ্য পর্য্যন্ত গিয়া পৌছাও অসম্ভব নয়। পীতাঙ্গচীন জাপান যদি এত দূর অগ্রসর হয়, খাস ইয়োরোপের গায় যদি গিয়া হাত দেয়, তাহা শ্বেতাঙ্গ ইয়োরোপের সহিবে কি? রুসিয়ার আভ্যন্তরিক ব্যাপারে জাপানের কোনওরূপ হস্তক্ষেপ যে কতদূর গুরুতর কথা,—দুই একজন সূক্ষ্মদর্শী ইংরেজ লেখকও ইতিমধ্যে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

ওদিকে আবার আমেরিকায় জাপানে রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ যে পরস্পরের বিশেষ অনুকূল নহে, এরূপ একটা কথাও অনেকদিন অবধি শুনা যাইতেছে। আমেরিকা জর্ম্মাণীর বিজীগিষার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত হইয়াছে,—বহু মার্কিণসেনাও ফ্রান্সে আসিতেছে। মার্কিণ প্রেসিডেন্ট উইল্‌সনের উদ্দেশ্য বলগর্ব্বিত দারুণ বিজীগিষু জর্ম্মাণকে দমন করিয়া জগতের ছোটবড় সকল জাতির স্বাধীনতা রক্ষায় মার্কিণশক্তি নিয়োগ করিবেন। এখন এই মহৎ লক্ষ্যসাধনে কার্য্যকরী সহায়তা যদি কোনও জাতি করিতে পারে, তবে সে মার্কিণ জাতি। মার্কিণ ব্যতীত আর সকল জাতিই বিষম রাজ্যলোলুপ, ইয়োরোপের বাহিরে দুর্ব্বলতর যত দেশ আছে, সব প্রভুত্বের অধীনে আনিয়া তার ধনসম্পদ, জনসম্পদ—যা কিছু সব নিজেদের ব্যবসায় বাণিজ্যের জালে বাঁধিয়া ফেলিতে অতি ব্যগ্র। ইহা লইয়া প্রতিযোগিতাই যে এই মহাযুদ্ধের মূলে রহিয়াছে, তাহাও বেশ বুঝা যায়।

আজ মার্কিনের সহায়তা অতিপ্রবল জর্ম্মাণীর বিরুদ্ধে অন্য সকলের পক্ষে যতই প্রয়োজন বলিয়া মনে হউক,—ইহাদের এই পুরুষ পরম্পরাগত—স্বভাবেরই মত অভ্যস্ত—একেবারে অস্থিমজ্জানিহিত—এই রাজ্যলোলুপতা এই ব্যবসায়িক সর্ব্ব গ্রাসিতা কি একা মার্কিণই দমন করিয়া এই পৃথিবীতে চিরশান্তির এক নবযুগ আনিতে পারিবেন? এই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া একটা সার্ব্বজনীন সন্ধি কি সহজে সম্ভব হইবে? তবে মার্কিণের সহায়তা ব্যতীত এখন আর উপায় নাই,—মার্কিণের শক্তিও বড় কম নহে। তার দাবী উপেক্ষা করা সহজ নাও হইতে পারে।

আমরাও আশা পাইয়াছিলাম,—আশা করিয়াছিলাম বৃটিশশক্তিই এই আশা আমাদিগকে দিয়াছিলেন। উপনিবেশ সমূহের স্বায়ত্তশাসন বৃটিশশক্তি বহুদিন হইল স্বীকার করিয়াছে। তাহাতে তাঁহার রাষ্ট্রীয়শক্তিও অনেক বাড়িয়াছে। বৃহৎ ভারতসাম্রাজ্য এখনও তাঁহাদের অধীন শাসিত অবস্থায় আছে। ভারতের জাগ্রত ও শক্তিমান্ জনবল ব্যতীত এসিয়ায় বৃটিশ প্রভুত্ব রক্ষা করা দুষ্কর—নিজ ভারতরক্ষাও দুঃসাধ্য হইতে পারে, দূরদর্শী বৃটিশ সচীবগণ ইহা উপলব্ধি করিয়া, ভারতের শাসন সংস্কার করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন—তাঁহাদের ঘোষণা হইতে আমরা এইরূপ বুঝিয়াছিলাম। ভারতসচীব ভারতে আসিলেন,—অনেক তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেন। তারপর শুনিলাম, এই শাসনসংস্কার কিরূপ প্রণালীতে হইবে, তাহার রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া তিনি স্বদেশে গিয়াছেন,—গিয়াই মন্ত্রীসভায় তাহা পেশ করিবেন মন্ত্রিসভাও অবিলম্বে তাহার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবেন

হোমরুলদলীগের প্রতিনিধিগণ এই সময় ভারতের দাবীর কথা বৃটিশ জাতিকে জানাইবার জন্য বিলাত যাত্রা করিলেন। বড়লাটের অনুমোদন তাঁহারা পাইয়াছিলেন,—কিন্তু বিলাতের মন্ত্রীসভা তাঁহাদের যাত্রা না-মঞ্জুর করিলেন।

তারপরেই বৃটিশ সচীবের বার্ত্তা আসিল, মধ্য এসিয়ায় বিপদ ঘটিতে পারে, ভারতের অভিমুখে শত্রুর অভিযান হইতে পারে, সুতরাং ভারতবাসী সচেষ্ট হউন, ধনজন দিয়া এসিয়ার শান্তিরক্ষা করিতে প্রস্তুত হউন। দিল্লীতে মজলিস্ হইল। অনেকেই আশা করিয়াছিলেন, তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যে ভারতীয় প্রজার ভবিষ্যৎ স্থান কি হইবে, তার সম্বন্ধে একটা কিছু ঘোষণা—বড় কোনও আশার কথা শুনা যাইবে। কারণ, ভারতের শক্তি কতদূর এই যুদ্ধে সার্থকভাবে নিয়োজিত হইতে পারে, তার সঙ্গে ইহার বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, এরূপ আমারা বিশ্বাস করি, অনেকেই করেন। কারণ, মনুষ্যত্বের উচ্চ অধিকার লাভের আশাব্যতীত এরূপ ত্যাগ—ত্যাগে কোনওরূপ অদম্য উৎসাহ কোনও জাতির হইতে পারে না। জড়বৎ তেজোহীন আশাহীন, উৎসাহ-উদ্যমবিহীন লোকের হাতে অস্ত্রদিলেও সে তা চালাইতে পারে না।

কিন্তু সে সব আশার কথা কিছুই বাহির হইল না। বড়লাট বাহাদুর বলিলেন, বারগেনের (bargain এর) কথা এখন কিছু হইবে না। মণ্টেগুসাহেব কাগজ পত্র লইয়া বিলাত গিয়াছেন, সেখানে গিয়া তিনি শাসন সংস্কারের প্রস্তাব পেশ করিবেন। এখন তোমরা সাম্রাজ্য রক্ষার সহায়তা কর। তবু তিনি এই পর্য্যন্ত বলিলেন, সিপাহীর বেতন বাড়িবে, ভারতবাসীকে কমিশনী নায়কের পদ substantial (প্রচুর) মাত্রায় দেওয়া হইবে। তাও দুইমাস হইয়া গেল, আর সাড়াশব্দ কিছু নাই!

ওদিকে ভারতসচীবও শাসন-সংস্কারের সম্বন্ধে এতদিন নীরব ছিলেন। কিছুদিন হইল, পার্লামেণ্টে কোনও সভ্যের প্রশ্নের উত্তরে শেষে মণ্টেগুসাহেব বলেন, রিপোর্ট মন্ত্রীসভায় পেশ করা হইয়াছে,—কিন্তু ফ্রান্সের যুদ্ধের বর্ত্তমান্ সঙ্গীন অবস্থায় তৎসম্বন্ধে কোনও আলোচনা করিবার অবসর মন্ত্রীসভার এখন নাই। ইহার পর অবসর যখন হইবে—তখন তাঁহারা দেখিয়া শুনিয়া যদি অনুমোদন করেন, তবে এ সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে আইনের বিল উপস্থিত করা হইবে।

ঐ 'যদি' কথাটায় বড় ভয় হইয়াছিল। কেবল যে কবে হইবে, তার স্থিরতা নাই, তা নয়,—আবার উহার মধ্যে 'যদি'ও একটা আছে। সেই সময় আরও সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, আগামী শরৎকালের আগে এ প্রস্তাব পার্লামেণ্ট উঠিবে না। ইতিমধ্যে নূতন নির্ব্বাচনে নূতন পার্লামেণ্টে হইবে। তখন যদি এই মন্ত্রীসভার প্রাধান্য থাকে, আর মণ্টেগুসাহেব ভারতসচীব থাকেন, তবেই এই প্রস্তাব উঠিতে পারে, নতুবা কি হয় বলা যায় না। তবে শেষের সংবাদটা সরকারী পক্ষের কথা নহে, সংবাদদাতার অনুমান। যাহা হউক, এই সব সংবাদ যখন আসিল, ষ্টেট্‌স্‌ম্যান প্রভৃতি পত্রিকায় একটু আনন্দের সাড়া উঠিয়াছিল,—টুট্‌কী বিদ্রূপও কিছু কিছু তাঁহারা করিয়াছিলেন।

সে এই কদিনেরই বা কথা? ইহার পরেই আবার ভারতগবর্ণমেণ্টের 'কমিনুকে' বাহির হইয়াছে, বিলাতের মন্ত্রীসভায় যদিও আপাততঃ অবসর নাই,—মণ্টেগু সাহেবের রিপোর্ট প্রচুর পরিমাণে ছাপা হইলেই তাহা পার্লামেণ্টে দেওয়া হইবে এবং সাধারণে প্রকাশিত হইবে,—সকলে তাহার আলোচনার সুযোগ পাইবেন। তারপর সকলের মতামত শুনিয়া মন্ত্রীসভা তার বিচার করিবেন, প্রয়োজন মত তার সংশোধন করিয়া নিবেন।

মন্ত্রীসভার বিচার সংশোধন ও অনুমোদন ব্যতীত এই রিপোর্ট বাহির হইবে—এরূপ কেহ প্রত্যাশা করেন নাই। সকলে কিছু বিস্মিতও হইয়াছেন, ওদিকে এঙ্গলোইণ্ডিয়ান পত্রিকা সমূহেও উল্টা সুর উঠিয়াছে,—তাঁহারা যেন এই ব্যাপারটা পছন্দ করিতেছেন না বলিয়াই মনে হয়।

তারপর আবার বিলাতের টেলিগ্রামও আসিয়াছে এই জুন মাসের মধ্যেই শাসনসংস্কারসংক্রান্ত রিপোর্ট বাহির হইবে।—বিলাতে ও ভারতে এক সময়েই তাহা পাওয়া যাইবে।

কিন্তু সিপাহীর বেতন বৃদ্ধি ভারতবাসী সৈনিকের কমিশনী নায়কের পদলাভ—এ সব সম্বন্ধে কোনও কথা এখনও শোনা যাইতেছে না।

ওদিকে সম্প্রতি আবার বাজার গুজব উঠিয়াছে—শীঘ্রই নাকি সন্ধি হইবে। সত্যই আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, হাওয়া কখন যে কোন দিকে বহিতেছে—তাহা বুঝিয়া উঠাও দুষ্কর। কে জানে, কি হইবে ভারতের ভাগ্যে কি আছে? তবে সন্ধি যদি হয়,

ভীম এই সংহারলীলার অবসান হইয়া ধরিত্রীদেবীর প্রসন্ন-মুখে শান্তির নির্ম্মলহাসি যদি আবার ফুটিয়া উঠে, সকলেই তাহাতে আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই,—তবে এই শান্তির ভিত্তি সুদৃঢ় হয় অটল হয়—ইহা সকলেই কামনা করিবেন।

অন্তরীণের কথা।

অন্তরীণের কথাই আজকাল বাঙ্গলায় সবচেয়ে বড় অশান্তির কথা হইয়াছে। প্রত্যহই প্রায় সংবাদপত্রে আবদ্ধ ব্যক্তিগণের নানারকম দুর্গতির কথা শোনা যায়। চরলরেন্স ও কুতুবদিয়ার আবদ্ধ যুবকগণ আইনের বাধা ভাঙ্গিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। চরলরেন্সের অন্তরীণ আসামীদের বিচার হইয়া গিয়াছে, বিচারে তাঁহাদের জেল হইয়াছে। কুতুবদিয়ার আসামীদের বিচার হইতেছে। আবার আলিপুরের জেলের বন্দীগণ (১৮১৮ সনের ৩ আইনে বন্দী state prisoners) কিছুদিন পূর্ব্বে অনশন পণ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি আবার হাজারীবাগেও বন্দীদের মধ্যে এই অনশন পণের কথা শুনা যাইতেছে।

এই সব ঘটনাকে একরূপ passive resistance (মহাত্মা গান্ধীর কথায় 'সত্যাগ্রহী') বলা যায়। দুর্গতি যখন সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করে, অথচ প্রতিকার হয় না,—কোনও ন্যায্য অধিকার দুর্ব্বল চায়, কিন্তু কিছুতেই যখন পায় না,—তখনই দুর্ব্বল ও পীড়িত অনন্যগতি হইয়া এইরূপ passive resistance এর উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। নানাস্থানে এরূপ ঘটনা ঘটিতেছে,—অথচ ইঁহাদের মধ্যে কোনও যোগাযোগ নাই। সুতরাং বুঝিতে হইবে, ইঁহারা সত্যই আর দুর্গতি সহিতে পারিতেছেন না।

তা ছাড়া, নানারূপ অভিযোগের কথা প্রকাশিত হইতেছে, তাহা যে অসার ও অমূলক—তাহা কোনও প্রমাণ দ্বারা কর্ত্তৃপক্ষ দেশের লোককে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন না। বন্দী বা অন্তরীণদের আত্মীয়বান্ধবগণ কঠোর দুর্গতির সংবাদ পাইয়া কোনও অনুসন্ধান করিলে তাহারও ভাল উত্তর কিছু সময় মত পাওয়া যায় না,—দেখা করিতে চাহিলেও অনেক ঘুরাঘুরি করিতে হয়। কেহ কেহ উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইয়াছেন,—কেহ কঠিন রোগে মারাও গিয়াছেন। অনেকে অতি অস্বাস্থ্যকর স্থানে আটক আছেন। রোগে ভুগিতেছেন।

এই সব কারণে সকলেই বাস্তবিকই মনে করিতেছেন, রাজদণ্ডভোগীর ন্যায়ই ইঁহাদের নানারকম দুর্গতি ও লাঞ্ছনা হইতেছে। প্রার্থনা করিয়াও প্রতিকার কিছু কে[ই] পাইতেছেন না।

বড় কোনও যুদ্ধে কোনও রাজসরকার যখন বিব্র[ত] হইয়া পড়েন,—দেশের মধ্যে প্রজা কেহ বিদ্রোহের চেষ্টা ন[া] করে, শত্রুকে সাহায্য কিছু না করে,—এজন্য তাঁহাদে[র] সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। কেহ এরূপ চেষ্টা করিতেছে এরূপ সন্দেহ হইলে, তাহার প্রতিকারেও উপায় নিতে হয়। এমন অনেক কথা প্রকাশ্য আদালতে হয়ত উপস্থি[ত] করা এ অবস্থায় সমীচীন হয় না। এখনকার আইনকানু[ন] বিচারপ্রণালীও যেরূপ তাহাতে এ সব অপরাধ নিঃসন্দেহভা[বে] কাহারও বিরুদ্ধে প্রমাণকরাও কঠিন হইতে পারে।

সুতরাং এইরূপ কোন সঙ্কটকালে এইরূপ সন্দে[হ] যাঁহাদের উপরে হয়, স্বেচ্ছামত বিচরণ করিয়া কোন[ও] অনিষ্টচেষ্টা তাঁহারা না করিতে পারেন, এরূপভা[বে] তাঁহাদের রাখা প্রয়োজন হইতে পারে। সকলে হয়[ত] অপরাধী নাও হইতে পারেন,—কেহ শত্রুতা করি[য়া] অথবা নিজের কোনও স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যেও তাঁহাদে[র] নামে মিথ্যা অপবাদ সরকারে জানাইতে পারে। সামা[ন্য] ব্যাপারও এ অবস্থায় সন্দেহজনক বলিয়া মনে হইতে পারে। যাহাই হউক,—এরূপ সঙ্কটকালে ভাল বুঝিতে না পারিয়া সন্দেহে নিরপরাধকেও নজরবন্দী করি[য়া] রাখিলে গবর্ণমেণ্টের এমন বড় একটা দোষ হয় না। কি[ন্তু] দেখিতে হইবে, সে কোনও দুঃখ ক্লেশ না পায়। তাহা[র] পরিবার তাহার স্বাধীনতাচ্যুতির জন্য কোনরূপ অভাবগ্র[স্ত] না হয়। পরিবার যদি অভাবে না পড়ে, নিজেও যা[র] যেমন অভ্যাস—আরামবিরামে সচ্ছন্দে যদি থাকিতে পারেন[,] স্থান স্বাস্থ্যকর যদি হয়, পীড়ায় যথোচিত চিকিৎসা[য়] কোনও অসুবিধা যদি না হয়,—তবে গ্লানিকর কিছু হইলে[ও] এরূপ নজরবন্দী অবস্থায় থাকা বিশেষ ক্লেশকর কাহার[ও] পক্ষে হয় না।

কিন্তু বাঙ্গলায় এখন অন্তরীণ ও বন্দীদিগের এ দারু[ণ] দুর্গতি কেন? যে সব সংবাদ প্রকাশ হইতেছে অথচ যথ[াযথ] প্রতিবাদ কিছুই হইতেছে না—তাহাতে মনে হয় যেন দণ্ডি[ত] অপরাধীর মতই কঠোর শাস্তি তাঁহারা পাইতেছেন।

যাঁহাদের অপরাধ আইনে আদালতের বিচারে সপ্রম[াণ] হয় নাই, বিচারক বিচার করিয়া কোনও রাজদণ্ডে যাহা[দের]

দণ্ডিত করেন নাই, যাঁহারা আদবে মোটে অপরাধীই নন, কেবল দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজপুরুষগণের সন্দেহের পাত্র মাত্র হইয়াছেন, দণ্ডিত ঘোর অপরাধীর মতই তাঁহাদের নানারূপ দুর্গতি ও লাঞ্ছনার কথা যখন শোনা যায়,—তখন দেশে সাধারণের মধ্যে এই দারুণ অসন্তোষ কেন না জন্মিবে ?

এত বেশী লোক এই ভাবে আবদ্ধ আছেন, যে মনে হয় অনেকেই একেবারে নিরপরাধ, সামান্য কারণে সন্দেহে তাঁহারা ধৃত হইয়াছেন। বাঙ্গলায় কি এত বড়ই একটা বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র হইয়াছিল ? 'সি আই ডি'র উপরে এত নির্ভর না করিয়া নিরপেক্ষভাবে ভাল অনুসন্ধান যদি কর্ত্তৃপক্ষ করেন, তবে আশাকরা যায়, অনেককেই গবর্ণমেন্ট মুক্তি দিতে পারিবেন। যাঁহাদের বিরুদ্ধে সন্দেহের কারণ প্রবল বলিয়া তাঁহাদের মনে হয়, তাঁহাদেরও এমন কঠোরভাবে আটক রাখিবার প্রয়োজন বলিয়া মনে করি না। যাঁর যাঁর বাড়ীতে অথবা কোনও ভাল স্বাস্থ্যকর স্থানে মোটামুটি নজরবন্দী অবস্থায় তাহাদের রাখিলেই চলিতে পারে। আর তাঁহারা নিজেরা ও তাঁহাদের পরিবারবর্গ সুখসচ্ছন্দতায় থাকিতে পারেন, সে বিষয়ে কোনও ত্রুটি হওয়া উচিত নয়। ইহা ন্যায় ধর্ম্মের বিরোধী—ন্যায়ধর্ম্মানুমত আইনেরও বিরোধী।

ডারবানের ট্রাম ও ভারতবাসী।

দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্গত ডারবানে ভারতবাসীর উপর আবার নানাপ্রকার অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি ট্রামে ভারতবাসীর সহিত অন্যান্য জাতিসমূহের যে বিভিন্নতা দেখান হয় সেই সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন (Indian Opinion) নামক সংবাদপত্র এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে ভারতবাসীদিগকে ট্রামে চড়িতে দেওয়া হয় না। ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে ভারতবাসী বর্ত্তমান এই যুদ্ধে যে কাজ করিয়াছে সে কথা ছাড়িয়া দিলেও বৃটিশসহরে বৃটিশ-প্রজা ট্রামগাড়ীতে স্থান পায় না কেন ? দক্ষিণ আফ্রিকা মরিসস্ বা সেণ্টহেলেনাবাসীরা নির্ব্বিবাদে সে ট্রামে ভ্রমণ করিতে পারে, কেবলমাত্র ভারতবাসী সম্বন্ধে এই নিয়ম করা হইল কেন ?

এই প্রবন্ধের উপর ভিত্তি করিয়া ডারবানের Indian Rate payers' association এর Joint-Secretaryগণ Town clerkএর নিকট একখানি পত্র পাঠাইয়াছেন তাহাতে তাঁহারা এই ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

হায়, এখনও বৃটিশসাম্রাজ্যে ভারতবাসীর এই লাঞ্ছনা। যে সাম্রাজ্যে তার স্থান—তার জন্যই সে অকাতরে অর্থ-দান করিতেছে শোণিত পাত করিতেছে! ভারতবাসী না হয়—তার কর্ত্তব্য করিতেছে। কিন্তু তার প্রতি কি আর কারও কোনও কর্ত্তব্য নাই ? ইহার প্রতিকার কি সত্যই অসম্ভব ?

বস্ত্র সমস্যা।

মডার্ণরিভিউ পত্রিকাতে কাপড়ের দুর্ম্মূল্যতা সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। মালঞ্চের পাঠকপাঠিকার জন্য আমরা নিয়ে তাহার মর্ম্মানুবাদ দিতেছি।

কাপড়ের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি হওয়ায় দেশে অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। বর্ষার পর এই কষ্ট আরও বাড়িবে ও শীতের পর ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইবে। কাপড়ের এই অভাবকে দুর্ভিক্ষও বলা যাইতে পারে। এই কষ্ট কাপড়ের অভাবের জন্য কতটা হইয়াছে, কতটা বা ব্যবসায়ীর অর্থলোভে হইয়াছে অবিলম্বে এ বিষয়ে গবর্ণমেন্টের অনু-সন্ধান করা উচিত। অর্থলোভে কাপড়ের দাম যতটা বাড়িয়াছে সেটা এখনই বন্ধ হওয়া উচিত। দেশে তুলা প্রচুর পরিমাণে জন্মাইবার জন্য গবর্ণমেন্টের দেশ-বাসীকে উৎসাহিত করা বিধেয়। লোকে যাহাতে তাহা-দের ইচ্ছামত ব্যবসায়ে টাকা লাগাইতে পারে সে পক্ষে কোন বাধা থাকা আর উচিত নয়। মূলধন যোগাড় করা, নূতন কলকব্জা সংগ্রহ করা আজকাল বড় কঠিন সমস্যা এবং এই কারণে নূতন কাপড়ের কল এদেশে স্থাপন করা আপাততঃ অসম্ভব। অতএব দেশে যাহাতে আবার তাঁতের সৃষ্টি হয়, তাঁতিরা যাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় তাঁতের ব্যবহার করে—এবিষয়ে সকলের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে আমাদের বিশেষ কিছু সাহায্য করিতে পারিবে না। সরকারী অথবা বেসরকারী সব ইংরাজেরই কাপড়ের দাম বাড়াইয়া ল্যাঙ্কেসায়েরের সুবিধা করা ইচ্ছা ; এ বিষয়ে দেশবাসীরই সকল চেষ্টা করিতে হইবে। যতদিন এ যুদ্ধ আছে ও যতদিন কাপড়ের দাম এইভাবে থাকিবে ততদিন তাঁতের কাপড় মিলের কাপড়ের সহিত চলিতে পারে, কিন্তু যুদ্ধের পর আর তাহা চলিবে

না। তখন উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁত উঠিয়া যাইবে, কাপড়ের কল দেশে মাথা তুলিবে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আরও অনেক মতামত আছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় অনেকে দেশী জিনিষের দাম বেশী বলিয়া কিনিতে চান নাই। কিন্তু আজকাল যে দামে তাঁহারা কাপড় কিনিতেছেন দেশী কাপড়ের দাম কোন দিনও সেরূপ ছিল না। তখন যদি তাহারা বেশী দামের ধুয়া না ধরিয়া একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া সেই কাপড় কিনিতেন তবে দেশে তাঁত টিঁকিয়া যাইত তাহা হইলে আজ আমাদের এত কষ্ট পাইতে হইত না। দেশের তাঁতিরাই আমাদের প্রচুর পরিমাণে কাপড় দিতে পারিত। আশাকরি ভবিষ্যতে আমাদের আর এ ভুল হইবে না।

সাধারণতঃ আমাদের দেশের অনেক লোক, একপ্রকার উলঙ্গভাবেই থকে কেবলমাত্র স্ত্রীলোকগণই ভাল করিয়া অঙ্গ ঢাকিতে পারে, কিন্তু আজকাল তাহাও কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। হাটবাজার লুটের কথা আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই। কাপড়ের অভাবে লোক আত্মহত্যা করিয়াছে এ সংবাদও বিরল নহে। এই সমস্ত ব্যাপার হইতে দেশের যে কি অবস্থা হইয়াছে তাহা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি। 'দর্শকে' এই আত্মহারা সম্বন্ধে একটি অতি হৃদয় বিদারক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। জয়নগর গ্রামে একটি মুসলমান স্ত্রীলোক রান্না করিতেছিলেন; এমন সময় তাহার জামাই সেখানে উপস্থিত হন। বস্ত্রের অভাবে তিনি জামাইর সম্মুখ হইতে তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতেছিলেন তখন তাঁহার শতছিন্ন কাপড়খানিও তাঁহার শরীর হইতে পড়িয়া যায়। ইহাতে জামাই অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া তাঁহার জন্য কাপড় কিনিতে তখনই বাজারে চলিয়া যান, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া দেখেন তাঁহার শ্বাশুড়ী গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। কাপড়ের অভাবই কি এই শোচনীয় মৃত্যুর কারণ না?——

নায়কে প্রকাশিত হইয়াছে যে একদিন দুইজন স্ত্রীলোক সিরাজগঞ্জের অন্তর্গত জমাইগ্রামে যাইতেছিলেন তখন একটি লোক তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের কাপড় দুখানি লইয়া যায়। স্ত্রীলোক দুইটি লজ্জায় একটি ঝোপের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। একটি ভদ্রলোক সেই সময় ঘোড়ায় চড়িয়া সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি স্ত্রীলোক দুটিকে দেখিতে পান এবং অনুসন্ধানে সমস্ত ব্যাপার জানিয়া তখনই ঘোড়া হইতে নামিয়া একখানি চাদর পড়িয়া নিজের কাপড়খানি দুইভাগ করিয়া স্ত্রীলোক দুটিকে দিয়া তাঁহাদের লজ্জা নিবারণ করেন।

খুলনাবাসীতে প্রকাশ যে একদিন দুইটি জেলেনী বেলা ৪টার সময় জেলাবোর্ডের রাস্তা দিয়া মাছ বিক্রী করিবার জন্য ধবলিয়াগড় হাটে যাইতেছিল। এমন সময় একটি লোক সেস্থানে উপস্থিত হইয়া জোর করিয়া তাহাদের কাপড় দুখানি লইয়া চলিয়া যায়। স্ত্রীলোক দুইটি মাছের ঝাঁকা ফেলিয়া রাস্তার পাশে একটা ঝোপের মধ্যে আশ্রয় লয়। কতক্ষণ পরে একটি লোক সেই পথে যাইতে যাইতে ঝাঁকা দুটি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিলেন যে ইহার মালিক কোথায় গেল, এমন সময় একটি স্ত্রীলোক চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া তাহাকে তাহাদের অবস্থা জানিয়া লোকটি তৎক্ষণাৎ নিজের চাদরখানা দু'ভাগ করিয়া তাহাদিগকে দিয়া তাহাদের লজ্জানিবারণ করিল।

বসুমতীতে প্রকাশ, গত ২রা চৈত্র অতি প্রত্যুষে ১৮ বৎসরের একটি মুসলমান যুবতী ভাঙ্গাতে (ফরিদপুর) একটি কাপড়ের দোকানে উপস্থিত হয়। তাহার পরিধানে শতছিন্ন একখানি কাপড়। দোকান খুলিলে স্ত্রীলোকটি দোকানের ভিতরে যাইয়া একখানি সাড়ি চাহিল। দোকানী জিজ্ঞাসা করিল, "টাকা কোথায়?" স্ত্রীলোকটি বলিল, "আমার টাকা নাই।" দোকানী তখন বলিল, "আমি তবে তোমাকে কাপড় কিরূপে দিব?" তাহার উত্তরে স্ত্রীলোকটি বলিল, "আমি টাকা কোথায় পাইব? আমাকে এই ছিন্ন কাপড়খানি দিয়া আজ ভোরে আমার স্বামী কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। এই কথা বলিতে বলিতে একখানি ছুরী বাহির করিয়া সে বলিল, "একখানা কাপড় না দিলে আমি এখনই আত্মহত্যা করিব।" দোকানী অনন্যোপায় হইয়া তাহাকে একখানি কাপড় দিল।

বঙ্গবাসীতে প্রকাশ খুলনা—শ্রীপুরের একটি ভদ্রমহিলা একদিন জল আনিতে গিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় পথে একটি লোক তাঁহাকে উলঙ্গ করিয়া তাঁহার কাপড়খানি লইয়া পলায়ন করে।

কাপড়ের অভাবে দেশে যে কি কষ্টের সৃষ্টি হইয়াছে উল্লিখিত কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতে তাহা বেশ স্পষ্ট বুঝা

যাইবে। দেশের এই কষ্ট দূর করিবার জন্য প্রত্যেকের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। আমাদের দেশের শিক্ষিত মহিলাগণ প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে দেশের কোন কাজ করিবার তাঁহাদের কোন সুযোগ হয়না। এইবার মহাসুযোগ আসিয়াছে। আশাকরি অন্যান্য লোকের সহিত তাঁহারাও দেশের এই দুর্দ্দশামোচনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন ?

বন্দী জার।

রুশিয়ার বিদ্রোহ হইবার ও সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইবার পর রুষসম্রাট জার স্ত্রী পুত্র কন্যাদিগকে লইয়া সাইবেরিয়ার অন্তর্গত টোবলস্ক সহরে বন্দী আছেন, এ কথা সকলেই অবগত আছেন। যে জার পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত সম্রাটগণ অপেক্ষা ধনী ও প্রতাপশালী ছিলেন, এখন তিনি কি অবস্থায় আছেন শুনিলে সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। টোবলস্কে ভয়ানক শীত পড়ে। জার তাঁহার পরিবার লইয়া যে কাঠের বাড়ীতে আছেন সেখানে যেন শীতের প্রকোপ আরও বেশী। একদিন এত শীত পড়িয়াছিল যে জারের তাঁহার পরিবার লইয়া একটু গরম হইবার জন্য চাকরদের ঘরে আশ্রয় নিতে হইয়াছিল। রাত্রের অন্ধকারে জার সামান্য কেরোসিনের আলো ব্যবহার করেন ও নিকটবর্ত্তী কূপ হইতে জল আনিয়া তাঁহাদিগকে জলের ব্যবহার করিতে হয়। সাধারণ স্নানাগারে যাইয়া তাঁহাদের স্নান করিতে হয়। তাঁহাদের স্নানের সময় অবশ্য অন্য কাহাকেও সেস্থানে যাইতে দেওয়া হয় না। রাজকন্যাদের পোষাকের সংখ্যাও খুব কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ছিন্ন অতি পুরাতন পোষাক পরিয়া তাহারা রাস্তায় বাহির হন ও কোন গহনা পরিতে পারেন না। তাঁহাদের চিঠি পত্র বেশ ভাল করিয়া দেখিয়া পরীক্ষা না করিয়া কোথাও পাঠান হয় না। জার নিকোলাস দিন দিন অতি গম্ভীর ও বিমর্ষ হইয়া যাইতেছেন এবং পুত্র এলেক্সিস প্রায়ই রোগে শয্যাশায়ী অবস্থায় আছেন। হায়, একবৎসর পূর্ব্বে কে ভাবিয়াছিল, রুষ রাজবংশের আজ এদশা হইবে ? কে জানে, রাজবংশের কোন্ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজ ইহারা করিতেছেন।

পৃথিবীর উচ্চতম বাসগৃহ।

আমেরিকার রাজধানী নিউইয়র্কে যেরূপ উচ্চ বাড়ী আছে, পৃথিবীর অন্য কোথাও সেরূপ বাড়ী আর নাই। আমাদের কলিকাতা সহরে ৫।৬ তালা বাড়ী দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইয়া যাই, কিন্তু আমেরিকায় ৫।৬ তলাত দূরের কথা ২৫।৩০ তালা বাড়ী সর্ব্বদা চোখে পড়ে। সম্প্রতি নিউইয়র্কে 'উলওয়ার্থ বিল্ডিং' (Wollworth Building) ৬০ তালার একটি বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাই আজকাল আমেরিকার (কাজে কাজেই পৃথিবীর) সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ বাড়ী। আমেরিকার অন্য দুইটী অত্যুচ্চ বাড়ীর তুলনায় উলওয়ার্থ বিল্ডিংএর উচ্চতা প্রভৃতির পরিমাণ দেওয়া গেল।

	উলওয়ার্থ বিল্ডিং	সিঙ্গার সেলাই কলের বাড়ী	মেট্রোপলিটান টাওয়ার
উচ্চতা	৭৯০ ফিট	৬১২ ফিট	৭০০ ফিট
কয়তালা	৬০	৪৬	৫০
ওজন	২০৬,০০০০০০ পাঃ	১৬৫১৬০০০০ পাঃ	১৭০০০০০০০
বৈদ্যুতিক আলোর সংখ্যা	৮০০০০	১৪৫০০	৩০০০০

এই বাড়ী তৈয়ারী করিতে ৬৪৮০০০ মন ইস্পাত লাগিয়াছে। ইহার দেওয়াল তৈয়ারী করিতে ১৭০০০০০০ ইট ব্যবহৃত হইয়াছে। এই বাড়ীতে তিনহাজার জানালা আছে ও দশহাজার লোক বাস করিতে পারিবে। আগুনের ভয় হইতে ইহা সম্পূর্ণ মুক্ত। কারণ ইহাতে কাঠ মোটেই ব্যবহার করা হয় নাই। দরজা জানালা সকলই ইস্পাত, কাচ, লোহার তার দ্বারা প্রস্তুত। নিউইয়র্কের প্রায় সবগুলি রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে ৫ মিনিটের মধ্যেই এই বাড়ীতে আসা যাইবে এবং কোন কোন স্থলে এই বাড়ীতে লোক থামিতে পারিবে।

ভারতের শাসন-সংস্কার।

(৪ঠা আষাঢ়ের নায়ক হইতে উদ্ধৃত)

পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বাভাস।

গত কল্যকার "ইংলিশম্যানে" জনৈক সংবাদদাতার লিখিত এক সংবাদ বাহির হইয়াছে। এই সংবাদের মূল্য কতটুকু, তাহা এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে রহিয়াছে। যাহা হউক, আমরা নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।—

"ভারতের শাসন-সংস্কার কিরূপ হইবে তাহার আভাস নাকি মিঃ মণ্টেগু ভারতবর্ষ হইতে যাইবার পূর্ব্বে কয়েকজন নরমপন্থী নেতার নিকট দিয়াছিলেন। সেই আভাস সম্বন্ধে গুজব অনেক রকম শুনিতে পাওয়া যাইতেছে।

যাহা হউক, কয়েক সপ্তাহ মধ্যেই যখন শাসন-সংস্কারের কথা জানিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তখন সেই আভাসের কথা, সেই গুজবের কথা বলাতে কোন দোষ হইবে না। ভারতের শাসন-সংস্কারে নাকি (১) ভারত গবরমেণ্টের উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে না। (২) প্রাদেশিক গবরমেণ্টের আমূল পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব হইয়াছে। (৩) কাউন্সিল সমূহে ব্যবস্থাপক সমিতির প্রাধান্য বাড়িবে এবং তাহা দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইবে। প্রত্যেক লোকাল বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটী একজন করিয়া মেম্বর নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন এবং বেসরকারী মেম্বরই অধিকাংশ থাকিবেন। লোকাল কাউন্সিল গুলির রিজলিউশন পাশ করার ক্ষমতা অপ্রতিহত থাকিবে। কেবল ইম্পিরিয়াল ডিপার্টমেণ্টের সম্বন্ধে রিজলিউশন পাশ করার অপ্রতিহত ক্ষমতা থাকিবে না। প্রদেশিক কাউন্সিলে যে সকল রিজলিউশান পাশ হইবে, তাহা প্রাদেশিক গবরমেণ্ট সমূহকে মানিয়া চলিতে হইবে। কেবল সকাউন্সিল গবরণরের উপর অর্পিত হওয়া অবস্থায় তাহা এ্যাডভাইসরি কমিটীর অনুমোদনে যদি রদ হইয়া যায় তবেই সেই রিজলিউশন গবরমেণ্ট মানিয়া না চলিতে পারেন। এ্যাডভাইসারি কমিটীও খুব বড় রকমের হইবে, তাহা সম্রাটের প্রিভিকাউন্সিলের অনুরূপ হইয়া গঠিত হইবে এবং তাহাতে অফিসিয়াল মেম্বারের ভাগ বেশী থাকিবে। রিজলিউশনের ক্ষমতা বজেট পর্য্যন্তও বিস্তৃত থাকিবে। শাসন পরিষদ সমূহের কলেবরও বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহা পূর্ণ ক্যাবিনেটের তুল্য হইবে। শাসন-পরিষদের মেম্বরগণ লোকাল এসেম্বলীর প্রধান দল দ্বারা মনোনীত হইবেন। শাসনসংস্কারের আর একটি ফল এই হইবে যে, বর্ত্তমানে প্রাদেশিক গবরমেণ্টের চাকুরীতে অফিসার সংগ্রহের নিয়মে যে কর্ম্মচারী নিয়োগের বিধি আছে তাহা আর থাকিবে না, তাহার পরিবর্ত্তে প্রতিযোগিতার পরীক্ষা হইয়া সক্ষম লোকগণই কার্য্য পাইবেন। আর ইউরোপীয়ানদের সংখ্যার প্রাধান্য থাকিবেনা, সেই সংখ্যার প্রাধান্য শূন্যে মিলাইয়া যাইবে।"

রঙ্গ।

শিক্ষয়িত্রী।—ভূগোল শেখনি কেন?

ছাত্রী।—মা বারণ করেছেন।

শিক্ষয়িত্রী।—কেন?

ছাত্রী।—মা ভূগোল শেখেননি তাঁর বিয়ে হ'য়েছে, মাসীমা ভূগোল সেখেনি তাঁরও বিয়ে হ'য়েছে। আপনি ভূগোল কত শিখেছেন, এখনও বিয়ে হল না। মা বলেন, ভূগোল শিখ্‌লে বিয়ে হবে না।

"ধামার বউ ধামী, মালসার বউ মালসী, ডালার বউ ডালী—নয় মা?"

"দুর হতভাগা মেয়ে! বলে কি?"

"কেন মা ব্যাকরণে যে প'ড়েছি, মামার বউ মামী, কাকার বউ কাকী; বাঙ্গলা কথায় যাতে আকার আছে, তাতে ঈকার দিলে স্ত্রী হয়।"

"তুই অতি অধম!"

"অধম!—আমি আম! এত বড় কথা বল! জান ব্যাকরণ লিখেছে, 'আমি' উত্তম পুরুষ।"

গুরুমহাশয় ব্যাখ্যা করিলেন, "হাত আছে' এই অর্থে হাতীকে বলে হাতী।"

"হাত ত আমারও আছে গুরুমশায়, আমি কি তবে হাতী?"

না—না—তুমি কেন হাতী হবে? তোমার হাত আছে বটে, হাতীর হাত ত নাই?"

"ছেলেটা কবিত্বে বেশ পাকা।"

"এখনই বেশ পাকা! বড় হ'তে হ'তে একেবারে পরে যাবে যে।"

১ম ছাত্র।—করুণ রস কাকে বলে পণ্ডিতমশাই?

পণ্ডিত।—যাতে দুঃখ হয়।

২য় ছাত্র।—ওহো তাই বুঝি চোখ দিয়ে ঝর ঝর ক'রে অমন জল পড়ে!—আর রৌদ্র রস?

৩য় ছাত্র।—দুর! রৌদ্রে কি আর রস হয়? সব যে শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে যায়।

৪র্থ ছাত্র।—তা বই কি? রস বল্‌তে হলেও যে মধুর রস—যেমন খেজুরের রস—বেরোয়ও শীতের রেতে।



সদ্যস্নাতা

BIJOYA PRESS, CALCUTTA.

৫ম বর্ষ } শ্রাবণ—১৩২৫। { ৪র্থ সংখ্যা

দেবর।

লক্ষীছাড়া ঘরে মা ষষ্ঠীর দয়া অশেষ। দরিদ্র ভোলানাথ অনেকগুলি ছেলেমেয়ে নিয়া বিব্রত হইয়া পড়িলে তাঁহার ভগ্নী সারদাসুন্দরী নিঃসন্তান বলিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র হরিধনকে শ্বশুরবাড়ী লইয়া গিয়া মানুষ করিতেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য অতি সংক্রামক। আজ দু'বৎসর হইল সারদা বিধবা হইয়াছেন। শ্বশুরকুলের বিপুল সম্পত্তির স্বচ্ছলতা সত্বেও নিজেকে কেবলমাত্র ভরণপোষণের অধিকারী জানিয়া সম্প্রতি হরিধনকে তিনি অনিচ্ছায় দাদার কাছে পাঠাইয়া দিলেন।

কাল সন্ধ্যাবেলা যোগেশ আসিয়া সারদাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বউদি, হরিধন আর আসে না কেন গো?" সারদা সহসা এ প্রশ্নের যে কি উত্তর দিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া যোগেশ একটু দুঃখিত স্বরে বলিল—"তুমি মনে ক'রোন বউদি, দাদার সঙ্গে তোমার সব গেছে। আমি বেঁচে থাক্‌তে তোমার কোন কষ্ট হবে না। তুমি আমাদের যে যত্ন কর বউদি, তা সামান্য টাকা দিয়ে শোধ করা যাবে না। হরিধনকে তুমি নিয়ে এস। তারে আমি তোমারি ছেলে বলে বিষয় ভাগ করে দেব।" সারদা এতক্ষণ যোগেশের মুখপানে বিস্ময়ে চাহিয়াছিলেন। কথা শেষ হইলে দেবরের উদারতায় তিনি লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"তুমি যে এত ভালবাস তা জানিনা ঠাকুরপো। আমারই দোষ হ'য়েছে।" সারদার চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু ঝরিয়া পড়িল। যোগেশ বলিলেন—"কেন বউদি, এ ভালবাসা ত তুমিই আমাদের শিখিয়ে দিয়েছ। শেখা জিনিষ কি এত শীগগির ভোলা যায়? দোষ স্বীকার করেছ তাই কিছু বল্‌তে পার্‌ছি না। নইলে দেখ্‌তে তোমার সংসারে আমি একদণ্ডও থাক্‌তাম না। একি আমার সংসার বউদি? আমার স্ত্রী, আমার ছেলে, সবই ত তোমার। এত পর ভাবা তোমার উচিত হয়নি। চিরকাল মার মতন স্নেহ করে আমাদের মানুষ ক'রে এসেছ, এখন হাঁটতে শিখেছি বলে তোমার কোলে কি বস্‌তে ইচ্ছে করে না?" সারদা আর থাকিতে পারিলেন না। নিজেকে শত ধিক্কার দিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। যোগেশ ব্যস্তভাবে আসিয়া তাঁহার পা'দুটি ধরিয়া করুণভাবে বলিলেন—"বউদি, ক্ষমা কর। তোমায় অনেক কথা ব'লে ফেলেছি। মা'র প্রাণ নিয়ে একবার বুঝে দেখ আমার কত কষ্ট হ'য়েছে।" আঁচলে চোখ মুছিয়া সারদা বলিলেন—"ঠাকুরপো, মানুষ যে এত আপনার হ'তে পারে তা এই প্রথম দেখলুম। সত্য কথা বল্‌তে কি, তোমার দাদাও আমায় এত ভালবাস্‌তেন না। আমি দোষ করেছি, তুমি কেন ক্ষমা চাইছ ভাই?"

স্বামীর এরূপ ব্যবহারে কুন্দ বড় অসন্তুষ্ট হইল। সে ভাবিয়াছিল—সারদার যখন ছেলেমেয়ে হয় নাই, সমস্ত সম্পত্তিই তার একমাত্র পুত্র শশিভূষণ পাইবে। কিন্তু যোগেশের মুখে হরিধনকে বিষয় দেওয়ার কথা শুনিয়া সে বড় উদ্বিগ্ন হইয়া স্বামীর নির্বুদ্ধিতাকে সহস্রধার ধিক্কার দিয়া ভাবিতে লাগিল, কি উপায়ে এই গৃহশত্রু হরিধনকে সে বহিষ্কৃত করিবে। সারদা যে তাহাদিগকে বিশেষ যত্ন করেন সে কথা সে নিজের মনে অস্বীকার করিতে পারিল না, এবং হরিধনের প্রতি প্রকাশ্যভাবে অত্যাচার করিলে যোগেশ

যে বিরক্ত হইবে সে বিষয়েও তার সন্দেহ নাই। কুবুদ্ধি হিংসার প্রতিপোষক। কুন্দ স্থির করিল—হরিধনকে অতিরিক্ত আদর দিয়া মাটি করিয়া ফেলিয়া স্বামীর চোখের সামনে শেষে ধরিয়া দিবে।

হরিধন আসিলে যোগেশ তাহাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন, এবং বাড়ীতে পড়াইবার জন্য একটি মাষ্টারও নিযুক্ত করিলেন।

আজ সকালে বাড়ীর চাকর নিধিরাম আসিয়া হরিধনকে ডাকিয়া বলিল—"দাদাবাবু, মাষ্টার মশাই এসেছেন।" হরিধন তখন কুন্দের কাছে ব'সিয়া গল্প শুনিতেছিল। বিরক্ত হইয়া বলিল—"মাষ্টার মশাইকে বস্‌তে বল। একটু পরে যাচ্ছি।" সারদা যদিও সংসারের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, পালিত পুত্রের কথা শুনিতে পাইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া তিরস্কারের কণ্ঠে বলিলেন—"মাষ্টার মশাই কি তোর চা'কর যে ব'সে থাকবেন? কি কর্চ্ছিস্ এখানে? যা পড়তে যা।" কুন্দ সরোষে বলিয়া উঠিল—"দিদির এক কথা। ছেলেমানুষকে অমন করে বল্‌তে আছে? দিনরাত পড় পড় করে ছেলেটাকে একটু বাড়তে দিলে না।" হরিধনের প্রতি কুন্দের এতাদৃশ স্নেহ দেখিয়া সারদা আনন্দিত হইলেন। বলিলেন—"পরের ছেলে ভাই, খারাপ হ'য়ে গেলে, আমাকেই সকলে মন্দ বল্‌বে।" কুন্দ মুখ ভার করিয়া বলিল—"আমিই বুঝি তোমার ছেলেকে খারাপ করে দিচ্ছি?" সারদার বড় ভয় হইল। দুঃখিত স্বরে বলিলেন—"তোরে কি এমন কথা বল্‌তে পারি ছোটবউ? আমি কি জানি না হরিধনকে তুই কি রকম ভালবাসিস্? তবে কি জানিস্ ভাই, ওর বাপমাই তখন আমায় দুষবে।" ইতিমধ্যে কুন্দও ভাবিয়া লইয়াছিল—সকালে গল্প করার কথা শুনিলে যোগেশ অসন্তুষ্ট হইবে এবং এরূপ কলহে তার উদ্দেশ্যসাধন হইবে না। কথা ঘুরাইয়া বলিল—"কেউ তোমায় দুষবে না, দিদি। আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না, কি যত্নে তুমি ওকে মানুষ করছ, লোকের মা বাপও এমন পারে না। আর ও-ই বা নষ্ট হবে কেন? ও ত বোকা ছেলে নয়, বেশ বুদ্ধিমান্।" নানাবিধ প্রশংসার কথা শুনিয়া সারদা গলিয়া গেলেন। একটু হাসিয়া বলিলেন--"তবে তোর যা ভাল হয় কর বোন্।" সারদা চলিয়া গেলেন।

কুন্দের কৃত্রিম আদরের অর্থ না বুঝিয়া হরিধন তাহাকে অধিক আপনার ভাবিয়া সারদাকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল এমন কি সামান্য কারণে ঝগড়া করিয়া শশিভূষণকেও মারপিট করিত।

দুপুরবেলা নিজের ঘরে বসিয়া উন্মুক্ত জানালার পা[illegible] চাহিয়া কুন্দ নিজের কুচিন্তা করিতেছে। শশিভূষণ আসি[illegible] কাঁদিয়া বলিল—"মা, দাদা আমায় মার্‌লে।" কুন্দ তা[illegible] একমাত্র ছেলেকে প্রাণের অধিক ভালবাসিলেও হরিধন[illegible] কিছু না বলিয়া শশিভূষণের কাণে চুপি চুপি বলিল—"তো[illegible] বাপের কাছে বল্‌গে যা।" শশিভূষণ কাঁদিতে কাঁদি[illegible] চলিয়া গেল।

ছেলের কথা শুনিয়া হরিধনকে দোষী বিবেচনা করিয়া যোগেশ বউদির ভয়ে কিছু বলিতে পারিলেন না বটে, বি[illegible] মনে মনে বড় অসন্তুষ্ট হইলেন। শশিভূষণ কাহারও কা[illegible] সহানুভূতি না পাইয়া অভিমানভরে ভিতরে আসিলে সার[illegible] ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাঁদছিস্ কেনরে শশি[illegible] হরি বুঝি তোরে মেরেছে?" "হাঁ জ্যেঠাইমা," বলিয়া শ[illegible] ভূষণ আরও কাঁদিয়া ফেলিল। সারদা শশিভূষণকে [illegible] স্নেহ করেন। হরিধনকে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করি[illegible] —"শশীকে মেরেছিস্ কেন?" হরিধন তৎক্ষণাৎ উ[illegible] দিল—"বেশ করব, তোমার কি?" রুক্ষস্বর শুনিয়া সারদ[illegible] সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। ক্ষিপ্রহস্তে তাহার একটি কাণ ধ[illegible] টানিয়া বলিলেন—"কি এত বড় কথা? বয়সের সঙ্গে তোম[illegible] বুদ্ধি বাড়ছে? মেরেছিস্ কেন বল্, নইলে আজ তো[illegible] মেরে ফেল্‌ব।" সারদার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া কু[illegible] বাহিরে আসিয়া বলিল—"কি হ'য়েছে দিদি, ওরে অ[illegible] করে মারছ কেন?" সারদা বলিলেন—"তুই আর আ[illegible] দিস্ নি বোন্, ও বড় পাজী হ'য়েছে।" "আহা, ছে[illegible] দাও, দেড়ে দাও। বড় হ'লে সব শুধরে যাবে।" কু[illegible] আসিয়া হরিধনের হাত ধরিয়া নিজের ঘরে লইয়া গে[illegible] বৈঠকখানায় বসিয়া স্ত্রীর কথা শুনিয়া যোগেশ ভাবিল তার বৌদিও যেমন স্ত্রীও তেমি। হরিধনের প্রতি কু[illegible] ভালবাসা দেখিয়া সে নিজেকে ধন্য বিবেচনা করিল।

(২)

হরিধনের বিরুদ্ধে কুন্দ যে কি ভীষণ চাতুরী খেলি[illegible] ছিল, সে কথা কেহ বুঝিতে পারিল না। সারদা তাঁহ[illegible]

কুন্দ তাঁর পালিত পুত্রকে যথেষ্ট স্নেহ করে এবং যোগেশ ভাবিলেন, হরিধন অতি পাজী ছেলে।

আজ বিকালে স্কুল হইতে আসিয়া কুন্দের কাছে যাইয়া হরিধন বলিল—"দুটো পয়সা দেবে ছোট পিসি ?"

কুন্দ সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল—"কি করবি ?"

"মারবেল কিনব।"

কুন্দ তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিল—"মারবেল খেলতে পারিস্ তুই ?"

মাথা নাড়িয়া "হাঁ" বলিয়াই হরিধন তার পকেট হইতে দু'টি মারবেল বাহির করিয়া ঘরের মেজের উপর রাখিয়া খেলিতে লাগিল—"এই দেখ জ্যেঠাইমা—থ্রী, সিক্স, নাইন, —এঃ ফস্‌কে গেল।" কুন্দ বলিল—"বেশ ত শিখেছিস্। তা মারবেল ত রয়েছে তোর, আবার পয়সা কি হবে ?"

"এ আমার মারবেল নয়, একজন ছেলের কাছ থেকে চেয়ে এনেছি।"

কুন্দের নিকট পয়সা পাইয়া হরিধন হর্ষোৎফুল্ল অন্তরে বাহিরে চলিয়া গেল।

আজ কয়েকদিন হইল হরিধন কুন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া মাষ্টারকে ফাঁকী দিয়া মারবেল খেলায় উন্মত্ত হইয়াছে। সন্ধ্যাবেলা যোগেশ বাজার হইতে ফিরিবার সময় দেখিলেন, হরিধন কতকগুলি ছোটলোকের ছেলের সহিত অশ্লীল কথায় ঝগড়া করিতেছে। এরূপ অধঃপতন দেখিয়া তাঁহার মনে বড় দুঃখ হইল। বাড়ী আসিয়া সারদার কাছে গিয়া বলিলেন—"বউদি তোমার ছেলের উপর আমার কোন দাবী আছে কি না বল।" বিস্ময় দৃষ্টিতে সারদা তাঁর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন ঠাকুরপো !" "আগে বল, জোর আছে কি না।" সারদা তাহার মনোগত ভাব বুঝিতে না পারিয়া শঙ্কিত স্বরে বলিলেন—"নিশ্চয়ই আছে।" তোমার ছেলের উপর যখন আমার জোর আছে আমার ছেলের উপর তোমার থাকবে না কেন ? এই জোর থাকাই ত সংসারের বন্ধন ঠাকুরপো !" "তবে ওকে আমার হাতে ছেড়ে দাও। আজ একটু শিক্ষা দিয়ে দেব। দেখে এলুম কতকগুলো ছোটলোকের ছেলের সঙ্গে সে এমন অশ্লীল কথায় ঝগড়া করছে, বউদি, সে শুনলে তুমি কাণে আঙুল দেবে।" সারদা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—"হরিধন কি তা'হলে মাষ্টারের কাছে পড়ে না ?" "কি জানি বউদি, সে নিশ্চয়ই ফাঁকী দেয়। এত যত্নে মানুষ করে শেষে যে তুমি জলে পুড়ে মরবে তা আমি দেখতে পারব না।" পালিত পুত্রের প্রতি সারদার বড় রাগ হইল। সে যে উৎসন্ন যাইতেছে সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল না। কুপিত কণ্ঠে বলিলেন—"হরিধনকে তুমি যেমন করে পার শিক্ষা দাও, আমার কোন আপত্তি নেই।"

হরিধন বাড়ী আসিলে যোগেশ তাহাকে ডাকিয়া নিজের ঘরে লইয়া গিয়া উত্তমমধ্যমে প্রহার আরম্ভ করিল। তাহার করুণ চিৎকারে সারদা অস্থির হইয়া পড়িলেন। ব্যস্তভাবে ছুটিয়া গিয়া অর্দ্ধপথেই তাঁর মনে হইল যোগেশ হয়ত লজ্জা পাইবে। স্নেহের অনুরোধে কর্ত্তব্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন না করিয়া রান্নাঘরে ফিরিয়া আসিয়া তিনি গুমরাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ভোলানাথ তাঁর ভগ্নীকে কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাঁহাদের কুশল সংবাদ লইতেন। আজও তিনি এখানে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে পিতাকে দেখিয়া হরিধন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। ভোলানাথ বড় ছেলেটিকে বড় ভালবাসেন। ত্রাস্তভাবে আসিয়া পুত্রকে ঘরের মধ্যে চাবিবন্ধ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সারদা আসিয়া বলিলেন—"হরি বড় দুষ্ট হয়েছে দাদা, তাই দেওরকে বলে আজ আমি ওরে জব্দ করেছি।" যোগেশ এতক্ষণ নিজের ঘরে বসিয়াছিলেন। রাগের মাথায় হরিধনকে যে তিনি অতি নির্দ্দয় প্রহার করিয়াছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মনে মনে তিনি অনুতপ্ত হইলেন এবং ভোলানাথের সম্মুখে কেমন করিয়া বাহির হইবেন ভাবিয়া লজ্জিত হইলেন। সারদা আসিয়া বলিলেন—"ঠাকুরপো, চাবিটা দাও ত।"

হরিধনের শরীরে প্রহারের চিহ্নগুলি রক্তবর্ণ হইয়া যেন পিতৃস্নেহের উপর কষাঘাত করিল। তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। পরে মনের আবেগ রুদ্ধ করিয়া সারদার পানে চাহিয়া শ্লেষভরে বলিলেন—"খেতে দিস্ বটে, কিন্তু দামও তুলে নিস্।" সারদার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। গভীর বিষাদে তাঁর চক্ষু দুটি ছল ছল করিতে লাগিল। ভোলানাথ তাহা লক্ষ্য না করিয়া হরিধনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আয় বাড়ী যাই। পান্তা ভাত খেয়ে তোরা মানুষ হয়েছিস্, গরম ভাতের তাত তোদের সইবে না। ভোলানাথ কাহারও সঙ্গে আর কোন কথা না কহিয়া হরিধনকে লইয়া

চলিয়া গেলেন। সারদা কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া অভিমান ভরে যোগেশের ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন— "পরের ছেলেকে এমন করে মারতে আছে ঠাকুরপো?" তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। ভোলানাথের কথায় যোগেশ বড় মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। বলিলেন—"তা জানিনা বউদি। আমি মনে করেছিলাম, হরিধন তোমার ছেলে।" যোগেশের সবিনয় কথা শুনিয়া সারদা একটু আশ্বস্ত হইলেন বটে, কিন্তু পালিত পুত্রের অবস্থা দেখিয়া তিনি বিশেষ সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। এমন নির্দ্দয়ভাবে কেউ যে কাহাকে মারিতে পারে এ ধারণা তাঁর ছিল না। দাদার কথায় যদিও তিনি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু পুত্রস্নেহ তাঁহাকে চাপিয়া ধরিল। সারদা ক্ষুণ্ণস্বরে বলিলেন—"তা' ব'লে তোমারও এমন করে মারা ভাল হয় নি।" রাগে দুঃখে কক্ষত্যাগ করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। কুন্দ আসিয়া স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"এখন বুঝলে ত? পর কখনও আপনার হয় না। তুমি তারে যত্ন করে পড়াচ্চ, আমি তারে খাওয়াচ্ছি পরাচ্চি, তবু দিদির মন ওঠে না। ভাই যে এত বড় কথাটা বলে গেল তা'তে তাঁর রাগ হ'ল না, আর তুমি যে তাঁদেরই ভালর জন্যে একটু মেরেছ সেইটেই দোষের হ'ল।" স্ত্রীর কথায় উত্তেজিত হইয়া যোগেশ বলিলেন—"যা বলেছ কুন্দ—পর কখন আপনার হয় না। এইবার বিষয়টাকে ভাগ করে দিই, ওদের যা ইচ্ছা হয় করুন।" মনের ভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কুন্দ বলিল—"বিষয় ভাগ করে দিতে চাও দেবে,—তোমার বিষয়—আমি তার কি ব'লব? তা বিবেচনাও কত্তে হয়,—ছেলে যা হয়ে উঠছে দুদিনে সব উড়িয়ে দেবে। তুমি খুব ভাল তাই এমন কথা বলছ। অন্য কেউ হ'লে একটা কাণা কড়িও হাতে তুলে দিত না।"

শশিভূষণ কুকুর দেখিলে বড় ভয় পাইত। এই সময় কোথাকার একটা কুকুরকে দেখিয়া ছুটিয়া বাড়ীর ভিতর আসিতে পড়িয়া গিয়া তার হাঁটু কাটিয়া গিয়াছে। সারদা তাহার চীৎকার শুনিয়া ব্যস্তভাবে বাহিরে গিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন—"নিধে কোথায় গেল? ছেলেটাকে কি একটু দেখতে পারে না!" কুন্দ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে দিদি?" "দেখ না, কোথাকার একটা কুকুরকে দেখে বাছা একেবারে খুন হ'য়ে গেছে।" সম্মুখে নিধিরামকে দেখিতে পাইয়া সরোষে তিনি বলিয়া উঠিলেন—"নিধে, কোথায় ছিলি তুই? একটু কি তোর আক্কেল বুদ্ধি নেই!" নিধিরাম প্রথমটা হতবুদ্ধির মত তাঁর পানে চাহিয়া থাকিল, পরে নিজের কাজে চলিয়া গেল, সে জানিত সারদা যতই রুষ্ট হ'ন না কেন তিনি পরের অনিষ্ট করিতে জানেন না। বউদির কথা শুনিয়া যোগেশ অতীত ঘটনা বিস্মৃত হইয়া হাসিয়া বলিল—"বউদির কথা শুনলে হাসি পায়। নিধে কি দিনরাত পাড়ার কুকুর তাড়িয়ে বেড়াবে?" স্বামীর কথা শেষ না হইতেই কুন্দ তাহার কূট বুদ্ধি খাটাইয়া বলিল—"তুমি অত রাগ করছ কেন? দিদি ত কোন মন্দ কথা বলেন নি। তোমারই ছেলে, যদি কুকুরে কামড়ে দিত কি হ'ত বল দেখি?" সারদা এতক্ষণ শশিভূষণের ক্ষতস্থানে জলপটী বাঁধিয়া দিতেছিলেন। কুন্দের কথা শুনিয়া তিনি ভাবিলেন, যোগেশ তাঁর কথায় রাগ ক'রেছে। দুঃখিত স্বরে বলিলেন—"আমি যা করি তাই মন্দ। বাড়ীতে একটা ছেলে, তার এত অযত্ন কেন? লোকে যে কত সাধনা করে পায় না। এ ত গাছপালা নয় যে মাটীতে পড়ে মানুষ হবে। আমি এসব সইতে পারব না। হয় আর একটা চাকর রাখ, ছোট বউ, না হয় আমি কোথাও চলে যাই।" শশিভূষণকে লইয়া সারদার এমন ঝগড়া যোগেশের কাছে নূতন নয়। কুন্দের পানে চাহিয়া আবার হাসিয়া তিনি বলিলেন—"কেন তুমি বউদিকে অমন ক্ষেপিয়ে তোল বল দেখি? ঠাট্টা বিদ্রূপ উনি বুঝতে পারেন না, মনে করেন সত্যই আমি ওঁরে কটু বলেছি।" কুন্দ বলিল—"দিদি কি পাগল, যে লোকের কথায় ক্ষেপে উঠবেন। অমন নিষ্ঠুর কথা কি বলতে আছে? পাগলের চেয়ে গালাগাল আর নেই। দিদি নেহাত ভাল মানুষ তাই এত সহ্য করেন। ও কথা বলা তোমার ভাল হয় নি।" সারদা চক্ষু দুটিকে অশ্রুপূর্ণ করিয়া ভারি গলায় বলিলেন—"জানি বউ, অদৃষ্ট যখন ভেঙ্গেছে, অনেক কথা আমায় শুনতে হবে। শশীকে একটু ভালবাসি, তাই পাগল হয়ে গেলাম। আমার মরণই ভাল। ম'লে আর দেখতে আসব না কেমন করে তোদের ছেলে মানুষ হচ্চে।" সারদাকে কাঁদিতে দেখিয়া যোগেশের বড় দুঃখ হইল—সামান্য পরিহাসও তিনি বুঝিতে পারেন না। কুন্দ বুঝিল, এই ভাবেই উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিতে পারে এবং ভবিষ্যতে তার পরিশ্রম সার্থক হইতে পারে।

(৩)

বর্ষাকাল। রাত্রে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। ভোলানাথের জীর্ণ খড়ের চাল ভেদ করিয়া অবারিত বারিরাশি দারিদ্র্যকে উপহাস করিতে লাগিল। পুত্রকন্যার অবস্থা দেখিয়া ভোলানাথের স্ত্রী কুসুম কুপিতকণ্ঠে স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"তোমার জন্যেই ত আমার যত জ্বালা। ছেলেটা ছিল সুখে, ঝগড়া করে নিয়ে এসে কি লাভ হ'ল? ঠাকুরঝির মত মানুষ কি আর হয়? তার দেওরই বা কি মন্দ? হরিকে সে বিষয় ভাগ করে দিতে চেয়েছিল। দু'টোদিন সবুর করলে রাজার হালে আমাদের সংসার চলত।" ঘরের একটি কোণে বসিয়া ভোলানাথ তামাক টানিতেছিলেন এবং ধূমরাশির সঙ্গে স্ত্রীর তিরস্কার উড়াইয়া দিতেছিলেন। হরিধনের ছোট ভাই রামধন কাঁদিয়া বলিল "মা, ঘুম পেয়েছে।" কুসুম সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া মনের আবেগে বলিতে লাগিল—"একটু সে মেরেছিল তা কি হত? যে মানুষ কর্‌বার ভার নিয়েছে তার কি এটুকু ক্ষমতাও থাক্‌বে না? ছেলে দুষ্টু হ'য়ে গেলে তারে শাসন করবে না? তুমি যে কতদিন রেমোশেমোকে মেরে হাড় ভেঙ্গে দাও। কেবল পরের বেলাই বুঝি দোষ হয়।" রামের ছোট শ্যামধন এতক্ষণ ঘুমাইতেছিল। গায়ে জল পড়িতে জাগিয়া উঠিয়া কাতরভাবে বলিল—"মা, জল পড়ছে যে,—কোথায় শোব?" কুসুম পূর্ব্বের মত মুখভঙ্গী করিয়া বলিতে লাগিলেন—"আদর জানান হ'ল। ঘটে বুদ্ধি না থাকলেই এই রকম হয়!" ভোলানাথ স্ত্রীর কথায় বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"মিছে বক্ বক্ করছ কেন? ছেলেগুলোর একটু ঘুমাইবার ব্যবস্থা করে দাও না?" স্বামীর কথায় কুসুম জ্বলিয়া উঠিলেন। তীব্রকণ্ঠে বলিলেন—"তুমি করে দাও না? বসে বসে ত তামাক টানছ। ছেলেপিলে মানুষ করবার যদি ক্ষমতা নেই বিয়ে করেছিলে কেন? সারা বছরটা ব'লে এলুম চালটায় দুটো খড়ের গুঁজি দাও, এখন আমার উপর রাগ কর্‌লে কি হবে?" এইবার হরিধন জাগিয়া উঠিল। সে চিরকাল সুখের কোলে মানুষ হইয়াছে, এত কষ্ট তার সহ্য হইবে কেন? কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল—"বাবা, কাল আমি পিসিমার কাছে চলে যাব, এখানে থাক্‌তে বড় কষ্ট হয়।" কুসুম তার কথা শুনিয়া রাগে অধীর হইয়া বলিলেন—"তুই ত সকল অনিষ্টের মূল। এখন জা হ। আর তোমায় পিসিমার কাছে পাঠাব? এবা রেমোকে পাঠিয়ে দেব।" মায়ের কথা শুনিয়া হরিধন বিপা গণিল। রাম সাহস পাইয়া আব্দার করিয়া বলিল—"মা দাদাকে আর পাঠিও না, এবার আমি যাব।" ভাইরে সুখের পথে অন্তরায় দেখিয়া হরিধন উত্তপ্ত হইয়া রামে গালে ঠাস করিয়া একটি চড় মারিয়া বলিল—"মুখপোড় ছেলে, তুমি যাবে সেখানে?" হরিধনের এই উদ্ধত স্বভা কুন্দের কৃত্রিম আদরের কুফল। কুসুম প্রথম হইতেই বড় ছেলের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। এখন তার এ অত্যাচার তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরে একটা কোণ হইতে একটা ভাঙ্গা ছাতি লইয়া আসিয় তাহাকে বিশেষরূপে প্রহার করিতে লাগিলেন। ভোলানাথ হরিধনকে বড় ভালবাসেন এবং স্ত্রীকেও যথেষ্ট ভ করেন। রুদ্রমূর্ত্তি কুসুমের গতিরোধ করিতে গেলে হয় বিপদে পড়িয়া যাইবেন, ভাবিয়া কাছে আসিয়া কাতরভাবে বলিলেন—"আর মেরনা। ওর কিছু দোষ নেই। সব আমার অদৃষ্ট। ইচ্ছে হয় আমায় মার।" স্বামীর আনু গত্য দেখিয়া কুসুম একটু শান্ত হইলেন। হরিধনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"কেমন এখন বুঝলি? দুষ্ট ছেলেকে বাপমায়েও দেখ্‌তে পারে না।" ভোলানাথ গম্ভীর বিষাদে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি থামিয়া গেল। কুসুম ঘরের জল মুছিয়া কাঁথা পাতিয়া, ছেলেদের শুইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

প্রভাতে সারদা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুসুম একটু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঠাকুরঝি যে এত সকালে?" সারদা হাসিয়া বলিলেন—"হরিধন ভাল আছে ত?" কুসুম মাথা নাড়িয়া জানাইলেন—ভাল আছে। পরে বলিলেন—"এমন অসময়ে এলে যে? ওখানে কো গোলমাল হয়নি ত?" সারদা হাসিয়া বলিলেন—"গোল মালের লোক ত ওখানে কেউ নেই ভাই। যেমন দেও তেমনি তার বউ। হরিকে দিনরাত বুকে তুলে রেখেছিল হঠাৎ কাল রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখে মন খারাপ হ'য়ে গেল তা রাত না পোয়াতেই ছুটে এলুম।"

"দুদিন থাক্‌বে ত?"

"না ভাই, থাক্‌লে কি চলে? সংসার আমারই ঘাড়ে

তার ওপর শশিভূষণকেও মানুষ করতে হয়। বউটা নেহাত ছেলেমানুষ। সংসারের কিছুই জানে না।" এই সময় ভোলানাথ আসিয়া একটু সলজ্জভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কি রে সারদা, কখন এলি?" ভোলানাথ ভাবিয়াছিলেন—সারদা তাঁহারই সহিত ঝগড়া করিতে আসিয়াছে। ভয়ে তাঁর হৃৎকম্প হইতেছিল। কিন্তু সারদা অতি সহজভাবে বলিল—"এই এলুম, দাদা। হরিধনকে নিয়ে যাব।" ভোলানাথ হাঁফ ছাড়িয়া বুকের ভার লাঘব করিয়া হতাশ ভাবে বলিল—"যা, এখনি নিয়ে যা। এখানে থাকলে ছুটোদিন বাঁচবে না।" গত রাত্রের ঘটনা স্মরণ করিয়া ভোলানাথের চক্ষুদুটি ভিজিয়া উঠিল। দাদার মুখপানে চাহিয়া সারদা একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন দাদা, কি হয়েছে?" মনের দুঃখ কোন মতে চাপিয়া ভোলানাথ বলিলেন—"কি আর হবে বোন? গরীবের যা হয়ে থাকে—অর্থাভাবে আত্ম-কলহ।" কুসুম ভাবিলেন ভোলানাথ যখন কলহের কথা তুলিয়াছেন তখন নিশ্চয়ই সারদাকে সব প্রকাশ করিয়া বলিবেন। তাড়াতাড়ি নিজের দোষ ঢাকিবার জন্য মুখচোখ রাঙ্গা করিয়া স্বভাবসুলভ কর্কশ-কণ্ঠে তিনি বলিলেন—"অমন মিথ্যে কথা ব'লো না। এখনও চন্দ্রসূর্য্যি উঠছে। আমি প্রথমে ঝগড়া করতে গিয়েছিলুম?" সারদার পানে চাহিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—"শোন ঠাকুরঝি, ব্যাপারটা বলি। কাল রাত্রে ঘরে বড় জল পড়ছিল। ছেলেগুলো ঘুমভেঙ্গে উঠে কাঁদতে লাগল। হাঁ গা, হাজার হ'ক আমি মা, গরীব বলে কি আর কম ব্যথা লাগবে? তাদের অবস্থা দেখে বড় কষ্ট হ'ল। নিজের মনে তাই দুঃখের কথা বলছিলাম। উনি শুনতে পেয়ে তেড়ে উঠে বললেন—মিছে বক্ বক্ করছ কেন? বল ত দিদি একথা বলা কি ওঁর ভাল হয়েছে? আমি না হয় পরই আছি। কিন্তু উচিত কথা ত বলতে হবে।" কুসুমের গণ্ডদেশ বহিয়া দুটি বড় বড় অশ্রুফোঁটা ঝরিয়া পড়িল। ভোলানাথ ভগ্নীকে সম্মুখে দেখিয়া সাহসভরে বলিলেন—"সব মিথ্যে কথা সারদা। ও আমায় বল্লে কি জানিস্? লজ্জার কথা। স্বামীকে বোধ হয় কোন স্ত্রী এমন ক'রে বলে না।" ভোলানাথকে বাধা দিয়া কুসুম বলিয়া উঠিলেন—"আহা, খুব বাড়াও খুব বাড়াও। মাইরী বলছি ঠাকুরঝি, আমি ওসব কিছু বলিনি। তোমার পা ছুঁয়েও বলতে পারি।" রাগে, ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া কুসুম ছুটিয়া গিয়া সারদার পায়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। সারদা ব্যস্তভাবে সরিয়া গিয়া বলিলেন—"কি কর বউদি? এতে যে আমার মহাপাপ হবে।" স্ত্রী যে রীতিমত শিক্ষা পাইয়াছে তাহাতে ভোলানাথের সন্দেহ রহিল না। কিন্তু আর একটু শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন—"সারদা, তুই দিনকতক থাক। শীগগীরই বুঝতে পারবি কে কেমন লোক।"

(৪)

ক'দিন ধরে শরীরটা খারাপ হইয়া আজ সন্ধ্যাকালে প্রবলভাবে যোগেশের জ্বর হইল। কুন্দ আসিয়া কাছে বসিয়া সেই পুরাতন কূটবুদ্ধির আশ্রয় লইয়া বলিল—"দিদির কি আক্কেল? জানেন ত সংসারে আমি একা। এখন কোন দিক করি? কোলে ছেলে, তার উপর তুমিও পড়লে। রোগীর সেবা করব না সংসার দেখব?" বলিতে বলিতে স্বামীর মুখ পানে চাহিয়া হঠাৎ সুর বদলাইয়া বলিল—"তাঁরও দোষ দিতে পারি না। হয়ত হরিধনের মা আসতে দেয় নি। অমন লোক পেলে কি কেউ ছাড়তে চায়? যখন এখানে ছিলেন, মনে হ'ত আমি পর্ব্বতের আড়ালে আছি।" যোগেশ বলিলেন—"তাঁকে একখানা চিঠি দাও।"

"আমিও তাই ভাবছিলুম।"

নিধিরাম আসিয়া কুন্দের হাতে একখানি চিঠি দিল। তাহা খুলিয়া কুন্দ দেখিল সারদা লিখিয়াছেন। স্বামীর মুখপানে চাহিয়া বলিল—"বাবা পশ্চিমে বেড়াতে যাচ্ছেন, আমায় নিয়ে যেতে চান।" যোগেশ বলিল—"তোমার বাবার চিঠি? আমি মনে করেছিলুম বউদি দিয়েছেন।" কুন্দ মাথা নাড়িয়া বলিল—"না"।

চিঠিতে লেখা ছিল—"ভাই ছোট বউ, গোটা পঁচিশ টাকা পাঠিয়ে দিস্। এঁদের বড় দুরবস্থা। এমন পয়সাও নেই যে গাড়ী ভাড়া করে চলে যাব। শশিভূষণ বোধহয় আমার জন্যে কত কাঁদে? নিধিকে দিয়ে যত শীগ্‌গীর পারিস টাকা পাঠিয়ে দিস্।" চিঠি পড়িয়া কুন্দ একটু হাসিল।

দুই তিন দিন কাটিয়া গেল। যোগেশ অস্থির হইয়া কুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বৌদিকে লিখে দিলে?" কুন্দ মিথ্যা করিয়া বলিল—"হাঁ, এখনও কোন জবাব পাই নি।" বিছানায় শুইয়া নিমিলিত নয়নে যোগেশ একটু হতাশভাবে

বলিলেন—"বোধ হয় চিঠি মারা গিয়েছে। আর একখানা দাও।" কুন্দ অভিমানের স্বরে বলিয়া উঠিল—"সে কথা কি আর তোমায় বল্‌তে হবে? নিধিকে আমি খাম আন্‌তে পাঠিয়েছি।"

আরও দুইদিন কাটিয়া গেল। যোগেশ আবার জিজ্ঞাসা করিল—"বৌদির কোন খবর পেলে?" কুন্দ বিষণ্ণভাবে উত্তর দিল—"কই, কিছুই ত পেলুম না।" স্বামীর নিকট হইতে কিছু শুনিবার প্রত্যাশা করিয়া কুন্দ থামিল। পরে তাঁহাকে নীরব দেখিয়া বলিল—"বোধ হয় তোমার উপর তাঁর রাগ হয়েছে।" যোগেশ অর্দ্ধতন্দ্রা অবস্থাতেই চকিতে প্রতিবাদ করিল—"কেন?" কুন্দ একটু স্তম্ভিত হইল। পরে বলিল—"সেদিন অমন করে মারা তোমার ভাল হয়নি। হাজার হ'ক, দিদি তাঁরে বুকে ধরে মানুষ করেছেন। একটা মায়া পড়ে ত? তাঁর মনে কি কষ্ট হয় নি? নিশ্চয়ই হয়েছে।" কথাগুলি এত বিষমাখান যে শুনিবামাত্রই যোগেশের মাথার যন্ত্রণা বাড়িয়া গেল। সে ক্রমাগত ভাবিতে লাগিল—তাই ত, বউদির মনে কষ্ট দিলুম। কুন্দ নির্ব্বিকার চিত্তে দেখিতে লাগিল, যোগেশের ম্লান গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। যোগেশ পাশ ফিরিয়া শুইতে শুইতে গভীর মর্ম্মবেদনার উচ্ছ্বাসে বলিয়া ফেলিলেন—"উঃ!" কুন্দ চমকিয়া উঠিল। সে ভাবিল মাথার যন্ত্রণাই তাহাকে কষ্ট দিতেছে। জিজ্ঞাসা করিল—"মাথায় কি একটু জল দেব?" যোগেশ বলিলেন—"না।" কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া যোগেশ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিলেন—"নিধিকে বৌদির কাছে পাঠিয়ে দাও। তাঁরে নিয়ে আসুক।" কুন্দ বলিল—"আচ্ছা।"

সকালে নিধিরামকে ডাকিয়া গোপনে তাহার হাতে একটি টাকা দিয়া কুন্দ বলিল—"দেখ নিধি, বাবু যখন জিজ্ঞাসা করবেন—বড়মার খবর কি, তুই বলিস—ভাল আছেন। বুঝ্‌লি ত?" নিধিরাম একেবারে বৃষকাষ্ঠের মত নির্জ্জীব হইয়া বলিল—"কেন মা?" কুন্দ একটু অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল—"কেন, সে কথা পরে বল্‌ব। এখন যা বল্‌ছি, শোন্।" নিধিরাম আরও গাধা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি মা?" কুন্দ এবার রাগিয়া বলিল—"এতক্ষণ তবে হাঁ করে কি শুন্‌লি?" কুন্দ তাহাকে সব কথা খুলিয়া বলিল। টাকা পাইয়া নিধিরামের আনন্দ আর ধরে না।

সন্ধ্যাবেলা যোগেশ নিধিরামকে জিজ্ঞাসা করিল—"বড়মার কি খবর নিধি?"

"তিনি ভাল আছেন বাবু।"

"আস্‌বার কথা তাঁরে বল্‌লি?"

"হাঁ। তিনি বল্লেন—হরিবাবুর অসুখ করেছে। সেরে উঠ্‌লে, আস্‌তে পারবেন না।"

"তুই দেখ্‌লি—হরিবাবুর অসুখ করেছে?" নিধিরাম ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল—কই, আমি ত কিছু দেখ্‌লুম না বাবু!" যোগেশ হতাশভাবে কুন্দের পানে চাহিয়া বলিল—"তুমি যা বলেছ, তাই ঠিক।" কুন্দের মনে বড় আনন্দ হইল সে ভাবিল, স্বামী নিশ্চয়ই দিদির উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন নিধিরাম চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া কুন্দের হাতে আবার একখানি চিঠি দিল। যোগেশ উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'কার চিঠি!" কুন্দ তাহা খুলিয়া দেখিল, সারদা দিয়াছেন। স্বামীর পানে চাহিয়া বলিল—"বাবার চিঠি। তাঁরা পশ্চিমে গেছেন।"

ক্রমে অসুখ বাড়িয়া গেল। কুন্দ ভয় পাইয়া বাপের বাড়ী খবর দিল। অনতিবিলম্বে তার বাপ চন্দ্রশেখর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুন্দ তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। চন্দ্রশেখর বলিলেন-"যোগেশের ত ভারি বুদ্ধি কম। বউদির ভায়ের ছেলেকে বিষয় দেওয়ার দরকার কি? এমন অসম্ভব কথা ত কোথাও শুনিনি।" কুন্দ বলিল—"তুমি ওঁরে নিয়ে চল বাবা। এখানে থাক্‌লে কোন দিন মাগী এসে পড়বে। আর কোন উপায় থাক্‌বে না।" চন্দ্রশেখর একটু চিন্তিতস্বরে বলিলেন—"এক কাজ করি- যোগেশকে আমার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সম্পত্তিটা তোর নামে লেখাপড়া করিয়ে নিই। কি বলিস্?"

"সেই ভাল কথা। নইলে পাঁচভূতে লুটে খাবে।"

চন্দ্রশেখর আসিয়া যোগেশের শয্যার পার্শ্বে বসিলেন। যোগেশ একটু চোখ খুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন—শ্বশুরমশাই আসিয়াছেন। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কতদূর বেড়িয়ে এলেন।" কুন্দ পূর্ব্বেই পিতাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল। চন্দ্রশেখর বলিলেন—"বৈদ্যনাথ গিয়েছিলুম। সেখানকার জলহাওয়া বেশ ভাল।"

"মনে কর্‌ছি, একটু ভাল হ'লে আমিও একবার সেথায় যাব।"

"বেশ ত বাবা। কিন্তু এখন তুমি আমার বাড়ীতে চল। এখানে তোমার লোকজন কম, তেমন সেবাশুশ্রূষা ত হচ্ছে না ?" "সে কথা ভাব্‌বেন না। বউদি এসে পড়লেই আর কারো দরকার হবে না।"

"বউদি তোমার আসেন কই ? পর কি কখনও আপনার হয়, বাবা ? ওটা তোমার বোঝবার ভুল।"

কুন্দ পাশে দাঁড়াইয়াছিল। দেখিল বাপের কথা শুনিয়া স্বামীর মুখ যেন হঠাৎ ম্লান হইয়া গিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"ও সব কথায় তোমার দরকার কি বাবা ? যে যারে যেমন দেখে।" পরে স্বামীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্ম বলিল—"দিদি আমাদের যে কত যত্ন করেন তা তুমি কি জান্‌বে বাবা ?" স্ত্রীর কথার উপর নির্ভর করিয়া যোগেশ বলিলেন—"বউদি যদি আমার পর হ'ন, তবে আপনার বলতে আমার কেউ নেই।" জামায়ের কথায় চন্দ্রশেখরের অপমান বোধ হইল। ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া কুন্দকে ডাকিয়া বলিলেন—"তবে আর আমায় ডেকে পাঠিয়েছিস্ কেন ? তোর দিদিকে নিয়ে আয়। আমি চল্লুম।" কুন্দ বলিল—"এমন সময়ে কি রাগ কর্‌লে চলে বাবা ? দিদি এলেই ত আমার সর্ব্বনাশ। যাতে বিষয়টা উদ্ধার হয় তার চেষ্টা করা কি ভাল নয় ?"

(৫)

কোন চিঠির উত্তর আসিল না দেখিয়া সারদা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ভোলানাথকে ডাকিয়া বলিলেন—"দাদা, আর ত থাকতে পারি না। একখানা গাড়ী করে আন, আমি চলে যাই।" ভোলানাথ ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিলেন—"টাকা কই বোন ? বাজারে এত দেনা হয়েছে যে কেউ আর ধার দিতে চায় না।" কুসুম আসিয়া বলিল—"একখানা চিঠিরও উত্তর এল না কেন বল দেখি ঠাকুরঝি ? আমার মনে হয় শশীর বাপ তোমার উপর রাগ করেছেন।" সারদা বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কেন, রাগের ত কোন কারণ হয় নি ?" ভোলানাথ বলিলেন—"হয় ত আমার উপর রাগ করেছে।" সারদা বলিলেন—"তা হতে পারে। তুমি তারে যে অপমান করেছ তা বলবার কথা নয়। এখানে আমার না আসাই ভাল ছিল।" কুসুম বলিল—"তাই ত বলি। ঘটে বুদ্ধি না থাকলেই এমন হয়। আগা পিছু ত কিছু ভাবেন না। যখন যা খেয়ালে এল করে ফেল্‌লেন। একে ত এম্নিতেই সংসার চলে না তার উপর দুটো লোক বাড়ল, এইবার মজাটা দেখুন।" ভোলানাথের পানে চাহিয়া সারদা একটু দুঃখিত স্বরে বলিলেন—"মিছে ঝগড়া করে কোন লাভ হবে না। তুমি একবার সেখানে যাও, দাদা। হয়ত তাদের কোন অসুখবিসুখ করেছে।" ভোলানাথ একটু শিহরিয়া বলিল—"বাপ্‌রে, আমি কি সেখানে যেতে পারি ? তারা কি মনে কর্‌বে ?" সারদা প্রতিবাদ করিলেন—"তারা সে রকম লোক নয় দাদা। তুমি যাও, কেউ কিছু মনে করবে না।" "না না তা হয় না। সে মুখ আমি রাখিনি।" সারদা কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন—"তবে হরিধনকে নিয়ে যাও। তুমি দূরে দাঁড়িয়ে থেকো, সে বাড়ীতে গিয়ে খবর নিয়ে আস্‌বে। না হয় আমাকে নিয়ে চল, আমি হেঁটেই যাব, গাড়ীর কোন দরকার নেই।"

"ব্যস্ত হচ্ছিস কেন ? তারা ভালই আছে।" সারদা অশ্রুপূর্ণ চোখে বলিলেন—"না দাদা, আমি আর এখানে থাক্‌তে পার্‌ব না। আমার মন বড় খারাপ হ'য়েছে। তোমার পায়ে পড়ি দাদা, আমার একটি কথা রাখ।" কুসুম স্বামীর উপর বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"গরীবের আবার মান অপমান কি ? যা বলছে শোন না।" ভোলানাথ রুষ্টস্বরে বলিলেন—"তুমি কেন বক্‌ছ ? তোমায় কি কেউ ডেকেছে ?" কুসুম বলিলেন—"শোন ঠাকুরঝি তোমার দাদার কথা। এই জন্যেই ত আমার সঙ্গে ওঁর ঝগড়া হয়। উচিত কথা উনি সহ্য করতে পারেন না।" ভোলানাথ রাগিয়া বলিলেন—"ভারি উচিতবক্তা! কেবল গরুর মত গাঁ গাঁ করে চিৎকার করলেই বুঝি উচিত বলা হ'ল ?"

এই সময় রামধন আসিয়া কাঁদিয়া বলিল—"মা দাদা মুড়ি কিন্‌লে না। এক পয়সার খাবার কিনে নিজে খেয়ে ফেল্‌লে।" কুসুম সরোষে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোর দাদা কোথায় গেল ?" সারদা বলিলেন—"রাগ কোরোনা বউদি, চিরকাল খাবার খেয়ে মানুষ হয়েছে, আজ কি সে মুড়ি খেতে পারে ? ছোটবউ-ই তারে আদর দিয়ে ঐ রকম করেছে।" কুসুম বলিলেন—"ছোটবৌ বুঝি হরিকে খুব আদর দিত ?" "বুকে করে রাখত। আজ ঘুড়ি, কাল মার্‌বেল। যখন যা আবদার নিয়েছে, তাই দিয়েছে।" কুসুম ভোলানাথের পানে চাহিয়া বলিলেন—"ওগো, শুনছ ? এমন লোকেদের তুমি অপমান করে এলে ? সাধে কি বল্‌তে ইচ্ছে হয়, ঘটে

একটু বুদ্ধি নেই ?" ভোলানাথ বলিলেন—"বেশ, সবই যদি আমার দোষ, তোমরা সংসার কর, আমি বিদেয় হই।" কুসুম বলিলেন—"তা'ত হবেই। এখন যে শত্রুবানী। তোমার আর দোষ দোব কি ? তোমার বাপমায়ের দোষ।" সারদা এইবার বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"বাপ-মায় কথা তুলে কি হবে বউদি ? সবই তোমার অদৃষ্ট।" ভোলানাথ একবার বিস্ফারিত নেত্রে স্ত্রীর পানে চাহিয়া পরক্ষণেই মুখ ফিরাইয়া সারদাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"সারদা, দুঃখ মানুষের হাতেগড়া জিনিষ। দরিদ্র বটে, কিন্তু আমার চেয়েও অধিক দরিদ্র আছে দেখে আমি সুখে ছিলাম। আজ কয়দিন হ'ল আমার মনের শান্তি নষ্ট হয়েছে। সংসারে স্ত্রীর সহানুভূতি স্বামীর সকল দুঃখে সান্ত্বনা। উপবাসে থাক, অনিদ্রায় থাক, কোন কষ্ট হবে না, যদি স্ত্রীর মুখ না মলিন দেখতে হয়। কিন্তু সেই স্ত্রী যদি মুখরা হয়, হীরের খনির মধ্যে থাকলেও তা কয়লা হয়ে যায়, সারদা।" সারদা দেখিলেন, কথাগুলি বলিতে বলিতে ভোলানাথের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। কুসুম কি একটা প্রতিবাদ করিবার জন্য হা করিতেই সারদা বলিলেন—"বউদি, দাদার মনে তুমি কষ্ট দিও না। একে অর্থাভাব, তার উপর সদ্ভাবের অভাব হ'লে, কষ্টের সীমা থাক্‌বে না। শুধু তাই নয়, বাড়ীতে সর্ব্বদা ঝগড়াঝাটি হ'লে ছেলেরাও তাই শিখ্‌বে। কেবল শাসনে রাখলে শিক্ষা দেওয়া হয় না। ভাল হ'য়েই তাদের শেখাতে হয়, ভাল কাকে বলে। তুমি মনে কর, দাদা বুঝি তোমার কথা শোনেন না। কিন্তু এটা তোমার বোঝবার ভুল। তোমাদেরই কষ্টে দাদা পাগলের মত হয়েছেন, তাই সকল সময় তাঁর মন স্থির থাকে না। ভাল কথায় ভুল যত বুঝিয়ে দেওয়া যায়, মন্দ কথায় তার অর্দ্ধেকও হয় না।" কুসুম তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন—"আচ্ছা লো আচ্ছা, আর বক্তৃতা দিয়ে কাজ নেই। নিজেকে সকলেই খুব বুদ্ধিমান মনে করে।"

(৬)

যোগেশ শ্বশুরবাড়ী যাইতে চাহিলেন না। চন্দ্রশেখর অগত্যা বাড়ী ফিরিলেন। কুন্দ কুপিতকণ্ঠে স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—"বাবা ত ভাল কথাই বল্লেন, শুনলে না কেন ?" যোগেশ ধীরে ধীরে বলিলেন—"এইবার একবার নিধিকে পাঠিয়ে দাও, বউদিকে নিয়ে আসুক। সঙ্গে কিছু টাকাও পাঠিয়ে দিও। হরিধনের বাপের অবস্থা তেমন ভাল নয়।" কুন্দ মুখ ভার করিয়া বলিল—"তুমিই কেবল বউদি বউদি কর—তাঁর প্রাণে ত একটুও মায়া নেই। চিঠির উপর চিঠি দিচ্ছি, নিধিকে দিয়ে বলে পাঠালুম তোমার অসুখ, তবু কি একবার দেখতে এলেন ? আর আসবেনই বা কেন ? তুমি তাঁর ছেলেটাকে কোন দিন মেরে ফেলবে, সে ভয় কি তাঁর নেই ? সে দিন ত তোমার মুখের উপর বলে গেলেন—এমন করে মারা ভাল হয় নি।" যোগেশ নীরব রহিলেন।

রাত্রে যোগেশের পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। কুন্দকে ডাকিয়া বলিলেন—"একটু জল দাও।" কুন্দ জল আনিয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে যোগেশ জিজ্ঞাসা করিল—"কুন্দ তা হ'লে কি হবে ?"

"কিসের কি হবে।"

বউদি যদি রাগ করে থাকেন ?"

কুন্দ নীরব রহিল। ঘণ্টা দুই অতীত প্রায়। কয়েক রাত্রি জাগরণের পর আজ কুন্দের একটু তন্দ্রাবেশ আসিয়াছে, হঠাৎ যোগেশ ভয়বিহ্বল স্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল। কুন্দ চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"অমন করছ কেন ?" যোগেশ একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন—"কিছু নয়। স্বপ্ন দেখেছিলুম।" কুন্দ বড় ভয় পাইল।

সকালে উঠিয়া কুন্দ দেখিল, যোগেশ যেন কি রকম হইয়া শুইয়া আছে। ডাকিয়া কোন সাড়া পাইল না। তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া নিধিকে ডাকিয়া বলিল—"নিধি, শীগ্‌গির একখানা গাড়ি করে বড়মাকে নিয়ে আয়।" কাছে শশিভূষণ দাঁড়াইয়াছিল। বলিল—"মা, বড়মা আর আসেন না কেন ?" কুন্দ শঙ্কিত স্বরে বলিল—"কি জানি বাবা।" তারপর একবার তারে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া চাপিয়া ধরিল। বোধ হয় এইবার অনুতাপের সূচনা হইয়াছে। এতদিন যে কল্পনা তার সুখের ছিল, আজ তার স্মরণ মাত্রেই শরীর শিহরিয়া উঠিল। হঠাৎ শশিভূষণকে পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে স্বামীর কাছে চলিয়া গেল। তার পদশব্দ শুনিতে পাইয়া অবসন্নভাবে যোগেশ জিজ্ঞাসা করিল—"বউদি এসেছ ?" কুন্দের বুক ফাটিয়া গেল। একবার ভাবিল স্বামীর পা'দুটি জড়াইয়া ধরিয়া নিজের দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিবে। কিন্তু পরক্ষণেই সঙ্কোচ

আসিল। ধীরে ধীরে যোগেশের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন আছ?" যোগেশ নিমিলিত নয়নে উত্তর দিল—"ভাল আছি।"

সন্ধ্যাবেলা অশ্রুপূর্ণ চোখে সারদা আসিয়া যোগেশের সংজ্ঞাশূন্য মাথাটি কোলের উপর তুলিয়া নিলেন। ভোলানাথ কলিকাতা হইতে বড় ডাক্তার লইয়া গেলেন। শরীরের নানাস্থান পরীক্ষা করিয়া বাহিরে আসিয়া একটু মাথা নাড়িয়া ডাক্তার ভোলানাথকে বলিলেন—"অবস্থা বড় সঙ্কট। কিন্তু এখনি তেমন ভয়ের কারণ দেখি না।"

রাত্রে যোগেশ প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিলেন—"এইটুকু তুমি ক্ষমা করতে পারলেনা বউদি?" সারদা আবেগ ভরে কাঁদিয়া বলিলেন—"ঠাকুরপো, কি ক্ষমা করব? কি কথা, বল।" কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ, হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে যোগেশ আবার বলিল—"তুমি বলেছিলে কি না বল? কেবল আমার দোষ দিলে ত চল্‌বে না?" রাগে যেন তার কোটরগত চক্ষু দুটি রক্তবর্ণ হইয়া ঠেলিয়া উঠিল। বাপের চিৎকারে শশিভূষণ জাগিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। হঠাৎ যোগেশের মুখপানে চাহিয়া আতঙ্কে মার কাছে সরিয়া গিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"মা, বাবার কি হয়েছে?" কুন্দর অনুতাপে যেন আহুতি পড়িল। সে ভাবিল, সারদার পায়ের উপর পড়িয়া, কিছুক্ষণ কাঁদিয়া বুকটাকে হাল্‌কা করিয়া লইবে,—কিন্তু সেই সঙ্কোচ! স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ সে কেমন করিয়া স্বীকার করে? কুন্দ শশিভূষণকে বক্ষে ধরিয়া বিছানায় মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। সারদা নিজের চোখের জল নিজের আঁচলে মুছিয়া কুন্দকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"এতদিন কি আমি ম'রে ছিলুম বউ? একেবারে এমন সময়ে খবর দিলি?" যোগেশ আবার জাগিলেন। শূন্যপানে হাত বাড়াইয়া দিয়া মিনতির স্বরে বলিলেন—"এই নাও বউদি, সম্পত্তির দলীলপত্র। হরিধনকে অর্দ্ধেক ভাগ করে দিলুম।" সকলেই দেখিল, যোগেশের অর্দ্ধনিমিলিত ম্লানচক্ষু বহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। সারদা তার বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। ভোলানাথ আসিয়া বলিলেন—"সারদা, তুই অত ব্যাকুল হয়ে' পড়লে ত চল্‌বে না। কপালে একটা জলপটী দিয়ে দে।" যোগেশ এইবার উঠিয়া বসিলেন। প্রলাপভরে অস্পষ্টভাবে কি বলিতে লাগিলেন। ভোলানাথ জোর করিয়া তাহাকে শোয়াইয়া দিলেন।

প্রভাতে যোগেশের চৈতন্য হইল। সারদার পানে চাহিয়া অভিমানভরে কাঁদিয়া বলিলেন—"আর একটু পরে আসতে পারনি বউদি?" কুন্দের বুক ভাঙ্গিয়া গেল। সারদা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই যোগেশের পায়ের উপর উবুড় হইয়া কাঁদিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত পরে রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল—"ওঁর কোন দোষ নেই।" কুন্দ আর বলিতে পারিল না। তার সর্ব্বশরীর অবশ হইয়া পড়িল। ব্যাপার বুঝিতে যোগেশের বিলম্ব হইল না। সস্নেহে কুন্দের হাতখানি টানিয়া লইয়া নিজের বুকের উপর রাখিয়া বলিল—"সামান্য মাটির জন্যে আমায় মেরে ফেল্‌লে, কুন্দ?" কুন্দ লাফাইয়া মেঝের উপর পড়িল। প্রাণের যাতনায় মাথার চুলগুলি ছিঁড়িতে লাগিল। পরে কাঁদিতে কাঁদিতে পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া সারদার বুকের উপর পড়িল—"দিদিগো, কি কর্‌লুম?" সারদা চোখের জল মুছিয়া বলিলেন—"ভয় কি বোন্! ঠাকুরপো নিশ্চয়ই সেরে উঠ্‌বে।" কুন্দ ভয়ে কম্পিত হস্তে সারদার পায়ের ধুলা লইয়া স্বামীর মাথায় দিয়া বলিল—"দিদি, তুমিই ঠাকুর, তোমার আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হবে না।"

বাস্তবিক সেইদিন হইতেই যোগেশ আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অজ্ঞের ঈর্ষ্যা।

পয়সা, দেখিয়া ক্ষুদ্র শীর্ণ সিকিটিরে,
অবজ্ঞায় তার পানে চাহিল না ফিরে।
সিকি ভাঙ্গাইয়া এ কি! ষো-ল-গু-ণ তার।
পয়সা লজ্জায় মুখ তুলিল না আর।

শ্রীসতীশচন্দ্র সেন গুপ্ত।

শিক্ষায় এদেশ ও বিদেশ

(১)

শিক্ষাই জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি। জাপান আমেরিকা ও জর্ম্মাণীর দ্রুত উন্নতির মূলসূত্র সেই সকল দেশের শিক্ষা প্রণালীকে অবলম্বন করিয়াই অগ্রসর হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসন্ধান সমিতির সভাপতি মিঃ স্যাড্‌লার জর্ম্মাণির শিক্ষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"German education has made the nation alert to science. It has made systematic co-operation a habit. It has taught patriotic duty. It has kept a whole people industrious. Combined with military training it has given them the strength of discipline. It has made profitable use of second rate intelligence. It has not neglected the mind

'জার্ম্মাণীর শিক্ষা-প্রণালী সমগ্র জাতিকে বিজ্ঞানে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে। সমবায়ে তাহাকে একেবারে অভ্যস্ত করিয়াছে। ইহা দেশের প্রতি কর্ত্তব্য শিক্ষা দিয়াছে। সমগ্র জাতিকে কর্ম্মিষ্ঠ ও অধ্যবসায়ী করিয়া তুলিয়াছে। সামরিক শিক্ষার সহিত মিলিত হইয়া, এই কর্ম্মশক্তি সংযম শৃঙ্খলার গুণলাভ করিয়া আরও বলীয়ান হইয়া উঠিয়াছে। ইহা দ্বারা দেশের সাধারণ চলন সই বুদ্ধিকেও সফল কর্ম্মানুযায়ী করিয়াছে। শিক্ষাপ্রণালী মানসিক উন্নতির প্রতিও তিলমাত্রও উদাসীনতা প্রকাশ না করিয়া উহাকে পুরাপুরি কাজে লাগাইয়াছে।'

জাপানের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৪॥০ কোটী। তথায় ৬ হইতে ১৪ বৎসর বয়সের বালক বালিকার সংখ্যা পয়ষট্টি লক্ষ। ইহাদিগের শিক্ষার সুব্যবস্থার জন্য জাপানের মত ক্ষুদ্রদেশে ২৬ হাজার বিদ্যালয় বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেদেশে বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযুক্ত বয়সের প্রত্যেক বালক বালিকাই বিদ্যা শিক্ষা করে। জাপানে টেক্‌নিকেল বিদ্যালয়ের সংখ্যাও ৫৬৮২টী। উন্নত শিক্ষাপ্রণালীর সাহায্যে জাপানের প্রত্যেক অধিবাসী তাহার মানসিক শক্তির যথোপযুক্ত বিকাশের সুযোগ লাভ করিয়া সমগ্র জাতিকে শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে স্কটল্যাণ্ডই শিক্ষায় অগ্রগণ্য। তথাকার একচতুর্থাংশ লোক বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পায়। তাহার ফলে ব্যবসা, বাণিজ্য ও রাষ্ট্রীয় কার্য্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র স্কচম্যান্‌রা উন্নত স্থান অধিকার করিতেছে।

এ সকল দেশে শিক্ষাকে সরকারের তরফ হইতে অত্যাবশ্যকীয় কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে। তাহারা জানে যে বর্ত্তমান শিক্ষাবিধানই ভবিষ্যতের জাতিকে গড়িয়া তুলিবে। ভবিষ্যতে স্বজাতিকে শক্ত ও সবল করিয়া তোলাই তাহাদের প্রধান রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য। সেই জন্য কিছু মাত্র অভাবের অজুহাত না দেখাইয়া তাহারা এই উদ্দেশ্যে অকাতরে অর্থব্যয় করে। এ সকল দেশের ছাত্রগণ খুব অল্প ব্যয়ে বিদ্যালাভ করিতে পারে।

আমাদের দেশে অনেকের বিশ্বাস বিদ্যালয়ে মূল্য যত বেশী দেওয়া যায়—শিক্ষা বুঝি ততই পাকা হয়। তাই efficiencyর দোহাই দিয়া এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থের দাবী ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে।

অথচ ইয়োরোপের যে সকল জাতি উচ্চ শিক্ষায় যথার্থ উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহাদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের উপর অর্থের দাবী ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে।

ফরাসীদেশ যে ইয়োরোপের মধ্যে উচ্চশিক্ষায় খুব উন্নত একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। ফরাসী জাতি উন্নত শিক্ষার ফলে, জ্ঞানের গভীরতায়, হৃদয়ের উদারতায়, সমগ্র ইয়োরোপীয় সভ্যতার শিরোভূষণ। সেই ফরাসী দেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিদ্যালয়ের নাম College de France,—পৃথিবী বিশ্রুত মনীষীগণ এই বিদ্যালয়ে জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে গভীর গবেষণায় নিযুক্ত থাকেন। ইহাতে বিজ্ঞানাগারের লব্ধ তত্ত্ব পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রদ্ধার সহিত স্বীকৃত হয়। এই বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক।

আমাদের দেশের বিদ্যার্থিগণ অত্যন্ত দরিদ্র। ব্যবসায় বাণিজ্যে অপটু বলিয়া বাঙ্গালীরা নির্ধন। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত

শ্রেণীর আর্থিক অবস্থা বর্ত্তমানে অত্যন্ত শোচনীয়। আর্থিক দীনতার অন্তরালে প্রতিভার অগ্নি ইহাদের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ফরাসী জাতির মতই ইহাদের হৃদয় উদার। যে কোনও মহান্ আদর্শ ইহাদের হৃদয়কে সহজে উদ্বেলিত করে। ফরাসী জাতির মত শিক্ষার উপযুক্ত সুযোগ লাভ করিলে—এই জাতি জগতের মধ্যে একটী মহান্ ক্ষমতা গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইবে। অর্থাভাবে ইহারা অধ্যয়ন করিতে পারিতেছে না। বঙ্গীয় যুবকগণ মানসিক শক্তিতে জগতের কোনও জাতি অপেক্ষা হীন নহে। যথাযোগ্য শিক্ষালাভের অভাবে এই বৃহৎ শক্তির অপচয় হইতেছে বলিয়া আমরা পাছু হইয়া রহিয়াছি। efficiencyর দোহাই দিয়া যাহারা এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নত কলেজগুলিতে ক্রমাগত ব্যয় বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা কথায় কথায় ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবেতনের দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেন। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে ইংলণ্ডের উচ্চ-শিক্ষার ব্যবস্থায় যে গুরুতর গলদ রহিয়াছে, তাহা সে দেশের শিক্ষা-জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অগ্রণীগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। সেই জন্যই হ্যাণ্ডেন, ফিশার প্রভৃতি মনীষীগণ ইংলণ্ডের শিক্ষা-সংস্কারের জন্য এতটা ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছেন।

শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে কতকগুলি বিষয়ে অনুকূলতার একান্ত প্রয়োজন।—

১। শিক্ষা যে জাতীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পক্ষে একান্ত আবশ্যকীয় এই ভাবটা দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে যথেষ্টরূপে অনুভূত হওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশে এখনও অধিকাংশ লোকই শিক্ষাকে কেবলমাত্র জীবিকার উপায় স্বরূপ বলিয়া মনে করেন। প্রাচীন ভারতে শিক্ষাকে আত্মার বিকাশের উপায় স্বরূপ মনে করিত বলিয়া তাহার আদর্শ অর্থকরী ছিল না। আচার্য্যেরা শিষ্যের আত্মাকে শিক্ষাদ্বারা উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন। দেশে যাহাদের অর্থ ছিল তাহারা বিদ্যা বিতরণের সাহায্যার্থে তাঁহা দান করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিত। তাহারই ফলে বৌদ্ধযুগে ভারতে সাধারণের গৃহে শিক্ষার অন্ন বিতরিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে শিক্ষার প্রতি সমগ্র জাতির তেমন শ্রদ্ধা নাই। অর্থের স্বার্থ ব্যতীত যেন বিদ্যার আর কোনও প্রয়োজন নাই। সর্ব্বসাধারণের উপযুক্ত সহানুভূতির অভাবই এদেশে শিক্ষা-বিস্তারের প্রধান অন্তরায়। আমাদের অভিভাবকবর্গও তাহাদের সন্তানগণের মন ও আত্মার যথার্থ কল্যাণের প্রতি উদাসীন। শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্থকরী বলিয়া যাহাদের ঘরে অর্থ রহিয়াছে, তাহারা কষ্ট করিয়া বিদ্যা অর্জ্জন করিতে নারাজ। এই জন্য এই দেশের ধনী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চশিক্ষা লাভের প্রয়াস খুবই কম দেখিতে পাওয়া যায়।

২। যে দেশের জনসাধারণের মধ্যে অতি প্রাচীন কাল হইতে নানাবিধ অনুষ্ঠান জাগ্রত থাকিয়া, অজ্ঞাতসারে জাতির মানসিক শক্তিকে বলিষ্ঠ করে, তাহার সৌন্দর্য্য-বোধকে বিকশিত করিয়া তোলে, এবং তাহার আধ্যাত্মিক জীবনের বৃহত্তর আদর্শকে জাগ্রত করিয়া রাখে,—সে জাতির মধ্যে অতি অল্প প্রয়াসে শিক্ষার উন্নত আদর্শকে সহজে কার্য্যকরী করিয়া তোলা যায়। আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে যাত্রা, কবি, পাঁচালী, কথকতা ও রামায়ণ গান প্রভৃতি জাতীয় অনুষ্ঠান সমূহ এ বিষয়ে আমাদের জনসাধারণের অন্তরের রসবোধকে জাগ্রত রাখিয়া প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছে। কারণ যাহারা শিক্ষা লাভ করিবে, তাহাদের জীবনের মানসিক উপাদানগুলি, অন্যান্য দেশের জনসাধারণ অপেক্ষা অধিকতর উন্নত ও মার্জ্জিত।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের রাজা প্রজা উভয়ের তরফ হইতেই জনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে। কৌন্সেলে এ সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থার প্রস্তাব উপস্থিত করা হইতেছে। দেশের সরকারী ও বেসরকারী সকলের মনেই যখন শিক্ষা সমস্যার আলোচনা উপস্থিত হইয়াছে—তখন অন্য দেশের শিক্ষাসম্বন্ধে আলোচনা করিলে হয়তঃ কিছু ফল ফলিতে পারে। তাই আমেরিকার অধিবাসিগণ, তাহাদের দেশের সর্ব্বসাধারণকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য, যে শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়াছে—তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।—

একথা বোধ হয় সকলেরই জানা আছে যে ইয়োরোপের নানা দেশ হইতে অতি নিম্নস্তরের লোকেরা আমেরিকায় গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে। আমেরিকায় প্রধান লক্ষ্য হইতেছে অত্যল্পকালের মধ্যে এই অনুন্নত জনসমূহকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণের উপযোগী করিয়া তোলা। এই জন্য এই নবীনজাতি জগতের যেখানে যাহা কিছু ভাল আদর্শ তাহাই যথাসম্ভব পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে।

ইয়োরোপ হইতে বিশাল সমুদ্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আমেরিকার একটা সুবিধা হইয়াছে এই যে, সে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শিক্ষা-প্রণালীকে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া গ্রহণ করিতে পারে। এই সকল নানা কারণে সেদেশ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রণালীর উপযুক্ত পরীক্ষাক্ষেত্র হইয়াছে।

ইংলণ্ড বা জর্ম্মাণীর মত আমেরিকা সম্পূর্ণ শিল্পজীবী দেশ নহে। কৃষিও আমেরিকার প্রধান অবলম্বন। ১৯১৫ খৃঃ অব্দে মার্কিণরাজ্যে স্কুল কলেজের সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ; তাহাতে ২ কোটী ২০ লক্ষ ছাত্র অধ্যয়ন করে। ইহার মধ্যে অধিকাংশই সরকারী বিদ্যালয়। প্রাইভেট্ বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ২১ লক্ষ ৭৩ হাজার মাত্র। অর্থাৎ শতকরা ৯০টী ছাত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা ষ্টেট্ করিতেছেন। প্রত্যেক ষ্টেটের হস্তে স্থানীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ভার। ফেডারেল্ গভর্ণমেণ্ট * খুব সামান্য কয়েকটি মাত্র অনুষ্ঠানকে পরিচালনা করে। নৌবিদ্যা, সামরিক বিদ্যা শিক্ষার ভার এই ফেডারেল্ গভর্ণমেণ্টের হাতে। এতদ্ব্যতীত Red Indians, Alaskans, Hawaiians, Philipinos, Samoans প্রভৃতির শিক্ষার ভারও এই ফেডারেল্ গভর্ণমেণ্টের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে।

এমন কি আমেরিকায় নিগ্রোদের রাষ্ট্রীয় অধিকার আছে বলিয়া তাহাদের শিক্ষার ভারও স্থানীয় ষ্টেট্ অথবা মিউনিসিপাল্টী গ্রহণ করিয়াছে। ১৯১২ খৃঃ অব্দের সেন্সাস্ অনুযায়ী সমগ্র মার্কিণ রাজ্যের অধিবাসীর সংখ্যা ৯ কোটী ৬০ লক্ষ। তন্মধ্যে ৫ বৎসর হইতে ১৮ বৎসরের বালকের সংখ্যা ২ কোটী ৫০ লক্ষ। ইহার মধ্যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে ২ কোটী ২০ লক্ষ। তবেই দেখা যাইতেছে যে ৫ হইতে ১৮ বৎসরের যত বালক আছে, তন্মধ্যে শতকরা ৮৪ জনের বেশী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। অবশ্য একথা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে নিগ্রোদের মধ্যে শতকরা ৩০ জন অশিক্ষিত এবং নবাগত ঔপনিবেশিকদের মধ্যে অশিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ১২। এই নিগ্রো ও নবাগতদিগকে হিসাবে ধরিয়াও আমেরিকায় শতকরা ৭ জন মাত্র অশিক্ষিত।

এই ৯ কোটী ৬০ লক্ষ অধিবাসীর শিক্ষার জন্য আমেরিকা ১৯১২ খৃঃ অব্দে ১৪৯ কোটী টাকার অধিক ব্যয় করিয়াছে। গত কয় বৎসরে আমেরিকার শিক্ষা বিভাগের ব্যয় বৃদ্ধি হইয়া বর্ত্তমানে ৩০০ কোটীতে উঠিয়াছে।

এই উপলক্ষে আমাদের ভারতবর্ষের কথাটা বলিয়া রাখিতেছি। বৃটিশ ভারতের অধিবাসীর সংখ্যা ২৪ কোটী ৪৫ লক্ষ। আমেরিকার প্রায় আড়াই গুণ। অথচ ১৯১৪ খৃঃ অব্দে ভারত-সাম্রাজ্যের শিক্ষার জন্য ব্যয় হইয়াছে ১০ কোটী টাকা মাত্র। অর্থাৎ ভারতের জনসংখ্যা আমেরিকার আড়াইগুণ বলিয়া সেই অনুপাতে শিক্ষাব্যয়ের পরিমাণ হওয়া উচিত ছিল ৭৫০ কোটী মুদ্রা। কিন্তু সেই স্থলে ১৯১৪ খৃঃ অব্দে এদেশে ব্যয়িত হইয়াছে মাত্র ১০ কোটী। অর্থাৎ আমেরিকার তুলনায় তাহার ৭৫ ভাগের একভাগ মাত্র। ইহার উপর মন্তব্য অনাবশ্যক।

আমেরিকায় প্রাথমিক শিক্ষার ভার প্রধানতঃ স্থানীয় ষ্টেট্ গুলির উপর ন্যস্ত রহিয়াছে একথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ১৯১৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৬টী ব্যতীত আমেরিকার সকল ষ্টেটেই বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত ছিল। ১৯১৫ খৃঃ অব্দে South Carolina, Florida, Albana, Teras এ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়।

বর্ত্তমানে কেবল Georgia এবং Mississipi ব্যতীত সমগ্র আমেরিকায় ৮ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক শিশুকেই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে হয়।

আমাদের দেশে অনেকে বলেন যে শিক্ষা অবৈতনিক হইলেই যথেষ্ট। বাধ্যতামূলক হওয়ার প্রয়োজন নাই। আমেরিকার অনুন্নত ষ্টেট্ গুলিও তাই মনে করিত। কিন্তু পরে দেখা গেল যে Massachusset ষ্টেট্ এ বাধ্যতামূলক শিক্ষা ছিল বলিয়া সেখানে অশিক্ষিত অধিবাসীর সংখ্যা শতকরা একটী মাত্র, কিন্তু দক্ষিণ Carolinaতে শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল না বলিয়া তথায় অশিক্ষিতের সংখ্যা শত-

---

* আমেরিকা বলিতে সাধারণতঃ আমরা উত্তর আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেটেস্ (United States) নামক, দেশটি বুঝি। অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন ষ্টেট্ বা রাজ্যের সম্মিলনে, এই দেশটি হইয়াছে। প্রত্যেক ষ্টেটের আভ্যন্তরিক শাসন একেবারে স্বতন্ত্র। সমান স্বার্থ এবং বহির্জ্জগতের সঙ্গে সমান সম্বন্ধ রাখিবার জন্য এই ষ্টেটগুলির একটা সম্মিলন বা ফেডারেশন (Federation) আছে। সকল ষ্টেটের প্রতিনিধিদের লইয়া এই ফেডারেশন সংক্রান্ত যে গবর্ণমেণ্ট, তাহারই নাম ফেডারেল গবর্ণমেণ্ট।

ক্ষা ১১ জন। এই দুই ষ্টেট্ এর মধ্যে শিক্ষায় অনুন্নত Carolina সর্ব্ববিষয়ে প্রতিবেশী ষ্টেট্ এর তুলনায় পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িতেছে ইহা অনুভব করিয়া উক্ত ষ্টেটের অধিবাসিগণ অবশেষে তাহাদের জিলায়ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছে।

আমেরিকান গভর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের প্রতি বেতনে সার্ব্বজনীন শিক্ষার যে আদর্শ উল্লেখ করা হইয়াছে, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

Within the year there has been in this country an increase in tendency towards democracy in education, towards giving every child of whatever condition, a full and equal opportunity will all other children for that degree and kind of education, that quality and quantity of education, which will develop in fullest measure its manhood or womanhood, its human qualities prepare it for the duties and reesponsibilities of democratic citizenship for participation in civic and social life and for making an honest living, contributing its part to the commonwealth, and serving humanity by some useful occupation followed intelligently and skillfully with good will and strong purpose. (Report of the commissioner of Education. U. S, 1915,)

ইহার সার মর্ম্ম এই "বিগত বৎসর এদেশে শিক্ষায় সার্ব্বজনীনতার দিকে ঝোঁক বাড়িয়াছে। যে অবস্থারই হউক না কেন, প্রত্যেক শিশুকে অন্য সকল শিশুর সহিত শিক্ষালাভের পুরাপুরি সমান সুযোগ দিতে হইবে। তাহাতে তাহাকে এমন ধরণের ও এই পরিমাণের ব্যাপক ও গভীর শিক্ষালাভের সুযোগ দিতে হইবে, যদ্দ্বারা তাহার মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ সম্ভবপর হয়। সেই শিক্ষাব্যবস্থার ফলে সে ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণে সমর্থ হইবে, এবং রাষ্ট্রের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত বুদ্ধি ও কৌশলের দ্বারা নানা মঙ্গল কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া মানব-সমাজের কল্যাণ সাধন করিবে।"

আমেরিকা গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র। Democracyর প্রধান লক্ষ্যই হইতেছে এই যে ষ্টেটের প্রত্যেক মানুষকেই আত্মরক্ষার এবং আত্মবিকাশের সমান সুযোগ দেওয়া। তাহার প্রধান উপায় শিক্ষা। অতএব শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্যের একান্ত প্রয়োজন। আমেরিকান শিক্ষাসচিবের একথা প্রত্যেকেরই অন্তরে গ্রথিত রাখা উচিত যে—"If democracy has any value and ultimate meaning it is equality of opportunity. But there can be no equality of opportunity without equality of opportunity in education."

'ডিমক্রেসীর প্রধান লক্ষ্য যদি হয় মানুষ মাত্রকেই আত্মবিকাশের সমান সুযোগ দেওয়া, তবে খুবই জোরের সহিত আমরা একথা বলিতে পারি যে গোড়ায় শিক্ষার সমান সুযোগ না লাভ করিলে অন্য কোনও বিষয়ে সমান সুযোগ লাভ সম্ভবপর হইবে না।'

শিক্ষার অভাবে মানুষ তাহার রাষ্ট্রীয় স্বার্থ বুঝিয়া আদায় করিতে সমর্থ হইবে না। সমগ্র জাতির সহিত তাহার ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধ যে কি তাহাও সে অনুভব করিতে পারিবে না। শিক্ষা ব্যতীত সে কোনও প্রকার অধিকার লাভের উপযোগী হইতে পারিবে না।

শিক্ষাক্ষেত্র হইতে আভিজাত্যকে দূর করিতে হইবে। প্রাচীনভারতে শিক্ষায় বর্ণের আভিজাত্য ছিল, কিন্তু ধনের অভিজাত্য ছিল না।

বৌদ্ধযুগে শিক্ষায় বর্ণ ও ধন কোনও প্রকারের আভিজাত্যই ছিল না।

ভারতবর্ষ ধনের দোহাই দিয়া সরস্বতীর পবিত্র মন্দিরের সম্মুখে দরিদ্রের পক্ষে প্রবেশ নিষেধের ছাপ আঁটিয়া দেয় নাই। তাই এদেশে শিক্ষা ছিল অবৈতনিক।

বর্ত্তমান সময়ে এদেশে যে কয়টি অবৈতনিক উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ ছিল, একে একে তাহার দরজা দরিদ্রের পক্ষে চিররুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। গত দশবৎসরে উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজে ক্রমাগতই বেতন বাড়িয়া চলিয়াছে। এই অনুপাতে আরও কয়েকবৎসর চলিলে দরিদ্রকে সরস্বতীর মন্দির হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হইবে।

পৃথিবীর মধ্যে অর্থে ও শিক্ষায় এদেশের জনসাধারণ

সর্ব্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ, অতএব এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রেই ডিমক্রেসীর প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

সম্প্রতি কোনও কোনও কলেজে বেতনবৃদ্ধির আলোচনা উপস্থিত হওয়ায় সমগ্র বঙ্গদেশ হইতে তাহার প্রতিবাদ উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। যাহারা শিক্ষাদ্বারা বাংলাদেশে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিবার শুভ আকাঙ্ক্ষা অন্তরে পোষণ করেন তাহাদিগকে একথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে—

শিক্ষাক্ষেত্রে বর্ণের আভিজাত্য, ধনের আভিজাত্য চলিবে না। দারিদ্র্যের অজুহাতে আমরা যদি কোনও বালককে বিদ্যামন্দিরের দরজা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেই,—অজ্ঞানতার অন্ধকারে তাহার জীবন যদি বর্দ্ধিত হয়, তবে আমরা একটী আত্মার যে সর্ব্বনাশ করিলাম স্বয়ং ঈশ্বরও তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে সক্ষম হইবেন না।

শ্রীকালীমোহন ঘোষ

বরষায়।

ধরণীর তাপদগ্ধ আকুল হৃদয়োপরে
সজল তরল ওই বরষা পড়িছে ঝরে।
জীবের জীবনসম সুধাধারা স্নিগ্ধ জল
মুকুতার দল সম ঝরিতেছে অবিরল।
অমনি বিমল স্নিগ্ধ অমনি তরল হাসি
কাহার কোমল মুখ জাগিতেছে প্রাণে আসি।
সেদিনো আমার ছিল আজি সে কোথায় হায়,
কাঁদে কি আমারে স্মরি আজি এই বরষায়।
জলধর ডাকে ওই সুগভীর গরজনে
কোথায় লুকাবে মুখ আজি সে অভয় মনে।
ভুলি নাই সেই স্পর্শ সেই দুটি বাহু দিয়া
হৃদয়ে লুকাত মুখ গলা মোর জড়াইয়া।
কচি দুটি হাতে হায় বাঁধিত কঠিন করে
তখনো জানে না বুঝি ছেড়ে যাবে চিরতরে।
ঘনঘোর বরষায় চমকি চপলা খেলে
আজি সে কোথায় আছে সেথা কি আদর মেলে
পেয়েছে জননী কি গো মম সম ভালবাসে
শ্রান্ত শিশু তনু তার স্নেহে বাঁধে বাহুপাশে?
অথবা সে গৃহহারা কাঁদিছে আমারে স্মরি,
আঁখি বয়ে পড়ে বুঝি অবিরল অশ্রুবারি!
আমি যে ধরায় হেথা কাঁদিতেছি তোরে স্মরে
আয় ওরে প্রাণাধিক ব্যথিত এ বক্ষে ফিরে!
শোকের এ তীব্রদাহে দহিছে হৃদয় মম
সজল বরষা-সম পাব কি সে প্রিয়তম!

শ্রীমতী মনোরমা দেবী।

আমাদের দীক্ষা।

(১)

আমি এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা সোনার বাঙ্গলার জনৈক ধনী জমিদারের একমাত্র বংশধর। দুর্ভাগ্যক্রমে অতি শৈশবে আমার মাতৃবিয়োগ হয়। একে পিতার বিপুল বিভবের একমাত্র উত্তরাধিকারী, তাহাতে শৈশবে মাতৃহীন; এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যাহা ঘটিয়া থাকে, আমারই বা তাহার অন্যথা হইবে কেন? পিতার আদর ও পরিজনবর্গের সোহাগের প্রবল প্রবাহমুখে আমার জীবন-তরী নৃত্য করিয়া ছুটিল। আমার সুখসন্তোষ-বিধানের নিমিত্ত সকলেই সন্ত্রস্ত; পিতা আমার অভিলাষমাত্রেই পূর্ণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া যেন সম্ভব-অসম্ভব, সঙ্গত-অসঙ্গত এসব পার্থক্য একেবারে বিস্মৃত হইলেন। আমি প্রকৃতই পিতার নয়নের মণি হইলাম।

পিতা আমার পরম নিষ্ঠাবান্, দেবদ্বিজসেবী, আদর্শ ব্রাহ্মণ। আমাদের গৃহে নানাবিধ দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত; কুলদেবতা কালীর নিত্যপূজা মহাসমারোহে সম্পাদিত হইত। সান্ধ্য নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া যখন দেবমন্দির-সমূহে আরত্রির আনন্দ-রোল উত্থিত হইত, তখন আমার

তরুণ হৃদয় কি যে এক অনির্ব্বচনীয় উল্লাসে উদ্বেলিত হইয়া উঠিত, তাহার অস্পষ্ট অনুভূতি এখনও আমার অন্তর আকুল করিয়া তুলে।

অতঃপর আমার বিদ্যার্জ্জনের কাল অতীত হইতেছে দেখিয়া পিতা আমাকে স্থানীয় উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু গ্রাম্যবিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাসের প্রতিকূলে বহুবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হইতে লাগিল। তাড়না বা শাসন সহ্য করিতে, এমন কি কোন নির্দ্দিষ্ট বিধি-ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত হইতে আমি কখনও অভ্যস্ত হই নাই। দ্বিতীয়তঃ চিরপরিচিত মাষ্টার পণ্ডিত প্রভৃতিকে আমি কোনরূপেই শিক্ষকের সম্মান দিতে পারিলাম না। তৃতীয়তঃ আমার প্রবল অভিমান গ্রাম্যবিদ্যালয়ে অধ্যয়নের অন্তরায় হইল। আমি আমাদের প্রজা পরিচারক প্রভৃতির পুত্রগণের সহিত একাসনে বসিয়া বাণীর উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিলাম না। কিন্তু শিক্ষার প্রতি আমার তীব্র অনুরাগ ছিল।

আমার মাতুল কলিকাতা হাইকোর্টের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ এটর্ণি। তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে এবং অপরাপর আত্মীয়গণের পরামর্শে আমার কলিকাতায় অবস্থানই স্থিরীকৃত হইল। যথাকালে হেয়ারস্কুলে প্রবেশ লাভ করিলাম। মাতুলের নির্দ্দেশ অনুযায়ী আমার বেশবিন্যাসের পারিপাট্য বৃদ্ধি হইল। বলা বাহুল্য, আমি মাতুলালয়েই অবস্থিতি করিতাম। আহারবিহারের অভিনব প্রথা, সহাধ্যায়িগণের অভিনব ভাবভঙ্গী, অদৃষ্টপূর্ব্ব ক্রীড়াকৌতুক, চক্ষের সম্মুখে নিত্য নব দৃশ্য—এই নূতনত্বের তীব্র আকর্ষণে আমি কক্ষচ্যুত গ্রহের ন্যায় কি যেন এক নূতন জগতের দিকে ছুটিলাম।

এস্থলে আমার মাতুলের আরও একটু পরিচয় আবশ্যক, কারণ তাঁহার সংসর্গে এবং আদর্শপ্রভাবে আমার ছাত্র-জীবন পরিপুষ্ট হইয়াছিল। তিনি যে একজন খ্যাতনামা এটর্ণি তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার প্রচুর অর্থ; প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা বহুবিধ বিলাসোপকরণ ও দাস-দাসীতে পূর্ণ; বিবিধ বিচিত্র যানবাহনাদি সর্ব্বদা তাঁহার দ্বারে দণ্ডায়মান। এ সমুদয়ে আমার তরুণ চিত্তকে যে—কতদূর আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহা বলিতে হইবে কি? মাতুলালয়ে আর একটি অভিনব সুযোগ উপস্থিত হইল। আমি পিতার আদরের নিধি হইলেও তাঁহার দেবভক্তি ও আচারনিষ্ঠা আমাকে অশেষ প্রকারে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিয়াছিল। এস্থানে সর্ব্বতোমুখী স্বাধীনতা, পিতার পুণ্য পরিবারে উচ্ছৃঙ্খলতা বা শাস্ত্রবিগর্হিত বিলাসব্যসনের প্রবেশাধিকার ছিল না; সুতরাং আদর সোহাগ কোন দিনই শাস্ত্রশাসনের গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারে নাই। কিন্তু মাতুলালয়ে বিধিনিষেধের প্রভাব আদৌ নাই। মাতুল আমার সর্ব্ববিষয়েই সম্পূর্ণ "লিবারেল"। তাঁহার গৃহে আহারবিহার, ক্রীড়াকৌতুক, বেশবিন্যাস প্রভৃতির বৈচিত্র্য ও পরিপাট্যে আমি মুগ্ধ হইলাম। মাতুলানীও আমার মাতুলের সুযোগ্যাসঙ্গিনী। তিনি বিক্রমপুরের নিতান্ত 'পাড়াগেঁয়ে' ব্রাহ্মণের গৃহে প্রতিপালিতা হইলেও আজি কলিকাতার শিক্ষাসভ্যতায় সুমার্জ্জিতা। নূতন আলোকলাভে তাঁহার হৃদয়ের অন্ধসংস্কার দূরে পলায়ন করিয়াছে। পদে পদে বস্ত্রপরিবর্ত্তন, সদাশঙ্কিত পদক্ষেপ, গঙ্গাজলস্পর্শ প্রভৃতি উপদ্রব এগৃহে নাই। সমস্ত প্রাতঃকাল শুষ্ককণ্ঠে অতিবাহিত করিয়া চরণামৃতরূপ অপূর্ব্ব পানীয়ের স্থলে শয্যাত্যাগ সময়েই সম্মুখে বাষ্পোদ্গারী চায়ের বাটী; সঙ্গে বিস্কুট, মাখন, ডিম্ব প্রভৃতির অপূর্ব্বসমাবেশ। অবশ্য মাতুলালয়ের এবম্বিধ ব্যবস্থাসমূহ পিতার অপরিজ্ঞাত ছিল;—তাহা না হইলে আমার ভাগ্যে এ সুখসংযোগ ঘটিত না। পরম ব্রাহ্মণ পিতা আমাকে প্রাণান্তেও এস্থলে প্রেরণ করিতেন না। কিন্তু মাতুল আমার পরম কুলীন, দেশের যত মুখ্যবংশের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা; ব্রাহ্মণত্বের গর্ব্বও তাঁহার যথেষ্ট। তাই পিতা আমাকে নিশ্চিন্তচিত্তে মাতুলভবনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাই আজ আমার জীবনরঙ্গে এই অভিনব অনিন্দ্যসুন্দর মোহনদৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

(২)

আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করি। প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করিয়াছি। পিতার আমার আনন্দের সীমা নাই। এদিকে কলেজে আসিয়া আর একটি বিশিষ্টতা বা বৈশিষ্ট অনুভব করিলাম। স্কুলে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ ছিল; শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি বশতঃ ছাত্রজীবনে সংযম ও শৃঙ্খলার সম্পূর্ণ অভাব হইতে পারে নাই।

কিন্তু উচ্চ শিক্ষার উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়া কি দেখিলাম? দেখিলাম—এস্থানে গুরুশিষ্যভাব তিরোহিত হইয়াছে; অধ্যাপক ও ছাত্রের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ব্যতীত অন্য প্রভেদ আছে বলিয়া বোধ হইল না; এস্থানে শিক্ষকের স্নেহ-মধুর সম্ভাষণের পরিবর্ত্তে বিশ্বজনীন 'বাবু' সম্বোধন। দেখিলাম—সর্ব্বত্র সাম্য-স্বাধীনতার প্রবল প্লাবন, সুতরাং কলেজের শিক্ষাগুণে আমার মানসিক ও নৈতিক যে কিরূপ উন্নতি হইল, তাহা ভুক্তভোগী ও শিক্ষিতমাত্রেই সম্যকরূপে অনুধাবন করিতে পারিবেন।

যথাসময়ে সসম্মানে এফ্, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। আমার সুখ্যাতি সর্ব্বত্র; ধনিপুত্রের এই প্রকার পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতার জন্য সংবাদপত্র সমূহেও আমার সুনাম ঘোষিত হইতে লাগিল; পিতার স্নেহময় হৃদয় পুত্রের কৃতিত্বে ও সুখ্যাতিতে গর্ব্বোৎফুল্ল। এই সময়ে বিলাত যাইবার প্রবল আগ্রহ হইয়াছিল;—আহা, কি সে দেশ! যেখানে সাম্যস্বাধীনতার উৎস চির-উচ্ছ্বসিত, যেখানে কোনও কুসংস্কারমূলক সমাজশাসন মানবের সুখভোগের অন্তরায় হয় না, যেখানে নরনারীর অবাধ সম্মিলনে পবিত্র প্রেমানন্দের উদ্ভব হয়, যেখানে শেলি-বাইরণের আবির্ভাব হইয়াছে, "Liberty broadens down from precedent to precedent"—সেদেশ ব্যতীত অন্যত্র কি প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতে পারে? সেদেশ দর্শন, সেদেশের রীতিনীতির অনুকরণ করিতে না পারিলে কি মানবজীবনের সফলতা সম্ভব? কিন্তু কুসংস্কারান্ধ পিতার তীব্র প্রতিবাদে আমার সে শুভ সংকল্প সিদ্ধ হইল না।

নদীর প্রবাহপথে প্রবলবাধা উপস্থিত হইলে সে অন্য পথে ধাবিত হয়। বিলাতযাত্রার পথে বাধা প্রাপ্ত হইয়া আমার চিত্ত অন্যপথ আশ্রয় করিল। হৃদয়ে প্রবল ধর্ম্মানুরাগ জাগিয়া উঠিল। পাঠক কি মনে করিতেছেন?—বাপ্‌কা বেটা? না না—তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে? আমার ন্যায় উদারপ্রকৃতি, উচ্চশিক্ষালোকপ্রাপ্ত, সুরুচি-সম্পন্ন যুবকের নিকট সেই 'বুনো' ব্যাস-বাল্মীকির 'সেকেলে', 'ঘুণধরা' কুসংস্কারকলুষিত ধর্ম্মের আদর হইতে পারে কি? বিশেষতঃ আমি ব্রাহ্মণসন্তান; আর ব্রাহ্মণই ত সেই 'সেকেলে' ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও সংস্কারক। সুতরাং দেশকালপাত্র অনুসারে ব্রাহ্মণের অন্ত্যবর্ণ লো[illegible] করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সেবায় মনোনিবেশ করিলাম কিন্তু পিতার ভয়ে পৌত্তলিকতার প্রধান চিহ্ন 'উপবীত' অঙ্গ হইতে বিসর্জ্জন করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্ষু[illegible] রহিলাম। বর্ত্তমানে পাঠাভ্যাসের ব্যাঘাত হইবে ইত্যাদি রূপ ছল করিয়া অবকাশসময়ে বাটী যাওয়া প্রায় ব[illegible] করিয়াছি। পল্লীগ্রামের জলবায়ুও আমার আর স[illegible] হয় না। পৌত্তলিকতার প্রিয়-নিকেতন পিতৃগৃহে স[illegible] সসঙ্কোচ পদক্ষেপ, আহারবিহারের অতিকঠোর অনু[illegible] বিধিনিষেধ পালনও আমার আর চলে না। কেব[illegible] পিতার আগ্রহাতিশয্যে মধ্যে মধ্যে দুই একটী রবিবা[illegible] মাত্র বাটিতে অতিকষ্টে অতিবাহিত করিতে হইত।

বি, এ, পরীক্ষায় ইংলিশ অনারে উত্তীর্ণ হইয়াছি কতিপয় উপযুক্ত বন্ধুর সঙ্গলাভে ব্রাহ্মসমাজে আমার প্রচু[illegible] প্রতিপত্তি; সুশিক্ষিতা মহিলাগণের সহিত সুপরিচি[illegible] হইয়া আমি কৃতার্থম্মন্য। সমাজে, সভায়, সান্ধ্যসম্মিলনে—সর্ব্বত্রই আমার আদর-আপ্যায়নের সীমা রহিল না অল্পদিনেই এক উচ্চশিক্ষিতা, পরমরূপগুণবতী কুমারী[illegible] সহিত আমার পরিচয় হইল। অবশ্য এ পরিচয়ে এক[illegible] বৈশিষ্ট আছে। আমাদের অনুরাগ অপ্রকাশ রহিল না কি জানি কি উপায়ে পিতাও যেন ইহা অবগত হইলেন তিনি আমার বিবাহের আয়োজনে অতিমাত্র ব্যস্ত হইলেন "এম্, এ, পাশ না করিয়া কখনও বিবাহ করিব না"—এ[illegible] স্থিরসংকল্প পিতাকে পত্রদ্বারা জানাইলাম। প্রজাপতি[illegible] দূতগণ মহোল্লাসে পাত্রী অন্বেষণে গমন করিবার উদ্যো[illegible] করিতেছিলেন, তাঁহারা আমার অসম্মতিতে মনঃক্ষো[illegible] সে আয়োজন বন্ধ করিলেন। পিতা আমার প্রতি অসন্তোষ বশতঃ অথবা শীঘ্রই পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইবে জানি[illegible] সে পত্রের কোনরূপ উত্তর দিলেন না। অবিলম্বে পরীক্ষা ফল বাহির হইল; সেনেটহল হইতে প্রত্যাগত জনৈ[illegible] বন্ধু হাসিমুখে আসিয়া "সেক্‌হাণ্ড" করতঃ শুভবার্ত্তা জ্ঞাপ[illegible] করিলেন। বন্ধু আমাকে সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াই বিদা[illegible] লইলেন; তিনি আজ কত গৃহে আনন্দের বার্ত্তাবহ।

বন্ধুকে বিদায় দিয়া কত কি সুখদুঃখের ক[illegible] আন্দোলন করিতে করিতে বাটী ফিরিয়া আসিতেছি; দ্বা[illegible] উপস্থিত হইতেই পিওন আসিয়া একখানি টেলিগ্রাম হ[illegible]

দিল। টেলিগ্রাম আমারই নামে; কত কি মনে করিয়া আবরণ মোচন করিলাম। সংবাদ—"গত রাত্রিতে হঠাৎ তোমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, অবিলম্বে বাটী আইস।—হরিহর চ্যাটার্জ্জী।" হরিহরবাবু আমাদিগের আত্মীয় ও জমিদারীর ম্যানেজার। বুকের ভিতর যেন কেমন করিয়া উঠিল। নানাবিধ চিন্তায় চিত্ত আলোড়িত হইল। প্রথমতঃ পরীক্ষার ফল পিতা অবগত হইতে পারিলেন না জানিয়া বড় দুঃখ হইল। মনে আরও যে কি অস্থিরতা ক্ষণিকের জন্য অনুভূত হইল, তাহা বর্ণনীয় নহে। কিন্তু এরূপ মুগ্ধ অবস্থা অধিকক্ষণ রহিল না। আত্মবিস্মৃতভাবে ফুটপাথেই দাঁড়াইয়া ছিলাম; সহসা আমার কর্ণে বামাকণ্ঠের সম্ভাষণ ধ্বনিত হইল। চমকাইয়া চাহিলাম। সম্মুখে আমার মনোমোহিনী ও তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী। তাঁহারা আমার পরীক্ষার ফল অবগত হইয়াছিলেন, এবং এই পথেই কোথায় যাইতেছিলেন। আমি প্রকৃতিস্থ হইয়া তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া উত্তর করিলাম, "আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলাম সত্য, কিন্তু হঠাৎ এই দুঃসংবাদে মন বড়ই চঞ্চল হইয়াছে," বলিয়া টেলিগ্রামখানি আমি আমার প্রিয়তমার ভগ্নীর হস্তে দিলাম। তাঁহারা তাহা পাঠ করিলেন, যথারীতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "তা আর কি করিবেন? ভগবান যা করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন। এই মহাবাণী স্মরণ রাখবেন এতেই সান্ত্বনা পাবেন।" তাঁহাদের দেখিয়াও আনন্দ হইয়াছিল, তাঁহাদের কথায়ও সত্যই যেন পিতার মৃত্যুতে ভগবানের মঙ্গলহস্তই দেখিতে পাইলাম। আর ত আমাকে বিবাহের জন্য উৎপীড়িত হইতে হইবে না! আর ত আমাকে পৌত্তলিকতার সংশ্রবে থাকিয়া পরমপিতার প্রতিকূলতা করিতে হইবে না! আর ত আমার মনোমোহিনীর সহিত মধুর পবিত্র মিলনের পথে কেহ প্রতিবন্ধক হইবে না!

(৩)

বাটীতে সুসজ্জিত বৈঠকখানায় দুইখানি চেয়ারে হরিহরবাবু ও আমি বসিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ সম্বন্ধে নানা কথোপকথন করিতেছিলাম। বহু বাদানুবাদের পর আমি উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিলাম—"আপনি উচ্চশিক্ষিত হইয়াও একি বলিতেছেন?" উত্তর হইল,—"তুমি এখনও বালক মাত্র; তোমাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করি, তাই এত কথা বলিলাম। এখন মতি স্থির করিয়া যাহাতে স্বর্গীয় কর্ত্তার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহার ব্যবস্থা কর।" কি পরিতাপ! একজন এম্, এ, বি, এল্, অবসর প্রাপ্ত সবজজের এই ঘোর কুসংস্কার! তা সে যাহাই হউক, তিনি আমাকে আদেশ করিবার কে? মনে বড়ই ক্রোধ ও বিরক্তির সঞ্চার হইল। কিন্তু আশৈশব যাঁহাকে ভয় ও ভক্তি করিয়াছি, সহসা তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিতে সাহসও হইল না। অগত্যা নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক যে কোন প্রকারে পিতৃশ্রাদ্ধের ব্যাপার সম্পন্ন করিলাম; অবশ্য কেশমুণ্ডনাদি অসভ্য ও অর্থশূন্য বিধান আমি প্রতিপালন করি নাই।

আর আমার সাধুসঙ্কল্প সিদ্ধির পথে কোন বাধা নাই। সর্ব্বাগ্রে প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করতঃ প্রেমময়ীর পাণিলাভে কৃতকৃতার্থ হইলাম। বলা বাহুল্য, ইহার পূর্ব্বেই স্কন্ধের সূত্রগুচ্ছটি স্কন্ধের ভার লাঘব করিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। বিদুষীর সাহচর্য্যে আমার কৈশোরের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়া উঠিল; উভয়ে স্থির করিলাম, ইউরোপেই আমাদিগের 'হনিমুন হওয়া কর্ত্তব্য; তাহাই হইল। ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ ও স্থানে স্থানে অবস্থান করতঃ দীর্ঘকালে স্বদেশে প্রত্যাগত হইলাম। এই সময়ে ধর্ম্মসম্বন্ধে আমার সম্পূর্ণ মত পরিবর্ত্তন হইল। উচ্চ শিক্ষা ও উচ্চতর সংসর্গের ফলে ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তায় সন্দেহ উপস্থিত হইল। আর যদি কেহ সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বনিয়ন্তা থাকেনই, তাহা হইলে তাঁহার পূজা বা উপাসনার প্রয়োজন কি? উপাসনা ত তোষামোদ, আর পূজা ত উৎকোচ প্রদানের অভিনয় মাত্র। সুতরাং এই সমস্ত উপায়ে সর্ব্বজ্ঞ (Omi i-Scient) ন্যায়মূর্ত্তি (Ail Just) ভগবানের বিরক্তি ভিন্ন সন্তোষের সম্ভাবনা কোথায়? এইরূপ যুক্তির বলে প্রচলিত সমস্ত ধর্ম্মই আমার চক্ষে ভ্রান্ত ও অল্পাধিক পরিমাণে কুসংস্কারমূলক বলিয়া প্রতীয়মান হইল।

আমারজীবন সঙ্গিনী এক অনিন্দ্যসুন্দর কন্যারত্ন ক্রোড়ে পাইয়াছেন। মাতৃভাষার প্রতি বিদ্বেষবশতঃ জনৈক ইউরোপীয়া রমণীর (নার্স) করে শিশু-কন্যার ভারার্পণ করিলাম। একজন সাহেব আমার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী; পুরাতন কর্ম্মচারিগণের স্থলে ইংরাজী নবীশ নূতন লোক নিযুক্ত হইয়াছে। সেরেস্তার কার্য্য ইংরাজী কায়দায় চলিতেছে। দেখিয়া

শুনিয়া হরিহরবাবু স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিলেন। আমার উচ্চাভিলাষ-সম্পাদনের পথে আর কোন বাধাই রহিল না। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের খাতিরে জনৈক ইংরেজ ম্যানেজার নিযুক্ত হইলেন। এইরূপে হরিহরবাবুর পদত্যাগে আমার গৌরব বৃদ্ধি হইল। বিশেষতঃ শ্রুতিকটু বাঙ্গালা ভাষার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলাম। উচ্চকর্ম্মচারী সমস্ত ইউরোপীয়, পত্নী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট, ইউরোপীয় নার্স, মান্দ্রাজী সার্ভ্যাণ্ট্স্‌—বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালীর কুসংস্কার দুইটিই সভয়ে দূরে পলায়ন করিয়াছে। অধিক কি বলিব! আমার পঞ্চমবর্ষীয় কন্যা বাঙ্গালা কথা বলিতেও পারে না।

এইস্থানে বলিয়া রাখা উচিত যে, আমি আমার পূর্ব্বপুরুষগণের প্রবর্ত্তিত সমস্ত দেবসেবাই বন্ধ করিয়াছি; দেবমূর্ত্তিসকল দূরীভূত হইয়াছে; পিতার মৃত্যুর পরই যে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত করিয়াছিলাম, তাহাও এক্ষণে ভৃত্যগণের আবাস; ব্রহ্মোপাসনাও আমার বিচার বুদ্ধিতে এখন সজ্জিত একটা কুসংস্কার মাত্র। দেবগৃহে এক্ষণে কুক্কুর, ঘোটক প্রভৃতির বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শৈশবে দেখিয়াছি আমার পিতৃগৃহে যাচক-ভিক্ষুকের দ্বার অবারিত ছিল। হিন্দুজাতির অবনতির মূলস্বরূপ এই কুপ্রথা আমি সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিয়াছি। হায়! ভ্রান্ত হিন্দুসমাজ এই প্রকার অযথা ও অনিষ্টকর দানের প্রশ্রয় দিয়া, সদুদ্যম, স্বাবলম্বন, আত্মমর্য্যাদা প্রভৃতি সমস্ত সদ্‌গুণ হারাইয়াছে! তাই বলিয়া কি আমি প্রকৃত মঙ্গলকর দানের বিরোধী? কখনই নহি, প্রকৃত লোকহিতকর কার্য্যের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গভর্ণমেণ্টের হস্তে লক্ষাধিক মুদ্রা আমি অর্পণ করিয়াছি। সংবাদপত্রসমূহ আমার দানশৌণ্ডতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছে; গুণগ্রাহী গভর্ণমেণ্ট আমাকে রাজাবাহাদুর উপাধিদানে সম্মানিত করিয়াছেন। হায়! মন্দবুদ্ধি হিন্দুগণ মুষ্টিভিক্ষাদানেই সর্ব্বস্বান্ত হইলে! প্রকৃত দানের মর্ম্ম বুঝিলে না!

(৪)

বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য সিমলায় অবস্থিতি করিতেছি। সঙ্গে পত্নী কন্যা ও পারিবারিক চিকিৎসক ডাক্তার—ইউরোপীয়ান না হইলেও শিক্ষা, সভ্যতা ও শিষ্টাচারে যে কোনও ইউরোপীয়ানের তুল্য, এবং তজ্জন্য আমার অতিশয় প্রিয়। আমাদের বাংলার অদূরে এক তুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গ অভ্রমণ্ডিত মস্তকে দণ্ডায়মান; মধ্যে নিবিড়-নীল দেবদারুকুঞ্জ ও অন্যান্য পার্ব্বত্য বৃক্ষ ব্যতীত গৃহাদির ব্যবধান নাই। নিসর্গের স্নিগ্ধগম্ভীর সৌন্দর্য্য উপভোগে পরমানন্দে দিনগুলি একে একে চলিয়া যাইতেছে। সহসা এক অত্যাশ্চর্য ঘটনায় শান্ত-স্বচ্ছ হৃদয়সরোবর সন্দেহ-লোষ্ট্রপাতে আকুলিত হইয়া উঠিল।

একদিন জনৈক আগন্তুকের সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধে বহু বাদানুবাদ হইয়াছিল। রাত্রিতে সুষুপ্তাবস্থায় এক অপূর্ব্ব দৃশ্যের আবির্ভাবে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল দেখিলাম, এক দীর্ঘকায়, আজানুলম্বিতবাহু, বলিষ্ঠদেহ, জটাজুটশোভিতশীর্ষ, আনাভিবিলম্বিতশ্মশ্রু, গৈরিকবসন, তপ্তকাঞ্চনকান্তি সন্ন্যাসী আমার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। আমি ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। সহসা সেই ভৈরবসুন্দর সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিলেন,—"মূঢ়, তুমি ঈশ্বর মান না, ঈশ্বরে বিশ্বাস কর না;—তুমি নরাধম!" সে জলদগম্ভীরস্বরে আমার অন্তঃস্তল প্রকম্পিত হইতে লাগিল। তথাপি সাহস অবলম্বনকরতঃ উত্তর করিলাম,—"ঈশ্বর নাই।" সন্ন্যাসী বলিলেন,—"বেশ, আমার কথার উত্তর দাও।"

আমি। উত্তম, প্রশ্ন কর।

সন্ন্যাসী। তুমি কি প্রকারে উৎপন্ন হইলে?

আমি। শুক্রশোণিতের সংমিশ্রণে।

সন্ন্যাসী। কে ঐ সংমিশ্রণ করে?

আমি। পরস্পরের প্রবল আকর্ষণই এই সংমিশ্রণের হেতু।

সন্ন্যাসী। কে উহাদিগকে পরস্পর মিলিত হইবার জন্য প্রবল আকর্ষণশক্তি প্রদান করিল?

আমি। নেচার (Nature) অর্থাৎ প্রকৃতি।

সন্ন্যাসী। উত্তম! কে জল সৃষ্টি করিল?

আমি। হাইড্রোজেন ও অক্‌সিজেনের রাসায়নিক সংযোগে জল সৃষ্ট হইয়াছে।

সন্ন্যাসী সুতীব্র ভ্রুকুটী সহকারে কুলিশকর্কশকণ্ঠে কহিলেন—"দেখ বৃথা বাগ্‌জালবিস্তারে প্রশ্নের উত্তর হইবে না। স্পষ্ট উত্তর দেও। হাইড্রোজেন অক্‌সিজেনের এ বিশ্বব্যাপী রাসায়নিক সংযোগ কে করিল?" আমি ভীতিকম্পিতকণ্ঠে উত্তর করিলাম,—"নেচার।"

সন্ন্যাসী। উত্তম! সূর্য্যের তাপ, অগ্নির দাহিকা শক্তি

চুম্বকের আকর্ষণ, জলের দ্রবত্ব, মনুষ্যের ভাষাভিজ্ঞতা, ব্যাঘ্রের হিংসা, ভেকের নিরীহতা কে প্রদান করিল? সাবধানে উত্তর দেও।

কি যেন এক আশ্চর্য্য অচিন্তনীয় শক্তি প্রভাবে আমি মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম, আমার বুকের বল (Strength of mind) কোথায় চলিয়া গেল, আর তর্কবিতর্ক করিবার সাহস রহিল না, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বলিলাম, "নেচার"।"

সন্ন্যাসী। উত্তম, তাহা হইলে যাবতীয় জাগতিক শক্তি ও কার্য্যপরম্পরার প্রযোজক ও নিয়ন্তা কে? এ অনাদি অনন্ত জগদ্বিধানের একমাত্র মূল কে?

আমি। 'নেচার' ভিন্ন আর কি হইতে পারে!

তখন মধুর গম্ভীর উচ্চহাস্যে সন্ন্যাসী আমার সর্ব্বশরীর পুলকিত করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"অবোধ, তবে বৃথা বিতণ্ডার আশ্রয় লইয়াছ কেন? অনাদি কাল হইতে মানবগণ যাহাকে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, গড, আল্লা, প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করিয়া আসিতেছে, তুমি নয় তাঁকে "নেচার" বলিতেছ। কিন্তু নামপরিবর্ত্তনে কি সত্তার বিনাশ হয় যে, তুমি "নেচার" নামের দোহাই দিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছ?"

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া উত্তর করিলাম—"স্বীকার করিলাম "নেচারই ঈশ্বর। তাহা হইলে ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ বা চিন্ময় হইতে পারেন না; কারণ "নেচার" ত তাপ-তাড়িতাদি অন্ধ-শক্তির সমষ্টিমাত্র। সুতরাং এ শক্তি 'নিয়মাধীন ও স্বপ্রকাশ-বোধরহিত।"

সন্ন্যাসী। কি প্রকারে বুঝিলে ঐশী শক্তির স্বাধীনতা বা আত্মবোধ নাই?

আমি। যে শক্তিবলে এই বিশ্বের কার্য্য চলিতেছে, তাহা যদি স্বতন্ত্র ও জ্ঞানময় হইত, তাহা হইলে জগৎ কখনই বৈষম্যময় হইত না; ঈশ্বর যদি ইচ্ছাময়, করুণাময়, সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইতেন, তাহা হইলে পৃথিবী দুঃখ-দারিদ্র্য, শোক-সন্তাপের লীলাভূমি হইত না। ঈশ্বর যদি সর্ব্বশক্তিমান্ হয়েন, তাহা হইতে তিনি কখনও পরমকারুণিক, ন্যায়মূর্ত্তি বা সমদর্শী হইতে পারেন না।

সন্ন্যাসী ধীর-গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন,—"কূট তর্কের আশ্রয়ে এ সন্দেহ কখনই নিরাকৃত হইবে না। সরলভাবে আপন মনকে জিজ্ঞাসা কর, অতি সহজে উত্তর পাইবে। মনে করিতে পার কি,—যে শক্তি এই অত্যাশ্চর্য্য কৌশলময় বিশাল বিশ্বের রচয়িতা ও নিয়ন্তা, যে শক্তি এই অত্যাশ্চর্য্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-গর্ব্বিত, উন্নত মনোবৃত্তিসম্পন্ন, দয়াদাক্ষিণ্যাদি-ভূষিত মানবের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা অন্ধশক্তি মাত্র? একথা কি যুক্তিসঙ্গত? তুমি বিজ্ঞ, তুমি বুদ্ধিবিবেক-সম্পন্ন, আর তোমার স্রষ্টা, বিধাতা অন্ধ, অজ্ঞান, অবিবেকী?"—সন্ন্যাসী আরও কি বলিতে যাইতে ছিলেন, এমন সময় আমার স্ত্রী আসিয়া আমাকে জাগাইলেন। তখন ভোর হইয়াছে। জানিলাম, তিনিও স্বপ্নে ঐ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভীতচিত্তে অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়াছেন। পরে শুনিলাম আমার কন্যাটী এবং ডাক্তারবাবুরও ঐরূপ স্বপ্ন দর্শন হইয়াছে। আমরা সকলেই কেমন একটু চিন্তিত হইলাম। কিন্তু কতিপয় দিনে সেভাব বড় রহিল না, বিশেষতঃ ডাক্তারবাবু উহা একক্ষণে মস্তিষ্কের উত্তেজনা স্থির করিলেন! আমি কিন্তু এ স্বপ্নবিবরণ একেবারে বিস্মৃত হইতে পারিলাম না।

(৫)

এক স্নিগ্ধোজ্জ্বল শারদ প্রভাতে আমরা কয়জনে সিমলা-বাসের বৈঠকখানায় বসিয়া আছি। সম্মুখে অনন্ত বিসর্পণী শৈলমালা প্রভাত সূর্য্যের কনক-কিরণে অভিষিক্ত হইয়া প্রাণ-মনোবিমোহিনী শোভা বিকীর্ণ করিতেছে। সে শান্তোজ্জ্বল, ভীমকান্ত, অচিন্ত্য সুন্দর মোহন দৃশ্য যথাদৃষ্ট বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই—বুঝি কাহারও নাই। শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ অরুণরাগরঞ্জিত হিমানীকিরিটে তুঙ্গ মস্তক অলঙ্কৃত করিয়া যেন দিবাকরের প্রত্যুদ্গমন করিতে ঊর্দ্ধ-গগনে উত্থিত হইয়াছে। সৌর-করোজ্জ্বল নীরদনিচয় স্বর্ণ-খচিত ক্ষৌমবসনের ন্যায় ইহাদের কটিদেশ সুশোভিত করিয়াছে। দৃষ্টির শেষ সীমা পর্য্যন্ত তুষারমণ্ডিত-মস্তক শৈলসমূহ বালার্ককরে উদ্ভাসিত হইয়া মানসবক্ষে কনক-কমল-কুট্মলের ন্যায় অনন্ত নীলাম্বরে শোভা পাইতেছে। এ মনোমোহিনী ছবি আঁকিবার নহে, দেখিবার।

এই ভুবনমোহন আলেখ্যের প্রশংসা প্রসঙ্গে সেই অদ্ভুত শিল্পীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে সেই আশ্চর্য্য স্বপ্ন সম্বন্ধেও আলোচনা হইতে লাগিল। ডাক্তার যথাপূর্ব্ব বলিলেন, উহা মানসিক উদ্বেগমাত্র। আমরা এইরূপ আলোচনা ও বাদানুবাদ করিতেছি, সহসা বালিকা

আমার গাত্র স্পর্শ করিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "Papa just look here! The vision comes," আমরা সকলেই চমকিত হইয়া সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম সেই স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তি—সেই বিশালকায় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ শূন্যমার্গে অগ্রসর হইতেছেন। এত স্বপ্ন নয়; সকলেই চক্ষু মুদিলাম;—নবীন তপনের প্রদীপ্ত প্রভায় দিগন্ত উদ্ভাসিত; ঐ চিরচঞ্চলা নিঝর্রিণী—সেই ললিত নৃত্যে সেই মধুর কলতানে নয়ন মন মুগ্ধ করিয়া তেমনই ছুটিয়া চলিয়াছে; ঐ ভৈরব-সুন্দর নগরাজ সুদূর অতীতের সাক্ষি-স্বরূপ দণ্ডায়মান। আর আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান—সেই অদ্ভুত পুরুষ। হৃদয়ের বল, বিজ্ঞানগর্ব্ব, সভ্যতাভিমান কোথায় লুকাইল; মন্ত্রবলে নতশির সর্পের ন্যায় আমাদের গর্ব্বোন্নত মস্তক আপনা হইতেই ভূমিস্পর্শ করিল। ক্ষণিকের জন্য যেন আপনা ভুলিয়া গেলাম। এরূপ অবস্থায় কতক্ষণ কাটিল ঠিক বলিতে পারি না। বালিকার কথায় যেন চৈতন্য হইল; সে বিস্মিত অথচ কাতরভাবে বলিয়া উঠিল, "Alas! he is gone"। মস্তক উন্নত করিয়া আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। সে মূর্ত্তি আর নাই; কিন্তু সে নদী, পর্ব্বত, সূর্য্য সবই আছে। যেন কেমন নিরাশা, কেমন অতৃপ্তি আমার হৃদয় অধিকার করিল। আমরা সকলেই নির্ব্বাক; কতক্ষণ পরে ডাক্তার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন যে, অনর্থক চিন্তা করিয়া আমাদের সকলেরই মস্তিষ্কবিকৃতি উপস্থিত হইয়াছে। আমি কিন্তু ডাক্তারের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিলাম না। সুস্থ শরীরে, প্রকাশ্য দিবালোকে একাধিকজন একসঙ্গে যাহা প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহা যে উত্তপ্ত মস্তিষ্কের মরীচিকা, তাহা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি! অপিচ—সরলা বালিকার মস্তিষ্ক-বিকারই বা কিরূপে সম্ভব। ফলতঃ বিজ্ঞান বা শরীরতত্ত্বে ইহার কোনরূপ ব্যাখ্যাই পাইলাম না। পত্নী, কন্যা ও আমি তিনজনেই কেমন উন্মনা হইয়া উঠিলাম। কি এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব ভাব যেন অন্তরে উঁকি দিতে লাগিল। স্বগৃহে ফিরিবার জন্য মন ব্যস্ত হইল। ডাক্তারত আমাদের প্রতি যথারীতি বিদ্রূপ করেন, কিন্তু তাঁহার আচরণ বিশেষ লক্ষ্য করিলে বোধ হয় যেন, তাঁহার মনেও কিসের ছায়া পড়িয়াছে।

(৬)

বাটীতে আসিয়া এক উপদ্রব উপস্থিত হইল। প্রায় প্রতি রজনীতেই বিভীষিকাময় স্বপ্নসকল—আমায় আকুল করিয়া তুলিল। কখন দেখি, করালবদনা কালী উদ্ধৃত অসি করে আমার প্রতি ধাবিতা হইতেছেন; তাঁহার কণ্ঠবিলম্বিত রুধিরস্রাবী মুণ্ডসকল যেন আমার প্রতি ভীষণ ভ্রুকুটী করিতেছে। কখন দেখি, শান্ত সুন্দর সদাশিব, জ্বলত্রিনেত্র, উচ্ছ্রিত জটাজুট, ভয়াল রুদ্রমূর্ত্তি ধারণকরতঃ প্রদীপ্ত শূল-করে আমার উপর আপতিত হইতেছেন; তদঙ্গবিহারী ফণিগণ ফণা বিস্তার করতঃ বিষনিশ্বাসে আমার সর্ব্বশরীর সন্তাপিত করিতে করিতে আমাকে আক্রমণ করিতেছে। কত রাত্রিতে এতাদৃশ লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিয়া ভয়ার্ত্ত চীৎকার-সহকারে জাগিয়াছি, আবার দেখি স্বর্গীয় পিতৃদেব জ্যোতি-র্ম্ময় মূর্ত্তিতে আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তীব্র তিরস্কার করেন ও বলেন,—"এখনও মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।" এই দারুণ দুর্ভোগের মধ্যেও আমার মনে বড় আনন্দ হইল। ডাক্তারটীও কেমন হইয়া উঠিলেন; বহু আয়াসে জানিতে পারিলাম যে, তাঁহার দশাও আমারই অনুরূপ। আমার স্ত্রীরও একই অবস্থা। কি করিব—কোন্ পথে শান্তি মিলিবে, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। ইতিমধ্যে সংবাদ পাইলাম, আমার শ্বশুর মহাশয় হঠাৎ সপরিবারে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া আবার পৌত্তলিকতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কেন জানি না, আমার মনে যেন কোথা হইতে আশার ক্ষীণরশ্মি পতিত হইল। আমিও কেন দীক্ষাগ্রহণ করি না? কিন্তু তাহাতে এ সমস্ত সংশয়, অশান্তি কি দূরীভূত হইবে? কে জানে?

কয়েকজনে কক্ষমধ্যে বসিয়া আছি। সহসা ধূপ-ধূনার সুগন্ধে কক্ষ আমোদিত হইয়া উঠিল। আশ্চর্য্য হইতে আশ্চর্য্যতর ঘটনাপরম্পরা-প্রভাবে আমাদের মন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল; কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ নিশ্চল নিস্পন্দ রহিলাম। কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কা হৃদয়কে অধিকার করিল; ভয়বিহ্বলচিত্তে ভগবান্‌কে ডাকিলাম। সহসা নয়ন সমক্ষে সেই স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ প্রকট হইলেন;—সেই তেজঃপুঞ্জ কলেবর, শিবসদৃশ সন্ন্যাসী। আর ছাড়িব না মনে করিয়া পদযুগল ধারণ করিতে অগ্রসর হইলাম, কিন্তু পারিলাম না। কেবল সেই পূর্ব্বপরিচিত জলদগম্ভীর স্বরে যেন আকাশবাণী হইল, "দেবতা সকল পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর; পরে দীক্ষাগ্রহণে আত্ম শুদ্ধি

করিও—সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে।" আমি যুক্তকরে বলিলাম, "আর কোথায় দীক্ষাগ্রহণ করিব! আপনি আমায় উদ্ধার করুন।" উত্তর হইল "সময়ে হইবে।" "আমরা কি দর্শন পাইব?" "চেষ্টা কর, প্রস্তুত হও; চেষ্টায় সকলি হয়।" মূর্ত্তি বিলীন হইল।

আবার আমার গৃহে দেবারতির শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছে; আবার পরিত্যক্ত-মন্দিরসমূহ স্তোত্রগানে মুখরিত হইতেছে। কিন্তু আমার হৃদয়ে ত শান্তি ফিরিয়া আসিল না! কোথায় সে মহাপুরুষ? কিরূপে তাঁহার সন্ধান পাইব; উৎকণ্ঠা, অস্থিরতায় আমার অন্তঃকরণ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। আত্মীয়বন্ধু পরিচিতবর্গ—সকলের নিকটেই মহাপুরুষের রূপবর্ণনা করতঃ সন্ধান লইতে অনুরোধ করিয়াছি; আমার কর্ম্মচারিগণকে ভারতের যাবতীয় তীর্থস্থান ও সাধুসন্ন্যাসীর আশ্রম অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিয়াছি। কিন্তু আজিও সন্ধান মিলিল না। আমার স্বপ্ন সফল হইয়াও কি হইল না?

ডাক আসিয়াছে। শ্বশুরমহাশয়ের একখানি পত্র হস্তে করিয়া যেন কেমন ভাবান্তর উপস্থিত হইল; খুলিয়া দেখিলাম—"পূর্ব্ববঙ্গ-রেলপথের * * * স্থানে এক মহাপুরুষ অধিষ্ঠান করেন। তাঁহার আকৃতি তোমার বর্ণনার অনুরূপ। নিজে গিয়া দেখিলে ভাল হয়।" এই সংবাদে অবসন্ন হৃদয় আবার সবল হইল; যথাসম্ভব সত্বর কথিত স্থানে উপস্থিত হইলাম। আহা! কি দেখিলাম! সেই সুন্দর মধুরমূর্ত্তি; কিন্তু সেই ভীতিজনক দেবত্ব যেন সরল সহাস সহানুভূতিপূর্ণ মনুষ্যত্বের আবরণে অবগুণ্ঠিত হইয়াছে। আনন্দে, ভক্তিতে হৃদয় ভরিয়া গেল। সঙ্গে পত্নী, কন্যা ও ডাক্তার ছিলেন, সকলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া আশীর্ব্বাদ লাভ করিলাম। আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলাম, "এইবার আমি আমার আরাধ্যদেবতাকে পাইয়াছি। আমায় দীক্ষাদান করুন; এ অসহ্য অস্থিরতা হইতে উদ্ধার করুন!" কন্যাটী আমার যেন কত পূর্ব্বপরিচিতের ন্যায় মহাপুরুষের নিকটস্থ হইয়াছে। সেই প্রেমময় সন্ন্যাসী বালিকাকে ক্রোড়ে লইয়া কত গল্পই করিতেছেন। সমস্ত শুনিয়া সহাস্যে বলিলেন, 'আমাকেই' যদি দেখিয়া থাক, তবে দীক্ষাগ্রহণ করিতে পার। মানুষের অবস্থাপরিবর্ত্তনে—দুর্গতির সুমতিবিধানে সেই সর্ব্বেশ্বরের ইচ্ছাই প্রবল। যে শক্তির প্রভাবে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অতিসামান্য ব্যাপারও যথানিয়মে নির্ব্বর্ত্তিত হইতেছে, তাহারই নির্দেশে তোমার জীবনে এই আশ্চর্য্যবৎ ঘটনাসকলের সমাবেশ হইয়াছে। বস্তুতঃ সেই সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ের রাজ্যে আশ্চর্য্য কিছুই নাই; মানবই কেবল অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া ইচ্ছামত ছুটিতে যায়। কিন্তু শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া সূর্য্যাদি হইতে অতিক্ষুদ্র পরমাণু পর্য্যন্ত স্বস্থানে অবস্থিত রহিয়াছে, তাহা ভগ্ন করা কি ক্ষুদ্র মানবের সাধ্য?"

শ্রীসূর্য্যকান্ত মিশ্র।

সে।

সে ছিল, উদার নীলিম নভের
উজল সাঝের তারা
সজ্জা বিহীন লাবনি ছড়ান
সোনালি স্বপন-পারা।
সে ছিল, ঊষর মরুভূর মাঝে—
শীতল স্রোতের বারি।
শ্রান্ত ক্লান্ত পথিক জনের—
প্রাণের তিয়াসাহারী।

সে ছিল, শারদ-চাঁদিনী রাতের
রজত-ইন্দু হাসি
সুপ্ত স্মৃতির উৎস ছুটান
উছল সুখের রাশি
গেছে সে কোথায় বকুলের মত
নীরব রোদনে ঝরি
আজো যে তাহার গন্ধ রয়েছে
কুঞ্জভবন ভরি।

শ্রীগোবিন্দলাল মৈত্র।

মহামতি রাণাড়ে।

শিক্ষিত ভারতবাসীর নিকট মহামতি রাণাড়ের পরিচয় দিতে হইবে না। এই পুণ্যশ্লোক মহাত্মার যোগ্যা সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী রমাবাই রানাড়ে কৃত আমাদের জীবনের কতিপয় স্মরণীয় ঘটনা" নামক মহারাষ্ট্র ভাষায় লিখিত পুস্তকের প্রস্তাবনায় দেশসেবক গোখলে বলেন যে, রাওসাহেব রাণাড়ে যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ত্রিশবর্ষে প্রথমতঃ মহারাষ্ট্রে ও পরে সমগ্র হিন্দুস্থানে রাষ্ট্রোন্নতির নানাবিধ আন্দোলনের কেবল আধারস্তম্ভ নহেন পরন্তু আদি প্রবর্ত্তক এ বিষয় তাঁহাকেও নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। তাঁহার বিশাল, ব্যাপক ও তেজস্বী বুদ্ধি, অগাধ জ্ঞান, প্রগাঢ় অনুশীলন ও অলৌকিক আকর্ষণ-শক্তি—এই সমস্তই তিনি একনিষ্ঠভাবে দেশ-সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। আপনার মাতৃভূমি কিরূপে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইবে—সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্ম্মিক, নৈতিক শিল্পবিষয়ক ও শিক্ষা-সংক্রান্ত—এই সর্ব্ব বিষয়ে কিরূপে অগ্রসর হইবে ও অভীষ্ট উৎকর্ষ লাভের আবশ্যক গুণ আপনার সমাজের স্ত্রীপুরুষমধ্যে কিরূপে আসিবে, দিবারাত্র এই বিষয় ব্যতীত অন্য কিছুই তাঁহার মনে জাগিত না। এরূপ উজ্জ্বল দেশভক্তি ও দেশোন্নতি বিধায়ক প্রযত্নে এবম্বিধ দৃঢ় শ্রদ্ধা যে কোন দেশেই হউক কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়।"

ন্যায়মূর্ত্তি (বিচারপতি) রানাড়ে একদা প্রায় ত্রিশবর্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়া দুইমাস কাল যাপন করিয়াছিলেন। শ্রীমতী রমাবাই তদীয় পূর্ব্বোক্ত পুস্তকে কলিকাতায় অবস্থান ব্যাপার যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, সেই শিক্ষাপ্রদ কথাগুলি বঙ্গীয় পাঠকগণের গোচরার্থে বঙ্গভাষায় অনূদিত হইল।

"আমরা কলিকাতায় আসিলাম। এখানে ধর্ম্মতলায় একটি বাটীভাড়া করিয়া রহিলাম। বাটীটি সুবৃহৎ ছিল সত্য কিন্তু অতি প্রাচীন বলিয়া প্রাঙ্গণে কূপ, উদ্যান বা বৃক্ষলতাদি কিছু না থাকায় নিতান্ত নির্জ্জন ও শূন্য দেখাইল। তজ্জন্য সেই বাটীতে থাকিয়া চিত্তে প্রফুল্লতা বা আনন্দ উপলব্ধি হওয়া দূরে থাকুক পক্ষান্তরে উদ্বিগ্নতা আসিল ও দিনটি অতি কষ্টে অতিবাহিত হইল।

সন্ধ্যাকালে স্বামী ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি আজ কি করিলে?" আমি কথঞ্চিৎ ক্লিষ্টভাবে উত্তর দিলাম "কিছু করি নাই। করিবই বা কি? একে ত জায়গা নূতন, কাহারও সহিত পরিচয় নাই বাটীও যাহা লওয়া হইল তাহাও না হয় একটু রমণীয় হউক—তাহাও নহে। বৃক্ষ-লতাপুষ্পে মানুষের মন কিয়ৎপরিমাণে প্রফুল্ল হয় তাহারও কিছু এস্থানে নাই। পরন্তু যেদিকে দেখ—সেদিকেই উদাস ও শূন্যভাব। ঘরেও কিছু করিতে মন লাগে না। বেশ, ভাড়া কম হইয়াছে ত? সেইভাল। এরূপ বাটী লওয়া কেন? ইহাপেক্ষা একটু ভাল ও নিজের মর্য্যাদানুরূপ অন্য ধন নাও। ভাড়ার খরচ যাহা হইবার তাহা হইয়াও বিনামূল্যে আসিয়া থাকিবার মত দেখাইতেছে।" ইত্যাদি যথেষ্ট শুনাইবার মত বলিলাম। "বাটী পুরাতন বলিয়া নিয়তলে দিবসেও শৃগাল ভীষণভাবে ডাকে। যাঁহারা বাহিরে থাকেন তাঁহাদের পক্ষে ঠিক কিন্তু যাহারা ঘরে থাকিবে তাহাদের দিন উদাসভাবে ও কষ্টে অতিবাহিত হয়।

এই সমস্ত শুনিয়া তিনি শান্তভাবে উত্তর দিলেন যে, "উদ্যানাদি বা গাছপালা কি কোথাও চিরকাল কাহারও সাথে করিবার শক্তি যাহার আছে, তাহার এরূপ ক্ষুণ্ণ হওয়া উচিত নয়। পাঠের ন্যায় আনন্দ ও তৃপ্তি বিধায়ক দ্বিতীয় কিছু নাই। এক জাতীয় পুস্তকে বিরক্তি আসিলে অন্য পুস্তক লইয়া, কবিতা পড়িলে না হয় পুঁথি পড়িবে। অধিক পাঠে মন ক্লান্ত হইলে তো ঈশ্বর সৃষ্ট উদ্যানাদি দেখিতে যাইবে। তোমার কিসের অভাব? গাড়ী জুড়িয়া বেড়াইতে যাইলে ক্লান্ত চিত্তে বিশ্রান্তি লাভ হয়। মনুষ্যকৃত উদ্যানাদি রচনায় যদি মনে আনন্দ ও তৃপ্তি হয় তাহা হইলে ঈশ্বরের সৃষ্ট পদার্থে অর্থাৎ সৃষ্টি-সৌন্দর্য্যে চিত্তাভিনিবেশ করিলে, তাঁহার রচনা-চাতুর্য্যে, বিশালতায় ও দয়ালুতায় আমাদের জীবমাত্রের কতদূর প্রসন্নতা ও তৃপ্তি সাধিত হয়; ইহা ভাবিয়া মন আত্মহারা ও চিত্ত দ্রবীভূত হয়। কিন্তু তোমার মন এক্ষণে পিতার দুঃখে ক্ষিন্ন হইয়াছে। সেইজন্যই তোমার কিছুই ভাল লাগিতেছে না। তোমাকে কিছু কাজ করিতে দিলেই হইবে। কাল তুমি এই শূন্য স্থানের শোভা সম্পাদনে মনোযোগ কর।"

এই কথা শুনিয়া আমার হাসি আসিল। পরে বলিলাম, "কেবল মনে করিলেই স্থানের শোভা কিরূপে হইবে?" ইহাতে স্বামী বলিলেন, "আমি কি বলি, আগে তাই শুন। কাল প্রাতে চারজন মজুর লাগাইয়া তুমি যেমন উদ্যান করিতে চাহ তেমনি জায়গা আঁকিয়া দিয়া তাহাদের দ্বারা খনন করাইয়া লইবে। ক্রমে সেই জমিতে কেয়ারি করিয়া মেথি ও ধনিয়ার বীজ বুনিবে। অধিকন্তু এই ঋতুমধ্যে জন্মাইবে এরূপ ফুলগাছের বীজও কিঞ্চিৎ আনিয়া বপন করিবে। অর্থাৎ একসঙ্গে আনন্দ ও কাজ দুই-ই হইবে। এই বাগানে তুমিই জল দিবে, তাহা হইলে অনায়াসে ব্যায়ামও হইবে। আমি ঘরে আসিয়া সন্ধ্যাকালে তোমার এই বাগানেই পাঠ করিব।" এইরূপ বলিয়া পরদিবস উঠিবার সময়ই সেইকথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। আমিও তাহার কথানুযায়ী মজুর ডাকিয়া সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত কার্য্য সমাপ্ত করিয়া রাখিলাম। সন্ধ্যাকালে স্বামী বাড়ী আসিবার পর আমরা গাড়ী করিয়া বেড়াইতে গেলাম ও ফিরিবার সময় কিঞ্চিৎ ফুলগাছের বীজ লইয়া আসিলাম।

পরে দুএকদিনেই এই নবকৃত উদ্যানে চৌকি পাতিয়া সন্ধ্যাকালে পাঠ করিতেছি, এমন সময় বাঙ্গলা সংবাদপত্র বিতরণকারী একব্যক্তি আসিয়া পত্র দিতে আরম্ভ করিবে কিনা জিজ্ঞাসা করিল। আমি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলাম "বাবা! আমাদের কাগজ চাই না! বাঙ্গলা পড়িতে পারিনা, শুধু শুধু কাগজ লইয়া কি হইবে?" লোকটি আমার কথায় লক্ষ্য না দিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল। তিনি তাহাকে বলিলেন—"আজ আনিয়াছ দাও। কাল হইতে আনিও না। আগামী সোমবার লইয়া আসিও—তারপর দিতে আরম্ভ করিও।" এই কথা শুনিয়া আমার একটু চমৎকার বোধ হইল, কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। লোকটি বাহির হইয়া যাইলে, উনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "যাঁহাদের দেশে আসিয়া দুই চারি মাস থাকিতে হইবে তাঁহাদের ভাষা আমরা বুঝি না, এরূপ বলিতে আমার লজ্জা বোধ হয়।" আমি বলিলাম "যাহা নিজের ভাষা নহে তাহা জানি না বলিতে লজ্জা কিসের? এক্ষণে যদি আবার শিখিতে মন হয় তাহা হইলে কিরূপে ঘটিয়া উঠিবে এবং শিখাইবেই বা কে?"

স্বামীর বাঙ্গলা অক্ষরপরিচয় মাত্র ছিল, কিন্তু ভালরূপ পড়িতে পারিতেন না, এ কথা আমার জানা ছিল বলিয়া আমি ইচ্ছা করিয়াই বলিলাম "বেশ, তবে আমি শিখিব এরূপ ইচ্ছা হইলে কাল হইতে তাঁহাকেই শিখাইতে হইবে। আমি প্রস্তুত আছি; পরন্তু আর কাহারও কাছে আমি শিখিব না। এই কথা শুনিয়া তিনিও বলিলেন "ভাল কথা।" কিন্তু নিত্য যেমন রহস্য করিয়া কথা বলেন বা উত্তর দেন আজ সেরূপ বলিলেন না। পরন্তু কোনও বিষয় চিন্তা করিতেছেন আকারে এইরূপ বোধ হইল। আমি মনে মনে অতিশয় লজ্জিত হইলাম। আমার কথায় রাগ হয় নাই ত? এইরূপই বোধ হইল। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনও কথাবার্ত্তাই হইল না।

সে দিবস সেইরূপই গেল। পর দিবস চা পানান্তে প্রাত্যাহিক ভ্রমণে বাহির হইলেন। পরন্তু নিত্যাপেক্ষা বিলম্ব হওয়ায় আমি পথ চাহিয়া বসিয়া রহিলাম—এমন সময় তিনি আসিলেন। সঙ্গে একজন চাপরাশি; তাহার হাতে ছোট বড় দশ পনরখান পুস্তক ছিল। সে সেগুলিকে টেবিলের উপর রাখিল, আমি নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলাম। তাহা হইতে দু একখানি পুস্তক খুলিয়া দেখিলাম। সেগুলি বাঙ্গলা ও ইংরাজী পুস্তক। এ পুস্তকগুলি আনিলেন কেন? আমার মুখ দিয়া এরূপ কথা বাহির হইতে না হইতে পূর্ব্ব দিবসের কথা স্মরণ হওয়ায় চুপ করিয়া রহিলাম। স্বামীর ঘর্ম্মসিক্ত জামা খুলিয়া অন্য জামা পরিতে দিলাম এবং তাঁহার পানের জন্য দুধ আনিতে যাইতেছি এমন সময় তিনি বলিলেন "বইগুলি মিলাইয়া লইয়া ফর্দ্দে লিখিত দাম দিয়া দাও বুঝিলে?" আমি "হাঁ" বলিয়া ফর্দ্দানুরূপ পুস্তক মিলাইয়া লইয়া দাম দিলাম। তারপর দুধ আনিয়া দিলে তিনি পানান্তে টেবিল হইতে একখানি বই লইয়া উল্‌টাইতে আরম্ভ করিলেন। আমি সেই বৈঠকখানা হইতে দূরে একখানি চৌকিতে সংবাদপত্র পড়িতে বসিলাম। পরন্তু মধ্যে মধ্যে তিনি কি করিতেছেন দেখিতে লাগিলাম। কারণ এতগুলি পুস্তক তিনি স্বয়ং যাইয়া ক্রয় করিয়া আনিলেন, ইহার উদ্দেশ্য আমি বুঝিতে পারিলাম না। তিনি বাজারে যান বা জিনিষ ক্রয় করেন, এ আমার কখনই জানা ছিল না। সারা জীবনে তাঁহার বাজার করার এই প্রথম প্রসঙ্গ। আদৌ পয়সা হাতে লয়েন না বা কাছে রাখেন না এ তাঁহার চিরন্তন নিয়ম।

এগারটা পর্য্যন্ত বই উল্‌টান হইল। কোনওরূপে পুস্তক পাঠ করিতে প্রযত্ন করা হইল। কিন্তু বহু দিবস পূর্ব্বে শিখিয়া ভুলিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য অক্ষর ঠিক করিতে পারিতেছেন না বলিয়া বোধ হইল। এগারটার সময় আমি রন্ধন হইয়াছে বলায় স্নান করিতে উঠিলেন। যাইতে যাইতে চাপরাশিকে বলিলেন যে, আমি ভোজন করিয়া ফিরিবার পূর্ব্বে তুমি বাজারে যাইয়া একটি শ্লেট ও পেন্সিল লইয়া আইস, বিলম্ব করিও না।" আহারান্তে পুনশ্চ বৈঠকখানায় আসিয়া আনীত শ্লেট হাতে লইলেন এবং সেই পুস্তকসমূহ মধ্যে একখানি পুস্তক লইয়া শ্লেটে মূল অক্ষর লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এ পর্য্যন্ত প্রত্যহ যেমন মধ্যে মধ্যে রহস্য বা ব্যঙ্গ করিয়া কথা কহেন, আজ তাহার কিছুই নাই। সমস্ত লক্ষ্য এই নূতন পাঠে অভিনিবিষ্ট।

সন্ধ্যাকালে গাড়ীতে বেড়াইতে যাইবার পূর্ব্বে যে পুস্তক পাঠ করিতে আটকাইতেছিল, তাহা উচ্চৈঃস্বরে এবং দ্রুতভাবে এমন পাঠ করিলেন এবং পুস্তকখানি নীচে রাখিয়া পোষাক করিলেন। আমরা দুইজনে গাড়ীতে বেড়াইতে গেলাম। অনেক কথাবার্ত্তা হইল, কিন্তু প্রাতঃকালের পুস্তক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে আমার সাহস হইল না। স্বামী কথায় কথায় একবার সহজভাবে বলিলেন, "আজ বাঙ্গলা পড়িতে সমস্ত বেলা অতিবাহিত হওয়ায় রোজের কাজ কিছুই হইল না।" এই কথা শুনিয়া কিছুই উত্তর দিলাম না। কিন্তু আমি নিজে নিজেই অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিলাম, কারণ আমারই কল্যকার কথার দোষে আজ তাঁহার এত ক্লেশ হইল। বাঙ্গলা শিক্ষা পরিহার করিবার জন্যই—"স্বামী শিখাইলে তবে শিখিব, আর কারো কাছে শিখিব না" এইরূপ বলিয়াছিলেন আমি কেবল মাত্র "হাঁ" বলিলেই কোনও বাঙ্গলার মাষ্টার আনা হইত। কিন্তু আমার সেরূপ অভিরুচি নহে। কারণ একে ত আমি বাল্যকাল হইতে বিদ্যালয় কেমন তা জানি না, অধিকন্তু স্বামী ব্যতীত কোনও পুরুষের নিকট শিক্ষা করিবারও কোনও উপলক্ষ কখনও ঘটে নাই। এক্ষণে স্বামীর অবসর নাই বলিয়া এবং বাঙ্গলা বহু দিবস পূর্ব্বে শিখিয়া এক্ষণে ভুলিয়া গিয়াছেন বলিয়া, শিখাইবার জন্য কোনও মানুষ রাখিবার সম্ভাবনা হইলে, এড়াইতে হইবে, এই স্থির করিয়াই আমি পূর্ব্বদিন ওরূপ বলিয়াছিলাম। কিন্তু এই কথাতেই এরূপ জেদ হইয়া সমস্ত পরদিবস তিনি প… চর্চ্চায় কাটাইলেন, এ নিমিত্ত আমি বড় অনুতপ্ত ও ক… হইলাম। রাত্রিতে কথায় কথায় অস্পষ্টভাবে এই ক… বিষয় তাঁহাকে কিছু বলিয়া আমার মনের ভার ক… লঘু হইল।

পর দিবস প্রাতে বেড়াইতে যাইবার পূর্ব্বে, তিনি… লইয়া ও তাহাতে বাঙ্গলার মূল অক্ষরাবলী লিখিয়া আমা… দিলেন এবং দুই একবার পড়িয়া দিয়া, তাঁহার ঘরে ফিরিব… পূর্ব্বে আমাকে অক্ষরগুলি তৈয়ারী করিয়া রাখিতে ব… লেন। আমিও তাঁহার ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে সমস্ত অ… তৈয়ারী করিয়া আবার লিখিয়া রাখিলাম।

স্বামী ঘরে আসিয়া প্রাত্যাহিক কার্য্যাদি করিয়া ক্ষৌর… করিতে করিতে একখানি বাঙ্গলা বই হাতে লইয়া উচ্চৈঃস্ব… পড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং যে শব্দ আটকাইল তাহ… অক্ষর ও উচ্চারণ সেই নাপিতকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগি… লেন। এইরূপ ব্যাপার চলিতে লাগিল। আমি পাশে… ঘরে বসিয়া পড়িতেছিলাম। সেস্থান হইতে বৈঠকখান… অন্য কে কথা কহিতেছে, এইরূপ শুনিলাম। তখন, কে… তাহা হইলে দেখা করিতে আসিয়াছে, এইরূপ বুঝিয়… লোকটি কে দেখিবার জন্য উঠিলাম; কিন্তু দেখিলাম… আর কেহই নহে। বাঙ্গলা পুস্তক হস্তে উনি উচ্চৈঃস্ব… পড়িতেছেন এবং পার্শ্বস্থ নাপিত শব্দের উচ্চারণ ও অ… বলিতেছে। ইহা দেখিয়া আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারি… লাম না। লোকটি বাহিরে যাইবা মাত্র আমি অগ্রস… হইয়া বলিলাম "মাষ্টার তাহা হইলে বেশ পাইয়াছেন দত্তাত্রেয় যেমন চব্বিশ জন গুরু করিয়াছিলেন, তেমনি এখন কার গুরুগণের নাম করিতে যদি কেহ আমাকে বলে, তাহ… হইলে এই গুরুর নামই আমি প্রথমে বলিব। পূর্ব্বে গুরু… কাছে শিক্ষা করিতে হইলে তাঁহার সেবা করিতে হইত, কিন্… এই গুরু বেচারী পক্ষান্তরে এখানে দাসত্ব করিতেছে এজন… ইহার নাম আগেই হওয়া উচিত।"

এইরূপে এত অধিক বয়সে উনি স্বয়ং শিখিয়া আমাকে… শিখাইতে লাগিলেন দেখিয়া আমার অতিশয় আশ্চর্য্য বোধ… হইল। আমার কথায় জেদী হইয়া তিনি এইরূপে নিজে… বহু দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সম্পাদন করিতে করিতেও আমাকে… বাঙ্গলা শিখাইবার জন্য স্বয়ং শিখিবার কষ্ট সহ্য করিলেন।

এইরূপে বাঙ্গলা শিখিবার ব্যবস্থা হওয়ায় আমি একমাস দেড় মাসের মধ্যেই ভালরূপে বাঙ্গলা পড়িতে শিখিলাম। সঙ্গে সঙ্গে গৃহপ্রাঙ্গণে রচিত উদ্যানে মেথি ও ধনিয়া ঘনভাবে গজাইল এবং বিলাতী ফুল গাছেও ফুল ফুটিল। সেখানে আমরা চৌকি পাতিয়া বসিয়া, কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে যে বাঙ্গলা সংবাদপত্র চাই না বলিয়াছিলাম, সেই সংবাদপত্র এক্ষণে লইতে আরম্ভ করিয়া, প্রত্যহ সেই স্থানে পড়িতে লাগিলাম। ক্রমে পুস্তক পাঠ অভ্যাস হইল। কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় বিষবৃক্ষ, দুর্গেশ-নন্দিনী, আনন্দমঠ প্রভৃতি আরও কতকগুলি উপন্যাস লইয়া আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।*

শ্রীপান্নালাল দে।

* এই প্রবন্ধটি খিদিরপুর মাইকেল লাইব্রেরীতে পঠিত হইয়াছিল।

বনবাস।

কবে বনবাস অবসান হবে
জান যদি কেহ কহরে,
চৌদ্দ বরষ রয়েছি যে আমি
পাড়াগ্রাম ছাড়ি সহরে।
কাননে রামের কত সুখ ছিল
ছিল ফুল তরু লতা হে,
স্বচ্ছসলিলা ছিল গোদাবরী
ভুলাতে পারিত ব্যথা হে।
এখানে নাহিক বন-মর্ম্মর
বন বিহগের সাড়াটি,
অগাধ জলের বদলে পেয়েছি
ক্ষীণ কল-জল-ধারাটি।
কোথা আমগাছে ঝুল ঝাপ্পুর,
কোথা বটগাছে দুলবো,
কোথা অজয়ের সেই শ্যামকূল
যেথা বুনো ফুল তুলবো।

কোথা কস্‌কসে মটরের খেত
শশা কাঁকুড়ের ভুঁই গো
রাজা হব কোথা, বিমাতার মত
বনে পাঠাইলি তুই গো।
সুখের মিথিলা যাবো সমারোহে
কোথা হরধনু টুটতে
তুই মা আমারে বনে পাঠাইলি
মারীচের পিছু ছুটতে।
হাঁপ ছাড়িবার সময় নাহি গো
পেটেতে নাহিক অন্ন,
দিশেহারা হয়ে ছুটেছি কেবল
স্বর্ণ-মৃগের জন্য।
আর কি তোমার কোমল কোলে মা
পাবনাক আমি ফিরতে,
শৈশব-সুখ স্বর্গ আমার
সরযুব তীর তীর্থে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

রাজনৈতিক সুধীবচন।

"কিং ভক্তেনাসমর্থেন কিং শক্তেনাপকারিণা।
ভক্তং শক্তং চ মাং রাজন্নাবজ্ঞাতুং ত্বমর্হসি॥"

অসমর্থ ভক্ত কি করিতে পারে? অপকারী শক্তও ভাল কিছু করে না। অতএব হে রাজন্, ভক্ত ও শক্ত আমাকে আপনার অবজ্ঞা করা উচিত নয়।

"অতিব্যয়োঽনবেক্ষা চ তথার্জ্জনমধর্ম্মতঃ।
মোক্ষণং দূরসংস্থানং কোষব্যসনমুচ্যতে॥"

অতিব্যয়, পরিদর্শনের অভাব, অধর্ম্ম উপায়ে অর্জ্জন, অবারিত দান, আর দূরে রাখা, এই সব রাজার পক্ষে কোষ সম্বন্ধীয় ব্যসন।

"ক্ষিপ্রমায়মনালোচ্য ব্যয়ানশ্চ স্ববাঞ্ছয়া।
পরিক্ষীয়ত এবাসৌ ধনী বৈশ্রবণোপমঃ ॥"

সম্যক্ আলোচনা না করিয়া তাড়াতাড়ি যে কোন কার্য্যে আয় করিবার চেষ্টা, ইচ্ছামত ব্যয়,—ইহাতে কুবেরের মত ধনী ও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

"যো যত্র কুশলঃ কার্য্যে তং তত্র বিনিযোজয়েৎ।
কর্ম্মস্বদৃষ্টকর্ম্মা যঃ শাস্ত্রজ্ঞোঽপি বিমুহ্যতি ॥"

যে কার্য্যে যে কুশল, তাকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হয়। যে কার্য্যে যার অভিজ্ঞতা নাই, শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও সে কার্য্যে ব্যর্থ হইবে।

"একং হন্যান্ন বা হন্যাদিষুর্মুক্তো ধনুষ্মতা।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতা যুক্তা হন্তি রাষ্ট্রং সনায়কম্ ॥"

ধনুর্ধারীর ধনু হইতে মুক্ত বাণ কাহাকে হত্যা করিতেও পারে, নাও করিতে পারে। কিন্তু বুদ্ধিমানের যুক্তিযুক্ত বুদ্ধি নায়কসহ রাজ্যও নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে।

"ন তচ্ছস্ত্রৈর্ন নাগেন্দ্রৈর্ন হয়ৈর্ন চ পত্তিভিঃ।
কার্য্যসংসিদ্ধিমভ্যেতি যথা বুদ্ধ্যা প্রসাধিতম্ ॥"

বুদ্ধি দ্বারা কার্য্য করিলে যেরূপ সিদ্ধি হয়, সেরূপ অস্ত্রে, হস্তিবলে, অশ্ববলে বা সৈন্যবলেও হয় না।

"দুর্য্যোধনঃ সমর্থোঽপি দুর্ম্মন্ত্রী প্রলয়ং গতঃ।
রাজ্যমেকশ্চকারোচ্চৈঃ সুমন্ত্রী চন্দ্রগুপ্তকঃ ॥"

দুর্য্যোধন সমর্থ হইয়াও কুমন্ত্রীর প্রভাবে বিনষ্ট হইলেন। আর সুমন্ত্রী চন্দ্রগুপ্ত একাই রাজ্যকে উন্নত করিয়া তুলিলেন।

"সভা বা ন প্রবেষ্টব্যা বক্তব্যং বাসমঞ্জসম্।
অব্রুবন্বিব্রুবন্নাপি নরো ভবতি কিল্বিষী ॥"

সভায় বরং যাইবে না, কিন্তু গেলে সঙ্গত কথা বলিবে। সঙ্গত কথা যে বলে না, অথবা অসঙ্গত কথা যে বলে, দুই জনেই পাপের ভাগী হয়।

"মাতা পিতা গুরুর্ভ্রাতা ভার্য্যা পুত্রঃ পুরোহিতঃ।
নাদণ্ড্যো নাম রাজ্ঞোঽস্তি স্বধর্ম্মে যোন তিষ্ঠতি ॥"

মাতা, পিতা, গুরু, ভ্রাতা, ভার্য্যা, পুত্র বা পুরোহিত যিনি হউন, যদি স্বধর্ম্মে না থাকেন, তবে রাজার অদণ্ডনীয় তাঁহারা হন না।

"তস্করেভ্যো নিযুক্তেভ্যোঃ শত্রুভ্যঃ নৃপবল্লভাৎ।
নৃপতি নিজলোভাচ্চ প্রজাং রক্ষেৎ পিতেব হি ॥"

তস্কর হইতে, আপনার নিযুক্ত লোক হইতে, আপনার প্রিয়জন হইতে এবং নিজের লোভ হইতে পিতার ন্যায় রাজা প্রজাদের রক্ষা করিবেন।

"বিষদিগ্ধস্য ভক্তস্য দন্তস্য চলিতস্য।
অমাত্যস্য চ দুষ্টস্য মূলাদুদ্ধরণং সুখম্ ॥"

বিষাক্ত খাদ্য, চলিত দন্ত এবং দুষ্ট অমাত্য—একেবারে সমূলে তুলিয়া ফেলিতে হয়।

"যত্রাযুদ্ধে ধ্রুবং মৃত্যু র্যুদ্ধে জীবিত-সংশয়ঃ।
তমেব কালং যুদ্ধস্য প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥

যখন যুদ্ধ না করিলে বিনাশ নিশ্চিত, যুদ্ধে জীবনরক্ষা পাইতেও পারে, তখন যুদ্ধই কর্ত্তব্য, বিজ্ঞেরা এইরূপ বলেন।

"অযুদ্ধে হি যদা পশ্যন্নকিঞ্চিদ্ধিতমাত্মনঃ।
যুধ্যমানস্তদা প্রাজ্ঞো ম্রিয়তে রিপুণাসহ ॥"

যুদ্ধ না করিয়া কিছুই সুফল নাই যদি দেখা যায় বিজ্ঞ ব্যক্তি যুদ্ধ করিয়া শত্রুকে বিনাশ করিয়াই বিনাশ হন।

"জয়ে চ লভতে লক্ষ্মীং মৃতে বাপি সুরাঙ্গনাং।
ক্ষণবিধ্বংসিনঃ কায়াঃ কা চিন্তা মরণে রণে ॥"

জয়ে লক্ষ্মী লাভ হইবে, অথবা মরণে সুরাঙ্গনা লাভ হইবে, ক্ষণবিধ্বংসী এই দেহ,—রণে কি মরণে ভয় কি?

অজ্ঞাত।

বরষা রাতে শ্রাবণ ধারায়
তোমারি গান শোনাও কাণে
শারদ প্রাতের উজল আলোয়
চেয়ে থাকো মুখের পানে

ফাগুনেতে সাজিয়ে ধরা
পাঠাও প্রেম-উপহার
কিন্তু তুমি কে সে প্রেমিক
সে পরিচয় দিলে না আর।

শ্রীমতী অবলাবালা মিত্র

স্বপ্ন।*

সুদূর দেশ।

আকাশের উপরিভাগে একটি জগৎ আছে। সেখানকার কার্য্য-প্রণালী আমাদের কার্য্য-প্রণালী হইতে পৃথক।

তথায় একজন যুবক ও একজন যুবতী বাস করিত এবং তাহাদের মধ্যে অত্যন্ত সখ্য ছিল। উভয়ে উভয়কে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত। একের সুখে অন্যে সুখী হইত এবং একের দুঃখে অন্যে তাহার সমদুঃখ ভোগ করিত। এইরূপে তাহারা বাস করিত।

সমুদ্রতীরে একটি ঘনবৃক্ষসমন্বিত কাননের ভিতর একটি মন্দির ছিল। সেই কাননটি অতিশয় জঙ্গলাকীর্ণ হওয়ায়, সাধারণের প্রবেশ সহজসাধ্য ছিল না। সেই দেশে একটি প্রবাদ ছিল যে, যে নিশীথে এই মন্দিরের পাষাণ-ফলক নিজরক্তে রঞ্জিত করিতে পারিবে, সে যাহা কামনা করিবে তাহাই পূর্ণ হইবে। এই প্রবাদটি সাধারণে বিশ্বাস করিত কিনা জানি না। যদিও কেহ বিশ্বাস করিত, কিন্তু কেহই সেই জঙ্গলাকীর্ণ, হিংস্র জন্তুর আবাসভূমি কাননের মধ্যে প্রবেশ করিতে সাহস করিত না।

একদিন আমাদের উক্ত প্রণয়ীযুগলের মধ্যে, যুবতী তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষী যুবকের মঙ্গলের জন্য, সেই দুঃসাধ্য কার্য্য সাধন করিতে কৃতসঙ্কল্পা হইল, এবং অতিকষ্টে সেই ঘন জঙ্গল ও বৃক্ষরাজি ভেদ করিয়া মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে একখানি প্রস্তরখণ্ড লইয়া নিজ বক্ষে আঘাত করিবামাত্র ঝর্ ঝর্ করিয়া বক্ষ হইতে রক্ত পড়িতে লাগিল, এবং সেই রক্তে মন্দিরের প্রস্তর-ফলক রঞ্জিত হইল। তারপর কে যেন বলিল,—"তুমি কি কামনা কর?" যুবতী বলিল,—"যাহাতে আমার প্রেমভাজন যুবকের মঙ্গল হয়, তাহাই করুন।"

তখন আবার উত্তর হইল,—"কি বর দিলে তোমার প্রেমভাজন যুবকের মঙ্গল হইবে?" যুবতী বলিল,—"তাহা আমি জানি না। যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গল সাধিত হয় তাহাই করুন।"

তখন উত্তর হইল,—"তাহাই হইবে।"

যুবতী নিজবস্ত্রাঞ্চলে বক্ষ আচ্ছাদিত করিয়া, মনের হর্ষে, যে পথদিয়া বনে প্রবেশ করিয়াছিল সেই পথদিয়া বাহির হইবার জন্য দৌড়িতে লাগিল। তখনও তাহার বক্ষ বাহিয়া রক্ত ঝরিতেছিল, কিন্তু সে তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দৌড়িতে লাগিল। তাহার পদতলে শুষ্ক পত্ররাজি মর্ম্মর শব্দ করিতে লাগিল। ওদিকে সমুদ্রতীরের বালুকার উপর চন্দ্র-কিরণ পতিত হইয়া, এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিয়া পড়িতেছিল, এবং জলকণা সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছিল। তাহার উপর চন্দ্রকিরণ পড়িয়া মুক্তার ন্যায় ঝক ঝক করিতেছিল।

যুবতী ছুটিতে ছুটিতে হঠাৎ থামিল,এবং দেখিল একখানি তরণী তর্ তর্ শব্দে তীরভূমি হইতে অগাধ সমুদ্রের দিকে ঐ ছুটিয়া যাইতেছে! এবং একজন আরোহী নৌকার উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। যুবতী চন্দ্রালোকে যাহা দেখিল; তাহাতে সে অতিশয় চিন্তান্বিত হইল।

এমন সময় কে একজন বলিল,—"কি হইয়াছে?" যুবতী বলিল,—"যাহার মঙ্গলের জন্য আমি নিজের জীবনকেও বিপন্ন করিতে ভীতা হই নাই, সে আমাকে ছাড়িয়া যাইতেছে।" পূর্ব্বকণ্ঠে আবার উত্তর হইল,—"তুমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাহাই ত পূর্ণ হইয়াছে।" যুবতী বলিল,—"সে কি?" উত্তর হইল,—"তোমার নিকট হইতে দূরে থাকাই এখন যুবকের পক্ষে শ্রেষ্ঠ মঙ্গল। তুমি ইহাতে সুখী ত?" যুবতী দ্বিধা ভরে বলিল,—"হাঁ আ-মি—সু-খী।

শ্রীশেফালিকা কুণ্ডু।

* Dreams—By Olive Schreiner হইতে অনুমদিত।

যৌবন।

আছে বিশ্বে যতদিন মলয় বাতাস
কোকিলের আছে কুহুতান,
চুত মুকুলের ফুলে আছে মধুবাস
মৌমাছির কণ্ঠভরা গান
ততদিন ঠিক যেন রয়েছে ফাগুন
যৌবন-বসন্ত ভরা মনের আগুন।

যতদিন জাহ্নবীর আছে কলরোল
রসকেলি জোয়ার ভাটার
মহাসমুদ্রের বুকে তরঙ্গ-হিল্লোল
আর্ত্তনাদে করে চুরমার
ততদিন ঠিক যেন রয়েছে ফাগুন
যৌবন-বসন্ত ভরা মনের আগুন।

যতদিন চুম্বকের আছে আকর্ষণ
পতঙ্গেরে দহে শিখানল
গিরিবক্ষ দীর্ণ করে গুপ্ত প্রস্রবণ
উঠে পরে গ্রহ তারাদল
ততদিন ঠিক যেন রয়েছে ফাগুন
যৌবন-বসন্ত ভরা মনের আগুন।

যতদিন আছে মুখে এককণা হাসি
একবিন্দু আছে অশ্রুজল
এক তিল নাচে বুকে ভালবাসাবাসি
কাণাকাণি করে মর্ম্মস্থল
ততদিন ঠিক যেন রয়েছে ফাগুন
যৌবন-বসন্ত ভরা মনের আগুন।

শ্রীঅবনীকুমার দে।

নামহীন।

শনিবার। রাজেন তিনটের ট্রেনে আফিস থেকে বাড়ী ফিরছিল। গাড়ীখানা তৃতীয় শ্রেণীর। সে গাড়ীর এক অংশ থেকে অপর অংশে যেতে হ'লে বেঞ্চি ডিঙিয়ে যেতে হয়।

মাঝামাঝি রকমের ভিড়। রাজেন গাড়ীর একটা কোণ অধিকার করে বসেছিল। একটা লোক গাঁজার কল্‌কে হাতে নিয়ে গাড়ীর আর এক অংশে অবিরাম বকে যাচ্ছিল। কিন্তু রাজেনের মন তখন গাঁজাখোরের বক্তৃতা শোনবার মত অবস্থায় ছিল না।

বাঁশী শোনা গেল। ট্রেন চলতে আরম্ভ করেছে। রাজেন ভাবছিল—"দারিদ্র্য, দারিদ্র্য! দারিদ্র্যই সকল অনর্থের মূল। এই ত কত অজ্ঞাত, অখ্যাত লোক পাশটাশ করে দেশের এবং দশের মধ্যে নামজাদা হয়ে উঠ্‌ছে,—অর্থে, সামর্থ্যে, গৌরবে, আর কিসেই বা নয়! তারা যদি ভাল কাজ করে লোকে ধন্য ধন্য করবে; যদি মন্দ কাজ করে লোকে বলবে উনি যখন করছেন এটা কখনই মন্দ নয়, এর মধ্যে নিগূঢ় কোন অভিসন্ধি আছে। আর আমরা! যাই বলি, যাই করি, কেউ শুনবে না, কেউ গ্রাহ্য করবে না। আমরা যে সামান্য কেরাণীমাত্র, যোগ-জমাখরচ করে জীবন কাটাই। অথচ আমাদের কি বুদ্ধি ছিল না? চেষ্টা ছিল না? সহায়-সুবিধা একটু পেলে কিছুই কি করতে পারতুম না? বুদ্ধিশুদ্ধি হয়তো একটু ছিল, এখন আফিসের খাতাচাপা পড়ে মারা গেছে; কিন্তু চেষ্টা করেছি কই? আমাদের চেয়ে অসহায় অনেক নিরক্ষর লোকও ত নিজের চেষ্টায় স্বনামধন্য হয়ে গেছে। তবে আমরাই বা পারিনা কেন? কিছু না,—সহায়, সামর্থ, সুবিধা প্রভৃতি বাঁধা কথাগুলো আমাদের বেদনাতুর মনকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে আমরা নিজে গড়ে রেখেছি। আসল কথা চেষ্টা আমাদের মোটেই নেই। নেই ত নেই, কি আর করা যাবে!"—আপন মনে এই বলে রাজেন গাড়ীর জানালার উপর মাথা রেখে চক্ষু বুজে বসে রইল। ক্লান্ত মস্তকের কোঁকড়ানো চুলগুলো নিয়ে ফুরফুরে বাতাস খেলা করতে লাগলো। একটু বুঝি তন্দ্রা এসেছিল। সহসা কিসের শব্দে চম্‌কে জেগে দ্যাখে মাঝের একটা ষ্টেশন থেকে সাত আটজন কাবুলী সেই কামরায় এসে উঠেছে। হাতে তাদের লাঠি, কাঁধে বোচ্‌কা এবং কপাল বয়ে ঘাম ঝরছে।

ক্ষণকাল গাড়ীর এদিক ওদিক চেয়ে একজন কাবুলী রাজেনের কাছাকাছি এসে নাকি সুরে বল্লে—এ বাবু, তুম হুঁয়াপুর যাকে বৈঠো।

রাজেন—কাহে, তুম যাওনা।

কাবুলী—কেয়া বোলতা, তুম নেহি যাওগে।

রাজেন দৃঢ়স্বরে কহিল—কভ্‌হি নেহি।

'আলবৎ যানে হোগা।' বলে আর একটা কাবুলী রাজেনের হাত ধরলে।

একটানে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রাজেন বাঘের মত চোখ পাকিয়ে বল্লে—কভ্‌হি নেহি। তখন দু তিনজন কাবুলী মিলে রাজেনকে পাকড়াও করে বেঞ্চির ওপারে ঠেলে ফেলে দিলে।

গাড়ীর জনকতক বাঙ্গালীবাবু খুবই রেগে উঠেছিলেন, কিন্তু কাবুলীদের লাঠির বহর দেখে কেউ অগ্রসর হচ্ছিলেন না।

কেউ বলছিলেন—শিক্‌লিটানো, শিক্‌লিটানো।

কেউ হাঁকছিলেন—পুলিস, পুলিস! প্রত্যেক গাড়ীতে পুলিস না রাখা একটা মস্ত বেবন্দোবস্ত।

গাঁজাখোর লোকটা ব্যাপার দেখে প্রচুর হাসছিল।

রাজেন যখন সামলে উঠে বেঞ্চির উপর দাঁড়ালো, কাণদুটো তার লাল, চোখদুটো রক্তবর্ণ; ঘৃণায়, লজ্জায়, রাগে সর্ব্বাঙ্গ তার কাঁপছে। বিষহীন সাপের ল্যাজে পদাঘাত করলে সেও একবার মাথা তোলে। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ক্রমে রাজেনের শরীরে একটু বিষ তখনো অবশিষ্ট ছিল। তার দৃঢ়মুষ্টি আপনাআপনি বদ্ধ হয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠলো এবং পরমুহূর্ত্তেই দেশভাষায় আর্ত্তনাদ করে প্রথম কাবুলীটা রগে হাত দিয়ে বসে পড়লো।

তার পরেই দেখা গেল রাজেনের উপর শ্রাবণের বারিধারার মত ঘুসিবর্ষণ হচ্ছে। গাড়ীর ভদ্রলোকেরা রাজেনের জীবনরক্ষা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ঠেলাঠেলি ও হট্টগোল সুরু করে দিলেন।

মুহূর্ত্ত পরেই দেখা গেল ঘুসি পড়ছে একজন পাঞ্জাবী মুসলমানের উপর। এই ভদ্রলোকটি কোন গোলযোগ না করে কখন গিয়ে রাজেন এবং কাবুলীদের মাঝখানে পড়ে নীরবে মার খাচ্ছেন তা এতক্ষণ কারো চোখে পড়েনি। পাঞ্জাবী মুসলমানটি নিজে কাউকে মারছেন না, কেবল বিশাল দুই বাহু বাড়িয়ে দিয়ে কাবুলীদের একপাশে ঠেলে রেখেছেন যাতে তাদের উন্মত্ত ঘুসি রাজেনের গায়ে না লাগে।

একজন নিরপরাধ মুসলমানের উপর কতক্ষণ ঘুসি চালান যায়! কাবুলীরা নিরস্ত হয়ে রাজেনকে গালি দিতে আরম্ভ করলে।

তখন আহত কাবুলীর দিকে চেয়ে পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি মিষ্টি হাসি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—কেয়া কুছ যাস্তি চোট লাগা?

কাবুলী সে কথায় উত্তর না দিয়ে বল্লে— ও শালা বাঙ্গালী তোমরা বাবা হ্যায়?

ভদ্র লোকটি বল্লেন—নেহি, ভাই, ও হামারা ভাই হ্যায়।

এ রকম কথার উপর আর রাগ করা চলে না। কাবুলীরা নিজেদের মধ্যে নিজেদের ভাষায় কি সব বলাবলি করতে লাগলো।

গাড়ীর লোকেরা কেউ বলছিলেন পরের ষ্টেশনে গাড়ী থামলে ষ্টেশন মাষ্টারকে সকল কথা জানান উচিত।

কেউ বলছিলেন—উনি অনায়াসে মানহানির মোকদ্দমা আনতে পারেন।

কেউ বলছিলেন—আমরা সকলেই সাক্ষী দিতে রাজি আছি।

গাঁজাখোর লোকটা থেকে থেকে প্রচুর হাসছিল।

পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় বল্লেন—না, মহাশয়, ঐটি মাপ করবেন। আমরা গরীব ভারতবাসী, মামলা মোকদ্দমা করবার সময়ও নেই আর টাকাও নেই।

এই বলে তিনি রাজেনের হাত ধরে বেঞ্চির একপাশে বসে পড়লেন।

তিনি আর একটি কথাও বলেননি। রাজেনের সঙ্গে তিনিও মাথা হেঁট করে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। বলতে গেলে ইনি কিছুই করেননি। অপমানিত রাজেনের পক্ষ নিয়ে সেই অপমানের প্রতিশোধ নেবার কোন উদ্যোগই করেননি। রাজেনের প্রতি একটি সান্ত্বনার কথাও তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হয়নি তবুও তাঁর এই নিস্তব্ধ অবস্থিতি, এই বেদনা-জড়িত আনত-দৃষ্টি রাজেনের আঘাতের উপর চন্দন-প্রলেপ মাখাতে লাগলো। তাঁর সেই মৌন গাম্ভীর্য্যের অন্তরালে রাজেনের সকল অবমাননা ঢাকা

পড়ে গেল; রাজেনের ক্রোধরক্ত মুখমণ্ডল ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এল। কোন কালে চেনাশুনা ছিল না, কিন্তু কয় মুহূর্ত্তে এই দুটি পথিকহৃদয়ে যে নির্ব্বাক পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো তা বহুকালের বন্ধুত্বেও সম্ভব হয় কিনা সন্দেহ। হৃদয় হৃদয়ের সঙ্গে নীরব ভাষায় কথা কয়, মুখের ভাষার সঙ্গে সে ভাষার তুলনা হয় না।

গাঁজাখোরটা এতক্ষণ বসে হাসছিল। হঠাৎ তাকে বক্তৃতায় পেয়ে বসলো। লোকটা কালো, গলায় একটা পৈতে, মাথায় একটা টুপি, হাতে একটা কলকে। সে বলতে লাগলো—"মহাশয়গণ, আজকে যে দৃশ্য আমার চোখে পড়লো এমন বহুকাল পড়েনি। আমি আজ মুগ্ধ হয়ে গেছি। যদি দেখতুম একটা বাঙ্গালীর অপমান সাতটা বাঙ্গালী বুক পেতে নিয়েছে, একটা বাঙ্গালীর মাথার উপর নিক্ষিপ্ত জুতো সাতটা বাঙ্গালী মাথা পেতে নিয়েছে, তা হলে এতটা মুগ্ধ হতুম কিনা সন্দেহ। মশায়গণ, যে দেশে যে খানে যাবো আজকের এই ঘটনা আমি গল্প করে বেড়াবো; আমার প্রাণে আনন্দ আর ধরছে না। বাংলাদেশে জন্ম নিয়ে অপমানের প্রতিকার করতে যাওয়া কি আর শোভা পায়? লাঞ্ছনার বোঝা ভাগ করে নিতে হবে। হায় রে কবে আসবে সেই দিন যেদিন একজন ভারতবাসীর ঘাড়ে উৎপীড়নের বোঝা বইতে ঊনত্রিশ কোটি ঘাড় এগিয়ে আসবে!

"মশায়গণ, এই বাংলা দেশটা বড় মজার দেশ। আমি একমুহূর্ত্তে তাকে আপনাদের চোখের সামনে ধর্ত্তে পারি। এই দেখুন আমিই হচ্ছি বাংলা, যাকে আপনারা সোনার বাংলা শস্যশ্যামলা বাংলা প্রভৃতি বলে থাকেন।" এই বলে লোকটা নিজের শীর্ণ আঙ্গুল দিয়ে তার জীর্ণ, অস্থিসার বুকখানা দেখিয়ে দিলে। বল্লে "এই পৈতে দেখুন—আমি ব্রাহ্মণ; এই টুপী দেখুন—আমি মুসলমান; আর, এই পৈতে আর টুপী খুলে নিয়ে আপনারা আমাকে যা খুসী তাই বলুন—হাড়ি, মুচি, ডোম, কাওরা, কায়েস্থ!" বলতে বলতে লোকটা গাঁজার কলকে রেখে বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে উঠলো। তারপর হাড়সার হাত দুখানা তুলে কালো গোঁফদাড়িপূর্ণ মুখে অস্বাভাবিক একটা ভঙ্গী এনে বল্লে—"আর এই দেখুন আমি ম্যালেরিয়া। দুর্ভিক্ষ আমার ভাই, বন্যা আমার বোন, দুঃখ আমার আত্মীয় এবং লাঞ্ছনা আমার কুটুম্বিনী।

"আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন পরের দুঃখে, পরের অপমানে আমি হাসি কেন। উত্তরে আমি বলি যে, ঐ ভয়াবহ হাসিটুকু মাত্র আমি কায়ক্লেশে বাঁচিয়ে রেখেছি। ভাইএর অপমানে, আত্মীয়ের বেদনায় আমিও একদিন কাঁদতুম, কিন্তু কান্না আমার ফুরিয়ে গেছে। অত্যাচার দেখলে, অবিচার দেখলে শুধু একটা বাঁকা হাসি এই ঠোঁট দুখানার উপর জেগে ওঠে। রক্ত আমার শরীরে নেই। তা রক্ত গরম হবে কোথা থেকে। এই দেখুন না, হাত আমার বরফের মত ঠাণ্ডা। কিন্তু চিরদিনই এমনি ছিল না, দেখেছেন ত আমি কতখানি লম্বা। যুবাবয়সে আমি ঐ বাবুটির মতই জোয়ান ছিলুম। ঐ বাবুটি হয়তো কত মনে করছেন! কিছু মনে করবেন না মশাই। আমার কথা শুনলে আপনার অপমানটা অপমান বলেই মনে হবে না।

"আমি যখন আপনার মতন তখন আমার প্রথম ম্যালেরিয়ায় ধরে। ঘরে আমার পত্নী ছিলেন। তিনি আমার কি ছিলেন, কেমন ছিলেন সে কথা আপনাদের বলতে পারছি না। তিনমাস জ্বর ভোগের পর যেদিন প্রথম পথ্য পেয়ে একটু আরামে ঘরে শুয়ে আছি, আমার পত্নী আমার পদসেবা করছেন,—এমন সময়ে তিনটি অতিথি, আপনাদের এই বাংলামায়েরই তিনটি অতিকায় সুসন্তান পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে বাড়ীতে পদার্পণ করলেন। আমি তাঁদের স্বাগত সম্ভাষণ করবার আগেই তাঁরা আমাকে সুদৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করে ফেল্লেন। আবার পত্নী যখন অভ্যাগত-শুভাগমন-সংবাদ প্রতিবেশীদের কর্ণগোচর করবার উদ্যোগ করছেন সেই সময়ে একজন গিয়ে হঠাৎ তাঁর মুখের সঙ্গে নিজের গামছার আত্মীয়তা নিবিড় করে তুল্লেন। তারপর কি হল আমার আর স্মরণ নেই, আমি মুর্চ্ছিত হয়েছিলুম। তবে এইটুকু মনে আছে আমি কাতর আর্ত্তনাদে তাঁদের হাতে মরণ ভিক্ষা করেছিলুম। সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত আমার পত্নীকে খুঁজে পাইনি।"

"এখন আমার কেউ নেই, শুধু এই প্রাণের সহচর গাঁজার কলিকাটি।" এই বলে লোকটা কলিকার প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করতে লাগলো। হঠাৎ বল্লে "আপনারা বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু কল্কেটিই আমার ভগবান্।" ট্রেন একটা ষ্টেশনে এসে থামলো; পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি

রাজেনের হাত ধরে নেমে পড়লেন। তারপর রাজেনকে ট্রেনের অন্য এক কামরায় তুলে দিয়ে একটু হেসে বল্লেন—ওরে চন্দ্রমুখ, এই গ্রামেই আমাকে যেতে হবে।

রাজেন—আপনার নামটি পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

ভদ্রলোকটি পূর্ব্ববৎ হাসিমুখে বল্লেন—আমাদের মত অসমর্থ লোকের কোন একটা নাম না থাকাই ভালো।

গাড়ী ছেড়ে দিলে। ভদ্রলোকটি নমস্কার করে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাজেনও নমস্কার করে জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে তাঁর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। গাড়ী ছুটে চলেছে। ভদ্রলোকটিকে আর দেখা যাচ্ছে না। রাজেন তখনো দেখছিল দুটি হাসিফুল্ল চোখ তার মুখের পানে অনিমেষদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

শ্রীক্ষেত্রমোহন সেন বি এস্ সি।

দোললীলা।

মধুনিশি পূর্ণিমার গোলোকে ভূলোকে
হেরি মিলনের আয়োজন
কামিনী কোমল হিয়া খুলিছে পুলকে,
মধুময় বন উপবন।
জ্যোৎস্নায় কার পায় সপিতে যৌবন
বন্দী হ'তে প্রেম আলিঙ্গনে।
কোথায় চলেছে ভেসে দিশেহারা মন
সৌন্দর্য্যের মদির স্বপনে ?
কে রূপসী হাসিমুখে ধায় নীলাকাশে
সুষমায় ভুবন ভুলায়ে ?
রাধা কি চলেছে আজ রসময় রাসে
ভক্তচিত্ত-পুষ্পক দোলায়ে ?

তাই বুঝি তালে তালে ভ্রমর গুঞ্জরে
ঘেরি রাঙা চরণ-মঞ্জীর,
হাসিমুখে বনলতা পুলকে মুঞ্জরে
মুরছয় মলয় সমীর।
ফুলে ফুলে মালঞ্চের ভরেছে অঞ্চল
কুসুমেতে সেজেছে সুন্দরী
কূলে কূলে উছলয় যমুনার জল
হেলে দুলে নাচিছে লহরী।
আনন্দে নাচিছে আজি প্রাণের স্পন্দন
ছন্দে ছন্দে হৃদয় দোলায়,
মাধব মাধবী পরি' প্রেমের বন্ধন
লালে লাল মধুর লীলায়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চন্দ্র।

সাহিত্যে আবর্জ্জনা।

সেদিন একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং প্রবীণ মাসিকপত্র-সম্পাদক বলিতেছিলেন, যে বাঙ্গলা সাহিত্যের আদর্শ কি প্রকার হওয়া উচিত তাহা লইয়া বর্ত্তমান কতকগুলি লেখকের মধ্যে যে লড়াই বাধিয়াছে, উপস্থিত বাঙ্গালা সাহিত্য উহার প্রতিধ্বনিতে এরূপভাবে মুখরিত যে অপর কোন বিশেষ বিষয়ের আলোচনা পাঠকবর্গের কর্ণে পৌছান দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। আর মনে হয় দেশে আর কোনও সমস্যা নাই, আর কোনও কথার আলোচনারও প্রয়োজন নাই। যেন এই এক কথার উপরেই দেশের সকল মঙ্গল নির্ভর করিতেছে। ইত্যাদি।

সাহিত্যের আর্ট লইয়াই ইহাদের বিবাদ। একদল বলেন সাহিত্যের ভিতর একটা নীতির স্থান নাই, থাকিতেও পারে না। কোন বাধা না মানিয়া দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া কেবল ভাবের তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে উহা চলিতে থাকিবে, আর পাঠকগণ বিস্মিত সোৎসুক নেত্রে উহার গতির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকিবেন—উহার উদ্দেশ্য কি নীতির দিকে কেহ চাহিবেন না, কেবল উহার আর্টে মুগ্ধ হইয়া লেখককে ধন্য ধন্য করিবেন। আর একদল বলিতেছেন, পৃথিবীর সকল ব্যাপারেই একটা নীতি একটা বাধাবাধির ব্যবস্থা আছে। এই নৈতিক বন্ধনই মনুষ্যজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া অন্যান্য ইতর প্রাণীর সহিত তাহার পার্থক্য বিধান করিয়াছে,

নৈতিক বন্ধন ভিন্ন যেমন সমাজ চলে না, ব্যক্তিগত জীবনে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, সেইরূপ নৈতিক বন্ধন ভিন্ন সাহিত্যে যে উশৃঙ্খলতা আসিয়া পড়ে, তাহা সাহিত্যকে উন্নত করিতে পারে না; বন্ধনবিহীন সাহিত্য আলু থালু ভাবে উধাও হইয়া ছুটিয়া ব্যক্তিবিশেষ কিম্বা দলবিশেষের চিত্তানন্দদায়ক হইলেও মনুষ্যসমাজের আদর্শকে উহা খর্ব্ব করে। সাহিত্যের উদ্দেশ্য কেবল আনন্দ প্রদান নহে, মনুষ্যসমাজের শিক্ষা ও মঙ্গল সাধনও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। সুতরাং আর্টের দোহাই দিয়া সুনীতিবিহীন সাহিত্যের সৃষ্টি করা সামাজিক হিসাবে পাপ। ইংলণ্ডের মত সামাজিক স্বাধীনতার দেশেও "ইনক আর্ডেন" লিখিয়া টেনিসনকে সমাজের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছিল। যাঁহারা বলেন, বাঁধা বাঁধির মধ্যে ফেলিয়া আর্টকে খর্ব্ব করিব কেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে জগতে শৃঙ্খলা ও সংযম ভিন্ন প্রকৃত সৌন্দর্য্য দেখা যায় না, এবং সুশৃঙ্খল, সুনিয়ন্ত্রিত নৈতিকবন্ধনের সীমাবদ্ধ সাহিত্য বাস্তবিক পক্ষে আর্টকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া উহার প্রকৃত পরিস্ফুরণের সাহায্যই করিয়া থাকে।

কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যের আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত তাহা এ প্রবন্ধের বিচার্য্য নহে। সে বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তিগণ যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু আর্টের দোহাই দিয়া বাঙ্গলায় প্রভূত পরিমাণে ভাক্ত আর্টিষ্টের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহাদের লেখার আর্ট সাধারণে বুঝিতে পারে না। সাধারণে মূর্খ বলিয়াই পারে না, সেজন্য আর্টিষ্টকে কেহ কোন কথা বলিলে, আর্টিষ্ট মাপ করিলেও তাঁহার গ্রহ, উপগ্রহের হাত এড়াইবার উপায় নাই। সুতরাং এ বিষয়ে অতি সঙ্কোচ এবং সন্ত্রস্ততার সহিতই কথা বলিতে হয়। কিন্তু তবুও ভয়ে ভয়ে বলিতেছি, আর্টের দোহাই দিয়া ইঁহারা সাহিত্যকে পঙ্কিল করিতেছেন, এবং উভয় পক্ষের বাক্‌বিতণ্ডায় সাহিত্যে প্রভূত আবর্জ্জনার সৃষ্টি হইতেছে। প্রবীণ সাহিত্যিক এবং সম্পাদকগণ বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রাঙ্গন পরিমার্জ্জিত ও সংস্কৃত রাখিতে ইচ্ছা করিলে, তাঁহাদিগকে সাবধান হইতে হইবে এবং সমালোচনার সম্মার্জ্জনীর তাড়নায় সর্ব্বদা এই প্রাঙ্গণ পরিষ্কার রাখিতে হইবে। নতুবা এত আবর্জ্জনা জমিয়া যাইবে যে পরে ভদ্রসম্প্রদায় ঐ প্রাঙ্গন মাড়াইতে ইতঃস্তত করিবেন। বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রথম আমলে "চণ্ডালের হাড় দিয়া পুস্তক পোড়াইয়া ভস্মরাশি করিয়া কর্ম্মনাশার জলে ফেলিবার" ব্যবস্থা দিবার লোক ছিলেন। তাঁহারা সাহিত্যের বাজারে কর্তৃত্ব করিয়া সমস্ত আবর্জ্জনা দূরে রাখিয়াছিলেন। এখন সাহিত্যে সেরূপ কোন নেতা নাই। মাসিকপত্রের সম্পাদক এবং সমালোচকগণের সাহিত্যের উপর আর সে প্রভুত্ব নাই, সুতরাং এই আবর্জ্জনা ক্রমেই জমিয়া যাইতেছে। অনেকের মতে উদীয়মান সাহিত্যে এই আবর্জ্জনা অপরিহার্য্য এবং সাধারণের মতের আগুনে তেল পুড়িয়া আসলই পরে থাকিয়া যাইবে। কিন্তু দেশে সেই আগুণের অতিশয় ক্ষীণতাই উপলব্ধি হইতেছে,—সমালোচনার ফুৎকারে ঐ আগুণকে প্রজ্বলিত করিয়া সাহিত্যের বিশুদ্ধতা পরিরক্ষা করিতে হইবে।

সমালোচনা দেশে নাই এ কথ বলিতেছি না, কিন্তু যে সমালোচনা দেখিতে পাইতেছি উহা কেবল লেখকের গ্রহ উপগ্রহের স্তুতিবাদ বলিয়া মনে হয়। যথার্থ সমালোচক দেশে থাকিলে বাঙ্গলা সাহিত্য উশৃঙ্খল ভাব ও সুনীতিভ্রষ্ট কল্পনায় এরূপ লঘু, চঞ্চল ও খামখেয়ালী হইত না। বাঙ্গালা কবিতা রসভাব বিহীন উদ্দাম বাক্যস্রোতে পরিণত হইত না এবং বাঙ্গলা গল্প কষ্টকল্পিত, সৌন্দর্য্য বিহীন, দীর্ঘ প্লটের অসার আখ্যানের সেন্টিমেন্টালিজমে আসিয়া পৌছিত না।

বাস্তবিক পক্ষে এখন বাঙ্গলা সাহিত্যে উচ্চ অঙ্গের জ্ঞানালোচনা একেবারে নাই বলিলেও বোধ করি অত্যুক্তি হয় না। ইহার প্রধান অঙ্গই হইয়াছে গল্প ও কবিতা। সাহিত্যের আর্টের বিচারও এই দুই অঙ্গ লইয়াই —চলিতে পারে। ফলতঃ আবর্জ্জনার সৃষ্টিও ইহাতেই হইতেছে। সমালোচনার দৌরাত্ম্যে এই আবর্জ্জনার পরিমাণ বাড়িয়া সাহিত্যকে সাধারণের পক্ষে ক্রমেই দুরূহ করিয়া তুলিতেছে।

প্রথমে কবিতার কথাই ধরা যাক্। বাঙ্গালায় অসংখ্য কবির উদ্ভব হইয়াছে। বাঙ্গালা মাসিকের কলেবরের অনেকাংশ কবিতায় পূর্ণ থাকে, সুতরাং কবিতার পাঠক নাই—এ কথা বলিতে পারি না। কিন্তু এই সকল কবিতার মধ্যে কতগুলি স্থায়ী সাহিত্যে স্থান পাইবে, তাহা বিবেচনা করিতে গেলে প্রাণে বড় আশার সঞ্চার হয় না। কবিতায় মৌলিকতা এবং সৌন্দর্য্য এখন লেখকদের

বিবেচনার জিনিষ নহে এখন আসল বিবেচনার জিনিষ হইয়াছে অনুকরণ। পাকা হাতে অনুকরণ দোষের নহে, কিন্তু যে সে অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিলেই উহা অতি হাস্যকর হইয়া দাঁড়ায়। বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা দাঁড়াইয়াছেও তাহাই। কেবল "কোকিল কুজিত কুঞ্জ কুটীর" "নিরাশার প্রাণ" "জ্যোৎস্নার আলোক" "মলয় সমীরণ" "উদাস হৃদয়" "কুসুম স্তবক" "হৃদয়ের কপাট" "স্তিমিত আলোক" "নিস্তব্ধ রজনী" "পিপাসী প্রাণ" "নিদাঘ সমীরণ" "আকুল প্রাণ" "চষা ক্ষেত" "ঘন বাঁশবন" "স্তিমিত নেত্র" "কুসুমিত উপবন" এবং "সারি সারি তাল গাছ" প্রভৃতিতে বাঙ্গালার কবিতা পূর্ণ। ইহার বাক্‌বুনির ভিতর কেহ সৌন্দর্য্য, উচ্চ ভাব এবং মৌলিকতা সন্ধান করিয়া বাহির করিতে না পারেন, তবে তাহা পাঠকের মূর্খতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

অনুকরণ দোষের নহে, যদি ঐ অনুকরণ, যাহার অনুকরণ করা হইতেছে তাহারই মত কিম্বা তাহারই কাছাকাছি প্রতিভাশালী লোকের হাতে হয়। নতুবা সাধারণ লোকের পক্ষে অতি উচ্চ অঙ্গের লেখার অনুকরণ সম্ভবপর নহে। এইরূপ অনুকরণ প্রায়ই বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। ইহার একটি উদাহরণ মেঘ দূতের অনুকরণে হংসদূত এবং পদাঙ্কদূতের ঝঙ্কার এবং মৌলিকতা বিবর্জ্জিত শ্লোক। বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহার কোন উদাহরণ দিতে চাই না। বাস্তবিক পক্ষে, যথার্থ প্রতিভাহীন লোক সোজা কথায় সাধারণ লেখক হইতে চান চেষ্টা করিতে পারেন, তাঁহার বক্তব্য উপযুক্ত মনে করিলে সকলেই মনোযোগ দিয়া শুনিবে, কিন্তু তাহার পক্ষে কবি হইবার চেষ্টা করা বৃথা এবং পাঠকবর্গকে ব্যতিব্যস্ত করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রসিদ্ধ মার্কিন লেখক Holmes বলিয়াছেন —

"Unpretending mediocrity is good and genius is glorious, but a weak flavour of genius in an essentially commonplace person is detestable"

কথাটা সকল দেশের পক্ষেই সমান ভাবে খাটে—অতি সাধারণ লোকের মধ্যে ক্ষীণ প্রতিভার একটু চিকমিকি আলো বাস্তবিকই ঘৃণিত না হইলেও বিরক্তিকর। বাঙ্গালার কবিযশ-প্রার্থিগণকে একথা মনে করিয়া চলিতে অনুরোধ করি। বাঙ্গালার বর্ত্তমান কবিতালেখকগণের মধ্যে প্রতিভাশালী লেখক নাই, একথা আমি বলিতেছি না, কিন্তু এরূপ লেখকের সংখ্যা খুব বেশী নহে। অধিকাংশ লেখকই বর্ত্তমান বাঙ্গালী চরিত্রের চুড়ান্ত সেণ্টিমেণ্টালিজ্‌মের উদাহরণ-সৃষ্টিতে ব্যস্ত।

কবি থাকিলেই তাহার সমালোচকের অভাব হয় না। বাঙ্গালায় সমালোচনার উপদ্রব কবিদিগের কাঁচুনিও ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। মনে করুন, কোন নব্য কবি কবিতা লিখিয়াছিলেন :—

গোলদীঘি-ধারে বসি সেলাই বুরুষ ডাকে জুতা দেহ দেহ।
মধুর সে ডাকশুনি পা হতে জুতা খুলি বলে লহ লহ।

পাঠকগণ ভাবিয়া বুঝিবার আগেই সমালোচক তান ধরিলেন—"কি মধুর কবিতা! যথার্থ কবি ভিন্ন এরূপ মহান্ উচ্চভাব পরিপূর্ণ কবিতা আর কাহারও লেখনী হইতে কিছুতেই বাহির হইতে পারে না। সামান্য দুই লাইন কবিতা বটে, কিন্তু ইহার ভিতর কি গভীর ভাব লুক্কায়িত রহিয়াছে, সাধারণ পাঠক হঠাৎ তাহা অনুধাবন করিতে পারিবেন না। পড়িবা মাত্র ইহা সেই সুবিস্তৃত গোলদীঘির সুচিক্কণ উর্ম্মিমালা-পরিশোভিত সলিল-রাশির সুমধুর শোভা মানসপটে উদিত করিয়া দেয়, গোলদীঘির চতুস্পার্শ্ববিরাজিত শ্যামল তরুগুল্মাদির অপূর্ব্ব শোভা হৃদয়ে প্রতিফলিত করে। সেই সলিল-স্নিগ্ধ সান্ধ্য সমীরণ, ভ্রমণ-বিহারী যুববৃন্দের বায়ুতাড়িত উড়ানির ও সার্টের বিচিত্র শোভা, সমভিব্যহারী নানা বর্ণের পরিচ্ছদ শোভিত বালক বালিকাগণের কণ্ঠোৎকীর্ণ মৃদু চীৎকারধ্বনি, কঠিন লৌহ-বেঞ্চোপরি দণ্ডায়মান স্বদেশী বক্তার হুঙ্কারপরিপূর্ণ সতেজ বক্তৃতা প্রভৃতি যুগপৎ মনের মধ্যে উদ্রেক করিয়া ইহা পাঠককে একেবারে বিহ্বল করিয়া ফেলে। তারপর গরীব সেলাই বুরুষের কথা—কবির সর্ব্বশ্রেণীর উপর কি উদার সহানুভূতি! সাধারণের চক্ষে ঘৃণিত এই সামান্য সেলাইবুরুষ পর্য্যন্ত তাঁহার করুণার চক্ষু এড়াইতে পারে নাই—কি মহানুভবতা! কি সর্ব্বজীবে সমান সহৃদয়তা! পাঠক তুমি বিদেশী "পিয়ের লোটীর" লেখাতে ইতর প্রাণীর উপর তাঁহার দয়া দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ধন্য ধন্য করিতে থাক, আর তোমারই স্বদেশী কবির তোমারই স্বদেশী সেলাই-

পুরুষের উপর দিয়া কোমলতা ও সহানুভূতি যদি তুমি এই কবিতা হইতে না বুঝিতে পার, তবে তোমার কোন আশা নাই! সাহিত্যক্ষেত্র ছাড়িয়া পালায়ন কর। যদি তোমার ধমনীতে বাঙ্গালী রক্ত প্রবহমান থাকে, তবে তুমি বুঝিতে পারিবে এই "জুতা দেহ দেহ" রবের ভিতর কি সুমধুর বস্তুতন্ত্রতা লুক্কায়িত রহিয়াছে। এ ডাক যে মধুর, তাহা কি আবার কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে? এ ডাকের কাছে কি কেহ স্থির থাকিতে পারে? কবি দেখাইয়াছেন যে এই মধুর ডাক শুনিবা মাত্রই "পদ হতে জুতা খুলি বলে লহ লহ"! অরসিক তর্ক করিবেন, ইহার কর্ত্তৃপদ কোথায়। যাঁহারা খাঁটী কবির খাঁটী কবিতার ভিতর ব্যাকরণের তর্ক ও ও ঝঞ্ঝাট উঠাইতে চান, তাঁহাদের জন্য এই কবিতা লিখিত হয় নাই। তাঁহাদিগকে ইহা পড়িতে বারণ করি।"

ইত্যাকার কবিতা এবং সমালোচনা বাঙ্গালা ভাষায় অভাব নাই। সাহিত্যের আবর্জ্জনা আর কাহাকে বলে?

এ ত গেল আধুনিক কবিতার কথা। আর এক শ্রেণীর "প্রেমিক এবং ভাবুক" জুটিয়াছেন, তাঁহাদের কাজ হইতেছে প্রাচীন কবিতা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়া উহার সমালোচনা করা। ইহাদের নিকট কবিতা প্রাচীন কিম্বা প্রাচীনতার আবরণে আবৃত হইলেই হইল। ছেঁড়া বই, কীটদষ্ট প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ও তালপাতায় লিখিত পুঁথি প্রভৃতি ঘাঁটিয়া যদি কিছু বাহির করা যায়, তাহা খাঁটী সোনা না হইয়া যায় না! প্রাচীন কবিতা দেখিলেই ইঁহারা একেবারে প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়েন। প্রাচীনের ভিতর যে রাবিশ থাকিতে পারে সে কথা তাঁহাদের মাথায়ই আসে না। সে কথা বলিলেও ইঁহারা বক্তার বাপান্ত করিয়া ছাড়েন। ধরা যাউক, একটা কবিতা আবিষ্কৃত হইল :—

> কৃষ্ণ যান চুপি চুপি চন্দ্রাবলীর কাছে।
> ঝাঁটা হাতে ধায় রাধা পঁহুর পাছে পাছে॥
> লম্ফ দিয়া উঠ্‌লেন প্রভু কদম্বেরি গাছে।
> কৃষ্ণদাস ভণে এমন প্রেম কোথায় আছে॥

অমনি সমালোচকের খোরাকী জুটিয়া গেল—সমালোচনা আরম্ভ হইল—"কি মধুর রসাত্মক পদাবলী! এরূপ রস প্রাচীন পদকর্ত্তাদেরই আয়ত্তাধীন ছিল! বর্ত্তমান কালের ইংরেজীনবীশ ছোকরা কবির দ্বারা এরূপ পদ সৃষ্টি করা দূরের কথা, ইহার গভীর ভাব পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিবে না। পাঠক অবিদিত নহেন যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধিকা ব্যতীত চন্দ্রাবলী প্রভৃতি কয়েকটী সখীর কুঞ্জে যাতায়াত ছিল—তবে শ্রীমতীর ভয়ে ঐ গমনাগমনটা একটু গোপনেই চলিত। একদিন রসময় চুপি চুপি চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যাত্রা করিয়াছেন। শ্রীমতীও কম চতুরা ছিলেন না। নিপট কপট বঁধুর এই গতির সন্ধান পাইয়া একবারে সম্মার্জ্জনী হস্তে তাঁহাকে তাড়না করিলেন। তখন রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন বড় বেগতিক—কিন্তু সমস্ত বিশ্বচরাচরের যিনি গতি করিতেছেন, তাঁহার কি উপস্থিত বুদ্ধির অভাব হইতে পারে? সম্মার্জ্জনী হস্তে শ্রীরাধিকাকে পশ্চাতে ধাবমানা দেখিয়া তিনি এক লম্ফে কদম্বতরু-শাখে আরোহণ করিয়া সমস্ত দিক রক্ষা করিলেন। যিনি নিজে চক্রী, তাঁহার হইতেই এই চক্রান্ত সম্ভবে। আহা! কি গভীর রসময়ী প্রেমের লীলা! অতি গূঢ় রহস্য ইহার ভিতর লুক্কায়িত আছে। কবি তাহা বুঝিয়াছেন, তুমি আমি বুঝিব না। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে প্রেমিক না হইলে এ রহস্য কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। ধন্য কৃষ্ণদাস, এ প্রেমের রহস্য তুমিই বুঝিয়াছিলে—তুমি ঠিক বলিয়াছ, "এমন প্রেম কোথায় আছে?" এত গেল কবিতার ভাবের কথা—ইহা ভিন্ন ইহার বাহ্যসৌন্দর্য্যও অতুলনীয়। পড়িবামাত্র ইহাতে প্রেমময় শ্রীভগবানের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনের সুশীতল কদম্বছায়া, গোপিকাগণের শ্যামলা কুঞ্জমালা, কৌমুদীবিধৌত রজত-সিকত সেই যমুনাতট, বংশীবট, আমাদের নয়নপথে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে! এরূপ কত সুন্দর কবিতা আমাদেরই অনাদরে কত জীর্ণ তালপত্রাঙ্গে কালগর্ভে লীন হইয়া যাইতেছে! কিন্তু হায়, বাঙ্গালী পাঠকের উহা উদ্ধার করিবার অভিরুচি দেখিতে পাই না"—ইত্যাদি।

এই প্রকার প্রাচীন কবিতার উদ্ধার সাধন ও সমালোচনা করিয়া অনেক লেখক তাঁহাদের উদ্যমের অপব্যবহার করিতেছেন এবং সাহিত্যে আবর্জ্জনার সৃষ্টি করিতেছেন। একজন ইংরেজ সমালোচক একটি কবির কাব্য সমালোচনা করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—"After reading some such lines one feels disposed to box his ears." আমাদের চুপ করিয়া থাকাই ভাল।

বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের আর একটি প্রধান অঙ্গ ছোট গল্প। কবিতার ন্যায় বাঙ্গালায় অনেক ভাল ছোট

গল্প আছে। কিন্তু অনেক রাবিশও চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। সকলেই গল্প লিখিতে ইচ্ছুক, এবং কেহ গদ্য সাহিত্য-সেবা আরম্ভ করিলেই গল্পে যশস্বী হওয়াই তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিক গল্পলেখাও, কবিতার ন্যায় না হইলেও, একটু কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ইহাতে ভাষার উপর ইচ্ছানুরূপ আধিপত্য, কল্পনার প্রখরতা, সৌন্দর্য্য সমাবেশের দক্ষতা, মনুষ্যচরিত্রে গভীর অভিজ্ঞতা এবং সর্ব্বোপরি বর্ণিত বিষয়ের সঠিক জ্ঞান থাকা দরকার। বাঙ্গালার অনেক গল্পলেখকের তাহা আছে বলিয়া মনে হয় না। গল্পে প্রায়ই ঘটনা-সামঞ্জস্য, বর্ণিত বিষয়ের বাস্তবতায় অজ্ঞতা দেখা যায়; ভাষার প্রাঞ্জলতা, বাঙ্গুনি ও স্বাভাবিক ভাবের অভাব দৃষ্ট হয় এবং কৃত্রিম কষ্টকল্পিত প্রাণহীন ভাষায় গল্পের সৌন্দর্য্য বিধানের চেষ্টা করা হয়। যেমন ভাবে ও কল্পনায়, সেইরূপ ভাষায়ও অনুকরণের চেষ্টা প্রবল হওয়ায়, অনেক গল্পই তৃতীয় শ্রেণীর হইয়া পড়ে। ছোট গল্পের উদ্দেশ্য অনেক লেখকই ভুলিয়া যান এবং মনে করেন প্রকাণ্ড একটা কৌশলপূর্ণ প্লটের সাহায্যে তাহাতে সমস্ত রসের অবতারণা করিয়া এক রহস্য-পূর্ণ ইতিবৃত্ত লিখিলেই তাহা উৎকৃষ্ট ছোট গল্প হয়।

বাস্তবিক পক্ষে ছোট গল্প নভেল নহে। মনুষ্য চরিত্রের বিশেষ বিশেষ ভাবের বিকাশ, কল্পিত কিম্বা প্রকৃত বিশেষ কোন ঘটনার সাহায্যে স্বাভাবিক সহজ এবং ঘটনোপযোগী ভাষায় পরিস্ফুট করিবার চেষ্টাই এ সকল গল্পের উদ্দেশ্য। ইহার উপরেও যদি লেখকের আশা থাকে তিনি ছোট কি বড় নভেল লিখিতে পারেন। ছোট গল্প লেখকের সে পথ ছাড়িতে হইবে। বাঙ্গালার অনেক গল্প-লেখক এ নিয়ম না মানিয়া নানারূপ আবর্জ্জনার বোঝা পাঠকের ঘাড়ে চাপাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। বাঙ্গালার অধিকাংশ পাঠকও এই লঘু সাহিত্য গলাধঃকরণ করিয়া লঘুচিত্ত হইয়া পড়িতেছেন। বাঙ্গালার সাহিত্যরথিগণের ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে কেবল পাঠকের রুচিতেই সাহিত্য সৃজিত হয় না। সাহিত্যই যথার্থপক্ষে পাঠকের রুচি সৃষ্টি করিয়া থাকে। মাসিকপত্র-সম্পাদকগণকে এ বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। তাঁহারা ছোট গল্পগুলিকে মিথ্যা ইতিহাসে এবং কল্পিত নভেলের সংমিশ্রণে কেন পরিণত হইতে দিতেছেন বুঝিতে পারি না। ইউরোপের অনুকরণে এদেশে ছোট গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। ফরাসী সাহিত্যই এ বিষয়ে ইউরোপেরও আদর্শ। বাস্তবিক ফরাসীজাতি এই আর্ট চরম উন্নতিতে আনিয়াছে। এ বিষয়ে বাঙ্গালী লেখকগণকে ফরাসী লেখকগণের শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে হইবে। গী দে মোঁপাশা একজন বিখ্যাত ফরাসী গল্প-লেখক। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার একটি গল্প পড়িয়াছিলাম। উহার আখ্যান ভাগ বা প্লট অতি সামান্য বিষয় লইয়া—একখানা জাহাজ যাত্রী লইয়া ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে যাইতেছিল। রাত্রিতে জাহাজে বৈদ্যুতিক আলোক জ্বলিতে-ছিল। যাত্রীগণ জাহাজে আমোদ প্রমোদে মত্ত। সমুদ্রের জল আলোড়ন করিয়া মহাশব্দে জাহাজ ছুটিতেছিল। সেই সময় একজন লোক জাহাজের পার্শ্বের রেলিং ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। হঠাৎ পদস্খলন হওয়ায় উল্টিয়া সে সমুদ্রে পড়িয়া গেল। সকলেই আমোদে মত্ত, বিশেষ জাহাজ খুব শব্দ করিয়া ছুটিতেছে, সুতরাং তাহার পতন-শব্দ কেহই শুনিতে পাইল না। জাহাজ চলিয়া গেল। বেচারা আলোকোদ্ভাসিত দূরবর্ত্তী জাহাজের দিকে চাহিয়া সাঁতরাইতে লাগিল। তাহার মনে নিদারুণ নিরাশাময় যন্ত্রণার অবধি রহিল না। কিন্তু বেশীক্ষণ তাহার এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল না। সত্বরই তাহাকে কুম্ভীরে জলের ভিতর টানিয়া লইয়া গেল। এই আখ্যানের কথা শুনিয়া বাঙ্গালী গল্প-লেখক হয়ত হাসিয়া উঠিবেন। কিন্তু গী দে মোঁপাশার এইটি একটি সুন্দর গল্প। এরূপভাবে সমুদ্রে নিমজ্জমান ব্যক্তির তৎকালীন মনোভাবের যে সজীব বর্ণনা তিনি দিয়াছেন তাহা অতুলনীয়, এবং তাহার তৎকালীন মানসিক ভাবের একটি লেখনীচিত্র প্রদর্শন করিয়া পাঠকের মনের উপর সেই ভাবের প্রবলতায় একটা রেখাপাত করাই গল্পটি লিখিবার উদ্দেশ্য। ইহাতে লেখকের গভীর মনুষ্য-চরিত্রজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় এবং জীবন্ত ভাষার সাহায্যে মানুষের বিশেষ বিশেষ মনোভাবগুলি—যাহা সর্ব্বদাই আমাদের মধ্যে উঠিতেছে পড়িতেছে—কিরূপ পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে পারা যায়—তাহা বোধগম্য হয়। বাঙ্গালা গল্প-লেখক এ সব আদর্শ ছাড়িয়া গল্পের নামে ডিটেক্টিভ কাহিনী কেন সৃষ্টি করিতেছেন এবং মাসিক পত্র সম্পাদকগণই বা কেন তাহাদিগকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম। সম্পাদকগণই এ বিষয়ে সাহিত্যের অভিভাবক। তাঁহারা কাগজের

কলেবর পরিপূরণের নিমিত্ত আবর্জ্জনার সাহায্য লইলে, অনেক সময় পাঠকবর্গের অপ্রীতিকর না হইলেও উহাতে সাহিত্যের অঙ্গসৌষ্ঠব বাড়িবে না।

সুতরাং আমার নিবেদন, সম্পাদক মহাশয়গণ যদি এই সকল তৃতীয় শ্রেণীর কবিতা ও গল্পের আবর্জ্জনা ভিন্ন তাঁহাদের পত্র পূরাইতে নিতান্তই অক্ষম হন, তবে উহার আকার কমাইয়া দিন। এই বিংশ শতাব্দীর কর্ম্মময় জগতে বাঙ্গালী হইলেও তাহাতে পাঠকগণের অসুবিধা হইবে না। কাগজ এবং অর্থের এই দুর্ভিক্ষের দিনে তাঁহারা যদি আকার কমাইয়া তাঁহাদের পত্রের অর্দ্ধমূল্যের ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলে গ্রাহকবর্গের অসন্তুষ্টি ঘটিবে বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই।

আর একটি কথাও আমি পাঠকগণের নিকট নিবেদন করিতে চাই। আমি সমালোচক নই, সুতরাং সমালোচনার হিসাবে এ বিষয়ে কলম ধরিবার স্পর্দ্ধাও রাখি না। উপস্থিত বাঙ্গালা মাসিক পাঠে কয়েকটি কথা মনে [illegible] এবং অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহাই বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। কোন ব্যক্তিবিশেষ কিম্বা দল-বিশেষকে কোন প্রকার আক্রমণের উদ্দেশ্য আমার নাই, এবং কেহ যেন কোন কথা নিজের ঘাড়ে লইয়া আমাকে ভুল না বুঝেন। এই কৈফিয়ত সত্ত্বেও আমাকে সমালোচনায় কলম ধরিতে দেখিয়া যাঁহারা আশ্চর্য্য বোধ করিবেন, তাঁহাদিগকে সমালোচক-গুরু ম্যাথিউ আর্ণল্ডের (Mathew Arnold) নিম্নলিখিত কথা কয়েকটি স্মরণ করাইয়া দিয়া আমার ধৃষ্টতা মাপ করিতে অনুরোধ করি—"Those who fail as writers, turn reviewers."

শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র।

আমলকী গাছ।

কত যুগান্তের তরু! বিশাল শাখায়
বিস্তরিয়া দিকে দিকে সুস্নিগ্ধ ছায়ায়
উঠেছিল ঊর্দ্ধমুখে অনাদি অম্বর
আনন্দে চুম্বিতে বুঝি! বিহঙ্গনিকর
মুখরিত দশদিশি মধুর সঙ্গীতে
প্রসারিত শাখে বসি, মুগ্ধ অবনীতে
ঝরিত সুধার ধারা! চঞ্চল সমীর
চঞ্চল শিশুর সম সোহাগ-অধীর
দোলাইয়ে পত্ররাজি যাইত বহিয়া
কোন্ দেশান্তের পানে!
পুলকে মাতিয়া
পিতা মম ভ্রাতা আর বন্ধুগণ সনে
ওই তরুতলে চারু কিশোর-জীবনে
যাপিলেন ক্রীড়া করি'; ভুবন-বিশ্রুত *
বিজয়ী তিব্বতযাত্রী বীর "রাজদূত" *
চট্টল-গৌরব-রবি ত্রিরত্ন "নবীন" †

আমারি পিতার সাথে হর্ষে একদিন
আহরিলা তরু হতে সুরসাল ফল
কি উন্মুক্ত কল-হাস্যে বুঝিবা উজ্জ্বল
জ্যোতিষ্কের শিশুগুলি হইলা বর্দ্ধিত
ওই বিটপীর স্নেহে, করিতে নন্দিত
ভবিষ্যৎ বসুন্ধরা।
নহে তা' কেবল
ক্ষুদ্র আমি, আমারও শৈশব বিমল
কৈশোর যৌবন আর ওই তরুতলে
সুশীতল ছায়াঘেরা শ্যাম শষ্পদলে
কাটিয়াছে কত দিন। কত স্মৃতি মম
রয়েছে উহারে ঘেরি ইন্দ্রচাপ সম
বিচিত্র সু-বর্ণ-রাগে। অক্ষম দুর্ব্বল
নারিতাম বৃক্ষে চড়ি' আরোহে চঞ্চল

রায় শরৎচন্দ্র দাস বাহাদুর, সি আই, ই।
(১) মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন
(২) কবিগুণাকর নবীনচন্দ্র দাস, এম এ, বি, এল্ (৩) রায় শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দত্ত বাহাদুর অবসর প্রাপ্ত সিভিল সার্জন।

আহরিতে ফল কভু, বিহঙ্গ কখন,
কখন বা সমীরণ নীরব-বেদন
বুঝিত আমার যেন, দিত মোয়ে দান
দু' একটি ফল আহা! হরষ মহান্‌
জাগিত আমার বুকে!

কত তৃষ্ণাতুর,
বুভুক্ষু পীড়িত কত আহরি প্রচুর
পরিপক্ক ফল তার প্রাণের পিয়াস
মিটাত আনন্দভরে! নিত্য বারমাস
প্রতিবেশী শিশুদের মিলন-বাজার
বসিত এ তরুতলে! কলহ চীৎকার
মারামারি কাড়াকাড়ি দু'টী ফল তরে
হত সদা অভিনয়!

যুগ যুগ ধ'রে
হেরিত কালের সাক্ষী বৃদ্ধ সহকার
আজ যারা শিশু ছিল, কালিকে আবার
তাহাদেরি শিশু আসি তাহার তলায়
বসাত প্রাণের মেলা—কোন্দলে খেলায়
অপূর্ব্ব আবেগে কিবা! কারেও বিমুখ
করেনি সে কোন দিন ফুল্ল হাসিমুখ
ছিল বুঝি প্রিয় তার!

আজি স্বপ্ন সব!—
বর্ষার প্রবল ঝঞ্ঝা উন্মত্ত তাণ্ডব
প্রচণ্ড দস্যুর সম ভীষণ আঘাতে
উৎপাটিয়া তরুবরে ধরার ধূলাতে
লুটাইয়ে দিয়ে গেছে—উৎসবের হাট
ভেঙ্গে গেছে চিরতরে নন্দনের নাট
রুদ্ধ হল অকস্মাৎ।

স্মৃতির কেতন
পিপাসিত মানবের সুধা-রসায়ন
আমলক তরু ওগো! সকল বন্ধন'
কে দিল গো রুদ্র-করে করিয়া ছেদন
আজি হেন অতর্কিতে! এমন নিঠুর
পাষাণ হৃদয় কেবা! কালি সুমধুর
আসিবে সমীর যবে, বিহঙ্গ যখন
আসিবে আশ্রয় আশে, শিশু অগণন
আসিবে আনন্দে ছুটি, আগ্রহে পথিক
হেরিবে তোমার পানে, হা অদৃষ্ট ধিক্‌!
কেবা দিবে তৃপ্তি সবে?

হে বিশ্ব-আত্মীয়!
আজনম-সঙ্গী মম প্রিয় রমণীয়!
সব হল সাঙ্গ আজি। ভবিষ্যতে আর
কেহ জানিবে না তোমা, স্মৃতিও তোমার
বুঝি বা পাশরি যাবে! শুধু কবি তব
তোমাহীন শ্যামাঙ্গন নিরখি নীরব
বিষাদে মরিবে কাঁদি, অশ্রুমালা তার
অতীতে রাখিবে বাঁধি ভুবন মাঝার।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

পল্লীর প্রাণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১৪)

দুপুরের পর—বেলা তখন প্রায় আড়াইটা—ছয় জন বেহারা ক্লেশব্যঞ্জক অস্পষ্ট শব্দ ব্যক্ত করিতে করিতে উকিল যাদববাবুর বাসার অন্দরের প্রবেশ দ্বারে একখানি পাল্কী আনিয়া নামাইল। পাল্কী হইতে সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার-ভূষিতা, সুধৌত-হর্ম্ম্য বসন-পরিহিতা, তামাকুরসাল-তাম্বুলচর্ব্বনরতা, বিপুলকায়া স্বর্ণ-মেখলাবদ্ধ-স্থূলমধ্যা মহামহীয়সী এক নারী নির্গতা হইলেন—এবং মন্থর চরণক্ষেপে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দুন্দুভি-বিনিন্দিত গম্‌গমে গম্ভীরস্বরে হাঁকিলেন,—"কৈ গো—ও বউমা। বলি কেমন আছগো তোমরা?"

বউমা—অর্থাৎ যাদববাবুর স্ত্রী চারুমুখী আগামী শীতে নাগরিক মেলার কথা স্মরণ করিয়া একখানি কার্পেটে সূক্ষ্ম সূচিতে বিচিত্র চিত্রাবলী তুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন।

সহসা এই কণ্ঠাধিকারিণীর আগমন-ঘোষণা তাহার শ্রুতি-বিবরে সজোরে প্রবেশ করিল,—চমকিয়া তিনি চাহিলেন—দ্রুত হাতের কাজটি ফেলিয়া বাহির হইলেন—সুস্মিতমুখে আগন্তুকাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "এই যে আসুন—আসুন—নমস্কার! ভাল আছেন ত?"

আগন্তুকার শির নত করিয়া প্রতিনমস্কার করিবার সামর্থ্য ছিল না।—যাহা হউক, হাসিমুখে তিনি প্রতি-সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন—"এই দেখ, এত বলি—তা শুনবে না।—নমস্কার কত্তে আছে? তোমরা হ'লে বামুনের জাত—ওতে যে পাপ লাগে গো! আমাকেই বরং পা ছুঁয়ে তোমাদের প্রণাম কত্তে হয়।"

বলিতে বলিতে ধর্ম্মভীরু এই মহিমাময়ী প্রবীণা আরও কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া বারান্দার সিঁড়ির কাছাকাছি গিয়া পৌঁছিলেন। চারুমুখী ধীরে ধীরে তাহার অনুসরণ করিতে করিতে সবিনয়ে কহিলেন, "ছি ছি! ও কি কথা বলছেন—ও কি কথা বলছেন? আপনি হ'লেন গুরুজন—আমার মায়ের মত।—সহরে আমরা থাকি, নমস্কার ত এখানে সবাই সবাইকে করে,—আপনার সঙ্গে ত কথাই নাই।"

মাতৃস্থানীয়া গুর্ব্বী এই গৃহাগতা মহাগৃহিণী উত্তর করিলেন, "তা ব'লতে পার বাছা,—যে জেতেরই লোক হ'ক, বয়সে গুরু হ'লে তাকে মান্যিমাননা কত্তে হয় বই কি? এই ত আমার বাপের বাড়ী এক কুমোরের মেয়ে চাকরাণী ছেল—আমাদের মানুষটানুষ সেই করেছে—আমরা তাকে পা ছুয়ে প্রণাম ক'ত্তাম।—"

দুইটি ধাপ পার হইয়া শ্রদ্ধাবতী বারান্দার উপরে গিয়া উঠিলেন।—চারুমুখী কহিলেন—"চলুন, ঘরের ভিতরে চলুন।"

"নাগো, ঘরের ভিতর গিয়ে আর কি হবে?—বড্ড গুমসে মত।—এই ত বেশ ফাঁকা এইখেনটা আছে—বাইরেই বসি গো?"

চারুমুখী দ্রুত ঘরে গিয়া একটি শীতল পাটি আনিয়া যত্নে তাহা বিছাইয়া দিলেন। আগন্তুকা দেয়ালে ঠেস দিয়া পা ছড়াইয়া তদুপরি উপবেশন করিলেন। দিনটা গরম ছিল, পদক্ষেপক্লান্তা সুখদেহা ধনিগৃহিণী একটু হাঁপাইতেছিলেন, পূর্ণ-চন্দ্রপ্রতিম বদনমণ্ডলে স্বেদবিন্দুও আবির্ভূত হইতেছিল। চারুমুখী একখানি পাখা লইয়া বাতাস করিতে আরম্ভ করিলেন।

সমাদৃতা প্রহৃষ্টমুখে কহিলেন, "এই ত! ভদ্দরের মেয়ে—বাড়ীতে একজন কেউ এলে আদর ক'ত্তে জানে বটে। আর আমি কি ছোট লোকের মেয়েই এনেছি। যেন রাজ-কন্যে—ব'সেই আছেন, নড়তেও পদ্মিনী যেন এলিয়ে পড়েন! একটু যদি দরদ বোঝে গা! তবু ত হাঘরে বাপ তেমন কিছু দেয় থোয়নি,—ভাল যে গয়না দুখানা গতরে পরে, তাও আমি দিইছি। বাপ ত দিয়েছিল, সেই দুখানা যেন পেতলের চিটি মিটি—লোকের সামনে তা বের ক'ত্তে লজ্জা করে। এতেই ঠ্যাকার কত! হাড়হাভাতের মেয়ে কপালের জোর ছেল—বড় ঘরে এসে পড়েছে—নিজের ওজনই যেন পায় না। তা তোমাদের ঝি কোথাগো, দুটো পাণ দিতে বল না?—আর এক ঘটী ঠাণ্ডা জল আন দিকি বাছা, খাই!—কি গরমই পড়েছে—তেষ্টায় যেন বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে।"

চারুমুখী একটু লজ্জিতভাবে কহিলেন—"ঝি এখনও আসেনি,—তা আপনি এই পাখাখানি একটু নাড়ুন কাকী-মা, আমিই এনে দিচ্চি।"

পাখাখানি সাত জ্যাঠাইমা হইতেও গরিয়সী কাকীমার হাতে দিয়া চারুমুখী গৃহমধ্যে গেলেন। এক ঘটী ঠাণ্ডা জল আনিয়া কাছে রাখিলেন,—পাণের বাটা আনিয়া পাণ সাজিতে বসিলেন।—কাকীমা মুখভরা পাণের ছাবা—থু থু করিয়া বারান্দার একপাশে ফেলিলেন—বার দুই কুলকুচি করিয়া প্রাঙ্গন অভিমুখে যথাসাধ্য একটু সরিয়া, সেই জল বদনবিবর হইতে নিঃসরণ করিলেন—জল কতক বারান্দায় কতক উঠানে পড়িল।—তার পর ঘটীটি তুলিয়া ধরিয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া বাকী সবখানি জল খাইয়া ফেলিলেন। চারুমুখী পাণ সাজিয়া সম্মুখে রাখিলেন,—পাখাখানি টানিয়া নিজের হাতে নিলেন। আগন্তুকা কয়েকটি পাণ মুখে পুরিলেন, তারপর অঞ্চলপ্রান্তে বাঁধা দোক্তার কৌটাটি খুলিয়া তার কতকখানি হাতে করিয়া নিয়া মুখে ফেলিয়া দিলেন,—চিবাইতে চিবাইতে একগাল পিক একটু ফিরিয়া পাটীর ওধারে বারান্দার উপরে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "তা তোমরা সব ভাল আছ ত বাছা?"

চারুমুখী উত্তর করিলেন, "হাঁ, আপনাদের আশীর্ব্বাদে এক রকম ভালই আছি।"

"গয়না টয়না কি গড়ালে আর ?"

"নতুন এ ছাড়া হার গড়িয়েছি—দশ ভরি দিয়ে।—বেশী ত আর পারিনে।"

"কেন পারবে না ? উরি মধ্যে থেকে বাঁচিয়ে কত্তে হয়। গায়ে পাঁচখানা ভাল গয়না না থাকলে কি আর লোকের মধ্যে বেরোন যায় বাছা ?—ওতে সবাই অমান্যি করে। তা বরং এক কাজ ক'রো—আমাকে বলো, আমি গড়িয়ে দেব—শেষে আস্তে আস্তে দাম দিও। এই ত কর্ত্তা সেদিন বেরবো-লাট গড়িয়ে আনলেন—দুই মেয়ের জন্য দুজোড়া, বউমার জন্য একজোড়া, আর আমার জন্যও এক জোড়া—খাসা গয়না বাছা—দেখ দিকি হাতে কেমন মানিয়েছে! এই যে বুড়ো হয়ে উঠেছি—তবু দেখ হাত দুখানি কেমন দিব্বি গোলগাল—কেমন নরম তুকতুকে—কাঁচা বয়সের মেয়েদের মত!—তাই না কর্ত্তা ব'ল্লেন, ওদের জন্যে ত গড়াব, তোমাকেও একজোড়া গড়িয়ে দি—হাতে বেশ মানাবে। বেশ গড়িয়েছে—দিব্যি ভারীভুরী—কত পাথর বসান। তা তুমি একজোড়া গড়াও না বাছা ?"

"হাঁ, ব'লব আজকে।"

"ব'লতে আবার যাবে কিগো ? হয়ত কত ওজর আপত্তি ক'রবে—এই ত সেদিন আবার হার গড়িয়ে দিলে দশ ভরি দিয়ে। আমিই বরং কর্ত্তাকে ব'লে আমাদের স্যাঁকরাকে দিয়ে গড়িয়ে দেওয়াব। শেষে দাম দিও।"

চারুমুখী একটু হাসিয়া কহিলেন, "তাই তবে দেবেন কাকীমা। আপনার ওটা কভরি হ'য়েছে ?"

"নভরি,—তা অত ভারি তোমার নেই হ'ল—এই ধর সাড়ে পাঁচ ভরি—নাহয় ছভরিই হ'ল—তাই দিয়েই গড়াতে ব'লব। পাথর দুখানা কম দিলে খরচাও একটু কম প'ড়বে। তবে সোণা গিনিই দিতে হবে—নইলে ক্যাকাসে দেখাবে—একেবারে পেতলের মত,—এই যেমন আমার বেয়াই বউমাকে গয়না দিইছিল। মেয়েটি খুব ফরসা দেখে ওঁদের খুব পছন্দ হল—দাবীদাওয়া আর বেশী কিছু করলেন না,—মিলে সব দিকে শেষে ফাঁকি দিলে। আর সেই ফরসাই বা কি ? একেবারে ক্যাকাসে—ঠিক যেন পেতলের গয়না—যা নাকি গায় দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল,—ঝ্যাঁটা মার!"

চারুমুখী কহিলেন, "ওর আর আমি কি ব'লব কাকীমা ?—আপনি যা ভাল বিবেচনা করেন, তাই করবেন।"

হাঁ—এই ত লক্ষ্মীবউটির মত কথা গো। তোমার শাশুড়ীর তপিস্তে ভাল বাছা। তা আবাগী গাঁয়ে প'ড়ে রয়েছে, এখানে এসে থাক্‌লে সুখী হ'ত। আর আমি কি নবাবের মেয়েই ঘরে এনেছি—কিছুতে কি আমার অপেক্ষা করে ? কোত্থেকে এক গয়নার বই এনেছে, নিজেই তাই দেখে দেখে ফরমায়েস্ করে। যদি বলি এটা না ওটা—গ্রাহ্যিই করে না। আর এখনকার বউগুলোও হ'য়েছে অমনি! বউ ত নয়—যেন এক একটা পাকা গিন্নী ঘরে আসে, ছেলেগুলো দু'দিনেই ভেড়া ব'নে যায়। আর আমরা যে বউ ছিলাম, চোরের মত শাশুড়ীর মুখ চেয়ে থাক্‌তাম, যা হাতে ক'রে দিত—নিয়ে ভাগ্যি মনে কর্‌তাম। হাঁ—তা বাড়ীর চিঠি পত্তর পেয়েছ কিছু ?"

"না,—শীগ্‌গির ত চিঠি কিছু আসে নি। কেন, কি হ'য়েছে কাকীমা ?"

"তাই ত ব'ল্‌তে এলাম গো। তা তোমার দেওরের কীর্ত্তি শোন নি ? যেদো বলেনি কিছু ?"

"না, কিছু ত শুনিনি ? কেন, কি ক'রেছে সে ?"

"ও হো!—তা বটে, তা বটে। সকালে ডেকে যেদোকে ব'ল্‌বেন সব কথা ছিল—তা ত সময় পেলেন না। আর এই পাপ মক্কেলগুলোর জ্বালায় কি সোস্তি কিছু আছে ?—মেছোহাটার মত যেন এসে ঘিরে এসে বসে। শকুনগুলো যেমন মড়া গরুর পচা মাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়, তেমনি যেন গা টেনে ছিঁড়ে খেতে থাকে!—সময় মত গায় মাথায় একটু তেল মেখে নেয়ে ধুয়ে সুখসোস্তিতে যে দুটি খাবেন—তা কি একটি দিনও ঘটে ?"

"তা অত বড় পসার হ'য়েছে—মক্কেল ত আস্‌বেই। তা—"

"হাঁ—পসার খুবই হ'য়েছে বই কি বাছা—খুবই হ'য়েছে বই কি। সবাই বলে—ক'ল্‌কেতার বড় আদালতেও ওঁর চেয়ে বড় উকিল নেই। কত মোকদ্দমা সেখানে পাঠান,—তারাও কত খাতির করে।"

"তা—কি জন্যে ডেকে পাঠাতে চেয়েছিলেন ? ঠাকুরপো কি ক'রেছে ?"

"তাই ত ব'লছিলাম। আমি সুধোলাম—যখন খেতে এসে ব'ল্লেন—যে যেদো শুনে কি ব'ল্লে। তা ব'ল্লেন, ডেকে পাঠান হয়নি, ফুরসুৎ হ'ল না।—কাছারীতে ব'ল্বেন, না যদি পারেন—সেখানেই কি ফুরসুৎ হয় বাছা? একবার জজ সাহেবের এজলাসে—একবার মাজেষ্টর সাহেবের এজলাসে—এই ছুটোছুটি ক'রে বেড়ান। খাসকামরাতেও যখন তখন ডেকে পাঠায়। ডিপুটী মোন্সবদের আদালতে কখনও পাও দেন না। সে সব ছোট মামলা—ঐ যেদো আছে—বিলেস আছে—উপেন্দর আছে—বেহারী-টেহারীরা সব আছে—ওদের দিয়েই করান। খোকা যে নতুন উকিল হ'য়েছে—তাকেও সে সব আদালতে যেতে বড় দেন না। নিজের কাছে কাছেই ওই জজসাহেবের আদালতে মাজেষ্টর সাহেবের আদালতেই রাখেন। তা আদালতে না পারেন,—সন্ধ্যার পর নিরেলা বাড়ীতে ডেকেই ব'ল্বেন। তাই কি নিরেলা একটু হয় বাছা? সন্ধ্যে বাতি দিতে না দিতেই সবাই এসে জমে—যেন দরবার মিলিয়ে বসে!"

"হুঁ!—তা আপনি ত শুনেছেন সব—"

"ওমা, তা শুনেছি বই কি? ঘোষালমশাইরা এসে ব'লে গেলেন—তারপর রেতে যখন খেতে এলেন—সব আমাকে ব'ল্লেন। তা, যেখানে যে কথাটি হয় বাছা, সব এসে আমাকে বলেন। ভালমন্দ পরামর্শটাও জিজ্ঞেসা করেন। সে ভাগ্যি বাছা, আমার খুব আছে। এখন এই সব বজায় থাক্তে থাক্তে তাঁর কোলে মাথা রেখে যেতে পাত্তাম—তা হ'লেই সে হ'ত। অবিশ্যি এখনই যেতে চাই নে—এই সুখ ঐশ্বয্যি সব ত আমারই—ওঁর প্রসাদাৎ আমারই ব'ল্তে হবে বই কি? কি বল মা? তা এই সব ফেলে কি কেউ যেতে চায়? তবে যেতে ত হবে? সময় যখন হয়—হাস্তে হাস্তে এই গরব নিয়ে যদি যেতে পারি—তবেই পুণ্যির জোর ব'ল্তে হবে। কি বল বাছা?"

"তা ত বটেই মা তা ত বটেই। ওর চাইতে পুণ্যি কি আর আছে? তবে—এখনই ওসব কথা ভাববার দরকার কিছু দেখ্ছি না। এখনও আপনার বয়স এমন বেশী ত হয় নি? শরীরও ত দিব্যি র'য়েছে,—ছেলেপিলে হয়েছে ব'ল্লেই মনে হয় না।"

"হেঁ—হেঁ—হেঁ। পাগল বৌয়ের কথা শোন! অবশ্যি কত্তাও সে কথা বলেন—এই যে হাত দুখানি—এই দেখ জড়োয়া চুড়ী প'রেছি, প্লেন চুড়ী প'রেছি, বেয়রো-লাটি পরেছি. বালা প'রেছি, এই যে আঙুলে তিনটে আংটি র'য়েছে,—ঘোমটা যদি দিয়ে বসি—কেউ ব'ল্তে পারবে না, কচি বউটি নয়। কর্ত্তা—কি ব'ল্ব মা তোমাদের কাছে—তোমরা মেয়ের মত—রতনচূড়ও দিয়েছেন—নাতির ভাতের সময়। তা সদাসর্ব্বদা ত তা প'রে বেরোন যায় না? সেদিন হাতে দিয়েছিলাম,—কেমন দেখনি?"

"হাঁ, দেখেছিলামই ত। দিব্যি মানিয়েছিল হাতে।"—

"তবু ত দেখ বাছা—আবাগীরা চোকঠেরে কত ইসেরা ক'রে হেসে হেসে কত ঠাট্টা ক'ল্লে। আমি কি বুঝিনি কিছু? নাতির ভাতে রতনচূড হাতে প'রেছি। তা প'রেছি—তোদের কি? কপালে যদি থাকে,—ওই নাতি বেতে প'রব—ওই নাতির ছেলের ভাতে প'রব—কেন প'রব না? কি বলগো বাছা বউমা?"

"তাই ত,—কেন পর্বেন না! সে ত ভাগ্যির কথা।"

"তাই বল।—ভাগ্যির কথা নয় আবার? কজনের এমন ভাগ্যি হয় বল? ওই ত বাছা, নবীন বাবুর ব্যাটার বৌয়ের সাধ হ'ল—গিন্নিরও তখন গত্ত। আমি ব'ল্লাম—তুমিও কেন দিদি সাধ খাওনা? মাগী লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিল—সবাই হেসে উঠল। তা আমি ব'ল্লাম—ব্যাটার বউএর সঙ্গে একসাথে সাধ খাওয়া—কজনের ভাগ্যে তা ঘটে? আর কেন? লজ্জার কি? গত্তই যদি হ'ল, তবে সাধ খেতে আবার লজ্জা কি? এই ধরনা—সত্যি বয়েস ত যায়নি,—আমারই যদি গত্ত এখন হয়——"

চারুমুখী ফিক করিয়া হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া নিলেন। আগন্তুকাও হাসিয়া কহিলেন,—"এই দেখ! বউমার আমার লজ্জা হ'য়েছে। তা বাছা আমার কাছে পষ্ট কথা! হাঁ।—হাঁ—তা যা ব'ল্তে এসেছিলাম—কি ব'লছিলাম ভাল?"

"ওই—ঠাকুরপো কি ক'রেছে—তাই।"

"হাঁ,—তা বুঝি শোননি? তা যেদোকেই ত উনি বুঝিয়ে সব ব'ল্বেন। তবে যদি এলাম,—আমিও ব'লে যাই তোমাকে।"

এই বলিয়া বেণীমাধব বসুর গৃহিণী রাজতরঙ্গিণী (ইনিই যে উকিল বেণীমাধব বসুর গৃহিণী তাহা অবশ্য পাঠকবর্গ

বুঝিতে পারিয়াছেন)—ঘোষালভ্রাতৃযুগল বর্ণিত নিবারণের বিবিধ দুষ্কৃতি-কাহিনী স্বামীর নিকট যেরূপ শুনিয়াছিলেন—সালঙ্কারে নিজের টিকাটিপ্পনী দিয়া সমস্ত বর্ণনা করিলেন। অতি হতভাগ্য অল্পায়ু গোপালদত্ত-সংক্রান্ত ঘটনাটির উপরেই তিনি বেশী জোর দিলেন। কারণ এই 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্কর' অসমসাহসিক হীনবংশ-প্রসূত অকৃতজ্ঞ বালকের প্রতি তাঁহার বিজাতীয় ক্রোধ এখনও বর্ত্তমান ছিল। এবং তাঁহার ইন্দ্রতুল্য স্বামীর মোক্তরেরের ভ্রাতার প্রতি গোপালদত্তের তথাবিধ অবমাননায় নিবারণের এই সহায়তা যে তাঁহার সেই স্বামীর প্রতিই তার অবজ্ঞা সূচিত হইতেছে, তাহাও বহু যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে প্রয়াস পাইলেন।

"এ সব ত বড় অন্যায় কথা বাছা! যেদোরই দোষ হ'য়েছে গোড়াতে। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে ঘরে গে বসে রইল—কাজ কর্ম্ম কিছু কল্লে না—কেন যেদো এর পেরেচ্ছয় দিলে!—"

"প্রশ্রয় কি উনি কিছু দিয়েছেন? অনেক বলেছেন, কথা শোনেনি—কি করবেন?"

"খরচ বন্দ করে দেওয়া তক্ষুণি উচিত ছেল। তা হ'লে বাছু বুঝ্তেন, কিসে কত কড়ি লাগে! খাসীর মত বসে বসে কেবল খাচ্ছে আর খোস মেজাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে—গায়ে তেল হবে না কেন?—চাকরীর ঘানিতে খাটতে হ'ত—মাগ ছেলেকে রোজগার ক'রে খাওয়াতে হ'ত—তা হ'লে গে তেল প'ড়ত।—মুরুব্বি লোকের মান্যি মাননা শিখ্তে হয়, বড় লোকের খাতির একটু ক'ত্তে হয়, না হ'লে যে অন্ন জোটে না—তা বুঝ্ত। এই দেখ না বাছা—যেদো ত লেখাপড়া শিখে উকিল হ'য়েছে—দুপয়সা পাচ্ছেও। তা উনি মুরুব্বি আছেন, তাই না পাচ্ছে? নইলে কি পেত? ওই ত কত্তা বলেন খোকাও বলে,—দিনকাল যা পড়েছে—তিন চারটে পাশ করা কত উকিল ফ্যা ফ্যা ক'রে গাছ তলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। উনি যদি পেছনে না দাঁড়াতেন—যেদোরও সেই দশা হ'ত না?—আর যদি উনি কিছুতে চটে ফটে ছেড়ে দেন, এই পশার ওর থাকবে? এমনি খুব ভাল মানুষ আছেন—দয়ার শরীরও বটে।—তবে একবার চট্লে আর রক্ষে নেই। অন্যায় কিছু দেখ্লে উনি বড় চটেও যান।"

চারুমুখীর মুখে কথা ফুটিল না। যতই এই মুরুব্বি ধনিগৃহিণীর মনস্তুষ্টির প্রয়াস তিনি পান, স্বামীর প্রতি এরূপ অবজ্ঞাসূচক কথা কোনও নারীর পক্ষে সুখকর হয় না।

রাজতরঙ্গিণী আবার কহিলেন,—"তাই বলছিলাম বাছা,—দেওরকে খুব শাসনে রেখো। শাসন না মানে, খরচ পত্তর সব বন্দ ক'রে দেবে। আর এটা ত একটা অপব্যয়ও বটে।—কেন বাপু, বড় হ'য়েছিস, বে থা ক'রেছিস, ছেলে পিলে হচ্ছে—তুই কিছু করবিনি, আর ভাই তোকে খাওয়াবে? হাঁ, তোকে দিয়ে ভেয়ের দুটো কাজের উপকার হয়, গতরে খেটেও দুটো পয়সা তার বাঁচিয়ে দিতে পাত্তিস, তার অনুগত হয়ে থাকতিস্, তবু সে এক কথা ছিল। তা নয়,—ষণ্ডামার্কের মত গাঁয়ে গুণ্ডোমি ক'রে বেড়াবে,—ভাল মানুষের সঙ্গে কেবল দাঙ্গা হাঙ্গামা করবে,—গাঁয়ের মাথা যাঁরা—তাঁদের এম্নি ক'রে অপমান করবে—এর চাইতে পয়সা বেশী থাকে কাঙ্গাল দুঃখীকে কেন খেতে দেও না? না হয় সহরে দুখানা বাড়ী কর—যাতে আখেরের কাজ হবে। তারপর কত্তা যে রকম চটে গেছেন—ওই লক্ষ্মীছাড়াকে পুষে কি শেষে নিজের ক্ষেতি করবে?—কি উপকার তাকে দিয়ে তোমাদের হ'তে পারে? দুঃখে যদি পড় বাছা, সে কি খেতে দেবে, না পর্তে দেবে? দূর করে দেও—বাড়ী থেকে একেবারে দূর ক'রে দেও! মাগ ছেলে নিয়ে পথেগে বসুক!"

চারুমুখী ধীরে ধীরে কহিলেন "বড্ড গোঁয়াড়, কারও কথা শোনে না।—আবার শাশুড়ী রয়েছেন মাথার ওপর—

"আছেন তায় কি হবে?—তিনি খেতে পর্তে দিচ্ছেন তোমাদের? এত খাতির তাঁর ক'ত্তে যাবে কেন?—হাঁ, সে হ'ল মা, তাকে কিছু আর ফেলে দেওয়া যায় না। তা সে এখানে এসে থাক্ না? না থাকে, মাসে পাঁচটা ক'রে টাকা পাঠিয়ে দেবে,—গেঁয়ে রাঁড়—ওতেই তার পেট চলে যাবে।—তাই বলে কথার অবাধ্য যদি হয়,—সে বল্লেই—দেওর বলে তাকে খেতে পর্তে দেবে কেন? সে চটবে—তা চটলই বা!—এত ভয় কিসের তোমাদের?—হাঁ—বলবে, তোমারও ত ছেলে বউ রয়েছে—তা আমার সঙ্গে কি তোমার শাশুড়ীর তুলনা হয় বাছা? ধল্তে—আমারই

ত সব—কর্ত্তা আটালা টাকা রোজগার কচ্চেন সেও ত আমারই টাকা।—ছেলে বউ আমারটাই খাচ্ছে। ছেলে কেবল পেটে ধর্‌লেই হয় না বাছা। তোমার শাশুড়ী—একটি পয়সা দিয়ে তোমাদের সাহায্য কত্তে পারে? তোমরা হাতে তুলে দেবে, তবে না পাবে? সোয়ামী কিছু রেখে যায়নি,—বাপের বাড়ী থেকে ত ছাই খাবলা তুলে দেবে—এমন লোকটি কেউ নেই।—ওই তারিণী বাড়ুয্যের যে এত খাতির মায়-পোয় করে—আর তার জন্যে আমাদের অপমান করে—সে কে? সাত পুরুষ হয়ে গেছে—তেরাত্তির ওযুধি লাগে না!"

চারুমুখী কহিলেন—"না, তাঁদের মধ্যে আর কি এমন সম্পর্ক!—তা কর্ত্তা' কি' বল্লেন?—কি ক'ত্তে হবে আমাদের?"

"কর্ত্তা অবিবেচনার কথা কিছু বলেননি। তেমন লোকই তিনি নন,—তাহলে কি আজ এত বড় হ'তে পাত্তেন না লোকে এত খাতির কত্ত? লোকে বলে, ক'ল্‌কেতার বড় আদালতে যদি উনি ওকালতী ক'ত্তেন,—জজ হ'য়ে আজ বেঞ্চিতে বসতেন—বড় বড় কত খেতাব পেতেন—বিলেতে পর্য্যন্ত নাম বেরোত!—তা উনি বল্লে'ন—ঘোষালদের ত উনি ফেল্‌তে পারেন না—অনুগত লোক—প্রতিপালন হচ্চে ও'র আওতায় তাদের দিকেও ত চাইতে হয়? তাই ব'ল্লেন যাদব যদি তার ভাইকে ভালবেসে খেতে পর্‌তে দেয়, দিক, তিনি কেন বাদী হবেন? তবে এটাও ত যাদবের দেখ্‌তে হয় যে তাঁর কোনও অপমান সে না করে,—আর তাঁর অনুগত লোক যারা—তাদেরও ক্ষেতি কিছু না করে! কেমন তা দেখ্‌তে হয় না? কি বল বাছা?"

"তা হয় বই কি?—"

"হাঁ, তাই উনি ব'ল্লেন—ওই ত ঘোষালের বড় ভাই নালিশ ক'ত্তে এখানে এসেছে—বামুনের ছেলে—কেঁদে পৈতে দিয়ে ও'র দুটিহাত জড়িয়ে ধ'রে ব'ল্লে,—আমাকে রক্ষে করুন। তা কি উনি ঠেল্‌তে পারেন? শাপ-মুন্নির ভয়ও ত আছে। আবার ওই যাদব—তারও ত মুরুব্বি তিনি। হাজার হলেও নিবেটা তার ভাই ত? সে যদি জেলে যায়—ওরই মুখ ছোট হবে না? কাজেই দুইদিকই তাকে দেখ্‌তে হয়! কি বল? হয় না?

"তা হয় বই কি? সবারই মুরুব্বি উনি—সবারই ভাল দেখ্‌তে হয় বইকি?"

"হাঁ এই ত বুদ্ধিমন্ত মেয়ের মতই কথা ব'লেছ—হাজার হলেও ভদ্দরের সন্তান—হবে না কেন? আর আমার বউটি—ঝাঁটামার। ঝাঁটা মার! কি ছোটলোকের মেয়েই ঘরে এনেছিলাম! হাঁ—তা না বল্‌ছিলাম—উনি ব'ল্লেন—অন্যায় কথা কিছু বলেননি।—নিবে ওদের অপমান ক'রেছে—গাঁয়ের সবাইকে ডেকে তাদের সামনে নাকে খত দিয়ে মাপ চাক্‌।—আর ওদের ক্ষতি ক'রবার ফন্দি আট্‌ছে—সব ছেড়ে দিতে হবে। ওই তারকঘোষালের বউ—মাগী মিন্‌মিনে বজ্জাত—যেন কত ভাল মানুষটি—কিছুই জানেন না—আর পেটে পেটে যত বজ্জাতী। তোর বাপু এসব কেন? রাঁড় হয়েছিস, ওরা খেতে পর্‌তে দিয়ে বাড়ীতে রেখেছে—দূর ক'রে আজ দিলে তুই কি ক'ত্তে পারিস?—নিবে একদিন আমদুধ পাঠিয়েছে—একদিন ঘরছেয়ে দিয়ে গেছে—বারমাস খেতে দেবে? ভাই না দিলে নিজে তোকে খেতে পাচ্ছ না! কদিন সে তোকে খাওয়াবে? আর মাগী কি না তারি সঙ্গে ঘোঁট ক'রে ওদের সঙ্গে মামলা বাধাবার ফন্দী আট্‌ছে! এসব বজ্জাতী নিবেকে ছেড়ে দিতে হবে। যদি তা করে, তাহ'লে আর উনি কিছু ব'ল্‌বেন না, ঘোষালরাও নালিশ ক'র্‌বে না। আর যদি তাতে রাজি না হয়, যাদবকে তার খরচপত্তর সব বন্ধ ক'রে দিতে হবে। না দেয়, যাদব যা ভাল বোঝে করুক;—আমরা বাছা আর তোমাদের কিছুতে থাক্‌ব না। আর ঘোষালরা যদি নালিশ করে, তারই ভেয়ের জেল হবে। আমরা কি ক'রব?"

"তা—আপনারা যা বল্‌ছেন, এত সঙ্গত কথাই। কেন তা হবে না! অন্যায় ক'রেছে, কেন মাপ চাইবে না? আর ওদের ক্ষেতি করবার চেষ্টা ক'রচে? তাই বা কেন কর্‌বে? তা আপনারা ডেকে বল্‌বেন,—আমিও ব'লব।"

"হাঁ, ভাল ক'রে ব'ল বাছা, তাই ব'ল্‌তে এলাম। কি জান, যাদব কিছু ভালমানুষ গোছের লোক—হিতকথা কিছু বল্লেও বোঝে না। আর তোমার শাশুড়ীও বাছা বড় সোজা পাত্তর নয়। নিবেও বড় গোঁয়াড়। তা ভালয় ভালয় কথা শোনে চুকে গেল, তা নইলে তোমাদের শক্ত হ'তে হবে। তোমার তবু হিত বুদ্ধি কিছু আছে,—

যেদোর সেটা বড় কম। মা তেরের জেদে সে মা ও'রকে যায়, এটা তোমাকেই দেখ্‌তে হবে—জান্‌লে? নইলে শেষকালাতে হবে। তোমাদের নাকি আপনার লোকের মতই দেখি—তাই ভাল কথা ব'লে গেলাম। জান্‌লে? আরকি জান বাছা ব্যাটাছেলেরা—ওরা ওই একরকম। ভালমন্দ সব সময় বুঝে চল্‌তে পারে না। ঘরে মেয়েমানুষ যদি শক্ত হয়—রাশ টেনে রাখ্‌তে পারে—তবেই গে তারা ঠিক থাকে।—কত্তার যে বুদ্ধিতে এমন পাকা—থই পাওয়া পওয়া যায় না ব'ল্লে হয়—তিনিও আমার কথা অগ্রাহ্যি ক'রে চলেন না।" এই বলিয়া রাজতরঙ্গিণী বক্তৃতার উপসংহার করিলেন। আর গোটা দুই পান ও কতখানি দোক্তা মুখে দিয়া শেষে কহিলেন, 'তা হ'লে এখন আসি গে বাছা আজ।"

ঝি আসিয়া কাজকর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছিল।—রাজতরঙ্গিনী তাকে ডাকিয়া কহিল "ও ঝি—দেখ্‌ত বাছা মড়ারা কোথায় আছে কিনা।—ওদের বল্‌ত গে--"

"ওমা, কোন্‌ মড়ারা!—কাদের ব'ল্‌ব!

"ওই যে বেহারাগুলো—পাল্কী নিয়ে এসেছিল কোথায় গে মরেছে তার ঠিক কি? যা ত বাছা, দেখ ত কোথায় গেল।—ব'ল্‌গে যা গিন্নীমা এখন যাবেন।"

ঝি একটু হাসিল,—মাগীর কথা শোন! যে লাস বহিয়া বেড়ায়, এই বেহারারাও আবার মড়া! জ্যান্ত বেহারা তবে কোথায় আছে? ঝি বাহিরে গেল,—ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, বেহারা পাল্কী লইয়া দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে।

রাজতরঙ্গিনী আর দুটি পান মুখে দিলেন,—আরও খানিকটা দোক্তাও মুখে ফেলিয়া কৌটাটি আঁচলে বাঁধিলেন। তারপর হাতে ভর করিয়া কুঁথিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ধীরে ধীরে গজেন্দ্র-লাঞ্ছিত-চরণ-বিন্যাসে দ্বারের কাছে আসিলেন। —চারুমুখীও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া আসিলেন। নমস্কার করিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে বিদায় দিলেন।—রাজতরঙ্গিনী পাল্কীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।—

ঝি পশ্চাৎ হইতে একটু মুখভঙ্গী করিয়া হাত নাড়িয়া অলক্ষ্যে ও নিঃশব্দে একটা বিদ্রূপের অভিনয় করিল।

(১৫)

সন্ধ্যাবেলা যাদব বড় খিন্ন ও চিন্তাক্লিষ্টভাবে বাসায় ফিরিলেন। পকেট হইতে দশটি টাকা—সেই দিনকার রোজগার—বাহির করিয়া চারুমুখীর হাতে দিলেন। তারপর কাপড় চোপড় ছাড়িয়া অনেকক্ষণ নীরবে চিন্তাকুলভাবে বসিয়া তামাক খাইলেন। চারুমুখী বুঝিয়াছিলেন, কি হইয়াছে। কিন্তু তখন কিছু বলিলেন না। যাদব হাত মুখ ধুইয়া আসিলেন,—চারুমুখী খাবার আনিয়া দিলেন।—জলযোগান্তে গোটাকতক পাণ মুখে দিয়া আবার অনেকক্ষণ গড়গড়ার নলে ধূমপান করিয়া যাদব বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলেন। ছেলেপিলেরা বাহিরের ঘরে মাষ্টারের কাছে কলরব করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল,—পাশের ঘরে বামুন পাক করিতেছিল,—উনানে ডাল ফুটিতেছিল, গামছাখানি কাঁধে ছোট পিড়িখানির উপরে বসিয়া সে তামাক খাইতেছিল। ঝি মশলা পেষণাদি সব কার্য্য শেষ করতঃ দ্বারের কাছে পা ছড়াইয়া বসিয়া বামুনের সঙ্গে গল্প করিতেছিল।—চাকর বাবুকে তামাক দিয়া বাহিরের ঘরের বারান্দায় গিয়া বসিল, —গুণ গুণ স্বরে একটা টপ্পার তান ধরিল। চারুমুখী পাখাখানি লইয়া স্বামীর কাছে গিয়া বসিলেন।

বাঁহাতে পাখা নাড়িতে নাড়িতে ডানহাতের অঙ্গুলিগুলি স্বামীর মাথার চুলের মধ্যে মৃদুস্পর্শে সঞ্চালন করিতে করিতে চারুমুখী কহিলেন, "তোমার কি অসুখ ক'রেছে কিছু?"

"না;—" একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া যাদব পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

চারুমুখী তখন আরম্ভ করিলেন, "বড় বাসার কর্ত্তা কি তোমায় ব'লেছেন কিছু?"

চমকিয়া যাদব ফিরিয়া চাহিলেন, কহিলেন 'তুমি কি শুনেছ কিছু? বোসগিন্নী এসেছিলেন বুঝি!"

"হাঁ—দুপুরের পর আজ এসেছিলেন।"

"কি বল্লেন তিনি?"

চারুমুখী সংক্ষেপে সকল কথা স্বামীর কাছে বিবৃত করিলেন। যাদব একটা নিশ্বাস ছাড়িলেন।

"কর্ত্তা তোমাকে কি বল্লেন?"

"ওই কথাই বটে। তবে ওরকম ভয় টয় দেখিয়ে কিছু বলেন নি। ব'ল্লেন, ঘোষালদের বড় অপমান হ'য়েছে,—আমার এ অনুরোধটা তোমাকে রাখতেই হবে। বজ্জ গোয়ার্ত্তুমি ক'চ্চে নিবারণ,—মত হয় ভাল, নইলে একটু

কঠিন শাস্তি তার হওয়া দরকার। প্রশ্রয় দিয়ে নষ্ট ক'রেছ, একটু দুঃখ না পেলে শোধরাবে না।"

"সে ত ঠিক কথাই ব'লেছেন, আমিও ত বরাবর তাই বলে আসছি। তা আমার কথা ত কখনও শুন্‌বে না তুমি। আর এখন কতখানি অপমান হ'তে হ'চ্চে দেখ। ভাই বল, ছেলে বল, শাসন যদি না কর,—লেখাপড়া ছেড়ে কাজ কর্ম্ম কিছু না করে যদি কেবল গোয়ার্ত্তুমি ক'রেই ফিরুছে, আর সময় মত শাসন না ক'রে যদি প্রশ্রয় দেও, তবে শেষে এম্‌নি পস্তাতেই হবে।"

যাদব একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, "যা হবার তা ত হ'য়েছেই,—এখন কি করি? ভেবে যে কিছুই কূল পাচ্চি না।"

"কেন, ভেবে এমন কূল না পাবার কি হ'ল? অন্যায় ক'রেছে মাপ চাইতে বলা হ'চ্চে। ভদ্রলোকের ত তা করাই উচিত। সেই বা কেন ক'র্‌বে না?"

যাদব কহিলেন, "শুধু এক পক্ষের কথা শুনেই ত কিছু ঠিক করা যায় না। নিবুর কি ব'ল্‌বার আছে, তাও শোনা চাই, ঘোষালদের কথাই যে একেবারে বেদবাক্য, তা কে ব'ল্‌তে পারে?"

চারুমুখী উত্তর করিলেন, "তা কে ব'ল্‌ছে? ঠাকুরপো কি ব'লে তাও শোন, গাঁয়ের পাঁচজনের কাছেও জিজ্ঞেসা কর,—তার যদি অন্যায় না হ'য়ে থাকে, তবে ওঁরাই বা কেন ব'লবেন, তাকে এতটা হীনতা স্বীকার ক'ত্তে হবে।"

"ঘটনা ঘোষালরা যা ব'লছে মোটামুটি সত্যি হতে পারে—"

"তবে আর কি? আর সন্দেহ যদি হয়, গাঁয়ের পাঁচজন লোককে জিজ্ঞেস ক'র্‌বে।"

"সেটা নিবুও মিছে ব'ল্‌বে না।"

"ওকালতী ত কর,—পাড়াগায়ে থাকে, মামলা বাধিয়ে ফেরে, আর দাঙ্গা হাঙ্গামা ক'রে বেড়ায়,—এরা সব এসে সাচ্চা কথাই কয়, নয়?"

"সহরের লোকই কি মিছে কথা কয় না?"

গেঁয়ে লোকের মত অত নয়। তবু এরা লেখাপড়া কিছু শিখেছে, ভদ্রসমাজে চ'লে ফেরে, স্বভাব চরিত্র এদের কিছু উন্নত না হ'য়েই পারে না!"

যাদব একটু হাসিয়া কহিলেন, "ঐটি তোমাদের ভুল চারু। বাইরে আদব কায়দা কিছু মোলায়েম হতে পারে, আসল চরিত্রের দোষ গুণে—সহুরে আর পাড়াগেঁয়ে লোকে তফাৎ বড় নেই। পাড়াগেঁয়ে লোক বরং মোটের উপর সরল বেশী।"

"সরল, না আহাম্মক—বুনো বর্ব্বর।"

"যাই হ'ক, মিছে কথা সভ্যদের চেয়ে বুনো বর্ব্বরেরা কমই বলে।"

"তা হলে আর সভ্যতার এত সুখ্যাতির কথা পড়তামও না, শুনতামও না।"

"তোমরা কতটুকুই বা পড় আর কিই বা শোন, দেখ ত না কিছুই।"

"সেকি আমাদের দোষ? খাঁচায় পুরে রেখেছ,—দেখব কোথায় কি? কাজেই যা ব'ল্‌বে, তাই মেনে নিতে হবে।"

"যাক্, ও তর্কে আর এখন লাভ কিছু নেই। এখন কি করা যায়, তাই ভাব্‌তে হ'চ্চে।"

"তা ভাবনা? তোমার ভাই—ভাল মন্দ এতে যা হবে, তাও তোমার। ভাল যা বিবেচনা হয় তাই ক'র্‌বে। ইচ্ছে হয়, সব চুলোয় দিয়ে—আদুরে গোপাল ভাইটিকেই মাথায় ক'রে নিয়ে নেচে বেড়াওগে না? সহর শুদ্ধ লোক গাঁ শুদ্ধ লোক ধন্যি ধন্যি ক'র্‌বে এখন।"

"এই দেখে? রাগ কেন ক'চ্চ,—আমি ত একথা বল্‌ছি না, নিবু যদি অন্যায় ক'রে থাকে তার প্রতিকার কিছু ক'র্‌ব না।"

"তা যা ভাল মনে কর ক'র্‌বে। আমি তার কি ব'লব?"

"তোমার কি কিছু ব'লতে হয় না চারু? আমার ভাল মন্দ যা, তা কি তোমারও ভাল মন্দ নয়।"

"ওত তোমার মুখের ভালমানুষী। ভাল কথা কিছু বল্লে তা শোন?"

"বাঃ! শুনি না? কি ব'লছ চারু। কোন কথাটা তোমার না শুনি ব'ল ত?" আদর করিয়া যাদব চারুমুখী হাতখানি ধরিলেন।

"কেন, কতদিন তোমাকে বলিনি, বাড়ী ব'সে আছে—কাজকর্ম্ম কিছু ক'ত্তে দেও না?"

"বাড়ীতে বাপ রাখিছে আছে,—ক্ষেত খামার কিছু

আছে—সে সব ত সেই দেখ্‌ছে। তাও ত দেখ্‌তে লোক একজন লাগে ?"

"[illegible]শুক্‌। শুধু তাতে একটা সংসার চলে ? তবে ২৫৷৩০ টাকা ক'রে খরচ কেন মাসে মাসে পাঠাতে হয় ? এই যে টাকাটা লাগে, তাকি তার নিজের রোজগার করে নেওয়া উচিত নয় ?"

"তা—চাকরীবাকরী ত আমাকেই যোগাড় ক'রে দিতে হবে। পাইনি কিছু—তাই পেড়াপীড়িও বড় করিনি। আর কি জান,—লেখাপড়া বেশী শেখেনি এমন ভাইটাই কেউ একজন বাড়ীতে থাকে—সেটা ভাল। বাড়ী ঘর আর জায়গাজমি কিছু থাক্‌লে তা রক্ষে পায়।"

"তার জন্যে মাসে ২৫৷৩০ টাকা খরচও বড় কম নয়। একজন মালী কি সরকার ১০৷১২ টাকা মাইনে দিয়ে রেখে দিলেও চলে। সে যাক্‌ গে—এখন এর কি ক'র্‌বে, তাই দেখ। যদি জিজ্ঞাসাই ক'ল্লে—ভাল যা মনে করি, তা ব'ল্‌তে হয়। বেণীবাবু অনেক ভাল তোমার ক'রেছেন, এখনও তাঁর হতে অনেক ভাল তোমার হ'তে পারে। তিনি যাতে বিরক্ত না হ'ন, সেটা তোমার দেখ্‌তে হয়। তাঁর মানও তোমায় রাখ্‌তে হয়। আর তিনি যে অন্যায় কথা কিছু ব'ল্‌ছেন, তাও নয়।"

"হাঁ, নিবু যদি এই রকম ক'রেই থাকে—"

"তা ক'রেছে কিনা, জান। তুমি ত ব'ল্‌ছ, সেও মিছে কথা ব'ল্‌বে না। তার কাছে সব শোন,—না হয় গাঁয়ের দুজন মুরুব্বি লোকেও ডেকে জিজ্ঞেসা কর।"

"তা ত ক'ত্তেই হবে। আর ঘটনা যা ঘোষালরা ব'ল্‌ছে—মোটামুটি সত্যি ব'লেই মনে হ'চ্চে। নইলে হরিঘোষাল খামোকা এদ্দূর ছুটে আস্‌ত না। তবে———"

"তবে—কি ?"

"ব'ল্‌ছিলাম এই যে—নিবু গোঁয়াড় টোয়ার যাই হ'ক্‌—অতটা খলবুদ্ধির ছেলে সে নয়। কোনও কুমতলব ক'রে কিছু ক'রেছে ব'লে মনে হয় না।"

চারুমুখী কহিলেন, "মতলব তার যাই থাক্‌, ক'রেছে এই সব কাণ্ড ?"

"তা ক'রেছে বই কি ? তবে ওঁরা যা ব'ল্‌ছেন—সেটা বড়ই বাড়াবাড়ি দাবী। গাঁয়ের দশজন মুরুব্বি লোকের সাম্‌নে নাকে খত দিয়ে মাপ চাইতে হবে,—তারকঘোষালের স্ত্রীকে কোনও সাহায্য কখনও ক'র্‌বেনা—নিবু যে এতটা রাজি হবে, এমনও মনে হয় না।"

"না হ'লে কি ক'র্‌বে ?"

"সেই ত মুস্কিলের কথা,—এটা কি বড় বাড়াবাড়ি নয় ?"

চারুমুখী ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, "এমন বাড়াবাড়িই বা কি ? হাজার হ'ক,—হরিঘোষাল বয়সে বড়—গুরুজন—তাকে অপমান ক'রেছে, মার ধর ক'রেছে।—জোর ক'রে তার পুকুর সাফ ক'ত্তে গিয়েছিল—তাতে বাধা দিতে এসেছিল—এই ত অপরাধ তার ? মাম্‌লা যদি করে, তবে যে জেল হবে।—বেণীবাবুর কথায় তারা তা ছেড়ে দিচ্চে—এখন তাদের মানটা যাতে সন্তুষ্ট হয়—মনটা থাকে—তা কি তা তোমাদের করা উচিত নয় ? এই যা শাস্তি—জেলের চাইতে ত আর তা বেশী নয় ?"

"তা—এমন লোকও আছে—যারা মনে করে এর চাইতে জেলও ভাল।"

"বেশ—তাই যদি মনে কর, কিছু ক'রো না, ওরা নালিশ করুক—জেলই হ'ক।"

"আমার যদি স্বাধীনতা কিছু থাক্‌ত, তবে তাই ক'ত্তাম। কিন্তু বেণীবাবু সেটা মোটেই চান না। তিনি বলেন, ঘোষালরা যদি মামলা ক'রে, তাঁকে তাঁদের পক্ষ নিয়ে যুঝ্‌তেই হবে, এড়াতে পার্‌বেন না। এক গাঁয়ের বামুনের ঘরের ছেলে—আমার ভাই—তার বিরুদ্ধে একটা ফৌজদারী মামলা তিনি চালাবেন—তার জেলটেল হবে—এটা তিনি কিছুতেই পছন্দ করেন না। আবার ঘোষালরাও এর কমে কিছুতেই রাজি হয় না। তাই তিনি বল্লেন, অন্যায় করেছে—একটুক্‌ হীনতা স্বীকার ক'ল্লে—যদি ওরা মিটিয়ে ফেলেন—ক্ষতি কি ?"

"সে খুব ভাল কথাই ব'লেছেন। এতে যে খুঁৎখুঁতি ক'রে, সেই আশ্চর্য্য।"

যাদব উত্তর করিলেন, "নিবু রাজি যদি হ'ত, খুঁৎখুঁতি কত্তাম না—তাকে ব'লব ও বটে জিদও ক'রব। কিন্তু সে কিছুতেই যদি রাজি না হয়—তবেই ত বিপদের কথা।" ওঁরা ব'ল্‌ছেন তাহলে তোমায় তাকে ত্যাগ কত্তে হবে। নইলে সে জব্দ হবে না—তার শাস্তি কিছু হবে না ?

"তা ত হবেই না।"

"তাই ত ভাবছি। বড় মুস্কিলেই ফেল্লে এরা। এর চাইতে নালিশ যদি ক'ত্ত সেও ভাল হ'ত—উকিল মোক্তার দিতাম পয়সা কিছু খরচ হ'ত—এমন একটা সঙ্কটে ত প'ড়তে হ'ত না।"

"কেবল পয়সা খরচ করেই কি পার পেতে? জেল হ'ত যে—তখন কি ক'ত্তে?

হুঁ!—তা. বলা যায় না। হয় ত জরিমানা ক'রেও ছেড়ে দিত—কি আদালতে একটা আপোষের কথা হ'ত—মাপ চেয়ে কি ক্ষতিপূরণ কিছু ধ'রে দিয়েও মেটান যেত—আর জেল—হলেই বা কি? এক আধ মাস জেল,—যদি হ'তই কি এমন এসে যেত!"

চারুমুখী কহিলেন, "তা তাত আর হ'চ্চে না। এখন কি ক'রবে!"

"যাইত বাড়ীতে—

"নিবারণকে—বুঝিয়ে সব বলি—"

"বাড়ীতে যাবে কেন? তাকে চিঠি লিখে দেওনা এখানে আস্তে? না হয়, ও বাড়ীর নঠাকুর কি আর দুই একজনকে আস্তে লিখে দেও--খরচ ত এমন বেশী নয়। এইত বর্ষা এসে প'ল ব'লে—জলটল খারাপ, গিয়ে একটা অসুখবিসুখ হ'য়ে প'ড়বে?"

"ওসব হবে না। ওঁরা তাতে রাজি নন। গাঁয়ে সবার সাম্‌নে নিবারণ ওদের অপমান ক'রেছে—তাঁদের সাম্‌নেই প্রতিকারের চেষ্টা ক'ত্তে হবে। সবাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানবে—একটা কিছু হ'ল।"

"তা এখানে একটা কিছু হ'লে—তাকি লুকোন থাক্‌বে? গাঁয়ের লোক কিছু জান্‌বে না?"

"সে লোকের মুখে শুন্‌বে হয়ত সব শুন্‌বেও না দুইপক্ষ দুই রকম গিয়ে ব'ল্‌বে। আর তাদের সাম্‌নে একটা কিছু হওয়াই এককথা,—আর চোখের আড়ালে কি হ'ল না হ'ল, তাই কাণে শোনা আর এক কথা। ঘোষাল-দের এ সম্বন্ধে বেজায়জিদ্‌ দেখলাম। তারা বলে সবার সাম্‌নে অপমান ক'রেছে সবার সাম্‌নে হীনতা স্বীকার ক'রে মাপ চাইতে হবে। নইলে নিবারণও ঠিক জব্দ হবে না তাদেরও অপমান যাবে না।"

"হুঁ—তা হ'লে ত—যেতেই হবে—"

"যেতে ত হবে সেইটেই ত হল বড় মুস্কিলের কথা। নিবারণকে ধমকটমক ক'রে যা খুসী ব'ল্‌তে পারি। কিন্তু মা র'য়েছেন—তিনি—"

চারুমুখী একটু রুক্ষস্বরে উত্তর করিলেন, "তা তিনি যদি অবুঝ হন—তাঁর আদুরে গোপালের কোনও দোষ না দেখেন—তার দিক টেনে ভালমন্দ বিবেচনা কিছু নাই করেন—তা হ'লেই কি তাঁর হুকুমে নিজের মাথাটি অম্‌নি কেটে দেবে? তিনি বরাবরই তার পক্ষ হ'য়ে বলেন, তোমার মুখপানে কবে চেয়েছেন? তাকে এমনি ক'রে গোল্লায়ত তিনিই দিলেন?"

"সে যাই হ'ক—তিনি মাথার উপর থাক্‌তে কি ক'রে বলি যে নিবারণ—তোকে আমি ত্যাগ ক'ল্লাম, খরচ পত্তর আর কিছু দিব না।

চারুমুখী উত্তর করিলেন "আর তিনিই বা তোমাকে কি ক'রে বলবেন—নিবারণ যা ক'রেছে বেশ ক'রেছে—তোর সর্ব্বনাশ হ'ক,—কারও দিকে আর চাস্‌নি—ওকেই গুরুঠাকুরের মত মাথায় ক'রে রাখ তো যা ভাল বোঝবারত আমি আর কি ব'লব!—তোমার ভাই তোমার মা,—আমি পরের মেয়ে বইত নই। না হয়, ওই বেণীবোসের বাড়ীতেই ছেলেপেলে নিয়েগে রেঁধে খাব,—খুব মুখ উজ্জ্বল হবে তোমার।"

"এই বলিয়া চারুমুখী উঠিলেন। যাদব তাঁর হাত টানিয়া ধরিয়া কহিলেন "এই দেখ! রাগ কচ্ছ—আমি কি তাই ব'ল্‌ছি। অবশ্য বেণীবাবুকে চটিয়ে দেওয়াটা আমার পক্ষে ভাল হবে না—সেটা বুঝি। তবে এটাওত বড় একটা শক্ত কথা বটে?"

"শক্ত হয় ক'রোনা। কে ব'ল্‌ছে? তোমার ভালমন্দ তুমি বুঝবে,—আমি কে যে তাই নিয়ে দুকথা ব'ল্‌তে যাব?"

"এই দেখ পাগল আর কি? আরে ব'সো ব'সো দেখ দিকি? কি একটু কথা বলেছি,—আর রাগে যেন একেবারে রাধারাণী হয়ে উঠ্‌লে! ব'সো, ব'সো! রাগ ক'রো না না হয়; দেহি পল্লবমুদারম্‌"—

ঈষৎ হাসিমুখে একটু ঝামটা দিয়া কহিলেন যাও ওসব ছেলেমানুষী আরএখন ভাল লাগে না! আর এ ছেলেকথাও নয় যে দুটো রঙ্গকরে উড়িয়ে দিবে। ধীর হ'য়ে নিজের ভাল-মন্দ বিবেচনা করে যা দরকার তা ক'ত্তেই হবে,—শক্ত যতই হ'ক।"

যাদব একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল "তাত—ক'ত্তেই হবে। তবে কি জান—মার সঙ্গে একটা গোলমাল করা সেটা কি কারও সুখের হয় চারু! চারুমুখী পাশেই তখন বসিয়াছিলেন। একখানি হাত হাতেই ধরা ছিল,—"আর একখানি হাতে পত্নীর পৃষ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া যাদব নিজের পার্শ্বের দিকে তাকে ধরিলেন একটু চাপিয়াই ধরিলেন।"

চারুমুখী কহিলেন, "সুখের তা কে বলে? তবে যতই অসুখের হ'ক কর্ত্তব্য যা তা ক'ত্তেই হয়? আর তোমার মাকে ত তুমি ত্যাগ ক'র্বে না! তাঁকে এখানে নিয়ে এস না, মাথায় ক'রে রাখ্‌ব। না আসেন তাঁর খেতে পরতে যা লাগে বাড়ীতে তাঁকে পাঠিয়ে দেবে —সেটাও আর কেউ তোমাকে বারণ ক'ত্তে পারে না! আর কল্লেই বা তা শুন্‌বে কেন?"

"তা বটে।—যাই বাড়ীতে—দেখি কি হয়?—নিবু যদি কথা নাই শোনে কি আর ক'রব তবে? ওখানে কিছু বল্‌তে না পারি, এখানে এসে চিঠি লিখে দেব। তাকেও বুঝিয়ে লিখ্‌ব।"

"সেই ভাল কথা। তাই ক'রো। আর ওখানে এসব কথা ব'লবার দরকারই বা কি? উনি যদি কেঁদে-কেটে প'ড়েন সত্যই কি এড়াতে পারবে। যাও বাড়ীতে চেষ্টা ক'রে দেখ—মিটমাট যদি হয় ত ভালই। না হয় কি ক'রবে? ব'লে এসো শেষে এখানে এসে যা হয় লিখে পাঠিও।"

"তাই হবে একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া যাদব আবার শুইয়া পড়িলেন। চারুমুখী কাছে ঘেঁসিয়া বসিয়া স্নিগ্ধস্পর্শে তাঁর গাঁয়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন,—আর একখানি হাতে পাখা লইয়া ধীরে ধীরে বাতাসও করিতেছিলেন। স্বামীর আরামদায়িকা চিত্তরঞ্জিকা সেবায় চারুমুখী কখনও বিমুখ ছিলেন না। যাদবও সেই মধুময় আরামে চিত্তের মধু-রঞ্জনে একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িত। (ক্রমশঃ)

যিশু-শিক্ষা।

(Mathew—9th Chap. Verse 25-34.)

কায়ার প্রতি এত মায়া
করছ কেন ওরে মন,
কি খাবে কি পরবে ব'লে
ভাব্‌ছ কেন অনুক্ষণ?

মুক্ত নভে পক্ষ মেলি'
উড়ে বেড়ায় পাখীর দল;
ধান বোনে না, চাষ করে না
তবু ত পায় আহার-জল।

দেখ্‌তে ত পাও বাগান ভরি
কুসুমরাশি ফুটে উঠে;
বস্ত্র তরে নয়কো ব্যস্ত
খাটতে কভু নাহি ছুটে।

পরম পিতার হস্ত হ'তে
তারা যেরূপ সজ্জা পায়;
রাজার পোষাক হার মেনে গো
লজ্জা পেয়ে পালিয়ে যায়।

অনাহারে মরছে পুত্র,
অঙ্গে নেইকো পরিধান,
সর্ব্বদর্শী পিতা কভু
এ দৃশ্য কি দেখ্‌তে চান্?

খোঁজ পূজ্য পিতার রাজ্য
প্রাণে আন পবিত্রতা;
সকল অভাব পূর্ণ হবে.
বাস্‌বে ভালো বিশ্ব-পাতা।

আজ্‌কের কথা ভাব আজই
কাজ কি কালের কথা ভেবে?
কল্য এলে নিজের কাজের
চিন্তাটুকু নিজেই নেবে।

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু

দ্বারকা।

রেলপথে করাচি গিয়াছিলাম। সুদীর্ঘ পথ, মধ্যে মরুভূমি, পথে খাওয়া দাওয়ার দারুণ কষ্ট; এই সকল কারণে করাচিতে পৌঁছিয়াই স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। তখন কার্ত্তিক মাস, করাচির শুষ্ক হাওয়ায় শরীর যেন ফাটিয়া যাইতে চাহিত। বেড়াইবার মত সমুদ্রবেলা সহর হইতে প্রায় ৭ মাইল দূরে অবস্থিত। কাজেই সাগরের "শীকর-সম্পৃক্ত বায়ু"-সেবনের সুবিধা অতি অল্পই ঘটিয়া উঠিত। মনে মনে স্থির করিলাম, এদিকের কার্য্য সারিয়া সাগরপথে বোম্বাই ফিরিব এবং পথে দ্বারকা, প্রভাস ও সুদামপুরী (বর্ত্তমান পোরবন্দর) দেখিয়া যাইব। ভারতের ইতিহাসে দ্বারকা এবং প্রভাস দুইটি মহাস্থান;—হিন্দুর মহাতীর্থ। যুগযুগান্তের কত স্মৃতি, কত কাহিনী, ইহাদের বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তীর্থযাত্রার আগ্রহ এবং কৌতূহল ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। অবশেষে যেদিন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম, সেদিনের সুখস্মৃতি অদ্যাপি আমার জীবনে একটি উপভোগ্য বস্তু হইয়া রহিয়াছে। সকাল সকাল আহারাদি সারিয়া সাগরের দিকে রওনা হইলাম। দুইজন সিন্ধি-সুহৃৎ আমাকে জাহাজে তুলিয়া দিতে সঙ্গে আসিলেন। যতক্ষণ ঘোড়গাড়ীতে ছিলাম, ততক্ষণ বন্ধুদ্বয় তাঁহাদের নবনির্ম্মিত নগরের সুবিন্যস্ত পণ্য-বীথি এবং প্রাসাদতুল্য অট্টালিকাগুলির উপর আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেছিলেন। করাচি—বাস্তবিকই বড় সুন্দর সহর। বর্দ্ধনশীল বাণিজ্য-সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে করাচি দিনদিনই সুন্দরতর হইয়া উঠিতেছে। সাগরপথে করাচিই পঞ্জাবের দ্বার। কাজেই করাচির বন্দর ভারতের একটি প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র। আমরা যখন বন্দরে পৌঁছিলাম, তখন বেলা ১১টা। প্রথম শ্রেণীর টিকিট করিয়া জাহাজে উঠিলাম। পরে জানিতে পারিলাম যে জাহাজ তিনটার পূর্ব্বে ছাড়িবে না। নিজের 'ব্যস্তবাগীশ'তার জন্য একটু লজ্জিত হইলাম। বন্ধুরা আমার কাছেই রহিলেন। কিছুক্ষণ পরেই টিকটিকির দল আসিয়া হাজির হইল এবং আমার 'বাপপিতামো' চৌদ্দ পুরুষের খবর ইতিপূর্ব্বেই অন্ততঃ বিংশতিবার লিখিয়া নেওয়া সত্বেও এইবার পুনর্ব্বার একবিংশতিবার লিখিয়া লইল। বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীর প্রতি টিকটিকির বড় দরদ। ঠিক যেন—"হারাই হারাই সদা ভয় হয়, পাছে হারাইয়া ফেলি চকিতে!" দিনরাত্রি সঙ্গে সঙ্গে ঘোরা, প্রত্যেকটি কথা অসীম আগ্রহে শোনা, রেলগাড়ীতে ঘুমাইয়া থাকিলেও পুতনার স্নেহে বিনিদ্রনয়নে সমস্ত রাত্রি পাশে বসিয়া থাকা, এমন কি শীতে কম্বল মুড়ি দিয়া ঘুমাইলেও—মধ্যে মধ্যে কম্বল সরাইয়া প্রেম-পাত্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করা, এমন আরও কত অহেতুকী প্রীতির নিদর্শন উল্লেখ করা যাইতে পারে। যতক্ষণ জাহাজ বন্দরে ছিল ততক্ষণ তারা তীরে দাঁড়াইয়াই রহিল। জাহাজ ছাড়িয়া গেলে সম্ভবতঃ আমার অভ্যর্থনার জন্য দ্বারকায় তার করিয়া তাহারা গৃহে ফিরিয়াছিল। তিনটা বাজিবার কিছু পূর্ব্বে, ক্ষুণ্ণহৃদয়ে আমার সিন্ধি বন্ধুদ্বয় বিদায় লইলেন। বিদায়কালে তাঁদের চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল। আমিও ব্যথিতপ্রাণে শেষবার তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রু গোপনের জন্য মুখ ফিরাইলাম। আরব-সাগরের অকূল বক্ষে তরী ভাসিল। কার্ত্তিক মাস, সাগর তখন অপেক্ষাকৃত শান্ত। আমি ডেকের উপরে গিয়া অসীমের শোভা দেখিতে লাগিলাম। ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশ, নিম্নে অকূল বারিধি! এমন সীমাহারা সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব মিলন বুঝি আর কোথাও ঘটে না! অসীমের এই নিবিড় বেষ্টনের মধ্যে রসনা শুষ্ক হইয়া যায়, মুগ্ধহৃদয় ভেদ করিয়া ধ্বনি উঠিতে থাকে—"সীমা কে জানে! সীমা কে জানে!" ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। পশ্চিমাকাশ রক্ত-কিরণে উদ্ভাসিত করিয়া দিনমণি অস্ত-স্নানের আয়োজন করিলেন। যতই তিনি দিক্‌চক্রবালে হেলিয়া পড়িতে লাগিলেন, ততই সমুদ্রবক্ষ অলক্তকরাগে অনুরঞ্জিত হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল যেন আকাশে এবং সাগরে রঙ্গের এক মহামেলা বসিয়া গিয়াছে! অবশেষে অংশুমালী একখানি প্রকাণ্ড স্বর্ণথালার আকারে ধক্ ধক্ ঝক্ ঝক্ করিতে করিতে অতি ধীরে অম্বুনিধি-নীরে অবগাহন করিলেন। অমনি জগজ্জ্যোতির সমস্ত রঙ্গ বারিধিবক্ষে ছড়াইয়া পড়িল! সমস্ত সাগরের জল লালে লাল হইয়া গেল! প্রকৃতির এই মহান্ দৃশ্য যে স্বচক্ষে দেখে নাই, তাহাকে সে শোভা বুঝাইবার

চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। সে অপূর্ব্ব ছবি যে একবার দেখিয়াছে জীবনে সে তাহা কখনও বিস্মৃত হইবে না। ক্রমে রাত্রি আসিল,—ঘনান্ধকার সসীমে এবং অসীমে একাকার করিয়া দিল। জাহাজ লবণাম্বুরাশি কর্ষণ করিয়া চলিল, এবং ঐ কর্ষিত-পথে ফস্‌ফরাসের আলোকের ন্যায়, কিসের জানিনা, একপ্রকার আলোক অজস্র জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। বর্ষাধিক পূর্ব্বে ইউরোপের মহাসমর আরম্ভ হইয়াছে, কাজেই সাগরে তখন কড়া পাহারার ব্যবস্থা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলদ্বীপ হইতে সমস্তরাত্রি পর্য্যবেক্ষণ আলো (Search light) ঘুরাইয়া জাহাজের গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখা হইতেছিল। রাত্রি ৮টার পরে কেবিনে যাইয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করা গেল। একটু বিশ্রামের পরে পুনরায় ডেকে যাইয়া দাঁড়াইলাম। অসীমের হাওয়ায় সর্ব্বাঙ্গ শীতল করিয়া দিল। ক্রমে জাহাজের যাত্রিগণ নিদ্রার কোলে আশ্রয় লইল। কেবল আমিই একা সেই গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে দাঁড়াইয়া আকাশপানে চাহিয়া রহিলাম। নৈশগগনে অযুতনক্ষত্র অযুত হীরকখণ্ডের ন্যায় ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। তাদের সেই মৃদুহাসি কি সুন্দর! কি অর্থপূর্ণ! মনে হইতেছিল যদি ঐ অর্থখানি একবার বুঝিয়া লইতে পারি, তবে এই ভয়সঙ্কুল-জীবনে নিশ্চয়ই অভয়প্রতিষ্ঠা হইবে। কিন্তু এজীবনে তাহা পারিলাম কৈ? দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যখন পদদ্বয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তখন বাধ্য হইয়া কেবিনে যাইয়া ঘুমাইলাম। ৪টা বাজিতেই ঘুম ভাঙ্গিল। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুইয়া সবিতৃদেবের উদয়মান দেখিবার জন্য বাহিরে গেলাম। জলধিগর্ভ হইতে তাঁর উত্থানের পূর্ব্বেই আকাশে তাঁর রক্ত পতাকা উড্ডীন হইল। সাগরের জলেও যেন সিন্দুর ঢালিয়া দিল। অলক্তকরাঙ্গা তরঙ্গায়িত জলরাশির প্রভাতনৃত্যে এবং আনন্দকল্লোলে অভিনন্দিত হইয়া সদ্যস্নাত তপনদেব একটি প্রকাণ্ড অগ্নিগোলকের ন্যায় সাগরগর্ভ হইতে উত্থিত হইলেন এবং অবিলম্বে উদয়াচলে আরোহন করিলেন। ক্রমে বেলা যতই বাড়িতে লাগিল, ততই বাঞ্ছিতধামের নিকটবর্ত্তী হইতেছি ভাবিয়া হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। ক্রমে সাগরতীরে বহুদূরে এক আধটি মন্দির চূড়া দৃষ্ট হইতে লাগিল এবং যাত্রিগণ উহার প্রত্যেকটিকেই প্রথমতঃ 'ত্রিলোকসুন্দরের' চূড়া মনে করিয়া ভক্তিভরে অভিবাদন করিতে লাগিল। দ্বারকার শ্রীমন্দিরের নাম 'ত্রিলোকসুন্দর'। কিন্তু দ্বারবতী তখনও বহুদূরে। অবশেষে বেলা ২ টার সময়ে শ্রীমন্দিরের চূড়া যথার্থই দৃষ্টিগোচর হইল। অমনি বিশ্বাসী যাত্রীর দল করজোড়ে ভক্তিনম্র হৃদয়ে একবার মস্তক অবনত করিয়া "জয় রাজা-রণছোড়জীকিজয়," "জয় ভগবান দ্বারকানাথ কি জয়" বলিয়া আনন্দধ্বনি তুলিয়া দিল। মন্দিরচূড়া নয়নপথারূঢ় হইবার পরেও প্রায় একঘণ্টা কাল সাগর বাহিয়া জাহাজ দ্বারকার সম্মুখীন হইল, এবং তীরভূমি হইতে প্রায় আধমাইল দূরে নঙ্গর করিল। দ্বারকার উপকূল নিমজ্জিত-শৈলমালায় পরিপূর্ণ বলিয়া জাহাজ কূলে আসিয়া লাগে না। কারণ তাহাতে বিপদের আশঙ্কা প্রচুর। খুব মোটামোটা তক্তার তৈরি বড় বড় নৌকা আসিয়া যাত্রিদিগকে নামাইয়া লইয়া যায়। পাণ্ডার দল আসিয়া জাহাজেই যাত্রিদিগকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু ইহারা অপেক্ষাকৃত নিরীহ এবং স্বল্প-সন্তুষ্ট। আমি একজন নবীন-বয়স্ক, ভদ্রবেশধারী পাণ্ডার অনুসরণ করিয়া জাহাজ হইতে অবতরণ করিলাম। আমার জিনিষপত্র নামাইতে পাণ্ডাজী যথেষ্ট সাহায্য করিলেন। নৌকা সাগরতরঙ্গে যেরূপ হাবুডুবু খাইতেছিল তাহাতে পাণ্ডাজীর সাহায্য ব্যতীত জাহাজ হইতে অবতরণকরা আমার পক্ষে আদপেই সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। বারিধিবক্ষে শুষ্কপত্রের ন্যায় ভীষণ দোল খাইতে খাইতে নৌকা পালভরে তীরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই নাতিদীর্ঘপথটুকু বড় ভয়ানক। বহুবার নাকি ডোবা পাহাড়ে আহত হইয়া যাত্রীভরা নৌকা বানচাল হইয়া গিয়াছে এই জন্যই এখন শীতের কয়েকমাস ব্যতীত ষ্টীমার কোম্পানি দ্বারকার যাত্রী গ্রহণ করেন না। অন্য সময়ে ভেরোয়ালে নামিয়া, পরে গো-শকটে প্রায় ৬০ মাইল অতিক্রম করিয়া তবে দ্বারকায় পৌছান যায়। দ্বারকার উপকূলে সাগর বারি এতই স্বচ্ছ যে নিমজ্জিত শৈলমালা, বহুনিম্নে সঞ্চরণশীল মৎস্যপুঞ্জ, সাগরতলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 'গোমতীচক্র' নানা আকারের ও নানাবর্ণের প্রবাল কীট ও প্রস্তরখণ্ড সকল সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তীরের প্রায় ৫০ গজ দূরে থাকিতেই বড়নৌকা হইতে নামিয়া ছোট ছোট নৌকায় চড়িতে হইল। এই জলি-বোটের মতন নৌকাগুলি দক্ষিণে ও বামে অবস্থিত শৈলমালার মধ্যদিয়া আঁকা বাঁকা

কিয়দ্দূর যাইয়া অবশেষে যাত্রীদিগকে এক একটি শৈলশিরে নামাইয়া দিল। সেখান হইতে আবার মানুষের স্কন্ধে চাপিয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতে করিতে অবশেষে পুণ্যতীর্থ দ্বারবতী তীরে উত্তীর্ণ হইলাম। প্রাণে তখন কি আনন্দ, কি উৎসাহ! ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা অসম্ভব। বরোদা-রাজের পুলিশ আসিয়া আমাকে অভিবাদন করিল। বুঝিলাম খবর আগেই পৌঁছিয়াছে। তারা আমার বাক্স প্রভৃতি খুলিয়া দেখিতে চাহিল। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিল যে ব্যবসায়ের জন্য নূতন বস্ত্রাদি আমার সঙ্গে আছে কিনা তাহা দেখাই তাহাদের উদ্দেশ্য, কারণ সেরূপ স্থলে নিয়মিত শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা আছে। ঠিক সেই সময়ে সহর কোটাল ফৌজদার স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হইয়া আমাকে অভ্যর্থনা-জ্ঞাপক মিষ্ট বচনে আপ্যায়িত করিলেন। আমিও পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। পাণ্ডাজী আমাকে কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী এক ধর্ম্মশালায় লইয়া গেলেন এবং তাহার নিম্নতলস্থ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি প্রকোষ্ঠে আমার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ধর্ম্মশালার এক চাকর আসিয়া নিকটস্থ এক ইঁদারা হইতে এক কলসী পানীয় জল আনিয়া দিল। হাতমুখ ধুইবার জন্যও জল পাইলাম। ওদেশে সুপেয় জলের বড়ই অভাব। প্রক্ষালনাদি শেষ করিয়া আমি একটু বিশ্রামের জন্য শয়ন করিলাম। আহারাদির ব্যবস্থার ভার পাণ্ডাজী নিজেই লইলেন। যথাসময়ে অন্নব্যঞ্জন আপনি আসিয়া পৌছিবে জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। তখন সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইয়াছে। অন্ধকার রাত্রি। আমিও ক্লান্ত। কাজেই সে রাত্রিতে আর বাহির হইব না স্থির করিলাম। রাত্রি প্রায় ১০ টার সময়ে কদন্ন, অসিদ্ধ ডাল, অর্দ্ধসিদ্ধ তরকারী, চর্ব্বিমিশ্রিত ঘৃত এবং জলমিশ্রিত দুগ্ধে কোনমতে জঠরানল নির্ব্বাপিত করিয়া অসীম আনন্দে ঘুমাইলাম। পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া তাড়াতাড়ি স্নানাদি সমাপনান্তে পাণ্ডাজীর অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। পাণ্ডাজী আসিয়া হাসিমুখে দেখা দিলেন। লোকটি যুবক। বেশ হাসিখুসী। বাঙ্গালা কথাও এক আধটু বুঝিতে পারেন। তিনি আমাকে পথ দেখাইয়া শ্রীমন্দিরাভিমুখে লইয়া চলিলেন। দ্বারকা অতি প্রাচীন জরাজীর্ণ সহর। ধরণ অনেক কাশীধামের ন্যায়। তবে কাশীর ঐশ্বর্য্য, জনতা এবং গঠন সৌন্দর্য্য,—সে সব দ্বারকার কিছুই নাই। কাশী যে ভাবে গঙ্গার তীরে অবস্থিত; দ্বারকার প্রাচীনাংশ কতকটা সেইভাবেই গোমতীতীরে প্রতিষ্ঠিত। তবে গঙ্গার তুলনায় গোমতীকে নদী বলাই চলে না। স্বল্পতোয়া, ক্ষীণদেহা সরিৎ মাত্র বলা যাইতে পারে। শ্রীমন্দিরের কিঞ্চিৎ দূরেই গোমতীর সাগরসঙ্গম। এই সঙ্গমস্থান হইতে বামে বহুদূর পর্য্যন্ত একটি কঙ্করময় অনতিপ্রশস্ত উচ্চতটভূমি প্রাচীরাকারে দণ্ডায়মান থাকিয়া গোমতীকে সাগর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সাগর সহরের পশ্চিমে। শ্রীমন্দিরও পশ্চিমাস্য। হিন্দুর আর কোন প্রসিদ্ধ মন্দির পশ্চিমাস্য আছে কিনা জানি না। গোমতী যে স্থানে ত্রিলোক-সুন্দরের পাদদেশ ধৌত করিয়া যাইতেছে সেই স্থানটিকে 'মোক্ষ ঘাট' বলে। বিশ্বাসী হিন্দু এইখানে স্নানাবগাহন করিয়া মোক্ষলাভ করেন। গোমতীস্নানের জন্য প্রত্যেক যাত্রীকে ১/০ করিয়া দক্ষিণা দিতে হয়। মোক্ষঘাটে স্নান করিলে অতিরিক্ত আরও কিছু লাগে। শুনিয়াছি যে গোমতী স্নানের এই মাশুল হইতে বরোদা রাজের বার্ষিক ৫০ হাজার টাকা আয় হইয়া থাকে। পাণ্ডাজী বলিলেন, এই গোমতী বশিষ্ঠকন্যা, পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাগরের প্রেমে মজিয়াছিলেন, এবং একদিন পিতার অনুপস্থিত কালে আশ্রম হইতে পালাইয়া আসিয়া বাঞ্ছিতের বক্ষে আত্মসমর্পণ করেন। সঙ্গমস্থানের লহরীলীলায় এবং মৃদুকলতানে দুঃখশীর্ণা, বিরহকাতরার প্রথম মিলনের আনন্দপুলক অপূর্ব্ব ফুটিয়া উঠিতেছে। গোমতীর জল স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ সাগরাম্বুর মত লবণাক্ত। সঙ্গমস্থানের দূরে এবং নিকটে প্রবাল কীটের ন্যায় নানা আকারের বিচিত্র প্রস্তর খণ্ড সকল চতুর্দ্দিকে ছড়ান রহিয়াছে। স্থানীয় লোকেরা ইহাকে 'গোমতীচক্র' বলে এবং শালগ্রাম শিলার ন্যায় পবিত্র বলিয়া মনে করে। উহার কোন কোনটি সদ্য প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্মের ন্যায় চিত্তাকর্ষক। ফিরিবার সময়ে উহার একঝুড়ি আমি সঙ্গে আনিয়াছিলাম, এবং বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও কলিকাতার বন্ধুদিগকে উপহার দিয়াছিলাম।

গোমতীর তটপ্রান্ত হইতে বহু উচ্চভূমির উপরে শ্রীমন্দির অবস্থিত। একপঞ্চাশৎটি সোপান বাহিয়া মন্দিরদ্বারে পৌছিতে হয়। সোপানাবলীর উভয় পার্শ্বে বহু দেবস্থান এবং মঠ। মন্দিরের চারিদিকে উচ্চ প্রাচীরের বেষ্টন। প্রাচীরসংলগ্ন বহু দেবস্থান প্রধান মন্দিরকে ঘেরিয়া রহিয়াছে।

শ্রীমন্দির চারি অংশে বিভক্ত। (১) দ্বার (২) মণ্ডপ (৩) দেবাধিষ্ঠান বা গর্ভগৃহ (৪) শিকরা বা চূড়া। মণ্ডপটি সমচতুর্ভুজ। দৈর্ঘ প্রস্থে ১৪ হাত। ইহা পাঁচ-তলা। প্রত্যেক তলই স্তম্ভশ্রেণীর উপর বিন্যস্ত। এই তলাগুলি ক্রমান্বয়ে নিম্নভাগ হইতে উচ্চভাগে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া সর্ব্বশেষ একটি সুন্দর গম্বুজে পরিণত হইয়াছে। মণ্ডপের চত্বর হইতে গম্বুজের শীর্ষ পর্য্যন্ত প্রায় ৫০ হাত উচ্চ। প্রথম তলের উচ্চতা প্রায় ১২ হাত। ইহা সম-চতুষ্কোণ। চারিকোণে চারিটি বিপুলস্তম্ভ। এতদ্ব্যতীত আরও বহুস্তম্ভশিরে স্তরবিন্যস্ত সেই বিরাটগম্বুজ বিধৃত। সর্ব্বনিম্নতলের স্তম্ভরাজির উপরে নানাবিধ কারুকার্য্য-সমন্বিত সারি সারি খিলান। মণ্ডপের পূর্ব্বদিকে দেবাধিষ্ঠান গৃহ। এই গৃহের শিরোপরি আকাশচুম্বী চূড়া। চূড়াটি কোণাকার একটি কোণের উপর আর একটি কোণ স্তর-বিন্যস্তভাবে উর্দ্ধদিকে ক্রমে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া সপ্তমস্তরে যাইয়া শেষ হইয়াছে। ভূমি হইতে সপ্তম স্তরের শীর্ষদেশ প্রায় শত হস্ত উচ্চ। কোণস্তরগুলিও সুন্দর স্তম্ভরাজির উপরে বিন্যস্ত। গর্ভগৃহ পশ্চিমাস্য। স্থাপত্য শিল্পের হিসাবে এই মন্দির ভারতের প্রধান মন্দিরগুলির তুলনায় অপেক্ষাকৃত দরিদ্র বলিয়া মনে হইল। একপ্রকার ছিদ্রবহুল বালুপ্রস্তরে মন্দিরের বহির্ভাগ নির্ম্মিত। গাঁথুনিও চিত্তাকর্ষক নহে। মন্দিরের গঠনপ্রণালী অনেকটা জৈন মন্দিরের মতন। গর্ভগৃহের মধ্যস্থলে উচ্চ বেদীস্থ সিংহাসনে দ্বারকানাথ বিষ্ণুর বিগ্রহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এখানে বিষ্ণুর রাজবেশ। রাজপরিচ্ছদ, শিরে রাজমুকুট, চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। শিল্পনৈপুণ্যের হিসাবে মূর্ত্তিটি খুব চিত্তহারী বলিয়া মনে হয় নাই। তবে ভক্তের চক্ষে উহার তুলনা নাই। সকালে পূজা এবং সন্ধ্যায় আরতি কালে পুনঃ পুনঃ নানা বিচিত্র বেশে দেবতাকে সজ্জিত করা হয়। সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে হিন্দুভক্তগণ দেবতাকে স্পর্শ করিয়া স্বহস্তে তাঁহার অভিষেক এবং পূজা করিয়া থাকেন। পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া পূজার বিধান বলিয়া দেন। প্রত্যেক পূজার্থীকে ||১০ আনা করিয়া দক্ষিণা দিতে হয়। এতদ্ব্যতীত ভোগের জন্য অবস্থানুসারে যিনি যাহা ইচ্ছা দিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

"প্রিয়া।"

রূপে নাহি তার রবির খরতা
নাহিক' শশীর কিরণ-ধারা।
প্রেমের মদিরা পিয়ায়ে আমারে
করে নি' সে কভু পাগলপারা।

ভালবাসা তার ভাবের আকারে
কবিতার মুখ দেয়নি খুলি'।
তাহার মুখের অক্ষর শুনি'
শিখেনি' পাপিয়া প্রেমের বুলি।

ছন্দ নাহিক গমনে তাহার
গন্ধ নাহিক' পরাগজয়ী।
গন্ত-বিভোরা কার্য্যপ্রবণা
সে নহে কখন (ও) আবেগময়ী।

সে হৃদয় নহে প্রণয়-প্রবণ
নহে ত' গঠিত অমৃত দিয়া—
জ্বালাক্—পোড়াক্—যন্ত্রণা দিক্
তবুও সে মোর প্রাণের প্রিয়া।

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ

ভারত-শাসন-প্রণালীর সংস্কার।

(দৈনিক বাঙ্গালী পত্রিকায় প্রকাশিত অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত)

মণ্টেগু ও চেমসফোর্ডের প্রস্তাব।

রিপোর্টের সারাংশ।

রাজপ্রতিনিধি মহোদয় ও ষ্টেটসেক্রেটারী মহোদয় ভারতবর্ষে শাসনপ্রণালীর সংস্কার বিষয়ে যাহা বাঞ্ছনীয় মনে করেন তাহা একখানা রিপোর্টে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দলিলে লর্ড ডার্হাম কানাডার শাসন-প্রণালীর ভিত্তি স্থাপন করেন, এই রিপোর্টও গুরুত্বে তাহার সমান হইবে। কোন্ ঘটনা পরম্পরায় ক্রমশঃ বর্ত্তমান অবস্থা আসিয়া পড়িয়াছে, প্রথমে এই রিপোর্টে তাহা বিবৃত হইয়াছে। শাসনপ্রণালী ও ব্যবস্থাপক সভাগুলি ক্রমশঃ কিরূপ পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহা বর্ণিত হইয়াছে; মর্লী-মিণ্টো প্রবর্ত্তিত কাউন্সিল সকল কিরূপ কার্য্য করিতেছে তাহা বিচারিত হইয়াছে; প্রস্তাবিত সমস্যায় কোন কোন বিষয় বিবেচনাসাপেক্ষ তাহা আলোচিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কংগ্রেস-লিগ কৃত প্রস্তাবও ধরা হইয়াছে; তারপর ইহাতে বাঞ্ছনীয় প্রস্তাবগুলি যথারীতি ব্যক্ত করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষের বিষয়ে সম্রাটের গবর্ণমেণ্টের যে নীতি তাহার স্বরূপ ষ্টেটসেক্রেটারী মহোদয় ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট তারিখে ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহা এই যে যাহাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অখণ্ডিত অংশরূপে ভারতে ক্রমোন্নতি সহকারে (দেশবাসীর) দায়িত্বমূলক শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয়। তদর্থে স্বায়ত্ত-শাসনের প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রমিক বিকাশ সাধন করিতে হইবে এবং যত শীঘ্র সম্ভব এইদিকে যথেষ্ট উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। লর্ড মিণ্টো ও লর্ড মর্লী ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে যে নীতির নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন সে নীতি অপেক্ষা এই মূলেই ভিন্ন প্রকৃতির এবং কত বৃহৎ তাহার সীমা নাই। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে 'প্রবর্ত্তিত প্রণালী কেবল বিকশিত করিয়া লইলে বর্ত্তমান অবস্থায় উপযোগী হইবে না। তজ্জন্য দায়িত্বমূলক শাসনপ্রণালী কতক মাত্রায় বিহিত হওয়া চাই এবং তাহা যাহাতে বাড়ে এইরূপ বিধান থাকা চাই। প্রথম উপায়, বাস্তবিক প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা করা। প্রাদেশিক বজেট ভারত গবর্ণমেণ্টের বজেট হইতে একেবারে পৃথক করা যাইবে, এবং বর্ত্তমানে জমা খরচের ফিরিস্তিতে যেরূপ ভাগাভাগি করা আছে, তাহার পরিবর্ত্তে ভারত গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের আমদানিতে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিতে হইবে। এই টাকাটা বজায় রাখিয়া প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট নিজের আয়ব্যয়ের ব্যবস্থা নিজেই করিবেন, এবং এই সঙ্গে ঋণ করিবার ও ট্যাক্স বসাইবার কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতা পাইবেন। ইহার সঙ্গে শাসনকার্য্য ও আইন প্রণয়ন বিষয়ে প্রকৃতই কতক পরিমাণে ভার দেওয়া হইবে। সকল প্রদেশের জন্যই স-কাউন্সিল গবর্ণর কর্ত্তৃক শাসনের প্রণালী প্রস্তাবিত হইয়াছে। এক্জিকিউটিব কাউন্সিল সহ গবর্ণর শাসনবিভাগের কর্ত্তা হইবেন। এই এক্জিকিউটিব্ কাউন্সিলে দুজন সভ্য থাকিবেন, একজন ইংরাজ, অপর জন ভারতবাসী। দুইজনেই গবর্ণরের পছন্দ মত নিযুক্ত হইবেন। এক্জিকিউটিব্ কাউন্সিলের সহযোগী স্বরূপ একজন বা ততোধিক সচিব গবর্ণমেণ্টের অঙ্গীভূত থাকিবেন। ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত সভ্যগণের মধ্য হইতে গবর্ণরের পছন্দ মত উঁহারা নিযুক্ত হইবেন, এবং এই সভায় সেবারকার জীবিতকাল পর্য্যন্ত ইঁহারা স্ব স্ব পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। রাজকার্য্যের সমস্ত বিষয় দুইভাগে বিভক্ত হইবে; গবর্ণর ও এক্জিকিউটিব কাউন্সিলের সভ্যগণের হস্তে 'হাতে রাখা' (Reserved) বিষয়গুলি, এবং গবর্ণর ও তাহার সচিবর্গের হস্তে 'হাত ছাড়ান'(transferred)বিষয়গুলি; বিষয়গুলিকে 'হাতে রাখা' ও হাত ছাড়ান' এই দুশ্রেণীতে ভাগ করা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন রকমে হইবে। কোন্ কোন্ বিষয়গুলি 'হাতে রাখা' বা 'হাত ছাড়ান' শ্রেণীতে পড়িবে একটি কমিটি কর্ত্তৃক ইহা নির্দ্ধারিত হইবে। ভারতবর্ষের বাহির হইতে একজন সভাপতি ও ভারতবর্ষ হইতে দুজন সভ্য লইয়া এই কমিটি গঠিত হইবে। সভ্য দুইজনের একজন ইংরেজ সরকারী

কর্মচারী, আর একজন বেসরকারী ভারতবাসী, এরূপ হইবে। রাজকার্য্যের যে সকল বিভাগ স্বভাবতঃ 'হাত ছাড়ান' বিষয়ের শ্রেণীতে পড়িতে পারে তাহা এই :—প্রাদেশিক উদ্দেশ্যে ট্যাক্স বসান, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন, শিক্ষা, পূর্ত্ত-কার্য্য, কৃষি, আবগারী, এবং স্থানীয় শ্রমশিল্প।

এই যে ব্যবস্থাপক সভা যাহার নিকট গবর্ণমেণ্ট এরূপ গুরুতর পরিমাণে দায়ী হইবেন, তাহাতে নির্ব্বাচিত সভ্যগণের সংখ্যাধিক্য থাকিবে, এবং নির্ব্বাচন করিবার জন্য ভোট দিবার অধিকার যথাসম্ভব বিস্তৃত করা হইবে। মুসলমানদের জন্য সম্প্রদায়গত নির্ব্বাচন বজায় থাকিবে, কিন্তু পাঞ্জাবের শিখেরা ছাড়া অপর লোকের সম্প্রদায়গুলির প্রধিনিধি পছন্দ মত নিযুক্ত হইবে। ভোট দিবার অধিকারের সবিশেষ বিবরণ এবং প্রত্যেক (ব্যবস্থাপক) সভার গঠন একটি কমিটী ঠিক করিয়া দিবেন। এই কমিটিতে সকল দলেরই প্রতিনিধি থাকিবে। সভ্য আপনার সভ্যগণের মধ্য হইতে রাজকার্য্যের প্রত্যেক বিভাগ বা বিভাগসমষ্টির জন্য একটি ষ্টাণ্ডিং বা স্থায়ী কমিটি সেই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত (এক্‌জিকিউটিব্ কাউন্সিলের) মেম্বার অথবা সচিবের সহযোগে কাজ করিবে। গবর্ণরের অনুমোদন হইলে সভার কার্য্যের নিয়ম পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা সভার থাকিবে। সাপ্লিমেণ্টারী প্রশ্ন করিবার অধিকার সভ্যেরই থাকিবে। সভা সমস্ত 'হাতে রাখা' বিষয়ের কার্য্যে প্রভাব খাটাইবে এবং সমস্ত 'হাত ছাড়ান' বিষয়ের নীতি কার্য্যতঃ সভার নির্দ্দেশেই চলিবে। "প্রদেশের শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য যে দায়িত্ব তাহার ভারবহনার্থ আবশ্যক," অথবা "হাতে রাখা বিষয়গুলির ভারবহন জন্য আবশ্যক," এই বলিয়া গবর্ণর যাহাদের সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দেন, সেই সকল নিরাপদে প্রণীত হইতে পারে এইজন্য সাবধানতার সহিত যে সকল বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা বজায় রাখিয়া, কোন আইন কিরূপ হইবে, তাহাও (ব্যবস্থাপক) সভার সিদ্ধান্ত মতে স্থির হইবে। আবার ব্যয় সম্বন্ধে প্রস্তাব এই যে, গবর্ণমেণ্টের শাসনবিভাগ সমগ্রভাবে বজেট প্রস্তুত করিবেন। ভারত-গবর্ণমেণ্টে যে টাকা দিতে হইবে, তাহাই প্রথম খরচা হইবে। তারপর প্রাদেশিক অভাব মোচনের ব্যবস্থা হইবে, আর রাজস্বের পরিমাণ যদি যথেষ্ট না হয়, অতিরিক্ত ট্যাক্স বসানের কথা গবর্ণর ও তাহার সচিববর্গের সিদ্ধান্তমতে স্থির হইবে। তারপর বজেট সভাতে উপস্থিত করা হইবে ও সভা উহার আলোচনা করিবে এবং মন্তব্য দ্বারা খরচের দফাগুলি সম্বন্ধে ভোট দিবে। 'হাতে রাখা' বিষয়গুলি ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে মন্তব্যগুলি মানিয়া চলিতে হইবে। 'হাতে রাখা' বিষয়গুলির জন্য প্রস্তাবিত খরচের দফাগুলি সভা যদি নামঞ্জুর করে বা পরিবর্ত্তিত করে, সে বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্তের ভার গবর্ণরের হাতে থাকিবে। এ বিষয়ে এই অত্যাবশ্যক সতর্কতার ব্যবস্থা আছে যে গবর্ণরের সার্টিফিকেট দেওয়া চাই যে এই সকল খরচের দফা শান্তি ও সুশৃঙ্খলা অথবা সুশাসনের জন্য আবশ্যক।

এ সকল প্রস্তাবের ফলে কি আয়ব্যয় বিষয়ে, কি শাসন বিষয়ে, কি আইন প্রণয়ন বিষয়ে, প্রকৃত প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। নির্ব্বাচিত সভ্যগণের বাস্তবিক সংখ্যাধিক্য থাকাতে ব্যবস্থাপক সভার সাহায্যে রাজকার্য্যের সকল বিষয়ে নির্ব্বাচনের অধিকার প্রাপ্ত লোকদিগের প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে, এবং ভারতের উন্নতির সহিত যাহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এরূপ বিষয়ের উপর অবিলম্বে লোকমতের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। অবস্থায় না বাধিলে যাহাতে যত শীঘ্র সম্ভব পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়, ইহাই প্রস্তাবগুলির উদ্দেশ্য, এবং এগুলি যাহাতে আপনা হইতেই উৎকর্ষ লাভ করে তদর্থে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, 'হাতে রাখা' ও 'হাত ছাড়ান' বিষয়গুলির তালিকাটী পাঁচ বৎসর অন্তে ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সংশোধিত হউক, এবং শাসন-প্রণালীর যাহাতে উন্নতি হয় তজ্জন্য দশ বৎসর অতীত হইলে পার্লামেণ্টের কমিশন কর্ত্তৃক সমগ্র রাষ্ট্রীয় অবস্থাটির পুনরায় পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। আর অগ্রসর হওয়া সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য বার বৎসর পরে পরে কমিশন বসা উচিত, ইহাও প্রস্তাবিত হইয়াছে।

ভারত গবর্ণমেণ্টের গঠন সম্পর্ক ধরিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যায়, সমস্যা আরও জটিল। কারণ, প্রদেশগুলিতে দেশবাসিগণের সম্পূর্ণ দায়িত্বমূলক শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত পার্লামেণ্টের নিকট ভারত গবর্ণমেণ্টের দায়ী থাকিতে হইবে, এবং শান্তি, সুশৃঙ্খলা ও সুশাসনের জন্য যে সকল বিষয় ইহার মতে অত্যাবশ্যক, উহাদের উপর, অবাধ প্রভুত্ব ইহার রাখিতে হইবে। তাই প্রদেশের জন্য একটি প্রতিনিধি সভার (chamber) শাসন প্রস্তাবিত হইলেও ভারত গবর্ণমেণ্টের

জন্ম দুইটি সভার শাসনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। এখনকার মত স-কাউন্সিল গবর্ণর লইয়াই শাসনবিভাগ গঠিত হইবে। প্রভেদ এই যে, একজনের স্থলে দুজন ভারতবাসী কাউন্সিলের মেম্বর হইবেন, এবং কাউন্সিলের মেম্বর নির্ব্বাচন করার পক্ষে বর্ত্তমান বাধাগুলি দূরীভূত হইবে। একশত জন সদস্য লইয়া একটি "লেজিস্লেটিব এসেম্ব্লী" ব্যবস্থাপক পরিষৎ হইবে। ইহার সদস্যগণের দুই ভাগ নির্ব্বাচিত হইবে। সম্প্রদায়গত নির্ব্বাচন মুসলমানদের জন্য বজায় থাকিবে এবং পঞ্জাবে শিখদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। ষ্টেট-কাউন্সিল নামে দ্বিতীয় সভাতে পঞ্চাশ জন সদস্য থাকিবে; একুশ জন নির্ব্বাচিত, তন্মধ্যে পনর জন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলি কর্ত্তৃক; এবং উনত্রিশ জন পছন্দ মত নিযুক্ত, তন্মধ্যে সরকারী কর্ম্মচারী পঁচিশ জনের বেশী হইবে না। সরকারী আইন প্রণয়নের সময়, পাণ্ডুলিপিগুলি সাধারণতঃ লেজিস্লেটিব এসেম্ব্লীতে উপস্থিত করা হইবে, এবং তারপর উহা ষ্টেট কাউন্সিলে চলিয়া যাইবে। দুই সভার মধ্যে মতভেদ ঘটিলে উভয়ের মিলিত সভা করা হইবে। বেসরকারী পাণ্ডুলিপিগুলির বেলায়ও ঐ প্রথামতই কার্য্য হইবে, কিন্তু এগুলি প্রথমতঃ প্রস্তাবকর্ত্তা যে সভার সদস্য সেখানেই উপস্থিত করা হইবে। লেজিস্লেটিব এসেম্ব্লী যদি এমন কোন বিধান নামঞ্জুর করে, যাহাতে ষ্টেট কাউন্সিল মত দিয়াছে, এবং যাহা স-কাউন্সিল গবর্ণরের মতে শান্তি, সুশৃঙ্খলা ও সুশাসনের নিমিত্ত অত্যাবশ্যক, তাহা হইলে তিনি সার্টিফিকেট দিলে এই বিধান টিকিয়া যাইবে। এইরূপে সকাউন্সিল গবর্ণর যাহা অত্যাবশ্যক আইনের পাণ্ডুলিপি বলিয়া মনে করেন, লেজিস্লেটিব এসেম্ব্লী যদি তাহা উপস্থিত করিবার অনুমতি না দেন বা প্রণয়ন কার্য্যের কোন অবস্থায় নামঞ্জুর করেন, তাহা হইলে ঐরূপ সার্টিফিকেট পাইলে পাণ্ডুলিপিখানি ষ্টেট কাউন্সিলে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে, এবং তাহারা সম্মতি দিলে উহা আইন বলিয়া গণ্য হইবে। বজেট লেজিস্লেটিব এসেম্ব্লীতে উপস্থিত করা হইবে, এবং সেখানে আলোচিত হইবে; কিন্তু উহার বিষয়ে যে সকল মন্তব্য গৃহীত হইবে, সেগুলি পরামর্শের মত মনে করা হইবে না। ইহার উদ্দেশ্য এই যে দুই সভার সম্মতিই আইন প্রণয়নের সাধারণ নিয়ম হইবে; কিন্তু এ ব্যবস্থাও থাকিবে যে শান্তি, সুশৃঙ্খলা বা সুশাসনের জন্য যে সকল বিধান অত্যাবশ্যক, তাহাদের সম্বন্ধে ষ্টেট কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত পূর্ব্ববৎ হইবে। প্রদেশগুলির বেলায় যেরূপ হইয়াছে সেইরূপ শাসনবিভাগের সহযোগী হইয়া কার্য্য করিবার জন্য স্থায়ী কমিটি সকল নিযুক্ত হইবে এবং দশ বৎসর পরে যে পার্লেমেণ্টের কমিশন প্রদেশগুলিতে তখনকার প্রথার কার্য্য পরীক্ষা করিবে, সেই কমিশন দ্বারা এখনকার প্রথার কার্য্যেরও পরীক্ষা হইবে। ইহার উপর আরও প্রস্তাব আছে এই যে সকল শ্রেণীর প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিগণকে লইয়া ভারতের জন্য একটি প্রিভিকাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হউক। ইহার কার্য্য হইবে, গবর্ণর জেনারল ইহার মত লইতে চাহিলে তাঁহাকে পরামর্শ দেওয়া।

এই প্রণালীতে কার্য্য যাহাতে অবাধে চলিতে পারে তজ্জন্য ষ্টেট সেক্রেটারী ও ইণ্ডিয়া আফিস এখন ভারত গবর্ণমেণ্টের উপর যে আটাআঁটি করিয়া কর্তৃত্ব করেন, তাহা কমাইতে হইবে। কিন্তু পার্লামেণ্টের কর্ত্তৃত্ব বজায় থাকিবে বলিয়া ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারীর বেতন বিলাতের জমা খরচভুক্ত থাকা উচিত, এবং পার্লামেণ্টকে অনুরোধ করা হউক, যে ভারতীয় বিষয় সম্পর্কে পরামর্শ দিবার জন্য একটি স্থায়ী বাছাই করা কমিটি নিযুক্ত হউক। এবং এমন লোক সর্ব্বদাই পার্লামেণ্টে উপস্থিত থাকিবে, যাঁহারা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন।

এখানে যে সকল প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা কেবল ব্রিটিশ ভারত সম্বন্ধে বর্ত্তিবে। ভারতের বর্গপরিমাণের তিন ভাগের এক ভাগ, এবং লোক সংখ্যার পাঁচ ভাগের এক ভাগ দেশীয় রাজ্য সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত। ব্রিটিশ ভারতে যে সকল পরিবর্ত্তন হয় তাহাতে উহাদের উপর প্রভাব না হইয়া পারে না, আর এই দুই অংশের সাধারণ স্বার্থ ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। এ জন্য প্রস্তাব করা হইতেছে যে চিফ্‌স কনফারেন্স বা রাজন্যপরিষৎ একটা স্থায়ী প্রিন্স বা রাজন্যদের কাউন্সিলে পরিণত হউক। এই কাউন্সিল বৎসরে সাধারণতঃ একবার সম্মিলিত হইবে। কাউন্সিল একটি ক্ষুদ্র কমিটি নিযুক্ত করিবেন। কোন বিষয়ে কি দস্তুর এবং কোন প্রথা প্রচলিত আছে এই জাতীয় প্রশ্ন সকল এই কমিটির বিবেচ্য হইবে। বিভিন্ন রাজ্যের পরস্পরের মধ্যে অথবা বিভিন্ন রাজ্য ও গবর্ণমেণ্টের মধ্যে মতভেদের বিষয় সকল বিবেচনার্থ একটি কমিশনের সমীপে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। হাইকোর্টের জজ অপেক্ষা কম পদস্থ নহেন, এরূপ

একজন সরকারী কর্ম্মচারী এবং কোন পক্ষের পছন্দ মত একজন লোক এই দুজন সভ্য লইয়া এই কমিশন গঠিত হইবে, এবং ইহা রাজপ্রতিনিধিকে পরামর্শ দিবেন। রাজন্যগণ দুষ্কর্ম করিলে পাঁচজন সভ্যের একটি কমিশন সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন এবং রাজপ্রতিনিধিকে পরামর্শ প্রদান করিবেন। একজন হাইকোর্টের জজ ও দুজন সামন্তরাজ ইহার সভ্যের মধ্যে থাকিবেন। উল্লেখযোগ্য সকল রাজ্যগুলিরই যাহাতে একেবারে ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, এরূপ ব্যবস্থা হইবে, এবং সাধারণ স্বার্থের বিষয়ে ষ্টেট কাউন্সিল ও রাজন্যবর্গের কাউন্সিল যাহাতে একযোগে মীমাংসা করিতে পারে তাহার বিধান হইবে।

শাসনতন্ত্রের রকম যাহাই হউক, দেশ শাসনের আসল কার্য্য একদল শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী দ্বারাই চালাইতে হইবে। এজন্য রিপোর্টে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে জাতিগত বাধা সকল দূরীভূত হউক। রাজকার্য্যের সকল বিভাগের জন্য ভারতবর্ষে কর্ম্মচারী সংগ্রহের একটা শতকরা সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকুক, এবং এই সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকুক। সিবিল সার্ব্বিসের জন্য এই সংখ্যা শতকরা তেত্রিশ হউক এবং দশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিবর্ষে শতকরা দেড়, এই হারে বাড়িতে থাকুক; তারপর এ বিষয়ে পুনরায় বিচার করা হইবে। বেতন ও পেনশনের হার নূতন করিয়া ঠিক করা হউক, এবং সৈন্যবিভাগে ভারতবাসিগণকে যথেষ্ট সংখ্যায় কমিশন দেওয়া হউক।

রাজপ্রতিনিধি মহোদয় ও ষ্টেট সেক্রেটারী মহোদয় যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রস্তাব করা হইতেছে যে ভারতীয় শিক্ষা ক্রমশঃ বেশী করিয়া ভারতীয় কর্ত্তৃত্বের অধীনে আসুক, এবং স্থানীয় শাসনের প্রতিষ্ঠানগুলির উপর জনসাধারণকে কর্ত্তৃত্ব করিতে দিয়া তাহাদিগকে কার্য্যশিক্ষা দেওয়া হউক, এবং এইরূপে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের নিমিত্ত অবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়া অবিলম্বে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা করা তাহারা বাঞ্ছনীয় মনে করেন। এইরূপে রাজকার্য্যের বহু বিভাগে লোকমতের প্রভাব থাকিবে এবং অবশিষ্ট বিভাগে লোকমতের প্রভাব ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে। Central Government সম্বন্ধে তাঁহারা এরূপ শাসন-প্রণালীর প্রস্তাব করেন যে তাহা ক্রমশঃ বেশী করিয়া দেশবাসিগণের প্রতিনিধিতে পূর্ণ হইবে এবং তাহাদের নিকট দায়ী হইবে।

তাঁহারা আগ্রহে প্রস্তাব করিতেছেন যে শাসনকার্য্যে কর্ম্মচারী নিয়োগে জাতিগত সকল বাধা দূর হউক এবং ভারতবর্ষ হইতেই আরও বেশী সংখ্যায় লোক চাকুরীতে প্রবেশ করুক। তাঁহারা এরূপ শাসন প্রণালীর প্রস্তাব করেন যে শাসনতন্ত্র অবিলম্বেই উন্নতিলাভ করিয়া পূর্ণ দায়িত্বমূলক শাসনপ্রণালীতে পরিণত হইবে।

স্থূল মর্ম্ম।

ভারত-সচিব ও বড়লাটের সুপারিশ।

পার্লামেণ্ট ও ইণ্ডিয়া অফিস।

(১) পার্লামেণ্ট ও ভারত-সচিবের কর্ত্তৃত্বের সংস্কার করিতে হইবে।

(২) ভারত-সচিবের বেতন ইংলণ্ডের তহবিল হইতে দিতে হইবে।

(৩) ভারতের শাসন-পদ্ধতির উপর দৃষ্টি রাখিবার উদ্দেশ্য হাউস অফ কমন্সকে এক 'সিলেক্ট কমিটী' নিযুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিতে হইবে।

(৪) বিলাতে ভারত-সচিবের মন্ত্রণাসভা অর্থাৎ ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের গঠন-প্রণালী এবং ভারত-সচিবের অফিস বা দপ্তরখানা পরিদর্শন ও তৎসম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশের জন্য এক কমিটী নিযুক্ত করিতে হইবে।

ভারত গবর্ণমেণ্ট।

(৫) ভারত-গবর্ণমেণ্ট দেশে শান্তি, সুশৃঙ্খলা এবং সুশাসনের জন্য দায়ী। সে দায়িত্ব বজায় রাখিবার জন্য যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া তাঁহারা বিবেচনা করিবেন, তাহা করিবেন এবং তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের অপ্রতিহত প্রভুত্ব রাখিতে হইবে।

(৬) ভারতের জন্য একটি প্রিভি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

শাসন-পরিষদ।

(৭) বড়লাটের শাসন-পরিষদে ভারতীয় সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(৮) শাসন-পরিষদের সদস্য নিয়োগের জন্য যে বিধিবদ্ধ সংখ্যা ও যোগ্যতা নিরূপিত আছে তাহা উঠাইয়া দিতে হইবে।

(৯) গ্রেট ব্রিটেনে পার্লামেণ্টারী আণ্ডার সেক্রেটারীর সদৃশ বা সমতুল্য পদে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যবৃন্দের ভিতর হইতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকজনকে নিয়োগ করিবার ক্ষমতা ভারত-গবর্ণমেণ্টকে দিতে হইবে।

ব্যবস্থাপক সভা।

(১০) বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভা বর্ত্তমানে যাহা আছে, তাহা দুইভাগে বিভক্ত করিতে হইবে—(ক) খাস মজলিস (Council of State) এবং সাধারণ মজলিস (Legislative Assembly.)

(১১) খাস মজলিস—বড়লাট ব্যতীত ইহার সদস্য-সংখ্যা হইবে ৫০। (বড়লাট হইবেন প্রেসিডেণ্ট, তাঁহার একজন ভাইসচ্যান্সেলার নিয়োগের ক্ষমতা থাকিবে।) এই সদস্যগণের মধ্যে ২১ জন হইবেন নির্ব্বাচিত এবং ২৯ জন বড়লাট কর্ত্তৃক মনোনীত। মনোনীত সদস্যদিগের মধ্যে ৪ জন বে-সরকারী এবং ২৫ জনের অনধিক (শাসন-পরিষদের সদস্যদিগকে ধরিয়া) হইবেন সরকারী।

প্রত্যেক খাস মজলিস পাঁচ বৎসর স্থায়ী হইবে।

সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেল খাস মজলিসের সদস্যগণের যোগ্যতা সম্বন্ধীয় বিধান গঠন করিবেন।

(১২) সাধারণ মজলিসের সদস্যসংখ্যা হইবে ১০০। ইহার দুই তৃতীয়াংশ নির্ব্বাচিত এবং এক তৃতীয়াংশ মনোনীত সদস্য হইবেন। মনোনীত সদস্যগণের অনূ্যন তিন ভাগের এক ভাগ বে-সরকারী ভদ্রলোক হইবেন।

গবর্ণর জেনারেল সাধারণ মজলিসে প্রেসিডেণ্ট মনোনীত করিবেন।

(১৩) খাস মজলিসের সরকারী সদস্যগণ সাধারণ মজলিসের মনোনীত সদস্য হইতে পারিবেন।

(১৪) গবর্ণর জেনারেলের হাতে খাস ও সাধারণ উভয় মজলিসই ভাঙ্গিয়া দিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(১৫) ব্যবস্থাপক সভায় নিম্নলিখিত কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বিত হইবে:—

ক। গবর্ণমেণ্টের আইনের খসড়া সাধারণভাবে সাধারণ মজলিসে পেশ করিতে হইবে। তাহার পর সাধারণ মজলিসে ইহা পাশ বা অনুমোদিত হইলে খাস মজলিসে প্রেরিত হইবে। যদি খাস মজলিস এমনভাবে খসড়াটীর সংস্কার করেন, যাহাতে উহা সাধারণ মজলিসের মনোনীত না হয় তাহা হইলে উক্ত আইনের খসড়াটি খাস ও সাধারণ মজলিসের সমবেত অধিবেশনে উপস্থাপিত করিতে হইবে। স-কৌন্সিল গবর্ণর জেনারেল যদি খাস মজলিসে এই সংস্কার-প্রস্তাব সুশাসন ও শান্তিরক্ষার সহায়ক বলিয়া (গবর্ণমেণ্টের মিতব্যয়িতারও সহায়ক বলিয়া) গ্রাহ্য করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে সাধারণ মজলিসের সেই সংস্কারের পুনঃসংস্কার বা উহা রদ-বাতিল করিবার ক্ষমতা থাকিতে পারিবে না। কিন্তু যদি আইনের খসড়াটী পেশ করিবার সময়ে সাধারণ মজলিস কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে স-কৌন্সিল গবর্ণর জেনারেল পূর্ব্বোক্ত কারণ দেখাইয়া ইহা খাস মজলিসে পাঠাইয়া দিবেন। বিশেষ প্রয়োজন বুঝিলে এবং পূর্ব্বোক্ত কারণ ঘটিলে গবর্ণমেণ্ট কেবলমাত্র সাধারণ মজলিসে খসড়ার সংবাদমাত্র দিয়া একেবারে খাস মজলিসে পেশ করিতে পারিবেন।

সদস্যগণের প্রস্তাবিত আইনের খসড়া যে মজলিসের যিনি সদস্য সেই মজলিসে তাঁহাকে করিতে হইবে। এই মজলিসে পেশ হইলে অপর মজলিসে উপস্থিত করিতে হইবে। মতভেদ ঘটিলে মজলিসের সমবেত অধিবেশনে আবার উহা পেশ করিতে হইবে। যদি সাধারণ মজলিস হইতে উক্ত খসড়া পাশ হয় এবং সেই খসড়াকে ভারত গবর্ণমেণ্ট সুশাসনের অন্তরায় মনে করেন, তাহা হইলে উহা সুশাসনের সহায়ক রূপে পরিণত করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের থাকিবে এবং তদনুসারে খাস মজলিসে পেশ করিয়া উক্ত খসড়া আইনে পরিণত হইতে পারিবে।

(১৬) কোনও সঙ্কল্প (Resolution) সভায় ধার্য্য হইলে তাহা সঙ্কল্প রূপে গ্রাহ্য না হইয়া পরামর্শ হিসাবে গ্রাহ্য হইবে।

(১৭) গবর্ণর জেনারেল এবং সম্রাটের, সম্মতিদানের সঙ্কোচসাধনের এবং পরিহার বা অগ্রাহ্য করণের যে যে নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতা আছে তাহা বজায় থাকিবে।

(১৮) গবর্ণর জেনারেলের হাতে এখন যেমন অর্ডিনান্স বা খাস হুকুম জারি করিবার ক্ষমতা আছে তাহা থাকিবে

এবং স-কৌন্সিল গবর্ণর জেনারেলের রেগুলেসন আইন জারির ক্ষমতা পূর্ব্ববৎ বজায় থাকিবে।

(১৯) গবর্ণমেন্টের বিশেষ কোনও আদেশ ব্যতীত অপর সকল স্থানে খাস বা সাধারণ মজলিসের মনোনীত সরকারী সদস্যগণেও বক্তৃতা করিবার ও ভোট দিবার স্বাধীনতা থাকিবে।

(২০) খাস বা সাধারণ মজলিসের প্রত্যেক সদস্যেরই আনুসঙ্গিক প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা থাকিবে। কোনও প্রশ্নের উত্তর সাধারণের স্বার্থের অনুযায়ী হইবে না এরূপ বিবেচনায় গবর্ণর জেনারেল সেই প্রশ্নের উত্থাপন মজলিসে বন্ধ করিতে পারিবেন না; তবে যদি তিনি মনে করেন যে, যে ভাবে প্রশ্নটী উত্থাপিত হইতেছে তাহাতে সাধারণের স্বার্থক্ষুণ্ণ হইতে পারে, তাহা হইলে তেমন স্থলে প্রশ্ন উত্থাপন বন্ধ করিবার ক্ষমতা তাঁহার থাকিবে।

(২১) খাস ও সাধারণ মজলিসের কার্য্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রথম বিধিনিষেধ স-কৌন্সিল গবর্ণর-জেনারেল কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইবে। গবর্ণরজেনারেলের অনুমতিক্রমে দুই মজলিসই তাহাদের বিধি-বিধানের সংস্কার সাধন করিতে পারিবেন। এক্ষেত্রে অর্থাৎ এইরূপ সংস্কারের জন্য ভারত সচিবের অনুমোদন আবশ্যক হইবে না এবং পার্লামেন্টেও ইহা পেশ করিতে হইবে না।

সাধারণ ও খাস মজলিসের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি থাকিবে এবং সেগুলি গবর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগের সহিত সংসৃষ্ট থাকিবে। কোন্ বিভাগের সহিত কোন্ ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি সংলগ্ন হইবে তাহার নির্দ্দেশ বড়লাটই করিবেন এবং সেই বিভাগের কর্ত্তা কোন্ কোন্ বিষয় ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির গোচর করা আবশ্যক তাহার নির্দ্ধারণ করিবেন। প্রত্যেক ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির দুই তৃতীয়াংশ সদস্য খাস ও সাধারণ মজলিসের সদস্যগণ ভোট দ্বারা নির্ব্বাচন করিবেন। বাকী এক তৃতীয়াংশ স-কৌন্সিল গবর্ণর জেনারেলকর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন।

প্রাদেশিক গবরমেণ্ট

প্রাদেশিক গবরমেণ্টগুলির শাসনাদিব্যাপারে ভারত-গবরমেণ্টের নিকট যে দায়িত্ব আছে, তাহা বজায় রাখা চাই এবং সেই গণ্ডীর মধ্যে প্রাদেশিক গবরমেণ্টগুলিকে ব্যবস্থাপক, শাসনবিষয়ক এবং আয়ব্যয় ঘটিত ব্যাপারে যতদূর বিস্তৃত ভাবে স্বাধীনতা দিতে পারা যায় তাহা দিতে হইবে।

প্রাদেশিক দায়িত্বপূর্ণ গবর্ণমেণ্ট—প্রথমে কোন কোনও ব্যাপারে দায়িত্ব অর্পণ করিয়া লাভ করিতে হইবে। যে ব্যাপারে দায়িত্ব অর্পিত হইবে, সেই সেই ব্যাপারে কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পাদিত করিতে পারিলেই পরিণামে পূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হইবে।

প্রাদেশিক শাসন-পরিষৎ।

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের শাসন-পরিষদের গঠন-প্রণালী ইহার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে:—(১) গবর্ণর ও তাঁহার শাসন-সভা (২) ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণের মধ্য হইতে গবর্ণর কর্ত্তৃক মনোনীত এক বা একাধিক মন্ত্রী এবং (৩) এক বা একাধিক অতিরিক্ত সদস্য ইহার বা ইহাদের কোনও নির্দ্দিষ্ট বিভাগ বা দপ্তরখানা থাকিবে না।

গবর্ণরের শাসন-সভা বা পরিষদের সদস্য থাকিবেন—দুইজন, ইহাদের মধ্যে একজন হইবেন ভারতবাসী।

যে যে ব্যাপারের দায়িত্ব দেওয়া হইবে না, সেইগুলি গবর্ণর ও তাঁহার শাসন-সভার হাতে থাকিবে।

মন্ত্রী বা মন্ত্রিগণের নিয়োগকাল বা পরমায়ু ব্যবস্থাপক সভার দায়িত্ব বা পরমায়ুর সমতুল্য হইবে। দায়িত্ব অর্প করা ব্যাপারগুলি ইহাদের হাতে থাকিবে। অতিরি সদস্যগণকে প্রধান সরকারী কর্ম্মচারীদিগের মধ্য হই গবর্ণরই নিযুক্ত করিবেন। ইহারা কেবল পরাম দিবেন মাত্র।

গ্রেট ব্রিটেনে পার্লামেন্টের অণ্ডার সেক্রেটারীদিগে সমতুল্য পদের অনুরূপ ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণের ভিত হইতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যগণের নিয়োগ করিবা ক্ষমতা থাকিবে।

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা।

প্রত্যেক প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভার সম্প্রসারণ হইবে ইহাতে নির্ব্বাচিত সদস্যেরই সংখ্যা বেশী থাকিবে। ব্যবস্থাপক সভা নিম্নরূপে গঠিত হইবে।—(১) নির্ব্বাচনে ব্যাপক নীতি অনুযায়ী সদস্য নির্ব্বাচিত হইবে। (২) মনো নীত সদস্যগণের মধ্যে (ক) সরকারী ও (খ) বেসরকা সদস্য থাকিবেন। (৩) সরকারী সদস্যগণের মধ্য কতকগুলি সদস্য 'এক্স অফিসিও' হইবেন। ভোট নির্ব্বাচনের এবং ব্যবস্থাপক সভার গঠনপদ্ধতি স-কৌন্সি গবর্ণর জেনারেল কর্ত্তৃক নিরূপিত হইবে এবং ভারতসা

ইহার অনুমোদন করিবেন, ও ইহা পার্লামেন্টেও পেশ করিতে হইবে।

গবর্ণর ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেন্ট হইবেন এবং তাঁহার ভাইস- প্রেসিডেন্টনিযুক্ত করিবার ক্ষমতা থাকিবে.

গবর্ণমেন্টের অন্যথা আদেশ ব্যতীত সাধারণতঃ বে-সরকারী সদস্যগণের বক্তৃতায় অবাধ অধিকার ও ভোট দিবার অধিকার থাকিবে।

ব্যবস্থাপক সভার প্রত্যেক সদস্যেরই আনুষঙ্গিক প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

বর্ত্তমানে যে ভাবে কার্য্যপ্রণালী চলিতেছে, তাহাই চলিবে; কিন্তু ব্যব্যস্থাপক সভা গবর্ণরের অনুমতি লইয়া তাহার সংস্কার করিতে পারিবেন। ব্যবস্থাপক সভায় ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটী সমূহ গঠিত হইবে এবং উহার এক একটী কমিটী গবর্ণমেণ্টের এক একটী বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবে। এই কমিটীর সদস্যগণ—ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সদস্যগণ এবং বিভাগের কর্ত্তা দ্বারা গঠিত হইবে। ইহাদের অধ্যক্ষ বা প্রেসিডেন্ট হইবেন সদস্য বা মন্ত্রী।

ব্যবস্থাপক সভাতেই সকল ব্যাপারের ব্যবস্থা হইবে।

যে সকল ব্যাপারে দায়িত্ব অর্পিত হইবে না, তদ্ব্যতীত অন্যান্য ব্যাপার-সংক্রান্ত আইনের খসড়া দেশের শান্তি ও সুশৃঙ্খলার সহায়ক হওয়া চাই এবং তেমন খসড়াই গবর্ণর ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিতে দিবেন। গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত এমন খসড়াই গেজেটে প্রকাশিত হইবে। ইহা ব্যবস্থাপক সভায় পেশ ও পঠিত হইবে। অতঃপর আলোচনান্তে ইহা গ্রাণ্ড কমিটির নিকট প্রেরিত হইবে। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভা প্রয়োজন বোধ করিলে এই খসড়া ভারত গবরমেণ্টের নিকটে পাঠাইয়া দিতে গবর্ণরকে বলিতে পারিবেন। এ সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টের মীমাংসাই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

গ্রাণ্ড কমিটীর গঠন।

গ্রাণ্ড কমিটী ব্যবস্থাপক সভার শতকরা ৫০ বা ৪০ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। (আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব হিসাবে সদস্যের সংখ্যার ন্যূনাধিক্য ঘটিবে।) সদস্যগণের নির্ব্বাচন আংশিক ভোট দ্বারা এবং আংশিক মনোনয়ন দ্বারা হইবে। অনধিক দুই তৃতীয়াংশ সদস্য সরকারী কর্ম্মচারী হইবে।

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত আইনের খসড়া আইনে পরিণত করিতে হইলে গবর্ণর ও গবর্ণর জেনারেলের অনুমোদন আবশ্যক এবং সম্রাট ইহা নাকচ করিতে পারিবেন।

গবর্ণর কোনও খসড়া বাতিল করিবার পূর্ব্বে তাহা পুনঃসংস্কারের জন্য পাঠাইতে পারিবেন।

গবর্ণর-জেনারেল প্রাদেশিক আইন কানুনের সংস্কোচ সাধন করিতে পারিবেন।

আয়-ব্যয়।

ভারতীয় ও প্রাদেশিক রাজস্বের হিসাবপত্র স্বতন্ত্র হইবে।

প্রাদেশিক রাজস্বের আয় হইতে প্রথমেই ভারত-গবরমেণ্টকে কর দিতে হইবে।

প্রাদেশিক গবরমেণ্ট কতক কতক ব্যাপারে কর নির্দ্ধারণ ও ঋণ করিতে পারিবেন।

বজেট বা আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রথমে ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিতে হইবে।

স্বায়ত্ত-শাসন।

জেলাবোর্ড মিউনিসিপালিটি লোকাল বোর্ড প্রভৃতি যাহাতে সম্পূর্ণরূপে জনসাধারণের কর্ত্তৃত্বাধীন হয়, তৎ পক্ষে যতদূর সম্ভব ব্যবস্থা করা হইবে।

পরিণয়।

বসুধার চিত্তখানি উজ্জ্বল করিয়া
জ্বলিতেছে নিশিদিন প্রেমের বর্ত্তিকা;

চকোরী ঘুরিছে তাই চন্দ্রের লাগিয়া,
তরুরে জড়ায়ে রহে সুন্দর লতিকা।

মালতী মল্লিকা বেলী চারুফুলহারে
বরিছে কুসুম-কুঞ্জে আকুল উচ্ছ্বাসে,
তটিনী হিল্লোল তুলি অনুরাগ ভরে
সৈকতে বাঁধিছে তার স্নিগ্ধ বাহুপাশে।
তেমনি মানব-হৃদি শান্তির লাগিয়া,—
গুথিতে মিলন মধু অমরার ডালি ;
প্রেম-যজ্ঞ-মন্ত্র-ধারে অন্তর ভরিয়া,—
সে মহাযজ্ঞের মাঝে দেয় প্রাণ ঢালি।
জীবনে বসন্ত যোগ শুভ-পরিণয়,
পাণিদান ছলে যাহে প্রাণ বিনিময়।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

আলমগীরের পত্র।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

(৩০)

প্রিয়পুত্র মহম্মদ আজাম্, চরমুখে তুমি অবশ্যই শুনিয়া থাকিবে যে, ঘাট নামক গিরি প্রদেশ আক্রমণ করিতে গিয়া কি বিপদেই পড়িতে হইয়াছিল। মুসলমান সেনাগণের দুর্দ্দশা ও কষ্টের অবধি ছিল না। ভগবানকে ধন্যবাদ যে, এক্ষণে এই দুরূহ কার্য্য শেষ হইয়াছে এবং কষ্টের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আমরা অবশেষে বিজয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি। সংসারে দুঃখ কষ্ট মানবের পাপকর্ম্মের প্রতিফল স্বরূপ হইলেও রাজা বা শাসনকর্ত্তার কার্য্যকলাপের উপর প্রজাগণের সুখ দুঃখ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। পুত্র, এই নিরীহ বৃদ্ধকে অকর্ম্মণ্য শাসনকর্ত্তাগণের কুশাসনের ফল এক্ষণে ভোগ করিতে হইতেছে। পুত্র, কঙ্কন প্রদেশের মাতারা দুর্গের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া উহার নাম আমি আজামতারা রাখিলাম। এই দুর্গ আমি তোমাকেই প্রদান করিলাম। তুমি হুকুম দাও যে বিজয়-বার্ত্তা তোমারই নামে ঘোষিত হউক। ছেলেবেলার কথা তোমার মনে পড়ে কি? নাগারার আওয়াজ শুনিলেই তুমি উৎফুল্ল হইয়া বলিতে "বাবাজী, ধুন্—ধুন্"। দাক্ষিণাত্যের বারনালা দুর্গের নাম নওলতারা রাখিয়াছি। তোমার ক্রীতদাসীগণের নিকট এই অভিযানের কথা শ্রবণ করিও।

(৩১)

ভাগ্যবান্ পুত্র, তোমার দুধ-ভাই মীরবহ্রর দুর্ব্বিনীত আচরণের কথা তোমার পত্র হইতে সবিশেষ জানিতে পারিলাম। পুত্র, একটি সাধুবাক্য তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিই—"ভগবানের দান তোমার প্রতি অহরহঃ মিষ্টভাবে বর্ষিত হইতেছে। তুমি যদি তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া কাজ না কর, অর্থাৎ অনর্থক অশান্তির সৃষ্টি কর, তাহা হইলে দণ্ড পাইবে।" মীরবহ্রকে দমন করা আবশ্যক মনে করিয়াছিলে তাই তাহাকে শাসন করিয়াছ ; কারণ সে তাহার বৃদ্ধা মাতা তোমার দুধ-মা—জাহেদবানুর যৎসামান্য অধিকার লইয়া অযথা আধিপত্য দেখাইতে চায়। সাদীর এই উপদেশ বাক্যগুলি অবশ্যই তাহার জানা নাই—"যে রাজার অধীনে তুমি কর্ম্ম কর, তাঁহাকে উপকৃত করিয়াছ বলিয়া কখনও মনে করিও না ; কারণ, স্মরণ রাখিও যে, তুমি স্বয়ং তাহার নিকট উপকৃত, যেহেতু তিনি তোমাকে কর্ম্ম দিয়াছেন। যাহাহউক পুত্র, জগদীশ্বর তোমাকে জ্ঞান-বুদ্ধি এবং সদ্‌গুণাবলী প্রদান করিয়াছেন। আমার উপদেশ মত কাজ করিলে ভাল হয়। তাহাকে তুমি এবারের মত ক্ষমা কর যেহেতু, পাপীগণ ক্ষমার যোগ্য।

(৩২)

প্রিয়পুত্র আজাম্, একদিন সাজান্ সা (সাজাহান) দারাস্তকোকে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন "পুত্র, রাজভৃত্যগণকে সন্দেহের চক্ষে দেখিও না, কদাচ তাহাদের সহিত অসদ্ব্যবহার করিও না। তোমার যতটুকু ক্ষমতা তাহাদের উপকার কর। তাহাদের বিরুদ্ধে স্বার্থপর লোকগণের মিথ্যা অভিযোগে কর্ণপাত করিও না। আমার এই উপদেশ একদিন তোমার পক্ষে অত্যন্ত হিতকর হইবে জানিও।" পুত্র, তোমার কিসে মঙ্গল হইবে, আমি

সতত সেই ভাবনায় ব্যাকুল। সেই জন্য তোমাকে ইহা লিখিলাম—যদিও সকল কথা লেখা উচিত নয়। যোগ্য-ব্যক্তির সহিত কপটাচরণ করা, আর কাজ পণ্ড করা একই কথা।

(৩৩)

সুধী পুত্র আজাম্, তোমার মুন্সী কাময়াব খাঁ আমাকে পত্র লিখিয়াছে। তোমার একজন কর্ম্মচারী গর্হিত আচরণ করায় তুমি তাহাকে দণ্ড দিয়াছ, সেকথা সে জানাইয়াছে। পুত্র, মন্দ অভিপ্রায়ে তরবারি বাহির করিলে সে তরবারি নিজের ঘাড়েই পড়িয়া থাকে। শান্তিরক্ষার জন্য তুমি যাহা করিয়া ফেলিয়াছ, তাহাতে আর হাত নাই। কিন্তু লোকটার প্রতি এত তাড়াতাড়ি দণ্ডের ব্যবস্থা না করিলেই বোধ হয় ভাল করিতে। অপরাধীকে দণ্ড দেওয়া খুবই উচিত, খুবই সঙ্গত। কিন্তু, যে জন্যই হউক, কাহারও প্রাণে বেদনা দিলে ভগবানের অপ্রিয় কার্য্য করা হয়। এই কারণেই এই সাধু বাক্যটি প্রচলিত আছে, "অপরাধীকে ক্ষমা করায় আনন্দ আছে, কিন্তু শাস্তি দেওয়ায় আনন্দ নাই।"

(৩৪)

সৌভাগ্যবান্ পুত্র, একদিন শত্রু ভ্রাতা দারাসুকোর খাস মুন্সী পাহাড় আমল সাহান্সার (সাজাহানের) নিকট এক হিসাবের ফর্দ্দ দাখিল করিয়া বলিল, "এই ফর্দ্দ অনুযায়ী দশ লাখ টাকা আমাদের (দারাসুকো এবং পাহাড় আমল) পাওনা হইতেছে। অতএব, রাজকোষ হইতে এই টাকা আমাদিগকে প্রদান করিবার হুকুম হউক।" সাহান্সা তখন ফর্দ্দখানি উজির সায়েদ আল্লা খাঁর হাতে দিয়া বলিলেন "খরচগুলি তুমি একবার ভাল করিয়া পরীক্ষা কর, এবং এ সম্বন্ধে কি করা উচিত বল।" খাঁ তৎক্ষণাৎ উত্তর করি-লেন, "হুজুর, এতটাকা এখন সরকারী তহবিল হইতে দেওয়া যাইতে পারে না।" দরবার শেষ হইলে পর উদ্ধত অসহিষ্ণু দারা সায়েদ আল্লা খাঁকে বিস্তর তিরস্কার বাক্য শুনাইয়া দিল। এই সংবাদ তৎক্ষণাৎ সাহান্সার কর্ণগোচর হইল, তিনি দারাকে এই কথাগুলি লিখিয়া পাঠাইলেন। ধার্ম্মিক এবং সৎলোকের সহিত শত্রুতাচরণ যে করে, সে নিজের অমঙ্গল নিজেই ডাকিয়া আনে। কোন্ কাজটি ন্যায়, আর কোন্‌টি অন্যায়, তাহা যথাযথ বিচার করিতে পারা রাজ-পুত্রের একটি বিশেষ গুণ। পাহাড় আমল তোমার মুন্সী, সে তোমারই লাভের দিকটি দেখিবে। কিন্তু সায়েদ আল্লা খাঁ আমার কর্ম্মচারী। তাহার কর্ত্তব্য আমার সম্পত্তি রক্ষা করা। তোমার বাকী ফর্দ্দ তোমার মূলহিসাবের সহিত মিলাইয়া লওয়া হইলেও, তোমার নিজের উচিত ছিল, সায়েদ আল্লা খাঁকে জিজ্ঞাসা করা, সে এখন এত টাকা দিতে পারিবে কি না। তাহা না করিয়া অকারণে একজন রাজকর্ম্মচারীকে বিশেষতঃ, সায়েদ আল্লা খাঁর মত লোককে মন্দবাক্য বলা তোমার পক্ষে বড়ই গর্হিত কার্য্য হইয়াছে। ইহাদের মত লোককে আয়ত্তির মধ্যে রাখা খুবই ভাল। বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান কর্ম্মচারী ধনাগমের এক প্রকৃষ্ট উপায় জানিও। সাধু-ভৃত্যের গুণেই মনিবের সুনাম বর্দ্ধিত হয়।" সেই দিন সন্ধ্যাকালে সায়েদ আল্লা খাঁকে ডাকিয়া সাহান্সা এক বহুমূল্য পরিচ্ছদ এবং ৩ ০০ হাজার দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) বক্‌শিস্ দিলেন।

(৩৫)

প্রিয়পুত্র আজাম, গুজরাট প্রদেশ, কাবুল, দাক্ষিণাত্য অথবা বাঙ্গালা দেশের মত সাম্রাজ্যের একপ্রান্তে অবস্থিত নয়। সুতরাং, এই প্রদেশের জন্য কর্ম্মচারীর নির্ব্বাচন একমাত্র বাদশাহ ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সেই হেতু তোমাকে জানাইতেছি যে, যে পর্য্যন্ত সে প্রদেশের শাসনপ্রণালী সুনিয়ন্ত্রিত না হয়, সে পর্য্যন্ত তুমি আমারই ব্যবস্থা মত কার্য্য করিবে। দোহদ জেলার প্রধান কোতোয়াল অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং রুগ্ন। শারীরিক অক্ষমতাপ্রযুক্ত সে তোমার নিকট হাজির হইতে পারে নাই। তজ্জন্য যেন সে পদচ্যুত না হয়। এখন যে যাহা করিতেছে, তাহাই যেন সে করিতে পায়।

(৩৬)

ভাগ্যবান পুত্র, আমীর ওমরাহগণ যে সমুদয় উপঢৌকন তোমার নিকট আনিয়াছিল, সে সকল তুমি গ্রহণ না করাতে রাজকোষের প্রভূত ক্ষতি করা হইয়াছে। তোমার উদ্দেশ্য বুঝিয়া এবার তোমাকে ক্ষমা করিলাম, কিন্তু ভবিষ্যতে এরূপ যেন আর না হয়।

(৩৭)

প্রিয়পুত্র আজাম, তোমার কথামত আমি মুসবিখাঁকে প্রধান খাদাঞ্চিরূপে বাহাল করিলাম। ভৃত্য কর্ত্তব্যপরায়ণ হইলেই যথেষ্ট। এই লোকের বাহ্যিক অবয়ব মন্দ নয়

অদ্বের ইহার স্বভাব সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। মানুষের প্রকৃতি বুঝিতে কিছু সময় লাগে। কোনও উচ্চপদে কোনও লোককে বাহাল করিতে হইলে, তাহার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে গোপনে অনুসন্ধান করাই প্রশস্ত। কারণ এমনও দেখা গিয়াছে যে প্রথম-প্রথম কোন-কোন লোক ভাল কাজ করে, পরে কিন্তু বিগড়াইয়া যায়। শারীরিক ব্যাধি চিকিৎসকেরা আরোগ্য করিতে পারে, কিন্তু মানসিক ব্যাধি একমাত্র খোদাই কেবল আরোগ্য করিতে সমর্থ।

(৩৮)

সুখী পুত্র আজাম্, আমার আদেশ মত কার্য্য নিষ্পন্ন করিবার উপযোগী বিচার-বুদ্ধি তোমার অবশ্যই আছে। গুজরাট প্রদেশ ভারতবর্ষের রত্নভাণ্ডার স্বরূপ। এই স্থানের অধিবাসীগণ অত্যন্ত কর্ম্মকুশল এবং সর্ব্ববিধ শিল্পকর্ম্মে সুনিপুণ। রাজকীয় শিল্পাগার হইতে যে জিনিষটি তুমি নমুনাস্বরূপ পাঠাইয়াছ, তাহা মূল্যবান্ বটে কিন্তু তেমন সুগঠিত নয়। কেন এরূপ হইল, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিবে।

(৩৯)

প্রিয়পুত্র আজাম্, কোন একজন আত্মীয়ের মুখে এই কথাগুলি আমি শুনিয়াছিলাম। তোমাকে তাহা লিখিয়া পাঠাইলাম; কারণ, তোমারও তাহা জানিয়া রাখা উচিত। একদিন খাসদরবারে সাহান্সা (সাজাহান) আলিমর্দ্দান খাঁ এবং সায়েদ আল্লাখাঁকে তাহাদের উৎকৃষ্ট কার্য্যের জন্য বিশেষরূপ সম্মানিত করিলেন, তৎপরে তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন, "রাজ্যের সুপরিচালন এবং সুবন্দোবস্ত কেবলমাত্র বিচার-বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। খোদা না করুন, যদি কোনও অযোগ্য লোক কখনও বাদশাহী পদ পায় এবং তাহার উজির প্রভৃতিও যদি অবিবেচক হয়, তাহা হইলে দেশময় অশান্তি ও বিশৃঙ্খলতা ছাইয়া যাইবে। ইহার ফলে প্রজাগণ নিঃস্ব ও দরিদ্র হইয়া পড়িবে, সুতরাং রাজস্বের পরিমাণ কমিয়া গিয়া অচিরে সমুদয় রাজ্য ধ্বংসের মুখে গিয়া পড়িবে। সেই কারণ বলিতেছি, তোমরা সর্ব্বদা সাধু এবং ধার্ম্মিক লোকের সহবাস কর। তোমাদের যথারীতি প্রাত্যহিক উপাসনা শেষ হইলে পর, আমার জন্যও কিছুকাল উপাসনা করিবে, যাহাতে এই রাজ্যটি নষ্ট না হয় এবং প্রজাগণ পাপকার্য্য না করে- পাপ কথা না বলে। আমার বিশ্বাস, তাহা হইলে, আমার মৃত্যুর পর যে ব্যক্তি সিংহাসনে বসিবে, সে ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিবে। একটি কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র দারা বিলক্ষণ আড়ম্বর-শালী, আত্মমর্য্যাদা-পরায়ণ এবং উন্নত-মনা হইলেও তাহার এক মহৎ দোষ আছে। সে সজ্জনের শত্রু এবং অসতের বন্ধু। দ্বিতীয় পুত্র সুজার উদার স্বভাব ছাড়া অপর কোন বিশেষ গুণ দেখিতেছি না। মোরাদবক্সের ত রাজোচিত সকল গুণেরই অভাব। সে পানভোজন লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত। রাতদিন সরাবে ডুবিয়া আছে। কিন্তু অমুককে (অর্থাৎ আওরংজেবকে) বেশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং দূরদর্শী বলিয়া আমার মনে হয়। খুব সম্ভবতঃ আমার পর সেই-ই সিংহাসন লাভ করিবে।" সাহান্সার এই কথায় সায়েদ আল্লাখাঁ বলিলেন "দূরদর্শী লোকমাত্রই সৌভাগ্যশালী হয়।" সাহান্সা বলিলেন "কি জানি, খোদা কাহাকে মনোনীত করিবেন—কাহার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ-দৃষ্টি হইবে।"

(৪০)

ভাগ্যবান্ পুত্র, অতি উত্তম কথা, যে তুমি দরবেশ মীর আরবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছ। পুত্র, আর একবার তুমি তাঁহার নিকট যাও এবং আমার হইয়া তাঁহার সমীপে প্রার্থনা জানাও। যেহেতু, আমি বড়ই লজ্জিত যে, আমার মন এখনও ইহ জগতের ভোগ-বিলাসেই মত্ত রহিয়াছে—পরকালের ভাবনা একবারও ভাবিতেছে না। ইস্লামধর্ম্ম নিরাপদ হউক, আমরা অধিকতর সুখ-সমৃদ্ধিশালী হই, খোদার নিকট যেন তিনি তজ্জন্য প্রার্থনা করেন। তাঁহাকে বলিও পুত্র, আমার সারাজীবন হেলায় অতিবাহিত হইয়াছে। বাকী যে কয়টা দিন বাঁচিব, এইরূপ অবহেলাতেই কাটিয়া যাইবে। আমি মৃত্যুর যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছি, মুক্তির পথ হইতে ততই যেন দূরে সরিয়া পড়িতেছি। হায়! আমি চক্ষুষ্মান্ হইয়া যাহা করিয়াছি, একজন অন্ধও তাহা করিতে পারে না। আমি ভগবানকে হারাইয়াছি—একবারও তাঁহাকে ভাল করিয়া স্মরণ করিলাম না।

(৪১)

(*এই পত্রখানি আওরংজেবের মরণাপন্ন অবস্থায় লিখিত হইয়াছিল)

পুত্র, আশীর্ব্বাদ করি তুমি শান্তিলাভ কর—তোমার পরিজনবর্গও শান্তিলাভ করুক। বার্দ্ধক্যের একেবারে শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছি—দুর্ব্বলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একেবারে শিথিল, শক্তিহীন। একা আসিয়াছিলাম, একাই চলিয়া যাইতেছি। আমি বুঝিতে পারিলাম না, কে আমি, কেন আসিয়াছিলাম, কি কাজ করিলাম! জীবন বৃথায় অতিবাহিত হইয়াছে—ভগবানের আরাধনা করা হয় নাই। একটি বিপুল সাম্রাজ্যের ভার আমার স্কন্ধে পড়িয়াছিল, কিন্তু দক্ষতার সহিত উহা পরিচালনা করিতে পারিয়াছি কি? আকাঙ্ক্ষিত—অমূল্যজীবন হেলায় নষ্ট করিয়াছি। জগদীশ্বর এই পৃথিবীতেই বিরাজমান, কিন্তু তাঁহার দর্শনলাভের সৌভাগ্য আমার হইল না। জীবন অনিত্য—অতীতের কোন চিহ্নই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না—ভবিষ্যৎ-জীবন সম্বন্ধেও কোন আশা নাই। আমার শরীর এখন জ্বর-ব্যাধি-শূন্য—যেন শরীরের দুরবস্থা দেখিয়া তাহারা লজ্জা পাইয়াই পলায়ন করিয়াছে। চর্ম্মসার এই দেহে আর এতটুকুও বল নাই। পুত্র কামবক্স বিজাপুরে গিয়াছে বটে, কিন্তু সে স্থান ত বেশী দূর নয়। তুমি আরও নিকটে (মালব-দেশে) রহিয়াছ। প্রিয়পুত্র সাহ্ আলম কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা দূরে (কাবুলে) পড়িয়াছে। পৌত্র মহম্মদ আজিম ও সেইখানে। ভগবানের যা অভিরুচি। আমার সৈন্যদল অসহায়, হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা আমারই মত অস্থির এবং বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। হায়, তাহারা বুঝিতেছে না যে, উপরে ভগবান্ আছেন—যিনি তাহাদের প্রভুরও প্রভু। সংসারে যখন আসিয়াছিলাম, কিছুই সঙ্গে আনি নাই, কিন্তু এখন ফিরিয়া যাইতেছি পাপের বোঝা লইয়া। জানিনা আমাকে কি শাস্তিই ভোগ করিতে হইবে। জগদীশ্বর পরম কৃপাময়, সে বিশ্বাস আমার আছে, তথাপি ভয় দূর হইতেছে না, কারণ আমি যে মহা-পাপী। যাহা হইবার তাহা ত হইয়া গিয়াছে। এখন আমি কাল-সমুদ্রে জীবন-তরী ভাসাইয়া দিয়াছি। জগদীশ্বর প্রজাগণের রক্ষাকর্ত্তা হইলেও আমার উপযুক্ত পুত্রগণের কর্ত্তব্য, প্রতিকূল ঘটনাবলীর উপর সতর্ক-দৃষ্টি রাখা—যাহাতে প্রজাগণের বিশেষতঃ মুসলমানগণের অকারণে জীবন নষ্ট না হয়। আমার প্রিয় পৌত্র বাহাদুরকে আমার শুভেচ্ছা এবং শেষ আশীর্ব্বাদ জানাইও। আর একটি কথা তোমাকে বলি। কন্যা জিনত-উন-নিসা যারপর নাই শোকার্ত্তা। তাহার রক্ষাকর্ত্তা একমাত্র ভগবান্। বিদায় পুত্র, বিদায়, বিদায়।

(৪২)

(আওরংজেব মৃত্যুশয্যায় এই পত্রখানি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সুলতান মহম্মদ কামবক্সকে লিখিয়াছিলেন।)

প্রিয়দর্শন পুত্র, এই সংসারে সকলেই নিজ নিজ ইচ্ছার বশীভূত হইয়া কার্য্য করিতেছে। কিন্তু পুত্র আমি অন্তিম-কালে তোমাকে ঐশ্বরিক ইচ্ছার কথাও স্মরণ করাইয়া দিতেছি। আমার উপদেশ তোমার কর্ণে প্রবেশ করিবে না জানি, তথাপি কয়েকটি কথা তোমাকে বলিব। আমি ত এই সংসার হইতে বিদায় হইলাম, কিন্তু আমার বড়ই দুঃখ হয় তোমাদের অক্ষমতার কথা ভাবিয়া। না জানি তোমাদের কি দুর্দ্দশাই হইবে। যাহা হউক এখন ত আর কোন হাত নাই। আমি পাপের বোঝা বহন করিয়া লইয়া চলিলাম—সংসারে থাকিয়া যে কেবল পাপ কার্য্যই সঞ্চয় করিয়াছি! প্রকৃতির কি আশ্চর্য্য বিধান! আমি আসিয়াছিলাম রিক্তহস্তে কিন্তু ফিরিয়া যাইতেছি পাপের ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া। বারদিন প্রবল জ্বরে আক্রান্ত ছিলাম, এখন জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। এখন যে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি পুত্র, সেই দিকেই যেন ভগবানের অস্তিত্ব অনুভব করিতেছি। একটি কারণে আমি প্রাণে বড়ই বেদনা অনুভব করিতেছি। আমার অবর্ত্তমানে আমার বিপুলবাহিনী এবং বিশ্বস্ত অনুচরগণ যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে সুপরিচালিত হইবে না। আমি নিজের সম্বন্ধে কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। মহাপাতকী আমি, আমার ভাগ্যে না জানি কি শাস্তিই লেখা আছে। ভগবান্ প্রজার রক্ষকর্ত্তা বটেন, কিন্তু আমার পুত্রগণের উচিত প্রজা সকলকে বিপদে রক্ষা করা। আজাম্ আমার নিকটেই আছে। তোমার সম্বন্ধে সকল কথা তাহাকে বলিয়াছি। তুমিও আমার শেষ অভিপ্রায় প্রতিপালন করিও, পুত্র। যাহাতে অনর্থক রক্তপাত হয় এবং মুসলমানগণের যাহাতে জীবন নষ্ট হয়, সেরূপ ঘটনা রহিত করাই তোমাদের কর্ত্তব্য। এই বৃদ্ধকে আর নিমিত্তের ভাগী করিও না। তোমাকে এবং তোমার পুত্রগণকে ভগবানের হস্তে সমর্পণ করিলাম।

তোমরা সুখী হও, পুত্র। আমি তোমাদের সকলের নিকট হইতে বিদায় লইতেছি। আমার হৃদয় এখন বড়ই অস্থির। প্রিয় পৌত্র বাহাদুর এখন গুজরাটে আছে এবং আজিম সীমান্তপ্রদেশে (কাবুলে) গিয়াছে। বেগম জিনত্‌-উন্‌-নিসা বড়ই শোকাকুলা। জীবনে কোন সুখই ত সে পায় নাই। তাহার যে কি কষ্ট, সে তাহা নিজেই জানে। অপরে তাহা কি বুঝিবে বল। উদিপুরী বেগম তোমার মাতা—আমার পীড়ারও অংশভাগিনী হইয়াছে। বেগমের অভিপ্রায় যে আমার সহিত সহমৃতা হইবেন—যেমন হিন্দু-সতীগণ করিয়া থাকে। পুত্র, আত্মীয় স্বজন এবং ভৃত্যগণ ভণ্ড এবং কপটাচারী হইলেও তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিও। তাহাদিগকে পদচ্যুত বা কোনরূপে নিগৃহীত করিও না। পুত্র, মিতব্যয়ী হইতে চেষ্টা কর। আশীর্ব্বাদ করি সুখী হও। বিদায় পুত্র, বিদায়!

ক্রমশঃ

শ্রীযামিনীকান্ত সোম (বিদ্যারত্ন)।

সংগ্রহ বৈচিত্র্য।

১। চা পানের আরম্ভ।

চা পান করিবার প্রথা প্রথম বোধহয় চীন দেশেই আরম্ভ হয়। অধ্যাপক কিং তাঁহার 'Farmers of Forty Centuries' পুস্তকে লিখিয়াছেন যে চীনারা টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য জল গরম করিয়া পান করিত। পরে উহা সুস্বাদু করিয়া লইবার জন্য চা'য়ের পাতা ভিজাইয়া লইত। উক্ত পুস্তকে লিখিত আছে যে টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ নিবারক বলিয়া সমস্ত দেশের লোকেই গরম জল পান করিত। কারণ যে স্থানে বহু-লোকের বাস সেই স্থানের পানীয় জলে প্রায়শঃই রোগের জীবাণু বর্ত্তমান থাকে।

আমেরিকার মিনেসোটা ইউনিভার্সিটির ডাঃ গর্টনার বলেন যে চা পান প্রথার আরম্ভ সম্বন্ধে অধ্যাপক কিং যাহা বলেন তাহা একেবারে ঠিক নহে। তিনি বলেন যে জনবহুল স্থানে পানীয় জল দূষিত হয় এবং সেই জল হইতে বহুরোগ উৎপন্ন হয়, ইহা ঠিক। কিন্তু পানীয় জল গরম করিয়া লইলে যে রোগের জীবাণু নষ্ট হয় তাহা তখনকার লোকের জানা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। চিকিৎসাশাস্ত্রও তখন এত উন্নত হয় নাই এবং পূর্ব্বকালে চীনারা ভূত প্রেতকেই রোগের কারণ বলিয়া বিশ্বাস করিত।

চা পান আরম্ভ সম্বন্ধে ডাঃ গর্টনার বলেন যে প্রথমে কোন কোন চীনা পরিবার গরম জলের সহিত চা'য়ের পাতা ভিজাইয়া মদ্য প্রভৃতি পানীয়ের ন্যায় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। ইহার পর তাহারা সাধারণ জলের পরিবর্তে চা পান করিতে লাগিল। অন্যান্য লোকেরা দেখিল যে যাহারা চা পান করে, তাহাদের মধ্যে রোগ, যাহারা চা পান করে না তাহাদিগের হইতে অপেক্ষাকৃত কম। ইহার ফলে চা নানারোগের প্রতিষেধক বলিয়া ঔষধরূপে লোকে ইহার খুব ব্যবহার আরম্ভ করিল। ইহাই চা উৎকৃষ্ট পানীয় রূপে ব্যবহৃত হইবার আরম্ভের কারণ।

২। আহারের কথা।

আজকাল আমিষ ও নিরামিষ ভোজন লইয়া বাদানুবাদ চলিতেছে। অনেক বড় বড় চিকিৎসাবিদের নিরামিষ ভোজনের উপকারিতা সম্বন্ধে বহু যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। কেট এমিল বেহুক (Kate Emil Behuke) নামে একজন জর্ম্মাণ পণ্ডিত নিরামিষ ভোজনের উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক তথ্যপূর্ণ একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে মানুষ সাধারণতঃ মুখে যাহা সুস্বাদু লাগে তাহাই খায়। জীবনরক্ষার জন্য যাহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এমন অনেক খাদ্য তাহারা খাইতে ভালবাসে না। তিনি বলেন যে কৃত্রিম উপায়ে রক্ষিত খাদ্য শরীরের পক্ষে বিশেষ অপকারী। দেখিতে লোভনীয় বলিয়া আমরা তাহা অত্যন্ত আদর করিয়া খাই। ঐ সব খাদ্য অপেক্ষা সূর্য্যের তাপে শুষ্ক করিয়া যে সব ফল রাখা হয় তাহা শরীরের পক্ষে যথেষ্ট উপকারী।

কাহারও কাহারও মতে তাজা ফল ও তরকারী সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য। ইহা খাইতে মাংস প্রভৃতি অপেক্ষা সুস্বাদু না হইলেও সহজে জীর্ণ হয় এবং পাকস্থলীও ভারী বোধ হয় না। অধিক প্রকার 'পদ' না খাইয়া একটি মাত্র পদ দিয়া খাওয়াই ভাল। তাহার কারণ বহুপদের মধ্যে কোনও কোনওটা হয়ত সহজে জীর্ণ হয়, আবার কোনও কোনটা জীর্ণ হইতে দীর্ঘ সময় লাগে। এইজন্য বদহজম ও অন্যান্য পাকস্থলীর পীড়া সহজেই জন্মে। খাদ্যের পদ এক হইলে সে ভয় থাকে না। খাইবার সময় জল বা অন্য কোনও পানীয় যত কম ব্যবহার করা যায়, ততই ভাল। কারণ চিবাইয়া খাইবার সময় জিহ্বা হইতে এক প্রকার লালা নির্গত হয়। এই লালা হজম শক্তির বিশেষ সহায়তা করে। জল বা অন্য পানীয় পান করিলে সেই লালা ধুইয়া যায়। তাহাতে হজম শক্তির সহায়তা কম হয়। নিরামিষ ভোজনে খাইবার সময় পানের স্পৃহা অত্যন্ত কমিয়া যায়। বিখ্যাত পণ্ডিত ডাঃ এলেকজাণ্ডার হেগ (Dr Alexander Haig) বলেন যে মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা নষ্ট হইয়া যায় বলিয়াই পানীয়ের প্রতি তাহার স্পৃহা হয়। মানুষ স্বভাবতঃ ফলমূলাহারী জীব (Frugivorous animal)। ছোট ছোট ছেলেপিলেদের সর্ব্বপ্রকার ফলের প্রতি স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা ও স্পৃহাই ইহার প্রমাণ।

প্রত্যহ নিয়মিতভাবে কফি (Coffee) পান শরীরের উপর বিষবৎ ক্রিয়া করে। চা অধিকক্ষণ ভিজাইয়া রাখিয়া খাইলেও শরীরের অত্যন্ত অপকার করে।

দুইবার আহার শরীরের পক্ষে যথেষ্ট। আহারের পর কিছু তাজা ফল খাইলে শরীরে বেশ বল পাওয়া যায়। খাদ্যদ্রব্যগুলি অতি উত্তমরূপে ধৌত করিয়া পরিষ্কার পাত্রে রাখা উচিত। খুব ভাল করিয়া চিবাইয়া খাওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ আহারে শরীর বহুকাল সুস্থ থাকিবে।

চৌদ্দ।

ফরাসীদেশের সম্রাট চতুর্দ্দশ লুইর সহিত ১৪ সংখ্যাটির অতি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। প্রথমতঃ তিনি ঐ নামের চতুর্দ্দশ নৃপতি। ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। উক্ত সংখ্যাটির বিভিন্ন অঙ্কগুলি যোগ করিলে (১+৬+৪+৩) মোট ১৪ হয়। তাঁহার মৃত্যু হয় ১৭১৫ খৃঃ অঃ। ঐ সংখ্যার বিভিন্ন অঙ্কগুলি যোগ করিলেও (১+৭+১+৫) ১৪ হয়। লুই ৭৭ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার অঙ্কগুলি যোগ করিলেও ১৪ হয়। সম্রাট লুই ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যু হয় ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে এই দুইটি সংখ্যার সমষ্টি হয় (১৬৩৮+১৭১৫=৩৩৫৩) উক্ত সংখ্যার বিভিন্ন অঙ্কগুলি যোগ করিলেও (৩+৩+৫+৩) ১৪ হয়। চৌদ্দর সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আর কাহারও আছে কিনা সন্দেহ।

রাজার ভাগ্য।

বিংশশতাব্দির প্রারম্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত ইউরোপে অনুমান মোট ২৫৫০ জন নৃপতি রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে ৩০০ শত জন রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন। ১৩৪ জন গুপ্ত ঘাতকের হস্তে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। ১২৩ জন যুদ্ধে বন্দী হইয়াছেন। ১০৮ জনের প্রাণদণ্ড হইয়াছে। ১০০ শত জন যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। ৬৪ জনকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়। ২৮ জন আত্মহত্যা করেন। ২৫ জনকে ভীষণ যন্ত্রণা দিয়া মারিয়া ফেলা হয় এবং ২৩ জন পাগল হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। ইহাদের মোট ৯০৫।

উপকারী মাকড়সা।

বিধাতার সৃষ্ট সর্ব্বপ্রকার জীবদ্বারা মানুষ কোনও না কোন উপকার পাইতে পারে। সামান্য মাকড়সা কর্ত্তৃক পৃথিবীর ইতিহাসের গতি কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

স্কটলণ্ডের রাজা রবার্ট ব্রুসের নাম অনেকের নিকটই পরিচিত। ১৩০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি স্কটলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় ইংলণ্ডের সহিত তাঁহার ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইংরেজ সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তিনি প্রথমে এথোলের জঙ্গলে পলায়ন করেন। পরে আয়র্লণ্ডের উত্তর উপকূলের নিকটবর্ত্তী রাথলিন নামক দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন। একদা যখন তিনি নিরাশচিত্তে শয্যায় শুইয়া ছিলেন তখন দেখিলেন যে একটি মাকড়সা ছাদের কড়িকাঠে জাল বুনিবার চেষ্টা করিতেছে। ছয়বার চেষ্টা করিয়াও যখন বিফল হইল, তখন ব্রুস মনে মনে ভাবিলেন আমিও ছয়বার যুদ্ধে বিফল মনোরথ হইয়াছি। এই সময় তিনি দেখিলেন যে মাকড়সাটি সপ্তমবারের চেষ্টায় সফল প্রযত্ন হইয়াছে। ইহা দেখিয়া ব্রুস আশান্বিত হইয়া

আর একবার চেষ্টা করিতে উদ্যত হইলেন। এই উদ্যমে তিনি জয়লাভ করিয়া স্কটলণ্ড হইতে শত্রুদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। এই ঘটনা হইতে স্কটলণ্ডে ব্রুস নামধারী কেহ মাকড়সাকে হত্যা করা অত্যন্ত পাপকার্য্য বলিয়া গণ্য করে। সামান্য মাকড়সাই ব্রুসকে এই মহৎ কার্য্যে উৎসাহিত করিয়াছিল।

প্রুসিয়ার বিখ্যাত রাজা ফ্রেডারিক দি গ্রেটের নাম সকলেই শুনিয়াছেন! তিনি যখন সান সোসিতে (San Souci) ছিলেন তখন একদা এক পেয়ালা চকোলেট্ পান করিতে বসেন। কিন্তু যখন পান করিতে যাইবেন, তখন সহসা উঠিয়া শয়নাগার হইতে রুমাল আনিতে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেখিলেন যে পেয়ালার মধ্যে প্রকাণ্ড-কায় একটি মাকড়সা পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি অন্য পেয়ালা আনিতে আদেশ করিবামাত্র একটি পিস্তলের শব্দ শুনিতে পাইলেন। তাহার পাচক উক্ত পেয়ালার মধ্যে বিষ মিশাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু তিনি অন্য পেয়ালা আনিতে বলায় সে তাহার বিশ্বাসঘাতকতা ধরা পড়িয়াছে মনে করিয়া নিজেকে হত্যা করে। এখনও সেই কক্ষের ছাদে একটি মাকড়সা অঙ্কিত আছে। এই সামান্য ঘটনা হইতে ফ্রেডেরিকের জীবন রক্ষা হয়। এই কারণে তাঁহার মৃত্যু হইলে, ইউরোপের ইতিহাস অন্যরূপ হইয়া যাইত। কারণ প্রুসিয়া শক্তির ভিত্তি তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন।

ইসলাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহম্মদ শত্রু কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া এক পর্ব্বতের গুহায় পলাইয়া আশ্রয় লন। কথিত আছে যে এই সময় সহসা গুহার প্রবেশপথে একটি বৃক্ষ জন্মিল। ইহার একটি শাখায় এক বন্য পারাবতের বাসা ছিল। এবং বৃক্ষটিও গুহার প্রবেশ পথের মধ্যে একটি মাকড়সা জাল বুনিয়াছিল। শত্রুগণ এইস্থলে উপস্থিত হইল। কিন্তু সেই মাকড়সার জাল দেখিয়া মনে করিল, এ স্থানে শীঘ্র কোন মানুষ আসে নাই। ইহা ভাবিয়া তাহারা সে স্থান পরিত্যাগ করিল। মহম্মদেরও বহুমূল্য জীবন একটি মাকড়সা হইতে রক্ষা পাইল।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

রাষ্ট্রনৈতিক দলাদলি।

রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে দলাদলি সর্ব্বত্রই আছে, সর্ব্বত্রই থাকে,—ইহা অনেকটা স্বাভাবিক। রাষ্ট্রীয়শক্তি, রাষ্ট্রীয় অবস্থার উপরে দেশের অনেক বড় বড় স্বার্থ নির্ভর করে। সুতরাং বড় কোনও পরিবর্ত্তনের চেষ্টায় ও সূচনায় মত-দ্বৈধ হইবেই। যখন এই সব রাষ্ট্রীয় কর্ম্মের দিকে বড় আগ্রহ লোকের জন্মে, তখন এই দ্বৈধ কেবল মতের আলো-চনাতেই সীমাবদ্ধ থাকে না,—কর্ম্মক্ষেত্রেও একটা প্রতি-দ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। প্রত্যেক পক্ষই প্রাণপণ চেষ্টা করেন, আপনাদের যে মত তাহাই কার্য্যে পরিণত হয়,—প্রতিপক্ষের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

এই পর্য্যন্ত যদি দলাদলির সীমা থাকে,—তবে দলাদলি দোষের হয় না,—দলাদলিতে ক্ষতিও হয় না। বরং বিপরীতমতের পরস্পর সংঘর্ষে কোনও মত অতিরিক্ত অসংযত বাড়াবাড়ির দিকে যাইতে পারে না,—প্রতিপক্ষ কখন জয়লাভ করে, এই ভয়ে প্রত্যেক পক্ষকেই সর্ব্বদা অতি সতর্ক ও জাগ্রত থাকিতে হয়,—চিন্তায় ও কর্ম্মে কোনও-রূপ জড়তা বা শিথিলতা কখনও আসিতে পারে না। বিগত দুই শতাব্দির অধিককাল বৃটিশরাজ্যের শাসনপ্রণালী এই দলাদলিকে অবলম্বন করিয়াই চলিতেছে,—বেশ জোরেই চলিতেছে। এই দলাদলির মধ্যেই বৃটিশজাতির বিশাল সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছে,—বৃটিশশক্তি পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

যাহা হউক, আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় দলা-দলিতে এসব বড় বড় তুলনা আনিবার এমন কোনও সার্থকতা নাই। আমরা এইমাত্র বলিতে চাই যে, দলা-দলিটাই দোষের নয়, বরং স্বাভাবিক,—এবং মানবের জাগ্রত চিত্ত ও কর্ম্মজীবনের স্বাভাবিক বৈচিত্র্যই ইহাতে আত্মপ্রকাশ করে—এবং যে পরিমাণে ইহা জাগ্রত কর্ম্ম-প্রচেষ্টার লক্ষণ সেই পরিমাণে ইহা মঙ্গল লক্ষণও বটে।

আবার, অনেক সময়—এই দলাদলির ঘাতপ্রতিঘাতেই প্রকৃত মঙ্গলের পথ বাহির হয়।

তবে যাঁহারা দলের নেতা তাঁহাদের দেশকালপাত্রভেদে বড় হিসাব করিয়া বুঝিয়া চলিতে হয়। এইখানে বড় ভুল কিছু করিলে, বড় ঠকিতে হয়—দলের ক্ষতি হয়, এবং দলের সকল চেষ্টার ফলে দেশের বড় কোনও মঙ্গলের সম্ভাবনা যদি থাকে, তবে সে পক্ষেও বড় বিঘ্ন উপস্থিত হয়।

এদেশের রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে ১২।১৪ বৎসর যাবৎ স্পষ্ট বিভক্ত দুইটি দলের মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাইতেছি। প্রথমে এই দুইটি দল সাধারণতঃ Moderate (মডারেট—নরম—মধ্যপন্থী) এবং Extremist (একষ্ট্রীমিষ্ট—চরমপন্থী) এই দুইনামে পরিচিত হয়। অবশ্য এ দুটি নাম এঙ্গ্লো ইণ্ডিয়ানদের দেওয়া নাম। Extremistগণ আপনাদিগকে Nationalist বা জাতীয়দল বলিতেন। মডারেটরাও অনেকে বলিতেন, আমরাও Nationalist তবে ওদের মত—অত বাড়াবাড়ি করি না। যাহা হউক্ Moderate এবং Extremist এবং নরম ও চরম—এই দুইটি নামই প্রচলিত নাম হইয়া পড়ে। এই দুই দলের সংঘর্ষে ১৯০৭ সনে সুরাট কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া যায়। দুইদলই তখন দেশকাল পাত্রাদির হিসাবে কিছু ভুল করিয়া কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াই ফেলিয়াছিলেন,—তাই এত বড় বিভ্রাট উপস্থিত হইল। চরম দল প্রায় লোপ পাইল,—নরম দলও বড় নরম হইয়া রহিল। কংগ্রেসও কেমন মিটমিটে হইয়া গেল। যাহা হউক, মিটমাট একটা শেষে হইল। ৯।১০ বৎসর পরে দুই দলের নেতারাই আপোষে একটা রফা করিয়া লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে গিয়া মিশিলেন,—কংগ্রেস আবার জাঁকিয়া উঠিল। তারপর, গত বৎসর কলিকাতার কংগ্রেসের মত অত বড় কংগ্রেস আর কখনও হয় নাই। ১৯০৬ সনে যখন নরমে চরমে দলাদলি পূর্ণমাত্রায় উঠিয়াছিল—যার ফলে পর বৎসরই সুরাট কংগ্রেসই ভাঙ্গিয়া গেল, তখন কলিকাতায় যে কংগ্রেস হইয়াছিল,—সে পর্য্যন্ত সেই কংগ্রেসই ছিল বৃহত্তম। বিগত কলিকাতার কংগ্রেস তাহা অপেক্ষাও অনেক বৃহত্তর হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে হোমরুল দলের আবির্ভাব হয়। পুরাতন Extremist বা চরমপন্থীদলের লক্ষ্য যে কি ছিল, স্পষ্ট বুঝা যায় না।—কেহই স্পষ্ট করিয়া তাহা বলেন নাই।—বর্ত্তমান হোমরুলদলের নেতৃবর্গ অনেকে সেই Extremi দলের নেতৃস্থানে ছিলেন বটে,—কিন্তু এই দলকে ঠি সেই দলেরই পুনরুত্থিত মূর্ত্তি বলা যায় না। অনেক নূ নেতা ইহার মধ্যে আছেন,—তখন যাঁহারা মডারেট দ ছিলেন, তাঁহাদের কাহাকে কাহাকেও এই হোমরুলদ এখন দেখা যায়। তারপর হোমরুলদলের সুস্পষ্টভা ব্যক্ত একটি লক্ষ্যও রহিয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভু থাকিয়া বৈধ উপায়ে আন্দোলন করিয়া ভারতবাসী বৃটি প্রজার পূর্ণ অধিকার লাভ করিবেন,—বৃটিশসাম্রাজ্যে উপনিবেশ সমূহে যেরূপ হোমরুল বা স্বায়ত্তশাসন প্রচলি আছে ভারতেও সেইরূপ শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবে মোটামুটি ইহাই হোমরুলদলের প্রধান লক্ষ্য।

ওদিকে পুরাতন সেই মডরেটদলও যেমন ছিলেন-এখনও আছেন। কিন্তু হোমরুলদলের আবির্ভাবে যে এ দলের প্রতিপত্তি সর্ব্বত্রই বড় নরম হইয়া পড়িয়াছে বিগত কলিকাতার কংগ্রেসের অধিনায়কত্বে শ্রীমতী এ বেসাণ্টের নিয়োগ ইহার বড় একটি প্রমাণ। শ্রীম বেসাণ্ট হোমরুলদলের প্রধান একজন নায়িকা। তি অন্তরীণে আবদ্ধ হইলেন। অনেকটা ইহার প্রবল প্রতিবাদে ভাবেই যে শ্রীমতী বেসাণ্টকে কংগ্রেসের অধিনায়কত্বে নির্ব্বাচন করিবার প্রস্তাব হয়, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পা যায়। মডারেট দল ইহার বিপক্ষে ছিলেন, কিন্তু বা দিতে পারিলেন না। প্রায় সকল প্রদেশের কংগ্রে কমিটি হইতেই শ্রীমতী বেসাণ্ট মনোনীত হইলেন,—এ বাঙ্গলায় অল্পের জন্য ব্যতিক্রম হইয়াছিল। কিন্তু হোমরুল দলের ঘোর প্রতিবাদে শেষে মডারেটদলকে হার মানিতে হয়,—শ্রীমতী এনী বেসাণ্টের মনোনয়নই গ্রহণ করিতে হয়

এই ব্যাপারে মডারেট ও হোমরুলদলের প্রকৃতি ও কার্য্যপ্রণালীর পার্থক্য কোথায়, তাহারও একটা পরিচ আমরা পাই। হোমরুলদলের যে লক্ষ্য—মডারেটদল বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের লক্ষ্যও তাহাই। বৈধ উপায়ে এই লক্ষ্য সাধনের চেষ্টা করিতে হইবে, একথাও উভয় দলই বলিয়া থাকেন। তবে যতদূর বুঝিতে পারা যায় উপায়ের 'বৈধতা' যে কি, বৈধভাবে কার্য্যপ্রণালী যে কি হইবে, এই সব বিষয়েই মতের একটা মিল নাই।—মডারে দল গবর্ণমেণ্ট যাহাতে বেশী অসন্তুষ্ট হন, তাহা করিতে চা

না। কার্য্যতঃ অসন্তোষজনক জোর প্রতিবাদ ঠিক অবৈধ বলিয়া মনে না করিলেও যেন অসমীচীন বলিয়া বোধ করেন, কিছু ভয় পান, বড় বড় রাজপুরুষদের কিছু খাতির করিয়া মন রাখিয়া চলিতে চান। অধিকার যা পাওয়া যায়, তাই তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে বরণ করিয়া নিতে প্রস্তুত। ভাল যা পাওয়া গেল, তাই ভাল বলিয়া নেও, ইহার পর সময়মত আরও ভাল পাইবে, তার জন্য চেষ্টা কর,—ইহাই তাঁহাদের কথা। এদিকে হোমরুলদল স্পষ্ট বলেন, পূর্ণ অধিকার আমরা চাই,—আজ না হয় কাল হইবে, কিন্তু চাই পূর্ণ অধিকার,—খাট হইয়া আমরা থাকিব না। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই পূর্ণ অধিকার আমরা পাইব, গবর্ণমেণ্ট স্পষ্ট ইহা ঘোষণা করুন। একটু আধটু দয়ায়—ছোটখাট দানে—আমরা সন্তুষ্ট হইব না,—সে দান গ্রহণ করিব না।—ইহারা সর্ব্বদাই নির্ভয়ে গবর্ণমেণ্টের কোনও অসঙ্গত কার্য্যের চূড়ান্ত প্রতিবাদ করিতে প্রস্তুত,—প্রয়োজন হইলে Passive resistance নীতি অবলম্বন করিতেও পশ্চাৎপদ নহেন। রাজপুরুষগণের মন রাখিয়া—খাতির করিয়া একেবারেই ইঁহারা চলিতে চান না। দেশের মঙ্গলের জন্য যাহা ইহারা ভাল মনে করেন, স্পষ্টভাবে তাহা বলিয়া তার দাবী করিয়া—তার জন্য বৈধ যে কোনও উপায় অবলম্বন করিতে ইঁহারা প্রস্তুত। রাজপুরুষগণ তাহাতে যতই কেন ক্রুদ্ধ হউন না, তাহা গ্রাহ্য করিতে চান না। এদেশে রাষ্ট্রনৈতিক দলাদলির ইহাই বর্ত্তমান অবস্থা। সম্প্রতি ভারতসচিব মণ্টেগুসাহেবের শাসন-সংস্কার প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে—দলাদলির ব্যাপারও বড় সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গালার দলাদলি—সুরেন্দ্রনাথ।

অন্যত্র যেমন—দলাদলি বাঙ্গালায়ও বেশ আছে। বাঙ্গালায় এই দলাদলির জোর যেন আরও বেশী। শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত এরূপ প্রতিপত্তিশালী মডারেট-নেতা বোধ হয় আর কোন প্রদেশে নাই, তাই মডারেট দলের তেমন একটা জোরও আর কোথাও এখন আছে বলিয়া মনে হয় না। নূতন শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব বাহির হইবার কেবল আগেই বাঙ্গালায় বড় একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল। বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটিতে এখন হোমরুল দলেরই প্রাধান্য। [illegible] (ইহারাই হোমরুলদলের নায়ক) একটি সার্কুলার পত্র বাহির করিয়াছিলেন যে, শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব আমাদের আদর্শ অপেক্ষা খাট হইলে তাহার জন্য ঘোর প্রতিবাদ করিতে হইবে,—অতএব সকলে সতর্ক হউন, প্রস্তুত থাকুন, ইত্যাদি। ওদিকে সুরেন্দ্র বাবুর বেঙ্গলী পত্রিকা ইহার প্রতিবাদে বলিতে থাকেন—আগেই কেন তোমরা কু-আশঙ্কা করিতেছ। এটা অতি অসঙ্গত কথা। প্রস্তাব বাহির হউক, তখন ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া যেটুকু ভাল হয়, আমরা গ্রহণ করিব,—যাহা মনোমত হইবে না তার প্রতিবাদ করিব, আর ভাল যাতে পাই তারজন্যে আন্দোলন করিব, ইত্যাদি। যে ভাবে এই বাদ প্রতিবাদ হইতেছিল, তাহাতে মনে হ[য়] দুইদলেরই প্রধানগণ প্রস্তাবের মূল কথা আগেই, সব না হউ[ক] মোটামুটি অন্ততঃ শুনিয়াছিলেন। অনেকে ইহাও বলে[ন] মণ্টেগু সাহেব মডারেট দলের কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি[কে] এই প্রস্তাবের মর্ম্ম জ্ঞাপন করেন এবং ইঁহাদের মধ্যে সুরে[ন্দ্র]নাথও ছিলেন।

ঠিক এই সময়েই আবার 'ন্যাশনাল লিবা[রেল] লীগের' প্রতিষ্ঠা হইল। এই লীগের নায়কগণের নাম দে[খিয়া] সকলেই বুঝিতে পারেন, ইহা মডারেটদের লীগ, এবং আ[র] নানা কারণে অনেকেই ইহা মনে করেন যে মণ্টেগু সাহে[বের] শাসন-সংস্কার প্রস্তাবের সমর্থনের জন্যই এই সময়ে লীগের প্রতিষ্ঠা হইল। গত কংগ্রেসের সময় হইতেই এই একটা সমিতি গঠনের চেষ্টা হইতেছে বলিয়া শুনিতেছিল[াম] এবং ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রীযুত পৃথ্বীশচন্দ্র রা[য়]। কংগ্রেসে এবং বাঙ্গালার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে [চির]দিন মডারেট দলেরই আধিপত্য ছিল। গত কংগ্রে[সের] পূর্ব্বে শ্রীমতী বেসাণ্টের নির্ব্বাচন উপলক্ষে যে সংগ্রাম উপ[স্থিত] হয়, তাহার ফলে কংগ্রেসে হোমরুলদলের প্রাধান্য [হয়] এবং বাঙ্গালার কংগ্রেসের কমিটিতেও তাঁহারাই একরূপ [প্রবল] হইলেন। কংগ্রেস আধিপত্য হইতে বিচ্যুতি ঘটিল[ে] মডারেটদলের স্থান কোথায় হইবে? সুতরাং তাঁহাদের [একটি] একটি সমিতি আবশ্যক—পৃথ্বীশবাবুর একখানি পত্রও মর্ম্মে তখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সেই অবধিই বো[ধ হয়] চেষ্টা একটা চলিতেছিল,—এখন মণ্টেগুসাহেবের শা[সন]-সংস্কার-প্রস্তাবের ঘোষণা সমূহ দেখিয়া তাড়াতাড়ি ন্যাশনাল লিবারেল লীগের গঠন হইল। শাসন-সং[স্কার]

প্রস্তাবের সমর্থন যে ইহার বড় একটি লক্ষ্য ছিল, তাহা আর একটি ঘটনা হইতেও বেশ অনুমান করা যায়। প্রস্তাব বাহির হইবার ২৩ দিন পরেই অন্য কোনও সমিতি এ সম্বন্ধে কোনও মত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে—প্রস্তাবের সকল কথা সম্বন্ধে কোনও সূক্ষ্ম আলোচনার অবসর না হইতেই—ন্যাশনাল লিবারেল লীগ এক সভায় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া তখনই বিলাতে ভারতসচিবের কাছে তার পাঠাইয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ প্রথমে এই লীগের মধ্যে ছিলেন না। পরে ইহার সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন।

বাঙ্গলায় সুরেন্দ্রনাথ যে স্থান অধিকার করিয়া আছেন, সেস্থানে এ পর্য্যন্ত কেহই যে আর উঠিতে পারেন নাই, একথা বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। গত ৪০ বৎসর যাবৎ বাঙ্গলায় রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ইতিহাস আর সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্মজীবনের ইতিহাস প্রায় একই কথা। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে কর্ম্মজীবনের সাগ্রহ নিয়োগ, অতুলনীয় বাগ্মিতা, বার্দ্ধক্যেও অনন্ত উৎসাহ উদ্যম, অসাধারণ সৌজন্য ও অমায়িকতা প্রভৃতি গুণে সর্ব্বত্র সকলের অতি শ্রদ্ধাভাজন ইনি হইয়াছেন। অনেক ত্রুটি ইঁহার আছে, ইহার অনেক কার্য্য এখন অনেকেই সমর্থন করেন না,—কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই সব গুণে এবং উন্নত কর্ম্মময় জীবনের স্মৃতিতে, ইহার অসাধারণ প্রতিপত্তি এখনও দেশে রহিয়াছে। অনেকেই চান, সুরেন্দ্রনাথ কোনও দলে একেবারে মিশিয়া—সকল দলাদলির উপরে থাকুন, মধ্যস্থের ন্যায় সকলকে পরিচালিত করুন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ তাহা কখনও করিতে চান নাই। নিজের যে সব ত্রুটি আছে—তাহাও কখনও স্বীকার বা লোকমতের খাতিরে সংশোধনের চেষ্টা করেন নাই। ইঁহার সাঙ্গোপাঙ্গবর্গ সর্ব্বদা ইঁহাকে মডারেটদলের মধ্যেই টানিয়া রাখিয়াছেন,—তিনিও রহিয়াছেন। বাঙ্গালার মডারেটদলের প্রধান বলই সুরেন্দ্রনাথ, তাই মডারেটগণ বরাবরই তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে চাহিয়াছেন। বস্তুতঃ সুরেন্দ্রনাথ বাহির হইয়া আসিলে বাঙ্গলায় মডারেটদলের দেশে কোনও স্থানই থাকে কিনা সন্দেহ। ন্যাশনাল লিবারেল লীগ্‌ও আপনাদের দলে তাঁহাকে প্রধান করিয়া রাখিতে চান। সুরেন্দ্রনাথ বোধ হয় ইতস্ততঃ কিছু করিতেছিলেন। শেষে সকল দ্বিধা ঘুচাইয়া এই দলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিলেন।

হোমরুলদলের অন্যতম নেতা ব্যারিষ্টার শ্রীযুত সি আর দাস মহাশয় চট্টগ্রামে একটি সভায় সুরেন্দ্রনাথকে আক্রমণ করিয়া অনেক কথা বলেন। তাহার অব্যবহিত পরেই সংবাদ পত্রে ঘোষিত হইল, সুরেন্দ্রনাথ ন্যাশনাল লিবারেল লীগের সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ কেহ দুইটি ঘটনায় কার্য্য কারণ সম্বন্ধ দেখাইয়া থাকেন। সত্য মিথ্যা ভগবান্ জানেন।

যাহা হউক, বাঙ্গলার রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথের যে অসাধারণ প্রতিপত্তি আছে, একথা সকলেই বোধ হয় মনে মনে বুঝেন ও স্বীকার করেন। মডারেটদলের প্রধান প্রধান লোকেরা এইজন্য সুরেন্দ্রনাথকে আপনাদের দলে প্রধান করিয়া রাখিতে চান। সুরেন্দ্রনাথেরও মন যে সেই দিকে একথা বলাই বাহুল্য। এদিকে হোমরুলদল সুরেন্দ্রনাথকে আপনাদের মধ্যে পাইবার কোনও আশা রাখেন না,—তাঁহার মতিগতি বুঝিয়া তাঁহার সহযোগিত্ব হয়ত বাঞ্ছনীয়ও মনে করেন না। তাঁহাকে একটু জব্দ করিবার আকাঙ্ক্ষাও কাহারও কাহারও থাকিতে পারে—(এ পৃথিবীতে মানবচরিত্র এমনই জটিল যে বড় কাজে বড়লোকের মনেও ছোট প্রবৃত্তির খেলা অনেক সময় দেখা যায়।) ওদিকে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিপত্তি যে তাঁহাদের পথে বড় শক্ত বাধা সৃষ্টি করিতে পারে,—তাহাও বোধ হয় বুঝেন। তাই সুরেন্দ্রনাথের ত্রুটি দেখাইয়া—তাঁহার সকল কাজে খুঁত বাহির করিয়া, লোকের কাছে তাঁহাকে খাট করিয়া তাঁহার এই প্রতিপত্তি যাহাতে ক্ষীণ হইয়া আইসে, এইরূপ একটা চেষ্টার ভাব হোমরুলদলের অনেকের মধ্যে যেন দেখা যায়। কিন্তু ইহাতে যে তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ সুফল ঘটিতেছে এরূপ মনে হয় না। দলাদলির গোলমালে লোকে কখন সঙ্গতির সীমা ছাড়াইয়া যায়, দলাদলির মধ্যে যাহারা থাকে, তাহারা সেটা তেমন বুঝিতে পারে না,—বাহিরের লোকে বুঝে। যখন তখন যে কোনও কার্য্যে সুরেন্দ্রনাথকে আক্রমণ করা, তাঁহার চেষ্টিত কার্য্যমাত্রকে অসার বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা, ব্যক্তিগত বিদ্বেষের মত দেখায় এবং অনেকেই এটা পছন্দ করেন না। শ্রীযুত সি, আর, দাস মহাশয়ের চট্টগ্রামের বক্তৃতার অনেক কথা অনেকে সঙ্গত বলিয়া মনে করেন নাই। যুক্তিতে যত তার সঙ্গতি দেখাইবার চেষ্টা হউক না, মানুষ কেবল

যুক্তিতেই চলে না। তার সেন্টিমেণ্টের প্রভাব তার কর্ম্ম-জীবনের বড় কম নয়। বিশেষ বাঙ্গালী আমরা বড় সেন্টিমেন্টাল্‌ জাতি। গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা এদেশ-বাসীর মজ্জাগত। যাঁহাকে বহুদিন লোকে শ্রদ্ধাভক্তি করিয়াছে, তাঁহার ত্রুটি যতই দেখা যাক্‌, এই সব ত্রুটিহেতু তার অনুগত হইয়া লোকে না চলুক,—তাঁহার কোনও অবমাননা—অবমাননাজনিত তাহার কোনও বেদনা—এদেশের লোক সহজে সহিতে পারে না। 'উনি গুরুজন' মাথায় থাকুন—কিন্তু ওঁর কথা মানিতে পারি না—এইরূপ উক্তি সর্ব্বদা লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। গুরু-স্থানীয় যাঁহাকে মানিব না, তাঁহাকেও মাথায় করিয়া রাখিব, ভক্তিশ্রদ্ধা দেখাইব, কোনও অবমাননা তাঁহার করিব না,—এইভাবেই এদেশের লোক চলিতে চায়। সুরেন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগতভাবে এরূপ আক্রমণ না করিয়া হোমরুলদলের নায়কগণ তাঁহাদের মতের সমীচীনতা ও হিতকারিতা যদি দেশের সমক্ষে প্রতিপন্ন করিতে বেশী চেষ্টা করেন,—দেশের লোক আহাম্মক নয়—তারা বুঝিবে—সেইমত গ্রহণ করিবে। সুরেন্দ্রনাথ তাহার বিরুদ্ধে চলিলে, দূর হইতেই নমস্কার করিয়া সরিয়া যাইবে। তাঁহার সঙ্গে চলিতে পিছনে গিয়া দাঁড়াইবে না। কিন্তু এই আক্রমণের ফল বিপরীত হইতেছে,—সুরেন্দ্রনাথের দল শক্ত হইয়া বাঁধিবার সুযোগ পাইতেছে। হোমরুলদলের নায়কগণ একথাটি তেমন বুঝিতেছেন বলিয়া মনে হয় না।

ইহার একটি কারণ, বাঙ্গলার হোমরুলদলের নায়কগণ কলিকাতার পদস্থ ধনী ব্যক্তি, দেশের সাধারণ লোকের সঙ্গে সামাজিক সৌজন্যে খোলাখুলিভাবে তেমন ইঁহারা মিশিতে পারেন না,—অতি উচ্চতর একস্তরে আগলা হইয়া ইঁহারা থাকেন। দেশের নাড়ীনক্ষত্র ইঁহারা বোঝেন না। লোকে ইঁহাদের কাছে যায়, মনের মত দুটি কথা বলিয়া আসে।—ইঁহারা কারও কাছে যান না। কারও মন বুঝিবার চেষ্টা করেন না, কলিকাতার বাহিরে কোনও গ্রামে বা সহরে দুইদিন সাধারণ লোক কাহারও বাড়ীতে তাহাদের মত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া ইঁহারা থাকিতে পারেন না। কিন্তু ইহাতে চলিবে না। আপনাদের মতে যদি—কেবল কলি-কাতায় নয়, দেশ ভরিয়া—বড় একটা দল ইঁহারা গড়িতে চান, তবে অত উঁচুতে থাকিলে চলিবে না,—অনেক নামিতে হইবে। নামিয়া দশজনের সঙ্গে আপনা আপনি ভাবে মিলিতে মিশিতে হইবে,—আর সময় একটু বেশী দিতে হইবে। এখ দেখিতে পাই, বাঙ্গালী হোমরুলদলের কর্ত্তারা প্রতিশ্রুতি মত বৈকালে দুই এক ঘণ্টার, অন্য সভায় পর্য্যন্ত সক আসিতে বা আসিয়াও থাকিতে পারেন না। যতই প্রয়োজনী আলোচনা থাক, সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে গৃহে তাঁহাদের পৌছিতে হইবে, কারণ তখন ডিনারের সময়। অমুক বড় কে এ সভায় উপস্থিত হইবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন বাহির হই কিন্তু সভায় আসিলেন না, বা আসিয়াই চলিয়া গেলেন,-কারণ তাঁহাদের বড় এন্‌গেজমেণ্ট (অন্য জরুরীকাজ আছে। অবশ্য ইঁহাদের সময়ের মূল্য আছে। ইংরে প্রবাদ অনুসারে Time is money for them। কি অর্থের মাপে সময়ের মূল্য ধরিলে দেশের ও দশের এসব কা হয় না। ইঁহারা সময় পাইলে, ভাবেন বেশ, লেখে বেশ, বলেনও বেশ। কিন্তু কেবল তাহাতে বড় কা বড় দল গড়া যায় না, তারজন্য কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া আস আসিতে হয়,—নিজে খাটিয়া পাঁচজনকে খাটাইতে হয়। তাহা ইঁহারা কেহ পারিবেন কি? যদি না পারে তবে বৃথা এই আড়ম্বর! গবর্ণমেণ্ট আর গবর্ণমেণ্ পক্ষে সুরেন্দ্রনাথপ্রমুখ ন্যাশান্যাল লিবারেল দল জাঁকি উঠিতেছে। দেশের রাজাজমিদার, সরকারী রাজক চারী,—এই সব রাজাজমিদারে কার্য্যে নিযুক্ত, প্রতিপালি অনুগত, অনুগ্রহপ্রার্থী—লোকের সংখ্যাও কম নয়। ইঁহা ন্যাশনাল লিবারেল লীগ ছাড়িয়া হোমরুলদলে যা দিবেন কি? এত বড় প্রবল প্রতিপক্ষতার সম্মুখে বড় এব হোমরুল দল গড়িয়া তাহাকে খাড়া রাখিতে হইবে। অ সব মত নাগরিক ঐশ্বর্য্যভোগীর খোস খেয়ালে ইহা হইব নহে। ক্লাবের মধ্যে ইঁহাদের তালে নাচিয়া লোকে কে ছ্যাঁচড়াপোড়া হইয়া মরিবে।—কেহ কেহ বলেন ব বাঙ্গলায় ত্যাগী যুবক নাই। যদি থাকিত দুই এক শত এ যদি পাইতাম, কি না করিতে পারিতাম। হায়! ক তোমরা একটু ত্যাগ কর, তবে ত ত্যাগের সহায়তা পা নিজের ষোলখানা মোহর পুরাপুরি বজায় রাখিয়া গরীব জনের বড় দুঃখের ষোলটি পয়সা চাহিতেছ,—পাইবে কেন

শাসন-সংস্কার প্রস্তাব—কি কর্ত্তব্য।

শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব সম্বন্ধে মতামত বাহির হইতেছে

দেশীয় লোকের এই মতামত একটু পড়িয়া দেখিলেই—সবই যে মোটের উপর দুইটিদলের মতামত তা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। দলের লোক সব চেনাই। দুইদলের দুই জনের মত পড়িলেই আর কিছু পড়িবার বড় দরকার হয় না। একজনের কথা পড়িলেই সকলের কথা পড়া হইল। তবে দুই একজন—একেবারেই দলো লোক নহেন যেন এইটুকু বুঝাইবার জন্য একটুখানি তানানানা ধরণে এদিকে ওদিকে টানিয়া দুই একটা ভালমানুষী কথা বলিতেছেন।

মডারেটদলের সকলেই বলিতেছেন, স্বায়ত্ত-শাসনের পথে অনেক দূর অগ্রসর হওয়া যাইবে,—আপাততঃ ইহাই বেশ এবং আদরে আমাদের ইহা বরণ করিয়া নেওয়া কর্ত্তব্য। তবে খাক্‌তি কিছু আছে, তাও শেষে পূরিবে। ইত্যাদি।

হোমরুল দল বলিতেছেন, না, ইহা কিছুই হয় নাই, সব ফাঁকিবাজি। দেশের লোকের প্রতি কেবল অবিশ্বাস। এ বাজে সংস্কার আমরা গ্রহণ করিতে পারি না,—করা উচিত নয়।—ইত্যাদি।

মডারেটগণ আনন্দে গ্রহণ করিতেছেন, বেশ করুন। তাঁহাদের সম্বন্ধে কি আর বলিব? হোমরুলদল বলিতেছেন,—গ্রহণ করিতে পারিব না। তাঁহারা কি করিবেন তবে? অবশ্য এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হওয়া—সে এখনও বিশবাঁও জলের তলে। যুদ্ধে জয়লাভ হইবে, তারপর ইংলণ্ডের ভদ্রমত মুখ্য সংবাদপত্র সমূহে আলোচনা হইবে, পার্লামেণ্ট আলোচনা হইবে, ক্যাবিনেট মন্ত্রিসভায় আলোচনা হইবে,—কত ছাঁট কাট হইবে,—শেষে হয়ত খোল নলচে দুই-ই বদলিয়া কি হুঁকা থাকিবে, কি হইবে, কে জানে? যাহাই হউক, একটা কিছু হইবেই। ধরিলাম, মোটামুটি এই রকমই একটা কিছু হইবে। যা হইবে, সেই অনুসারেই শাসনকার্য্য আরম্ভ হইবে। মডারেটদলে পাণ্ডারা কাউনসিলে যাইবেন, মন্ত্রী হইবেন। হোমরুলদল তখন কি করিবেন? তাঁহারা যে গ্রহণ করিলেন না,—তাহা কিপ্রকারে দেখাইবেন? কেবল গ্রহণ করি নাম না, করিব না বলিলেই ত হয় না। কার্য্যতঃ দেখাইতে হয়, গ্রহণ করা হইল না। আর তাও একআধজনে কিছু দেখাইলেও বা তাহাতে লাভ কি? রাজার লবণ আইনের উপরে [illegible] করিয়া রামা শ্যামা—কি সোণাউল্লা ফরজদ্দি আপন ঘরে আলুণি পান্তা খাইল। না হয় অমুক বাবু কি মিঞার অমুক, কি অমুক মৌলবীসাহেব, বিনা লবণে মাছভাজা, চপ কাটলেট, কি কোপ্তাকাবাব ভোজন করিলেন। কিন্তু তাহাতে লাভ কি হইল? দেশের সকলেই যে লুবণ খাইতেছে। যদি হোমরুল লীগ দলে পুষ্ট হইয়া দেশময় ছাইয়া পড়ে এবং হোমরুলের কেহ এই শাসনসম্পর্কে একেবারে না আসেন, ব্যবস্থাপকসভার সদস্যতার জন্য ভোটের লড়াই না করেন, বড় মন্ত্রীর কাজের জন্য নোলার জল না ফেলিয়া বেড়ান, তবে বলা যাইতে পারে যে গ্রহণ করা হইল না। সরকার পক্ষকে বেশ একটু উদ্বিগ্নও ইহাতে বোধ হয় করা যায়। কিন্তু ইহা সম্ভব হইবে কি? হোমরুলদলের এত ত্যাগ এতশক্তি আছে কি? যদি না থাকে, তবে গ্রহণ করিব না গ্রহণ করিব না বলিয়া এ বাগাড়ম্বর একেবারেই বৃথা,—হাসিবার কথা!

গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় মডারেটদল অথবা মডারেটদলের সহায়তায় গবর্ণমেণ্ট—কাহারও প্রভাব দেশের মধ্যে বড় কম হইবে না। বহু ধনী উচ্চপদস্থ প্রতিপত্তিশালী লোক মডারেটদলভুক্ত হইয়াছেন। রাজনীতিক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ যাঁহাদের নাম পূর্ব্বে কখনও দেখা যাইত না, তাঁহারাও অনেকে এখন এই শাসন-সংস্কার-প্রস্তাব উপলক্ষে মডারেট দলে নাম দিয়াছেন। রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদানে যাঁহারা আগে কিছু ভয় পাইতেন, তাঁহাদের ভয়ের কারণ দূর হইয়াছে। মডারেট দলভুক্ত হইয়া গবর্ণমেণ্টের সমর্থন করিলে, গবর্ণমেণ্ট তুষ্ট বই রুষ্ট হইবেন না। আগে রাজভক্তি এবং স্বদেশহিতৈষণা দুইয়ে বড় একটা বিরোধ ছিল। এই ব্যাপারে সে বিরোধ দূর হইয়াছে,—দেশহিতার্থে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়াও রাজভক্তি প্রদর্শন অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থন এখন বেশ হইতে পারে। কাউন্সিলে যাইবার বা মন্ত্রিত্বগাভের সুবিধাও ইহাতে হইবার বেশ আশা আছে। এ সুযোগ ঐশ্বর্য্যবান্ পদস্থ ব্যক্তিগণ—এমন কি রাজা জমিদার সম্প্রদায় পর্য্যন্ত ত্যাগ করিবেন কেন? ইঁহাদের অনুগত এবং রাজপুরুষগণের প্রসাদ-ভিখারী লোকেরও অভাব নাই। সকলে মিলিয়া সরকার পক্ষীয় অতি প্রবল ও জনবহুল এক মডারেট রাজনৈতিক দল গঠিত হইতে পারে ও হইবে। শাসন-সংস্কার গ্রহণ না করিলে যাহা

করিতে হয়, গ্রহণ না করার কথা যাহাতে সার্থক হয়, হোমরুলদল এই মহাবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাহা করিতে পারিবেন, এমন সম্ভাবনা দেখিতে পাই না।

সুতরাং এই শাসন-প্রস্তাব বা গ্রহণ করা যায় না, জিদ করিয়া এরূপ বলা না বলা সমান।

এই প্রস্তাবের মূল ত্রুটি ইহার মধ্যে ২০শে আগষ্ট তারিখে প্রতিশ্রুত প্রকৃত Responsible Goverment এর প্রজার নিকট দায়িত্বমূলক শাসন-প্রণালীর কোনও সূচনা এখন নাই। দূর ভবিষ্যতে সম্ভাব্য ক্ষীণ প্রতিশ্রুতির একটু আভাস মাত্র পাওয়া যায়। অবশ্য একথা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে পূরা Reponsible Government পাশ্চাত্যদেশে যেমন আছে তা এখনই আমাদের হইতে পারে না। দিলেও সেরূপ শাসন-প্রণালী আমরা চালাইতে পারিব বলিয়া মনে হয় না। কারণ, সে সংস্কার সে অভ্যাস আমাদের নাই। তবে আরম্ভ হইতে পারে। ক্রমে শক্তির পরিণতির সঙ্গে দায়িত্বের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া শেষে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে। কেন আমাদের এই শক্তি নাই, তার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; কারণ যাহাই হউক, একথা সত্য যে এ শক্তি আমাদের নাই। সুতরাং এখনই একেবারে পূরা স্বায়ত্ত-শাসন আমরা চাহিতেও পারি না, পাইতেও পারি না। তবে তার সূচনা এখনই হওয়া উচিত। এই ব্যাপারে এখন হইতেই কিছু কিছু শক্তি পরিচালনার অবসর আমাদের চাই। জলে না নামিয়া কেহ সাঁতার শেখে না, আবার সাঁতার না শিখিয়াও একেবারে অথৈ জলে কেহ ঝাঁপ দিতে পারে না। ঠাঁইজলে বিচক্ষণ অভিভাবকের পরিচালনাধীনে সাঁতার শিখিতে হয়, —শিখিয়া শেষে অথৈ জলেও লোকে ভাসিতে পারে। এ ক্ষেত্রেও আমাদের সম্বন্ধে সেই কথা। ঠাঁই জলে থাকিতে হইবে বটে,—কিন্তু সেই ঠাঁইজলে বৃটিশশক্তির অভিভাবকত্বে সাঁতার শিখিতে হইবে, কোমরজলে মাটিতে দাঁড়াইয়া কেবল নাচা কোঁদা করিলেই চলিবে না। বর্ত্তমান প্রস্তাব মোটের উপর সেই রকম ধরণের হইয়াছে,—সাঁতার শিখিবার কোনও ব্যবস্থা বড় ইহার মধ্যে নাই।

যাহা হউক, এই প্রস্তাব আশানুরূপ ও সন্তোষজনক হয় নাই সত্য,—কিন্তু তাই বলিয়া প্রস্তাব একেবারে গ্রহণ করা যাইবে না একথা বলিলেও চলিবে না,—বলাও নিরর্থক। এখনও আইন পাশ হয় নাই। আইন কি ভাবে হইবে তার নির্দ্দেশ হইয়াছে মাত্র। আইনে যাহাতে দায়িত্বমূলক শাসনের সূচনা হয়, তার জন্ম সকলের প্রবল আন্দোলন করা উচিত। যদি হয় ভাল, যদি নাই হয়, এই সংস্কার যদি অনিচ্ছায় ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়ার মতই হয়,—তবু হোমরুলদলকেও এখন ঘাড়ে তাহা তুলিয়া নিতে হইবে। ইহার মধ্যেই থাকিতে হইবে। থাকিয়া পরে যাহাতে আকাঙ্ক্ষিত অধিকার পাওয়া যায়, তার জন্ম প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। রাগ করিয়া দূরে থাকিলে চলিবে না,—তাহাতে কিছুই লাভ হইবে না।

অন্তরিনের কৈফিয়ত।

ভারতরক্ষী আইন প্রবর্ত্তনের পর হইতে অদ্য পর্য্যন্ত বাঙ্গলা দেশের অনেকগুলি যুবক, এবং কতিপয় প্রবীণবয়স্ক ব্যক্তিও বিপ্লববাদী বলিয়া ধৃত এবং অন্তরীণে আবদ্ধ হইয়া আছেন। ইহাদের মধ্যে কয়েকজন খালাস পাইয়াছে, কিন্তু বেশীর ভাগই জেলে আটক আছেন অথবা নানা স্থানে ইন্‌টার্ণ আছেন। ইঁহাদের দোষসম্বন্ধে প্রায় প্রত্যেক দরবারে আমরা লাট সাহেবের নিকট অনেক কথা শুনিতেছি। আবার ইহাও শুনিতেছি যে এই ভাবে আবদ্ধ ব্যক্তিদিগের উপর অনেক অত্যাচার হইতেছে। অত্যাচারের ফলে কেহ কেহ যুবক পাগল হইয়া গিয়াছে, কেহ কেহ আত্মহত্যা করিয়াছে, কেহ কেহ অস্বাস্থ্যকর স্থানে ভীষণ রোগযন্ত্রণায় ভুগিয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। দৈনিক ও সাপ্তাহিক ইংরাজী ও বাঙ্গলা কাগজে প্রতিদিন আমরা আবদ্ধ যুবকদের দুর্দ্দশার কাহিনীপূর্ণ চিঠিপত্র দেখিতে পাই। এইভাবে কথা বাহির হইয়া লোকের মনে এই আইন সম্বন্ধে একটা ভীষণ ভয়ের সঞ্চার করিয়াছে। গত কংগ্রেসের সময় শ্রীমতী বেসাণ্ট কলিকাতায় আসেন। তাঁহাকে সব কথা জানান হয় ও সকলের অনুরোধে তিনি বড়লাট বাহাদুরকে সব কথা জানাইয়া ইহার একটা তদন্ত করিতে অনুরোধ করেন। তাহার ফলে বাঙ্গালার লাটসাহেবের নির্দ্দেশ মত মাননীয় ষ্টিফেন্‌সন্ মুর ও স্যার বিনোদচন্দ্র মিত্রকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। তাঁহারা মিসেস বেসাণ্ট যে সব অত্যাচারের কথা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহার তদন্ত করেন এবং এই উপলক্ষে অন্তরীণে আবদ্ধ ব্যক্তিকে

ও পুলিশ কর্মচারীকে পরীক্ষা করেন। তাঁহাদের তদন্তের ফল লাটসাহেব গত ব্যবস্থাপক সভায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহা হইতে আমরা অবগত হইয়াছি, মিসেস বেসাণ্ট যে সব আবদ্ধ ব্যক্তির প্রতি যে যে অত্যাচারের কথা গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়া ছিলেন, তাহা ভিত্তিহীন ও সম্পূর্ণ অমূলক। ষ্টেট সেক্রেটারী মিঃ মণ্টেগু সাহেবের আগমন উপলক্ষে তাহাদের সকলকে ক্ষমা করিয়া মুক্তি দেওয়া হয় না। তাই তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া মিথ্যা গল্পের সৃষ্টি করিয়াছে।

দেশের লোকের মন হইতে ভয় দূর হয় এবং এজন্য যে অসন্তোষ জন্মিয়াছে তাহা শান্ত হয়, এই উদ্দেশ্যে এই রিপোর্টের কথা গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধু এবং এজন্য তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদার্হ।

কিন্তু এসম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি কথা আছে। বর্তমান অবস্থায় দেশে এইরূপ অসন্তোষ থাকা উচিত নয়, তাই স্পষ্ট ভাবেই সকল কথা আমরা বলিতে চাই। রিপোর্টে যে কৈফিয়ত বাহির হইয়াছে তাহা মোটের উপর শ্রীমতী বেসাণ্টের জ্ঞাপিত অভিযোগের উত্তর। কিন্তু অন্তরীণে আবদ্ধ ব্যক্তিগণের পক্ষে তাহাই মাত্র অভিযোগ নয়।

তারপর, শ্রীমতী বেসাণ্ট যেরূপ সব অত্যাচারের অভিযোগ করেন, ততখানি অত্যাচার ঠিক নাও হইতে পারে। কিন্তু ইঁহারা যে বহু অসুবিধা ভোগ করেন, অস্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিয়া অনেকে পীড়িত হন,—চিকিৎসার শুশ্রূষার সুবন্দোবস্ত হয় না,—নানারকম কঠোর নিয়মে ইঁহাদের সুখ স্বচ্ছন্দতার ব্যাঘাত হয়, আত্মীয়বান্ধবগণ অনুসন্ধান করিয়া সময় মত উত্তর কিছু পান না, অনেক সময় দেখা করিতেও বহু বিলম্ব হয়, কত বেগ পাইতে হয়, ইঁহাদিগকে যে খরচ দেওয়া হয়, তাহাতে ইঁহাদের চলে না,—এরূপ অনেক অভিযোগ কেবল কুতুবদিয়া বা চুরলরেকের নয়, আরও অনেক স্থানের অনেক অন্তরীণ ব্যক্তিবর্গের সম্বন্ধে সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে।

ইহারও অনুসন্ধান আবশ্যক। এই সব অভিযোগ সম্বন্ধেও সরকার পক্ষ হইতে পরিষ্কার একটা উত্তর বাহির না হইলে দেশের লোকের ভয় দূর হইবে না, অসন্তোষও যাইবে না।

কুতুবদিয়ার মোকদ্দমার ব্যারিষ্টার শ্রীযুত সি আর দাসের জেরায় পুলিশ সাহেবের মুখেই যে সব কথা বাহির হইয়াছে, তাহাও সন্তোষজনক নয়। Special Tribunal সমূহের বিচারও সুবিচার বলিয়া অনেকে গ্রহণ করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাদের এক সরাসরি রায়েই যে সকল কথার নিষ্পত্তি হইয়া গেল, দেশের লোক সুখী হইয়া সব কথা মানিয়া নিল, বলিবার আর কিছু রহিল না, এরূপ মনে করা যায় না।

আমরা চাই ব্যাপারটা একেবারে পরিষ্কার হইয়া যাউক,—দেশের লোক ইহা বুঝিয়া সন্তুষ্ট হউক, যে গবর্ণমেণ্ট যদি এই সঙ্কটকালে সন্দেহে কাহাকেও ধরিয়া রাখিতে বাধ্যও হন, তবে যাহাদের ধরিয়া রাখা হয়, তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে আছে, গুরুতর কোনও অসুবিধায় ক্লেশ কেহ পাইতেছে না,—রুগ্ন হইয়া পড়িলে, সুচিকিৎসারও সু-শুশ্রূষার অভাবে গুরুতর অনিষ্ট কাহারও হইবে না।

যে রিপোর্ট ও কৈফিয়ত বাহির হইয়াছে, তাহাতে এই সুফল ঘটিবে বলিয়া আমরা ভরসা করি না।

শিক্ষার ব্যয়—ব্যয়ের সার্থকতা।

আজকাল ছাত্রদের শিক্ষার সমস্যা অতি গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হাজার হাজার ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করিয়া সহরের কলেজ সমূহে প্রবেশলাভ করিবার চেষ্টা করিয়া বিফল হইতেছে। এ সম্বন্ধে আমরা মালঞ্চে ইতিপূর্ব্বে অনেকবার আলোচনা করিয়াছি। প্রথম বিভাগে যে সকল ছাত্র উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছে, তাহাদের সকলের স্থানও কলেজে হওয়া শক্ত হইয়াছে। কোন কোনও কলেজে ছাত্রদের পরীক্ষায় কত নম্বর পাইয়াছে, তাহাও জানাইতে হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগের ছাত্রদের কোনও কলেজ সহজে লইতে চাহেন না। ইহাই ত গেল মেট্রিকুলেশন পাশ ছাত্রদের কথা। তারপর নিতান্ত কম পক্ষেও ৫।৬ হাজার ছাত্র প্রতি বৎসর ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাশ করে। তাহাদের জন্যও কলেজ সমূহে স্থান সঙ্কুলান হয় না। দেশে উত্তীর্ণ ছাত্রের পরিমাণে কলেজের সংখ্যা অনেক কম। কাজেই কোন কলেজেই প্রথম বিভাগের ছাত্র পাইলে নিম্নতর বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র লইতে চাহেন না। এবং প্রত্যেক কলেজই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ বহু ছাত্র পান। কাজেই বহুছাত্রই কলেজে প্রবেশ করিতে না পারিয়া বিষম বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারে না। অবস্থা যাহাদের খারাপ তাহারা অল্প টাকার কোনও কর্ম্মের চেষ্টা করে। কেহ কেহ ১৫।২০ টাকা বেতনের কর্ম্মও লাভ করিয়া চিরকাল দুঃখে কাটাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসে।

তারপর কলেজে প্রবেশলাভ করিতে পারিলেও সকলের পক্ষে পাঠ চালাইবার সুবিধা খুব কম। যাহাদের অবস্থা খারাপ তাহাদের কলেজের পাঠ চালান যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার তাহা আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছেন। একশত জনের মধ্যে নিরানব্বই জন অভিভাবককেই ঋণ করিয়া ছেলেদের পড়ার খরচ চালাইতে হয়। বি এ, এম্ এ, পাশ করিয়াও আজকাল লোকের সহজে চাকুরী মেলে না। যাহা মেলে তাহারও বেতন বি, এর পক্ষে ৪০৲ হইতে ৫০৲ টাকা, এবং এম এ, র ৬০৲ হইতে ৮০।৯০৲—বড় জোর ১০০৲ টাকা। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সভ্যসমাজে বাস করিবার খরচও অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় অল্প বেতনভোগী অভিভাবকদিগের কম পক্ষে ৩০।৩২ টাকা মেসের খরচ তুলিয়া দিয়া ছেলেদের উচ্চশিক্ষা দেওয়া একরূপ অসম্ভব।

তারপর এবৎসর হইতে প্রায় সমস্ত কলেজই বেতন কিছু কিছু বৃদ্ধি করিয়াছেন। একে ত দেশের জীবিকা-সমস্যাই গুরুতর। তারপর যুদ্ধের জন্য প্রত্যেক দ্রব্যের মূল্য এত অধিক পরিমাণে বাড়িয়াছে যে মধ্যবিত্ত লোকের দুইবেলা আহার জোটাই অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লেখাপড়া করিতে যাহা যাহা দরকার, তাহার প্রত্যেক দ্রব্যের মূল্যই অসম্ভব রকম বাড়িয়াছে। কাগজ, কলম, পেন্সিল, বই প্রভৃতির মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা কতগুণ বাড়িয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। ইহার উপর আবার কলেজ সমূহ বেতন বাড়াইলেন। কলেজ-কর্তৃপক্ষেরা বিশেষ জ্ঞাত আছেন যে বেতন বাড়াইলেও তাঁহারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ছাত্র পাইবেন। কিন্তু তাঁহারা গরীব ছেলেদের কথা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? গরীবের ঘরের অনেক ভাল ভাল ছেলে, যাহারা উচ্চশিক্ষা পাইলে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিত, এরূপ অনেকেরই আশা ভরসা এব্যবস্থায় বিলুপ্ত হইবে।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হইতেছে যে ইহার কি কোনও মীমাংসা হইবে না? হাজার হাজার মেধাবী ছাত্রকে কি উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে মূর্খ হইয়া দুঃখে কষ্টে জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় সহজ হইবে না। দেশের বর্ত্তমান শিক্ষার ব্যবস্থা-বিধি ইহার প্রতিকূল। অন্যান্য দেশে ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রবেশ করিবার প্রশস্ত পথ আছে। এই সব শিক্ষার জন্যও বহু উচ্চবিদ্যালয় আছে। দেশের গবর্ণমেণ্টও এবিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশের অবস্থা অন্যরূপ। ব্যবসায়বাণিজ্য শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট বিশেষ কোনও চেষ্টা করিতেছেন না। এরূপ অবস্থায় একমাত্র উপায় দেশের শিক্ষিত জনসাধারণ দেশবাসিগণের সমবেত চেষ্টার উপর নির্ভর করিতেছে। আমাদের নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক আন্দোলন লইয়াই ব্যস্ত। তাঁহারা দেশের শিক্ষা-সমস্যা বা জীবিকা-সমস্যার দিকে মোটেই দৃষ্টি দিতেছেন না। আমরা বলিতে চাহি না যে রাজনৈতিক আন্দোলন ভাল নয়। কিন্তু কেবলমাত্র ঐদিকে দৃষ্টি দিলেই চলিবে না। তাহাতে দেশকে উন্নত করিবার অনেক কার্য্যই অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভে দেশবাসিগণের এদিকে একটু দৃষ্টি পড়িয়াছিল। সেই সময় জনসাধারণের সমবেত চেষ্টায় জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের লোককে সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এই যে এখন অনেকেই ইহার কথা ভাবেন না। এমন কি অনেকে ইহার অস্তিত্বও জানেন না। গত ১০।১২ বৎসর বহু বাধা বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিয়া জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ এখনও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া কিছু কিছু কর্ম্ম করিয়া যাইতেছেন। পরিষদের অন্তর্গত শিল্পশিক্ষার জন্য বেঙ্গল টেক্‌নিকাল কলেজের কথা বোধ হয় কেহ কেহ শুনিয়াছেন। এই কলেজ হইতে পাশ করিয়া যে যে ছাত্র বাহির হইতেছেন, তাঁহারা সকলেই বেশ কাজকর্ম্ম করিতেছেন, এবং তাহাদের কাজকর্ম্মও সহজেই জুটিতেছে। প্রায় সকলেই ৬০৲ টাকার উপরে বেতন পাইতেছেন। অনেকে ১০০।১৫০৲ টাকা বেতন পাইতেছেন, এমন কি দুই চারিজন ২০০৲ হইতে ২৫০৲ টাকাও মাসিক বেতন পাইতেছেন। অনেক সাহেবী ফার্ম্মও ইঁহাদের আদর করিয়া লইতেছেন। সাক্‌চির 'টাটা লৌহ কোম্পানীতে' বেঙ্গল টেক্‌নিকালের বহু উত্তীর্ণ ছাত্র সুখ্যাতির সহিত কাজ করিতেছেন। এই অনুষ্ঠানটির অবস্থা এখনও মন্দ নহে। শিক্ষার ব্যয়ও এখানে কম। মাসিক বেতন মোটে ৩৲ টাকা, মাসিক মোট খরচ ২০৲ টাকার মধ্যে হয়। কিছু কষ্ট করিয়া থাকিলে ইহার অল্পেও হয়, এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক একটি ছাত্রের ব্যয় ৩০।৩২ টাকা

কমে কিছুতেই হয় না। ভাল গরীব ছাত্রকে এখানে বিনা বেতনে পড়িবার সুযোগ দেওয়া হয়। দেশের অভিভাবকগণ যদি নিজেদের ছেলেদের উক্ত বিদ্যালয়ে পড়িতে দেন, তাহা হইলে খুব ভাল হয়। শিল্পশিক্ষা ব্যতীত কোন দেশেরই উন্নতি হয় না। আমাদের দেশে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা একরূপ নাই বলিলেও চলে। বিদেশে যাইয়া পড়ার ব্যয়ও অত্যন্ত অধিক এবং অতি অল্প সংখ্যক লোকের পক্ষেই ইহা সম্ভব। দেশের লোকের দৃষ্টি এই অনুষ্ঠানটির প্রতি পড়িলে শিক্ষা পরিষৎ ইহার অনেক উন্নতি করিতে প্রস্তুত আছেন। বহু ছাত্রও এই বিদ্যালয় হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া দেশকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে পারেন। দেশের অভিভাবকগণ এ বিষয়ে একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহার উপকারিতা সম্যক্ বুঝিতে পারিবেন।

কলিকাতা, মাণিকতলা পঞ্চবটী ভিলার, ৪৬নং মুরারিপুকুর রোড, এই স্থানে এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত। কেহ অনুসন্ধান করিলেই সকল বিবরণ জানিতে পারিবেন।

মেসোপটেমিয়ায় বাঙ্গালী সেনানীর দুর্ঘটনা।

বাঙ্গালী রেজিমেণ্টের সুবাদার অরুণকুমার মিত্রের মৃত্যু ও সুবেদার মেজর শৈলেন্দ্র বোস ও জমাদার আর, এল মুখার্জ্জীর আহত হইবার কথা সকলেই জ্ঞাত আছেন। সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে বাঙ্গালী সৈন্য যুদ্ধ করিতেছে এবং যুদ্ধেই সুবেদার মিত্রের মৃত্যু হইয়াছে ও সুবেদার মেজর বোস ও জমাদার মুখার্জ্জী আহত হইয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা বিডন স্কোয়ারে এক সভায় অরুণকুমারের মৃত্যুর জন্য শোক ও গৌরব প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে গত ৬ই জুলাই বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে যে কম্যিউনিক বাহির করিয়াছেন, তাহাতে জনসাধারণের মনে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে। কম্যিউনিকে প্রকাশ যে সম্প্রতি মেসোপটেমিয়ায় সুবেদার মিত্রের মৃত্যু ও সুবেদার মেজর বোস ও জমাদার মুখার্জ্জীর আহত হওয়া যুদ্ধ হইতে ঘটে নাই। এ ঘটনা রেজিমেণ্টের অন্তর্গত সৈনিকগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এবং ব্যক্তিগত বিবাদই ইহার কারণ। ইহাতে সকলেই যারপরনাই ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইয়াছে। কেন, কিরূপভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটিল, এ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় নাই। ইহাতে যারপরনাই

যাহা হউক কি কারণে এরূপ অতি দুষ্কার্য্য ঘটিয়াছে, ইহার সঠিক সম্পূর্ণ বিবরণ শীঘ্র প্রকাশ হওয়া উচিত। নানা প্রকার গুজব বাহির হইতেছে। গত ১১ই জুলাই তারিখের Daily News লিখিয়াছেন যে সাহেব মহলে গুজব যে বাঙ্গালী সৈন্য এখনও যুদ্ধলিপ্ত হয় নাই। এবং বহুকারণ ঘটিয়াছে যাহাতে এই রেজিমেণ্টকে যুদ্ধে কখনও পাঠান হইবে না। এরূপ আরও নানা প্রকার গুজব শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাতে সৈন্যসংগ্রহ কার্য্যের সমূহ ক্ষতি হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয়। যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট শীঘ্র এ সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ বাহির করিয়া জনসাধারণের মন হইতে আশঙ্কার নিবৃত্তি করুন।

দুষ্টের দমনে বাঙ্গালার পুলিশ।

শ্রীমতী সুভাষিণী দেবীর হরণ সম্পর্কিত দুই নম্বরের মামলাও শেষ হইয়াছে। অপরাধী বিশেশ্বর সাহার ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। পূর্ব্বে সুরবালা ও গায়ত্রীর ৭ বৎসর করিয়া কারাবাসের আদেশ হইয়াছিল। খুনের অপরাধে ফাঁসির হুকুম হয়। সেই অপরাধ সব চেয়ে গুরু অপরাধ বলিয়া গণ্য। কিন্তু আমাদের এদেশের লোক কুলবালার পক্ষে এই দুর্গতি মরণ অপেক্ষাও ভীষণ বলিয়া মনে করেন। পিতামাতা পর্য্যন্ত এইরূপ, দুর্গতি-কলুষিত অপেক্ষা কন্যার অপঘাত-মৃত দেহ দেখিয়াও সুখী হইবেন।

সুভাষিণী দেবীর দুর্গতির কাহিনী প্রকাশ যখন হইল, দেশে একটা তীব্র বেদনাপূর্ণ উত্তেজনার সাড়া উঠিয়াছিল। এই মোকদ্দমা দুইটির ফলাফল জানিবার জন্যও বড় একটা আগ্রহ দেখা যাইত। অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তিতে সকলেই যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছেন। এইরূপ শাস্তিতে যে এই পাপ অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে পুলিশকে এজন্য এইরূপ সতর্ক দৃষ্টিই রাখিতে হইবে।

কলিকাতার পুলিশ আজকাল এই পাপ দমনের জন্য যেভাবে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন—যে ভাবে প্রায় দিনের পর দিন এই সব পাপে পাপী ব্যক্তিরা ধৃত হইয়া দণ্ডনীতির অধিকারে আসিতেছে, তাহাতে অতি কৃতজ্ঞ ও সশ্রদ্ধ চিত্তে আমরা পুলিশকে ধন্যবাদ না দিয়া পারি না। এই ত পুলিশের কাজ! সাধারণতঃ পুলিশের উপরে এদেশের লোকের বড় একটা অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার ভাব আছে। সেটা

হইতে পুলিশই যে বিপন্নের রক্ষক এই ব্যাপারে এখন সকলেই তাঁহা অনুভব করিতেছে। সকল বিপদেই লোকে যদি এইরূপ রক্ষকরূপে পুলিশের উপরে ভরসা করিতে পারে, তবেই বাস্তবিক পুলিশের অস্তিত্ব সার্থক হয়।

সমাজ-শাসনে ব্রাহ্মণ।

কিসে জাতি যায়, কিসে যায় না, সমাজ নীতি লঙ্ঘিত হইলে কিরূপ অপরাধ কোন্ প্রায়শ্চিত্তে মার্জ্জিত হইতে পারে,—এসব বিষয়ের সুবিচার এখন হিন্দু সমাজে হয় না। সামাজিক কোন অপরাধ কাহারও হইলে অথবা হইয়াছে বলিয়া লোকে মনে করিলে স্থানীয় সামাজিকগণ অনেকটা খামখেয়ালী মতেই তার বিচার নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন। কখনও লঘু অপরাধে গুরু শাস্তি হয়, কখনও গুরু অপরাধীও নিষ্কৃতি পায়। আরও লজ্জার কথা ও দুঃখের কথা এই যে সমাজের এই শাসন দরিদ্র ও দুর্ব্বলকেই প্রায় পীড়িত করে, প্রতিপত্তিশালী ধনীকে বড় স্পর্শ করে না, সমাজের উপরে যদি সকলের স্বীকৃত বড় একটা শাসন-সংঘ থাকিত, তবে বিচ্ছিন্ন এই সব অত্যাচার অবিচার, ধর্ম্ম-শাসনের এই লজ্জাকর গ্লানি অনেক পরিমাণে দূর হইত। সকল জাতির সাধারণ সমাজনীতি যে সব, সে সবের সম্বন্ধে ব্রাহ্মণপণ্ডিতমণ্ডলীই সমাজ-শাসন-নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে পারেন। ইহা তাঁহাদের অধিকারে কিন্তু লোকের একটা সাধারণ ধারণা আছে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ অনুদার এবং যুগোপযোগী বিচারের ও বিধান দানের অযোগ্য। তাই তাঁহাদের শাসন কর্ত্তৃত্ব অনেকেই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নন।

কিন্তু দুইটি ঘটনায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এবং ব্রাহ্মণসভা যেরূপ বিচার করিয়া যেরূপ বিধান দান করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের উদারতার ও যুগোপযোগী বিচারদক্ষতার যথেষ্ট পরিচয় হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্তান্তে সুভাষিণী দেবীকে সমাজে পুনর্গ্রহণ করা যাইতে পারে, নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী সকলেই এই ব্যবস্থা দিয়াছেন। তারপর সম্প্রতি যশোহরে আর একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। একটি নমঃশূদ্র যুবক আপনাকে নৈকষ্য কুলীন বলিয়া পরিচয় দিয়া একটি দরিদ্র নৈকষ্য কুলীন ব্রাহ্মণকন্যার পাণিপ্রার্থী হয়। ব্রাহ্মণ সম্বন্ধটি গ্রহণ করিয়া বিবাহের আয়োজন করেন। বিবাহের দিন আসিল, কন্যার সম্প্রদান হইল,—কিন্তু তখন কোনও [illegible] রাখা হয়।

অনুসন্ধানে জানা গেল, বর ব্রাহ্মণ নয়, নমঃশূদ্র। কোনও কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে সে চাকর ছিল, তাহাদের আচারনিয়মও কথা বার্ত্তার ধরণ সব শিখিয়াছে। সম্প্রতি যশোহরে এই মোকদ্দমার বিচার হইয়া গিয়াছে। অপরাধীর কারাদণ্ড হইয়াছে। ওদিকে গ্রামবাসী সামাজিকগণ সেই দুর্ভাগ্য দরিদ্র ব্রাহ্মণকে জাতিচ্যুত করিয়া রাখিলেন, যদিও তাঁহার এই অপরাধ অপরাধই নয়। দুঃস্থ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ সভার যশোহর শাখার নিকট আবেদন করে। লঘু প্রায়শ্চিত্তান্তে সেই ব্রাহ্মণ সমাজে গৃহীত হইতে পারেন, সদস্যগণ এই ব্যবস্থা দিয়াছেন। তবে সেই কন্যাটি সম্বন্ধে তাঁহাদের কি ব্যবস্থা হইয়াছে, জানা যায় নাই। তার সম্বন্ধে তাঁহারা অবিচার করিবেন, এরূপ মনে হয় না।

যাহাহউক, এই দুইটি ব্যবস্থাতেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ অতি উদারচিত্ততার ও সুবিচারের পরিচয় দিয়াছেন। এইরূপ হইলে, আশা করা যায় ক্রমে ব্রাহ্মণমণ্ডলী সমাজ-শাসনে সার্থক কর্ত্তৃত্বলাভ করিবেন,—তাঁহাদের মর্য্যাদা বাড়িবে, সমাজেরও অনেক মঙ্গল হইবে।

বঙ্কিম-স্মৃতি।

এই পত্রখানি আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম। ইহার উপর কোনও মন্তব্য অনাবশ্যক। অমর বঙ্কিমের স্মৃতি রক্ষার জন্য কোনও আয়োজনে কি বাঙ্গালীর সহায়তার কোনও অভাব হইবে?

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে। আনুমানিক কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র টাকা ব্যয় করিলে উক্ত মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইতে পারিবে ভাস্করকে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে বলা হইয়াছে। প্রোক্ত উদ্দেশ্যের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমি পরিষদের সদস্যগণের নিকট এবং সহৃদয় বঙ্গবাসী মাত্রের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। যিনি যাহা দিবেন তাহা সাদরে গৃহীত হইবে এবং যথারীতি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইবে। সাহায্যের টাকা নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ,
২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

ভারতের অন্ধ।

ইয়ুরোপের প্রায় সকল দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষে অন্ধের সংখ্যা অধিক। ভারতবর্ষের বিভিন্নপ্রদেশের মধ্যে যুক্ত-প্রদেশ ও পঞ্জাবে অন্ধের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। বায়ুর শুষ্কতা, বাসগৃহের বায়ুসঞ্চালনের ব্যবস্থা না থাকা, অতি-রিক্ত উত্তাপ প্রভৃতি অন্ধতার কারণ বলা হয়। অন্ধত্বের কারণ অসংশয়ে বলা দুরূহ। তবে ইহাতে সন্দেহ নাই যে, বায়ুসঞ্চালনের ব্যবস্থাশূন্য গৃহে বাস করিলে চক্ষুর অনিষ্ট হয়। শীতের দিনে কখনও বা মশক তাড়াইবার জন্য লোকে আবার এইরূপ গৃহে ধোঁয়া দিয়া থাকে। উহাতে চক্ষুর অত্যন্ত অপকার হয়। ধূলিতেও চক্ষুর অত্যন্ত অপকার হয়।

নিম্নের তালিকা হইতে ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশের ১০ সহস্র নরনারীর মধ্যে কত জন অন্ধ তাহা দেখুন।

প্রদেশ।	দশসহস্র মধ্যে অন্ধ সংখ্যা।	
	পুরুষ।	স্ত্রী।
ভারতবর্ষ	১৩৮	১৪৫
আসাম	৯৪	৮৭
বঙ্গদেশ	৭৮	৬৩
বিহার	১১১	১০৪
বোম্বাই	১৩৬	১৫৩
ব্রহ্মদেশ	১৩১	১৫০
মধ্যপ্রদেশ	১৭৩	২৩৯
মান্দ্রাজ	৮৩	৮৯
পঞ্জাব	২৪৯	২৬১
যুক্তপ্রদেশ	২০৮	২৩৪
বরোদা	১২৯	২০৪
মহীশূর	১০৪	৯৪
ত্রিবাঙ্কুর	৪২	২৯

১৯১১ সালের আদম সুমারী হইতে উক্ত হিসাব প্রদত্ত হইল।

নানা বয়সের অন্ধত্ব তুলনা করিলে আর একটি বিষয় দেখা যায় যে, শিশুকাল হইতে প্রায় ৩৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পুরুষের মধ্যে অন্ধ সংখ্যা অধিক, আবার ৩৫এর ঊর্দ্ধবয়স্ক নারীদের মধ্যে অন্ধসংখ্যা অধিক। যথা:—

১০ সহস্র মধ্যে।

	পুরুষ।	স্ত্রী।
	৩৩	২৩
	৫৬	৩৮
১০—১৫	৭১	৫৩
১৫—২০	৮৮	৬৬
২০—২৫	১০১	৭১
২৫—৩০	৯৯	৮১
৩০—৩৫	১১৫	১১২
৪০—৪৫	১৬৯	১৯১
৪৫—৫০	১৯৫	২৩৫
৫০—৫৫	২৯২	৩৫১
৫৫—৬০	৩৪৫	৪৫০
৬০ এর অধিক বয়স্ক	৮০৬	৯৪০

সকল বয়সের হিসাবে ইহাই দেখা যায় যে ভারতে পুরুষ হইতে স্ত্রীজাতির মধ্যেই অন্ধ সংখ্যা অধিক। 'সঞ্জীবনী'।

ভারতরক্ষী ফৌজ।

বাঙ্গালার গবরমেণ্ট একটি কমিউনিক প্রচার করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, ভারতরক্ষী ফৌজে ভারতবাসিগণকে (ইউরোপীয়ান বাদে) পুনরায় প্রবেশ করার অধিকার ভারত গবরমেণ্ট প্রদান করিয়াছেন। চতুর্থ সংখ্যক কলিকাতা ইন্‌ফ্যাণ্টি তে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা এবং আসাম হইতে এক হাজার রংরুট গ্রহণ করার কথা মঞ্জুর হইয়াছিল। গত বৎসর ১২৫৮ জন লোক ব্যাটালিয়নে যোগ দিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া আবেদন করে; কিন্তু মাত্র ২০০ লোক যোগ দেয় এবং তন্মধ্যে মাত্র ৯৯ জন সামরিক শিক্ষার সময় উপস্থিত হয়। কলিকাতা ইউনিভার্সিটী কোর এবং বেঙ্গল লাইট হর্স এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই। "কলিকাতা ইউনিভারসিটী কোর"এ ১,০৯৯ খানি দরখাস্ত পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ৩১১ জন যোগ দেয়। বেঙ্গল লাইট হর্সে ৩৪৪ জন আবেদন করে এবং তন্মধ্যে ২০৮ জন যোগ দিয়াছে।

ইহা নাগরিক ফৌজ বলিয়াই গণ্য করা যাইবে। দেশের আভ্যন্তরিক অশান্তি নিবারণ জন্যই প্রধানতঃ এই ফৌজ কার্য করিবে। ভারতরক্ষী ফৌজের ভারতবাসী ও ইউরোপীয়ান উভয় সৈন্যগণের উপর সমভাবে এই কার্য্যের দায়িত্ব থাকিবে। কিন্তু যখন সংখ্যা পূরণ হইবে এবং সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইবে তখন এই ফৌজের ভারতবাসী সৈন্যগণের উপর দেশরক্ষার নির্দিষ্ট কোনও ভার দেওয়া হইবে। কাজেই বাহিনী পূর্ণ করার জন্য আবার ভারতবাসীদিগকে

ফৌজে লওয়া হইবে এবং যতশীঘ্র সম্ভব ফৌজে যোগ দেওয়া দরকার। কারণ শীঘ্র সামরিক শিক্ষা পাইবার সুযোগ মিলিবে। বাঙ্গালার গত বৎসরের ফল বড় নিরাশা-জনক হইয়াছে। কলিকাতা ব্যাটালিয়ন পূর্ণ করিতে বাঙ্গালা প্রদেশ হইতে আরও ৯১০ জন লোক চাই। বাঙ্গালা দেশে ইউরোপীয়ান বাদে অন্য ভারতবাসী ব্রিটিশ প্রজাই যোগ দিতে পারিবে। তবে নিম্নলিখিত সর্ত্তগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(১) ভারতীয় বাহিনীতে সাধারণতঃ যে শ্রেণীর লোক যোগ দেয় আবেদনকারী সেই শ্রেণীর লোক হইবে না; (২) সে নীচ জাতীয় লোক হইবে না; (৩) তাহার চরিত্র ভাল হওয়া চাই; (৪) তাহার বয়স ১৮ বৎসরের কম হইবে না এবং ৩০ বৎসরের বেশী হইবে না; (৫) ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে যতটা উচ্চতা, যতটা বুকের মাপ, দেহের মাপ ও গঠন দরকার ভারতরক্ষী ফৌজেও সেই নিয়মে মাপাদি চলিবে। বেতন মাসিক ১১৲ টাকা এবং প্রচলিত নিয়মে খোরাকী পাওয়া যাইবে।

দেশের আভ্যন্তরিক অশান্তি নিবারণ করিবার জন্য প্রত্যেক যোগ্য বাঙ্গালীরই যে এই ভারতরক্ষী ফৌজে যোগদান করা উচিত, একথা বলাই বাহুল্য। তবে একটি কথা। সাধারণ সিপাহীর যে বেতন আর খোরাকীর যে বরাদ্দ আছে, তাহা শিক্ষিত ভদ্রসন্তানদের পক্ষে বড় কম। ভারতরক্ষী সৈন্যদলে যাঁহারা একবার যোগ দিয়াছেন, যতদূর জানি, শিক্ষার সময় সকলকেই প্রায় ঘরের পয়সা কিছু খরচ করিতে হইয়াছে। আমাদের এ দরিদ্র দেশের পক্ষে তাহা অতি দুঃসাধ্য। সিপাহীর বেতন বাড়িবে, অনেক দিন অবধিই এই কথা শুনিতেছি। কিন্তু এখন ও বাড়িল না। আর কোনও কথাও সে সম্বন্ধে শোনা যায় না। বেতন এবং খোরাকীর বরাদ্দ না বাড়াইলে লোক যে বেশী হইবে, এমন ভরসা হয় না।

আরও একটি কথা আছে। ভারতরক্ষী ফৌজ সাধারণতঃ ভদ্রশ্রেণীর লোকদ্বারা গঠিত হইবে এবং তদনুসারে নিয়ম করা হইয়াছে যে ভারতীয় সাধারণ সৈন্য বাহিনীতে সাধারণতঃ যে শ্রেণীর লোক যোগ দেয়, ভারতরক্ষা ফৌজ দলে প্রবেশপ্রার্থী সেই শ্রেণীর লোক হইবে না। আমাদের বাঙ্গালী পল্টনে যে কোন শ্রেণীর লোক যোগদান করিবে তাহার কোন নির্দ্দিষ্টতা নাই—ভদ্র, ইতর শিক্ষিত, অশিক্ষিত সব শ্রেণীর লোকই ইহাতে যোগ দিয়াছে। এখন বিবেচ্য বিষয় হইতেছে যে ভারতরক্ষী ফৌজে তাহা হইলে কোন শ্রেণীর লোক যোগ দিবে। অন্ততঃ বাঙ্গালার পক্ষে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে হইবে।

আরও একটি কথা। স্থানীয় অশান্তি দমনের জন্য অধিক বয়স্ক (চল্লিশ হইতে পঞ্চাশ পর্য্যন্ত বয়সের) লোকদের সামরিক শিক্ষা দান করিতে ক্ষতি কি? ইঁহারা সাধারণ সৈন্যদলে যোগ দিতে পারেন না। তবে যাঁহারা সুস্থ ও সমর্থ, শিক্ষা পাইলে স্থানীয় শান্তিরক্ষায় উঁহারা যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারেন। এসম্বন্ধে কোনও সুব্যবস্থা হইলে বড় ভাল হয়।

ভারতে টাকা সঞ্চয় কি প্রকারে জার্ম্মাণদিগকে সাহায্য করিতেছে।

[বাঙ্গালার পলিটিকেল ডিপার্টমেন্টের প্রেস-সেন্সর অফিস হইতে 'মালঞ্চে' প্রকাশের জন্য আমরা ইংরাজীতে যাহা পাইয়াছি তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল]

"বর্ত্তমান যুদ্ধে ইংরাজের জয়ের জন্য 'আমি কি সাহায্য করিতে পারি,' এই প্রশ্নটি প্রতি ভারতবাসীরই মনে উদয় হওয়া উচিত। সহস্র সহস্র ভারতবাসী বহু যুদ্ধের কেন্দ্রে ইংরাজের সহিত সমভাবে বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতেছে সত্য, কিন্তু সকলেই কিছু যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে পারে না। কিন্তু সকলেই যাহাতে আমাদের সৈন্যগণ জয়ী হইতে পারে, তাহার জন্য কোন না কোন প্রকারে সাহায্য করিতে পারে। যুদ্ধে শত্রুগণ জয়ী হইলে, ভারতবাসীর কিরূপ নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইবে, তাহা ভুলিয়া গিয়া অনেক ভারতবাসীই পরোক্ষভাবে শত্রুর সাহায্য করিতেছেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় হইলেও সত্য কথা। একথাও সত্য যে কোন ভারতবাসীরই ইচ্ছা নয় যে সে শত্রুকে সাহায্য করে। তবে তাহারা যদি এমন কোন কার্য্য করে, যাহাতে আমাদের সৈন্যগণের আবশ্যকীয় যুদ্ধোপকরণ যোগাইতে বা তাহা লইয়া যাইবার পথে প্রতিবন্ধক হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে শত্রুকে সাহায্য করার ন্যায়ই মনে করিতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি কথা উল্লেখ করিলেই এই বিষয়টি সকলেই বুঝিতে পারিবেন, আশা করি।—রৌপ্যমুদ্রা প্রস্তুতের জন্য ভারতে অনেক রূপার আবশ্যক। ভারতবাসী যে পরিমাণে রৌপ্য মুদ্রা সঞ্চয়ের জন্য আবদ্ধ

করিয়া রাখিবে, অথবা উহা গলাইয়া গহনা প্রস্তুত করিবে, তত অধিক পরিমাণ রৌপ্য গবর্ণমেণ্টকে বিদেশ হইতে আনিতে হইবে, প্রকৃতপক্ষে ভারতবাসীর এই ব্যবহারের জন্য গবর্ণমেণ্টকে আমেরিকা হইতে গত দুইবৎসরে প্রায় পঞ্চাশ ক্রোর টাকা মূল্যের রৌপ্য আনিবার বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছে। ইহাতে দুই প্রকারে ক্ষতি হইয়াছে, প্রথম যে পঞ্চাশ ক্রোর টাকা অন্য প্রকারে নিয়োগ করিয়া বৎসরে অন্যূন প্রায় পাঁচ ক্রোর টাকা গবর্ণমেণ্ট লাভ করিতে পারিতেন, তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে। দ্বিতীয়, এই রৌপ্য আনিবার জন্য যে সকল জাহাজ নিযুক্ত করিতে হইয়াছে, সেই সকল জাহাজ অনায়াসে যুদ্ধ-উপকরণ প্রেরণের জন্য নিযুক্ত করা যাইত এবং গবর্ণমেণ্টের নূতন জাহাজ প্রস্তুতের অর্থগুলি বাঁচিয়া যাইত। আবার আমেরিকা হইতে ঐ সকল রৌপ্য সংগ্রহের জন্য যে সকল লোক আবশ্যক হইয়াছে, তাহারা যুদ্ধের কার্য্যের সাহায্যের জন্য অনায়াসে নিযুক্ত হইতে পারিত। স্বর্ণমুদ্রা সঞ্চয় বা গলান দ্বারাও প্রায় এইরূপ অসুবিধা ও অনিষ্টই হইতেছে। গভর্ণমেণ্টের এই টাকাগুলি অযথা ব্যয় না হইলে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে ট্যাক্স কমান বা ভারতের শিক্ষা-প্রভৃতির ব্যয়ের অধিকতর সাহায্য করা সম্ভব হইতে পারিত। ইংলণ্ডের প্রধান সচীব প্রকৃতই বলিয়াছেন—"Silver bullets will win the war"। ভারতের এই প্রথার সম্পূর্ণ বর্জ্জনদ্বারাই জর্ম্মানী এতদীর্ঘকাল যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে একথারও উল্লেখ করা উচিত যে জাপান প্রভৃতি দেশে অল্পমূল্যের নোটের বহুলপ্রচারদ্বারা ধাতুমুদ্রার ব্যবহার অনেক হ্রাস করিয়াছে। ভারতবাসীই এখনও ধাতুমুদ্রার ব্যবহারই সমধিক আদর করিতেছেন। ফলে ভারতের অর্থে অন্যান্য দেশ ঐশ্বর্য্যশালী হইতেছে। ভারতে মুদ্রার এই সঞ্চয়শীলতা, বস্ত্র, লবণ ও খাদ্য সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ। যুদ্ধের অনিষ্ট ব্যতীত ইহাতে ভারতবাসী তাহার নিজের আর্থিক ক্ষতিও করিতেছে।

যে দিক দিয়াই দেখা যাউক, এই মুদ্রাসঞ্চয়ের কোন সংযুক্তিই দেওয়া যাইতে পারে না। অন্য সমস্ত দেশেই মুদ্রা এইরূপ অযথা সঞ্চয়ে আবদ্ধ না রাখিয়া তাহার বাজারে অর্থাৎ আদানপ্রদানে লাভবান্ হইয়া সমস্ত জাতিটাকেই ঐশ্বর্য্যশালী করিতেছে। ন্যায়নিষ্ঠ ও প্রতাপশালী ভারত গভর্ণমেণ্টের অধীনে নিরাপদে টাকা লাগাইয়া প্রচুর লাভবান হইবার কত সুবিধা রহিয়াছে—যাঁহাদের টাকা যখন তখন আবশ্যক হইতে পারে, তাঁহারা পোষ্ট আফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা অনায়াসে লাগাইয়া আবশ্যকমত তাহা উঠাইয়া লইতে পারেন; যাঁহাদের টাকা শীঘ্র আবশ্যক হইবে না তাঁহারা 'ওয়ারবণ্ড' (War Bond) কিনিয়া নিজেও লাভবান হইতে পারেন, গভর্ণমেণ্টকে অর্থাৎ যুদ্ধব্যয়েরও সাহায্য করিতে পারেন। বাক্সে বা গহনায় ঐ টাকাগুলি আবদ্ধ রাখিলে সে লাভ হইবে কি? এই সামান্য কথাটি একটু চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিতে পারেন। অথচ এই সামান্য চিন্তার অভাবে—কতই না ক্ষতি, ভারতবাসী করিতেছেন। সামান্য বিষয়েও বিবেচনার অভাব যে কি প্রভূত অপকার করিতে পারে, তাহা ভারতবাসীর এই সঞ্চয়শীলতা স্পষ্ট প্রমাণ করিতেছে। সুতরাং আশা করা যায়—যে প্রত্যেক দেশহিতৈষী ব্যক্তি নিজে ত এইরূপ ক্ষতিজনক সঞ্চয় করিবেনই না, পরন্তু অপরকেও এই কার্য্য করিয়া দেশের শত্রু জর্ম্মাণীর সাহায্য করা হইতে নিবৃত্ত করিবেন।

রঙ্গ।

চুটকী।

চন্দ্রকান্ত।—শাস্ত্র একবার ব'লছেন, দশ বছরের মধ্যে মেয়ের বিয়ে না দিলে মহাপাতক হবে। আবার ব'লছেন সৎপাত্র না পেলে বড় বয়সই হ'ক, মেয়ের বিয়ে দেবে না। এটা কি রকম হ'ল ভটচাজ মশাই?

ভট্টাচার্য্য।—তা হ'বেই ত, তা হ'বেই—'নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং'—অর্থাৎ কিনা, এমন মুনি নাই যাঁর মত ভিন্ন নয়।

চন্দ্রকান্ত। তা যেন হ'ল—তবে কন্যা বয়স্থা হ'য়ে উঠল, কোন্ মতে চ'লব তবে?

ভট্টাচার্য্য।—তার জন্যে আর ভাবনা কি? 'মহাজনের মতেই চ'লবে। শাস্ত্রও ব'লছেন, 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।'

চন্দ্রকান্ত। তা বটেই ত, তা বটেই ত, চ'লতে ত তা হবেই, মহাজনের কথামত না চ'ললে কি আর উপায় আছে? এই ত কন্যাদায় ঘাড়ে—টাকা ধার ত আর দেবেই না—যা আছে তার জন্যেও অম্‌নি গিয়ে নালিশ দেবে—ঘর দোর সব নিলেম করে নেবে! এইবার শাস্ত্র ঠিক কথাই বলেছেন।

গৃহিণী।—হাঁগা, তখনই ব'লেছিলাম, মেয়েকে ইংরিজি টিংরিজি প'ড়তে দিও না,—তা আমার কোনও কথা কি শুনবে না?

কর্ত্তা।—কেন কি হ'য়েছে বল ত?

গৃহিণী।—ওর ত হিষ্টিরিয়া বাই হ'ল ব'লে।—

কর্ত্তা।—হিষ্টিরিয়া! সে কি? হিষ্টিরিয়া কেন হবে?

গৃহিণী।—হবে না? এই ত দেখে এলাম—ব'সে হিষ্টরী প'ড়ছে! হিষ্টিরিয়া বাই এতে হবে না?

বিমলা।—কৈকেয়ী কিনা দশরথের কাছে দুটি বর চাইলেন—

বামা।—মাগীর কি বুকের পাটা ভাই। সে হ'ল তার বর, আবার তার কাছেই চায় কি না আরও দুটো বর। ধন্যি মেয়ে বটে! তাই ত দশরথ পাপিষ্টে টাপিষ্টে ব'লে এত গাল দিলে,—শেষে মরেই গেল।

বিমলা।—দূর হ! কি ব'লে শোন না? ওলো এ ভাতার বর নয় লো, ভাতার বর নয়। এক বর চেয়েছিল, রামকে বনে পাঠাবে; আর এক বর চেয়েছিল, ভরতকে রাজা ক'রে দেবে।

বামা।—আমিও ত তাই ব'লছি, বরের ভ তার বর ত এমন অন্যায় কথা শুনবে না? তাই বাইরের দুটো নতুন বজ্জাত বর চেয়েছিল।

ঐতিহাসিক ভুল।

বাদসাহ জাহাঙ্গীরের সময় সার টামাস রো এদেশে তামাক আনেন,—তখন হইতে তামাকু সেবন প্রবর্ত্তিত হয়। ঐতিহাসিকদের একথা ভুল। অতি প্রাচীনকাল হইতে এদেশে তামাকু সেবন প্রচলিত ছিল। কারণ, দেখা যাইতেছে, অতি প্রাচীনকাল হইতে এদেশে নারিকেল আছে। নারিকেলের মালায় হুঁকার খোল হয়। সুতরাং নারিকেলের সৃষ্টি যখন বিধাতা এদেশে করিয়াছিলেন, তাহা যাহাতে ব্যর্থ না হয়, তারজন্য তামাকুগুল্মেরও সৃষ্টি অবশ্য তিনি করিয়াছিলেন, এবং সেই গুল্মপত্র যথারীতি প্রস্তুত করতঃ নারিকেল খোল সহযোগে কিরূপে সেবা করিতে হয়, সে বুদ্ধিও দেশবাসীর মনে নিহিত করিয়াছিলেন। ধান্য যে দেশে জন্মে, সেই দেশের লোক প্রাচীনকাল হইতে ভাত খায়। সুতরাং নারিকেল ফলোৎপাদিত হুঁকায় খোল যেদেশে জন্মে, সেদেশের লোক কেন প্রাচীনকাল হইতে তামাকু সেবন করিবে না?

টীকা ও টিপ্পনী।

নেশা।—নিশায় ইহা প্রশস্ত—তাই ইহার নাম 'নেশা'!

সুরা।—সুর অর্থাৎ দেবতাদের ইহা সুপেয়—তাই ইহার নাম 'সুরা'।

মৃত্যু।—মৃৎ শব্দের উত্তর ত্যু প্রত্যয়—পরিণতি অর্থে অর্থাৎ ইহার পর দেহ মৃৎ বা মৃত্তিকায় পরিণত হয়, তাই ইহার নাম 'মৃত্যু'।

[কবর দিলেই দেহ মৃত্তিকায় পরিণত হয়, অগ্নি সংকারে হয় না, সুতরাং কবরেই মৃত্যুর সার্থকতা হয়, তাহাই প্রশস্ত, ইতি পৌরবিদুষাং মতঃ—(পৌর পুরাকালীয় ইত্যর্থঃ।)]

সত্য।—'সৎ' অর্থাৎ যাহা আছে—তাহাই 'সত্য' মিথ্যাও আছে সুতরাং তাহাও সত্য। 'অসৎ' অর্থাৎ যাহা নাই—সুতরাং—'অসৎ' কথাই আসল মিথ্যা,—'অসৎ' বলিয়া কিছু নাই।

মুমূর্ষু।—'মৃ' ধাতুর উত্তর ইচ্ছার্থে সনন্ত করিয়া হইয়াছে 'মুমূর্ষু'—অর্থ, মরিতে ইচ্ছুক। কিন্তু মরিতে কেহই ইচ্ছা করে না, সুতরাং 'মুমূর্ষু' কেহ নাই—এক আত্মহত্যা-প্রয়াসী ব্যতীত।

কর্ম্মকারক।—কর্ম্ম যে করে, সেই কর্ম্মকারক 'রাম সীতাকে বিবাহ করিলেন,' এইবাক্যে—সীতাকে বিবাহরূপ যে কর্ম্ম তাহা কে করিলেন, না রাম। সুতরাং 'রামই' এখানে কর্ম্মকারক। কর্ত্তা মাত্রই কর্ম্মকারক। সকল কর্ত্তাকে যিনি করিয়াছেন, সেই বিধাতৃপুরুষ ব্যতীত 'কর্ত্তৃকারক' আর কেহ নাই।

সুমধ্যমা।—সু অর্থাৎ উত্তম মধ্য যাহার সেই নারী। যাহা বৃহৎ বা বিপুল তাহাই উত্তম, যথা পর্ব্বতোত্তম—হিমালয়। সুতরাং বিপুলমধ্যা বা স্থূলোদরী নারীই সুমধ্যমা। প্রমাণ যথা 'সুশ্রোণি'।

শাদা ও কাল।—শাদা হইল সকল বর্ণের সমবায় পুরা 'সৎ'। কাল হইল সকল বর্ণের অভাব—একেবারেই অসৎ। সতে অসতে কখনও মিলন হয় না। সুতরাং শাদায় ও কালায় মিল হইবে কেন?



৫ম বর্ষ আশ্বিন—১৩২৫। ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আগমনী।

এস মা হৈমবরণী !

বেধেছে খোঁপা, দেবী ভগবতী ত্রিনয়না বরণী।
বিরহ কাতর আঁখি ধারা মুছি নীল অঞ্চলে আজি,
শুদ্ধ ধৌত শ্যাম দেহখানি অরুণ কিরণে আজি
ধরণী এনেছে পূজার অর্ঘ মণ্ডপ দ্বারে তব,
গগনে, পবনে উঠেছে ধ্বনিয়া বোধন শঙ্খ রব।
শরতোজ্জ্বল নির্ম্মল-নীল উদার গগন তল
হীরক খচিত চন্দ্র আতপ করিতেছে ঝল মল।
জননী-চরণ-চুম্বন-সাধ ধরার বক্ষ ভেদি,
পর্ব্বত হ'য়ে উঠেছে ফুটিয়া রচিতে তোমার বেদী।
অন্ধকারার কঠিন বন্ধ ভেঙ্গেছে নির্ঝরিণী।
ধৌত করিতে চরণ যুগল ত্রিলোক নিস্তারিণী।
সরসীর জল আরসী হয়েছে ধরার মর্ম্মতটে,
বিশ্বদেবীর প্রকাশ মুকুলিত দল পটে
পঙ্কজ ছলে উঠেছে ফুটিয়া, মুক্তির মধু বুকে
মুগ্ধ মানস-ভৃঙ্গ পড়িয়া চরণে লুটিছে সুখে।

বিশ্বমেনকা দুয়ারে দাড়ায়ে কৈলাশ পানে চাহি
জননীর স্নেহ কাঁদিয়া উঠেছে তব আগমনী গাহি।
ক্ষতমুখে আজি শোনিত ছুটেছে বারণ মানেনা আর,
রক্তের ক্ষীর গঙ্গা, যমুনা হয়ে গেছে একাকার।

এস মা হৈমবরণী !

অকাল বোধনে, ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিছে তোমারে ধরণী।
স্বর্ণমৃগের মরিচিকা মোহে পড়িয়া সোণার ফাঁদে,
অত্যাচারের অশোক কাননে এখন জানকী কাঁদে।
হাহাকার কত পঞ্চবটীর মিশিছে আকাশ তলে
ভেসে যায় কত চিত্রকুটের শিখর নয়ন জলে
কোন দশাননে, সমরাঙ্গনে কোলে করে আছ জননী
বিরহ ব্যথিত নর-নারায়ণ কাঁদে যে গো দিবা রজনী।
ভক্তি নাহি মা শক্তি নাহি মা, দুঃখ তো আছে হৃদয় ভরা
নীল পদ্মের সংখ্যা পুরাতে দিব উপাড়ি আঁখির তারা।
তা বলে কি জীব পাবে না তোমারে ওগো জীব দুঃখহরণী।
অকাল বোধনে, ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকে জগ তোমারে, এসো

শ্রীগোপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

পূজা ও পূজায় বাঙ্গালা।

সম্বৎসর চলিয়া গেল, আবার বাঙ্গালায় পূজা আসিল। বাঙ্গালায় পূজা কেবল মহাদেবী মহাশক্তির সাত্ত্বিক উপাসনা নয়,—আনন্দময়ীকে লইয়া বড় একটা আনন্দময় রাজসিক উৎসবও বটে। তাই তাঁহার ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী মহামহিমাময়ী রাজসীমূর্ত্তির কল্পনা এই উপলক্ষে হইয়াছে।—পূজায় গীতবাদ্য, ভোগবলি, পানভোজন, ভোজদান, শোভাযাত্রা, রঙ্গক্রীড়া, বসনভূষণ সজ্জা—কত আড়ম্বর—কত প্রমোদের ব্যবস্থাও হইয়াছে। বহু যুগ ধরিয়া বাঙ্গালী বাৎসরিক এই মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিতেছে, প্রবাসের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে প্রমত্ত হইয়া গৃহাভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছে,—গৃহাগত প্রবাসী সন্তানগণের উল্লাস কোলাহল উৎসববাদ্যের সঙ্গে মিলিয়া পল্লীভূমিকে মুখরিত করিতেছে! কিন্তু ক্রমেই এ মহাধ্বনি যেন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। পল্লী ভরিয়া সে বাদ্য আর বাজে না, নিশীথে চারিদিকে সেই বাদ্যধ্বনি শুনিতে শুনিতে আনন্দশয্যায় আর তেমন করিয়া বাঙ্গালী ঘুমায় না,—প্রভাতে চারিদিকের তেমনই বাদ্যধ্বনির মধ্যে জাগিয়া আর সেই পুলকে তার দেহে রোমাঞ্চ হয় না। সে শক্তি নাই, সে উদ্যম নাই, কর্ম্মক্লান্ত রোগজীর্ণ তার দেহ,—বহু দুঃখে, বহু দুশ্চিন্তায় অবসন্ন তার মন—উৎসব তার কাছে প্রাণহীন অনুষ্ঠান মাত্র। প্রাণ তাহাতে মাতিয়া উঠে না।—প্রমোদের ক্লান্তিভারটুকুও তার ক্ষীণদেহে দীনমনে সে বহিতে পারে না। অতি দরিদ্র—অনুষ্ঠানটুকুরও আয়োজন সে তেমন করিতে পারে না,—আজকালকার এমন সুগম পথেও প্রবাস হইতে সে বড় গৃহে যাইতে পারে না। বহু রোগদুষ্ট হীনকলহে অশান্ত পল্লীতে—যে পারে সেও যাইতে চায় না। উৎসব যাহারা করে, উৎসবের মত আনন্দে কিছুই করে না, বার্ষিক একটা দায়ের মত কোনও কাজ সারে।

কত বৎসর ধরিয়া এমনই চলিতেছে। উৎসব দীন হইতে দীনতর—সকল আয়োজন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে। এবার যে দুর্ব্বৎসর আসিয়াছে, এমন দুর্ব্বৎসর কাহারও স্মৃতির মধ্যে কখনও এদেশে আসিয়াছে কি না সন্দেহ। কত দুঃখ দারিদ্র, কত রোগ শোক, কত অভাবের নিয়ত হাহাকার ত সাধারণ অবস্থার মতই এখন হইয়া উঠিয়াছে। তারউপর চারিবৎসর এই মহাযুদ্ধের মহাদুর্গতি ক্রমেই আসিয়া আমাদের দুর্ব্বল স্কন্ধে চাপিয়া পড়িতেছে। দেশে টাকা নাই। কৃষকের বড় সম্বল পাটের বাজারে দর নাই। চাউলের বাজারও নরম—কৃষকের মুজুরী পোষায় না। কৃষকের টাকা জমিদারের টাকা,—তাঁহাদেরও তহবিল খালি, শুধু কতকগুলি বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের ব্যতীত ব্যবসায়ের অবস্থাও বড় মন্দ। সেই সব ব্যবসায়ে যাহারা কাজ করিয়া খাইত, তাহারা অনেকেই বেকার হইয়া পড়িয়াছে। অর্থাগমের এই অবস্থা, তার উপরে ব্যয়ের প্রয়োজন বাড়িয়াছে। দরকারী জিনিষপত্র সবই মহার্ঘ হইতেছে। চাউল সস্তা ছিল,—কৃষকের ক্ষতি যাই হউক, অন্যান্য দরিদ্রের কিছু সুবিধা হইয়াছিল,—তারও দাম হঠাৎ চড়িয়াছে। এ চড়া দামে কৃষকের লাভ কিছু নাই, কারণ তার ক্ষেত বা ঘর হইতে ধান চাউল অনেক আগেই বাহির হইয়া সস্তাদরে মহাজনের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে,—লাভ এখন যা, তা মহাজনের। তার পর সমরঋণের টান আছে। যে কিছু পারে, সেই কোন্ না দিতেছে, না দিয়া পারিতেছে? সকলের উপরে কাপড়। কাপড়ের দুঃখে দেশময় হাহাকার উঠিয়াছে! চারিদিকে আন্দোলন আলোচনা বেশ জোরেই হইতেছে। কিন্তু রসনার বা লেখনীর এ জোরে কাপড়ের দর কমিতেছে না। পূজায় সকলে নূতন কাপড়ে সাজে; হায়! এবার পুরাতন ছিন্নবস্ত্রখণ্ডেও যে কটি আবৃত করিয়া কত লোক ঘরের বাহির হইতে পারিবে না? পূজার অনুষ্ঠানে কাপড় লাগে, ঘরের আপনার জনকে না দিলেও আশ্রিত অনুগত লোকদের কাপড় দিতেই হয়। যাঁদের পয়সা কিছু আছে,—তাঁহারাও মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছেন, কি উপায় করিবেন।

এই ত আগামী পূজার উৎসব আনন্দের ছন্দে অনেক দিন অবধিই দেখা যাইতেছিল। ইহার উপর আর এক দৈব উৎপাত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে—বন্যা। উত্তরবঙ্গ প্রায় সব বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। হাজার হাজার

গৃহস্থ গৃহহীন হইয়া পথে বসিয়াছে,—গৃহ নাই, অন্ন নাই, বস্ত্র নাই—নূতন কিনিয়া নিবার অর্থও নাই। শীঘ্রই হয়ত মহামারী আরম্ভ হইবে,—ঔষধ পথ্য—রোগীর একটু শয্যা আচ্ছাদনও হয়ত জুটিবে না! উঃ! এই অবস্থা—এক আধটি লোকের নয়—গ্রামে গ্রামে হাজার হাজার গৃহহীন গৃহস্থ পরিবারে—কত নারী কত পুরুষ, কত রুগ্ন জীর্ণ বৃদ্ধবৃদ্ধা আহা, কত অবোধ কোমল শিশু কত খেলা-ধূলার বালক বালিকা—তাদের এই সব দৃশ্য—উঃ! কল্পনা স্ফুরিতেও প্রাণ যেন বিষমাখা কাঁটার ঘায়ে পাগল উঠে।

শুধু মা—মহামায়া। একি লীলা তোমার মা! তোমার আনন্দময়ী মহিমাময়ী মূর্ত্তি লুকাইয়া কেন আজ মহাকালীর করালী মূর্ত্তি ধরিলে? সেই যে দশভূজা দশপ্রহরণধারিণী সিংহবাহিনী মূর্ত্তি তোমার—তাতেও তুমি অসুর-নাশিনী! কিন্তু তবুও সে মূর্ত্তি কি উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়ী কি প্রাণোন্মাদন মহিমা তাহাতে বিরাজিত, কি ভুবনমোহন হাসি সেই কোটি ইন্দু-প্রভ আননে! শ্রী, বিদ্যা, শৌর্য্য, সিদ্ধি—মূর্ত্তি ধরিয়া দুইধারে বিরাজিত। দানবদলনেও সেই রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি,—আর এই মহাঘোরা, নগ্না, নৃমুণ্ডমালা, নৃমুণ্ডকরা নৃকর-মেখলা, ঘোর রক্তনেত্রা, রক্তপানে বিকট রক্ত-দশনা, রক্তরঞ্জিত লোলরসনা, করালী কালী মূর্ত্তি! সে মূর্ত্তি-লীলা যে দানবদলনে তোমার ঐশ্বর্য্যপ্রতিষ্ঠার লীলা। আর এই মূর্ত্তি না—এযে কেবলই মহামায়ার লীলা—সংহার-দণ্ডের ভীম সংঘাতন খেলা। এই লীলা—এই মূর্ত্তি কেন আজ তোমার মা!

আমরা জড়, আমরা প্রাণহীন, একেবারেই তমো-দানবাশ্রিত! সহস্র বেদনার সহস্র আঘাতেও জাগি না, জাগিয়া উঠিতে পারি না,—জাগিতে জাগিতে আবার ঘুমাই—উঠিতে উঠিতে আবার পড়িয়া যাই। তমোগ্রস্ত আমরা—তামস অধিকার পূর্ণ হইয়াছে,—তাই কি তোমার রাজসী মূর্ত্তি একেবারে লুকাইয়া মহাতামসী মূর্ত্তিতে দেখা দিলে? তমোগ্রস্ত আমরা, পূর্ণ তামসাধিকারে আমরাই কি আজ তোমার এই তামসী মূর্ত্তি আকর্ষণ করিলাম মা! তাই যদি হয়, এসময় তোমার এই আগমন সার্থক হউক! এ মূর্ত্তি ত তোমার নিদ্রার মূর্ত্তি নয়, নিদ্রা ভাঙ্গিতে প্রচণ্ড সংঘাতনী মূর্ত্তি! ঘোর ভীমনয়নে তোমার বিশ্বদাহন অগ্নি, করাল কালমুখে বিশ্ববিনাশন হুঙ্কার বিশ্বত্রাস অট্টহাস, উত্তোলিত করে তোমার ঘোরঘাতন খড়্গ, নগ্নবক্ষে মুণ্ড-মালা, নগ্নকটিতে করমেখলা! চরণ তলে তোমার শব—দলনে শিবরূপে জাগিয়া উঠিতেছে! এস মা! মোহনিদ্রা ভাঙ্গিতে অমনই হুঙ্কার ছাড়, বিশ্বত্রাস অট্টহাসে জড়প্রাণ কম্পিত কর! এস মা, ওই খড়্গাঘাতে অসাড় দেহ ছিন্ন ভিন্ন কর, হীন শির কাটিয়া গলায় পর, ক্ষীণ ছিন্নকরে কটিতে নূতন মেখলা ধর! রক্ত-কর্দ্দমলুণ্ঠিত দীন শবগুলিকে পায়ে দলিয়া জাগ্রত জীবন্ত শিবময় জীবে ধরায় আবার উদ্ভূত কর!

তামসী লীলা তোমার পূর্ণ হউক, অবসান হউক! রাজস অধিকারে আমাদের লইয়া যাও! রাজস ভাবের টানে তোমার রাজসী মূর্ত্তি তখন আকর্ষণ করিব। মা আসিয়া পারিবে কি মা? তখন রাজস মহিমায় মহিমাময়ী রাজসী মূর্ত্তিতে তোমার পূজা করিব—রাজস উৎসবে মাতিব।

এখন যে পূজার চেষ্টা করিতেছি—এত স্বপ্নমায়া! রাজসী মূর্ত্তি তোমার মাটিতে গড়িতেছি, কিন্তু রাজস প্রাণ কোথায় তাহাতে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেছি। সে প্রাণ আমাদের কোথায় যা দিয়া ও মূর্ত্তিতে তাহা প্রতিষ্ঠা করিব? এ ত শুধু তামস প্রাণে মাটির গড়া প্রাণছাড়া তামসী মূর্ত্তিতে মিথ্যা পূজা এ পূজা যে কত বৃথা—তাই বুঝাইবার জন্যই কি না উৎসবে আজ এই ঘোর আঁধার নিরানন্দ আনিলে—তোমার তামসী মূর্ত্তি এবার এমন করিয়া প্রকট করিলে? ইচ্ছাময়ী! তোমার ইচ্ছাই তবে পূর্ণ হউক মা!

কংগ্রেসের কথা।

বোম্বে নগরে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হইয়া গেল। মডারেট প্রধানগণ অনেকেই যান নাই, তবু কংগ্রেস হইল—বেশ ভাল জাঁকাল ভাবেই হইল। গত কলিকাতার কংগ্রেসে ভারতমহামানবপ্রাণ যে ভাবে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিল, বোম্বের এই কংগ্রেসে তার চেয়ে কম আপনাকে প্রকাশ করে নাই। মডারেটগণ যান নাই, এই ভারতমহামানব-প্রাণের প্রকাশমান মূর্ত্তি হইতে তাঁহারা সরিয়া খসিয়া পড়িলেন না কি? কোথায় তাঁহাদের স্থান হইল? ভারতের প্রাণে নয়, বাহিরের এক প্রভুশক্তির চরণপ্রান্তে! হউক, ভারতের এই মহামানবপ্রাণে কোথায় তাহাতে একটু ক্ষত হইয়াছে কি একটু দাগ কোথায় পড়িয়াছে? তাঁহারা কি না, শুধু মৃতচর্ম্মের বস্তুই খসিয়া

পড়িয়াছেন! কোথাও কোনও ক্ষত হয় নাই, কোনও অঙ্গ পড়ে নাই! কোনও বেদনার লক্ষণ পর্য্যন্ত কোথাও প্রকাশ পায় নাই। ভারতের সমবেত জাতীয় প্রাণ কংগ্রেসকে ধরিয়াই জাগিয়া উঠিয়াছে। কংগ্রেসই এই জাগ্রত প্রাণের মহিমাময় মূর্ত্তিরূপ। জীবন্ত এই মূর্ত্তি-রূপ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া, কোনও ক্ষত, কোনও বেদনা না রাখিয়া যে বিচ্যুত হইয়াছে, এই প্রাণের সকল সাড়া হারাইয়া মৃত অঙ্গাংশের মতই সে পড়িয়া গিয়াছে—বলিতে হইবে। স্বেচ্ছায় যাঁহারা বিচ্যুত হইলেন, জাতীয় জীবনে তাঁহারা সত্য আত্মহত্যাই করিলেন।

একষ্ট্রিমিষ্ট বা চরমপন্থী কংগ্রেস বলিয়া মডারেটগণ যতই এই কংগ্রেসের গ্লানি করিতে চেষ্টা করুন, শাসন-সংস্কার প্রস্তাব সম্বন্ধে কংগ্রেসে যে মন্তব্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে ইহাই সিদ্ধ হইয়াছে, কংগ্রেস কোনও দল বিশেষের সভা নহে, ভারতের জাতীয় মহামিলন-ক্ষেত্র—যেখানে সকল মতের সমন্বয় হইতে পারে, যেখানে সকল দলের সমান স্থান সমান অধিকার আছে—সকল মতের সমাধি বিচারের অবসর আছে। যাহারা একষ্ট্রিমিষ্ট বা উষ্ণমস্তিষ্ক চরমপন্থী বলিয়া নিন্দিত, তাঁহারাই দেখাইয়াছেন, একষ্ট্রিমিজম্ বা অধীর চরমতা তাঁহাদের কিছু নাই। তাঁহারাই প্রকৃত মডারেট, বিভিন্ন মতের সমন্বয় তাঁহা-রাই করিতে পারেন। দেশের কাজে দশের মতে যে সামঞ্জস্য করিয়া চলিতে হয়, তাঁহারাই তাহা পারেন,—দেশের সেবায় বাস্তবিক কাজে তাঁহাদেরই অধিকার আছে। মডারেটগণই কংগ্রেস ছাড়িয়া প্রকৃত একষ্ট্রিমিষ্টের আচরণ করিয়াছেন। এংলো ইণ্ডিয়ানদের কাছে তাঁহারা যতই নরম ও মোলায়েম বলিয়া প্রীতিভাজন হউন, দেশের কাছে অধীর একষ্ট্রিমিজম্ তাঁহারাই দেখাইয়াছেন।

কংগ্রেসে তাঁহারা যোগ না দিলেই দেশের মঙ্গল—এ মঙ্গল তাঁহারাই কয়জনে বুঝিয়াছেন, আর কেহ বোঝে নাই—এই কথা বলিয়া তার প্রমাণে যে সব যুক্তি তাঁহারা দেখাইয়াছেন, তাহাতে যে সারবত্তা কতদূর আছে, গত সংখ্যায় তাহার আলোচনা আমরা করিয়াছি। পুনরা-লোচনা নিষ্প্রয়োজন। নিজের স্বার্থ নিজের মতলব ছাড়িয়া দশের সঙ্গে মিলিয়া দেশের কাজ যাঁহারা করিতে চান, বিবিধ মতের একটা সামঞ্জস্য তাঁহাদের করিয়া নিতেই হয়। 'মডারেট' নাম ধরিয়াও মডারেটেরা তাহা পারিলেন না।

ব্যক্তিগত ভাবে হোমরুল দলের প্রধানগণ কেহ কেহ পূর্ব্বে যেমনই প্রকাশ করিয়া থাকুন, কংগ্রেসে কোনও জিদ তাঁহারা না করিয়া দশের মতে এমন একটা সামঞ্জস্য করিয়া নিয়াছেন যে নিতান্ত গোঁড়া বা মতলববাজ কেহ ব্যতীত এ মন্তব্যে তেমন কোনও আপত্তি করিতে পারে না। তাই প্রথম প্রথম মডারেটগণ এই মন্তব্য পড়িয়া একটু কেমন চমকিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা বোধ হয় আশা করিতে-ছিলেন, চরম দল গরম মেজাজে এমনই একটা রিজো-লিউশন পাশ করিয়া ফেলিবে, যাহা দেশের ধীরবুদ্ধি কেহই সমর্থন করিবেন না,—বাড়াবাড়ি করিয়াই আপনাদের মত ও দল দুইই তাহারা হাল্কা ও হাস্যাস্পদ করিবে। আরও বোধ হয় আশা করিয়াছিলেন, কংগ্রেসটাই একটা বাজে ছেলে খেলার ব্যাপারের মত—লোক হইলেও একটা 'মব' (mob) এর মেলার মত হইবে। তার কিছুই হইল না। দৃশ্যের মহিমায় ও ভাবের গুরুত্বে কংগ্রেস ভারতের কংগ্রেসের মতই হইল,—মন্তব্য যাহা পাশ হইল, তাহাতেও গোঁড়ামি কিছু নাই, ছ্যাবলামি কিছুই নাই; কোনও দিকের জিদ লইয়া অসঙ্গত বাড়াবাড়ি কিছু নাই,—ধীরবুদ্ধি সকলেই তাহা নিরপেক্ষ ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন।

তাই যেন অপ্রতিভ হইয়া তাঁহাদের কেহ কেহ বলিয়া-ছিলেন, আমরা যাই নাই তাই ওরা ভড়কিয়া গিয়া ওই রিজোলিউসন পাশ করিয়াছে। ভালই হইয়াছে।—গেলে কি আর ইহাহ হত? ওরা সংস্কার প্রস্তাবকে একেবারেই 'গোটেল' করিয়া বাড়াবাড়ি একষ্ট্রিমিষ্ট রিজোলিউশনই পাশ করিত।

কাজেই! একটা কিছু বলাত চাই! নইলে দেশের কাছে মুখ থাকে কোথায়? কিন্তু হায়, সে মুখ কি আর আছে?

প্রথম চমকে যাহাই বলুন, এখন অবশ্য অনেক খুঁৎ—তাঁহাদের মতের সঙ্গে কংগ্রেসের মন্তব্যের অনেক গুরু পার্থক্যও তাঁহারা দেখাইতেছেন। নহিলে পৃথক মডারেট কন্‌ফারেন্স হয় কি করিয়া?

দল যত বড়ই হউক দলের চেয়ে দেশ অনেক বড়। একনিষ্টদের সভা বা মডারেটদের সভা তাঁহাদের নিজের দলের কাছে যত বড়ই হউক, কংগ্রেস দেশের কাছে অনেক

বড়। দলবাঁধা পাকা একষ্ট্রিমিষ্ট নহেন, দলবাঁধা পাকা মডারেটও নহেন, এমন লোকও অনেক আছেন। কোনও দলে নাম লেখান লোকের সংখ্যা অপেক্ষা, ইঁহাদের সংখ্যা দেশে এখনও অনেক বেশী। ইহারা কংগ্রেসকে মানেন,—কোনও দলের সভাকে মানেন না। ইহারা অন্তরের সঙ্গে কংগ্রেসের এই মন্তব্যই দেশের সর্ব্বসম্মত মত বলিয়া সমর্থন করিবেন। কারণ ইহা কোনও এক দলের মত হয় নাই। আর সংস্কার প্রস্তাবের সমালোচনাও যথেষ্ট হইয়াছে। নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রই দেশের পক্ষে এই কথাই সত্য কথা বলিয়া অনুভব করিবেন।

দেশমান্য শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য মহোদয় বরাবরই মডারেট দলভুক্ত। বুদ্ধিতেও তিনি খাঁটি মডারেট, কেবল দলের নামে নহেন। দেশপ্রাণ তিনি দেশকে ও দেশের কংগ্রেসকে দলের অপেক্ষা বড় বলিয়া দেখিয়াছেন। তাই কংগ্রেস তিনি ত্যাগ করিতে পারেন নাই—এই মত সামঞ্জস্যও কতক পরিমাণে তাঁহার চেষ্টাতে হইয়াছে। হোমরুল দলের নেতারাও মডারেট, কোনও দলের নন এমন যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারাও মডারেট, তাই এই সামঞ্জস্য হইয়াছিল। তথা কথিত 'মডারেট'দের ভয়ে নয়। কংগ্রেস ভাবে জাতীয় এবং কার্য্য প্রণালীতেও মডারেট কংগ্রেসই হইয়াছে। আলাদা যাঁহারা হইলেন, প্রকৃত একষ্ট্রিমিষ্ট তাঁহারাই।

কলিকাতার দাঙ্গা।

বকর-ঈদ ও মহরম এই দুইটিই মুসলমানদের বড় দুইটি পরব—যাহা জনসমাজের মধ্যে বহু আড়ম্বরে সম্পন্ন হয়। এই দুই পরব উপলক্ষে হিন্দু মুসলমানে মধ্যে মধ্যে দাঙ্গাও এখন হয়। বকর-ঈদে কোর্ব্বাণী লইয়া, আর মহরমের সময় হিন্দুদের যদি কোনও বড় পরব থাকে—তবে এই দুই পরবের শোভাযাত্রার ঠোকাঠুকিতে—দাঙ্গা হইয়া থাকে। মহরমে বোম্বে অঞ্চলে সিয়া সুন্নী দুই মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও কয়েকবার দাঙ্গা হইয়াছে।

বহুকাল যাবৎ হিন্দু মুসলমানে এ দেশে প্রত্যেক গ্রামে ও সহরে প্রতিবেশীর মতই বাস করিতেছে। ব্যবসায়িক এমন—কি সামাজিক বহু ব্যাপারেও অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহাদের মধ্যে হইয়াছে। এই সব সম্বন্ধে কেহ কাহাকেও এড়াইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় স্বাভাবিক যে সদ্ভাব,—যে মিল মিশ একটা জন্মে, সাধারণতঃ তাঁহারও অভাব কিছু দেখা যায় না। বস্তুতঃ এই ভাবটি না থাকিলে এত বিষয়ে এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধেও তাহারা থাকিতে পারিত না। ধর্ম্ম অনুষ্ঠানাদি ব্যাপারেও যে পরস্পরের সঙ্গে বড় একটা বিভেদ সর্ব্বদা থাকে তা নয়। হিন্দুর দুর্গোৎসবে গ্রামে গ্রামে গ্রামবাসী মুসলমানেরাও নূতন কাপড় পরিয়া আনন্দে দেখিতে আইসেন মুসলমান বাদ্যকর হিন্দুর বাড়ীতে দেবপূজায় ও বিবাহাদি ক্রিয়াতে আসিয়া বাদ্য বাজায়। আরও কত লোক কত কাজকর্ম্ম আসিয়া করে। কোর্ব্বাণী যতই আপত্তি থাক্, মুসলমানের মহরম উৎসব মহরমের মিছিল হিন্দুরা আনন্দ করিয়া দেখিতে যায়। পীরের দরগায় হিন্দুরা পূজা দেয়,—ঘরে ঘরে মেয়েরা সত্যপীরের আসান পীরের সিন্নীর অনুষ্ঠানও করে। শুনিয়াছি এই সত্যপীরই হিন্দুর সত্যনারায়ণ হইয়াছেন,—গ্রামে প্রতি হিন্দুগৃহেই ইঁহার সিন্নী হইয়া থাকে। সিন্নী মুসলমানী একটা আরাধনার রীতি। আবার বহুগ্রামে হিন্দুর দেবালয়েও মুসলমান গৃহস্থেরা পূজা-ভোগ পাঠায়। বিবাহাদি অনুষ্ঠানে হিন্দুর বাড়ী মুসলমানের, মুসলমানের বাড়ী হিন্দুর নিমন্ত্রণ হইয়া থাকে। যার যার সম্প্রদায়গত বিধিনিষেধের গণ্ডী মানিয়া আহারের ব্যবস্থাও অনেক স্থলে হয়।

তবু মধ্যে মধ্যে এত দাঙ্গা ফ্যাসাদ—দাঙ্গায় এমন খুনাখুনি পর্য্যন্তও হয় কেন? ইহার মূলে কি রহিয়াছে, তার অনুসন্ধান ও আলোচনা আবশ্যক। রোগের মূল ধরিয়া চিকিৎসা না করিলে ইহার প্রতিকার কিছু হইবে না।

যাহা হউক, তার অবসর এখানে নাই। সম্প্রতি যে দাঙ্গা হইয়া গেল তার মূলেও হিন্দুমুসলমান বিদ্বেষের কারণ কিছু নাই। ইহার কারণ রাজনৈতিক সাধারণতঃ যে সব দাঙ্গা হয়, তাহা হইতেও বিভিন্ন রকমের। এই রকম 'রাজনৈতিক' দাঙ্গাও যে একেবারে আর হয় নাই, তা নয়। ১০৷১১ বৎসর পূর্ব্বে কুমিল্লা ময়মনসিংহ অঞ্চলে যে দাঙ্গা হইয়াছিল, তাহা হিন্দু মুসলমানে হইলেও রাজনৈতিক দাঙ্গা। এ দাঙ্গাও রাজনৈতিক, তবে মুসলমানের বিরোধ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সাক্ষাৎও মুখ্য ভাবে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে—পরোক্ষ ও গৌণভাবে মারবারীদের সঙ্গে। বহু কারণে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা অসন্তোষের ভাব কিছু কাল ধরিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল। ইহা সঙ্গত কি অসঙ্গত যিনিই যাহা বলুন—এই অসন্তোষ যে সত্য এবং তাহার

তীব্রতাও যে কম হইয়াছিল না, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এই অসন্তোষের মূলে ধর্মবিশ্বাসগত বেদনা যতই থাক, প্রধানতঃ রাজনৈতিক আকার ধরিয়াই ইহা আপনাকে প্রকাশ করিতেছিল। সুন্নি সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মতে ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে রাজনৈতিক দায়িত্ব বড় ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশ্রিত। তুর্কীর সুলতান একাধারে সুন্নী মুসলমানদের ধর্মগুরু ও রাষ্ট্রপ্রভু, ইহাই তাহাদের ধর্মবিধি। সুন্নীমতে ইঁহারাই হজরৎ মহম্মদের প্রতিনিধি বা খলিফা। তিনিও একাধারে মুসলমান সমাজের ধর্মগুরু ও রাষ্ট্রপ্রভু ছিলেন। ইংরেজ এখন ভারতের রাষ্ট্রাধিপতি—এ আধিপত্যও মুসলমানকে মানিতে হয়। এই খলিফার সঙ্গে যতদিন ইংরেজের মৈত্রী ছিল, কিছু আটকাইত না। সে মৈত্রী এখন নাই—ঘোর যুদ্ধই আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে ধর্মভীরু সুন্নীর চিত্তে কিছু চাঞ্চল্য নিতান্তই স্বাভাবিক। তারপর তুর্কী ও জর্মাণের গুপ্তচর এমন দেশে থাকিতে পারে, যাহারা এই চাঞ্চল্যকে নানা কূট উপায়ে বাড়াইয়া তীব্র একটা অসন্তোষের উত্তেজনা সৃষ্টি করিতেছে। ইহার পর, যাহা কিছু ক্লেশের কারণ ঘটিতেছে অবান্তর যাহা কিছু অপ্রীতিকর ব্যাপার হইতেছে, সবই এই মূল অসন্তোষকে জটিল ও স্ফীত করিয়া তুলিতেছে। যুদ্ধের ফলে বস্ত্রাদির দুর্মূল্যতা এবং অন্যান্য কতকগুলি কারণ হেতু এই অসন্তোষ এইরূপে জটিল হইয়া বড় বাড়িয়া উঠিয়াছে। সাধারণ লোকে মূলতত্ত্ব অত সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিয়া দেখে না,—অসন্তোষের বহিরবয়বটা ধরিয়াই চলে, উত্তেজনার বহির্গত রঙ্গেই হিল্লোলিত হয়। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। তীব্র একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল। এই উত্তেজনার বেদনাকে প্রকাশ করিবার জন্য এবং যদি কিছু প্রতিকার সম্ভব হয় তার উপায় নির্দ্দেশের জন্য মুসলমান সম্প্রদায় বিপুল আয়োজনে বহু অর্থব্যয় করিয়া বিরাট এক সভার অধিবেশনে উদ্যোগী হইতেছিল। বৃহৎ সভামণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছিল বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ মৌলবী মৌলানা প্রভৃতি সমাজনেতৃগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। যেমন কংগ্রেসের সময় হয়, প্রায় তেমনই একটা আড়ম্বর আয়োজন হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের মনে হইল, ঐ সভার ফলে উত্তেজনা অনেক বাড়িয়া গুরুতর শান্তিভঙ্গ হইবে—সুতরাং সভা বন্ধ বা স্থগিত করিবার হুকুম হইল। ইহাতে যে দারুণ অসন্তোষ উত্তেজনা হয়, তাহাই দাঙ্গার নিদান।

কোন্ অবস্থায় কি উপায়ে অসন্তুষ্ট উত্তেজিত প্রজাকে সন্তুষ্ট ও শান্ত করিতে হয়, তাই বুঝিয়া সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিতে পারাই গবর্ণমেণ্টের বিচক্ষণতা ও রাজনৈতিক সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচায়ক। অনেকেই বলিতেছেন—আমরাও সেইরূপ বলি যে—এই ক্ষেত্রে গবর্মেণ্ট বড় ভুল করিয়াছেন।

প্রজার অসন্তোষ উত্তেজনা কেবল জোর করিয়াই সর্ব্বদা চাপিয়া দেওয়া যায় না। ভুল বুঝিয়াই হউক আর ঠিক বুঝিয়াই হউক, গবর্ণমেণ্টের কোনও বিধি যদি বহু প্রজা অতি অন্যায় বলিয়া মনে করে, তাহাদের কোনও বেদনা প্রকাশের চেষ্টায় এতদূর অগ্রসর হইয়া যদি এমন একটা বাধা পায়,—যতই দুর্ব্বল হউক—বহুলোক একসঙ্গে তীব্র অসন্তোষের উত্তেজনায় যদি একেবারে মরিয়া হইয়া ক্ষেপিয়া উঠে—তাহারা সামর্থ্যের হিসাব করে না, ফলাফলের হিসাব করে না, হিতাহিত বুদ্ধি তাদের থাকে না,—গুরুতর একটা অভ্যাহিত তাহারা ঘটাইতে পারে। 'জান কবুল তবু দেখিয়া নিব'—এমনই একটা অধীর ভাবের বশে লাঠি হাতে করিয়াও তাহারা কামান বন্দুকের উপরে গিয়া তখনকার মত লাফাইয়া পড়িতে পারে। এই ব্যাপারেও ঠিক তাই হইয়াছে।

'মব' (mob) উত্তেজনায় উন্মত্ত হইয়া উঠিলে এইরূপই ঘটে। এরূপ ঘটনা দেশে আরও ঘটিয়াছে। তবু যে গবর্মেণ্ট কেন এটা বুঝেন নাই বা ভাবেন নাই—বলিতে পারি না। সভা হইলে যে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা তাঁহারা করিয়াছিলেন, তার অপেক্ষা অনেক গুরুতর শান্তিভঙ্গ বোধ হয় সভা না করিতে দিয়া ঘটিয়াছে। যে সব উত্তেজক কথা বক্তারা সভায় বলিতেন, এই অসন্তোষজনক ঘটনার খবর পাইয়া—তাহা পথে পথে বাড়ীতে বাড়ীতে দল দল উত্তেজিত লোকের কাছে আরও উত্তেজক ভাবে বলিবার সুযোগ পাইয়াছেন। সভায় গবর্ণমেণ্ট যে সংযমের মধ্যে সকলকে রাখিতে পারিতেন, সভার বাহিরে তা পারেন না, পারেনও নাই।

সভা করিতে দিয় যদি তাঁহারা পরিচালক ও বক্তাদের ডাকিয়া সাবধান করিয়া দিতেন, অথবা শান্তিরক্ষার দায়িত্বে মুচলিকা লিখাইয়া নিতেন,—তারপর সভার চারিধারে সশস্ত্র পুলিশ বা সৈনিকদের কড়া পাহারায় রাখিতেন, সভার মধ্যেও যদি প্রধান রাজপুরুষ কেহ কেহ উপস্থিত থাকিতেন,

কোনও বিভ্রাট ঘটিতে পারিত না। যে কোনও বেদনাই হউক, প্রকাশের সুযোগ পাইলে তার তীব্রতা কমিয়া যায়। এই সভাতেও তাহা হইত। না হয়, খুব তীব্র গালাগালিই হইত, কিন্তু মুখের কথা ইটপাথরও নয়, ঠেঙ্গালাঠিও নয়, কাহারও গায়ে তাহাতে আঘাত লাগে না।

মারবারীদের বিরুদ্ধেও দাঙ্গাকারীদের বড় একটা আক্রোশ প্রকাশ পাইয়াছিল। তার কতকগুলি কারণ আছে। আট বৎসর পূর্ব্বে বড়বাজারে আর্ম্মাণীটোলার মসজিদে গরু-কোর্ব্বাণীর প্রবর্ত্তন উপলক্ষে মারবারীতেও মুশলমানে বড় একটা দাঙ্গা হয়। খুনজখম লুটতরাজও বেশ হয়। সে স্মৃতি কেহই একেবারে ভুলিতে পারেন নাই; সেই অবধি পরস্পর একটা বিদ্বেষের ভাব দুই সম্প্রদায়ের লোকের মনে আছে। সম্প্রতি কাপড়ের বাজারের দর অত্যধিক চড়িয়া যাওয়ায় মারবারীদের বিরুদ্ধে বাঙ্গলায় সর্ব্বত্রই একটা অসন্তোষের ভাব জন্মিয়াছে। কাপড়ের বাজার একেবারে ইহাদের হাতে, অনেকেরই ধারণা সুযোগ বুঝিয়া ইহারা জোট বাঁধিয়া অতিলাভের আশায় কাপড়ের দর এমন চড়াইয়াছে, দেশের লোকের এত দুঃখ দেখিয়াও দেখিতেছে না। ইহার সঙ্গে আরও কথা উঠিয়াছে— প্রকাশ্যে সে কথা কেহ বলিতে সাহস করেনা বটে, কিন্তু পথে ঘাটে খুব শোনা যায়—এই যে সমরঋণে মারবারীদের কাছ হইতে অনেক টাকা পাইবার আশায় গবমেণ্ট এই দরবৃদ্ধিতে কোনও বাধা দিতেছেন না। নহিলে কেরোসিন্, কয়লা, লবণ প্রভৃতি কত জিনিষের দর বাঁধিয়া দিতেছেন, কাপড়ের কেন দেন না? এই কথার মূলে কোনও সত্য আছে একথা আমরা বলিতেছি না। তবে কথা এইরূপ একটা উঠিয়াছে এবং তাহাতে গবমেণ্টের সঙ্গে মারবারীদের একটা ঘরোয়া বন্দোবস্ত হইয়াছে, এইরূপ সন্দেহে এই অসন্তোষও বাড়িয়াছে। কলিকাতার গাঁড়াতলা অঞ্চলের মুশলমানদের মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই মারবারীদের বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষ আছে, এই সব কারণে তাহা আরও বাড়িয়া উঠিবারই কথা। আবার শুনিতে পাই, এইরূপ রটনাও দুষ্টলোকে কেহ কেহ করিয়াছে যে মারবারীরা বড়বাজারে একটা দাঙ্গাহাঙ্গামা ও লুট তরাজের ভয়ে গবমেণ্টকে তিনকোটি টাকা দিয়া এই সভা বন্ধ করাইয়াছে, —টাকার ভাগ কিছু লাট সাহেবও পাইয়াছেন। টাকার কথা যাহাই হউক, লুটতরাজের ভয়ে মুভাবন্ধ করিয়া দিতে মারবারী প্রধানগণ গবমেণ্টকে ধরিয়া পড়িতে পারেন, এ গুজব নানা কারণে অনেকে বিশ্বাস করিতে পারে। আর বড় কোনও উত্তেজনার সময়, উত্তেজনার অনুকূল, যে কোনও গুজবই উত্তেজিত লোকেরা সহজে বিশ্বাস করিয়া থাকে। এই সব কারণেই দাঙ্গার বেগটা মারবারীদের বিরুদ্ধে এমনভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

যাহা হউক, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। অনেক হতভাগ্য হতাহত হইয়াছে, বড় একটা বিষাদের ছায়া যেন সহর ভরিয়া পড়িয়াছে। গুমট একটা দারুণ অসন্তোষ বহিঃও যে অন্তরে অন্তরে অনেকের নাই, এ কথা বলিতে পারি না। কে জানে, ভবিষ্যতে সুযোগমত—যে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার উপলক্ষ্য ধরিয়া গুরুতর একটা অমঙ্গলকর বিভ্রাট ঘটিতে পারে। কেবল বাহির হইতে শাসনদণ্ডে চাপিয়া নয়,—কোমল মমতার করে কুশল নীতির প্রয়োগে কর্ত্তৃপক্ষ এই অসন্তোষ দূর করুন,—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

দাঙ্গায় শিক্ষা—আমাদের অযোগ্যতা।

এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান্ কোনও কোনও পত্রিকা এই সব দাঙ্গার কথা তুলিয়া বলিতেছেন,—আদিম বর্ব্বরোচিত উদ্দাম চিত্তাবেগ যেখানে জনসাধারণের মধ্যে এত প্রবল— এতই অসংযত যে ধর্ম্মের বা অন্যরূপ যে কোনও বিরোধেই বিভিন্ন সম্প্রদায় এমনই ক্ষেপিয়া পরস্পরের টুঁটি ছিঁড়িয়া ফেলিতে চায়,—সে দেশে কি স্বায়ত্তশাসন চলে? এমন হাল্কা স্বভাব যাদের, যে গবমেণ্ট এক সম্প্রদায়ের টাকা খাইয়া অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধতা করেন—লাট সাহেব পর্য্যন্ত এই টাকার ভাগ নেন—এই রকম সব আজগুবি কথা যারা বিশ্বাস করে, আর তাই লইয়া দাঙ্গাহাঙ্গামা করে, তাহারা আবার ইলেক্টর হইবে! তাহাদের ভোট লইয়া আবার স্বায়ত্তশাসনে সরকারী কাউন্সিল নির্ব্বাচিত হইবে? এইরূপ কথা বলিয়াও সম্প্রতি কোনও কোনও এঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান্ পত্রিকা কয়েকদিন হইল যেন চক্ষু টিপিয়া মুচ্কি হাসিয়া ঝাঁঝাল একটু বিদ্রূপ করিয়াছেন।

কিন্তু ইঁহাদের জিজ্ঞাস্য এই যে ইঁহারা কি সত্যই মনে করেন, এ দেশের শিক্ষিত লোক ইহাদের ঘরের খবর কিছুই রাখে না? অবশ্য কিছুকাল যাবৎ ইংলণ্ডের বা

ইয়োরোপের ইতিহাস পড়া এ দেশের ইস্কুল হইতে একেবারেই তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস আছে,—তাও না পড়িলে চলে। কলেজে কেহ কেহ ইতিহাস পড়ে বটে, কিন্তু ব্যবস্থা এমন হইয়াছে যে বোধহয় বার আনা ছেলে দেশের বা বিদেশের ইতিহাসের কোনও খবর না রাখিয়াও বিএ এমএ পাশ করিয়া শিক্ষিত সমাজে স্থান নিতেছে। তাই ইঁহারা বোধহয় মনে করেন, আমাদের ঘরের খবর ইহারা কি জানে? যা খুসী তাই ইহাদের বলিতে পারি। কিন্তু ইঁহাদের মনে রাখা উচিত, যে আগে যখন ইস্কুলের সকল ছাত্রকেই ভারতের ও ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়িতে হইত, কলেজের সকল ছাত্রকেই অন্ততঃ রোম ও গ্রীসের ইতিহাস পড়িতে হইত,—তাহারা এখনও সব মরিয়া যায় নাই, না তাহাদের পাঠের স্মৃতিও একেবারে লোপ পায় নাই।

'মব' (mob) বা অজ্ঞ জনসাধারণ সবদেশেই সমান 'মব'। গ্রীসে যেমন ছিল রোমে যেমন ছিল, নব্য ইয়োরোপে গণতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠার পরেও যেমন ছিল বা আছে, ভারতের 'মব' তার চেয়ে হীন নয়। আজকাল ইয়োরোপে সকলকেই একটু লেখাপড়া করিতে হয়; কিন্তু অবৈতনিক প্রাইমারী হইতে একটু 'রিডিং' 'রাইটিং' আর 'রিথমেটিক'—একটু লেখা একটু পড়া আর একটু অঙ্কগণা, শিখিয়াই জনসাধারণ বড় বিজ্ঞ হইয়া উঠে না। ভারতীয় হিন্দু মুসলমান 'মব' ইহাদের মত একটুখানি সাক্ষর না হইলেও এদেশে এমন সব অনুষ্ঠান আছে, যাহার ফলে ধর্ম্মের কথা সুনীতির কথা সকলেই কিছু শুনে ও শিখে। মোটের উপর নৈতিক বুদ্ধিতে ইয়োরোপীয় জনসাধারণের তুলনায় এদেশের জনসাধারণ খাট নহে। তবে চতুর নায়ক কেহ এই সব লোককে সাময়িক একটা উত্তেজনায় বেশ ক্ষেপাইয়া তুলিতে পারে। এদেশেও পারে, ওদেশেও পারে। প্রাচীন রোমের কথা কিছু নাই ধরিলাম, সে ত সেকালের কথা। আধুনিক যুগে কি হয়? ধর্ম্মের জন্য না হউক, অন্য রকম স্বার্থের বিরোধে দাঙ্গা হাঙ্গামা ইংলণ্ডে কি হয় নাই? একটি দাঙ্গার দৃষ্টান্তই দিতেছি। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে যখন কলকারখানা প্রথম চলিত হয়, হাতের শিল্প বিনষ্ট হইয়া শ্রমজীবীদের দারুণ দুঃখ উপস্থিত হয়, ইহারা ক্ষেপিয়া অনেক কলকারখানা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। কতদিন যাবৎ বহুদূর ব্যাপিয়া ভীষণ দাঙ্গা চলিয়াছিল,—শেষে সৈন্যবলে দাঙ্গা দমন করিতে হয়। তখন পার্লামেন্টের প্রভুত্বই দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আর তখন না থাকিলেও কিছুকাল পরেই ইহাদের পার্লামেন্টের সভ্যনির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়। সাম্য ও স্বাধীনতার মন্ত্র ধরিয়া ফরাসীবিপ্লব উপস্থিত হয়। পেরিস্ নগরের এমনই সব 'মব' ক্ষেপাইয়াই কতিপয় নায়ক এই বিপ্লব ঘটান—যার ফলে ক্রমে সমগ্র ইয়োরোপে গণতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখনও এই গণতান্ত্রিক যুগে শ্রমজীবীদের বড় বড় ধর্ম্মঘটে—যে সব কাণ্ড হয়, তাহাতেও ইহাদের ধীরবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

যাহা হউক, একেবারে আজকাল এই সব দাঙ্গাহাঙ্গামা যদি কিছু সংযত হইয়া থাকে, ভোটের অধিকার পাইয়া, তার দায়িত্ব কিছু অনুভব করিয়াই হইয়াছে। আরও কথা আছে। জনসাধারণের অতি অসন্তোষজনক কোনও কার্য্যই এখন কোনও গভর্মেণ্ট ইয়োরোপে করিতে ভরসা পান না। যে স্থলে সেরূপ কিছু করেন, সে স্থলে গোলমাল হয় তাই কি? যুদ্ধের পূর্ব্বে সাফ্রাগেট নারীরাই কি দাঙ্গা হাঙ্গামার উৎপাত কম করিতেছিল?

তারপর ঘুষের কথা। অবশ্য বাঙ্গলার গবমেণ্ট ঘুষ খাইয়াছেন, তা বলি না। তবে ঘুষ (বা ঘুষাঘুষি)—দোষের যতই হউক, ডিমক্রাসী তার মধ্যেও চলে। অষ্টাদশ শতাব্দী ভরিয়া ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট যে ঘুষেই চলিত। মন্ত্রীরা ঘুষ দিয়া দল পুষ্ট রাখিতেন, নির্ব্বাচনের সময়েও ঘুষে ভোট কেনা হইত। এখন কড়া আইনে ইহা বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু পার্লামেন্টের নির্ব্বাচনের সময় অল্পকিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও পদপ্রার্থীদের ভোটের জন্য প্রচুর মদ খরচ করিতে হইত। একেবারে আজকাল ইহা কিছু কমিয়াছে কিনা জানি না।

শেষ কথা, democracy বা গণতন্ত্র শাসন আসল ব্যাপারটা কি? এ শাসন ত গণনায়কদের শাসন। আসল 'গণ' যাহারা তাহারা নিজেরা বুঝিয়া যে ভোট ও দিতে পারে না,—নায়করাই ত ইহাদের একেবারে চালাইয়া নেন। নানা কৌশলে প্রতিযোগিতায় যিনি যত লোককে চালে বাধ্য করিতে পারেন, তত ভোট নিজের পক্ষে তিনি লাভ করেন।

এই ত democracy? ইহা ভারতেও বেশ চলিতে পারে। তুলনায় হিসাব করিলে ভারতেও গণনায়কের অভাব এখন হয় না। আর গণসাধারণ – নায়কদের হাতে তারা ইংলণ্ডে যেমন এদেশেও তেমনই হইবে। যেটুকু ত্রুটি এখন দেখা যায়, ভোটের দায়িত্বটুকু বুঝিলে তা আর থাকিবে না। সেটুকু বুদ্ধি এদেশের লোকের আছে। অশিক্ষিত প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ সম্প্রদায়গত সমাজ মোড়লদের পরিচালনাধীনে বেশ শাসন করিতেছে। সাধারণ বৈঠকে যে ব্যবস্থা হয়, সকলেই নতশিরে তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে। এই যে শক্তি তাহাদের আছে, তাহা এখন রাষ্ট্রের দিকেও পরিচালিত করিতে হইবে। শক্তি যেখানে থাকে,—এক দিক হইতে অন্যদিকে তাহা পরিচালনা করা এমন অসম্ভব ব্যাপার কিছু নয়।

অর্চ্চনা।

(১)

শরতের প্রভাত!

দূরে পূজাবাড়ীতে সাঁনাই বাজিতেছিল; সাঁনাইয়ের করুণ রাগিনী মৃদু বাতাসের সঙ্গে দিক্‌দিগন্তে ভাসিয়া যাইতেছিল! সেই মধুর রাগিনী, বিশ্বজননীর আগমন বার্ত্তা ঘোষনা করিতেছিল। যে সে সুর শুনিতেছিল, তাহারই প্রাণের তন্ত্রীতে একটা বড় পুরাতন সুর বাজিয়া উঠিতেছিল!

সে সুর, স্মৃতির সুর! বড় প্রিয়, বড় মধুর!

অতীতের স্মৃতি, সুখের হউক্, দুঃখের হউক, যে তাহাকে জাগাইয়া তোলে, সে প্রাণের মধ্যে অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া লইয়া থাকে!

শারদ প্রভাতের এই চিরন্তন করুণ কোমল সুরটি, মানুষের প্রাণের মধ্যে চিরদিনই স্মৃতির কি বিপুল কাহিনী বহন করিয়া আনিতেছে! আশায়, হর্ষে, বেদনায়, অশ্রুতে, সেই কাহিনীর প্রত্যেক ছত্রটী, প্রত্যেক "আখরটী" বিজড়িত! সে দুঃখস্মৃতির ভারবহন করিয়া হৃদয় ক্লান্ত হয় না, সুখস্মৃতির কল্পনানুভূতিতে অন্তর তৃপ্ত হয় না!

একটা বেদনার অনুভূতি, পুলকের উচ্ছ্বাস, নিবিড়ভাবে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশকে পূরিত করিয়া স্পন্দিত হইতে থাকে! কোন্ সুদূর অতীত যুগ হইতে, এই অনুভূতি, এই উচ্ছ্বাস মানবের হৃদয়কে শারদ প্রভাতের সাঁনাইয়ের সুরের সঙ্গে সঙ্গে, কম্পিত, উদ্বেলিত করিয়া আসিতেছে!

প্রভাতারুণের কোমল দীপ্তি, ক্ষুদ্র চণ্ডীমণ্ডপখানির পার্শ্বদেশ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে! এক বর্ষীয়সী রমনী মণ্ডপের বারান্দায় বসিয়াছিলেন;—তাঁহার চক্ষে ঐ কোমল দীপ্তিটুকু বড় ম্লান বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল!

দূর পূজাবাড়ীর সাঁনাইয়ের সুর তাঁহার কাণে ভাসিয়া আসিতেছিল। সেই সাঁনাইয়ের করুণ সুরের সঙ্গে, জীবনের সহস্র স্মৃতির কাহিনী নিবিড় হইয়া রহিয়াছে। যে মণ্ডপ আজি প্রতিমাশূন্য, সেখানে একদিন বিশ্বজননীর ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী চারুমূর্ত্তিখানি বড় শোভা পাইত। যে নির্জ্জনমন্দিরসম্মুখভাগ আজিকার প্রভাতের অরুণরাগসম্পাতেও উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে না, ঐ স্থানই একদিন উৎসববেশ পরিহিত বালকবালিকাগণের কলহাস্যে মুখরিত হইয়া উঠিত!—আর সেই বিগতদিনের অরুণদীপ্তি তাহাদিগের নানা কারুকার্য্যখচিত পরিচ্ছদগুলির উপরে পড়িয়া হাসিয়া উঠিত!

ভিখারীর দল মণ্ডপের সম্মুখস্থিত প্রশস্ত রাজপথ অতিবাহন করিয়া চলিয়া যায়;—মণ্ডপ শূন্য দেখিয়া আর সেখানে আইসেনা; একদিন ছিল, যখন ভিক্ষার্থীর করঙ্গ পূর্ণ করিয়া তণ্ডুল দান করা হইত;—অর্চ্চনার প্রথম দিনে ক্ষুধার্ত্ত কাঙ্গালকে প্রচুর আহারীয় দানে পরিতুষ্ট করা হইত! আজি আর ভিক্ষার্থে ভিখারীর দল আইসে না, ক্ষুধার্ত্ত কাঙ্গাল আহারীয় প্রার্থনা করে না;—কিন্তু তবু অতীত কাহিনীর স্মৃতিটুকু মুছিয়া যায় না কেন?

উৎসবের মঙ্গলশঙ্খধ্বনির মধ্যে নববধূবেশে বর্ষীয়সী যেদিন শ্বশুরালয়ের প্রাঙ্গণে প্রথম পদার্পণ করিলেন, সেদিন তিনি সংসারের সর্ব্বত্র প্রাচুর্য্যের মধ্যে একটি অনাবিল আনন্দ ও তৃপ্তির ধারা অনুভব করিয়া পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিলেন! সংসারের সেই আনন্দস্রোতের মধ্যে নব বধূটি একটি ক্ষুদ্র পুলকচঞ্চল ঊর্ম্মির মত মিশিয়া রহিল! যে ক্ষুদ্র নব বধূটি প্রথম জীবনে সংসারের প্রত্যেকের কাছেই স্নেহ, মমতা, ও প্রীতি লাভ করিয়াছিল, সে জীবনের মধ্যাহ্নে আসিয়াও প্রত্যেকের ভক্তি ও সম্মানের অধিকারিণী হইল! কিন্তু এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে অবস্থার অনেক বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে;—স্নেহের জন, মমতার জন, সকলেই একে একে কোন্ দুজ্ঞেয় লোকের অতিথিরূপে বিদায় লইয়াছে!

উৎসব ও আনন্দের কলহাস্যে যে গৃহ একদিন মুখরিত ছিল, আজ সেখানে নিরানন্দ জাগিয়া উঠিয়াছে!

শ্বশ্রূমাতার স্বর্গারোহণদিনে যে অশ্রু সর্ব্বপ্রথম ভূমিস্পর্শ করিয়াছিল, সে অশ্রুস্রোত আর রুদ্ধ হয় নাই; বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতে লাগিল, প্রিয়জন একে একে সকলেই বিদায় লইল! উদ্দাম জলস্রোতের মুখে বাঁধ একবার ভাঙ্গিলে আর সে জলস্রোতকে বাধা দিয়া রাখা যায় না!

তারপর একদিন, সেদিনও বিশ্বজননীর পূজার সাঁনাই এমনি করিয়া করুণ সুরে বাজিয়া উঠিয়াছিল, প্রভাতের অরুণদীপ্তি এমনি করিয়া শ্যামল পত্রশোভার অন্তরাল দিয়া নামিয়া আসিয়া দূর্ব্বাদলাগ্রশোভিত শিশিরবিন্দুগুলিকে মুক্তাবর্ণে রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছিল;—সেই উৎসবের সুরের মধ্যে, সেই নবোদিত সূর্য্যের স্নিগ্ধ কোমল আভাটুকুর মধ্যে রমণী তাঁহার জীবন দেবতাকে হারাইলেন;—রহিল শোকদীর্ণ হৃদয়ের সান্ত্বনাস্থল, দুই পুত্র, সত্য ও বিধু, এবং পুত্রবধূ নির্ম্মলা!

আজি আবার পূজা আসিয়াছে; সেই চিরনূতন সাঁনাইটী, পুরাতন সুরে আবার স্মৃতির কাহিনী জাগাইয়া তুলিতেছে! আজ এই বর্ষীয়সীর কাণে সেই সাঁনাইয়ের মধুর সুরটুকু আর উৎসবের সুর নহে! এ যেন এক হৃদয়মন্থনকারী করুণ ক্রন্দনের সুর।

ভোরের পাখী ডাকিবার অনেক পূর্ব্বে তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া শূন্য চণ্ডীমণ্ডপের কাছে আসিয়াছেন। বুকের মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন বেদনার্ত্ত হইয়া লুণ্ঠিত হইতেছিল! দুইহাতে বক্ষ চাপিয়া তিনি বিশ্বজননীর বিগ্রহশূন্য মণ্ডপের সম্মুখে লুটাইয়া পড়িলেন।

হৃদয়ের মধ্যে যে তীব্র বেদনারাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহাকে বাহির করিয়া দিবার কোনও পন্থাই কি নাই? তপ্ত অশ্রুরাশি বাধা না মানিয়া এই যে অজস্র ধারায় নামিয়া আসিতেছে, মর্ম্মদাহী স্মৃতির অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার কোনও ক্ষমতাই কি ইহার নাই? জীবনপ্রবাহের উৎসমুখ প্রায় শুষ্ক হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু তবু ত স্মৃতি যায় না! বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, শরতের মেঘনির্ম্মুক্ত আকাশের তলে, দীপ্ত সূর্য্যালোকে বন বনান্তরে শ্যাম-ছায়া তেমনি মোহন হইয়া উঠে;—স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোকে নদীজল তরলিত রৌপ্যরাশিবৎ তেমনি জ্বলিতে থাকে;—জগদম্বার অর্চ্চনা দিন আসিতেছে বলিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা তেমনি উৎসাহ প্রফুল্ল হইয়া উঠে;—এক বিরাট ব্যাপারকে সার্থকতা প্রদান করিবার জন্য দিকে দিকে তেমনি অবিরাম আয়োজন, অক্লান্ত চেষ্টা চলিতে থাকে; আবার তেমনি করুণ সুরে সাঁনাই বাজিয়া বাজিয়া জগদম্বার আগমনবার্ত্তা দিকে দিকে প্রচার করে। বিদেশ গত প্রিয়জন গৃহে ফিরিয়া আইসে;—কেহ তাহাকে স্নেহের অভিব্যক্তির মধ্যে সযত্নে গ্রহণ করে, কেহ তাহাকে সরমসঙ্কুচিত হৃদয়ের প্রেমাভিব্যক্তিটুকুর মধ্যে সোহাগে, আদরে আমন্ত্রণ করিয়া লয়! বিশ্বমানব-হৃদয়ের এই চিরন্তন রীতিটি একটি নির্দ্দিষ্ট রেখাকে অবলম্বন করিয়া একই স্রোতে চিরদিন প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে!

বর্ষীয়সীর উচ্ছ্বসিত বক্ষপঞ্জর নিপীড়িত করিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিতেছিল!

হে জননী, আদ্যাশক্তি বিশ্বপ্রসবিনী, সবই ত ফিরিয়া আইসে, কিন্তু যাহাদের স্নেহের মধ্যে সংসারকে চিনিয়াছিলাম, তাহারা ত আর ফিরিয়া আসিল না!

জীবনে তোমার অর্চ্চনা চিরদিনই করিতে পাইব আশা করিয়াছিলাম; অন্তরে তোমার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু আজি যখন উৎসবের মধ্যে সকলেই তোমার অর্চ্চনার অধিকার পাইয়াছে, তখন এই মণ্ডপ শূন্য কেন? কই, এখানে তোমার ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তিখানি সংস্থাপিত দেখিতেছি না কেন?

তুমি যদি এই শূন্য মণ্ডপ পূর্ণ না কর, হে বিশ্বজননী, আমার হৃদয়ের এই আকুলতাকে দূর করিয়া দাও;—অন্তরের বাহিরেও তোমার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত দেখিবার এই যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা, এই আকাঙ্ক্ষাকে তুমি নাশ কর, শান্ত কর! হে জননী, অন্তরসিংহাসনে তোমার সিংহবাহিনী মূর্ত্তিখানিকে এমনি ভাবে উজ্জ্বল করিয়া তোল, যে তোমার সেবিকা যেন বাহিরকে একেবারেই ভুলিয়া যাইতে পারে!

তুমি এস, হে জননী, তোমার প্রেমামৃত ধারা অভিসিঞ্চন করিয়া আমার হৃদয়মরুকে রসপূর্ণ কর,—আমি বাহিরের বিশ্বকে ভুলিয়া তোমার বিশ্বপালিনী মূর্ত্তিখানি অন্তরের মধ্যেই একান্তভাবে অনুভব করিয়া কৃতার্থ হই।

—"মা"—অন্তরের মধ্যে যে আহ্বান রসমাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া গুমরিতেছিল, একি তাহারই অনুকরণ বাহিরেও বাজিয়া উঠিল!

মা—এই ত তুমি অন্তর পরিপূর্ণ করিয়া বিরাজিতা রহিয়াছ, তোমাকে বাহিরে খুঁজিতেছিলাম, তাই বুঝি তুমি বাহিরের আহ্বান শুনাইয়া, তোমার অন্তরবাসিনী মূর্ত্তিকে সুস্পষ্ট করিয়া দেখাইবার জন্যই, তোমার সেবিকাকে সচেতন করিয়া তুলিলে!

—"মা"—বর্ষীয়সী চমকিয়া উঠিলেন; চক্ষু ঘুরাইয়া চাহিয়া

দেখিলেন, পুত্র বিধু, সজলনয়নে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে!

বিধু জননীকে চক্ষুরুন্মীলন করিতে দেখিয়া ডাকিল, —"মা"—,

"কি বাবা!"—জননীর নয়নপ্রান্তে অশ্রু; প্রসন্নতা ও তৃপ্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে!

বিধু কহিল, "ঘরে চল মা!"—

বিধু ভাবিতেছিল, পূজার মন্দিরে বিশ্বজননীর প্রতিমা-প্রতিষ্ঠিত নাই, কিন্তু আজ এই সপ্তমীর প্রভাতে প্রতিমা শূন্য চণ্ডীমণ্ডপের দুয়ারে যে মূর্ত্তি আসীনা রহিয়াছে, সেই মূর্ত্তির মধ্যেই বিশ্বজননীর পুণ্যছায়া পরিস্ফুটরূপে প্রতিভাত রহিয়াছে!

হে বাঙ্গালীর জননীরূপিনী, তুমি গৃহে চল মা! তিন দিনের সাড়ম্বর পূজান্তে তোমাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে না, তোমাকে এই বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপের দুয়ার হইতে তুলিয়া লইয়া বাঙ্গালীর গৃহমধ্যে চিরতরে প্রতিষ্ঠাপিত করিব!

বর্ষীয়সী ধীরে ধীরে উঠিয়া অন্তঃপুরের দিকে যাইতে লাগিলেন। বিধু জননীর অনুসরণ করিল!

তখন নিকটবর্ত্তী প্রতিবেশীর বাড়ীতে সপ্তমী পূজারম্ভের বাদ্য গম্ভীর নির্ঘোষে বাজিয়া উঠিয়াছিল!

(২)

বারদিন পূজার ছুটি পাইয়া সত্য কর্ম্মস্থল হইতে বাড়ী আসিল!

সত্যকে একটা কথা বলিবার জন্য বিধু কয়দিন পর্য্যন্ত চেষ্টা করিল; কিন্তু দাদা যদি কথাটা ঠিক না বুঝিতে পারে, অথবা প্রকাশ করিবার দোষে সে যদি কথাটার অনভীপ্সিত অর্থ করিয়া লয়, তাহা হইলে বিধুর সমস্ত কল্পনাই ত ব্যর্থ হইয়া যাইবে! সুতরাং সে কি ভাবে কথাটা সত্যকে বলিবে, তাহাই কয়দিন পর্য্যন্ত আলোচনা করিল!

অবশেষে সত্যের যাইবার দিন আসিল। বিধু সাহস করিয়া ভ্রাতার কাছে যাইয়া দাঁড়াইল। সত্য কহিল,— "কি বিধু, কিছু বলিবার আছে ন্যকি?"—

প্রশ্ন শুনিয়া বিধু একবার ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিল— কহিল, "পূজা করিলে হয় না, দাদা?"—কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই বিধু বুঝিল, কথাটা কেমন খাপছাড়া ভাবে বলা হইয়া গেল! সে ত এমন করিয়া বলিতে চাহে নাই! সে একটু কুণ্ঠিতভাবে আর একবার সত্যের মুখের দিকে চাহিল, তারপর মাটীর দিকে চাহিল! সত্য কথাটা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল। পরে ধীরে ধীরে কহিল, "পূজা করিবার মত শক্তি কোথায় বিধু? জগদম্বা কৃপা করেন ত আবার তাঁহার অর্চ্চনা করিতে পারিব!" সত্যের কথাগুলির প্রথমভাগটা সাংসারিক লোকের কথার মত রসশূন্য হইলেও, শেষ ভাগটায় অশ্রুজড়িত কণ্ঠে একটা সুস্পষ্ট কম্পন অনুভূত হইয়াছিল; বিধু তাহা লক্ষ্য করিয়া একটু সাহস পাইয়া কহিল,—"মা—"

"মা কি পূজার কথা বলিয়াছেন বিধু?—"

বিধু তাড়াতাড়ি ব্যস্তভাবে কহিল, "না না, মা কিছু বলেন নাই—তবে কবে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে ততদিন ত মা——"

"কি করিব বিধু, উপায় নাই"—সত্যের কথা শুনিয়া বিধু কাঁপিতে লাগিল! সে এতদিন ধরিয়া একটা কল্পনার মায়ালোক বিপুল আগ্রহের সহিত সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছিল, তাহা যে আজই একই আঘাতে চূর্ণ হইয়া যাইতে চলিয়াছে! জননী বাঁচিয়া থাকিতে যদি পূজা না করা গেল, তাহা হইলে ভাবী সম্পদের দিনে নিস্ফল পূজার আয়োজনের মধ্যে সার্থকতা কোথায়?

সেই দিন সন্ধ্যার পর সত্য চলিয়া গেল। বিধু তাহার নিরানন্দ দিনগুলি কোনও মতে কাটাইতে লাগিল! তাহার দৈনিক নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যগুলি শেষ করিয়া চণ্ডীমণ্ডপের রোয়াকের উপর আসিয়া যখন সে প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা বসিত, তখন তাহার কল্পনাগুলি তাহাকে দুর্ব্বল, অসহায় পাইয়া নবীন উদ্যমে বেড়িয়া ধরিত!

জননীর স্বাস্থ্য ক্রমশঃই খারাপ হইয়া পড়িতেছিল। বিধু তাহা লক্ষ্য করিয়া আরও ম্রিয়মান হইতেছিল। এক-দিন হয়ত অবস্থার উন্নতি হইতে পারে, কিন্তু তখন হয়ত জননী জীবিতা থাকিবেন না। জননীর জীবদ্দশাতেই কি আবার জগন্মাতার পূজানুষ্ঠান সম্ভব হয় না?' বিধু তাহার পঠদ্দশায় কি করিতে পারে? সাংসারিক অস্বচ্ছলতার মধ্যে সে কেমন করিয়া তাহার আকাঙ্ক্ষাটীকে পরিপূর্ণতা প্রদান করিবার উপযুক্ত উপায় খুঁজিয়া বাহির করিবে?

কোনও যাদুমন্ত্র বলে তাহার বয়স যদি একদিনে হঠাৎ আরও দশ বৎসর বাড়িয়া যাইতে পারিত!—সে যদি কোনও

মতে এই অস্বচ্ছল সংসারটীকে বিগতদিনের স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে ফিরাইয়া নিতে পারিত!—তাহা হইলে—কি করিত সে তাহা হইবে!

আজ তাহার কিশোর হৃদয় প্লাবিত করিয়া যে কল্পনার উৎস মুক্তপ্রবাহে প্রধাবিত হইতেছে, তাহাকে সে একটি সম্পূর্ণ সার্থকতা প্রদান করিত!

এমনি করিয়া এই কিশোর বালকটি তাহার কল্পনা-লোক সৃষ্টি করিয়া তুলিত;—বাস্তবের দিকে ফিরিতেই সে দেখিতে পাইত, যে তাহার সেই কল্পনার মায়ালোক উষাগমে অন্ধকার রাশির মত ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতেছে!

তখন সে ধীরে ধীরে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মণ্ডপ সম্মুখ হইতে উঠিয়া সান্ধ্যবন্দনরতা জননীর পাদমূলে বসিয়া পড়িত!

ভাবপ্রবণ বিধু যে একটা কিছু কল্পনা করিতেছিল, এবং সেই কল্পনাটিকে সার্থকতা প্রদান করিবার কোনও উপায় খুঁজিয়া না পাইয়াই যে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে, জননী তাহার উপবেশন ভঙ্গি দর্শন করিয়াই তাহা অনুমান করিয়া লইতে পারিতেন। শিশুকাল হইতেই জননী বিধুকে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন, কীটদষ্ট পুষ্পকোরকটী দেখিয়াও বাল্যে তাহার নয়ন অশ্রুময় হইয়া উঠিত! অসমতল প্রাঙ্গণে বাধাপ্রাপ্ত বর্ষার জলরাশির পথ মুক্ত করিয়া দিয়া, যে সেই উচ্ছ্বসিত জলরাশির সহজগতি নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইত!—সেই বিধু,—যে কৈশোরে রামায়ণ পাঠকালে জনকদুহিতার দুঃখকাহিনী পড়িয়া পড়িয়া শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিত;—দেবকিশোর অভিমন্যুর মৃত্যুসংবাদ শ্রবণান্তে জননী সুভদ্রার নীরব শোকানুভূতিটীকেই যে কাব্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিত!

জননী নীরবে তাহার কুঞ্চিত কেশরাজির মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতেন! এই নীরবতাটুকুকে ভঙ্গ করিয়া কেহই কোনও দিন কোনও প্রশ্ন উত্থাপন করিতেন না!

বিধু জননীর স্নেহস্পর্শের মধ্যে তাঁহার আশীষ অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইত!

(৩)

সংসারের একটি নিভৃত কোণে একখানি ক্ষুদ্র কালো মেঘ সঞ্চিত হইতেছিল!—মেঘখানি এতটুকু—কিন্তু কালে উহাই প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে বাড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা ছিল!

বধূ নির্ম্মলা—এতটুকু লজ্জানতা বালিকাটি, পাতায় ঢাকা কুন্দকোরকটীর মত সুন্দর—নম্র! সে তাহার হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত মাধুর্য্যরাশির মধ্যে একেবারে বিলীন হইয়াই ছিল!

সে যেন পৃথিবীর কেহ নহে,—অন্তঃপুরের একটি নিভৃত কোণে সে যেন কয়েকটা দিনের জন্যই নামিয়া আসিয়াছে,—লোক-চক্ষুর অন্তরালে ফুটিয়া, নীরবে ঝরিয়া পড়িবে,—শুধু সেই মুহূর্ত্তটার জন্যই উন্মুখ অপেক্ষায় যেন সে বসিয়া রহিয়াছে!

সত্য এই বালিকাটিকে ঠিক চিনিতে পারে নাই। বৎসরের অধিকাংশ সময়ই সে বিদেশে কর্ম্মোপলক্ষে যাপন করে; পূজা ও বড়দিনের স্বল্পাবকাশে যখন বাড়ী আসিত তখন সে একটি সরমকুণ্ঠিতা বালিকাকেই দেখিত! কেমন করিয়া অকুণ্ঠিত প্রেমাভিব্যক্তির মধ্যে স্বামীর হৃদয় জয় করিতে হয়, তাহা সে বুঝিত না! কতখানি নারীর অধিকার, তাহা সে জানিত না!

সে তাহার প্রেমরাশিকে তাহার হৃদয়ের মধ্যে সঙ্গোপনে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। যে প্রীতি, যে উচ্ছ্বসিত প্রেমের উৎস, তাহার অন্তর মধ্যে শতমুখে প্রবাহিত হইতেছিল, সে তাহার শতাংশও ত ভাষার সাহায্যে স্বামীর কাছে প্রকাশ করিতে পারিবে না!

স্বামীর স্পর্শ তাহার আবেগকম্পিত বক্ষের মধ্যে যে পুলক, যে হর্ষ, জাগাইয়া তুলিত, তাহার প্রতিদানে মুগ্ধা নারী সে কিনা করিতে পারে? সে স্পর্শে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবেশমুগ্ধ হইত, নয়নপল্লব নিমীলিত হইয়া আসিত,—নিখিলবিশ্ব তাহার কাছে লুপ্ত হইয়া আসিত! সে তখন আর তাহার নিজের অস্তিত্বকে পৃথক করিয়া অনুভব করিতে পারিত না! নীরবতার মধ্য দিয়া এই গভীর আত্মদান কাহিনীটুকু সত্য অনুভব করিতে পারিত না! নির্ম্মলা তাহার কল্পিত আদর্শের বহু উর্দ্ধে রহিয়া যাইত!

নির্ম্মলার প্রীতি একটা নীরব ধারায় প্রবাহিত হইতেছিল;—সে প্রবাহে তরঙ্গ নাই, কল্লোল নাই! এই নীরব কল্লোলবিহীন প্রেমোচ্ছ্বাসের মধ্যে সত্য তৃপ্তি পাইত না। সে চাহিত, এমনি একটি উচ্ছ্বসিত বিপুল আবেগ যাহা

তাহাকে বেষ্টন করিয়া, প্লাবিত করিয়া, ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে!

নির্ম্মলা তখনও পঞ্চদশী বালিকা, সত্যের তখনও বাইশ বৎসর পূর্ণ হয় নাই! সত্য অভিমান করিয়া পত্নীকে বেদনা দিয়া বুঝাইতে চাহিল যে সে আর কোনমতেই তাহার কাছে ধরা দিবে না! যেদিন নির্ম্মলা তাহার সমস্ত প্রেমরাশিকে স্বেচ্ছায় সত্যের কাছে নিবেদন করিয়া দিতে আসিবে, শুধু সেই দিনই সে তাহার অভিমান স্রোতকে সংরুদ্ধ করিবে!

কিন্তু নির্ম্মলা যে তাহার প্রদত্ত আঘাতগুলিকেও তাহার নিষ্ঠ প্রেমাভিসিঞ্চনের দ্বারা বরণ করিয়া লইত, সত্য তাহা বুঝিতে পারিত না! স্বামীর নিকট হইতে কতটুকু সে পাইতেছে, সে হিসাব তো সে করিত শিখে নাই! সে ভাল বাসিয়াই তৃপ্ত, সুখী! সে বিনা আড়ম্বরে, বিনা আয়োজনে, তাহার সবটুকু প্রেম তাহার দেবতার কাছে নিবেদন করিয়া দিয়াছে! দেবতা নৈবদ্য গ্রহণ করিলেন কিনা, ভক্ত তাহা হিসাব করিয়া দেখিতে চাহে না! সে নিবেদন করিয়াই সুখী—তৃপ্ত—মুগ্ধ!

সত্যের অভিমানের উপর একটা কঠিন আবরণ পড়িয়া আসিতেছিল,—এই নির্ব্বোধ মেয়েটি সেই আবরণটা ভেদ করিবার জন্যও একদিন এতটুকু আয়োজনও করিল না!

লক্ষ্মীপ্রতিমা বধূর বিরুদ্ধে ছেলে যে এমন একটা রুদ্ধ অভিমান পোষণ করিয়া আসিতেছে, জননী তাহা একদিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও সন্দেহ করেন নাই। সুতরাং এই মেঘটুকু জননীর অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিতেছিল!

ভাবপ্রবণ বিধু বুঝিয়াছিল, গঙ্গা ও যমুনার জল এক পুণ্যতীর্থে আসিয়া মিশিয়াছে;—কিন্তু এই উভয় জলরাশির মিলন স্থলে এমন একটি রেখা খুঁজিয়া পাওয়া যায়, যাহা তাহাদের উভয়কেই বিভিন্ন করিয়া চিনাইয়া দিতে পারে!

(৪)

সত্য কলিকাতার মেসে থাকিয়া সওদাগরী আফিসে কর্ম্ম করিত! তাহার সামান্য আয়ের উপরই সংসার নির্ভর করিত! মাসান্তে নিজ খরচের জন্য কয়েকটি টাকা রাখিয়া বেতনের বাকী অংশটা সে জননীর নিকট পাঠাইয়া দিত।

বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া সত্য আপনাকে কলিকাতার কর্ম্ম কোলাহলের মধ্যে ভুলাইয়া রাখিয়া, অন্তরের রুদ্ধ অভিমান রাশিকে সংযত, সংহত করিতে চাহিল! কিন্তু তাহার মর্ম্মবিতানে যে রুদ্ধ অভিমানরাশি গুমরিতেছিল, তাহাকে কোনমতেই অস্বীকার করিতে পারিল না।

কুসুমপেলবা বালিকা নির্ম্মলা—সে কি তাহারও হৃদয়ের মধ্যে স্থান লাভ করিতে পারে নাই! উচ্ছ্বসিত রূপ-মাধুর্য্যে যে দিন দিন পুষ্পিতালতিকাটীর মতই সর্ব্বশোভাময়ী হইয়া উঠিতেছে, হায়, তাহার অন্তরসৌন্দর্য্য যদি তাহার এই অনিন্দনীয় রূপরাশিকেও ম্লান করিয়া দিয়া প্রকাশিত হইয়া পড়িতে পারিত!

যে প্রাণোন্মাদকারী সুগন্ধ, রসমাধুর্য্য, ফুটনোন্মুখ কোরকের হৃদয়াভ্যন্তরেই নিবদ্ধ, মুগ্ধ সত্য তাহা অনুভব করিতে পারিল না। নির্ম্মলা যদি ভাষণ-চপলা হইত, সে যদি তাহার অন্তরের প্রেমরাশির শতাংশও মুখে ব্যক্ত করিয়া বুঝাইতে পারিত, তাহা হইলে বোধ হয় সত্য তৃপ্ত হইতে পারিত!

সত্য মনে করিয়াছিল, রূপসী নির্ম্মলা তাহার "সযত্নে ওজন করা বিন্দু বিন্দু প্রেম" "অবসর" মত তাহাকে প্রদান করিতে চাহে! সেই দানকৃপণ নারীর রুদ্ধদ্বার অন্তরের কাছে সত্য দস্যুর মত লুণ্ঠন করিতে যাইয়া দেখিল, সে দ্বার রুদ্ধ, লজ্জানতা নারী নীরবে তাহার প্রেমভারাবনত নয়ন-পল্লব অর্দ্ধনিমীলিত করিয়া রাখিয়াছে,—তাহার দৃষ্টি ভূতলচুম্বী;—সে মুখের দিকে চাহিয়া ভাল করিয়া কথাও বলিতে পারে না। তাহাকে সবলে দূরে নিক্ষেপ করিয়া পাষাণ প্রতিমাখানির মত চূর্ণ করিয়া ফেলাও যায় না; তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া সেই কৃপণের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করাও চলে না!

তাহার উপর ক্রোধ হইলেও, তাহাকে বক্ষের কাছে নিষ্ঠুরের মত টানিয়া আনিয়া সবলে দুই বাহুদ্বারা পীড়ন করিবারই মত অনেকটা প্রবল, উদ্দাম বাসনা হৃদয়ের মধ্যে তীব্রভাবে জাগিয়া উঠে! তাহাকে পীড়ন করিয়া, পেষণ করিয়া, তাহার জন্য অশ্রু অন্তর মধ্যে গুমরাইয়া উঠিতে চাহে!

নির্ম্মলাকে ভুলিতে চাহিয়াও কৃতকার্য্য হইল না! ভুলিয়া গেলে যেন তাহাতে শাস্তি দেওয়া হইল না! নিশিদিন সেই নারীর স্মৃতিকে হৃদয়ের মধ্যে জাগাইয়া রাখিতেই হইবে; তাহার অন্তরের প্রবল দহনকে নির্ম্মলার মানসী

মূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া নিশিদিন প্রজ্জলিত করিয়া রাখিলেই যেন সে তাহার অনভিব্যক্ত প্রেমের জন্য উপযুক্ত শান্তি পাইবে!

সুতরাং কলিকাতা আসিয়া সত্য তাহার নিঃসঙ্গ কক্ষটীর মধ্যেই একান্ত ভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিল,—আফিসের কয়েক ঘণ্টা ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত সময়টাই সে তাহার ক্ষুদ্র কক্ষটীর মধ্যেই কাটাইয়া দিত! সেখানে রাক্ষসী নির্ম্মলার স্মৃতিটুকু লইয়াই সত্যের কল্পনার ভাঙ্গাগড়া চলিত!

(৫)

প্রায় একবৎসর কাটিয়া গেল!

এই এক বৎসর মধ্যে নির্ম্মলা অনেকটা বুঝিতে শিখিয়াছে!

বেলাভূমিতে দণ্ডায়মান থাকিয়া সমুদ্রের তরঙ্গসঙ্কুল বক্ষের উপর যে দ্রব্যটি ফেলিয়া দেওয়া যায়, সমুদ্র তাহাকে কিছু দূর টানিয়া লইয়া যায়! তারপর চঞ্চল ঊর্ম্মি সবেগে যখন ফিরিয়া আসিয়া বেলাভূমির উপর প্রহত হয়, তখন সে সেই প্রক্ষিপ্ত দ্রব্যটীকে দাতার হাতের কাছেই বিপুল বেগে ফেলিয়া দিয়া যায়!

নির্ম্মলা তাহার নীরব প্রেমকে বারংবার সত্যের অভিমুখে প্রেরণ করিল, সত্য বিপুল বেগে তাহা তাহার অন্তর সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশে টানিয়া লইতে চাহিল, কিন্তু সে যাহা চাহে, তাহা সে পায় নাই; যাহা সে পাইল তাহাকে সে চিনিতে পারিল না;—মূর্খ সত্য, বালিকা নির্ম্মলার নিষ্ঠ প্রেমকে চিনিতে পারিল না,—তাহার হৃদয়ের মধ্যে যে চিরচঞ্চল প্রেমরাশি বিক্ষুব্ধ হইতেছিল, তাহা বালিকার বেদনার্ত্ত হৃদয়ের কাছে তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দানকে ফিরাইয়া লইয়া আসিল!

স্বামীর কাছে যে তাহারও কিছু প্রাপ্য থাকিতে পারে, নির্ম্মলা তাহা হিসাব করিয়া দেখিতে শিখে নাই!

স্ত্রী, স্বামীকে ভালবাসে, তাহার মধ্যে নূতনত্ব কিছুই নাই। কিন্তু,—ইহার মধ্যে একটা 'কিন্তু' আসিল কোথা হইতে? জগতের প্রত্যেক ব্যাপারের মধ্যেই ঐ "কিন্তু"টা যদি বিরাট বিশ্বম্ভর মূর্ত্তিতে চাপিয়া বসিয়া না থাকিত!

নির্ম্মলা তাহার সমবয়স্কাদিগের হাস্যপরিহাসের মধ্যে কেমন একটা নূতন সুর শুনিতে পাইত; সেই সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিবার উপযুক্ত কোন ঝঙ্কারই ত তাহার অন্তর মধ্যে সে খুঁজিয়া পাইত না! স্বামী ত তাহাকে তাহার বিবাহিত জীবনের কয়েকটি বৎসরের মধ্যে এমন কিছুই প্রদান করেন নাই, যাহা সে পরম সম্পদের মত বক্ষের কাছে আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিতে পারে! সে প্রথম প্রথম শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত। তার অবসর মুহূর্ত্তে যখন বিবাহিত জীবনের সমস্ত ইতিহাসটা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিত, তখন স্বামীর দেওয়া কোন সম্পদই ত পাইত না!

যে নারীপ্রকৃতি এতদিন সুপ্ত ছিল, আজ তাহা হঠাৎ কুম্ভকর্ণের রাক্ষসী ক্ষুৎপিপাসা লইয়া জাগিয়া উঠিল। নির্ম্মলা বুঝিতে পারিতেছিল না, তাহার ক্ষুধিত, তৃষিত, বেদনার্ত্ত অন্তর কি চাহে;—কিসের অতৃপ্তি এ!

হে নির্ম্মলার জীবন দেবতা, তুমি আইস, তুমিই বলিয়া যাও, এ কিসের ক্ষুধা,—এ কিসের তৃষ্ণা, এ কিসের বেদনা!

অন্তরের মধ্যে যে উৎস এতদিন রুদ্ধ ছিল, আজ তাহা কাহার নিষ্ঠুর অঙ্গুলিসঙ্কেতে বাধামুক্ত হইয়া, এই অসহায়া ব্যথিতা নারীকে একেবারে প্লাবিত করিয়া দিয়াছে!

হে নির্ম্মলার হৃদয় দেবতা, তুমি শঙ্করের মত এই উচ্ছ্বসিত, হৃদয়বেগকে ধারণ কর,—এই উদ্দাম প্লাবনকে শান্ত কর, সংহত কর!

(৬)

ভাদ্র মাসের শেষ।

বিধু সন্ধ্যার পূর্ব্বে মণ্ডপ-গৃহের সম্মুখে উপবিষ্ট ছিল। পশ্চিমাকাশে তখনও রঙিন্ মেঘের খেলা চলিতেছিল। বৃক্ষচূড়ায় তখনও একটি কোমল রক্তিমাভা রঞ্জিত মেঘের ফাঁক দিয়া আসিয়া লাগিতেছিল! অপরাহ্নে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য বৃষ্টি হইয়াছিল! বৃক্ষপত্রগুলি তখনও ভাল করিয়া শুকায় নাই। জলসিক্ত পত্রগুলির উপর সেই কোমল রক্তিমাভাটুকু লাগিয়া এক অপূর্ব্ব উজ্জ্বলতার সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছিল।

বিধু কিছু পূর্ব্বে পীড়িতা জননীর কাছে বসিয়া রামায়ণ পড়িতেছিল।

একটি নীলোৎপল কম পড়িয়াছে; দেবীর পূজা অসমাপ্ত রহিয়া যায়;—অনন্যোপায় রামচন্দ্র স্বীয় নীলাব্জসুন্দর নয়ন উৎপাটিত করিয়া দিয়া দেবীর অর্চ্চনা সম্পূর্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন! অদূরে বিষণ্ণ লক্ষ্মণ পূজারত অদ্ভুত-কর্ম্মা জ্যেষ্ঠের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন! তারপর সেই

সার্থক মুহূর্ত্তে প্রসন্না সিংহবাহিনী ভক্তের অন্তর সিংহাসন ছাড়িয়া বাহিরে আসিলেন ;—ভক্তের অর্চ্চনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতার মণ্ডিত করিয়া দিলেন !

সেইদিন, সেই মুহূর্ত্ত ভক্তের পক্ষে কি আনন্দের দিন, কি সার্থকতার মুহূর্ত্ত !

বাহিরের সৌন্দর্য্য, আকাশের রঞ্জিত মেঘের খেলা, আজি আর বিধুকে মুগ্ধ করিতে পারিতেছিল না ! তাহার অন্তরমধ্যে তাহার চিরপোষিত আশা আজি আবার প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিতেছিল !

আবার পূজা আসিতেছে ! দিকে দিকে বিরাট আয়োজন চলিতেছে ! বর্ষণক্লান্ত, খণ্ড, লঘু মেঘগুলি আকাশের গায়ে ভাসিয়া বেড়াইতেছে ;—পৃথিবীর আয়োজনকে সম্পূর্ণ করিবার জন্ত যেন মেঘের রাজ্যেও আয়োজন চলিতেছে ! নিখিল বিশ্ব এই আনন্দোৎসবে বিপুল উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়াছে !—বিধু তাহার হৃদয়ের দিকে চাহিল, সেখানে উৎসব নাই কেন ?—আয়োজন নাই কেন ?

নিঃস্ব, দীনবালক কেমন করিয়া বিশ্বজননীর পূজার আয়োজন করিবে ! তাহার হৃদয়ে এই অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা কেন ? যে আকাঙ্ক্ষাকে সার্থকতা প্রদান করিবার উপায় সে খুঁজিয়া পায়না, সে আকাঙ্ক্ষাকে উন্মাদের মত সে হৃদয় মধ্যে পোষণ করিতেছে কেন ?

সন্ধ্যা কখন তাহার গাঢ় নীলাঞ্চলখানি দিয়া নিবিড়ভাবে ধরণীর পৃষ্ঠ ঢাকিয়া দিয়াছে ;—আকাশে নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে ;—বিধু তখনও প্রস্তর মূর্ত্তিখানির মত তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে বসিয়াছিল ; এমন সময় জননী কাছে আসিয়া ডাকিলেন, "বিধু -"

বিধু চমকিয়া উঠিল ; জননীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—"মা, এই ঠাণ্ডায় বাহিরে আসিয়াছ কেন ?"

"কতবার তোকে ডাকিলাম, তুই সাড়া দিস্ নাই তো ।"—

"আমি শুনি নাই; ভিতরে চল মা তুমি"—বিধু জননীর সহিত অন্তঃপুরে গেল !

বিধু কহিল,—"মা, পরশু দাদা বাড়ী আসিবেন লিখিয়াছেন ।"—

নির্ম্মলা শ্বশ্রূর পদসেবা করিতেছিল, অবগুণ্ঠনের অন্তরাল দিয়া সে একবার দেবরের মুখের দিকে চাহিল !

"সত্যের চিঠি আসিয়াছে বুঝি, ভাল আছে ত সে ?

"দাদা দুই দিনের ছুটি পাইয়াছেন, ভাল আছেন তিনি ।"—

নির্ম্মলার বক্ষের মধ্যে বড় কাঁপিতেছিল ; তাহার বক্ষের গুরুস্পন্দন শব্দ যেন বাহিরেও শুনা যাইতেছিল ; সে শ্বশ্রূমাতার দিকে চাহিয়া শুষ্ককণ্ঠে কহিল, "মা ঠাকুরপোকে ভাত দেব কি ?"—

"যাও, রাত ত কম হয় নাই ।"

নির্ম্মলা উঠিল ।

নির্ম্মলা রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিয়াই দীপাধার যথাস্থানে রক্ষা করিল ; তারপর দুই হাতে বক্ষ চাপিয়া সেই খানেই বসিয়া পড়িল । তাহার বক্ষের গুরুস্পন্দনটা তখনও যায় নাই !

(৭)

নির্ম্মলা যখন কম্পিতপদে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল, তখন রাত্রি প্রায় দশটা ।—

সত্য টেবিলের কাছে ছোট একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া একটা মাসিকের পাতা উল্টাতেছিল !

নির্ম্মলা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, একবার চকিতনেত্রে সত্য তাহার দিকে চাহিল ।

সেই বিপুল সৌন্দর্য্যোদ্ভাসিত, লীলাতরঙ্গায়িত দেহলতা ! নির্ম্মলা নত নেত্রে দণ্ডায়মানা ছিল, যেন কোন্ অশরীরিণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিয়াছে । তাহার কপোলের বর্ণসুষমা কক্ষস্থিত স্নিগ্ধোজ্জল আলোক সম্পাতে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল ।

সত্য ভাবিতেছিল, এই নারীকে সেই মুহূর্ত্তে তাহার দৃঢ়বাহুদ্বারা সবলে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া নিষ্ঠুরের মত একেবারে নিষ্পিষ্ট, বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারিলে কি অন্তর তৃপ্ত হইবে ! কোন বাধা না মানিয়া ক্ষমাহীনের মত চুম্বনে চুম্বনে তাহার শোণিত-রাগ-রঞ্জিত সুগৌর কপোল দুইটীকে যদি সে আরও রঞ্জিত করিয়া দেয়, তাহা হইলে কি নির্ম্মলাকে শাস্তি দেওয়া হইবে !

সত্যের হৃদয়ের মধ্যে একটা তীব্র আবেগ, স্ফীত, উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল ; সে কঠোর হস্তে টেবিলের

একখানি কাঠ চাপিয়া ধরিল। নির্ম্মলাকে একটা কিছু বলা আবশ্যক,—কি বলিবে সে নির্ম্মলাকে? নির্ম্মলা—নির্ম্মলা!—না, সে হয় তো কিছুই বুঝিতে পারে নাই! নির্ম্মলার সম্বন্ধে সে হয় তো বরাবরই অবিচার করিয়া আসিয়াছে! এই সহায়হীনা উপেক্ষিতা নারী! ইহাকে ত সে কোন সম্বলই প্রদান করে নাই! সে মুখের দিকে চাহিয়া মুখ ফুটিয়া কথা বলিতে পারে না,—তাহাকে সে ত অকরুণ, নির্ম্মম ব্যবহারই এতকাল দিয়া আসিয়াছে; কি অপরাধ তাহার? সে লজ্জাহীনার মত তাহার অন্তর-নিহিত প্রেমকে নিবেদন করিয়া দিতে পারে নাই—এই ত তাহার অপরাধ!

গর্ব্বিত পুরুষ সে,—সেও ত করুণ ব্যবহারের দ্বারা তাহার হৃদয়কে জয় করিতে চাহে নাই! তাহার মত নির্ম্মলাও যদি অভিমান করিয়া থাকে!

সত্য আর তাহার চিন্তার শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে পারিতেছিল না; এমন করিয়া সে তো আর কোন দিনই ভাবে নাই! তাহার উন্মুখ হৃদয় তীব্র আবেগে অস্থির হইয়া উঠিল! সে হঠাৎ নির্ম্মলার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল, ডাকিল,—"নির্ম্মলা!"

এ কি আহ্বান! বেদনার্ত্তের কণ্ঠ সেই আহ্বানের মধ্যে বাজিয়া উঠিল।

নির্ম্মলা চমকিয়া উঠিল; তাহার ভূতলচুম্বী দৃষ্টি উৎসারিত করিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিল, দেখিল, সে মুখে একটা অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে!

নির্ম্মলা স্বামীর দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল! স্বামীর হৃদয়ে যে একটা তীব্র দহন চলিতেছিল, নির্ম্মলা তাহা যেন কতকটা বুঝিল;—কিন্তু কেমন করিয়া যে এই দহনকে শান্ত করিতে হয়, কৌশলটা ত সে জানে না!

সে যে তাহার চারিদিকে এমন করিয়া একটা আনন্দহীন ব্যর্থতা রচনা করিয়া তুলিয়াছে, তাহাই মনে করিয়া সে ক্ষুব্ধ, কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল!

হায়, স্বামীর হৃদয়ের প্রত্যেক স্পন্দনটী পর্য্যন্ত কেন সে তাহার অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে পারে না?

সত্য দেখিল, নিশ্চল মর্ম্মর প্রতিমাখানির মতই নির্ম্মলা তাহার কাছে নীরবে আসিয়া দাঁড়াইল! তাহার অর্দ্ধাবগুণ্ঠন একপাশে সরিয়া গিয়াছে; আর সেই স্রস্ত গুণ্ঠনাবকাশ দিয়া একখানি পরম কমনীয় মুখ দেখা যাইতেছিল; শৈবাল জড়িত শতদলের মত, ভ্রমরকৃষ্ণ কেশজালাবৃত সেই মুখখানি বড় সুন্দর!

বৃশ্চিক দংষ্টের ন্যায় তীব্র কাতর স্বরে সত্য বলিয়া উঠিল,—"নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর, তুমি কেন এত রূপ লইয়া আসিয়াছিলে!—"

নির্ম্মলা কাঁপিতেছিল;—তাহার পদতল হইতে পৃথিবী যেন সরিয়া যাইতেছিল;—তাহার সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়া আসিতেছিল। ঘরের আলোটার চারিপাশে একটা কালো ছায়া নাচিয়া উঠিল!

——পরক্ষণেই সত্যের উন্মাদ বাহুবেষ্টনীর মধ্যে একখানি মূর্চ্ছাতুর তরুণদেহ আশ্রয় পাইল।

সত্য স্বীয় বক্ষোবন্ধনের কাছে সেই কুসুমপেলব তনুখানি দৃঢ়ভাবে চাপিয়া ধরিল; একটা তীব্র, উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস তাহার দীর্ণ বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল।

সে যাহাকে আঘাত করিবার জন্য উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, সেই নারী আঘাত পাইয়া তাহারই বক্ষের কাছে আসিয়া, এমন করিয়া, একান্তভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে!

সত্য একটু নীচু হইয়া নির্ম্মলার রক্তপুষ্পদলতুল্য অধরপুটে স্বীয় আবেগ কম্পিত অধর সংস্থাপিত করিল। তারপর সবেগে সেই মূর্চ্ছাতুর দেহ পার্শ্বস্থিত শয্যার উপর নিক্ষেপ করিয়া, অস্থিরভাবে সেই কক্ষের মধ্যে পদচারণা করিতে লাগিল।

(৮)

বিধু ব্যস্তভাবে ডাকিল, "বৌদি—"

নির্ম্মলা তখন সান্ধ্য আরতির আয়োজন করিতেছিল, বিধুর আহ্বান শুনিয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, মৃদুকণ্ঠে কহিল,—"কি ঠাকুরপো?"—

"বৌদি, মার অসুখ ত বাড়িয়া পড়িল দেখিতেছি"—

নির্ম্মলা সভয়ে বিধুর কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল, "ঠাকুরপো, ভয়ের কিছু কি?"

"তা' কি আমি ভাল বুঝি, বৌদি?"

"তবে"—

"মা এইমাত্র হঠাৎ আমাকে বলিলেন, 'বিধু শরীর বড় খারাপ হইয়া পড়িল, আর বেশী দিন দেরী নাই

আমার,"—বিধু কথা শেষ করিতে পারিল না; তাহার কণ্ঠস্বর অশ্রুজড়িত হইয়া আসিল।

নির্ম্মলা হরিণীচঞ্চল দৃষ্টিতে একবার কক্ষের চারিদিকে চাহিল; মার অসুখটা যেন মূর্ত্তি ধরিয়া তখনি সেই কক্ষের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে! নির্ম্মলা ব্যস্তভাবে কহিল, "চল ঠাকুরপো, আমরা মার কাছে যাই।"

নির্ম্মলা ভাবিতেছিল, অসুখটাকে যদি হাতে পায়ে ধরিয়া, অনুনয় বিনয় করিয়াও ফিরাইয়া দেওয়া যাইত!

চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া বিধু কহিল, "মার কোনও ইচ্ছাই পূর্ণ করিতে পারিলাম না বৌদি,"—তাহার কল্পনা, আশা, সমস্তই অপূর্ণ রহিয়া যাইবে; হায়, জননী জীবিতা থাকিতে যদি সে একবারও জগদম্বার অর্চ্চনা করিতে পারিত!

এতদিন ধরিয়া কল্পনায় যে চারু চিত্রপট বিধু অঙ্কিত করিতেছিল, তাহার মধ্যে নির্ম্মলার তুলিকাস্পর্শও কম ছিল না! বিধু চিত্র অঙ্কিত করিয়া নির্ম্মলাকে দেখাইত, নির্ম্মলা তাহার মায়াতুলিকার বিচিত্র রেখা সম্পাতে সেই চিত্রকে জীবন-সম্পদ প্রদান করিতে চাহিত!

আজ বিধুর শুষ্ক মুখ দেখিয়া নির্ম্মলা ব্যথিতা হইয়া উঠিল! সে একটু ভাবিয়া কহিল, "পূজা করিলে হয় না, ঠাকুরপো?"

"কি করিয়া হ'বে বৌদি?"—

"পূজার আর কয়দিন বাকী আছে?"—

"নয় দিন"—

"আমাদের বাড়ীতে একবার চারিদিনের মধ্যে সমস্ত বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল"—

"তা' হয়, কিন্তু?—"

"কিন্তু কি, ঠাকুরপো?—

"টাকা,—টাকার কাজ কেমন করিয়া চলিবে।" নির্ম্মলা একবার বিধুর দিকে চাহিল, একবার জানালার ফাঁক দিয়া বাহিরের দিকে চাহিল। তারপর ধীরে ধীরে কহিল,—

"আমার একটা কথা রাখিবে?—রাখিবে, ঠাকুরপো?—না, একথা তোমায় রাখিতেই হইবে,—দেখিব, বৌদির উপর কত স্নেহ,—"

বিধুর কৌতূহল, মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিতেছিল! সে নির্ম্মলার হাস্য প্রফুল্ল স্নেহপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—

"কি কথা বৌদি?"

"রাখিবে ত আমার কথা? আমাকে ছুঁইয়া প্রতিজ্ঞা কর,—"

"রাখিব,"—নির্ম্মলার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া বিধু হাসিয়া উঠিল—" ঠাকুরপো, আমার বালাজোড়াটা বিক্রয় করিলে প্রায় দেড় শত টাকা হইবে, সেই টাকা—"

বিধু ব্যস্তভাবে বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—

"না, না—তা' কি হয় বৌদি?

—"বীরপুরুষ আর কি! প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার কি চোট্—"

"বৌদি—"

"ঠাকুপো, মার ইচ্ছা পূর্ণ করার চেয়ে আর কি বড় আছে, ঠাকুরপো!" নির্ম্মলা ধীরে ধীরে কথা কয়টি কহিল! তাহার চক্ষে অশ্রুর একটা ক্ষণিক উচ্ছ্বাস দেখা যাইতেছিল।—

মাতার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য বিধু কি না করিতে পারে!

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বিধু কহিল, "বৌদি, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক্"—তাহার দুই কপোল প্লাবিত করিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছিল!

নির্ম্মলা ধীরে ধীরে বিধুর হাত ধরিল, কহিল, "ছিঃ ভাই, চল, মার কাছে চল,—মনে থাকে যেন, আর নয়দিন মাত্র বাকি।"

বিধুর কল্পনা-চিত্র আজ নির্ম্মলার মায়া-তুলিকাস্পর্শে সার্থক হইতে চলিল।

(৯)

সপ্তমীর দিন প্রভাতে আবার সানাই বাজিতেছিল! সেই বড় পুরাতন সুর;—সেই চির করুণ সুর!

সত্যের চণ্ডীমণ্ডপে দেবী প্রতিমা বড় শোভা পাইতেছিল।

মণ্ডপের একপার্শ্বে অজিনাসনে উপবিষ্টা এক বর্ষীয়সী নারী একদৃষ্টিতে জগদম্বার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন।

মা, এমনি করিয়া তুমি তোমার সেবিকার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলে! তুমি যে বধূ মূর্ত্তিতে আমার গৃহে আসিয়াছ, তাহা তো আমি জানিতাম না, জননী!

আজ জীবনের সায়াহ্নে, নিখিল বিশ্বের উপর একখানি শান্ত যবনিকা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে!—

জীবন ভরিয়া তুমি তোমার কত লীলাই দেখাইয়াছ,—আজ জীবনের অবসান-প্রায়-মুহূর্ত্তে আবার তুমি আসিয়াছ মা! কাঙ্গালিনীর কাতর প্রার্থনা তুমি শুনিয়াছ,—আজ তোমাকে অন্তর ও বাহির পূর্ণ করিয়া বিরাজিতা দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছি!

দীন বাঙ্গালার গৃহ ধান্য ও ধনে পরিপূর্ণ করিয়া,—প্রীতিতে, প্রফুল্লতায় উজ্জ্বল করিয়া,—ভক্তিতে, বিশ্বাসে প্রদীপ্ত করিয়া,—আশায়, উৎসাহে মুখরিত করিয়া আবার আসিয়ো মা!

সূর্য্যোদয়ের অল্পক্ষণ পরেই সত্য আসিল। সত্য রাস্তার উপর হইতেই দেখিল, মণ্ডপে দেবী প্রতিমা বড় শোভা পাইতেছে,—সে তাহার নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। একি স্বপ্ন! বিস্মিত সত্য মণ্ডপের সম্মুখে আসিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিল, ডাকিল,—"মা"—

জননী মণ্ডপে ছিলেন, উত্তর দিলেন,—"সত্য আসিয়াছিস্?"

সত্য ভাবিল যেন জগজ্জননীরই স্নেহতরল কণ্ঠের আহ্বান।

সে জুতা ছাড়িয়া মণ্ডপে প্রবেশ করিল। উপবিষ্ট জননীকে দেখিয়া সত্য চমকিয়া উঠিল। একখানি নিষ্ঠাপূত দেহ, নির্ব্বাণোন্মুখ হোমাগ্নিশিখার মত শোভা পাইতেছিল। একটা কোমল অপার্থিব জ্যোতি, সেই স্নেহোদ্ভাসিত মুখখানিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সত্য দেখিল, সমস্ত জীবনব্যাপী আরতির অবসানমুহূর্ত্ত নিকটতম হইয়া আসিতেছে; সেই প্রতিমার সম্মুখে আর একখানি ভক্তিরসনাপ্লুত দেবীমূর্ত্তি যেন একটি বিপুল কৃতার্থতার মধ্যে আপনাকে বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছে!

সত্য জননীকে প্রণাম করিয়া কাতর কণ্ঠে কহিল, "মা, তোমার শরীর এত খারাপ হইয়াছে, তাহা তো আমাকে জানাও নাই!"—

"কয়েক দিন পরেই ত তুই আসিবি, তাই বিধুকে নিষেধ করিয়াছি;—সত্য, বিধু আর আমার পাগলী মা, এবার মাকে ঘরে আনিয়াছে।—এবার আমাকে যাইতে দিস্ সত্য,—আমার মেয়াদ ফুরাইয়াছে, বুঝিতেছি।—মাকে প্রতিবৎসর আনিস্, সত্য!"—সত্যের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল; জননী মুখ ফুটিয়া এমন কথা তো কোনদিনই বলেন নাই!

বিধু কাছে ছিল, সত্য তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, "বিধু, তুই আমাকে জীবনব্যাপী অনুতাপ হইতে রক্ষা করিয়াছিস্!"—

সেই দিন সন্ধ্যার সময় শয্যারচনার নিমিত্ত নির্ম্মলা তাহার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল।

আজ সমস্ত দিন ধরিয়া মহাপূজার আয়োজন ও অনুষ্ঠানের মধ্যেও তাহার বক্ষের গুরুস্পন্দনটী একটিবারের জন্যও থামে নাই। কর্ম্মব্যস্ত নির্ম্মলা অবগুণ্ঠনান্তরাল হইতে যখনি স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়াছে, তখনি সে দেখিয়াছে, যে স্বামীর দৃষ্টি তাহাকে প্রতি কার্য্যের মধ্যেই অনুসরণ করিতেছে! কই, এমন করিয়া তো স্বামী তাহার মুখের দিকে আর কোন দিনই চাহেন নাই!

একটি অনাবিল তৃপ্তির ধারা, আজি তাহার অন্তরের রাজ্য প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছিল, এতদিন কোন দুর্ব্বার বাধার শি তাহাকে তাহার প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইতে দেয় নাই,—আজ যেন সে বাঁধা দূরে গিয়াছে, এই যেন সর্ব্বপ্রথম তাহার জীবনে চিরঈপ্সিত মিলন-মুহূর্ত্ত আসিতেছে। আজিই যেন নির্ম্মলার উন্মুখ নারীপ্রকৃতি তাহার ন্যায্য অধিকার-সীমায় সর্ব্বপ্রথম পদার্পণ করিল। সে রাজ্য তাহার চিরন্তন, অখণ্ড অধিকার!

কি ভাবিয়া নির্ম্মলা রচিত শয্যার পার্শ্বদেশে ঘুরিয়া একটি দেরাজের কাছে গেল! দেরাজ টানিয়া খুলিল; একখানি খাতার মধ্যে একখানি সযত্ন রক্ষিত আলোকচিত্র ছিল, এদিক ওদিক চাহিয়া, নির্ম্মলা তাহা বাহির করিল। তারপর সরিয়া আসিয়া প্রদীপের কাছে দাঁড়াইল!

ক্ষুদ্র চিত্রখানি—কাহার সে চিত্র?

নির্ম্মলা সে চিত্রখানি কৃপণের মত সাবধান হস্তে একবার বক্ষের কাছে দৃঢ়ভাবে চাপিয়া ধরিল, তারপর তুলিয়া লইয়া স্বীয় রক্তাধর স্পর্শ করাইবার জন্য একটু নীচু হইল —এমন সময়ে অতর্কিতে কাহার দৃঢ়বাহু তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল;—নির্ম্মলার মুখ হইতে অস্ফুট ভীতিধ্বনি বাহির হইবার পূর্ব্বেই, একটি চিরপরিচিত প্রিয়কণ্ঠস্বরের সাদর সম্ভাষণ তার মুগ্ধ কর্ণের কাছে গুঞ্জরিয়া উঠিল!

—"নির্ম্মলা,—আমার প্রিয়া"—

সরমকুন্ঠিতা নির্ম্মলা স্বামীর বক্ষের কাছে তাহার রঞ্জিত মুখখানি লুকাইল!

আজ তাহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে! যে সমুদ্র তাহার নীরব-দানকে এতদিন বিপুল বেগে ফিরাইয়া দিয়াই আসিয়াছে, আজ সে তাহাকে তাহার অন্তরের গভীরতম প্রদেশে টানিয়া লইল!

আজি নির্ম্মলার নীরবতা আর সত্যকে আঘাত করিতেছে না,—অভিমানের দ্বারা সত্য তাহার "সৌন্দর্য্যোদ্ভাসিতা নির্ম্মলাকে" কুন্ঠিতা করিতেছে না!

(১০)

বিজয়ার দিন প্রভাতে শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট সত্যকে জননী কহিলেন,—"সত্য আজি আর উঠিয়া যাইতে পারিব না, আমার বিছানা মণ্ডপের একপাশে কর; তারপর আমাকে—আমাকে সেথানে নিয়া চল।"—জননী এই কয়েকটি কথা বলিয়াই অত্যন্ত পরিশ্রান্তা হইয়া পড়িলেন!

সত্যের চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইয়া আসিল; সে কষ্টে অশ্রুরোধ করিয়া কহিল—"এই দুর্ব্বল অসুস্থাবস্থায় তোমাকে একটা টানাটানি করিলে ক্ষতি হইতে পারে মা"—

জননী একটু হাসিলেন; নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখা বায়ু সংস্পর্শে যেন একটু কাঁপিয়া উঠিল।

—"পাগল আর কি!"—বিধু সেথানে ছিল; সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া তাহার চক্ষুর পাতা স্ফীত হইয়াছে, সে ভগ্নস্বরে কহিল, "দাদা, মার ইচ্ছাই পূর্ণ কর, মাকে মণ্ডপে নিয়া চল।" সত্য আর জননীর ইচ্ছায় বাঁধা দিল না!

মণ্ডপে আসিয়া জননী কহিলেন, "মা, আমার জপ-মালা?"—অশ্রুমুখী নির্ম্মলা জপমালা আনিয়া দিল। জননী কহিলেন, "সত্য, বিধু, এদিকে আয়; মা তুমিও আইস,—লজ্জা কি মা! সত্য, আমার মাকে অযত্ন করিস্ না; নির্ম্মলা লক্ষ্মী, বহু পুণ্যফলে উহাকে পাইয়াছিলাম। বিধু, তোর বৌদিদির সঙ্গে চিরদিন মিশিয়া মিশিয়া থাকিস্!" জননী সত্যের হাতে বিধু ও নির্ম্মলাকে অর্পণ করিলেন, তারপর নীরবে তিনজনের মস্তকে হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

কিছুক্ষণ চক্ষু বুজিয়া থাকিয়া কহিলেন,—"বিধু, তোর বৌদিদির মাথার কাপড়টা সরাইয়া আমাকে উহার মুখখানি একবার ভাল করিয়া দেখা।"

নির্ম্মলা কাঁদিতেছিল, অবগুণ্ঠনমুক্ত অশ্রুপ্লাবিত সুগৌর মুখখানির দিকে চাহিয়া চাহিয়া জননী কহিলেন, "মা, তুমি এই গৃহের গৃহলক্ষ্মী, আজ তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমি নিশ্চিন্ত চিত্তে যাইতে পারিব, তুমি সুখে থাক, সকলকে সুখী কর, মা!"

নির্ম্মলা কাঁদিতে কাঁদিতে জননীর পদধুলি গ্রহণ করিল। সত্য একবার নির্ম্মলার মুখের দিকে চাহিল, দেখিল সে মুখে পুণ্য ও নিষ্ঠার একটি বিমল জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

স্বর্গপথযাত্রিনী জননীর পুণ্য আশীষ তাহাকে সকল গৌরবের মধ্যে প্রতিষ্ঠিতা করিয়া দিয়াছে!

তারপর জননী আর কোনও কথা কহিলেন না, মুখ ফিরাইয়া লইয়া জগন্মাতার মুখের উপর দৃষ্টি সংস্থাপিত করিলেন।

* * * * *

দ্বিপ্রহরে যখন বিশ্বজননীর প্রতিমাখানি প্রাঙ্গণে আনা হইল, তখন সমাগত প্রতিবেশীদিগের কয়েকজন, সেই মহা-প্রস্থানোদ্যতা পুণ্যবতীর নিষ্ঠাপূত দেহখানিও জগন্মাতার জবা-বিল্বদল-চর্চ্চিত চরণমূলে আনিয়া সসম্ভ্রমে রক্ষা করিলেন।

তখনও প্রতিবেশীর আলয়ে সানাইয়ের সেই চির-পুরাতন বেদনাপ্লুত বিদায়ের রাগিণীটি বড় করুণ সুরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাজিতেছিল!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

পুত্রহারা।

মাণিক আমার ঘুমিয়েছে নাকি?
　আহা থাক্, তবে ডেকোনা তাকে!
তিনরাত বাছা ঘুমোতে পারেনি,
　জ্বরের ঘোরে চেয়েনি মাকে।

কাছ থেকে সব সরে যাও দেখি,
চুপ্, চুপ্, কেউ ক'য়োনা কথা।
ঘুম ভেঙ্গে গেলে হবেনা আবার—
ভুলে থাক্ যাদু রোগের ব্যথা।
ওকি, ওকি, সব কেঁদে ওঠ কেন?
হায় হায় তবে কি হ'ল এর!
চিরঘুমে মণি ঘুমিয়ে পড়েছে?
শেষ হয়ে গেছে গ্রহের ফের!

*   *   *   *

দুখীর মতন বাছাকে আমার
নিয়ে যেওনাক' শ্মশানঘাটে।
তোষকটা তার পেতে দিও বাপু!
লাগে যদি গায়ে দড়ির খাটে।
পাশের বালিস দুইপাশে রাখ,—
অভ্যেস তার চিরটা কাল!
'শান্তিপুরে' টা পরিয়ে দিও ত'
গায়ে দিয়ে দিও দুরঙ্গা শাল।
সিল্কের নীল পিরাণ' পরুক্,
দুপায়ে থাকুক নতুন জুতো।
ধুতি জামা পাশে থাকে থাকে রাখ,
সাথে দিও ঘুড়ী, লাটাই, সুতো।
'ফাষ্ট্ বুক'টা সুরু করেছিল,
আধখানা খাতা রয়েছে লেখা;
কথামালা খানা শেষ করে গেছে,
ভাগ কসা তার হ'লনা শেখা!

বই, খাতা, আর কলম, দোয়াত
সবি দাও সাথে, যা'গেছে রেখে—
গেল রবিবারে নতুন লাটিম
কিনেছিল আহা, বাজার থেকে!
কাজল-লতাটা নিয়ে এসো কেউ
কেউ আন দেখি তেলক-মাটি!
ঠাকুর-ঝি হাত ধ'রে থাক্ ভাই!—
আমি বসে ফোঁটা কপালে কাটি।
জীবনের শোধ সাজিয়ে ছেলেকে
শেষ করি আজ সাজার পালা!
কোথায় চল্‌লি নয়নের মণি,
বুকের পাঁজরা, জপের মালা?
নিয়ে যাবে যারা শুনে রাখ তারা,
সাবধানে খাট ধরো গো তুলে!
মাথাটা যেন না কাত হয়ে পড়ে,
শালখানা যেন যায় না খুলে!
পড়ে থাক্ তার শিশিভরা গঁদ,
ছেঁড়া জুতোযোড়া, পুরোণ' মোজা,—
আর পড়ে থাক্ দুখিনী মায়ের
বুকভরা যত শোকের বোঝা!
'ঘাটে' দেখে যদি কেউ বলে 'আহা
কার বাছা গেল!' কাণে তা' এলে—
বলে দিও তাকে, আর কারো নয়
হতভাগী এই আমারি ছেলে!

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু।

স্মৃতিপূজা।*

যষ্ঠাংশতকের অমর কবি কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মভূমি বলিয়া যে সেনহাটীগ্রাম আজ বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণের পবিত্র তীর্থস্থলে পরিণত হইয়াছে, আমার জন্মস্থানও সেই সেনহাটী গ্রামে। কিন্তু কবিকে সর্ব্ব প্রথম দেখিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল আমার যশোহরে। সে অনেক দিনের কথা। তিনি তখন যশোহর জেলাস্কুলের হেড পণ্ডিত ছিলেন। তারপর কত-বার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, কতবার তাঁহার সহিত কত কথার আলোচনা করিয়াছি, কতবার তাঁহার পাদমূলে বসিয়া কত অমূল্য উপদেশ লাভ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে

* কবির দ্বাদশ সাম্বৎসরিক স্মৃতিসভায় পঠিত।

করিয়াছি। কিন্তু সেই প্রথমবার সাক্ষাতেই তাঁহার চরিত্রের যে অকৃত্রিম সরলতা, অসীম আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান দৃঢ় স্বাবলম্বন-প্রিয়তা ও কঠোর কর্ত্তব্যবুদ্ধির পরিচয় পাইয়াছিলাম মানুষে তাহা একান্ত দুর্লভ না হইলেও নিতান্ত সুলভও নহে। আমি সেই কথাই বলিতেছি।

আমার খুল্লতাত শ্রীযুত কেদারনাথ সেন যশোহরে ওকালতী করেন। একবার শীতকালে তাঁহার সহিত আমি যশোহরে গিয়াছিলাম। সেখানে গিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত আমি কাছারী বেড়াইতে যাইতাম। একদিন কাছারী হইতে ফিরিবার পথে হঠাৎ তিনি গাড়োয়ানকে গাড়ী থামাইতে বলিয়াই গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমিও নামিলাম। তখন পথ দিয়া শুষ্কদেহ, রুক্ষকেশ, মলিনবসনধারী, দীনদর্শন একজন লোক যাইতে ছিলেন। আমার খুল্লতাত মহাশয় ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। আমি বিস্ময়ে অবাক হইয়া ভাবিলাম, একি ব্যাপার! আমার কাকা ইহাকে প্রণাম করেন কেন? এমন সময় কাকা বলিলেন, "মজুমদার মহাশয়, গাড়ীতে আসুন, এক সঙ্গে যাই।" সে লোকটি বলিলেন, "কেন কেদারবাবু, আমি আপনার গাড়ীতে যাইব কেন?" কাকা বলিলেন, "তাহাতে দোষ কি? আমি আপনার গ্রামবাসী স্বজাতি ও আত্মীয়, আমার গাড়ীতে যাইতে আপনি কিন্তু করিতেছেন কেন?" লোকটি উত্তর করিলেন, "কেদারবাবু, আপনি আমার আত্মীয়, আপনার গাড়ীতে যাইতে কোন দোষ নাই। কিন্তু আমি যাইব কেন? লোকে যখন অভাবে পড়ে, তখন আত্মীয় স্বজনের সাহায্য লয় তা ঠিক, কিন্তু আমার পদদ্বয় ত বেশ সবল ও সুস্থ আছে, আমি ত হাঁটিতে পারি, এ অবস্থায় আমি আপনার সাহায্য লইব কেন? আমার যে কার্য্য নিজে করিবার সাধ্য আছে সে জন্য পরের—হউনই বা তিনি আত্মীয়, সাহায্য লওয়া লোকতঃ ধর্ম্মতঃ অতি গর্হিত। তাহাতে ভগবানের নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়, তাহাতে ভগবানের দানের অপব্যবহার করা হয়, তাহাতে পাপ হয়; সুতরাং আমি ত যাইব না। আমায় মাপ করুন কেদারবাবু।"

এই বলিয়া তিনি হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন। আমার কাকা ও আমি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। পথে কাকাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কে ইনি?" কাকা বলিলেন "ইঁহাকে চিনিস্ না? ইঁহার বাড়ী আমাদের গ্রামে, নাম কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, একজন বড় কবি। 'সদ্ভাবশতক' নামক একখানা ভাল বাঙ্গালা কবিতা পুস্তক লিখিয়াছেন। কিন্তু ইঁহার প্রশংসা শুধু বড় কবি বলিয়া নহে—ইনি অতি সৎলোক—দেবতার মত মানুষ।" কাকার কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়া কবির দিকে চাহিলাম। এই সময় আমরা যশোহর 'লোন' আফিসের কাছে আসিয়া পৌছিয়াছিলাম—লোন আফিসের ঠিক পশ্চিমে ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের হোটেলে কবির বাসস্থান। তিনি বাসায় ঢুকিবার সময় আমাকে দেখাইয়া আমার কাকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ ছেলেটী কে?" কাকা—"আমার ভ্রাতুষ্পুত্র।" কবি আমাকে বলিলেন, "মণি, এসো।" আমি কাকার দিকে চাহিলাম, তিনি বলিলেন—"যা।" কাকা বাসায় চলিয়া গেলেন। আমিও কবির সহিত হোটেল প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম।

প্রাঙ্গণের উত্তরপার্শ্বে দক্ষিণদ্বারী একখানা ছোট খড়ের ঘর—এই ঘরেই কবি বাস করেন। কবি ঘরে ঢুকিলেন—আমিও ঢুকিলাম। ঘরের পূর্ব্ব পার্শ্বে একটী পরিষ্কার স্থান—সেখানে খানকয়েক পূজার বাসন—মধ্যস্থলে একখানা বিছানা, আর ঘর ময় কাগজ, পাতা, বই ও মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র স্তূপাকারে সজ্জিত। কবি ঘরে ঢুকিয়াই বাক্স খুলিয়া আমার হাতে একটি কমলালেবু ও একখানা পাটালি গুড় দিয়া বলিলেন "খাও মনি।" আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া লেবুটী ভাঙ্গিয়া খাইলাম—পাটালি পকেটে রাখিয়া দিলাম। তারপর কাগজপত্র ও বই ঘাটিতে লাগিলাম। কবি বলিলেন—"বেশ বেশ, পড় পড়।" আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেখানে ছিলাম পরে সন্ধ্যা হইল দেখিয়া কবিকে বলিলাম, "আমি এখন যাই।" কবি বলিলেন—"না না, যাই বলিতে নাই, বল, 'আমি আসি'।" আমি বলিলাম—"আমি আসি" কবি বলিলেন—"আচ্ছা এসো—তোমার যখন ইচ্ছা আসিও—আমি বাড়ী না থাকিলেও বিনাসঙ্কোচে আসিও, ইচ্ছা মত পড়িও।" আমি কবিকে প্রণাম করিয়া বাসায় চলিয়া গেলাম। তারপর ১০।১২ দিন আমি যশোহরে ছিলাম—প্রতি দিনই তাঁহার উপস্থিতিতেই হউক বা অনুপস্থিতিতেই হউক, আমি একবার ঘরে ঢুকিয়া ইচ্ছামত কাগজপত্র ঘাটিয়া বই নাড়িয়া একটু আধটু পুঁথি-

তাম। তিনি বাড়ী থাকিলে আমাকে বই বা কাগজ পড়িয়া শুনাইতে বলিতেন, তখন মুখে মুখে কত উপদেশ দিতেন, তাহার কতক বুঝিতাম, কতক বুঝিতাম না। কিন্তু যাহা বলিতেন তাহা মন দিয়াই শুনিতাম। তাহার কতকগুলি আমার আজিও মনে আছে - যতদিন বাঁচিব ততদিনই তাহা মনে রাখিব।

ইহার পর আমার বাড়ী আসিবার সময় হইল। কাকা আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিবার জন্য রেলওয়ে ষ্টেসনে আসিলেন। সে দিন শনিবার, স্কুলের কার্য্য সারিয়া সেই গাড়ীতে বাড়ী যাইবার জন্য কবিবরও ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কাকা বলিলেন—"এই যে কৃষ্ণবাবু, আপনিও বাড়ী যাইতেছেন, বেশ ভালই হইয়াছে—আমার ভাইপোটিকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, ইহার ভার আপনার উপর।" কবিবর বলিলেন—"আচ্ছা, আমি ইহাকে বাড়ী পৌছিয়া দিবার ভার লইলাম।" ইহা বলিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এস মণি।" আমরা গাড়ীতে উঠিলাম—কাকা বাসায় চলিয়া গেলেন।

যশোহর হইতে বাড়ী যাইতে হইলে আমাদিগকে দৌলতপুর ষ্টেশনে নামিতে হয়। যথাসময়ে ষ্টেশনে গাড়ী পৌছিল—আমরা নামিয়া পড়িলাম। দৌলতপুর হইতে আমাদের গ্রামে নৌকা পথে মাইলখানেক যাইতে হয়। ষ্টেশনে দেখি আমাকে লইয়া যাইবার জন্য বাড়ী হইতে লোক আসিয়াছে—তাহারা নৌকা লইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু কবি কিছুতেই আমাকে তাহাদের সহিত যাইতে দিলেন না,—বলিলেন "তোমার কাকা তোমাকে আমার সঙ্গে দিয়াছেন—আমিই নৌকা করিয়া তোমাকে লইয়া যাইব।" তিনি নৌকা ভাড়া করিলেন—আমিও আর কথা না বলিয়া সেই নৌকাতেই উঠিলাম।

অল্পসময়ের মধ্যে নৌকা সেনহাটীর ঘাটে আসিয়া পৌছিল,—আমার বাড়ীর লোকেও এই সময় তাহাদের নৌকায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন আমি কবিকে প্রণাম করিয়া বলিলাম—"এইবার আপনি বাড়ী যান—আমিও ইহাদের সঙ্গে চলিয়া যাই।" কিন্তু তিনি সহসা আমার হাত ধরিয়া বলিলেন—"না— না, তাহা হইতে পারে না। তুমি আমার সঙ্গে আইস। আমি তোমার ভার লইয়া আসিয়াছি, আমিই তোমাকে নিজে গিয়া বাড়ী পৌছাইয়া দিয়া আসিব।" এবার বাস্তবিকই আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইলাম, এবং সত্য কথা বলিতে কি, মনে মনে ভাবিলাম লোকটা কি পাগল নাকি। তিনি কিন্তু নিজের ভাবে আমাকে একপ্রকার জোর করিয়াই তাঁহার বাড়ী টানিয়া লইয়া গেলেন। বাড়ী নিয়া আর ঘরে ঢুকিলেন না, বিশ্রাম করিলেন না, প্রাঙ্গন হইতেই ডাকিয়া বলিলেন—"ওহে, আমাকে একটা লণ্ঠন দাও ত।"—ঘর হইতে কে একটা লণ্ঠন দিলেন—তিনি এক হস্তে লণ্ঠন ও অন্য হস্তে আমার হাত ধরিয়া সেই শীতের রাত্রিতে এক-মাইল দূরে আমার বাড়ী পৌছাইয়া দিতে চলিলেন।

আমাদের বাহির বাড়ী পৌছিতেই তিনি আমার পিতাকে ডাকিলেন। বাবা বহির্ব্বাটীতেই ছিলেন। দৌলতপুর হইতে প্রত্যাগত সেই লোকের সহিত বোধ হয় এ বিষয়েই কথা বলিতেছিলেন। তিনি অতি ব্যগ্র হইয়া বৈঠকখানা হইতে নামিয়া আসিয়া কবিবরকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন—"কৃষ্ণবাবু, আসুন আসুন, বসুন।" কবি বলিলেন—"আমি বসিব না বরদাবাবু।" বাবা বলিলেন—"কেন আপনি শীতের রাত্রে এত কষ্ট করিয়া নিজে ইহাকে পৌছাইয়া দিতে আসিলেন? বাড়ী হইতে লোক গিয়াছিল তাহাদের সঙ্গেই এ অনায়াসেই আসিতে পারিত। আমি ইহাতে বড়ই কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইতেছি।" কবি বলিলেন—"আমি আমার কর্ত্তব্য করিয়াছি মাত্র তাহাতে আপনি লজ্জিত হইতেছেন কেন? আপনার লোকের সঙ্গে আসিতে পারিত তা ঠিক, কিন্তু তাহাতে আমার কর্ত্তব্য করা হইত না। কেদারবাবু আমাকে ইহার ভার দিয়াছেন—আমিও সে ভার গ্রহণ করিয়াছি। কেহ কোন ভার গ্রহণ করিলে নিজেরই ত তাহা পালন করিতে হয়—আমি তাহা কেন করিব না? আর আসিতে ত আমার কষ্ট হয় নাই; তবে আমি আসি বরদাবাবু!" এই বলিয়াই কবি যাত্রা করিলেন। বাবা বলিলেন "একা যাইবেন না।" কবি বলিলেন—"না, না, লোকের দরকার নাই। আমি একাই যাইতে পারিব—অনর্থক কেন অন্যকে কষ্ট দিব।" কিন্তু বাবা আমাদের প্রাচীন ভৃত্য 'গঙ্গাজেঠাকে' ইঙ্গিত করিলেন। গঙ্গাজেঠা চলিয়া গেলেন কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"না, তাহা হইল না। আমাকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন—"কি গঙ্গাধর, কোথায় যাও?"

মাঝি ভাবিলাম বলি বাজারে যাইতেছি। কিন্তু ওরূপ মানুষের কাছে মিথ্যা বলিতে ইচ্ছা হইল না—সাহসও পাইলাম না। কাজেই আমি আসল কথা বলিয়া ফেলিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন—না গঙ্গাধর তা কিছুতেই হইবে না, তুমি বাড়ী ফিরিয়া যাও, বুড়ো মানুষ কেন তুমি কষ্ট করিয়া আমার সহিত যাইবে?' আমি ইতস্ততঃ করিতেছি দেখিয়া তিনি বলিলেন, তুমি যদি না যাও, আমি এই দাঁড়াইলাম—আর এক পাও যাইব না। কাজেই আমি বাধ্য হইয়া ফিরিয়া আসিলাম।"

তখনও আমি বাবার কাছে বসিয়াছিলাম। আমি বলিলাম, "বাবা, মানুষটা কি ক্ষ্যাপা নাকি?" বাবা যেন কি ভাবিতেছিলেন—হঠাৎ আমার কথা শুনিয়া একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"কি তুই ক্ষ্যাপা বলিস! কর্ত্তব্যকে এমন বড় করিয়া দেখেন, নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভুলিয়া, শারীরিক মানসিক কষ্ট উপেক্ষা করিয়া যিনি এত ছোট কাজকেও ব্রতের ন্যায় অবশ্য পালনীয় মনে করেন, তিনি যদি ক্ষ্যাপা তবে জানি না সুস্থ কাহাকে বলে! আশীর্ব্বাদ করি তোমরা এরূপ 'ক্ষ্যাপা' হও।"

ইহা বলিয়া পিতা চুপ করিলেন, আমি কিন্তু কৌতূহলী হইয়া কবির কথা জিজ্ঞাসা করিতে গেলাম। তিনি তাঁহার সম্বন্ধে কত কথা বলিতে লাগিলেন—আমি তন্ময় হইয়া উপন্যাসের ন্যায় আগ্রহে সে কাহিনী শুনিতে লাগিলাম। সে কাহিনী শুনিতে শুনিতে কবির সেই দীনমলিন মূর্ত্তি এক মহনীয় দেব-মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল—আর আমার মস্তক ভক্তিভরে অবনত হইয়া সেই মূর্ত্তির চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। সেই হইতে আমি কবির ভক্ত—কবির স্তাবক।

কবির জীবিতকালে তাহার অদ্ভুত কার্য্যকলাপ দেখিয়া আমরা তাঁহাকে খেয়ালী, মস্তিষ্কছন্ন বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছি। কিন্তু সে দোষ তাঁহার নহে—দোষ আমাদের বুঝিবার শক্তির—দোষ আমাদের স্বভাবের।

মানুষ আমরা বড় অভিমানী জীব। আমরা যে যত নির্ব্বোধই হই না কেন, যে যত ছোটই হই না কেন, আমরা তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি, বিশ্বাস করিতেও চাহি না। আর কেহ যে আমাদের চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান্ হইতে পারে, আর কেহ যে আমাদের চেয়ে বড় হইতে পারে, এ কথা মনে করিতেও যেন আমাদের ভাল লাগে না। তাই সকল লোককেই আমাদের বিদ্যাবুদ্ধির ধারণা ও সংস্কারের মাপকাটিতে দেখিয়া আমাদের সমান করিতে চাই, কিন্তু জগতের হিতের জন্য, লোক শিক্ষার জন্য ভগবান যে সময় সময় দুই একজন মহৎ লোক আমাদের মধ্যে প্রেরণ করেন, তাঁহারা ত আমাদের মাপকাটির ভিতর পড়েন না—তাঁহাদের কার্য্যকলাপ ত আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না, তাই তাঁহাদিগকে আমরা খেয়ালী মস্তিষ্কছন্ন বলিয়া পাশ কাটাইয়া নিজ নিজ মান রাখিবার চেষ্টা করি। আমাদের মনকে 'চোকঠার' দিয়া প্রবোধ দিতে চাই। তাই চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণপরমহংস, আমাদের কাছে উন্মত্ত, তাই বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী 'বামা ক্ষ্যাপা' তাই আমাদের কাছে ক্ষ্যাপা—কৃষ্ণচন্দ্র আমাদের কাছে মস্তিষ্কছন্ন!

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

সেখ ফরিদ ও কৃষক-বধূ।

[পঞ্জাবের বিখ্যাত সিদ্ধ-ফকির ফরিদের জীবনী সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে। একটি বহুজন-বিদিত প্রবাদ অবলম্বনে এই গাথা লিখিত হইল।]

গভীর বনে　কঠোর মনে　গেল যখন সেখ ফরিদ
সিদ্ধি বিনা　ফিরিবে না　ছিল তখন এমন জিদ্।
বছর বারো　চায়নি কারো　সুখের পানে পেটের লাগি'
কাটতে বাঁধন করতো সাধন　সারাদিবস রাত্রি জাগি।

এমনি করি　মায়ার ডুরি　ছিন্ন করে যোগের বলে,
যোগীর শক্তি　'বাক্যসিদ্ধি'　প্রাপ্ত হ'য়ে ফরিদ চলে।

স্নানের পরে আসতে ঘরে পাখীরবিষ্ঠা পড়লো গায়
শাস্তি দিতে লাল আঁখিতে যেমন ফরিদ দেখলো তায়
ভষ্ম হ'য়ে পড়লো ভূঁয়ে দেখে ফরিদ হাস্ত ভরে
ভষ্ম নিয়ে জীবন দিয়ে গর্ব্বে আবার ফিরলো ঘরে।

* * * * *

চলতে পথে পিপাসাতে ফরিদ সেখ কুয়ার পাশে
সেথায় শুধু কৃষক-বধু কুকুর সাথে ফিরছে বাসে।
ফকির দেখে কুকুর ডাকে ফরিদ তা'কে করতে ছাই
ক্রুদ্ধ দৃষ্টি অগ্নি বৃষ্টি ক'রলো তবু মরণ নাই।
কোথায় ঋদ্ধি যোগীর সিদ্ধি ব্যর্থ-রোষে ফরিদ কাঁপে ;
"আঃ কর কি নয়ত পাখী ছাই হবেনা তোমার শাপে।"

সবিস্ময়ে ভয়ে ভয়ে সুধায় ফরিদ "কোথায় পেলে
ঘটলো বনে ফুটলো মনে যোগ কি তুমি শিখেছিলে ?"
বললো নারী "ধার না ধারি তন্ত্র মন্ত্র যোগ বিয়োগ
স্বামী আমার সব সাধনার আমি তাঁহার যোগাই ভোগ।
এক দিনেতে অর্দ্ধরেতে চেয়েছিলেন তৃষার জল,
আনিয়া দেখি রুদ্ধ আঁখি দাড়িয়ে রলাম চরণ তল
নিদ্রা যখন ভাঙ্‌বে তখন দিব বলে জলের পাত্র,
ভাঙ্‌লো না আর নিদ্রা তাঁহার কেটে গেল সকল রাত্র।
প্রভাত হ'লে নয়ন মেলে দেখ্‌লে স্বামী আমার পানে
খুললো হিয়ার গুপ্তদুয়ার কি-যে পেলাম কে তা জানে
হারিয়ে দিশা ভুলিয়ে তৃষা ধরলো ফরিদ নারীর পা,
"ওমা আমায় দেও কণা তার স্বামীর সেবায় পেলে যা।"

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চন্দ্র।

কোষ্ঠীর ফল।

(১)

পলাশপুর ষ্টেশনের ক্লকঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া রাত্রি বারটা বাজিয়া গেল।

ষ্টেশনটী ক্ষুদ্র। সুতরাং রাত্রের ডিউটীতে এ্যসিষ্টাণ্ট ষ্টেশনমাষ্টার ও সিগনলারবাবু, এই দুইজন মাত্র উপস্থিত থাকিতেন, এতদ্ব্যতীত একজন জমাদার ও দুইজন খালাসীও পালা করিয়া রাত্রের কার্য্যে নিয়োজিত থাকিত।

টিকিট কাটিবার লম্বা টেবিলখানির উপর কয়েকখানি মোটা মোটা খাতা মাথায় দিয়া এ্যসিষ্ট্যাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টারবাবু গাঢ় নিদ্রা উপভোগ করিতেছেন, সিগনলারবাবুও একখানি টুলের উপর পা রাখিয়া নিজের চেয়ারখানিতে বসিয়া ঢুলিতে ছিলেন, এমন সময়ে টেলিফোনের ঘণ্টা সজোরে বাজিয়া উঠিল।

সিগনলার বাবুর যে তন্দ্রাটুকু আসিতেছিল, তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে দূর হইয়া গেল। তিনি চমকিত হইয়া অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত উঠিয়া, টেলিফোনের হ্যাণ্ডেল ঘুরাইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী ষ্টেশনকে বলিলেন, কেয়া ? এ রামটহল ঠাকুর ? বলি কেয়া। এ্যাঁ ?"

রামটহল ঠাকুর নামধারি ব্যক্তি দশমাইল দূর হইতে যাহা বলিলেন, তাহার উত্তরে সিগনলার বলিলেন, "থারটী ফোর ডাউন ? আরামপুর নটইয়েট ? এ্যাঁ," বলিয়া কাণে কপ লাগাইয়া ক্ষণকাল রহিলেন, তারপরে বলিলেন "আমড়া গাছি ছাড়লো ? আচ্ছা।"

টেলিফোনের কপটি যথাস্থানে রাখিয়া নিদ্রিত খালাসীকে ধাক্কা মারিয়া তুলিয়া সিগনলার বাবু আদেশ দিলেন, "এই ঘণ্টা মারো, থারটী ফোর ডাউন, আমড়াগাছি।"

পরমুহূর্ত্তেই ঢং ঢং ঘণ্টাধ্বনি সহিত বাহিরে খালাসী হাঁকিল, "চলা আও সব টিকস্ লেনেওয়ালা, ছোড়া গাড়ি আমড়াগাছি।"

দ্বিপ্রহর রজনীতে ক্ষুদ্র ষ্টেশনটিতে টিকস্ লেনেওয়ালা কেহই উপস্থিত ছিল না ; কিন্তু ঘণ্টার শব্দে নিদ্রিত এ্যসিষ্ট্যাণ্ট বাবুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি শায়িত অবস্থাতেই জড়িতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন গাড়ীর খবর হোল ?"

সিগনেলার বাবু বলিলেন "থারটীফোর ডাউন।"

উত্তরে কোন কথা না বলিয়া তিনি চক্ষু বুজিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। এমন সময়ে এক ব্যক্তি ষ্টেশনের ঘরে

প্রবেশ করিয়া এ্যাসিষ্ট্যান্ট বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিল, আরে ঘোষ যে? তুমি কবে থেকে এখানে?"

এ্যাসিষ্ট্যান্ট ষ্টেশন মাষ্টার বাবুর নাম শ্রীনবগোপাল ঘোষ কিন্তু রেলওয়ে কর্ম্মচারীগণ পরস্পর পরস্পরের নাম ধরিয়া সম্বোধন করেন না, সাহেবীয়ানার হাস্যাস্পদ অনুকরণ করিয়া পরস্পরের উপাধি ধরিয়াই সম্বোধন করিয়া থাকেন।

নবগোপাল বাবু ওরফে ঘোষ চক্ষুদ্বয় মার্জ্জনা করিয়া উঠিলেন। তারপর আগন্তুকের দিকে চাহিয়া সোল্লাসে বলিলেন, "গুড্ গড্স্! রায়! তুমি কোত্থেকে হে?"

আগন্তুক ওরফে রায় বলিল, "বদলি হয়ে এলাম এখানে। কাল ভোর থেকে জয়েন কর্ব্বো।"

সোল্লাসে ঘোষ বলিলেন, "বেশ হয়েছে, খাসা হয়েছে। বসো।"

রায় বসিল। ঘোষ মহাশয় সিগনেলার বাবুকে দেখাইয়া বলিলেন, "ইনি হচ্চেন আমাদের ব্যানার্জ্জি—এন্, ডি, বি—পুরো নাম নারান বাবু। এখানকার সিগনেলার, মাস ছয়েক হলো এসেছেন, অতি অমায়িক ভদ্রলোক।"

"ওঃ" বলিয়া রায় করপুট নাসিকাগ্রে স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। তিনিও তদ্রূপ প্রত্যভিবাদন করিলেন। নবগোপাল বাবু তখন রায়কে দেখাইয়া সিগনেলার বাবুকে বলিলেন, "ইনি হচ্ছেন পি, সি, রায়, —আমাদের বহুকালের ওল্ড ফ্রেণ্ড।"

সিগনেলার বাবু রায়কে বলিলেন, "বেশ বেশ! এখন কোথা থেকে আসা হোল? কোন ট্রেন ফ্রেন ত এখন নেই।"

রায় বলিল, এসেছিলাম, দুপুরের ট্রেনে আমড়াগাছি। সেখানে নেবে গরুর গাড়ী করে গিয়েছিলাম আমার গুড়তুত ভগ্নীপতির বাড়ী চাঁছড়ে। সেখান থেকে বাবুইহাটীর মেলা দেখে এখানে আসছি, তাতেই এত রাত্তির হয়ে গেল।"

"ওঃ! তা হলে সারাদিন খুব ঘুরেছেন তো?" বলিয়া সিগনলার বাবু টেলিগ্রাফের কল লইয়া খুট খুট করিতে লাগিলেন। রায় তাহার ব্যাগ খুলিয়া কাপড় ও ক্ষুদ্র একটি পুঁটুলি বাহির করিল।

ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওপুঁটুলিতে কি?"

রায় বলিল, "খানকতক পাঁপড়ভাজা আছে ভাই। মেলায় গরম গরম ভাজ্‌ছিল, তাই নিয়ে এলাম তোমাদের জন্যে। তুমি এখানে আছ জানলে—"

কৌতুক করিয়া ঘোষমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, মাইনে টাইনে বাড়লো?"

মৃদুহাস্যের সহিত রায় বলিল, "ওঁ ভাই, পয়লা মার্চ্চ থেকে 'ফরটী' (চল্লিশ) হয়েছে।"

ঘোষ বলিলেন, সত্যি! তা হলে তো "এ কেবলই শুকনো পাঁপড়ভাজায় চলবে না যাদু! একদিন ভাল করে একটা ফীষ্ট না দিলে ছাড়বো না!"

সহাস্যে রায় বলিল, "ব্যস্ত হচ্ছ কেন? জ্যৈষ্ঠ মাস আসুক, আমারও ততদিনে 'সিক্সটী' হোক, তখন ভাল করে খাইয়ে দিব।"

নবগোপাল বাবু বলিলেন, "সে কি হে? তিন মাসের মধ্যে চল্লিশ থেকে একেবারে ষাট টাকা! তবেই আমরা খেয়েছি! চল্লিশ থেকে ষাট হতে দশটী বছর।"

রায় বেশ জোরের সহিত বলিল, "দেখে নিও তুমি, যদি না হয় তা হলে আমি দুমাসের মাইনে বাজী হারবো।"

ঘোষ হাসিয়া বলিলেন, "কি ব্যাপার হে? সাহেবদের কাউকে ধরেছ নাকি?"

"কিছু না।"

"তবে।"

"আমার কুষ্ঠীর ফল।"

বিস্মিত হইয়া নবগোপাল বাবু বলিলেন, "তার মানে?"

রায় বলিলেন, "আমার গুরুদেব আশ্বে দিয়েছেন।"

সিগনলার ও ঘোষ উভয়েই অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া, বলিলেন, "কি রকম?"

এমন সময়ে পূর্ব্ববর্ত্তী ষ্টেশন হইতে ট্রেন ছাড়িবার সংবাদ টেলিগ্রাফে আসিল। নবগোপাল বাবু বলিলেন, "পোষাকটা পরে নিই ততক্ষণ।" বলিয়া টেবিলের এক কোণে স্তূপীকৃত কোট প্যাণ্টুলুন প্রভৃতি সজ্জা বাহির করিয়া পরিতে আরম্ভ করিলেন। একজন খালাসী লাল সবুজ লণ্ঠনে কেরাসিন তৈল ঢালিতে প্রবৃত্ত হইল।

রায় বলিলেন, "তিনি সে দিন কালীঘাটে এসেছিলেন, আমি তখন ঢাকুরে ছিলাম; কাজেই আমার ওখানেও পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন। সেবাটেবা হয়ে গেলে, ঠাকুর যখন শয়নে গেলেন, আমি পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বল্লাম, 'ঠাকুর! আপনি তো আমার ইষ্টদেবতা। আপনার

আশীর্ব্বাদে সবই তো হয়। তা, আমার কি চিরকাল এই তিরিশ টাকার বুকিংক্লার্ক গিরি কর্ত্তে হবে ?' ঠাকুর বল্লেন 'কতদিন কচ্ছো ?' আমি বললাম, 'এই সাত বছর।' ঠাকুর চমকে উঠে বলেন 'সাতবছর ধরে এত খেটেও মাসে মোটে তিরিশ টাকা!" আমি বল্লাম, 'ঠাকুর! আপনার দয়া হলে, এই তিরিশ টাকা তিনশ টাকা হতে কতক্ষণ ?' তিনি একটু ভেবে বল্লেন, 'কুষ্ঠী আছে তোমার ?' আমি বললাম, 'আজ্ঞে আছে বৈ কি।' 'দেখাও দিকি।' এনে দেখালাম। তিনি অনেকক্ষণ ধরে দেখে শুনে, অনেক অঙ্কপাত করে বল্লেন 'এ যে খুব ভাল কুষ্ঠী দেখছি। আজকাল এমন সুক্ষ্ম গণনা তো প্রায় দেখা যায় না।' বলে, আবার কতক্ষণ উল্টে পাল্‌টে দেখে শেষে একটু হাসলেন। বল্লেন, 'বাচ্ছা, তোকে যদি তোর মনোমত ফল দিই, তা হলে তুই আমাকে কি দিবি বল।"

ঘোষ ব্যানার্জ্জি উভয়েই অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। নারান বাবু বলিলেন, "তারপর ?"

রায় বলিতে লাগিল, আমি বল্লাম, 'ঠাকুর আমি আর কি দিতে পারি ? আমার কি ক্ষমতা যে আমি দেব।' তিনি হেসে বল্লেন, 'দূর পাগলা, আমি তোরে পরখ কচ্ছিলাম। তুই আর কি দিবি ? আচ্ছা যদি তোর ভাল হয় তা হলে আমার কাশীর ঠাকুর বাড়ীতে অতিথিদের শীতকালে ১০০ খানা কম্বল কিনে দিস্।' এই বলে আবার বল্লেন, 'বাচ্ছা, তোর দুঃখের দিন শেষ হয়ে এসেছে। এটা কোন সম্বৎ পাঁজিতে দেখ দিকি।' পাঁজি দেখে আমি বল্লাম যে এটা ১৮৩৫ সম্বৎ। তিনি বল্লেন, 'পঁয়ত্রিশ তে' ? এই দেখ কুষ্ঠীখানায় স্পষ্ট লেখা রয়েছে ১৮৩৬ সম্বৎ ৩১ বৎসর বয়সে বৈশাখস্য ১৮ দিন গতে বসুদশা রয়েছে, তার ফল হচ্ছে—'বহুমিত্রং বহুধনং রাজমানঞ্চ। আর ১৩ই জ্যৈষ্ঠের পর যোগিনী সিদ্ধায়। তার ফল হচ্ছে সিদ্ধা সাধয়তে সর্ব্বং ধনাদিকং।"

ঘোষ হাসিয়া বলিলেন, "তুমিও যে একজন হয়ে উঠলে দেখছি। মুখদিয়ে যে একেবারে সংস্কৃতর খই ফুট্‌ছে।"

রায় বলিল, "আমি তার শ্রীমুখে যা শুনেছি তাই বলছি বৈ.ত নয়। তারপর ঠাকুর ওই কথা বলে বল্লেন যে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে আমি অনেক ধনরত্ন পাব। আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'ঠাকুর, কত পাব ?' তিনি উত্তর ক'ল্লেন, অত সুক্ষ্ম হিসাব তো আর কুষ্ঠীতে থাকে না। আচ্ছা দেখছি আমি তোর পতাকী চক্র ধরে অঙ্ক কষে।' তারপর তাই অনেক কষে মেজে বল্লেন যে প্রায় পাঁচ ছয় হাজার টাকা আমি পাব তা মাইনে বেড়েই পাই আর পরধনেই পাই। মাইনে বাড়লে অবশ্যি টাকাটা নগদ পাব না, ছহাজার টাকার বারো পারসেণ্ট সুদ ধর, তা হইলেই ষাট টাকা হয়। কাজেই যদি মাইনে বাড়ে, তা হলে ষাট টাকা করে পেতে পারি।"

উভয়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। ঘোষ বলিলেন, "আজকালকার দিনে কিন্তু বিশ্বাস হয় না এসব কথা!"

রায় যেন একটু রুষ্ট হইয়া বলিল "তা হবে কেন ? তোমাদের কিই বা বিশ্বাস হয় ? একেবারে পুরো নাস্তিক হলে কি আর চলে ? আচ্ছা ধর, বিশ্বাসই যেন হয় না, কিন্তু হাতে হাতে ফলটা তো দেখলে। সাত বছর ধরে ত্রিশটাকায় ঘষড়াচ্ছিলাম, ঠাকুর আজ্ঞে দেবার দুমাস পরেই তো চল্লিশ হোল। সেটা—"

বাধা দিয়া ঘোষ বলিলেন, "তা হবে না কেন ? ত্রিশগ্রেডে তুমি প্রথম ছিলে, প্রমোশন হলেই তোমার চল্লিশ হবে এ ত জানা কথা হে। এ তে আর অলৌকিক কিছুই নেই।"

রায় গম্ভীরভাবে বলিল, "দেখা যাক্ তো! তোমরা বিশ্বাস না করতে পার, আমি কিন্তু ঠাকুরের কথা দেবতাবাক্য বলে মানি।"

এমন সময়ে খালাসী আসিয়া জানাইল যে ট্রেন দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। নবগোপাল বসুর পোষাক পরা শেষ হইয়াছিল, তিনি লালসবুজ কাঁচ বিশিষ্ট লণ্ঠনটী লইয়া বলিলেন "বসো একটু, আমি ট্রেনখানাকে পাশ করে আসি।" বলিয়া প্ল্যাটফরমে গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই ট্রেন ছাড়িয়া দিল, যে কয়েকটী যাত্রী নামিয়াছিল, তাহাদের টিকিট সংগ্রহ করিয়া ঘোষমহাশয় আবার ফিরিয়া আসিলেন। রায় তখনও বসিয়া আছে। ঘোষ তাহাকে বলিলেন, "রায়, এইবার একটু ঘুমুনো যাক নিশ্চিন্তি হয়ে এখন আর ট্রেন ফ্রেনের হাঙ্গামা নেই, সেই একখানা আপ প্যাসেঞ্জার আছে ভোর সাড়েচারটের সময়।" বলিয়া নিজ স্থানে তিনি শয়ন করিলেন। রায় দুইখানি বেঞ্চি পাশাপাশি জোড়া দিয়া তাহারই উপর একখানি বহুপুরাতন খবরের কাগজ পাতিয়া, মেঝেক হইতে

ইখানি মোটা-মোটা টারিফ বহি লইয়া তাহাই মাথায় দিয়া ইয়া পড়িল।

প্ল্যাটফরমের সমস্ত আলোগুলি নিভাইয়া দিয়া জমাদার এই সময় আসিয়া ঘোষ মহাশয়কে জানাইল যে প্ল্যাটফরমে াহার একটা ষ্টীলট্রাঙ্ক পড়িয়া আছে, কেহই লইয়া যায় াই।

ঘোষ মহাশয় চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করিয়া বলিলেন, যাহার াক্স তাহার গরজ হইলে আপনিই আসিয়া লইয়া যাইবে, জ্জন্য তাঁহার মাথা ঘামাইবার কোন দরকার নাই। ব্রেকের মাল হইলেও বা কথা ছিল, কিন্তু গার্ডসাহেব যখন ব্রেকেরও কোন রসিদ দেন নাই, তখন চিন্তা করিবার কোন কারণ নাই।

রায় সে কথা শুনিয়া জমাদারকে বলিল, "তার চেয়ে এক কাজ কর বরঞ্চ। 'বাক্সটা প্ল্যাটফরমের মাঝখান থেকে সরিয়ে, ফিমেল ওয়েটীং রুমের দোরগোড়ায় রেখে দাওগে, যার বাক্স হয় সে নিয়ে যাবে।"

সেই কথাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিয়া জমাদার তদ্রূপ করিতে গেল।

অল্পকাল মধ্যেই সকলে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু রায় শত চেষ্টা সত্ত্বেও ঘুমাইতে পারিল না। রেলওয়ে কর্ম্মচারীগণের নিদ্রা অতি সহজেই আসে, এমন কি অনেক গার্ডসাহেব দাঁড়াইয়াই নিদ্রা উপভোগ করিয়া থাকেন, কিন্তু হঠাৎ রায়ের আজ সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল।

সে কিছুক্ষণ বেঞ্চির উপর এপাশ ওপাশ করিল, কিন্তু ছারপোকা ও মশার কামড় অত্যন্ত অসহ্য বোধ হওয়ায় আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিল। তারপর দ্বারটী ঈষৎ খুলিয়া প্ল্যাটফরমে আসিল।

প্ল্যাটফরম ঘোর অন্ধকার ও জনশূন্য। চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ মাঠ হইতে সন্ সন্ শব্দে হাওয়া বহিতেছিল, ক্বচিৎ দুই একটা পেচকের বা কুকুরের ডাক শ্রুতিগোচর হইতেছিল। উভয় দিকে বহুদূরে ডিস্ট্যান্ট সিগনালের লাল আলো দুটী রক্তবর্ণের বৃহৎ দুইটী তারকার ন্যায় জ্বলিতেছিল।

রায় প্ল্যাটফরমে পায়চারি করিতে লাগিল। দেওয়ালের গায়ে আংটায় বাধান 'ফায়ার' অঙ্কিত রক্তবর্ণের কয়েকটী জলপূর্ণ বাঁলতী ছিল, একটি নামাইয়া তাহার জলে সে বেশ করিয়া হাত মুখ ধুইয়া ফেলিল। তারপর ওভারব্রীজের কাঠের সিঁড়ির উপর গিয়া বসিল।

(২)

হঠাৎ টেলিগ্রামের টকাটক্ শব্দে সিগনলার নারায়ণবাবুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাম repeat করিবার সঙ্কেত জানাইয়া সম্পূর্ণ টেলিগ্রামখানি লিখিয়া লইয়া অতিমাত্র ব্যস্ততার সহিত নবগোপালবাবুকে ডাকিয়া তাহা দেখাইলেন।

পালপুকুর নামে একটি ষ্টেশন টেলিগ্রাম করিতেছেন যে পালপুকুরের ঠিকানায় একটি বাক্স ফ্রন্টব্রেকে অর্থাৎ এঞ্জিনের কাছের ব্রেকভ্যানে ছিল, এবং সেই ব্রেকের যে খালাসী ছিল, সে নিদ্রিত গার্ডসাহেবের নিদ্রার ব্যাঘাত না ঘটাইয়া নিজের বুদ্ধি খরচ করিয়া পালপুকুরকে পলাশপুর পড়িয়া পলাশপুরেই তাহা নামাইয়া দিয়াছে। সুতরাং পরবর্ত্তী ট্রেণে যেন বাক্সটী নিশ্চয় পাঠান হয়। বাক্সটীতে মূল্যবান অলঙ্কারাদি আছে বলিয়া বাক্সের মালিক স্বয়ং ভোরের ট্রেণ পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিবেন।

ঘোষ মহাশয় বলিলেন, "জমাদার যেটার কথা বলছিল, সেই বাক্সটা বুঝি?"

নারায়ণবাবু বলিলেন, "বোধ হয়। এসে দেখা যাক যে তাতে পালপুকুর লেখা আছে কিনা।" ঘোষ মহাশয় জমাদারকে বাক্সটী ঘরের ভিতর আনিবার জন্য আদেশ করিলেন।

কিন্তু ফিমেল ওয়েটীং রুমের সম্মুখে যাইয়া অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত জমাদার দেখিল যে বাক্সটী সেখানে নাই। প্ল্যাটফরমে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সুতরাং সে আলো আনিতে ঘরের ভিতর গেল।

ঘোষ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "লে আয়া?"

বাক্সটীর স্থানভ্রষ্ট হওয়ার কথা জমাদার জানাইল। ঘোষ মহাশয় বলিলেন, "সে কিরে, দেখ. দেখ, কোথায় গেল দেখ।" বলিয়া তিনিও একটি হাতলণ্ঠন লইয়া বাহিরে আসিলেন। উভয়ে আলো লইয়া প্ল্যাটফরম এদিক ওদিক উত্তমরূপে খুঁজিলেন, কিন্তু বাক্সটী পাওয়া গেল না।

ঘোষ বলিলেন, "শেয়ালে টেয়ালে নিয়ে যায় নি ত?"

জমাদার জানাইল যে বাক্সটী যদিও খুব ভারি ছিল না, তথাপি শৃগালে বাক্স লইয়া যাইবে এ ধারণা বাতুলেও

করিতে পারে না। ঘোষ মহাশয় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া ইতঃস্ততঃ করিতে লাগিলেন, তারপর বলিলেন, "ঠিক দেখেছিলি যে বাক্স নেবেছিল।"

জমাদার বলিল যে সে অন্ধ নহে, সে স্বচক্ষে বাক্সটী দেখিয়া তবে তাঁহাকে সে সংবাদ জানাইয়াছিল এবং নূতন বাবুটী বাক্সটীকে প্ল্যাটফরমের মধ্যস্থল হইতে সরাইয়া ফিমেল ওয়েটীং রুমের নিকট রাখিতে বলায় সে স্বহস্তে বাক্সটিকে সেখানে রাখিয়াছে।

ঘোষ বলিলেন "দেখি রায় কি বলে।"

কিন্তু ষ্টেশন ঘরে আসিয়া রায়কেও দেখিতে পাওয়া গেল না। নারায়ণবাবু বলিলেন যে তিনি জাগ্রত হইয়া আর রায়কে দেখিতে পান নাই।

ঘোষ বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হয়েছে। এ সেই শালারই কাজ—এ আর কেউ নয়। সেই যে তার গুরুদেব তার কুষ্ঠি দেখে বলেছে যে তুমি পাঁচ ছয় হাজার টাকা পাবে তাই বিশ্বাস করে শালা বাক্সটা সরিয়েছে। ভেবেছে বুঝি তারই ভেতর মোটা টাকা পাবে। এখন উপায় ?"

নারায়ণবাবু বলিলেন, "মাষ্টারবাবুকে ডাকা যাক। তিনি যা বলেন।"

অগত্যা তাহাই হইল। ষ্টেশনমাষ্টারবাবুর কুঠী পার্শ্বেই অবস্থিত। সেখানে অনেক ডাকাডাকির পর সেই দ্বিপ্রহর রাত্রে তাঁহাকে ঘুম ভাঙ্গাইয়া ষ্টেশনে আনা হইল। তিনি আদ্যন্ত শুনিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন, "সে শালা পালাবে কোথায় ? এখন তো আর ট্রেণ নেই।"

নারায়ণবাবু বলিলেন, "হয়েছে, তখন বলছিল যে চাঁচুড়ের ওর ভগ্নীপতির বাড়ী, যদি সেখানে গিয়ে থাকে।"

ঘোষ মহাশয় বলিলেন, "আরও এক কাজ কর্ত্তে পারে। এখান থেকে আরামপুরে হেঁটে গিয়ে সেখান থেকে তিনটে তেরর এক্সপ্রেস ধরতে পারে।"

মুখখানি গম্ভীর করিয়া ষ্টেশনমাষ্টারবাবু বলিলেন, "এক কাজ কর। লাল আলো দেখিয়ে তিনটে তেরর এক্সপ্রেস এখানে ডিটেন্ করিয়ে গার্ডের হাতে একটা খবর দাও যে তাকে দেখলেই ধরবে। আর এখনিই চারিদিকে ঝড়াঝড় টেলিগ্রাম করে দাও। পালপুকুরে এই ব্যাপার জানিয়ে দাও, আরামপুরে টেলিগ্রাম কর, পুলিশে টেলিফোণ কর, পালাবে সে কোথায় দেখি। বেটাচ্ছেলেকে চোখে দেখলাম না এই যা আপশোষ। যার মাথায় এতটা সূক্ষ্ম বুদ্ধি খেলে —উঃ কি ধরিবাজ রে বাবা।"

তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাম ও টেলিফোণে চতুর্দ্দিকে সে সংবাদ প্রেরিত হইল।

(৩)

ঠিক এই সময়ে পি, সি, রায় সশরীরে ঘরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ব্যাপার ?"

সকলেই চমকিত হইলেন। ঘোষ বলিলেন, "আরে, তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?"

সে বলিল "হাতমুখ ধুয়ে জলটল খেয়ে এলাম। এই রাত্রে আবার জল কোথায় পাব, তাই ইঁদারায় গিয়েছিলাম জল তুলতে।"

হোঃ হোঃ করিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলেন। ঘোষ বলিলেন "কি বিভ্রাট দেখ দেখি।" বলিয়া আনুপূর্ব্বিক ঘটনা বিবৃত করিলেন।

ষ্টেশনমাষ্টার নারায়ণবাবুকে বলিলেন, "এন, ডি, বি! আবার সব টেলিগ্রাম কর যে সে লোক ফিরে এসেছেন বটে, কিন্তু জিনিষের কোন সন্ধান হয় নি।"

সেই মর্ম্মে পুনরায় টেলিগ্রাম প্রেরিত হইল। পুনরায় আলো লইয়া সকলে চারিদিকে সন্ধান করিল, কিন্তু বাক্সর কোন সন্ধান মিলিল না। মাষ্টারবাবু বলিলেন, "আর অনর্থক বসে থেকে লাভ কি, আমি গিয়ে একটু শুইগে, রাত্তিরে আর কি তদন্ত করবো। যা করবার তা সকালেই হবে এখন।" বলিয়া তিনি নিজের বাসায় গেলেন।

ঘোষ, রায় এবং ব্যানার্জ্জি ইঁহারাও পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে শয়ন করিয়া পরস্পর এই ঘটনার কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন।

ভোরের ট্রেণ চলিয়া গেলে সকলে হাতমুখ ধুইয়া দেখিলেন, রায় তখনও গাত্রোত্থান করে নাই। সে সেই বেঞ্চি দুখানির উপর নিজের চাদর মুড়ি দিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত।

ঘোষ ডাকিল, "রায়, উঠে পড়, বেলা হোল, মাষ্টারবাবুর আসবার সময় হোল।"

দুই একবার আলস্য ভাঙ্গিয়া কাঁপা গলায় রায় বলিল, "পাচ্ছিনে ভাই আর উঠতে, শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়ছে।"

"কেন হে।"

"খুব জ্বর এসেছে শেষ রাত্তির থেকে। দেখনা গায়ে হাত দিয়ে, গা যেন পুড়ে যাচ্ছে একেবারে। মাথার ভিতর দিয়ে যেন ট্রেণ চলছে।"

ঘোষ তাহার কপালে হাত দিয়া দেখিলেন যে তাহার কথা প্রকৃত বটে। জ্বরের উত্তাপ অত্যন্ত বেশী হইয়াছে। কাজেই সে বলিল, "তাই তো! মুস্কিলে ফেল্লে তো খুব। কি করা যায় এখন?"

অতিকষ্টে রায় উঠিয়া বসিয়া বলিল, "অত্যাচারের জন্যেই জ্বরটা হয়েছে বোধ হয়। কাল সমস্ত দিন খাওয়া হয় নি, পিত্তি পড়েছিল। তারপরে আমড়াগাছি থেকে সেই রৌদ্রে গরুরগাড়ী করে গিয়েছি চাঁচুড়ে, আবার সেখান থেকে হেঁটে এসেছি বাবুইহাটী, সেখান থেকে আবার এখানে। তারউপর ইঁন্দারার জলে কাল রাতদুপুরে আধা নাওয়া হয়েছে। উঃ মাথাটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে একেবারে!"

ঘোষ বলিলেন, "তাই তো, বড়ই ভাবনার কথা তো! রাত্তিরে আবার ইঁন্দারার জলে নাইতে গেলে কেন? তা, এখন বাসায় চল।"

রায় বলিল, "না, বাসায় আর এখন যাব না। তুমি ভাই একটা উপকার কর। আমি এখানে এসে জয়েন করেছি এটা তো সবাই জেনেছে, সুতরাং মাষ্টারবাবুকে বলে একটা রিপোর্ট দেওয়াতে হবে যে আমি জয়েন করেছি। তারপর কলিকাতায় গিয়েই আমি ছুটির দরখাস্ত করবো'খন।

ঘোষ বিস্মিত হইয়া বলিল "সে কিহে, এই জ্বরঅবস্থায় তুমি যাবে কল্‌কাতায়!"

"হাঁ ভাই, এখানে থাকলেই এ জ্বরটা ম্যালেরিয়ায় দাঁড়াবে, তখন আরও মুস্কিলে পড়তে হবে। তার চেয়ে সাতটা বিশে আমি কলিকাতায় যাই, তারপর ভাল হয়েই বরং আসবো।"

ঘোষ তাহাতে কোন প্রতিবাদ করিল না। অনতিবিলম্বেই ৭-২০র ট্রেণ আসিল। রায় তাহার তল্পীতল্পা লইয়া সেই ট্রেণে কলিকাতা যাত্রা করিল।

* * * *

ষ্টেশনমাষ্টার বাবু যখন আসিয়া শুনিলেন যে তাঁহাকে না জানাইয়াই পি, সি, রায় চলিয়া গিয়াছে, তখন তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। ঘোষকে বলিলেন, "সম্পূর্ণ তোমার দোষেই একটা আসামী পালাল। আমার আগে ততটা সন্দেহ হয়নি, কিন্তু তার হঠাৎ পালাবার কাণ্ডটা দেখে এখন বেশ বুঝতে পাচ্ছি যে নিশ্চয়ই এ তার কাজ। বাক্স ভেঙ্গে ভেতরকার জিনিষপত্রগুলো সরিয়ে নিয়ে আমাকে না জানিয়ে ৭-২০শে রওনা হয়েছে, এখন ধর কাকে ধরবে? উঃ! চোখের উপর একটা মুঠো ধুলো দিয়ে বামাল নিয়ে পালাল, তোমরা টেরও পেলে না হ্যা।"

ঘোষ বলিলেন "সে যে ইঁদারায় গিয়েছিল—"

মুখ খিঁচাইয়া মাষ্টার বাবু বলিলেন, "তোমার মাথায় গিয়েছিল, আহাম্মক কোথাকার!"

সিগনলার বাবু বলিলেন "এক কাজ করুন, শেয়ালদায় টেলিগ্রাফ করা যাক, যে তাকে দেখলেই ধরবে।"

মাষ্টার বাবু বলিলেন "তোমাদের যেমন বুদ্ধি। ভেবেছ বুঝি যে সে শেয়ালদায় নামবে। নৈহাটী দিয়ে টিকিট কিনে ওপারে গিয়ে ভারতবর্ষের কোথায় ছিট্‌কে পড়বে কেউ টেরও পাবে না। আহা হাঃ হাতের মুঠোয় আসামী পেয়ে কিনা—"

(৪)

যে ব্যক্তির বাক্স হারাইয়াছিল, তিনি কলিকাতার হেড অফিসে যাইয়া নালিস করিলেন, ফলে একজন এসিষ্ট্যান্ট ট্রাফিক সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সরেজমিন তদন্তে আসিলেন। বাক্সের মালিকও তাঁহার সঙ্গে আসিলেন।

ষ্টেশন মাষ্টার রায় সংক্রান্ত সকল কথাই সুপারিটেণ্ডেণ্টের নিকট বলিলেন। ঘোষ ও ব্যানার্জ্জি সে কথায় সমর্থন করিলেন।

ট্রাফিক সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ইঁদারায় ডুবুরি নামাইলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে সেখানে লোকারণ্য হইয়া গেল। কিয়ৎকাল পরে সত্যসত্যই ইঁদারা হইতে অপহৃত ট্রাঙ্ক আবিষ্কৃত হইল। মালিক জানাইলেন যে উহা তাঁহারই ট্রাঙ্ক বটে।

ট্রাঙ্কটীর মুখে দড়ি দিয়া বাঁধা ছিল, দড়ি কাটিয়া উহা খোলা হইলে দেখা গেল যে তাহার ভিতরের জিনিষপত্র কিছুই নাই। ট্রাঙ্কটী যাহাতে ইঁদারার মধ্যে অবিলম্বে ডুবিয়া যায়, সেকারণ কয়েকটী বড় বড় ইষ্টকখণ্ড তাহার মধ্যে রক্ষিত হইয়াছিল।

ব্যাপার দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল। একজন ভদ্রসন্তান এবং রেলওয়ে কর্ম্মচারীদ্বারা এরূপ গর্হিত কার্য্য ঘটিতে পারে

ইহা লইয়া বহুলোকে নানা প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল।

ঘোষ বলিলেন, "ব্যাপার আর কিছুই নয়, সেই যে বড় গুরুঠাকুর বলেছে যে তুমি শীগগির মোটা টাকা পাবে; সেই কথার ফলেই লোকটা এই কাণ্ডটা করেছে। তা নৈলে ওত সেরকম লোক বলে আমাদের ধারণা ছিল না।"

ষ্টেশন মাষ্টার বাবু জানাইলেন যে তিনি চোরকে প্রায় ধৃত করিয়াছিলেন, কেবল ঘোষের গাফিলীতেই সে ব্যক্তি নিরাপদে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

বাক্সের মালিক হৃত দ্রব্যাদির যে ফর্দ্দ দিলেন তাহাতে জানা গেল যে বাক্সের মধ্যে মূল্যবান দ্রব্যাদি যাহাছিল, তাহার আনুমানিক মূল্য শতাধিক টাকা। কতকগুলি রূপার বাসন, কেস্ সমেত একছড়া সোনার নেকলেস ছিল, আরও খুচরা কতকগুলি সোনারূপার অলঙ্কার ছিল তাহার মূল্য প্রায় হাজার টাকা। এতদ্ব্যতীত জামা কাপড়, তোয়ালে প্রভৃতি সামান্য জিনিষ যাহা ছিল তাহার দামও ২০।২৫ টাকার কম নহে।

ফর্দ্দ দিয়া তিনি জানাইলেন যে রেলওয়ে কোম্পানী এই সমস্ত দ্রব্যের পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে পারেন উত্তম, নচেৎ তিনি আদালতে যাইয়া দেখিবেন কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। রসিদ লইয়া ব্রেকভ্যানে বাক্স রাখিয়া তাহার পরিণাম কি না এই!

সহকারী ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (Assit Traffic Supdt.) আগাগোড়া সব লিখিয়া লইয়া জানাইলেন যে উত্তমরূপে এ বিষয়ের তদন্ত হইবে এবং তদন্তে যদি প্রমাণ হয় যথার্থই উক্ত মূল্যের দ্রব্যাদি তাহার মধ্যে ছিল, তাহা হইলে হাজার টাকা পর্য্যন্ত ক্ষতিপূরণ তিনি পাইতে পারেন এবং সেই হাজার টাকা পলাশপুরের ষ্টেশন মাষ্টার, এসিষ্ট্যাণ্ট মাষ্টার ও সিগনলার এই তিনজনের বেতন হইতে ভিন্ন ভিন্ন অংশে গৃহীত হইবে।

ষ্টেশনের কর্ম্মচারী বৃন্দ প্রমাদ গণিলেন। নানা প্রকার মধুর আপ্যায়নে ঘোষ বেচারীর মুখে সেদিন আর অন্নজল উঠিল না!

(৫)

কলিকাতা হেড অফিসে সার্ভিস বুক হইতে পি, সি, রায়ের ঠিকানা পাওয়া গেল। চাকরির প্রারম্ভে অর্থাৎ ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে সে ভবানীপুরে থাকিত, সেই ঠিকানার উপর নির্ভর করিয়া কলিকাতা পুলিস ও রেলওয়ে পুলিস ভাবানীপুর তোলপাড় করিয়া ফেলিল, কিন্তু রায়ের কোন সন্ধান মিলিল না।

পলাশপুর ষ্টেশনে তাহার ঠিকানা জানা আছে কিনা তজ্জন্য Enquiry আসিল। ঘোষমহাশয় চাঁচুরিয়া নামক গ্রামে তাহার এক ভগ্নীপতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ দিলেন তৎক্ষণাৎ চাঁচুরিয়াতে পুলিস ছুটিল।

তাহার ফলে ঠিকানা আবিষ্কৃত হইল, এবং পুলিস অবিলম্বে কলিকাতায় সে কথা তার করিল।

সেই দিনই অপরাহ্নে বহু পুলিস কর্ম্মচারী ও এসিষ্ট্যাণ্ট ট্রাফিক সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সকলে মিলিয়া নূতন ঠিকানায় যাইয়া বাড়ী ঘেরাও করিলেন। রায় অসুস্থ শরীরেই গ্রেপ্তার হইল! কিন্তু খানাতাল্লাসিতে হৃত দ্রব্যাদির কোন সন্ধান হইল না।

ডিপার্টমেণ্টাল বিচারে তাহার চাকরি গেল। আদালতের বিচারে তাহার তিনবৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম হইল।

যখন আদালতের হুকুম হইল, তখন ঘোষ মাহাশয় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন "ভাই, সামান্য একটা ভুয়ো কথায় কি বিপর্য্যয় কাণ্ডটা করলে! এখন আমরা শুদ্ধ যে মারা যাই। হাজারটা টাকা আমাদের মাইনে থেকে মাসে মাসে কেটে নেবে। তোমার জন্য যে ধনে প্রাণে মারা গেলাম ভাই! এটা কি ভাল হোল? ধর্ম্মে সইবে এতটা!"

রায় কোন উত্তর করিল না, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িল মাত্র,—তারপর কাঁদিয়া ফেলিল।

* * *

প্রায় মাসাধিক কাল পরে একদিন প্রভাতে পলাশপুর ষ্টেশনে এক হুলুস্থুল কাণ্ড!

ষ্টেশন হইতে একক্রোশ দূরে বাবুই হাটী নামে একখানি সমৃদ্ধ গ্রাম আছে। সেখানকার লক্ষ্মণ পোদ্দার নামীয় এক ব্যক্তি আসিয়া ষ্টেশন মাষ্টারকে জানাইল যে তাঁহার নিকট তাহার এক দরবার আছে।

মাষ্টার বাবু সবেমাত্র ষ্টেশনে আসিতেছেন, একজন খালাসী পশ্চাতে চায়ের বাটী লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। এমন

সময়ে লক্ষণ পোদ্দারকে দেখিয়া তাঁহার পিত্ত জ্বলিয়া গেল; ও অঞ্চলে প্রবাদ ছিল যে প্রত্যুষে লক্ষণ পোদ্দারের মুখ দর্শন করিলে সে দিন অদৃষ্টে অন্ন জুটিবার আশা বড় থাকে না।

ঈষৎ বিরক্তির সহিত তিনি পোদ্দারের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

লক্ষণ পোদ্দার পেটের নীচে বস্ত্রাঞ্চল হইতে একটী কাগজে মোড়া জিনিষ বাহির করিয়া মাষ্টার বাবুর হাতে দিল। কাগজ খুলিয়াই তিনি চমকিত হইলেন। দেখিলেন, যে তাহার মধ্যে বহুমূল্যবান্ একছড়া সোনার নেকলেস রহিয়াছে।

মাষ্টার বাবুর হৃতপিণ্ড তখন টিপ টিপ করিতেছিল। তিনি বলিলেন "একি পোদ্দারের পো! এ কোথায় পেলে?"

ঠাণ্ডা লাগিয়া লক্ষণ পোদ্দারের গলাটা একটু ধরিয়া গিয়াছিল। সে ভাঙ্গাকাঁসির মত আওয়াজ করিয়া বলিল, "দেখেছেন মশাই, এই আমার বল্লেই যত দোষ—থানারে—পুলিসরে। এখন ঠেলা সামলান। এই বেলা—

"বাধা দিয়া মাষ্টার বাবু বলিলেন, "হয়েছে কি বল না বাপু চেঁচামেচি কর্‌ছো কেন সকাল বেলা!"

ঝঙ্কার দিয়া লক্ষণ পোদ্দার জানাইল যে গতরাত্রে ফাগুয়া নামধারী একজন ষ্টেশনের কুলী তাহার নিকট এই নেকলেস বিক্রয় করিতে যায়। তাহার মনে সন্দেহ হওয়ায় সে সেটী লইয়া নিতান্ত ধর্ম্ম ভাবিয়াই ষ্টেশনমাষ্টারকে দেখাইতে আসিয়াছে। সে নাও আসিতে পারিত, কিন্তু সম্প্রতি ঐ বিষয়ে গোলযোগ হওয়াতেই এরূপ ধর্ম্মাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

মাষ্টারবাবু জেরায় অবগত হইলেন যে ২।১ দিন পূর্ব্বে ১টী আংটীও সে জনৈক দোকানদারকে বিক্রয় করিয়াছে!

ফাগুয়াকে তৎক্ষণাৎ ডাকান হইল। সে আসিয়া পোদ্দারকে দেখিয়াই পলায়ন করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু জমাদার ও কয়েকজন খালাসী তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

তৎক্ষণাৎ আরামপুর ও কলিকাতা উভয় স্থানেই টেলিগ্রাম করা হইল। ফাগুয়া ষ্টেশনের ল্যাম্পরুমে বন্দী রহিল।

পরের ট্রেণেই আরামপুর হইতে পুলিস আসিয়া পড়িল। তৎপরবর্ত্তী ট্রেণে কলিকাতা হইতে সেই এসিন্‌ট্যান্ট ট্রাফিক সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ফাগুয়ার ঘর খানাতল্লাসী করিতে হুকুম দেওয়া হইল। প্রথমে বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু মেজে খুঁড়িয়া একটী হাঁড়ি আবিষ্কৃত হইল তাহাতে রূপার বাসন ও অন্যান্য অলঙ্কার প্রভৃতি পাওয়া গেল।

অনেক পীড়নের পর ফাগুয়া স্বীকার করিল যে সেই প্ল্যাটফরম হইতে ট্রাঙ্ক লইয়া তাহা ভাঙ্গিয়া জিনিষগুলি সরাইয়া ইষ্টকপূর্ণ করতঃ ইঁদারায় ফেলিয়া দিয়াছিল!

কাপড় চোপড়ের কথা প্রথমে অস্বীকার করিয়া শেষে বলিল যে সেগুলি বাবুইহাটীর বারবণিতাগণকে বিক্রয় করিয়াছে।

লৌহবলয়ে ভূষিত করিয়া ফাগুয়াকে কলিকাতায় চালান করা হইল।

(৬)

রায় যে কেবল মুক্তি পাইল তাহা নহে। স্বয়ং ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট অফ ট্রাফিক নিজের আফিসে তাহাকে ডাকাইয়া তাহার করমর্দ্দনপূর্ব্বক তাহার প্রতি যে দুর্ব্ব্যবহার করা হইয়াছে তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; এবং সেকারণ তাহার বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিবেন এমত আশ্বাসও দিলেন। রায় চাকরী ফিরিয়া পাইল।

কর্ত্তৃপক্ষের বিবেচনার ফল অনতিবিলম্বে "উইক্‌লি সার্কুলারে' প্রকাশিত হইল। তাহাতে দেখা গেল যে পি, সি, রায়কে বুকিংক্লার্ক হইতে ৬০্ টাকা বেতনের এ্যাসিষ্ট্যান্ট ষ্টেশনমাষ্টার পদে উন্নীত করা হইয়াছে এবং তাহার প্রতি যে অন্যায় আচরণ করা হইয়াছে তজ্জন্য তাহাকে কোম্পানি ১০০্ টাকা 'বোনাস' দিয়াছেন। তাহার সচ্চরিত্রতার কথা তাহার 'ক্যারাক্টার রোল' নামা চাকরির ইতিহাসে লিখিত থাকিবে একথারও উল্লেখ ছিল।

বোনাসের ১০০্ টাকা পাইয়া রায় এক মাসের ছুটী লইয়া কাশী গেল। সেখানে যাইয়া শুনিল যে তাহার গুরুদেব প্রায় একমাস পূর্ব্বে স্বর্গীয় হইয়াছেন, তাঁহার এক শিষ্য ঠাকুরবাড়ীর তত্ত্বাবধান করেন। সে প্রাপ্ত—

টাকার উপর নিজের সঞ্চিত অর্থ কিছু দিয়া ১০০খানি কম্বল ক্রয় করিয়া দীনদুঃখীকে বিতরণ করিল।

ছুটী অন্তে এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ষ্টেশনমাষ্টাররূপে সে পলাসপুরেই আসিল। ঘোষ মহাশয় প্রভৃতি একদিন মহাসমারোহের সহিত বনভোজন করিলেন। আহারান্তে ঘোষ মহাশয় রায়ের পিঠ চাপরাইয়া বলিলেন, "ধন্তি ভাই তোমার কুষ্ঠীর ফল!"

শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত।

অক্ষম।

প্রমত্ত করি বন্ধন তরে
সংযত নহে কর।
সিংহ-সদনে দড়ি হাতে যেতে
অন্তরে নাহি ডর।
'জেপ্‌লিন' যোগে উড়িতে আকাশে
সাহস আমার আছে।
'টরপেডো' চড়ি' হেসে যেতে পারি
অতল সাগর কাছে।
হ'লে হ'তে পারে চরণ আঘাতে
চূর্ণ গিরির শির—
অক্ষম আমি তথাপি জগতে
মনেরে করিতে স্থির।

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ।

হিন্দু-জ্যোতিষ।*

(কাল ও যজ্ঞ)

বৈদিক যজ্ঞাদিই বল, আর পৌরাণিক ব্রত-পার্ব্বনাদিই বল, ধর্ম্মানুষ্ঠান-ক্রিয়া-কলাপাদির উপরেই আমাদের হিন্দু-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। হিন্দু-জ্যোতিষ এই ক্রিয়া-কলাপাদির মূল-ভিত্তি। বৈদিক সময়ে যজ্ঞাদির কালনিরূপণ করিবার জন্ম প্রথমে সূর্য্য ও চন্দ্রের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণের সূত্রপাত হইয়াছিল, এবং আজও পর্য্যন্ত আমাদের দেশে প্রধানতঃ ব্রত-পার্ব্বণাদির শুভাশুভ দিন নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যেই পঞ্জিকাদি গণনা চলিয়া আসিতেছে।

কেহ কেহ সন্দেহ করেন, যজ্ঞাদির কাল নিরূপণের জন্ম বৎসরাদি গণনার সূত্রপাত হয় নাই, বৎসরাদি গণনার একটা হিসাব রাখিবার জন্ম যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হইয়াছিল। অবশ্য এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না বটে, তবে দেখা যায় যে, আর্য্য ঋষিগণ প্রতি ঋতুতে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। ঋত্বিক শব্দ ঋতু শব্দ হইতে উৎপন্ন (ঋতু+যজ্‌+ক্বিপ্‌)। এ কারণ ঋতু-যাগকারী পুরোহিতগণকে ঋত্বিক নামে অভিহিত করা হইত। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, সে সময় বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা ব্যতীত বৎসরাদি গণনার হিসাব রাখার উপায়ান্তর ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া কাল নিরূপণ করিবার জন্যই যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা হইত, এমন কথা বলা চলে না। তৈত্তিরীয় সংহিতায় আমরা দেখিতে পাই, "যজ্ঞো বৈ প্রজাপতিঃ," "সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ" যজ্ঞ এবং সংবৎসর উভয়েই প্রজাপতি। উভয়েই পরস্পর এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে একটি ব্যতীত অপরটির অস্তিত্ব থাকা একেবারেই সম্ভব ছিল না। তৈত্তিরীয় সংহিতায় আরও কথিত আছে, কোনও সময়ে দেবগণের নিকট হইতে যজ্ঞ একেবারে লোপ পাইয়া যাওয়ায়, দেবগণ কিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন। পরে অদিতি দেবগণকে সাহায্য

* এই প্রবন্ধের দু এক স্থানে শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক প্রণীত "অরিয়ন (Orion)" এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়-প্রণীত "আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী" নামক পুস্তকদ্বয়ের কিছু কিছু সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

রেন এবং যজ্ঞারম্ভের প্রকৃষ্ট কাল দেখাইয়া দেন। ইহা হইতে বোধ হয়, বৎসরাদিকাল গণনা সূচিত হইবার পূর্ব্বেও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা হইত; কিন্তু কালাকাল বিচার অভাবে ক্রমে উহা একেবারে লোপ পাইয়া যায়। পরে আর্য্যঋষিগণ যজ্ঞাদি পুনঃ প্রতিষ্ঠা কল্পে কালগণনার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়া পরেন; এবং তাঁহারা আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পান যে, পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে সূর্য্যের অবস্থান কালীন দিবা ও রাত্রি সমান হইতেছে। তখন তাঁহারা পুনর্ব্বসু নক্ষত্রকে নক্ষত্র-গুলীর আদি নক্ষত্র স্থির করিয়া লইয়া, উহা হইতে বৎসর ও ঋতু গণনা আরম্ভ করেন। অদিতি এই পুনর্ব্বসু নক্ষত্রেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবী। একারণ সংহিতাদিতে, ইনি যজ্ঞকাল প্রদর্শন করাইয়া দেন, বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সূর্য্য পুনর্ব্বসু নক্ষত্র হইতে বৎসর আরম্ভ করিতেন বলিয়া তাঁহার অপর নাম অদিতিপুত্র বা আদিত্য। শতপথ ব্রাহ্মণে দ্বাদশ মাসে সূর্য্যকে দ্বাদশাদিত্য নামে বর্ণনা করা হইয়াছে।

বৈদিক সময়ে চন্দ্রের গতি হইতে মাস এবং সূর্য্যের গতি হইতে বৎসর গণনা করা হইত। আর্য্যঋষিগণ প্রথমে দেখেন যে, সূর্য্য এক পূর্ণচন্দ্র হইতে অপর পূর্ণচন্দ্রের মধ্যে স্থূল হিসাবে প্রায় ত্রিশবার উদিত হন এবং এইরূপ দ্বাদশ পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে একবার সমগ্র ভূচক্র প্রদক্ষিণ করেন। সুতরাং তাঁহারা প্রথমে ত্রিশ দিনে একমাস এবং এইরূপ দ্বাদশ মাসে অর্থাৎ ৩৬০দিনে এক বৎসর কল্পনা করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে সূর্য্যের গতি ও ঋতু পরিবর্ত্তনাদি বিশদ-রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এই বৎসরমানকে ৩৬০দিন হইতে ৩৬৬দিনে সংশোধন করিয়া লওয়া হয়। অধুনা আমরা এই ৩০ ও ৩৬০ দিনকে সাবনমাস ও সাবন বৎসর নামে অভি-হিত করিয়া, অশৌচ ও গর্ভাধানাদি সংস্কার কার্য্যে ব্যবহার করিয়া থাকি। একারণ মনে হয়, বৎসরমান ৩৬৬দিনে পরিবর্ত্তিত হইবার পরেও ৩৬০দিন বৎসরমান কোনও কোনও কার্য্য বিশেষে ব্যবহৃত হইত; এবং তাহারই স্মৃতি রক্ষার্থ আমরা আজও পর্য্যন্ত উহাকে সাবন নামে ব্যবহার করিয়া আসিতেছি।

বৈদিক সময়ে মাত্র চান্দ্রমাস গণনাই প্রচলিত ছিল। পূর্ব্বে এই দ্বাদশ চান্দ্রমাসকে মধু, মাধব, শুক্র, শুচি, নভঃ, নভস্য, ইষ, উর্জ্জ, সহঃ, সহস্য, তপঃ ও তপস্য নামে অভিহিত করা হইত। পরে পূর্ণিমার দিন চন্দ্র যে নক্ষত্রে অবস্থান করেন, সেই নক্ষত্রের নামানুসারে চান্দ্রমাসগুলির নাম-করণ করা হয় এবং এইরূপে বৈশাখাদি মাস সংজ্ঞা প্রচলিত হইয়া পড়ে (১)। বৈদিক সময়ে চন্দ্রের গতি অনুসারে মাস গণনা করা হইলেও, সূর্য্যের গতি অনুসারে বৎসর ও ঋতু গণনা করা হইত। চন্দ্রের একবার সমগ্র ভূচক্র পরি-ক্রমণ করিতে প্রায় ৩৫৪দিন সময় লাগে। উহা সৌরবৎসর মান ৩৬৬দিন হইতে প্রায় ১১দিন কম; এবং এই হিসাবে প্রতি আড়াই বৎসরে একমাস কম হইয়া পড়ে। একারণ চান্দ্র বৎসরের সহিত সৌর বৎসরের সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য প্রতি আড়াই বৎসর অন্তর একটি করিয়া চান্দ্রমাসকে অধিমাস রূপে কল্পনা করা হয় (২)। পূর্ব্বে এই অধিমাস-গুলিকে সংসর্প, মলিম্লুক ও অংহস্পতি নামে অভিহিত করা হইত। কিন্তু নক্ষত্রানুসারে নামকরণ করার পর হইতে আর এই সকল নাম ব্যবহার করা হয় না; অধিমাসগুলিকে মলমাস-বৈশাখ, মলমাস-জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি নামে নামকরণ করা হইয়া থাকে।

অধুনা আমাদের দেশে পূর্ণিমান্ত ও অমান্ত এই উভয়-বিধ মাসই গণনা করা হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে পূর্ণিমান্ত মাসকে গৌণচান্দ্র এবং অমান্ত মাসকে মুখ্যচান্দ্রমাস বলা হয়। ভারতের কোনও কোনও স্থানে পূর্ণিমান্ত মাসকে প্রধান মাসরূপে গণনা করিতেও দেখা যায়। বৈদিক সময়ে কিরূপ মাস গণনা প্রচলিত ছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া

---

(১) বিশাখা নক্ষত্র হইতে বৈশাখ, জ্যেষ্ঠা হইতে জ্যৈষ্ঠ, উত্তরা-ষাঢ়া হইতে আষাঢ়, শ্রবণা হইতে শ্রাবণ, উত্তরভাদ্রপদ হইতে ভাদ্র, অশ্বিনী হইতে আশ্বিন, কৃত্তিকা হইতে কার্ত্তিক, মৃগশিরা হইতে মার্গশীর্ষ [অগ্রহায়ণ] পুষ্যা হইতে পৌষ, মঘা হইতে মাঘ, উত্তরফল্গুনী হইতে ফাল্গুন এবং চিত্রা হইতে চৈত্র মাসের নামকরণ করা হইয়াছে। এই সকল মাসের পূর্ণিমার দিন চন্দ্র এই সকল নক্ষত্রে অথবা ইহাদের পরবর্ত্তী নক্ষত্রে অবস্থান করিয়া থাকেন।

(২) বৈদিক গ্রন্থাদিতে পাঁচবৎসর অন্তর অধিমাস গণনা করি-বারও উল্লেখ পাওয়া যায়। বৎসরমান ৩৬০ দিন না হইলে পাঁচ বৎসর অন্তর অধিমাস হইতে পারে না। এক্ষারণ মনে হয়, আমাদের এই অধিমাস কল্পনা বহু প্রাচীন। অধুনা আমরা যে মাসে দুইটি অমাবস্যা সংঘটিত হয়, অথবা যে মাসে একেবারেই অমাবস্যা হয় না, সেই মাসকে অধিমাস বলিয়া গণনা করিয়া থাকি। উহা প্রতি আড়াই বৎসর অন্তরই ঘটিয়া থাকে।

কিছু বলা যায় না। তবে আমরা দেখিতে পাই, পূর্ণিমার দিন চন্দ্র যে নক্ষত্রে অবস্থান করেন, সেই নক্ষত্রের নামানুসারে চান্দ্রমাসের নামকরণ করা হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, ব্রতপার্ব্বনাদি যাবতীয় তিথিকৃত্য এই পূর্ণিমান্ত মাসেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। একারণ মনে হয়, বোধ হয় পূর্ণিমান্ত মাসই মাসগণনার আদি সূচনা। পরে বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে অমান্ত মাস গণনার প্রথম সূত্রপাত হয়। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে কথিত আছে ;—

স্বরাক্রমেতে সোমার্কৌ যদা সাকং সবাসবৌ।
স্যাত্তদাঽদিযুগং মাঘস্তপঃ শুক্লোঽয়নংহ্যুদক্॥

অর্থাৎ বাসব বা ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে সূর্য্য ও চন্দ্র যখন একত্রে অবস্থান করেন, তখন আদিযুগ মাঘ মাস, তপঃ ঋতু, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণ আরম্ভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে আর্য্য-ঋষিগণ ঋতুর পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াই বৎসরাদির আরম্ভ-দিনের সংশোধন করিয়া লইতেন ; কেন যে এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, সে বিষয়ে ততটা মনোযোগ দিতেন না। তৈত্তিরীয় সংহিতার সময়ে মাঘীপূর্ণিমায় উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত। পরে ঋতুর পরিবর্ত্তন ঘটায়, যখন দেখা যায় যে, মাঘীপূর্ণিমার ১৫ দিন পূর্ব্বে উত্তরায়ণ আরম্ভ হইতেছে, তখন বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে মাঘমাসের শুক্লপ্রতিপদে আদিযুগ নির্দ্দেশ করিয়া অমান্তমাস গণনার রীতি প্রচলিত করা হইয়াছিল।

বৈদিক যজ্ঞাদিকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—দেবযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞ। এই দ্বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান কল্পে সংবৎসরকেও দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ। উত্তরায়ণ দেবযজ্ঞের কাল এবং দক্ষিণায়ণ পিতৃযজ্ঞের কাল। ইহারা ঋগ্বেদে দেবযান ও পিতৃযান নামে প্রসিদ্ধ। চন্দ্রের কলার হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে চান্দ্রমাসকে যেমন কৃষ্ণ ও শুক্ল পক্ষে বিভাগ করা হইয়াছে ; সেইরূপ বিষুবরেখার দক্ষিণে ও উত্তরে সূর্য্যের গতি থাকায়, দিনমানের যে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে, তদনুসারে সংবৎসরকেও দক্ষিণ ও উত্তরায়ণে বিভক্ত করা হইয়াছে। দেবযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞের কাল সম্বন্ধে শতপথব্রাহ্মণে কথিত আছে,—"বসন্তো গ্রীষ্মো বর্ষা, তে দেবা ঋতবঃ, শরদ্ধেমন্তঃ শিশিরস্তে পিতরোঃ, স এবাপূর্ব্বেহর্দ্ধমাসঃ স দেবা, যোঽপক্ষীয়তে স পিতরোঽহরেব দেবা রাত্রিঃ পিতরঃ, পুনরহ্নঃ পূর্ব্বার্দ্ধো দেবা, অপরার্দ্ধঃ পিতরঃ।" অর্থাৎ বসন্ত গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই তিনটি দেব ঋতু বা উত্তরায়ণ কাল, এবং শরৎ হেমন্ত ও শিশির এই তিনটি পিতৃঋতু বা দক্ষিণায়ণ কাল। যে পক্ষে চন্দ্রের কলা বৃদ্ধি হয় তাহা দেবগণের এবং যে পক্ষে হ্রাস হয় তাহা পিতৃগণের কাল। দিবা ভাগ দেবগণের এবং রাত্রি পিতৃগণের ; আবার দিবার পূর্ব্বার্দ্ধ দেবগণের এবং পরার্দ্ধ পিতৃগণের কাল। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, চন্দ্রের কলা ও দিনমানের হ্রাস বৃদ্ধিই পিতৃ যজ্ঞ ও দেবযজ্ঞের কাল নির্দ্দেশের কারণ। এই হ্রাস বৃদ্ধিরই একটা হিসাব রাখিবার জন্য দেবযজ্ঞ ও পিতৃ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হইত। অধুনা আমাদের এই দেবযজ্ঞের কাল বিশেষরূপে প্রতিপালিত না হইলেও, পিতৃযজ্ঞ-কালের সবিশেষ আদর করা হইয়া থাকে। পূর্ণিমান্ত আশ্বিনমাস এক সময়ের শরৎ ঋতু অর্থাৎ দক্ষিণায়ণারম্ভের কাল ছিল। একারণ এই আশ্বিন কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত ১৫ দিন কাল সংবৎসরের মধ্যে আমাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পিতৃযজ্ঞের সময় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এই ১৫ দিন কাল আমরা প্রত্যহ তিলতর্পনাদি দ্বারা, এবং অমাবস্যায় মহালয়া পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ ও ষোড়শপিণ্ডদানাদি দ্বারা অতি আগ্রহের সহিত পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। কেবল ইহাই নহে, আজকাল আমাদের যতপ্রকার পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে, তাহা দিবা পরার্দ্ধ ব্যতীত কখনও পূর্ব্বার্দ্ধে সম্পন্ন করা হয় না ; এবং কৃষ্ণ একাদশী ও অমাবস্যা তিথিদ্বয়কে পতিতশ্রাদ্ধের উপযোগী কাল বলিয়া পরিগণিত করা হইয়া থাকে।

অধুনা আমাদের সে বৈদিক যাগতপাদি আর নাই। আমরা এখন উহার অনুকল্পে পৌরাণিক ব্রতপূজাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। ব্রতপূজাদি তিথিকৃত্যের অপর নাম পার্ব্বণ। পর্ব্ব শব্দের অর্থ সন্ধি অর্থাৎ সমপদার্থদ্বয়ের যোগস্থল। দুই চান্দ্রমাসের সংযোগ দিন,—অমাবস্যা অথবা পূর্ণিমা। এ কারণ অমাবস্যা বা পূর্ণিমা একটি পর্ব্ব। এইরূপ দুই যুগের সংযোগ দিন, দুই বৎসরের সংযোগ দিন, দুই ঋতুর সংযোগ দিন, দুই পক্ষের সংযোগ দিন,—ইহারা সকলেই এক একটি পর্ব্ব। বৈদিক সময়ে পর্ব্বদিনে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা কালগণনার হিসাব রাখাটা বেশী সুবিধাজনক বিবেচিত হইয়াছিল। তাই বোধ হয়, প্রতি

ঋতুতে, প্রতি বৎসরের আরম্ভ দিনে এবং পূর্ণিমাদি পর্ব্ব-দিনে যজ্ঞানুষ্ঠান করা হইত। মনুর সময়ে পৌরাণিক এত পূজাদি সূচিত হয় নাই বৈদিক যজ্ঞাদিরই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। মনুসংহিতাতেও পর্ব্বদিনে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। মনু বলেন,——

অগ্নিহোত্রঞ্চ জুহুয়াদাদ্যন্তে দ্যুনিশোঃ সদা।
দর্শেন চার্দ্ধমাসান্তে পৌর্ণমাসেন চৈব হি॥
শস্যান্তে নবশস্যেষ্ট্যা তথর্ত্বন্তে দ্বিজোঽধ্বরৈঃ।
পশুনাত্বয়নস্যাদৌ মাসান্তে সৌমিকৈর্মখৈঃ॥

অর্থাৎ দিবা ও রাত্রির প্রথমে ও শেষে অগ্নিহোত্র যাগ করিবে। কৃষ্ণপক্ষ পূর্ণ হইলে দর্শ নামক এবং পূর্ণিমাতে পৌর্ণমাস নামক যজ্ঞ করিবে। নূতন শস্য প্রস্তুত হইলে আগ্রয়ণ, ঋতু পূর্ণ হইলে চাতুর্ম্মাস্য, অয়নের প্রথমে পশু-যাগ এবং বৎসর পূর্ণ হইলে সোমরসসাধ্য অগ্নিষ্টোমাদি যাগ করিবে।

আজকাল আমাদের যে সকল ব্রতপূজাদির অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে, তাহার সকল গুলি আপাতদৃষ্টিতে পর্ব্ব-দিন বলিয়া বোধ হয় না বটে; কিন্তু যদি আধুনিক পর্ব্ব-গুলির সঙ্গে প্রাচীন পর্ব্বদিনগুলিকেও পর্ব্বদিন বলিয়া গণ্য করা যায়, তাহা হইলে সকলগুলি না হউক, আমাদের প্রায় অধিকাংশ ব্রতপার্ব্বনাদি যে পর্ব্বদিনে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। পূর্ব্বে বিষুব-সংক্রমণ-বিন্দু পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে সূর্য্যের অবস্থান হইতে বৎসর-গণনার সূত্রপাত হয় বটে; কিন্তু পরে যখন চান্দ্রমাস ও ঋতুগণনা প্রচলিত হয়,- তখন এই বৎসর গণনা, বিষুব-সংক্রান্তি হইতে উত্তরায়ণ অথবা বসন্ত ঋতুর আরম্ভ দিনে পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হয়। পুনর্ব্বসুতে বিষুব-সংক্রমণ হইলে চৈত্রপৌর্ণমাসীতে উত্তরায়ণ হইয়া থাকে। এ কারণ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে চৈত্রপৌর্ণমাসীতে বৎসরারম্ভ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার প্রায় দুই হাজার বৎসর পরে বিষুব বিন্দু যখন পুনর্ব্বসু হইতে মৃগশিরা নক্ষত্রে পিছাইয়া পরে, তখন বৎসরারম্ভ দিন ফাল্গুনী পৌর্ণমাসীতে পরিবর্ত্তিত করিয়া লওয়া হয়। পরে বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সময়ে বিষুব সংক্রমণবিন্দু কৃত্তিকানক্ষত্রে আসিয়া পরায়, মাঘ মাসকে বৎসরের আদিমাস বলিয়া পরিগণিত করা হইয়াছিল। এখন দেখা যাইতেছে যে, চৈত্রমাসে যখন উত্তরায়ণ হইত, তখন আষাঢ় ও পৌষমাসে বিষুব সংক্রমণ এবং আশ্বিন মাসে দক্ষিণায়ণ ঘটিত। ইহারা সকলেই সেই সময়ের পর্ব্ব। এইরূপ ফাল্গুনমাসে উত্তরায়ণের যুগে জ্যৈষ্ঠ; অগ্রহায়ণ ও ভাদ্র এবং মাঘ মাসের যুগে বৈশাখ কার্ত্তিক ও শ্রাবণ পর্ব্বমাস ছিল। অধুনা অশ্বিনী আমাদের আদি নক্ষত্র এবং বৈশাখ আমাদের আদি মাস হইলেও, আমরা প্রাচীন প্রায় সকল পর্ব্বগুলিরই স্মৃতিরক্ষা করিয়া আসি-তেছি। ফলে আমাদের "বারমাসে তের পার্ব্বণ" হইয়া পরিয়াছে, বৎসরের সকল মাসেই আমরা কোনও না কোনও পর্ব্বানুষ্ঠান করিতেছি।

প্রথমে চৈত্র মাসে উত্তরায়ণ বা বৎসরারম্ভ হইত। এ কারণ আজও পর্য্যন্ত আমরা চৈত্রশুক্লপক্ষে বাসন্তী পূজা বা নবরাত্র পার্ব্বণের অনুষ্ঠান করিয়া সেই প্রাচীন বসন্তোৎ-সবের স্মৃতিরক্ষা করিয়া আসিতেছি। চৈত্রমাসে উত্তরায়ণ হইলে আশ্বিন মাসে দক্ষিণায়ণ হইয়া থাকে। দক্ষিণায়ণ দেবযজ্ঞের কাল নয়। একারণ আশ্বিন মাসে আমাদের যে শারদীয়া পূজা বা নবরাত্র পার্ব্বণের অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে, তাহাকে রামচন্দ্রের অকাল পূজা বলা হয় (১)। চৈত্র ও আশ্বিনে উত্তর ও দক্ষিনায়ণ হইলে আষাঢ় ও পৌষে বিষুব সংক্রমণ ঘটিয়া থাকে। তাই বোধ হয়, আষাঢ় শুক্লপক্ষে আমাদের রথযাত্রা ও পূর্ণিমায় চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ এবং পৌষ পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক পার্ব্বণ অনুষ্ঠিত হয়। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ বা বৎসরারম্ভের স্মৃতিরক্ষার্থ, আজও পর্য্যন্ত আমরা দোলযাত্রা, হোলি অথবা বসন্তোৎসব পার্ব্বণদ্বারা সেই প্রাচীন বসন্তোৎসবেরই অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছি। কেবল তাহাই নহে, এই উত্তরায়ণান্ত ভাদ্র শুক্লপক্ষে আমাদের ললিতা সপ্তমী, দুর্ব্বাষ্টমী, তাল-নবমী, অনন্তচতুর্দ্দশী প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান পৌরাণিক ব্রতেরও অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে। কৃত্তিকানক্ষত্রে বিষুব-সংক্রমণ হইবার সময়ে, কার্ত্তিক মাসকে কিছুদিনের জন্য বৎসরে আদিমাস বলিয়া পরিগণিত করা হয় এবং তখন অমান্ত মাস গণনার রীতিও কিছু কিছু প্রচলিত ছিল। একারণ বোধ হয়, কার্ত্তিকী অমাবস্যায় আমরা দীপান্বিতা

(১) শারদীয়া পূজা যে অকাল পূজা, এ কথাটা স্মরণ রাখিবার জন্য, আমরা পূজার বোধনে মন্ত্রপাঠ করিয়া থাকি,—"ঐ রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ। অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা॥

লক্ষীপূজা (শ্যামাপূজা) ও গৃহপ্রাঙ্গণাদি আলোকমালায় সজ্জিত করিয়া সেই কার্ত্তিকীবৎসরেরই স্মৃতিরক্ষা করিয়া আসিতেছি। কেবল তাহাই নহে, বৎসরারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে দ্যূত প্রতিপদ, যম বা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পর্ব্বেরও অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। বেদাঙ্গ জ্যোতিষে যখন মাঘ শুক্লপ্রতিপদে উত্তরায়ণ বা বৎসরান্ত দিন পরিবর্ত্তন করা হয়, তখন মাঘ মাস পর্ব্ব মাস হইয়া পড়ে। বসন্তপঞ্চমী বা সরস্বতীপূজাই, বোধ হয়, আমাদের এই সময়ের বসন্তোৎসব। উপরন্ত মাঘ-শুক্লপক্ষে বিনায়ক চতুর্থী, মাকরী সপ্তমী ও মাঘীপূর্ণিমা পর্ব্বেরও অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে।

অশ্বিনী নক্ষত্রের আরম্ভে বিষুব-সংক্রমণ হইতে অধুনা বঙ্গদেশে সৌরমাস অনুসারে বৎসর গণনা করা হইয়া থাকে (১)। অশ্বিনী মেষরাশির আদিতে অবস্থিত। একারণ চৈত্রসংক্রান্তিতে আমাদের মহাবিষুব সংক্রান্তি। এইদিন চড়কপূজা ও জলপূর্ণ ঘটদানাদি দ্বারা সৎসরারম্ভ পর্ব্বানুষ্ঠান এবং সমগ্র বৈশাখমাসকে অতি পুণ্যমাস বলিয়া পরিগণিত করিয়া নানারূপ দানধ্যানাদি ব্রতের অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে। অপর দিকে তুলার আদিতে অর্থাৎ সৌর আশ্বিন সংক্রান্তিতে জল বিষুব সংক্রমণ ঘটিয়া থাকে। এই সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র কার্ত্তিক মাসে আকাশপ্রদীপ দান ও কার্ত্তিক সংক্রান্তিতে কার্ত্তিকের পূজার অনুষ্ঠান করা হয়। পৌষ সংক্রান্তিতে উত্তরায়ণ আরম্ভ। এই দিন আমাদের পৌষ পার্ব্বণ এবং সমগ্র মাঘমাস স্নানদানাদি ধর্ম্মকর্ম্মের প্রকৃষ্টমাস বলিয়া বিবেচিত হয়। কেবল ইহাই নহে, চান্দ্রমাস-সংক্রান্তি পূর্ণিমা ও অমাবস্যার ন্যায়, সৌর সংক্রান্তি দিনগুলিও অতি পুণ্যাহ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে।

আমরা কেবল প্রাচীনবৎসরারম্ভ দিনগুলিই আধুনিক ব্রত পার্ব্বনাদিতে গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহা নহে, প্রাচীন যুগাদ্যা দিনগুলিরও স্মৃতিরক্ষার্থ আমরা যথেষ্ট যত্নবান। বৈশাখ শুক্লাতৃতীয়ায় সত্যযুগ আরম্ভ। এই দিন আমাদের অক্ষয়তৃতীয়া ব্রত ও জলপূর্ণ ঘটদানাদির অনুষ্ঠান করা হয়। কার্ত্তিক শুক্লানবমী তিথিতে ত্রেতাযুগোৎপত্তি। এই দিন গৌরী ব্রত এবং বঙ্গদেশে জগদ্ধাত্রী পূজার উৎসব করা হইয়া থাকে। ভাদ্র কৃষ্ণ ত্রয়োদশীতে দ্বাপর যুগোৎপত্তি এবং মাঘীপূর্ণিমায় কলিযুগৎপত্তি এই দুই দিন অতি পুণ্যাহ বলিয়া বিবেচিত হয় এবং ইহাতে স্নান দান ও হরিসংকীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে।

প্রাচীন ও আধুনিক পর্ব্বদিনগুলির স্মৃতি রক্ষার্থেই যে আমাদের সকল ব্রত পূজাদির অনুষ্ঠান, এমন কথা জোর করিয়া বলা চলে না। দেবযজ্ঞের প্রকৃষ্টকাল শুক্লপক্ষ কিন্তু আমাদের এমন কতগুলি ব্রতানুষ্ঠান আছে যাহা কৃষ্ণ পক্ষেও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে,—যেমন সাবিত্রী চতুর্দ্দশী, জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রি ইত্যাদি। আমাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপাদির সংখ্যা এত অধিক যে, ইহাদের মধ্যে জ্যোতিষসংক্রান্ত কাল নির্ণয়ের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া সহজসাধ্য নহে। ব্রতপূজাদির মূল ভিত্তি স্মৃতি ও পুরাণ। ইহাতে কাল গণনার হিসাব রাখিবার জন্য ব্রতপূজাদির প্রয়োজন, এরূপ কথা কোথাও উল্লেখ নাই; অথবা এরূপ প্রয়োজন আছে, এমন কথাও আমরা কেহ মনে করিব না। তবে দেখা যায়, যে মনুর সময় পর্য্যন্ত পর্ব্বদিনে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। যজ্ঞার্থেই যজ্ঞের প্রয়োজন। দেব বা পিতৃলোকের তৃপ্ত্যর্থেই যজ্ঞের সৃষ্টি। তবে যজ্ঞগুলিকে একটা ধারাবাহিক নিয়মে পরিচালিত করিবার জন্য কালগণনার প্রয়োজন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কাল গণনারও একটা হিসাব রাখিবার জন্য যজ্ঞগুলিও ব্যবহৃত হইতে থাকে। একারণ বৈদিক সময়ে যজ্ঞ ও কাল পরস্পর সাপেক্ষ ছিল, এবং বর্ত্তমান স্মৃতি পুরাণাদিতে স্পষ্ট উল্লিখিত না হইলেও, সেই কাল ও যজ্ঞের ঘনিষ্ঠসম্বন্ধটি ব্রত পার্ব্বণাদির ব্যবস্থায় বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। প্রাচীন পর্ব্বদিনে বিশেষ বিশেষ ব্রতের ব্যবস্থা আকস্মিক বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

(১) ভারতের অনেকস্থানে চান্দ্রমাস অনুসারে এখনও বৎসর গণনা করা হয়।

কাশী।

অয়ি কাশী বারানসী ভূতলের ইন্দু
মহাকাল-ত্রিশূলেতে সিঁদূরের বিন্দু।
যুগে যুগে জন্মি' যেন পুণ্যের সঙ্ঘ
নিরমিল সুবিমল কমনীয় অঙ্গ।
তীর্থের পারিজাত মোক্ষের সত্র,
বিশ্বের জননীর স্নেহ আতপত্র,
ধর্ম্মের ধাম তুমি, দুর্গার দুর্গ
ভারতের হৃদি প্রাণ, কণ্ঠের সুর গো।

অগৃহীর গৃহ তুমি, অকামীর কাম্য
উদাসীর মায় তুমি বিরোধীর শাম্য
ধরা ছাড়া তবু ধরা প্রেমে তুমি বন্দী
তব বায়ু ভকতির পরিমল গন্ধী।
পরশনে শিব কর পুণ্যের সদ্ম
তুমি মোর শ্যামা মার রাঙা পাদপদ্ম।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

প্রেমের ফাঁদ।

(গল্প)

(১)

গোয়ালন্দে পটলের প্রচুর আমদানি। দিদিমার খেও অরুচি। তাই একদিন রাত্রি ৯টার সময় গোয়ালন্দ যাইয়া উপস্থিত হইলাম। জাহাজের আলো পড়িয়া গোয়ালন্দ বড় সুন্দর 'দেখাইতেছিল। কিন্তু পদ্মার পাড়ে গোয়ালন্দের আলোক ঝলমল্ মুখখানা দেখিবার মত চোখ চিন্তা ও কল্পনা তখন আমার ছিল না।

ষ্টীমার হইতে নামিয়াই এক ঝুড়ি পটোল কিনিয়া ফেলিলাম। পটোলওয়ালা যাহা চাহিল তাহাই তাহার হাতে বুঝাইয়া দিয়া ঝুড়িটা কুলির মাথায় চাপাইয়া দিতেছি —এমন সময় এক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়ের বাড়ী?'—বলিলাম। জিজ্ঞাসা করিলেন 'মহাশয়ের নাম?'—তাও বলিলাম। তিনি একটু হাসিলেন।

আমি মনে করিলাম, পটোলের দামদস্তর করি নাই; যা চাওয়া তাই দেওয়া; তাই বুঝি লোকটা বুঝিল আমি গোয়ালন্দের ঠকের কাণ্ড জানি না!—না, আমি তা' খুবই জানিতাম; কিন্তু সদ্যতোলা পটোল আর দিদিমার মুখের অরুচি-জনিত উত্তপ্ত গরজ—দুইয়ে মিলিয়া আমাকে একটু উদার করিয়া তুলিয়াছিল।

কুলিটা আগে আগে হাঁটিতেছিল। আমিও একটু তাড়াতাড়িই পা চালাইতেছিলাম। ভদ্রলোকটি আমার গায়ে গায়ে মিশিয়া আসিতেছিলেন। জেটিতে আসিয়া ষ্টীমারে উঠিতেছি এমন সময় তিনি বলিলেন—'ও— এটা কালীগঞ্জের ষ্টীমার। আপনি ত' যাবেন লৌহজঙ্গ? নারায়ণগঞ্জ যেইলে উঠুন!" আমি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বিস্মিত ও লজ্জিতভাবে বলিলাম. —হাঁ! তাই নাকি? তা হলে সেটা কোন্ জেটিতে?" —"আসুন আমার সঙ্গে"—বলিয়া তিনি আগে আগে হাঁটিতে লাগিলেন। আমি তাহার পাছে পাছে যাইয়া আর এক জেটি অতিক্রম করিয়া ষ্টীমারে উঠিলাম। ভদ্রলোকটি বলিলেন—"আমিও নারায়নগঞ্জ' যাব। আমরা এক পথেরই পথিক—তবে কিনা, মাঝখানে আপনি খসে পড়বেন। তা' বাকী পথটা কোন রকমে কাটান যাবে।"

আমিও ভাবিলাম, যাহোক, জাহাজের একঘেয়ে একটানা চলতিটা একটু বৈচিত্র্যময় করিয়া লইব—গল্পে, কথায়, আর হাসিত মাসায়। ভদ্রলোকটি ইত্যবসরে আমারই কম্বলখানা পাতিয়া পটোলের ঝুড়িটি মাথার দিকে সরাইয়া রাখিলেন। তারপর বলিলেন, "আপনি না হয় শুয়ে থাকুন,

আমিই টিকেট নিয়ে আসি। "আমি ভাবিলাম, তা মন্দ নয়; কিন্তু স্থানটা গোয়ালন্দ; টিকেটের মূল্য আগে দেওয়া হইবে না। আমি চতুরতার সহিত রুমাল খুঁজিতে খুঁজিতে বলিলাম, বেশ, তো নিয়ে আসুন আপনি; টাকা—তা, তা,—রুমালটা কি হল?—আরে!—রুমালটা!" ততক্ষণে তিনি বলিয়া ফেলিলেন—"না, থাক্ থাক্! টিকেট নিয়ে আসি তারপর টাকা দেবেন।"

আমি দেখিলাম, ভদ্রলোকটি নিতান্তই ভদ্রলোক! তাই ভাড়ার টাকা তার হাতে পুরিয়া দিয়া বলিলাম—"না, না সে কি! এই নিন টাকা! টাকা—সে একটা কথা কি?—আপনি তো আর পালিয়ে যাবেন না!—"

ভদ্রলোকটি টিকেট আনিতে চলিয়া গেলেন। আমি কম্বলের উপর শুইয়া পড়িলাম, শুইতে শুইতেই আমি ঘুমের সাগরে স্বপ্নের দোলায় দোদুল দুলিতে লাগিলাম। ষ্টীমার কখন ছাড়িল, কোন্ দিকে চলিল, তাহার কোনও খবর ঘুমের দেশে পাইলাম না।

(২)

আমি যখন জাগিলাম, তখন বেলা ৯টা।

জাগিয়া সেই ভদ্রলোকটিকে দেখিতে পাইলাম না। ভাবিলাম হয়তো জাহাজের নীচের ডেকে গিয়াছে। কি আর কোথাও আছে।

আমারই কাছে জটলা বাঁধিয়া এক ঝাঁক যুবক তাস খেলিতেছিল। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম—দেখুন! শুনুন তো! দেখুন!—লৌহজঙ্গ আর কতদূর?—তাহারা অধর চাপিয়া হাসিল বলিল,—"কি-কি কি-কি! লৌহজঙ্গ!" আমি বলিলাম হাঁ, লৌহজঙ্গ - লৌহজঙ্গ!

তখন তাহাদের মধ্যে কি একটা খেলার গণ্ডগোল নিয়া বচসা আরম্ভ হইল। আমার কথা আর কেহ খেয়ালই করিল না।

তখনও আমার ঘুমের ঘোর ভাল করিয়া ভাঙ্গে নাই। চোখ বুজিতেই আবার ঘুমাইয়া পরিলাম। আবার জাগিয়া উঠিলাম—প্রচণ্ড একটা কোলাহলে। দেখিলাম, তাস খেলোয়াড়দের একপক্ষ "মূর্ত্তি-স্ত বোম্" সাজিয়াছেন—আর বিজয়ী পক্ষ জয়ধ্বনি করিতেছেন! আমি হাই তুলিয়া, হাত-পা টান করিয়া, আলসতা ঝাড়িয়া, পকেট হইতে ঘড়ি উঠাইয়া দেখিলাম, বেলা দশটা! অনতি উচ্চ স্বরে বলিলাম—"ইস্! বেলা বাজে দশটা! এখনো লৌহজঙ্গের সাথে দেখা-শুনা নেই!" বলিতেই একটি যুবক তাস ভাজ করিতে করিতে বলিল—"মহাশয়ের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে নিশ্চয়!"

আমি একটু উত্তেজিত স্বরেই বলিলাম—'সে কি!' যুবকটি তেমনি ব্যঙ্গের ভাবেই উত্তর দিল—"আজ্ঞে তাই! কালীগঞ্জের ষ্টীমারের সাথে লৌহজঙ্গের প্রেম নাই তো, আর দেখা-শুনা হইবে কি!"

কথাটা শুনিয়াই তো চক্ষু স্থির! বিস্ময় ব্যাকুলিত কণ্ঠে বলিলাম—"কা—লী গঞ্জের ষ্টীমার!—" ধস্‌মসাইয়া উঠিয়া বসিলাম। শিয়রে পটোলের ঝুড়িটি রাখিয়াছিলাম—ফিরিয়া চাহিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার মাথা ঘুরিয়া গেল! ও হরি! আমার পটোলের ঝুড়িটি যে নাই! নিকটস্থ যুবকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাহারা কলিকাতা হইতে আসিয়াছে। তখন ভোর! তাহারা পটোল-টটোল কিছুই আসিয়া দেখে নাই। তাহাদের ভাষায় বলিতে গেলে এই—"আমরা এসেছি ভোরে। এসে আপনাকে নিষ্পটোল অবস্থায় দেখেছি।"

আমি উঠিলাম—উঠিয়া উন্মাদের মত নীচে-উপরে ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম।—পটোলের ঝুড়িও নাই, সেই ভদ্রলোকও নাই! বুঝিতে আর বাকী রহিল না যে, সে বেটা ভদ্রবেশী গোয়ালন্দের গুণ্ডা! পটোল তো নিয়াছেই, সঙ্গে সঙ্গে ভাড়ার টাকা! হায়—আমি কেন ঘুমাইয়াছিলাম?—কেনই বা সাধিয়া, ভাড়ার টাকা পর্য্যন্ত—" আমি রেলিং ধরিয়া তাহাই ভাবিতেছি—তখন, তাস খেলোয়াড়দের একজন যেন আমাকেই লক্ষ্য করিয়া গাহিল—

"কি ঘুম তোরে পেয়েছিল
হতভাগিনী?"

আর একজন পাদপূরণ করিয়া গাহিল—

সে যে কাছে এসে "নিয়ে গেছে"
তবু "জাগিনি!"

আমিও মনে মনে বলিলাম—তাইত!—

আমি রেলিংএর উপর ঝুকিয়া পড়িয়া দেখিলাম—সেই যমুনা, সেই যমুনার উপর দিয়া দুই বৎসর আগে পারুলদের বাড়ী গিয়াছিলাম। দীর্ঘ দুইটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে—সেই যে বিবাহ করিয়া আসিয়াছি—আর পারুলদের বাড়ী যাই নাই। প্রতিজ্ঞা, পারুলদের বাড়ী আর

ধনো যাইব না। জীবনটা, বন্ধনবিহীন মুক্তবিহঙ্গের মত াকাশে-বনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, কাটাইয়া দিব।

পারুলদের বাড়ী হইতে কতবার কত লোক আসিয়াছে, ই নাই; সকলেই রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। পারুলও াগ করিয়া চিঠি লেখা বন্ধ করিয়াছে। কিন্তু, এখন যেন কেবলই মনে হইতেছে,—

"কি জানি কি প্রেমের টানে
ছুটে চলেছি!—"

(৩)

পারুলদের গ্রামের নাম না-ই বলিলাম! পারুলদের াড়ী যাইতে হইলে যে ষ্টেশনে নামিতে হয়—সেটাও াপন করিয়া বলিব—'নলচর'! ষ্টীমার নলচর ষ্টেশনে ামিল। আমি নামিয়া পড়িলাম। নামিবার সময় কেটসংগ্রাহক মহাশয় আমার মুখের পানে চাহিয়া একটু াসিলেন। ভাবিলাম, একটি পান আর একটি সিগা-রেটেই খুশী!

আমি নলচরে নামিয়া দাঁড়াইতেই পেছন হইতে কে আমার চোখ টিপিয়া ধরিল। এই বিদেশে—এই এতদূরে—ঠাৎ আমার আপন লোকটি কে আসিল যে, আমার চোখ িপিয়া ধরিল?—আমি কাহার নাম বলিব? আমি হাসিতে াসিতে মৃদুভাবে চোখ হইতে অচেনা আপনের হাত দুখানা রাইয়া বলিলাম—"ও—তুমি গিরিজা!" সেও আমার থা নকল করিয়া বলিল,—"আপনি বাড়ুয্যে মশাই!"

আমি তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম—"তুমি এখানে সেচ কেন?" সে বলিল—"সোণাকাকার কলেজ বন্ধ 'য়েছে—পূজোর ছুটি—সে আসি আসি করে' আস্‌চেনা। আমি রোজই তারজন্য দাঁড়িয়ে থাকি এখানে।"

আমি বলিলাম—"সোণাকাকা! তার নাম কি?" স বলিল—"বাঃ! সোণাকাকা! চিন্‌লেন না?—সাণাকাকা! যার নাম ষোড়শীলাল!" আমি বলিলাম—ষোড়শীলাল! তা' হ'তে পারে। সেই—আর এই! তা' মার কেমন করে' ঠাহর থাক্‌বে বল? তোমাকে চিন্‌তে পেরেছি শুধু এইজন্য যে—যে দুদিন ছিলাম, তুমি অষ্টপহর আমার সঙ্গে ছুট্‌কো করেছ! যাক্, তুমি এখন পথ দেখিয়ে চল।"

—আপনারা এখন পেছন হইতে বিদ্রূপের লাঞ্ছনা দিতে থাকুন। আমি কিন্তু শ্বশুরবাড়ী চলিয়াছি!

মনের মধ্যে এলো-মেলো মেঘ। তা' থাক্! আমি শ্বশুরবাড়ী চলিয়াছি। শ্বশুরবাড়ীর পথে অনেক জামাতা-বাবাজীরই মনে মনে ভয় থাকে—না জানি শ্যালিকারা কিছু-একটা কাণ্ড করিয়া তুলিবে! কিন্তু শ্যালক শ্রীমান্ গিরিজা ভিন্ন আর শ্যালক কিম্বা শ্যালিকা আমার নাই। যাঁরা আছেন—তাঁরা সবাই পূজার পাত্র ও পাত্রী—কাকা আর কাকী (অবশ্য পারুলের মধুময় সম্পর্কে)। কাজেই মনে কোন ভয় ছিল না;—ছিল পটোলের চিন্তা! তবে গল্প-সল্প করিতে পারেন এমন দুটি স্ত্রীলোক আছেন বটে—তাঁরা দু'জনেই প্রায় আশী বসন্তের যুবতী!—একজন মদীয় শ্বশুরমহাশয়ের পিসিমা—পারুলের সম্পর্কে "কর্ত্তামা"—আর একজন ঐ মধুময় সম্পর্কেই ঠাকুরমা। ঠাট্টা বিদ্রূপের জালটি পাকা-পোক্ত নয় ভাবিয়াই পটোল সংক্রান্ত শত চিন্তা সত্ত্বেও শ্বশুরবাড়ীর পথে স্বচ্ছন্দ, সাবলীল, দুলালী ধরণেই চলিতে লাগিলাম।

যে জামাতৃ-দেবতা শত আবাহন শত নিমন্ত্রণ সত্ত্বেও শ্বশুরবাড়ী পদার্পণ করেন নাই—তিনি যে হঠাৎ কেন অনাহূত ভাবে বর্ষার জলের মত নদ-নদী-নালা, বিল ঝিল-মাঠ বাহিয়া কল কল রবে তরঙ্গিত মহিমায় শ্বশুরবাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন—তাহা ভাবিয়া কাহারও মূর্চ্ছা না হইলেও বিস্ময়ের যে সীমা রহিল না, তাহা ঠিক।

সম্মুখে পূজা—সকলেই আমাকে ঘরে লইয়া গেল, আদরে ও যত্নে—যদিও ব্যস্ততা বশতঃ বরণডালার অপমান-জনক অভাব বিদ্যমান ছিল।

(৪)

বেলা তখন ঢলিয়া পড়িয়াছে। অবেলায় শ্বশুরবাড়ীর ভুরি-ভোজনে শরীরটা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল। আমি শেফালী ফুলের মত ঝুরুঝুরে ফুরফুরে শুভ্র শয্যায় শয়ন করিয়া তন্দ্রার গোলাপী আবেশে অবশ হইয়াছিলাম। অমন সময় ঘরে কাহার পদশব্দে চমকিয়া উঠিলাম। চাহিয়া দেখিলাম—গোয়ালন্দের সেই লোকটিই আমার টেঁকঘড়িটি হাতে করিয়া বাহিরে যাইতেছে। আমি অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় এক লম্ফে বিছানা হইতে উঠিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিলাম—"চোর! চোর!"

সকলে দৌড়াইয়া আসিল। আমি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলাম—"গোয়ালন্দে পটোল চুরি করেছ—আবার, এখানে এসে ঘড়িটিও—।" বলিয়াই দমিয়া গেলাম। কৈ! চোর ত পলায়নের চেষ্টা করিতেছে না! কেহ ত চোর ধরিবার চেষ্টা করিতেছে না। সকলেই যে বেদম হাসাহাসি করিতেছে! আমার বলবুদ্ধি আড়ষ্ট হইয়া গেল। আমি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলাম।

গোয়ালন্দের ভদ্রলোকটি হাসির তুফান থামাইয়া বলিতে লাগিলেন—"তুমি গোয়ালন্দে যখন পটোল কিনিতেছিলে, তখনই তোমাকে দেখিয়া চিনিয়াছিলাম। তবুও তোমার নামধাম জিজ্ঞাসা করিয়া দ্বিগুণ নিশ্চয় করিয়া লইলাম। ভাবিলাম, শিকার জুটিয়াছে; এবার ফাঁদ পাতিয়া ধরিব। "গোয়ালন্দের জেটি—তার কোথায় কোন্ ষ্টীমার থাকে, তা খুঁজিয়া নেওয়া কঠিন। তাই অতি সহজেই জেটির গণ্ডগোল বাধাইয়া তোমাকে কালীগঞ্জের ষ্টীমারে উঠাইয়া দিলাম। তুমি কিন্তু নারায়ণগঞ্জের ষ্টীমারেই উঠিতে ছিলে।

"তারপরে, তোমার ও আমার দুইখানা নলচরের টিকেট কিনিয়া, জাহাজে আসিয়া দেখিলাম তুমি ঘুমাইয়াছ। আরও একটু সুবিধা হইল। তোমাদের গ্রামের নগেনবাবু আমার সতীর্থ। আমরা এক সঙ্গেই গোয়ালন্দে আসিয়া ছিলাম। তাহারই কোনও প্রয়োজনে আমাকেও সেখানে ক'য়েক দিন দেরী করিতে হইল। ঝুড়িটি তাহারই কাছে দিয়া আসিলাম। তোমার পটোল সে বাড়ীতে পৌঁছিয়া দিবে বলিয়াছে।

"টিকেট কালেকটর বাবু আমাদের আত্মীয়। আমি তাঁহার কামরায় যাইয়া সব বলিলাম। জাহাজে পটোল চুরি বলিয়া একটা কথা হইতেছে শুনিয়া, আর কামরা হইতে বাহির হই নাই। কারণ, তুমি আমাকে তখন দেখিতে পাইলে, হয় তো আমার কথা না শুনিয়াই একটা অনর্থ ঘটাইয়া ফেলিতে!

"আড়াল হইতেই তোমার মুখখানা রমেশবাবুর পরিচিত করিয়া রাখিলাম। কিজানি, টিকেট চেক করিতে যাইয়া, কিম্বা নামিবার সময়, যদি—"

আমি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলাম—"ও—তাই বুঝি! বও তো ভাবলুম, একটা পান আর একটা সিগারেটে সে হাস্‌বে কেন?"

তিনি বলিলেন—"হাঁ, সে সুখের ভাগ আমিও কিছু যে না পাইয়াছি তা নয়। থাক্ শোন—

"তুমি খুব অস্থির হইয়াছিলে, নয়? তা আমি আর রমেশবাবু কামরায় বসিয়া বসিয়াই দেখিয়াছি। অস্থির হওয়ার কথাও বটে! একবার শুনিলাম, বলিতেছ—'ঐ গোয়ালন্দের গুণ্ডাটাই এ কাণ্ড করেছে!'—এক একবার ইচ্ছা হইল, পরিচয়টা দিই, কিন্তু তার আগেই যদি তুমি প্রতিশোধ গ্রহণে তৎপর হও, তবে?—তাই বাড়ীতে আসিয়া গোপনে পরিচয়টা দিব, স্থির করিলাম।

"তুমি যখন গিরিজার সঙ্গে বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছ, তখন আমি কামরা হইতে বাহির হইয়া ষ্টীমার ঘাটে নামিয়াছি। তারপর পথে বসন্তপুরের স্কুলবোর্ডিং এ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মদন ও মুরারির সম্মিলিত "গেষ্ট" (Guest) হইয়া খাওয়া দাওয়ার পর এই তো কতক্ষণ হয় বাড়ী আসিয়াছি।

"পিসিমা—তোমার কর্ত্তামা—তোমার জন্য নাকি একছড়া লোহার চেন তৈরী করাইয়া রাখিয়াছেন। তিনিই আমাকে ঘড়িটি আনিতে বলিয়াছিলেন। বিড়ালের মত পা' টিপিয়া নীরবে হাঁটার অভ্যাস নাই। কাজেই তুমি টের পাইয়া খপ্ করিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিয়াছ। ভাবিয়াছিলে,—গোয়ালন্দে পটোল আর ভাড়ার টাকা নিয়াছি; এবার ঘড়িটিও।—নয়?—

"সুযোগ ঘন ঘন আসে না। এত দিন তুমি ধরা দাও নাই; তাই, কি আর করিব?—সুযোগ পাইয়া আমাকেই ফাঁদ পাতিয়া ধরিতে হইল।

"ভাবিয়াছিলাম, গোপনে পরিচয় দিয়া সব কথা চাপিয়া ফেলিব! কিন্তু, তা' আর হইল কৈ?—আমি তোমার পূজ্যাস্পদ—সোনাকাকা—ষোড়শীলাল!"

আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম—"শ্বশুর জামাতার অভিনয় একটু পানসে হ'য়ে পড়্‌লো; নইলে এটা সাহিত্যিকের খাসা খোরাক হ'ত!"

তিনি বলিলেন—"বটে! তা তার একটু আধটু বেসুরো বাজেই ত। তা' আর আমি কি বলিব, বল?—প্রত্যক্ষ সত্যের নির্লজ্জ আলোটাকে সলজ্জ স্বপ্নের অলীক ছায়ায় কেমন করিয়া ঢাকিয়া রাখিব?"

আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম—"আপনাকে ১ গালি-গালাজ ক'রিয়াছে; তার প্রতিকার?" তিনি মাকে বন্ধুর মত গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"এই তার প্রতিকার! সকল সময় দেবতার মত দূরে দূরে কিলে ভয় ভিন্ন বন্ধুর ভালবাসা হয় কি?"

*　　*　　*

রাত্রিতে পারুলের কাছে আদ্যন্ত সব কথা বলিতে হইল। রুল বলিল—"এটা কোনো মাসিকে ছেপে দেও না?" মি পারুলের ফুটন্ত পাপ্ড়িতে সুদীর্ঘ দুইবৎসরের সঞ্চিত হাগরাশি ঢালিয়া দিয়া বলিলাম—"তা হলে গল্পের নামটি বলে' দাও!" পারুল আমার বুকে মুখ লুকাইয়া বলিল—"বলি?" আমি বলিলাম—"বল।"

"বলি?"

"—বাঃ! বল না?"

পারুল খট্ খট্ করিয়া হাসিয়া আবার বলিল—"বলি?" আমি পারুলকে আরও বুকে টানিয়া আনিয়া বলিলাম, "হাঁ, বল!" পারুল এবার আমার কাণের কাছে ওষ্ঠদ্বয় ঘনাইয়া, সারা গায়ে সুড় সুড়ির ফুল ছড়াইয়া বলিল, "প্রেমের ফাঁদ!"

শ্রীসদাশিব বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রিয়।

(১)

তুমি প্রিয়! তুমি প্রিয়!
নিখিল ভুবনে　　জীবনে মরণে
তুমি প্রিয়! তুমি প্রিয়!
সখা,—
কোন্ সুনিমিষে তোমাতে আমাতে
হল বিনিময় হিয়াতে হিয়াতে
ভাবি বসে তাই একা!
সখা,—
তুমি প্রিয়! তুমি প্রিয়!
কাছে মোরে ডেকে নিও!

(২)

তুমি প্রিয়! তুমি প্রিয়!
শয়নে স্বপনে　　বচনে মননে
তুমি প্রিয়! তুমি প্রিয়!
সখা,—
আমার সকল বুকের ভিতরে
অমল উজল কনক-আখরে
তোমারি ছবিটী আঁকা!
সখা,—
তুমি প্রিয়! তুমি প্রিয়!
চরণে শরণ দিও!

(৩)

তুমি প্রিয়! তুমি প্রিয়!
সজনে বিজনে　　আঁধারে কিরণে
তুমি প্রিয়! তুমি প্রিয়!
সখা,—
তব দরশন, তব পরশন,
মৃত-পরাণের নবীন চেতন
অপার মাধুরী মাখা!
সখা,—
তুমি প্রিয়! তুমি প্রিয়!
সাথী মোরে করে নিও!

(৪)

তুমি প্রিয়! তুমি প্রিয়!
জনমে জনমে　　ধরমে করমে
তুমি প্রিয়! তুমি প্রিয়!
সখা,—
আজ আমি আর নহি আপনার
বসুধা খুঁজিয়া সুধা-পারাবার
তটিনী পেয়েছে দেখা!
সখা,—
তুমি প্রিয়! তুমি প্রিয়!
প্রেমটুকু মোরে দিও!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

শূর্পণখার অভিশাপ।

(অদ্ভুত স্বপ্ন)

জ্যৈষ্ঠমাস, স্কুল-কলেজ সমস্ত বন্ধ হইয়াছে, স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গের সঞ্জীবন সংস্পর্শে প্রবাসক্লিষ্ট প্রাণটা সতেজ করিয়া নিতে বাড়ীতে আসিয়াছি কিন্তু আজ কয়েকদিন যাবৎ মার্ত্তণ্ডদেব যেরূপ প্রচণ্ডভাবে ধরণীর অঙ্গে অগ্নিরাশি ঢালিতেছেন, তাহাতে যেন শরীরমন অধিকতর অবসন্ন হইয়াই পড়িয়াছে। আজ সন্ধ্যাকাল হইতে আকাশের বায়ুকোণে একটী নাতি ক্ষুদ্র বিদ্যুৎগর্ভ মেঘ দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে গুমোট যেন আরও বাড়িয়াছে। এই নির্ব্বাত নিদাঘ নিশা, বিনিদ্রনয়নে কিরূপে অতিবাহিত করিব, তাহার কোনপ্রকার সন্তোষজনক "রুটিন"ই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না। নব্য কাব্যরসে অরসিকা গৃহিণী আহারান্তে রামায়ণখানা নিয়া "সীতার বনবাস" অধ্যায় পড়িতে আরম্ভ করিয়া এবং স্থানে স্থানে যুক্তি তর্ক বহির্ভূত মতলব মত টীকা করিয়া রাম-চরিত্র সমালোচনার ছলে আমার উপর এক একটা এড়েশা কিস্তি দিতেছেন। যদিও আমি মামুলি যুক্তি দিয়া "মাত" ঠেকাইয়া গৃহিণীকে নিরস্ত করিয়া দিতেছি, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার "তরল নয়নে তেরচা চাহনি" সহ পুরুষ জাতির উপরে সুতীব্র মন্তব্য থামিতেছে না। এই গরমের সময় পাছে বিতর্কটা বিবাদে পরিণত হয়, এই আশঙ্কায় বাগ্‌যুদ্ধ ছাড়িয়া তালবৃন্তের আশ্রয় লইয়া সটানভাবে শয্যায় শুইয়া পড়িলাম। গৃহিণী আপন মনে অনুচ্চস্বরে রামায়ণ পড়িতে লাগিলেন। আমি খানিকক্ষণ এপাশ ওপাশ করিয়া শয্যাপার্শ্বে পতিত একখানা ক্ষুদ্র পুস্তক খুলিয়া অন্যমনস্কভাবে তাহার পাতাগুলি উন্টা-ইতে লাগিলাম। পুস্তকখানা এক সাহেব কোম্পানীর প্রকাশিত স্কুলপাঠ্য ক্ষুদ্রাকার ভারতবর্ষের ইতিহাস। খোকা এখানা পড়ে।

উদ্দেশ্যবিহীনভাবে পাতা উন্টাইতে উন্টাইতে পুস্তকের একখানা ছবির প্রতি দৃষ্টি পড়িল। এখানি রাম লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর বনযাত্রার চিত্র। ছবিখানা এমনই বিকৃত যে নীচের লেখাটা না দেখিলে ইহা ধাঙ্গড় চৌয়াড়ের ছবি বলি-য়াই মনে হয়। শ্রদ্ধাহীন বিজাতীয় চিত্রকরের হাতে [illegible] শ্রীরামচন্দ্রের নব-জলধররূপের কিরূপ বিকৃতি ঘটিয়াছে, এই মূর্ত্তি খোকার কোমল মনে ভারতের আদর্শ পুরুষের সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা জন্মাইয়া দেয়—ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে এবং মধুকর-নিকর-গুঞ্জনবৎ গৃহিণীর রামায়ণ পাঠ শুনিতে শুনিতে অজ্ঞাতসারে তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম বলিতে পারি না। ইহারই মধ্যে এক ভীষণ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম, দেখিলাম বিচিত্রাম্বর-পরিহিতা ছিন্নকর্ণা ছিন্ননাসা এক কৃষ্ণাঙ্গ-রমণী অট্টহাস্যে চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া কটমট্ করিয়া আমার দিকে চাহিয়া আছে। ঘৃণা, বিদ্বেষ এবং ক্রোধে তাহার মুখখানা বড়ই বিকটদর্শন করিয়া তুলিয়াছে। আমি সেই বিকটাননা রমণীর তীব্র দৃষ্টিতে ভীত হইয়া এক-পা, দু-পা করিয়া পিছে হটিতেছি, এমন সময়েই রমণী আবার পূর্ব্ববৎ অট্টহাস্য করিয়া উন্মাদিনীর মত দৌড়িয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "দাঁড়াও, ভয় নাই। আজ তোমাকে কয়েকটা মনের কথা বলব।"

"আমি মহারাজাধিরাজ রাবণভগিনী শ্রীশ্রীমতী শূর্পণখা দেবী। তোমরা বল রাক্ষসী। ছেলেমেয়ে—বুড়ো বুড়ী—বামুণ শূদ্র সাধু চোর সকলেই আমার নাম শুনলে হাসে, ব্যঙ্গ করে। তোমাদের সঙ্গে আমাদের জাতের রক্তের সংস্রব বড়ই কম, তাই তোমাদের সঙ্গে আমাদের আকৃতি, প্রকৃতি, আচার ব্যবহার, চালচলন এমন কি গায়ের রংটার পর্য্যন্ত ঐক্য নাই। তাই ব'লে কি আমরা মানুষ নই? আমাদের জাতটা যে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে কেবল রাক্ষস ব'লেই অবজ্ঞাত তাহা নহে, আমাদের জাতের কোনও কালমানুষ তাদের সামনে পড়লেই তারা শেয়াল কুকুরের মত তাহাদিগকে মেরে ফেলত! তারা তাদের দেবতার কাছে আমাদের ধ্বংস কামনা ক'রে পূজা দিত! সুবিধা পেলেই আমাদের আড্ডা ভেঙ্গে চু'রে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিত! এত অত্যাচারেও তাদের 'সাধ মিটে নাই। আমাদের উপর তাদের অত্যাচারটা সমর্থনের জন্য অথবা আমাদের উপরে তাদের ভবিষ্যদ্বংশের ঘৃণাটা পুরোপুরি বজায় রাখবার জন্য পুঁথি পুস্তকে নানা

র ফেঁদে ভীষণ হ'তে ভীষণতররূপে আমাদের চিত্র এঁকে রেখেছেন। কিন্তু সত্য সত্যই কি আমরা জগতের ঘৃণার পাত্র ?

আমি খোনা মানুষ। সব কথা হয়ত ভাল ক'রে বলতেই পারব না। বিশেষতঃ লক্ষ্মণ ছোঁড়াটার অত্যাচারে আমার যে দশা ঘটেছে তাতে আর লোকসমাজে আমার মুখ দেখানই চলেনা। তাই এতকাল তোমাদের কাছে কিছু বলতে সাহসী হই নাই। কিন্তু যখন দেখলাম্ যে আমারই মত ঘৃণিত কুঁজী বাঁদীর কথাটাও তোমরা কাণ পেতে শুনলে, * তখন বোধ হয় সময়ের গুণে তোমরা অপ্রিয় সত্যও শুনতে শিখেছ। এই ভরসায় আজ তোমার কাছে দুটো কথা বল্‌তে এসেছি।

আমি বালবৈধব্যের পবিত্রতা রক্ষায় অসমর্থ হ'য়ে কন্দর্পের শাসনে উপযাচিকারূপে লক্ষ্মণের দ্বারস্থ হ'য়ে যে পাপ করেছিলাম, ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যানেই তার উপযুক্ত সাজা হ'য়েছিল। নারীর আর এর চেয়ে কি অপমান হ'তে পারে ? কিন্তু তাতেও ত মন উঠ্‌লো না, যখন দুর্বৃত্ত আমাকে মাটিতে চিৎকরে ফে'লে বুকে চ'ড়ে ব'সে আমার নাক কাণ কে'টে দিল, নিঃসহায় অবলার চীৎকারে পঞ্চবটীর জল স্থল পূর্ণ, তখন প্রভুদের বড়ই আনন্দ হলো। মেয়ে মানুষের নাককাণ কাটা, বীরত্ব বটে।

বিধবার মনোমত পত্যন্তর গ্রহণ ত আমাদের জাতির চিরন্তন প্রথা। এতেই আমাদের উপর এত ঘৃণা ? তোমরাই কি বড় একনিষ্ঠ শুদ্ধ জাতি ? তোমাদের যৌন পবিত্রতার দৌড় কতদূর ? বানরাভিহিত আর্য্যানার্য্যের মিলনোৎপন্ন কপিশবর্ণের সঙ্কর জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে তোমাদের রামায়ণে যা লেখা আছে, তাতে ত আর্য্য-দেবগণের অবিচারিত ভাবে ইন্দ্রিয়চালনারই পরিচয় পাওয়া যায়। দক্ষিণদেশে তোমাদের দল বাড়াইবার অভিপ্রায়ে—পালের গোদা ব্রহ্মা সেই আদেশ করিলেন যে—

"অপ্সরঃ সু চ মুখ্যাসু গন্ধর্বীণাং তনুষু চ
যক্ষ পন্নগ কন্যাসু ঋক্ষ বিদ্যাধরীষু চ
কিন্নরীনাঞ্চ গাত্রেষু বানরীণাং তনুষু চ
সৃজধ্বং হরিরূপেণ পুত্রাং স্তুল্য পরাক্রমান্।"
(আদিকাণ্ড ১৭শ সর্গ)

অর্থাৎ "এখন হ'তে তোমরা প্রধানা প্রধানা অপ্সরী, কিন্নরী, নাগী, যক্ষী, এবং বানরীতে আত্মতুল্য পুত্র উৎপাদন কর।" অমনি তোমাদের দেবতা ও ঋষিগণ বানরপত্নীগণে সঙ্গত হ'তে লাগলেন। ইহাই কি সুনীতি ? অন্যের কথা কি ? আমার ঠাকুরদাদা পুলস্ত্য ঋষিত তোমাদের মধ্যে একজন প্রধান লোক ? বল্‌তে লজ্জা হয়, তপস্যার সময়ে তিনি "তৃণবিন্দু" ঋষির যুবতী কন্যা "হবিভূ" কে দেখে তাল ঠিক রাখ্‌তে না পেরে ঐ কুমারী কন্যাতেই গর্ভাধান করেন। শেষে কথাটা জানাজানি হ'য়ে গেলে তৃণবিন্দু গর্ভিণী কন্যা হবিভূকে পুলস্ত্যের সঙ্গে জোর ক'রে গাঁটছড়া বেঁধে দিলেন। সেই গর্ভেই আমার পিতৃদেব "বিশ্রবাঃ" জন্মগ্রহণ করেন। এইত তোমাদের কুলপতি ঋষিদের সংযম! এমন সংযমের কত দৃষ্টান্ত চাও ? সব কথা বলার উপযুক্ত সময় এখন নয়। তারপর শোন তোমাদের সেই বিশ্রবাঃ ঋষির কথা। তিনিও স্বীয় ধর্মপত্নী "ইলবিলা"কে অতিক্রম ক'রে "সুমালী"রাক্ষসের কন্যা আমার মাতৃদেবী "কৈকসী"তে উপগত হ'য়ে ছিলেন। মাতৃদেবী যৌবনকালে সাভিলাষি হ'য়ে—

"উপসৃত্যাগ্রত স্তস্য চরণাধোমুখী স্থিতা
বিলিখন্তী মুহুর্ভূমিমঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ ভামিনী,
স তু তাং বীক্ষ্য সুশ্রোণীং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্
অব্রবীৎ * * * * " (উত্তরকাণ্ড ৯ম সর্গঃ)

বিশ্রবার নিকটে গিয়ে পদাঙ্গুষ্ঠদ্বারা ভূমিনির্লেখনাদি আকারেঙ্গিত দ্বারা মনোভাব প্রকাশ করা মাত্রই তিনি তাঁর নাক কাণ কেটে না দিয়ে সাগ্রহে অভিলাষ পূর্ণ করেছিলেন। তাহাতেই ত আমাদের উৎপত্তি। তোমাদের ইন্দ্র চন্দ্র বায় বরুণ দেব ঋষি কাহার কথা বলি ? জিতেন্দ্রিয় একনিষ্ঠ কে ? কে লোভের ফাঁদ এড়া'তে সমর্থ হ'য়েছেন ? এ অবস্থায় রাম লক্ষ্মণের সমীপে সাভিলাষা হ'য়ে যাওয়াটা কি আমার বড়ই দুরাশা বা দুষ্কার্য্য হ'য়েছিল ?

আসল কথা আমাদের দ্বারা তোমাদের স্বার্থ সিদ্ধির প্রতিবন্ধকতা হ'ত ব'লে আমাদের উপর তোমাদের বড়ই বিদ্বেষ ছিল। তাই যখন তখন আমাদের উপর

* ১৩২৫ সালের "ভাদ্র" সংখ্যা মালঞ্চে "মন্থরার অভিযোগ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

নানা দৌরাত্ম্য করেছ। আবার নিজেদের ইচ্ছামত অতি কুৎসিতাকারে তোমাদের পুরাণে আমাদিগকে চিত্রিত করেছ। বিন্ধ্যবাসী ঋষিঠাকুরেরা রামচন্দ্রকে হাতে পেয়েই আমাদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধায়। নিজেদের কার্য্যসাধনের উদ্দেশ্যে তাকে দণ্ডকারণ্যে বাসের জন্য পাঠিয়ে দিল। এবং রাক্ষসগুলোকে মেরে ধ'রে তাড়িয়ে দিয়ে সেই সুপ্রশস্ত সুজলা সুফলা ভূমি মুনিঠাকুরদের "আয়্মা" ক'রে দিতে পরামর্শ দিল। ব্রাহ্মণসেবক শ্রীরামচন্দ্রও তদানীন্তন ক্ষত্রধর্ম্ম রক্ষার্থে আমাদের বিনাশের সঙ্কল্প ক'রে "অগস্ত্য বচনাচ্চৈব জগ্রাহৈন্দ্রং শরাশনম্" তারপর দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু শত হ'লেও সীতা দেবী মেয়ে মানুষ। তাঁর হৃদয় কোমল। স্বামীর এই প্রকার অহেতুকী রাক্ষসহিংসা দেখে তিনি হাত জোড় করে রামকে ব'লেছিলেন—

"অধর্ম্মস্তু সু সূক্ষ্মেণ বিধিনা প্রাপ্যতে মহান্,
নিবৃত্তেন চ শক্যোয়ং ব্যসনাৎ কামজাদিহ।"

হে স্বামিন্! সূক্ষ্মভাবে বিচার করিতে গেলে কামজ ব্যসন হেতু আপনি অধর্ম্ম পথে যাইতেছেন। সেই কামজ ব্যসনটী কি? না "বিনাবৈরঞ্চ রৌদ্রতা।" অর্থাৎ বিনাশক্রতায় (অকারণে) প্রাণিহত্যাদি রুদ্র ভাবাবলম্বন। তিনি আরও ব'লেছিলেন—

"রৌদ্রং পরপ্রাণাভিহিংসনম্,
নির্ব্বৈরং ক্রিয়তে মোহাৎ তচ্চ তে সমুপস্থিতম্।
প্রতিজ্ঞাতস্ত্বয়াবীর দণ্ডকারণ্যবাসিনাম্,
ঋষীণাং রক্ষণার্থায় বধঃ সংযতি রক্ষসাম্।
এতন্নিমিত্তঞ্চ বনং দণ্ডকাইতি বিশ্রুতম্,
প্রস্থিতস্ত্বং সহভ্রাত্রা ধৃতবাণশরাসনঃ।
ততস্ত্বাং প্রস্থিতাং দৃষ্ট্বা মম চিন্তাকুলং মনঃ,
ত্বদ্‌বৃত্তং চিন্তয়ন্ত্যা বৈ ভবেন্নিঃশ্রেয়সং হিতম্।"

(আরণ্যকাণ্ড, ৯ম সর্গঃ)

অর্থাৎ আপনার সঙ্গে কোন প্রকার বৈরভাব না থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র ঋষিদিগের অনুরোধে ভাইকে নিয়ে রাক্ষস বধের জন্য যে সশস্ত্র হয়ে দণ্ডকারণ্যে চলেছেন, এটা আমার মতে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিজনক। এমন ক'রে গায় প'ড়ে ঝগড়া করতে যাওয়া শ্রেয়স্কর নয়।

কিন্তু রাম সতী সাধ্বীর কথা শুনলেন না।

ঐ যে মুনি গোঁসাইগণ আমাদের বংশ নিপাতের জন্য রামকে লেলিয়ে দিল এটা কোন্ উচ্চনীতি? ভারতের উত্তরার্দ্ধে কি তাদের তপস্যার উপযুক্ত স্থান ছিল না? তবে আবার আমাদের পার্ব্বত্য জঙ্গলা দেশের জন্য এত লোভ কেন? দক্ষিণাগত ঋষিগণের দলপতি অগস্ত্য ঋষিটি কেমন তপস্বী ছিলেন, রামের নিজ বাক্যেই তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিচ্ছি। রাম যে সময়ে দক্ষিণদিকে যেতে যেতে অগস্ত্যাশ্রমের নিকটবর্ত্তী হলেন, সে সময়ে তিনি লক্ষ্মণকে ঐ আশ্রম দেখিয়ে ব'লেছিলেন,—

"নিগৃহ্য তরসা মৃত্যুং লোকানাং হিতকাম্যয়া,
দক্ষিণাদিক্ কৃতা যেন শরণ্যা পুণ্যকর্ম্মণা,
তস্যেদমাশ্রমপদং প্রভাবাদ্ যস্য রাক্ষসৈঃ
দিগিয়ং দক্ষিণা ত্রাসাদ্ দৃশ্যতে নোপভুজ্যতে।"

(আরণ্যকাণ্ড, ১১শঃ সর্গঃ)

"যিনি মানুষের বসতির জন্য বলপূর্ব্বক অসুর, রাক্ষসাদিকে নিগৃহীত করিয়া দক্ষিণদিকটা আমাদের বসতির উপযুক্ত ক'রে দিয়েছেন, যাঁর ভয়ে রাক্ষসেরা এদিকে পা দিতে সাহসী হয়না, এই সেই অগস্ত্য ঋষির আশ্রম।"

এতে কি বিন্ধ্যলঙ্ঘনকারী অভিযানের দলপতি অগস্ত্যকে মৌনাবলম্বী মুনি ব'লে বিশ্বাস কর? আবার ইনি যে কত রকম মারাত্মক অস্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা, রামায়ণে তার ভূরি ভূরি পরিচয় পাওয়া যায়। একি তীর্থযাত্রীগণের অভিযান, না পরদেশাক্রমণকারিগণের যুদ্ধ যাত্রা? এতেও কি কেউ তোমাদের বাধা না দিয়ে পৈত্রিক বাড়ী জমাজমী তোমাদের ব্রহ্মোত্তর দিয়ে স'রে পড়্‌বে নাকি?

আমাদের উদ্বাস্তু করার জন্য তোমরা এতটা কোমর বেঁধে লেগেছিলে কেন? আমাদের দেশে থেকে আমরা নিজেদের ইচ্ছামত খাই, দাই, তাতে তোমাদের মাথায় টনক নড়ে কেন? আর আমাদের চালচলনটাই বা তোমাদের অসহনীয় কেন? আমরা তোমাদের মত আগুন জ্বে'লে যাগ যজ্ঞ করিনা, সর্ব্বদা মদমাংস খাই; কখন কখন মানুষের মাংসও মদের চাট্‌নীরূপে ব্যবহার করি, আনন্দ হ'লে মদ খেয়ে ভাই বোন, বাপ মা, স্বামী স্ত্রী একত্র হ'য়ে মাদল বাজিয়ে নৃত্য করি, গান গাই। এটা তোমাদের চক্ষে ভাল না লাগ্‌তে পারে, কিন্তু তা বলে এত উষ্ণ হও কেন? এ সব কাজ তোমরাও কি প্রকারান্তরে কর না?

ধর—নরহত্যা ক'রে তার মাংস খাওয়ার কথাটা। তোমরাই বা কম কিসে? পরবর্ত্তী তান্ত্রিক যুগের কথা বলছি না। সেই অতি প্রাচীন সত্য ত্রেতা যুগেও যজ্ঞে তোমরা মানুষ বলি দিয়ে দেবতাকে উপহার দিয়েছ। গাধা, গণ্ডার, হরিণ, শূকরাদির মাংস দিয়ে পিতৃযাগ, বাস্তু-যাগ—কত যাগযজ্ঞই করেছ? আবার এর সঙ্গে সঙ্গে সোমরস তো ব্যঞ্জনের লবণের মত অবশ্য প্রয়োজনীয় উপকরণ! কিছুদিন পূর্ব্বে অযোধ্যারাজ "অম্বরীষের" যজ্ঞে কি হ'য়েছিল? অম্বরীষের যজ্ঞীয় পশুটী দেবরাজ ইন্দ্র চুরি (!) ক'রে নিয়ে গেলে পুরুত ঠাকুরেরা রাজার অসাবধানতার তিরস্কার করে বল্লেন—

"প্রায়শ্চিত্তং মহদ্ধ্যেতন্নরং বা পুরুষর্ষভ,
আনয়স্ব পশুং শীঘ্রং যাবৎ কর্ম্ম প্রবর্ত্ততে।"

(আদি ৬১শ সর্গঃ)

যজ্ঞ-পশু হারিয়ে যাওয়ার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে শীঘ্র একটী মনুষ্য বলি দিয়া যজ্ঞ সম্পাদন কর। পুরোহিতের এই ব্যবস্থানুসারে তিনি "ঋচীক" নামক দরিদ্র ব্রাহ্মণের "শুনঃশেফ" নামক একটী ছোট ছেলেকে বহু টাকা দিয়ে কি'নে নি'য়ে এলেন। এই সঙ্গে আর একটা কথা না ব'লে পারছিনা। সগর রাজার যজ্ঞই কি, আর রঘুর যজ্ঞই কি, অম্বরীষের যজ্ঞই বা কি, যখনই যে কোন ক্ষত্রিয় রাজা বহুল যাগযজ্ঞের দ্বারা তৎকালোচিত উচ্চপদে আরোহণ করতে চেষ্টা করেছেন, তখনই তোমাদের দেব-ঋষিগণের টনক ন'ড়ে উঠেছে। চুরি চামারি কোন কাজেই তারা পিছুহটার লোক নয়! বিশ্বামিত্র-ত্রিশঙ্কুর কথাটাও আমরা শুনেছি। এক ধাপ নীচের ক্ষত্রিয়দিগকে নীচে ঠেসে রাখার জন্য যাদের এত আয়োজন, তারা যে কথায় কথায় আমাদের হত্যা ক'রে পুণ্য সঞ্চয় করবে, তাতে আর বিস্ময়ের কথা কি?

যাক্ সে কথা। এখন তোমাদের মদমাংস প্রীতির কথাটা একটু বলি। মদ, আর বেশ্যা—যাহা আমাদের (তথা কথিত রাক্ষসদের) সমাজে কদাপি দেখা যায় নাই—সেই বেশ্যাই ছিল তোমাদের উৎসবের প্রধান অঙ্গ। যারা মদ না খে'ত, তোমাদের চক্ষে তারা অসুর! তোমাদের পুরাণেই দেখি সমুদ্র মন্থনে যখন বারুণীর (মদ্যের) উদ্ভব হলো তখন—

"দিতেঃ পুত্রা ন তাং রাম জগৃহুর্ব্বরুণাত্মজাম্,
অদিতেস্তু সুতা বীর জগৃহু স্তামনিন্দিতাম্,
অসুরাস্তেন দৈতেয়াঃ সুরাস্তেনা দিতেঃ সুতাঃ।"

(আদিকাণ্ড ৪৫শঃ সর্গঃ)

দিতি পুত্র দৈত্যগণ মদ খেলেন না ব'লে দেবতারা তা-দিগকে অসুর ব'লে গাল দিলেন। আর খুব মদ খেয়ে মত্তগুল হ'য়ে নিজেরা "সুর" উপাধি গ্রহণ করলেন। তবে আমরা মদ খাই ব'লে ঘৃণা কেন? যজ্ঞার্থেই যে সুরার ব্যবহার ছিল, তা নয়। মদ মাংস না হ'লে তোমাদের রাজরাজড়া বা বড়মানুষের অভ্যর্থনাই হতো না! তাই মহারাজ বিশ্বামিত্র একসময়ে বশিষ্ঠাশ্রমে অতিথিরূপে উপস্থিত হ'লে বশিষ্ঠ—"ইক্ষুন্মধু স্তথা লাজান্ মৈরেয়াংশ্চ বরাসবান্" ইক্ষু, মধু, ধেনো, মৈরেয় প্রভৃতির উত্তম উত্তম মদ প্রচুর পরিমাণে জোগাড় করেছিলেন।

রামের বনযাত্রা কালে, গঙ্গাপার হওয়ার সময়ে সীতা গঙ্গাদেবীর কাছে এই বলে মানত ক'রেছিলেন যে—

"সুরাঘট সহস্রেণ মাংসভূতোদনেন চ,
যক্ষ্যেত্বাং প্রয়তাং দেবি পুরীং পুনরুপাগতা।

(অযোধ্যাকাণ্ড ৫২ সর্গঃ)

"হে গঙ্গে! আমরা মঙ্গলমত ফিরে এলে তোমাকে হাজার হাজার কলস মদ ও মাংসযুক্ত অন্ন দিব।"

রাম বনে গেলে যখন ভরত নিরানন্দ অযোধ্যা নগরীতে প্রবেশ করেন, তখন তিনি নগরবাসিগণের নিরানন্দ ভাব দেখে সারথিকে বলেছিলেন—

"বারুণী মদগন্ধশ্চ মাল্যগন্ধশ্চ মূর্চ্ছিতঃ,
চন্দনাগুরুগন্ধশ্চ ন প্রবাতি সমন্ততঃ।"

"হে সারথে! অযোধ্যানগরীতে এখন আর পূর্ব্বের মত মদ্য, অগুরু ও পুষ্পমাল্যের গন্ধ পাওয়া যাইতেছে না।" অর্থাৎ লোকগুলো রামের শোকে যেন সর্ব্বপ্রকার সুখ-সম্ভোগ ছেড়ে দিয়েছে! যেখানে রাস্তা দিয়ে যেতে দুপাশে মদের গন্ধে ভুর্ ভুর্ করে, সেখানে কি মদের ঢলাঢলি কম হ'তো?

বানর নামে যে জাতটার সঙ্গে তোমাদের অতিশয় বান্ধবতা ছিল, তারাও ত আমাদেরই মত স্ত্রীপুরুষে মদ খেয়ে আমোদ আহ্লাদ করত। "বালী"রাজার গুপ্তহত্যার পরে সুগ্রীব নূতন রাজপদে এবং নূতন রাণী ভ্রাতৃবধূ "তারা"কে

পেয়ে যখন ভোগবিলাসে একেবারে মে'তে গিয়ে রামের সঙ্গে চুক্তির কথাটা একবারে ভুলে গেল, তখন কিষ্কিন্ধ্যায় যেভাবে মদের স্রোত ব'য়ে গিয়েছিল, তেমন মদের স্রোত লঙ্কায়ও কখনও বয় নাই। সুগ্রীবকে সীতা উদ্ধারে এইরূপ নিশ্চেষ্ট হ'য়ে থাকতে দে'খে লক্ষ্মণও ভারি রে'গে গেলেন। শেষে একদিন চুক্তির কথাটা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য তিনি শসজ্রে কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়ে বানর-রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করলেন এবং সুগ্রীবকে ডেকে পাঠালেন। সুগ্রীব সে সময়ে তারার সঙ্গে খুব মদ খেতেছিল। সে লক্ষ্মণঠাকুরের ক্রোধের কথা শুনে নিজে না গিয়ে তার প্রীতিসম্পাদনের জন্য নূতন রাণী বালীপত্নী তারাকেই সেখানে পাঠায়ে দিল। তখন—

"সা প্রস্খলন্তী মদবিহ্বলাক্ষী,
প্রলম্ব কাঞ্চী গুণহেম সূত্রা,
স লক্ষনা লক্ষ্মণ সন্নিধানং,
জগাম তারা নমিতাঙ্গ যষ্টিঃ ॥
সাপানযোগাচ্চ নিবৃত্তলজ্জা,
দৃষ্টিপ্রসাদাচ্চ নরেন্দ্র সূনোঃ,
উবাচ তারা প্রণয় প্রগল্‌ভং,
বাক্যং মহার্থং পরিসান্ত্বরূপম্ ॥"

(কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৩৩শঃ সর্গঃ)

অর্থাৎ তোমাদের বন্ধুপত্নী "তারা ঠাকুরাণী" মদের নেশায় ঢুলুঢুলু নয়নে টল্‌তে টল্‌তে লজ্জাহীনার মত লক্ষ্মণের কাছে গিয়ে নানা রকম প্রণয়প্রগল্‌ভ কথায় লক্ষ্মণকে ঠাণ্ডা ক'রে দিল। বলি রাক্ষসীরা কি এর চেয়ে নির্লজ্জ বেহায়া? এই বানরজাতিই হলো তোমাদের অন্তরঙ্গের বন্ধু! তোমাদের মুখে এদের প্রশংসা ধরে না। যত ঘৃণা সব আমাদের বেলায়। তাতেই লোকে বলে যে—

"স্বার্থের নিকটে যদি ফাঁদ পাতা যায়
দেব নর ঋষি মুনি কে কোথা এড়ায়?"

স্বার্থের টান এমনই বটে!

আরও একটা অপ্রিয় সত্য বলি। কথাটা হচ্ছে—তোমাদের নারাঙ্গনাপ্রীতি। তোমাদের যে রাজার রাজ্যাভিষেক—কি তোমরা চোমরা লোকের বিয়ের মিছিল, কিম্বা তেমনি বড়মানুষের অভ্যর্থনা, সকল শুভকার্য্যে ঐ জিনিষটা চাই! নৈলে কোন শুভকার্য্যেরই জলুষ হয় না! অদ্যাপি তোমরা ঐ নোংরা রুচিটা ছাড়্‌তে পার নাই। সেই সত্যযুগেও দেবসভায় প্রত্যহ উর্ব্বশী মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচী ও তিলোত্তমাদি নৃত্য না করলে ইন্দ্রাদি দেবগণের রাত্রিতে সুনিদ্রা হত না। এই স্বর্বেশ্যাদল আবার তোমাদের জাতীয় পুরাণে মানবজাতির মহাসম্মানপাত্রী! পরমপুণ্যশীল মুনি ঋষি বা মহারাজগণই তাহাদের কৃপার পাত্র ছিলেন। তোমাদের পুরাণে এদের সম্বন্ধে যে সব ঘৃণাকারজনক কথা আছে, তা মুখে উচ্চারণ করতেও লজ্জা হয়। তোমাদের কাছে বেশ্যার কেমন আদর তারই সামান্য দু চারটা উদাহরণ দিচ্ছি।

যে সময়ে মহারাজ দশরথ রামাভিষেকের আয়োজন করার জন্য মন্ত্রী ও পুরুতঠাকুরদের উপর ভার দিলেন, সে সময় বশিষ্ঠ ও বামদেব কর্ম্মচারীদিগকে অন্তঃপুর সজ্জার জন্য যে আদেশ দিলেন—তাহাতে এরূপ আদেশও ছিল—

"সর্ব্বে চ তালাপচরা গণিকাশ্চ স্বলঙ্কৃতাঃ,
কক্ষ্যাং দ্বিতীয়মাসাদ্য তিষ্ঠন্তু নৃপবেশ্মনঃ।"

(অযোধ্যাকাণ্ড ৩য় সর্গঃ)

"গায়িকা ও নর্ত্তকী বেশ্যাদিগকে নানালঙ্কারে সাজাইয়া দ্বিতীয় কক্ষায় স্থাপন কর।" আবার রামচন্দ্র বনযাত্রা করিলে রামের ক্লেশ দূর করার জন্য পুত্রবৎসল দশরথ মন্ত্রীদিগকে এইরূপ আদেশ করিলেন যে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং চতুরঙ্গবাহিনী পাঠাও, আর—

"রূপাজীবাশ্চ বাদিন্যা বণিজশ্চ মহাধনাঃ,
শোভয়ন্তু কুমারস্য বাহিনীঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ।"

(অযোধ্যাকাণ্ড ৩৬শ সর্গঃ)

ঐ সেনাদলের সঙ্গে মিষ্টভাষিনী রূপাজীবা বারাঙ্গণা এবং ধনবান্ বণিকদিগকে পাঠান হউক। এই শ্রীরামচন্দ্র যখন গায় প'ড়ে আমাদের সঙ্গে বিবাদ বাধিয়ে আমাদের বংশ ধ্বংস ও গ্রাম নগর আগুন দিয়া ছারখার ক'রে দেশে ফিরে আসেন, সে সময় ভরত নগরবাসিগণকে তাহার অভ্যর্থনার আয়োজন করিতে বলেন। তিনি রাজ্যে ঘোষণা করিলেন—

"অভিনির্যাতু রামস্য দ্রষ্টুং শশিনিভং মুখম্।
সূতাঃ স্তুতি পুরাণজ্ঞাঃ সর্ব্বে বৈতালিকা তথা,
সর্ব্বে বাদিত্রকুশলা গণিকাশ্চৈব সর্ব্বশঃ।"

অর্থাৎ সূত, পুরাণপাঠক, কালোয়াত, বাদ্যকর এবং নিকাগণ শোভাযাত্রা ক'রে রামের অভ্যর্থনার জন্য বাহির বে।" গণিকা না হ'লে যে তোমাদের কোন শোভাত্রার শোভাই খোলে না! কি সুরুচি! এরই নাম ভ্যতা! কিন্তু অসভ্য রাক্ষস-সমাজে ধনিকা গণিকার মন উচ্চস্থান কদাপি ছিল না। আমার দাদা স্বর্গরাজ্য য় ক'রে বহু রমণীর ভর্ত্তা হ'য়েছিলেন বটে, কিন্তু যুদ্ধ ক'রে য়ে কে'ড়ে নিয়ে বিয়ে করা তোমাদের সমাজেও নিতান্ত প্রচলিত ছিল না। মহর্ষি মনুর ব্যবস্থিত রাক্ষস, পশাচাদি বিবাহ কিরূপ? রাজা দশরথ যে সাড়েসাতশ মণীকে ভোগের উপকরণ করে অন্তঃপুরে পু'রেছিলেন, টাই বা কোন সন্নীতি? স্থূলকথা, কর্ত্তাদের অধোবাতেও ন্ধ নাই, আমাদের উদ্গারও দুর্গন্ধভরা। আমার দাদা ন্দ্ররাজ্য স্বর্গ লুণ্ঠন ক'রে তাদিগকে দাস্যে নিযুক্ত ক'রেছেন, তরাং তিনি দস্যু। আর তোমরা দিগ্বিজয় ক'রে ক্ষুদ্র াজ্যগুলির স্বাধীনতা ধ্বংস করেছ, তাদের উন্নতির জন্য, রিত্রাণের নিমিত্ত! এরূপ এককার্য্যে পৃথক ফলের ব্যবস্থাটা তামাদের নীতিশাস্ত্রেই দেখা যায়!

বলি তোমাদের সভ্যতার মাপ কাঠিটা কি? বড় বড় ালান কোঠা, ধন রত্ন, তৈজসপত্র, সাজ গোজ ইত্যাদির াহ্যাড়ম্বরই যদি সভ্যতার পরিচায়ক হয়, তবে আমরাই । তোমাদের চেয়ে কম কিসে? হনুমানের মুখেই প্রকাশ য়, সে যখন সীতা অন্বেষণ করবার জন্য আমাদের বাড়ীতে কে ছিল তখন সে আমাদের প্রাসাদের "রত্নভূষিত স্ফটিক য়নাসন, দান্ত কাঞ্চন চিত্রাঙ্গ বৈদূর্য্যমণি নির্ম্মিত খাটের ায়া, দিব্য মাল্যোপশোভিত পাণ্ডুর ছত্র, পরমাস্তরণাীর্ণ সুশোভন শয্যা, গন্ধাশ্বরণসঙ্কুলা মন্দুরাদি, মণিখচিত পানাত্রাদি, লতাগৃহাণি চিত্রাণি চিত্রশালা গৃহাণিচ, ক্রীড়াৃহাণি চান্যানি দারুপর্ব্বতকানি চ; নূপুরাণাঞ্চ ঘোষেণ াঞ্চীনাং নিস্বনেন চ, মৃদঙ্গতান নির্ঘোষৈ র্ঘোষদ্ভি র্নিনাদিতম, প্রাসাদং সঙ্ঘাত যুতং, স্ত্রীরত্নশতসঙ্কুলম্ হ্ব্যূঢ়কক্ষং, কৃতাশ্চ বৈদূর্য্যময়া বিহঙ্গাঃ, চিত্রাশ্চ নানা বসুভিভূর্ অঙ্গ; সপ্ততলপ্রাসাদ, ষড়্ রসযুক্তা ঘৃত-কুঙ্কুম-বাসিত সুনিপুণ পাচকপক্ক চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় নানাবিধ খাদ্য,' ানালঙ্কারভূষিতা সুবক্ত্রা রক্ষকামিনী, মারুততুল্যগামী কনকদণ্ডশোভিত ব্যোমরথ ইত্যাদি (সুন্দর কাণ্ড ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ সর্গ)—অদ্ভুত দৃশ্য দেখে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। বল বীর্য্য পরাক্রমের কথাটা আর নাই বা বললাম। যদি সেই ঘরের ঢেঁকি কুমীর বিভীষণকে নিয়ে লক্ষ্মণ চোরের মত দাদাকে অপ্রস্তুত ভাবে হত্যা না কর ত তবে ভালরূপেই সে পরিচয়টা পেতে। তোমরা চোরা-বাণে গুপ্তহত্যা করবে, আগুন দিয়ে শত্রুপুরীর বালকবালিকা অবলা স্ত্রীলোকদিগকে পুড়ে মারবে, বারাঙ্গনা বারুণী নিয়ে উৎসব জমাবে, তাতে কোন দোষ নাই, যত দোষ আমার ঐ কার্য্যটীতে। তোমার অহল্যা তারা হলেন প্রাতঃস্মরণীয়া, আর ক্ষণেকের জন্য ভ্রষ্ট পথে গিয়ে আমার গেল নাক কাণ। একেই বলে "কারো ভাগ্যে পৌষমাস, কারো হয় সর্ব্বনাশ!"

এ পর্য্যন্ত বলিয়াই রমণী থমকিয়া দাঁড়াইল, হঠাৎ তাহার যেন ভাবান্তর হইয়া গেল। ক্রোধারক্ত নেত্রে আমার দিকে পূর্ব্ববৎ কটমট ভাবে চাহিয়া রহিল; পরে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিতে লাগিল—"এত আস্পর্দ্ধা! অবলার উপর এত জুলুম! ভাই, ভাইপো জ্ঞাতিগোষ্ঠী সব নির্ব্বংশ করেছ, প্রতিশোধ নেওয়ার উপায় নাই। যদি ভগবান থাকেন—তবে—তবে একদিন তোমাদের দশাও ঠিক আমাদের মত হবে! বিধর্ম্মী বিজেতার পদতলে তোমাদের দেবতা ব্রাহ্মণ লুণ্ঠিত হবে! দেবমন্দির চূর্ণীকৃত, নারীর সতীত্ব অবমানিত, ধর্ম্মশাস্ত্র ভস্মীভূত হবে! আবার ঐ বিজেতাদিগের মনঃকল্পিত ইতিহাসেই তোমরা ধর্ম্মজ্ঞান ও নীতিজ্ঞানহীন কাপুরুষ পশু নামে অভিহিত হবে!"

এই কথা বলিয়াই আবার সেই ভীষণ ভ্রূকুটি-কুটিল নয়নে তীব্র চাহনি চাহিয়া রমণী যেন বায়ুতে মিশিয়া গেল। রমণীমূর্ত্তি অন্তর্হিত হওয়ায় আমারও যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়িয়া গেল। কিন্তু হঠাৎ একি! সংক্ষুব্ধ সাগর কল্লোলবৎ এ কিসের শব্দ? শব্দটা যেন পশ্চিমদিক হইতে ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতেছে। ওঃ! কি ভীষণ ধূলিরাশি! পশ্চিমাকাশ অন্ধকার করিয়া ধূলিরাশি ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে! আমি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলাম, অমনি একটা প্রবল ঝাঁকুনিতে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখন দেখিলাম, আমি গৃহিণীর ভুজপাশে আবদ্ধ হ'য়ে নিজ শয্যার উপরেই কয়েদ হ'য়েছি! বাহিরে ভীষণ ঝটিকা উত্থিত হইয়াছে। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টিপাত, মুহুর্ম্মুহুঃ মেঘগর্জ্জন হইতেছে।

শ্রীনীলকণ্ঠ দে।

বিশ্বাস।

(গাথা)

বয়ষ পরে গুরু আসিয়া
কহিল—"আরে, এস, এ ধারে
ভাল তো ঘুটু ঘোষ ? সকল মঙ্গল ?
কেমন চাষবাস এবারে ?"

ঘোষজা পুলকিত তনুতে
চরণ ধুলা ল'য়ে মাথাতে
ঘসিয়া করে করে কহিল সবিনয়ে
"সকলি ভাল তব দয়াতে।"

"এবার তবে আর কিছুরি
ওজর করিও না বৃথা এ
ইষ্ট মন্ত্রটি ধারণ করি ফেল'
কি হবে মিছে কাল বীতায়ে ?

"বছরো আছে ভাল, উনিশে
অমৃত যোগ গেছে পড়িয়া
এদিন মেলা ভার ও-দিনে ভাবি তাই
ফেলি এ শুভ কাজ করিয়া।

"কি জানি কবে কার কি হয়!
পড়েছে দিন কাল এমনি
আজিকে দেখি যা'য় কালি সে নাহি, হায়,
স্বপন মনে হয় যেমনি!

"ঘোর এ কলি কি না ? সে হেতু
চারিটি পাদ পাপ পূর্ণ
নহিলে এ দেশের এ হেন দশা হয় ?
গেল এ রসাতলে তূর্ণ।

রুদ্ধ শ্বাসে ঘুটু শুনি এ
শঙ্কা গণে মনে—তাই তো
দেশটি রসাতলে যায় তো কোনখানে
সপরিবারে আমি যাইব!

নীরব দেখি গুরু ঘুটুরে
ভাবিল বুঝি কায হইল,
কহিল—"তবে তাই যোগাড় কর' গিয়ে,
উনিশে দিন ঠিক রহিল।"

ধরণী-নিবদ্ধ নয়নে
কহিল ঘুটুঘোষ—"প্রভু গো
ছোট যে ছেলে ক'টি! ইষ্ট মন্তর
নারি নিতে এবে কভু তো!

"পাগল হ'লে নাকি, বাবাজী ?
ছেলেরা ছোট তা'তে কি ক্ষতি ?
মন্ত্র বিনা যেরে শুদ্ধ নহে দেহ
গুরুরে পাওয়া সে তো নিয়তি।

"যা' কিছু কর কাজ সকলি
না হ'লে গুরু নয় সিদ্ধ,
তীর্থ দান ধ্যান দেবতা দ্বিজ পূজা
সবারি মূল গুরু, নিত্য।

"গুরু যে নরাকারে দেবতা
এ ভব-নদী-পার-তরণী!
চতুর্ব্বর্গের ফল তো হাতে হাতে
করিলে গুরু-সেবা অমনি।

"ভক্তি কর যদি গুরুরে
কিছুরি প্রয়োজন হবে না
তীর্থধর্ম্মের সবারি সার গুরু
ভবের ভয় আর রবে না!

"মাত্র একবার দিবসে
ইষ্টমন্ত্রটি স্মর' গে
মুক্তি তবে তব সাধ্য রোধে কেবা ?
যাবেও সশরীরে স্বরগে!"

অশ্রু দর দর নয়নে
ভক্তি পুলকের আবেশে
কণ্ঠ গদগদ কহিল দুটু—"প্রভু
ক্ষম' এ অবহেলা আদেশে !

"বছর দুই আরো না গেলে
নারিব ও আদেশ রাখিতে !
কেন তা' শোন বলি, আমারো কায সারা
তা' হলে হ'য়ে যায় বাড়ীতে !

"তখন ছেলে দু'টি তবু'ও
কাযের মত কিছু হইবে
পারিবে দু'পয়সা আনিতে ততদিনে
বধুও কায শিখি লইবে।

"রাজার সাথে এই মামলা
চুকিবে ততদিনে, সাড়াব'
ভিটে খানা, দু'খানা ঘরও তুলে দিব ;
বলদ'ও জোড়া দুই বাড়াব'।

"তা' হলে ছেলেদের রবে না
অন্ন বস্ত্রের দুঃখ
নহিলে ক'বে তারা চিরটাকাল ধরি—
'বাবাটা ছিল অতি মূর্খ'।'

"মা-হারা আহা তারা বাল্যে
পায়নি কোন সুখ জীবনে
এখন আমি যদি কিছু না দিয়ে যাই,
বাঁচিবে তবে তারা কেমনে ?

"আমিও জানি প্রভু সে কথা
মূর্খ হইলেও বুঝিতো
ইষ্টমন্ত্রটি জপিয়া একবার
গুরুরে যেমনিই পুজিব'—

"অমনি রথ নামি আসিবে
স্বর্গে যেতে হবে চড়িয়া
তাইতো আগে হ'তে রাখিয়া যেতে চাই
এসব ঠিক্‌ঠাক্ করিয়া।"

* * * *

উঠিল গুরুদেব শিহরি
দেখি এ বিশ্বাস অন্ধ,
আপন হীনতায় সরমে গেল মরি !
মন্ত্র একি নব-ছন্দ !

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমাদের দুর্গতি।

(জনৈকা প্রবীণা বঙ্গনারীর কথা।)

অধুনা অনেক শিক্ষিতা মহিলা পত্রিকাদিতে প্রবন্ধ, াব্য, গল্প ইত্যাদি লিখিয়া থাকেন। পুস্তক রচনাতেও ানেকে সিদ্ধহস্তা হইয়াছেন। তাঁহাদের লেখা শিক্ষিত মাজে যথেষ্ট আদৃত, এবং তাহার অধিকাংশই সুপাঠ্য াহাতে সন্দেহ নাই। আমিও নারী এবং প্রবীণা, লেখার ত কিছু লেখার শক্তি আমার নাই। তবে আজকাল ামাদের দারুণ দুর্গতি দেখিয়া গোটাদুই কথা বলিতে য়াস পাইতেছি। আশা করি প্রবীণার এই কঠোর কয়টি উচিত কথায় নবীনারা রাগিয়া কোঁদল বাধাইবেন না। তা এমন যদি বাধান ত বাধাইবেন। কোঁদলে প্রবীণার মুখের কাছে নবীনারা কি দাঁড়াইতে পারিবেন ?

বঙ্গের কৃতবিদ্য সন্তানগণ সকলেই প্রায় রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, এই সব লইয়া ব্যস্ত। গার্হস্থ্য নীতির বিষয় বড় একটা কেহ কিছু ভাবেন না, এবং সে বিষয়ের কোন আলোচনাও দেখিতে পাই না। হিন্দু গৃহস্থ-সংসারের সুখ সাচ্ছন্দ্য, নীতি ধর্ম্ম কাহার দোষে উৎসন্ন

যাইতে বসিয়াছে ? প্রীতিময়ী, ক্ষমাময়ী, স্নেহময়ী কল্যাণী, বঙ্গরমণীর পরিবর্ত্তে ঘরে ঘরে আজ কি দেখিতেছি ? সেই অন্নে তুষ্টা, শ্রমে অকাতরা, সেবায় নিপুণা, গৃহকর্ম্মে অদ্বিতীয়া, দুঃখে ধৈর্য্যশীলা, সুখে অপ্রমত্তা, গৃহের লক্ষ্মী, সর্ব্বজীবের জননীরূপিণী ভারত রমণীর নাম লোপ পাইতেছে। তাহা ক্রমশঃ পাঠ্য পুস্তকের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত দেখিতে পাইবে—তাহার স্থান আজ বিলাসিনী বঙ্গললনা অধিকার করিয়াছে। সে "দুঃখে দাসী, দীনা প্রেমিকা নীরবা নিঠুরা ভাবে," আর বড় একটা দেখা যায় না। যে বঙ্গরমণীর সহিষ্ণুতা ধরার সহিত তুলনা হইত, সে সহিষ্ণুতা বোধ করি বঙ্গললনাকে একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছে। পরিজনে অপ্রিয়ভাষিণী, সেবকের প্রতি খড়্গহস্তা, সন্তানের প্রতি মমতা হীনা গুরুজনে বীতশ্রদ্ধা, স্বামীর শাসনকর্ত্রী—মা বঙ্গবধূ, একি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে মা তোমার পরিবর্ত্তন আজ। যে লাজনম্রা, বিলাস-ব্যসন-বর্জ্জিতা ; স্নেহে বিগলিতা, আত্মসুখে বিমুখী, পরসুখান্বেষণে আত্মহারা, কমনীয়া রমণীয়া বঙ্গললনা ভারতের চিরগৌরব ছিল, তাহা কি পাপে, কাহার অভিশাপে বঙ্গ আজ হারাইতে বসিয়াছে! বঙ্গবধূ আর কিছুতেই সুখী হয় না, পরিজনকে সুখী করিতে পারে না। স্বামীকে সুখ শান্তি দিতে পারে না। ভারতসন্তান চিরদিনই দুঃখী। মা জগৎজননী, কৈলাসবাসিনী উমা, রাজার কন্যা হইয়া ভিখারীর ঘরণী হইয়াছিলেন। ইহাই ভারতের আদর্শ। দুঃখীর ঘরে দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিয়া সুখী হইতে কেবল ভারত ললনাই পারিত। রাজকন্যা সাবিত্রী, অল্পায়ু বনবাসী সত্যবানকে স্বেচ্ছায় পতিত্বে বরণ করিয়া, এক পতিভক্তির গুণে শেষে অতুল ঐশ্বর্য্য এবং স্বামীর জীবন লাভ করিয়াছিলেন। নবীনারা এ সব গ্রাহ্যই করেন না। অনেকে এই সকল সত্য ঘটনা বলিয়াও বিশ্বাস করেন না। এই যুদ্ধ বিপ্লবের দিনে, এই দেশব্যাপী মহামারী দুর্ম্মূল্যতার দিনে সহজেই লোকের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তদুপরি যদি গৃহে তিলেক শান্তি না থাকে, দুঃখে অর্জ্জিত শাকান্নে ধূলি মুষ্টি নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা হইলে প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি না করিয়া আর কি করিবে? যে সকল যুবক বা কিশোর, পিতা মাতার অপরিনামদর্শিতার ফলে, বাল্যে বিবাহিত হইয়াছে, সাবালক না হইতে বালকের পিতা হইয়াছে, অক্ষমতা হেতু বা অল্পবুদ্ধিনিবন্ধন বিদ্যাশিক্ষায় অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই, পরে সামান্য আয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইতেছে, তাহারাই ইহার বিষময় ফল আরও বেশী অনুভব করিতেছে। "আফিসে সাহেবের তাড়া, গৃহে গিন্নির মুখ নাড়া, থতমত খাই, মাথা চুলকাই—বুঝি মাঝখানে যাই মারা" তাহাদের অবস্থা এতই ভয়ানক দাঁড়াইয়াছে! পরিপাটি বসনভূষণ-বিলাস দ্রব্য, চাকর বামুন আবশ্যাতিরিক্ত যোগাইতে না পারিলে, বঙ্গবধূ আর হাসিয়া কথা কহে না। ধনবান্ স্বামী না হইলে, তাহারা স্বামীকে ভক্তির পাত্র, মুক্তির হেতু বলিয়া মনে করে না। স্বামী আরদালী বিশেষ, যখন যাহা হুকুম করা যাইবে, তখনই তাহা তামিল করিতে তিনি বাধ্য, নতুবা তাঁহার বিবাহ করার কি আবশ্যক ছিল? বাঙ্গালী কন্যার বালিকা বয়সে শিক্ষার দোষেই এমন দুর্গতি তাদের হইয়াছে। 'কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ—' এ কথা কয়টি পিতা মাতা মনে করেন? যাঁহাদের অর্থের সচ্ছলতা আছে, তাঁহারা উচ্চদরের বালিকাবিদ্যালয়ে কন্যাকে পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হ'ন, এবং মনে করেন আমার কন্যার চূড়ান্ত শিক্ষা হইতেছে। কিন্তু কন্যার চরিত্র গঠন, কি নীতি শিক্ষার বিষয় একবার ভাবিয়াও দেখেন না। কেহ কেহ বা নিজেরা কষ্ট স্বীকার করিয়াও কন্যাকে উত্তম বসনভূষণে সজ্জিতা করিয়া স্কুলে পাঠান ; সাংসারিক দুঃখ দারিদ্রতা তাহাদের জানিতেও দেন না। তাহারা ছোট বেলা হইতেই শিখিয়া রাখে তাহাদের যখন যাহা আবশ্যক তখনই তাহা পাওয়া চাই! পাছে অন্যের সহিত তুলনায় নিজেকে হীন হইতে হয়, এই জন্য সাধ্যাতীত বিলাস ব্যসন তারা অভ্যাস করেন। সেই বিলাসিতাও অস্থিমজ্জার সহিত মিশিয়া যায়। কালে তাহা দরিদ্রের সংসারে বিষময় ফল প্রসব করে। দরিদ্র বঙ্গ যুবক, সেই বিষ আকণ্ঠ পান করিয়া জর্জ্জরিত দেহে ভাবিতেছে, "বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।" তাই বলি, এত রাজনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি লইয়া যাঁহারা মাথা ঘামান, তাঁহারা গৃহে কিসে শান্তি আসে, সে গার্হস্থ্য নীতির কিছুই আলোচনা করেন না কেন? আজিকার সে ক্ষুদ্র বালিকাটি কালে বধূ, জননী ও গৃহিণী পদে উন্নীত হইবে ; তাহার ধর্ম্মজ্ঞান, নীতিশিক্ষা, চরিত্র গঠন, কষ্টসহিষ্ণুতা, স্বার্থত্যাগ, কতদূর

াবশ্যক কেহ ভাবিয়াও দেখেন না কেন। একটি কন্যার চাব চরিত্রের উপর এক একটি সংসারের সুখ শান্তি র্ভর করে। সেই কন্যাকে কতদূর কিরূপ শিক্ষায় ক্ষিত করিলে, তবে সকলকে সুখী করিতে পারিবে, জে সুখী হইবে, ইহা কেহ চিন্তাও করেন না। এখনও একেবারে সুৎস্বভাবা, স্বাধ্বী, স্নেহময়ী, গুণবতী, রমণী নাই, একথা বলা চলে না। যে সংসারে মন রমণী একটীও আছেন, সেই সংসার সেই একের গুণেই জ্বল, মধুময়, শান্তির আধার হইয়া আছে। তেমন সংসার খিলে চক্ষু জুড়ায়। কিন্তু অধুনা যে সকল অল্পশিক্ষিতা ীনা অধিক মাত্রায় দেখিতে পাইতেছি, তাঁহাদের দেখিয়া ও বঙ্গযুবকের দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া, তাঁহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, আজ এই গোটাকত কথা বলিলাম। আপনারা হিন্দুবালিকার সুশিক্ষাপদ্ধতি প্রচলন করুন। ঘরে ঘরে আবার সেজুঁতি, পুণ্যিপুকুর প্রতিষ্ঠিত করুন। বালিকার মনে ধর্ম্মভাব প্রবর্ত্তিত করুন, তবেই যদি দেশে আবার সুখশান্তি ফিরিয়া আসে। ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া বা সম্প্রদায় বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া কোনও কথা আমি বলি নাই। যে সকল গুণবতী স্বাধ্বী সতী আজও বঙ্গের ঘরে বিরাজমানা আছেন, তাঁহারা সকলেই আমার নমস্যা। তাঁহাদের গুণে আজও হিন্দুগৃহস্থ বজায় আছে। তাঁহারা যেন কেহ কিছু মনে না করেন।

জনৈকা প্রাচীনা।

পল্লীছাড়া।

জল ফুলের গন্ধে মধুর গ্রাম্যপথের শীতল ছায়,
াতার ফাকের মধ্য দিয়া তরুণ রবির দীপ্তি ভায়,
'রি মাঝে পথের 'পরে হরষ ভয়ে কে চলে যায়?
যে চির বিদেশবাসী গ্রাম সে কভু দেখেনি হায়!

রকালের গৃহহারা পল্লীছাড়া জন্ম হতে;
াবাল্য সে গল্প শুনে ছবি এঁকেছে কল্পনাতে।
ট হ'লে পল্লীপানে ধায় যবে সব শতে শতে,
ক ফেটে তা'র কান্না আসে অশ্রু চাপে কোন মতে।

টুটল আজি ধৈর্য্য তাহার মন যে টানে গ্রামের গাছে,
গৃহ তাহার নাই বা থাকুক গ্রামখানিত আছেই আছে।
হেথায় সবার অচেনা সে তবু কে তায় ডাক্‌ছে কাছে,
জানবার তা'র নাই প্রয়োজন ছুটল সে আজ ডাকের পাছে।

গ্রামের দিকে চাইতে গিয়ে অপার হরষ জাগলি মনে,
মিলিয়ে সকল দেখল আজি কল্পিত তা'র চিত্র সনে।
আবেশ মাখা আনন্দেতে ঝরল আসার নয়ন-কোণে,
অবাক যে আজ মর্ত্ত্যবাসী স্বর্গ-সুধার আস্বাদনে!

শ্রীব্রহ্মানন্দ সেনগুপ্ত।

শুভ-দৃষ্টি।

(গল্প)

'জীবনে বিবাহ করিব না' বলিয়া যিনি সকলের সম্মুখে কটা ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিলেন সেই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ চরণচন্দ্রকে ছয় মাসের মধ্যেই দারপরিগ্রহ করিতে দেখিয়া ামরা বাস্তবিকই বড় বিস্মিত হইয়াছিলাম। তিনি বহুদিন হইতেই আমাদিগকে ছাড়িয়া বিদেশে চাকুরী করিতেছেন; শুভ-বিবাহ ব্যাপারটাও সেখানেই ঘটিয়াছে। সুতরাং আমাদের নিমন্ত্রণটাও বাকী পড়িয়া গিয়াছিল। এখন সকলেই তামাদির মধ্যে যাওয়ার গতিক, এমন সময় আমাদের

বন্ধুটি সস্ত্রীক বাড়ী আসিয়া আমাদিগকে অভয় দিলেন 'নিমন্ত্রণ ফাঁকে যাইবে না।' আমরা আশ্বস্ত হইলাম। বন্ধু ও বন্ধু-পত্নীর অনুগ্রহে অচিরেই আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল।

দুর্মুখেরা বলে যে কিরণচন্দ্র তাহাদের পাশের বাড়ীর ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা চারুর "লভে" পড়িয়াছিল এবং সেজন্য তার বাবা তাকে ভাল রকম শাসাইয়া দেওয়াতেই সে নাকি চিরকুমার থাকিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। কথাটা কতদূর সত্য জানিনা, তবে সে যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছে তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। দণ্ডবিধি আইনের ১৪৭ ধারায় না হউক, অন্য কোন ধারায় এই অপরাধের জন্য অভিযুক্ত হইতে পারে কিনা, তাহা বোধ হয় উকিলবাবুরা সহজেই বলিতে পারিবেন। নিমন্ত্রণের পর আমরা সকলে মিলিয়া কিরণকে তার বিবাহের একটা বিবরণ বলিতে ধরিয়া বসিলাম। এতগুলি লোকের অনুরোধ কি সহজে সে কেহ এড়াইতে পারে ?

"তোরা তবে ছাড়ছিস্‌না—বিয়ের কাহিনীটা শুন্‌বিই—আচ্ছা তবে বলি।" কিরণ বলিতে আরম্ভ করিল,—"তোরা জানিস্ বিয়ে কোর্‌বনা বলেই ইচ্ছা ছিল, তবে বাবার পীড়াপীড়ি ও মা'র কান্নাকাটিতে শেষে মত দিতেই হইল। হরিরামপুরের জমিদারের একমাত্র মেয়ের সাথে বাবা আমার সম্বন্ধ ঠিক করে ফেল্লেন,—মনে মনে আশা, ছেলে একটা বিরাট জমিদারীর মালিক শেষে হতে পারবে। অধিবাসের আগের দিন চার নৌকা লোক বোঝাই করে এতগুলি বরযাত্রী, মেয়ের বাপকে জব্দ কর্‌তে চল্লাম। আমাদের নৌকা যখন হরিরামপুরের ঘাটের কাছে এসে পৌছেছে, তখন অদূরে হৃদয়ভেদী ক্রন্দনের রোল শোনা গেল। তারপর একটি লোকের নিকট সমস্ত বিবরণ শুনে ত আমাদের চক্ষুস্থির! এ যে বিনামেঘে বজ্রপাতের চেয়েও বেশী—এ যেন 'নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা রে দূত!' শুনলাম জমিদারের একমাত্র মেয়ে, আমার ভাবী পত্নী, তার পূর্ব্বদিন (অর্থাৎ যে দিন আমরা শুভযাত্রা করে বের হয়েছিলাম) কলেরায় মারা গেছে। নৌকা ফিরিয়ে তখনই আবার বাড়ীর দিকেই রওনা হওয়া গেল। বিয়ে কর্‌তে এসে বিফলমনোরথ হয়ে বৌ না নিয়ে বাড়ী ফিরে যাওয়ার মত লজ্জার কথা আর আছে বলে আমার মনে হয় না। সত্যি কথা বল্‌তে কি, বাড়ীতে যে আমি সকলেরই হাসির পাত্র হব তা ভেবে আমি বড়ই ভীত হয়ে পড়েছিলাম। হায়, এতগুলো বরযাত্রী মেয়ের বাপকে জব্দ কর্‌তে এসে আজ নিজেরাই জব্দ হয়ে গেলেন।

আমাদের নৌকা সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে রামনগর এসে পৌছল। মাঝিরা ডাকাতের ভয়ে রাত্রিতে নৌকা চালাতে সাহস পায়না বলে, অগত্যা এক রাত্রির জন্য এখানেই নৌকা রাখ্‌তে হবে স্থির হল। পূর্ব্বে এই রামনগর হতে আমার একটি সম্বন্ধ এসেছিল এবং যতগুলি মেয়ের ফটো পেয়েছিলাম, তার ভিতর এটিই বোধ হয় সকলের চেয়ে সুন্দরী ছিল। এখানে এসে শুন্‌লাম সেই মেয়েটির নাকি আজ বিয়ে! বিয়েটি দেখবার খুবই ইচ্ছে হল, কিন্তু বিনা নিমন্ত্রণে আর কি করে পরের বাড়ী যাওয়া যায় বল না ? কিছুক্ষণ পরেই সে আশা পূর্ণ হওয়ার সুযোগ ঘট্‌ল। মেয়ের পিতা পরেশবাবু নিজেই এসে আমাদের সবাইকে বিয়ে দেখ্‌বার জন্যে বিশেষভাবে বলে গেলেন। বাবার সঙ্গে তার খুব পরিচয় ছিল। বিয়েটাও হ'ত, তবে বাবা এত বড় জমিদারীর লোভটা ছাড়্‌তে পাল্লেন না।

* * * *

উজ্জ্বল দীপমালায় বিবাহ সভাটি বেশ শোভা পাচ্ছিল। প্রীতি-উপহারগুলো কবি অকবি সবাইকে দেওয়া হয়ে গেছে এবং বরও তখন পিঁড়িতে এসে বসেছেন, এমন সময় যৌতুকের কথা নিয়ে ছেলের মামা ও পরেশবাবুর ভিতরে খুব গোলমাল বেঁধে গেল। কিছুক্ষণ খুব ঝগড়াঝাঁটির পর ছেলের মামা বল্লে,—"উঠে আয় গৌর, ওঠে আয়! এমন ইতরের সঙ্গে আমরা কাজ করি না।"

আমি আর স্থির থাকতে পার্‌লুম না; খুব তীব্রস্বরে বল্লাম, "তোমাদের মত নরাধমের হাতে যে মেয়ে সঁপে দেয়, তাকেও আমি পাষণ্ড বলি।" তারা কোন কথায় কর্ণপাত না করে, গালি দিতে দিতে বিবাহ সভা ত্যাগ করে চলে গেল।

তখনকার সে দৃশ্যটা একবার ভেবে দেখ,—কি নিদারুণ! পরেশবাবু এসে আমার বাবার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বল্লেন,—আমায় এ অপমানের হাত হতে বাঁচাও ভাই।"

আমি বাবার দিকে চাইতেই, তিনি বলে উঠ্লেন,—বেশ আমার ছেলের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেও।"

সকলের জয়ধ্বনির মধ্যে আমাদের শুভদৃষ্টি হয়ে গেল।

কিরণের কথা শেষ হইলে আমাদের দলের মধ্য হইতে শীল বলিয়া উঠিল, বাহাবা, কিরণ—বাহাবা! এযে খছি ঠিক একখানা উপন্যাসের প্লট। আচ্ছা ভাই, প্রীতি-উপহারগুলোর কি হল?"

কিরণ হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল,—ভাই সেগুলো নিয়েও ভারী মজা হয়েছিল। ওই যে জায়গায় "গৌর ভাই গাঙ্গুলীর সহিত শ্রীমতী সুরমাবালার শুভবিবাহের প্রীতি-উপহার—"লেখা ছিল, সেখানে তাড়াতাড়ি গৌর-ভাই গাঙ্গুলী কেটে এই কিরণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামটা বসিয়ে দেওয়া হল। তোমরা ভেব না যে আমার বিয়েতে প্রীতি-উপহার বাদ গেছে।"

ক্ষীরোদবিহারী (দুর্মুখেরা যাহাকে বউপাগ্লা বা ওই রকম কিছু বলে থাকে) আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,—আমি প্রস্তাব করি, এমন সরস কাহিনীটা কোন এক মাসিকের পূজার সংখ্যায় ছাপাইবার জন্য প্রেরিত হউক!" সকলের সোল্লাস কোলাহলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হইল।

ক্ষীরোদ কহিল, "আর কিরণ, আমরা কামনা করি, তোমাদের দাম্পত্য জীবন সুখ ও শান্তিময় হউক! হবে না কেন, কবিই বলেছেন,—" ইহা বলিয়া ক্ষীরোদ গাহিল,—

"বিয়েটা মন্দ নয় ত দিনগুলো যায় বেড়ে মজায়।
বিয়ে ছাড়া জীবন যেন মেসের বামুন রেঁধে খাওয়ায়।"

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

মা।

চরণ অলক্ত রাগ রাখিয়া পশ্চিমে
তুমি ত ডুবিয়া গেলে অনন্ত অসীমে;
আমার গগন ভরি কি ঘোর আঁধার!
ঘনাইল, মনে কি মা রহিল তোমার?
ফুরাইল মধুপান, ঝরে গেল ফুল
সংসার-স্বপন মোহে করিল ব্যাকুল,
বাসনার তারাগুলি হ'ল সমুজ্জ্বল,
অনিত্য আনন্দ মদে করিল বিহ্বল।

তার পরে একি চিন্তা, একি আত্মগ্লানি;
ভেঙ্গে গেল স্বপনের স্বর্ণবীণাখানি।
কবে গো ফুটিবে ঊষা, আছি পথ চাহি,
ঢালিবে জীবন ধারা,—জীর্ণ তরী বাহি
যাব চলি' প্রেমোজ্জ্বল আলোক পাথার;
নিরখিব, পরশিব চরণ তোমার।

শ্রীক্ষেত্রমোহন সেন।

বন্দীর কথা।

আন্দামানের যেখানে লর্ডমেয়ো নিহত হইয়াছিলেন আমরা সেই হোপটাউনের সমুদ্রকূলে একখানা বড় পাথরের উপর বসিয়া সূর্য্যাস্ত দেখিতেছিলাম। পশ্চিম সমুদ্রে নীল জলের মধ্যে অস্তাচলগামী সূর্য্য ডুবিতেছিল, কূলে লর্ডমেয়োর স্মৃতিফলক জলমগ্ন পাথরের উপর ঢেউয়ের সাথে একবার ডুবিয়া আবার ভাসিতেছিল। আমরা দুইজন রাজনৈতিক বন্দী। মেয়োর স্মৃতিফলকের সহিত সূর্য্যাস্তের তুলনা করিয়া নানাবিধ দার্শনিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, এমন

সময় একটি দীর্ঘনিশ্বাসের প্রবাহ আমাদের চিন্তাস্রোতের উপর আসিয়া পড়িল। দেখিলাম, আমাদের কাছে আর আর যে সব নির্ব্বাসিত বসিয়াছিল, তাহারা একদৃষ্টে 'রসের' চলমান ষ্টিমারের পানে চাহিয়া রহিয়াছে। 'রস' পোর্টব্লেয়ারের (রাজধানী) প্রধান স্থান। এখান হইতেই প্রতি চল্লিশ দিনে একখানা ষ্টিমার মুক্তযাত্রী লইয়া কলিকাতায় যায়। আজ শনিবার জাহাজ ছাড়িবার দিন বলিয়া অনেকেই সকাল করিয়া কাজ সারিয়া সমুদ্রকূলে আসিয়াছে। 'জাহাজ' ছাড়িবার সময় হইয়াছে, যাহারা নির্ব্বাসন কাল ভোগ করিয়া দেশে যাইবে, তাহারা জাহাজে স্থান লইতে আরম্ভ করিয়াছে। ঐ জাহাজ পূর্ণ হইয়া গেল! ঐ যে জাহাজ দেখিতে দেখিতে হেলিতে দুলিতে নঙ্গর তুলিয়া ভাসিয়া চলিল! বন্দীরা কূলে বসিয়া একদৃষ্টে জাহাজের দিকে তাকাইয়া ছিল। জাহাজ অনেক দূরে চলিয়া গেল যখন আর কিছুই দেখা গেলনা তখন ব্যথিত হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে একটা দীর্ঘ নিশ্বাসের প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া গেল! অনেকে চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া আপন আপন কাজে নিযুক্ত হইল। রহিলাম আমরা দুই বন্ধু, আর বৃদ্ধ নিতাই মণ্ডল।

নিতাই অনেকদিনের লোক। তাহার চুল পাকিয়াছে, দাঁত পড়িয়াছে, কঠোর কর্ম্মে ও কালের ধর্ম্মে শরীর ভাঙ্গিয়াছে। কত যুগ যুগান্তের কাহিনী তাহার কুঞ্চিত ললাটে অঙ্কিত হইয়াছে! নির্ব্বাসিতদের মধ্যে এমন সরল সহৃদয় ও চরিত্রবান্ বড়ই বিরল বলিয়া আমরা তাহাকে একটু শ্রদ্ধার চক্ষে, প্রীতির ভাবে দেখিতাম। বিশেষ মৃত্যুপর্য্যন্ত নিতাইয়ের মুক্তি নাই শুনিয়া স্বভাবতই তাহার জন্য বড় কষ্ট হইত। সত্য কথা নিতাইকে আমি ভাল বাসিতাম। সে বৃদ্ধ হইয়াছে, তাহার আহারের জন্য যেখানে যা কিছু ভাল জিনিষ পাইতাম, তাহার একটু না একটু লইয়া আসিতাম। প্রথম প্রথম সে কিছুই লইতে চাহিত না, বলিত, "আপনারা ভদ্রসন্তান, আপনাদের ভাল খাওয়া পরা অভ্যাস, ওসব আপনারাই রাখুন; আমরা চাষা, কষ্ট সহ্যকরা আমাদের অভ্যাস আছে।" আমরা তাহার সে সব কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম। নিতাই সর্ব্বদাই 'হাসি তামাসা' ভাল বাসিত। তাহাকে দেখিলে মনে হইত নির্ব্বাসনের কষ্ট যেন একটুও তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। শুধু যেদিন কলিকাতার জন্য রস্ হইতে ষ্টীমার ছাড়িত, সেইদিন তাহার মুখের উপর একটা বিষাদের কালো ছায়া আসিয়া পড়িত। সে—সে রাত্রে কিছুই খাইত না। নিতাই আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া এই কঠোর ব্রত পালন করিয়া আসিতেছে। উঃ কি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হৃদয়!

রাজনীতিক বন্দীদের জন্য আন্দামানের কর্ত্তৃপক্ষ সে সময় একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া অনেকের ধারণা ছিল। কারণ প্রচলিত আইন মতে রাখিতে গেলে, অনেক অসুবিধা ঘটিত, আবার না রাখিলেও চারিদিকে হৈ চৈ পড়িত, বন্দীরা নূতন নিয়মে অসুবিধা দেখিলে একযোগে কার্য্য ত্যাগ করিত,—কোন শাস্তিকে শাস্তি বলিয়া গ্রাহ্য করিত না। এই উভয়-সঙ্কট সময়ে কর্ত্তৃপক্ষ কতকগুলি বিষয়ে আমাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। আমরা দুইজন একত্র থাকিতে পারিতাম না।

আমি একা হোপ্‌টাউনে থাকিতাম। বন্ধুটি সেদিন অন্যত্র যাইতে ঘটনাচক্রে এক রাত্রের জন্য আমাদের ষ্টেশনে আসিয়াছিল। অনেক দিনের পর সেই দূর দ্বীপান্তরে বন্ধুর সহিত দেখা! ওঃ সে কি আনন্দ! তেমন আনন্দ কোন দিগ্বিজয়ী সম্রাটের ভাগ্যেও ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না! সে আজ কত দিনের কথা, তবু তার মিলনস্মৃতি যেন জীবনের সমস্ত দুঃখদৈন্যকে ছাপাইয়া অক্ষয় আনন্দের রথে কোন অজানা দেশে লইয়া যায়!

বন্ধুকে নিতাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিলাম। নিতাইয়ের সমস্ত ইতিহাস জানিতাম না। সে দুঃখের কথা বলিয়া আমি কোনদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই। বন্ধু নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিল "মেয়ো সাহেবকে মারবার পর থেকে ত যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর কুড়ি হইতে পঁচিশ বছর হিসাবে ধরা হয়, তবে চল্লিশ বছর হয়ে গেল, তবু এরা তোমায় ছাড়ে নি কেন?"

নিতাইয়ের মুখ হঠাৎ কালো হইয়া গেল। বুঝিলাম কথাটায় তাহার আঘাত লাগিয়াছে। বন্ধুও তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল "নিতাই, না বুঝে তোমার মনে কষ্ট দিতেছি, মাপ্ কর।" নিতাই জিভ্ কাটিয়া বলিল, "সে কি বাবু, আমি আপনাদের গোলাম।" বন্ধু তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "গোলাম নয় নিতাই, তুমি আমাদের ভাই, তুমি আমাদের বন্ধু।"

নিতাই তাহার পূর্ব্বকাহিনী বলিতে লাগিল,—"সে আজ চল্লিশ বছরের কথা বাবু. একদিন সকাল বেলায় ঐ যে জাহাজ চলে গেল,—অমনি একখানা জাহাজে কালাপানীতে আসি। তখন আমার বয়স ছিল কুড়ি বছর, গায়ে ছিল অসুরের মত জোর, মানুষকে মানুষ বলেই গ্রাহ্য কর্ত্তাম না। ...ঠিতে হোক্-লাঠিতে হোক্ আড়ঙ্গে আমাকেই কলস ...তে হ'ত। একবার আমাদের গাঁয়ের কিছু দূরে এক মুসলমানের গাঁয়ে কলস নিয়ে গোলমাল বাধে। খেলায় জিতেছিলাম আমি, কিন্তু তারা জোর করে কলস তাদের একজন মুশলমানকে দিলে আমি কলস কাড়িয়া নি। তাতেই মারামারি বাধে। তারা অনেক লোক তবু আমি তাদের ...ম জখম' করতে ক'রতে কলস নিয়ে ছুটে পার হবার জন্য খেয়াঘাটে যেয়ে দেখি খেয়া ওপার। চল্লিশ পঞ্চাশ জন মুশলমান ঢাল সড়কি নিয়ে ছুটে মারতে এলে বেগতিক দেখে গাঙে ঝাপ দিয়াছিলাম। অনেক পরিশ্রম হয়েছিল বলে সাতরাতে বড়ই কষ্ট হচ্ছিল। একবার বুঝি ডুবে যাবার মতন হয়েছিলাম এমন সময় আমাদের গাঁয়ের হরিখুড়ো নৌকা করে সেইখান দিয়ে যেতে আমাকে নৌকায় তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন।" .

"আমি সেই ঘটনার চার বছর আগে পাশের গাঁয়ে বিয়ে করেছিলাম। যাকে বিয়ে করেছিলাম তার যা ছিল চেহারা—সে আর কি ব'লবো বাবু।"

নিতাই একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিল—"কিন্তু এই চেহারাই তার আমার আরো কয়জনের সর্ব্বনাশ করে দিয়েছে। গ্রামের তশীলদার ছিল বড়ই দুর্দ্দান্ত। আমার বউয়ের উপর পড়ে গেল তার বদনজর। আদুরী ছিল সতী লক্ষ্মী। সে প্রথমে আমাকে কিছুই বলেনি. ভেবেছিল, আমি গোঁয়ার মানুষ শুনলে হয় ত কি না কি করে বসি।"

"একদিন সন্ধ্যার সময় হরিখুড়ো আধমরা হয়ে আমাদের বাড়ীতে এসে কেঁদে উঠ্‌লো। শুনলাম কাল থেকে তার বালবছরের বিধবা মেয়ে লক্ষ্মীকে পাওয়া যাচ্ছে না। জাত যায় বলে খুড়ো নিজেই মেয়ের খোজে তশীলদারের কাছারীতে গিয়েছিল। তশীলদার আগে লক্ষ্মীকে হাত ক'রবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিল, খুড়ো তা জানতো। এবারেও তশীলদারের হাত আছে ভেবে খুড়ো তাকে লক্ষ্মীর কথা জিজ্ঞাসা করলে। এক দুই কথায় তশীলদার রেগে উঠে কাছারীর পাইক পেয়াদাকে ডাক দিয়ে খুড়োকে মারতে আরম্ভ করে। সারাদিন বন্ধ করে রাখে, শেষে একশো জুতো মেরে ছেড়ে দিতে হুকুম দেয়। পেয়াদারা নাগারা জুতোর পঞ্চাশ ঘাতেই খুড়ো মরবার মতন হয়ে পড়লেন, তারা টেনে এনে জঙ্গলের কাছে ফেলে দিয়ে গেল।"

বন্ধু এই ভীষণ অত্যাচারের কথা শুনিয়া শিহরিয়া বলিল, "দেশে কি আর লোক ছিল না ?"

নিতাই বলিল, "কে আর পরের জন্য বিবাদ ফ্যাসাদে ঘাড় দেয় ? বিশেষ তশীলদার হ'ল গ্রামের হর্ত্তা কর্ত্তা। হরিখুড়ো সন্ধ্যার সময় প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় আমাদের বাড়ীতে আসে। আমরা সারারাত্রি তার সেবা করি, কিন্তু ভোর হতে না হতেই খুড়ো আমাদের ত্যাগ করে চলে গেল! আমি মোড়লদের ডাক দিয়ে সব কথা বললে, তারা তেলে বেগুণে জ্বলে উঠে মার মার করে কাছারীর দিকে ছুটলো। আমিও তাদের সাথে ছুট্‌লাম। তশীলদার খবর পেয়ে আগেই সরে পড়েছিল। আমরা তার খোঁজ না পেয়ে গায়ের জ্বালা গায়ে রেখে ফিরে এলাম। তার দুইদিন পরে গ্রামে দারোগা এসে আমাদের আশিজনকে একেবারে বেঁধে থানায় চালান দিল। কাছারীলুট আর তশীলদারকে মারতে যাওয়ার জন্য মোকর্দ্দমা আরম্ভ হ'ল। জমিদার ভিতরের খবর জানতেন না। বিদ্রোহী প্রজা শাসনের জন্য অকাতরে টাকা ছড়াতে লাগ্‌লেন। সাক্ষীর অভাব হ'ল না। মোকদ্দমায় আমাদের পঞ্চাশ জনের শাস্তি হয়ে গেল। আমার হল এক বছর।"

"সে এক বছর যে কি করে কাটিয়েছি তা কি বলবো! এই চল্লিশ বছর যেন সেই এক বছরের একদিনও নয়। জেলে কত দুঃখ সহ্য করতে হয় তা আপনারা অবশ্যি নিজেরাই ঠেকে শিখেছেন। সেই কষ্ট সহ্য করে এক বছরে দেড়মাস 'মাপ' নিয়ে সাড়ে দশ মাসে খালাস হয়ে বাড়ী গিয়েছিলাম। যে পথ-খরচ জেল হতে পেয়েছিলাম, তাতে কোন মতে একবেলা আধপেটা খেয়ে হেঁটেই রাত্রিতে বাড়ীতে পৌছিলাম। কেমন লজ্জা করতে লাগ্‌লো বলে আঁধারে আঁধারে চুপ করে ঘরের দরজায় উঠ্‌লাম। উঠেই শুনি আদুরীর গলা। বুঝ্‌লাম তশীলদার তার গলা চেপে ধরে জোর কচ্ছে। হঠাৎ মাথা ঘুরে উঠ্‌লো। হাতের মাথায় একখানা কুড়ালি ছিল, তাই নিয়ে ছুট্‌লাম!

দরোজার কাছে ছিল আর এক পাহারাদার, সে আমায় দেখে ভয়ে "বাপ্ রে" বলে দৌড় দিল আমি ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লাম। কি যে ক'রলাম তা তখন হুস ছিল না। যখন হুঁস হ'ল তখন দেখলাম—তশীলদারের কাজ সারা হয়ে গেছে।"

"আদুরী আমার পায়ে পড়ে কেঁদে বল্লে, যা হবার তা হ'য়ে গেছে তুমি পালাও। তুমি যে এয়েছ তা কেউ জানবে না।"

আমি বল্লাম, "সে কি! আমি পালালে তোর গতি কি হবে?" আমি সারারাত সেখানেই বসে রইলাম। সকাল হলে থানায় গিয়ে সব কথা স্বীকার ক'রলাম। থানার লোকে আমায় তখন বেঁধে জেলে পাঠিয়ে দিল। মোকদ্দমায় আমার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়ে গেল।"

আমরা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। মুখে কোন কথা আসিল না। শেষে বন্ধু বলিল, "নিতাই এ ত কোন খারাপ মোকদ্দমা নয়, এতে তোমার মুক্তি হচ্ছে না কেন? এতে ত কুড়ি বছরের বেশী কালাপানীতে রাখা যায় না?" নিতাই হাসিয়া বলিল, "সে আর এক—'তামাসা' বাবু।" আমরা তার এই ভীষণ তামাসার কথা শুনিবার জন্য আবার তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। নিতাই বলিল,—

"দশবছরের পর সরকারের হাত থেকে ছুটি নিয়ে যখন নিজের কাজ নিজে করবো বলে—হুকুম পেয়ে ঘর বাঁধতে লাগ্লাম, তখন অনেকে আমায় বিয়ে করতে বলেছিল। আদুরীকে ভুলতে পারিনি বলে বিয়ে কর্তে স্বীকার হলেম না। একজন পরামর্শ দিল সরকারের কাছে পরিবার আনাবার জন্য দরখাস্ত কর, সরকার নিজব্যয়ে পরিবারকে এখানে এনে দেবে।" কথাটা মন্দ লাগল না। অনেকে ত দেশ থেকে পরিবার এনে সুখে স্বচ্ছন্দে এখানে বাস কচ্ছে। আমিও দরখাস্ত করে ঘর দুয়ার সারাবার ব্যবস্থা করতে লাগলাম। আদুরীর যাতে কোন অসুবিধা না হয়, তার জন্য সব বন্দোবস্ত করে প্রত্যেকবার জাহাজ আসবার দিনে 'রসে' উপস্থিত থাকতাম, কিন্তু ছয়মাসের মধ্যে কোন খবর কেউ দিল না। একদিন একখানা নূতন রান্নাঘর বেঁধে ঘিরে রাখছি এমন সময় সরকার হ'তে পরোয়ানা পেলাম—আদুরীর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই, বাড়ী আগুণে পুড়ে গেছে। শুনে আমার ইচ্ছা হল এখানে যে ঘর বেঁধেছি তা আগুণ দিয়ে জ্বালায়ে দি। ঘরের কাছে অনেকের ঘর ছিল বলে তা' করি নি।

"একদিন জঙ্গলে কিছু মাছ মারতে যাই। হঠাৎ ঝরনার কূলে জারাওয়ালাদের (এখানকার আদিম অধিবাসীর এক প্রধান শাখা) সাথে দেখা হ'ল। তারা দেখেই তীর দিয়ে আমাকে মারতে উঠলো। আমি হাত জোড় করে ভগবানের কাছে শেষ প্রার্থনা জানাতে লাগ্লাম। তীর বুকে বিঁধবার দেরী দেখে চেয়ে দেখি তাদের মধ্যে একজন আমাকে মারতে নিষেধ ক'রে বুঝি ধরে নিতে ইঙ্গিত কচ্ছে। আশ্চর্য্য! তারা বিষাক্ত তীর তূণীরের মধ্যে রেখে আমায় বেঁধে নিয়ে গেল। তারা আমায় হাত জোড় থাকতে দেখে ভেবেছিল, বুঝি আমি তাদের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাচ্ছি।

আমি প্রথমে অনেকদিন পর্য্যন্ত তাদের কথাবার্ত্তা কিছুই বুঝতে পারিনি—তারাও না। ইসারা আকার ইঙ্গিতে যতদূর যা হয় তাই চ'লত। শেষে তাদের একজন জেল থেকে পালিয়ে এল। সে লোকটি অল্প একটু 'হিন্দুস্থানী' বুঝ্তো। তার নাম ছিল 'লু'। লুর সাথে জারাওয়ালাদের রাজার মেয়ে 'লুয়া'র বিয়ে হবার কথা হয়েছিল। কিন্তু একদিন হঠাৎ লু সাহেবদের হাতে পড়ে বন্দী হ'য়ে জেলে যাওয়ায় বিয়ে হয়নি। লু ছিল আমার গুরু! আমি তার কাছে জঙ্গলী কথা শিখতাম, আর সে আমার কাছে হিন্দুস্থানী শিখ্তো। দুজনের মধ্যে ভাব ছিল খুব।

"আমাকে নিয়ে জারাওয়ালারাই খুব মুস্কিলে পড়েছিল। আমাকে নিয়ে কি করা হ'বে এ নিয়ে তাদের মধ্যে খুব তর্ক বিতর্ক হ'ত। অনেকের মত ছিল আমাকে মেরে ফেলা। তাদের ভয় যে পাছে আমি কোন রকমে পালিয়ে গোরার দলে রাস্তার কথা বলে দি। গোরাদের সাথে এদের অনেকবার যুদ্ধ হ'য়ে গেছে। ক্রমে এরা হঠ্তে হঠ্তে জঙ্গলের মধ্যে এসেছে। এখানে এত বড় জঙ্গল যে বাইরের লোকে পথ না জানলে কিছুতেই এ যায়গায় আসতে পারে না। তাই তাদের অনেকে আমায় মেরে ফেল্তে চেয়েছিল। রাজা তাদের কথা শোনেনি। রাজা বলতো 'একবার প্রাণ ভিক্ষা দিয়েছি আবার বিনাদোষে মারতে পারি না।"

"লু' আমার পাহারাওয়ালা ছিল। সে সব সময় আমার ছ থাকতো। আমাকে জঙ্গলীভাবে শিক্ষা দেওয়াই লুর কাজ। তারা যেমন ন্যাংটা হয়ে থাকে, আমাকেও র করে তেমনি করা হ'য়েছিল। প্রথম প্রথম খুব লজ্জা তো, কিন্তু তারা সবাই লেংটা বলে কাপড় না পেয়েও একদিনের বেশী আমার কোন অসুবিধা হয়নি। আমি সাধ্য চেষ্টা করে তাদের সাথে একভাবে থাকতাম। এ বিষয়ে আমাকে খুব সাহায্য করিত।

"একদিন জঙ্গলের মধ্যে আমি আর লু বেড়াতে গিয়েছাম। লু হঠাৎ একটা বিষ-তীর নিয়ে আমাকে মারতে লো। আমি ত অবাক্। আমি লুকে জিজ্ঞাসা লাম, ব্যাপার কি? সে বলিল—'তা বুঝি তুমি ন না? তুমি লুয়ার সাথে বিয়ে বসবে।' আমি বল্লাম, —আমি ত তার কিছুই জানি নে। আমি কখনো কে বিয়ে ক'রব না।' লু আমার কথায় হেসে উঠে লে, 'লুয়া আমায় বিয়ে করতে অস্বীকার করেছে। সে য় করবে তোমাকে।'

"লুর মুখের চেহারা দেখে বুঝ্‌লাম আজ আর আমার ণ নাই। নিরুপায় হ'য়ে বল্‌লাম, 'লু মরবার সময় ছি আমি তাকে কখনো বিয়ে ক'রবো না।' লু সে থা বিশ্বাস না করে মারবার জন্য যেমন তীর উঠাবে, নি পাহাড়ের উপর থেকে 'লুয়া' তীর হাতে করে বল্‌লে , খবরদার। ওকে মারলে তুমিও বাঁচবে না।' তার টি কথায় লুর হাত থেকে তীর পড়ে গেল। সে আস্তে স্তে চলে গেল। আমরা ঘরে এলাম। সেই অবধি আমাকে পাহারা দিতে নিযুক্ত হ'ল।

"লুয়ার বর্ণ আর আর জারাওয়ালাদের মেয়ের মতনই ষণ কালো। দেখ্‌তে ভালো নয়, তবে রাজার মেয়ে ল তার কোমরে অনেকগুলা কড়ি ও পাথরের টুকরা তা দিয়ে বাঁধা ছিল। সেই সুতার সাথে একটা গাছের তা সাম্‌নে ঝুলান ছিল। সেই একটি ছোট পাতাই র লজ্জার একমাত্র আবরণ। বিধিদত্ত সম্পদের মধ্যে ল তার ধনুকের মত জোড়া ভ্রূ ও দুটি বড় বড় মানান ই কালো চক্ষু।"

"জারাওয়ালাদের কুঁড়েগুলা সব এক জায়গায় ছিল। ড়েগুলা একেবারে ছোট। কোনরূপে শোয়াবসা যায়, কিন্তু দাঁড়াতে গেলে মাথায় ঠেকে। তাদের রাজার কুঁড়ে কেবল একটু বড়। রাজার কুঁড়ের সাম্‌নে একটা খালি যায়গায় পাথরের উপর বিচারালয়। বিচারালয়ের সাম্‌নে কতকগুলা মানুষের মাথার খুলির মালা ঝুলান একটা জয়স্তম্ভ।

"আমাকে একদিন হঠাৎ এই বিচারালয়ে উপস্থিত করা হ'ল। আমি ত নিজের অপরাধের কিছুই জানি না। সাতজন জারাওয়ালা বিষ মাখান তীর নিয়ে আমার চার পাশে দাড়া'ল। রাজা পাথরের উপর বসা।

"রাজা আমাকে বলিল—আমার সাথে লুয়ার বিয়ে হবে তাতে আমি স্বীকার আছি কি না। আমি বল্‌লাম—'না, আমি বিয়ে ক'রবো না।'

"রাজা বিকট চিৎকার করে বল্‌লো—'কি, এত আস্পর্দ্ধা? রাজার মেয়েকে একটা দাস বিয়ে করতে চায় না? আচ্ছা যদি বিয়ে কর্‌তে না চাও তবে তোমাকে এখনি মেরে ফেলা হ'বে।' বাস্তবিক জীবন নিতান্ত অসহ্য হয়ে উঠেছিল। এই অসভ্য জঙ্গলীদের সাথে বনে জঙ্গলে লেংটা হয়ে আধপেটা আধপোড়া মাছ মাংস খেয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরণ নিতান্ত মন্দ নয় বলে আমি বল্লাম 'সেই ভালো, মেরে ফেল।'

"রাজার আদেশে আগেই সাতখানা ধনুকে সাতটি বিষ-তীর জোড়া হয়ে গেল। এবার আমি আর হাত জোড় করে ভগবানকে ডাকলাম না। ভাবলাম হয়ত বেটারা আবার ভাববে আমি ক্ষমা চাচ্ছি। তাই আমি চোকবুজে মনে মনে ভগবানের নাম নিয়ে মরবার জন্য তৈয়ার হলাম। অনেকক্ষণ হ'য়ে গেল কৈ কোন তীরও আমার বুকে এসে পড়লো না ভেবে চোকমেলে দেখ্‌লাম সাতখানা ধনুকের তীর আবার সাতজনের হাতে। আর রাজার পায়ের কাছে লুয়া কাঁদ্‌ছে। রাজা ইঙ্গিত করলে সকলেই চলে গেল। শেষে রাজাও মাথা নীচুকরে উঠে গেল। লুয়া এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে গেল। আমি চুপ করে তার সাথে চল্‌লাম। সে ঝরণার কাছে একখানা বড় পাথরের উপর বসে পড়লো। আমিও ব'সলাম। সে কোন কথা বলে না। আমিও কি বলবো ভেবে ঠিক না না কত্তে পেরে চুপ করে রইলাম। বনের মাঝে চাঁদের একটু আলো এসে দেখলাম 'লুয়ার' চোখে জল।

"আত্মীয় কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে যে কোন্ সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তা জানি না। যখন ঘুম ভাঙ্গলো, তখন দেখি প্রায় ভোর হয়ে গেছে। লুয়া তেমনি বসে আছে, শুধু ঘুমের সময় বুঝি আমার মাথাটা সে কোলে তুলে নিয়েছে। উঃ সারারাত্রি সে এমনি করে বসে আছে। ভাব্‌তেই একটু লজ্জা হ'ল। আমি বল্‌লাম 'লুয়া তুমি রাতে কি একটুও ঘুমাও নি?' লুয়া কোন কথা বল্‌তে পারল না। তার দুই চোখ দিয়ে জল বেয়ে পড়তে লাগলো। অসভ্য জানোয়ারের হৃদয়ে এত ভালবাসা! চোখে এত জল!

* * *

"একদিন লুয়ার অসুখ হয়েছিল। সে আমাকে বিশ্বাস করে একা রেখে চলে গেল। আমি কিন্তু তার বিশ্বাস রক্ষা কর্ত্তে পারি নি। এতদিন যে সুযোগের অপেক্ষায় এত কষ্ট সহ্য করে ছিলাম আজ সেই সুযোগ পেয়ে আর চুপ করে থাক্‌তে পারলাম না। সরকারের একদল ফৌজ নিকটেই এসেছে বলে সেদিন প্রায় সকল আরাওয়ালা আরো জঙ্গলের মাঝে যায়গার খোঁজে গিয়েছিল। আমি প্রাণপণ করে পাহাড় থেকে নাম্‌তে লাগলাম। উঃ, সে কি জঙ্গল! কাঁটাতে সকল গা পা ছিঁড়ে গেল। চল্‌তে চল্‌তে অবসন্ন হয়ে একটা বড় বেতের ঝোপের মাঝে পড়ে গেলাম। সে কাঁটার ঝোপ থেকে পলাবার আর কোন উপায় না দেখে ধরা পড়বার জন্য অপেক্ষা কর্ত্তে লাগলাম। প্রায় একঘণ্টা বাদে এক আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটে গেল। লু আমার খোঁজে সেই ঝোপের কাছে এসে আমাকে সেই অবস্থায় দেখে হাস্‌তে হাস্‌তে ধনুকে বিষতীর দিয়ে বল্‌লো—'আজ তোর শেষ দিন, আজ রাজার হুকুম তোর মাথা কেটে নিতে হবে।' আমার উত্তরের আগেই আমাকে লক্ষ্য করে যেমন তীর ছুড়বে অমনি সে বিকট চিৎকার করে পড়ে গেল। বিস্ময়ে চেয়ে দেখি তার বুকে তীর বিঁধে গেছে। লুয়া ধনু হাতে পাহাড় থেকে নাবছে। লুয়াকে দেখে লজ্জায় আর মাথা তুল্‌তে পারলাম না, সে আমায় কত বিশ্বাস করেছিল, আমি তার সব বিশ্বাস ভেঙ্গে এসেছি। তবু সে আমার জন্য তার নিজের লোককে মারতে একটুও ভাবলো না।

"লুয়া এসে হাস্‌তে হাস্‌তে আমায় বেতের ঝোপ থেকে বার করে নিয়ে এল। তারপর আস্তে আস্তে বল্‌লো—'তোমরা বুঝি সভ্য?' আমি তার কাছে ক্ষমা চাইলাম। সে তেমনি হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌ল 'ক্ষমা, আমি তোমাকে অনেক দিন আগেই করেছি। কিন্তু এবার আর আমার হাত নেই। এবার রাজার হুকুম। তোমার আর সব থাক্‌বে, কেবল মাথাটা নিয়ে রাজাকে দিতে হইবে। তুমি দেখনি যেখানে বিচার হয় সেখানে কতগুলা মাথার মালা গাঁথা হয়েছে। ও সব পলাতক আসামীর।'

"আমি বল্‌লাম, 'তবে আমার মাথাও সেখানে ঝুলান হ'বে?' লুয়া উত্তর দিল, 'না, তা হবেনা। আমি রাজার কাছে এবার তোমার প্রাণ ভিক্ষা না চেয়ে শুধু তোমার মাথাটা ভিক্ষা চেয়েছি।' আমি বল্‌লাম, 'মাথা নিয়ে তুমি কি করবে?' সে বল্‌ল—'কেন? জান না ছয় মাস গলায় দিয়ে থাক্‌বো তারপর ঘরে ঝুলিয়ে রাখবো।'

"আরাওয়ালাদের মধ্যে স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রী ছয় মাস তার মাথারখুলি গলায় রাখে; তারপর ঘরে ঝুলিয়ে পূজা করে। আমি বল্‌লাম, 'লুয়া আমি ত তোমাকে বিয়ে করি নি।' লুয়া হাসিয়া বলিল, 'আমি যে করেছি।'

"লুয়া বল্‌তে লাগিল, 'তুমি হয়ত ভাবছো যে এ পাগল মেয়েমানুষটা বলে কি? এত ভালবাসে, মারতে চায় কেন? সত্যি কথা আমি তোমায় মারতে চাই না। তোমার বুকে তীর বিঁধবার আগে যে আমার কলিজা লালে লাল হয়ে যাবে। কিন্তু করবো কি উপায় নেই। রাজার হুকুম! আর তুমি পালিয়ে এসে রাজার কাছে বড় অপরাধ করেছ। সব অপরাধের ক্ষমা আছে কিন্তু এ অপরাধের ক্ষমা নেই। কেউ ক্ষমা চাইতে পারবে না, এই নিয়ম ব'লে এবার আমি তোমার প্রাণ ভিক্ষা না চেয়ে মাথার খুলি চেয়েছি। যাক্, তুমি আর দেরী ক'রো না, আমার বড় কান্না আসছে। আর দেরী করলে হয়ত রাজার হুকুম মত কাজ করতে পারবো না।' বলেই সে তীর নিয়ে ধনুকে জুড়তে আরম্ভ করলো। সব ঠিকঠাক, এমন সময় একটা বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। লুয়া আমার দিকে একটু চেয়েই চুপি চুপি চোরের মতন গাছের আড়ালে যেয়ে দাঁড়াল। একটু পরেই যেন কাকে লক্ষ্য করে তীর ছুড়লো। আমি চিৎকার করে বল্‌লাম, কে আছ, আমাকে বাঁচাও। কথা শেষ হ'তে না হ'তেই দেখি একজন সাহেব, শিকারের পোষাক পরা, হাতে বন্দুক, বুকে তীর, বিঁধে গড়াতে গড়াতে পাহাড় থেকে পড়ে গেল। পর মুহূর্ত্তেই একজন পাঠানের

[হা]তে লুয়া তার হাতে করে পড়ে গেল। আমি দৌড়িয়া [তা]কে কোলে করে বস্‌লাম। লুয়া আমার দিকে চাহিতে [চা]হিতে আমার কোলের উপর মাথা রেখে মরে গেল।

"পাঠান আ[ম]ার বন্দুক তুলে আমাকে মারতে এলেই [আ]মি বল্‌লাম, 'আমি একজন বন্দী; আমাকে মেরো না।' [পা]ঠান এসে আমাকে বেঁধে নিয়ে গেল। হাকিমের কাছে সব কথা বল্‌লাম, কেবল লুয়ার সাথে ভালোবাসার কথা বাদ দিলাম। কেহই আমার কথা বিশ্বাস করলো না," হাকিম রায় দিলেন, "আইন সঙ্গত স্থান থেকে পালিয়ে আরাওয়াদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, মৃত্যু পর্য্যন্ত মুক্তি নাই।"

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চন্দ্র।

মানুষের মহত্ত্ব।

ডুবুরি অতলে পশে মুকুতার তরে।
বাঁচা আর সুখ তার ধরণীর প'রে।
নীচ-স্বার্থে ডোবে নর, লোভে মজি, হায়।
মহত্বে অস্তিত্ব তার, সুখ উচ্চতায়।

শ্রীসতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

পল্লীর প্রাণ।

(উপন্যাস)

(১৮)

অনেক বেলায় বাজার মিলে। বাজারের মাছ [ত]রকারী কিনিয়া রাঁধিতে এই জ্যৈষ্ঠমাসেও বেলা ১২টা [অ]তীত হইয়া যায়। কোনও অভ্যাগতের সৎকারে বিশেষ [কি]ছু আয়োজন করিতে হইলে বেলা আরও হেলিয়া একটা [দে]ড়টায় গিয়া নামে। পুত্র পুত্রবধূ বাড়ী আসিয়াছে,—ভবানী [মা]ছের পাকে পাঁচভাগ রাঁধিতে দিয়া নিজের পাকেও গিয়া [তি]ন চারি রকম নিরামিষ তরকারী রাঁধিলেন। সুতরাং [যা]দব ও নিবারণের আহার করিতে বেলা প্রায় একটা [বা]জিয়া গেল। তবে চারুমুখীর কোমল দেহে নাকী বেশী অনিয়ম সয় না, তাই ১২টার আগেই কন্যাসহ তিনি যা হইয়াছিল, তাই দিয়া আহার করিয়া আসিয়া শয়ন করিলেন। নৌকাপথে আগের রাত্রিতে ভাল ঘুমও তাঁহার হয় নাই। যাদবও আহারান্তে ঘণ্টা দুই বিশ্রাম করিয়া পাণের ডিবাটি হাতে লইয়া বড়ঘরের দাওয়ায় আসিয়া বসিলেন।

"নিবু কোথায় রে? ও নিবু!"

পিছনের বাগানে একটা গাছে কতকগুলি আম পাকিয়াছিল, নিবারণ তাই পাড়িতে গিয়াছিল। ভবানী এই মাত্র আহার করিয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে একটি মোটা পাটি বিছাইয়া একটু গড়াগড়ি দিতেছিলেন। তিনি উঠিয়া ঘরের জানালাটি খুলিয়া নিবারণকে ডাকিলেন। নিবারণ আমগুলি কুড়াইয়া ডালায় তুলিয়া নিয়া আসিল। ভবানীও দাওয়ায় নামিয়া দরজার নীচে একধারে বসিলেন। চারুমুখীরও ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল। চোকে মুখে জল দিয়া আরও গোটা দুই পাণ মুখে পুরিয়া পাশের দিকের এক দরজা দিয়া তিনি ঘরে আসিলেন, সম্মুখের দরজার কাছে গিয়া উপবিষ্টা হইলেন। ঠুনঠান ঠান্ঠুনুক শব্দে এক বোঝা মাজা বাসন হাতে লইয়া কাদম্বিনীও তখন ঘরে ঢুকিল, বাসন যথাস্থানে রাখিয়া সম্মুখ দুয়ারে উঁকি দিয়া দেখিল, মা' দরজার কাছে মাটিতে বসিয়া আছেন।—সে তাড়াতাড়ি একখানি পিঁড়ি আনিয়া তাঁহার পিছনে রাখিল,—তারপর

পিছনদুয়ারে গিয়া একটি শিকার উপর হইতে পানের বাটাটি নামাইল,—গোটাদুই আস্ত পাণ খানিকটা সুপারী খয়ের ও চুণ দিয়া মুড়িয়া নিয়া মুখে দিল। খোকা তখন উঠিয়াছিল,—পিছনের এক দরজার কাছে পা ছড়াইয়া তাকে মাই দিতে বসিল। বসিয়া ঝিমাইতে লাগিল,—ঝিমাইতে ঝিমাইতে ওইখানেই আঁচল বিছাইয়া খোকাকে লইয়া শুইয়া পড়িল।

নিবারণ আমের ডালাটি নীচে একপাশে রাখিয়া মাটির পৈঠার উপরে পা দিয়া উপরের খুটিটি ঠেস দিয়া দরজার ধারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বাবু আসিয়া দাওয়ায় বসিয়াছেন দেখিয়া নরা'ণ তামাক দিয়া গিয়াছিল। যাদব পাণ চিবাইতে চিবাইতে হুঁকায় গুড়ুক্ গুড়ুক্ একটু একটু টান দিয়া ভাবিতে লাগিলেন—কেমন করিয়া কি ভাবে এখন কথাটা তুলিবেন। মাতাকে বড় গম্ভীর এবং ভ্রাতার হাসিহীন মুখে একটা নীরব ঔদাসীন্য লক্ষ্য করিয়া তাঁহার মনটা কেমন দমিয়া যাইতেছিল।

যাহাহউক প্রসঙ্গ যতই অপ্রিয় হউক, তুলিতেই হইবে। বিলম্বে লাভ কিছু নাই বরং অসুবিধা আছে। বেলা একেবারে গেলে পাড়ার পাঁচজনে হয়ত আসিবে। ঘরোয়া কথায় বাধা পড়িবে। হুঁকায় ঘন ঘন কয়েকটা টান দিয়া যাদব কহিলেন। "তা কি হয়েছিল নিবু?"

নিবু উঠানের দিকে চাহিয়া ছিল, সেই ভাবেই সংক্ষেপে পুকুর সংক্রান্ত ঘটনা বিবৃত করিল।

"হুঁ"—এ ত হ'ল এক দফা। আর?"

"আর! কই আর ত কিছু হয়নি?"

"বাজারে নাকি একদিন কি ঝগড়া হ'য়েছিল।"

নিবারণ একটু ভ্রূকুটি করিল,—কহিল "ওহো, এ নালিশও হয়েছে। বাজারে এমন কিছুই হয়নি, গোপালদত্তকে তিনি মেরেছিলেন, সেও উল্টে হাত তুলেছিল,—আমি মাঝে প'ড়ে থামিয়ে রাখি তারে।"

"কোনও বচসা হয় নি তখন?"

নিবারণ উত্তর করিল, "বাজারে ঢের লোক তখন ছিল,—যাকে যাকে বল ডেকে দিচ্চি, তাদের জিজ্ঞেসে ক'রে জান্‌তে পার।"

"বাঁকা ভাবে কথাটা কেন নিচ্ছিস্? আমি ত তোকেই জিজ্ঞাসা ক'চ্চি। অনেকদিন অবধিই একটা বিবাদ চ'ল্‌ছে—সব আমি জান্‌তে চাই।"

"কোনও বিবাদ তার সঙ্গে আমার চলেনি।—বাজারে চটে তিনি কুকথা ব'লেন, আমি তাই নিষেধ করি। আর তাঁর কথায় কতকগুলি লোক গোপালদত্তকে মারতে আসে, আমি তাই ঠেকাই। এই যা হয়। —তা নিয়ে আর কোনও বিবাদ তার সঙ্গে আমি করিনি। বামাপিসীই বরং বাড়ী এসে মাকে অনেক ব'কে যান।"

যাদব হুঁকাটায় আর কয়েকটা টান দিলেন। তারপর ধীরে ধীরে আবার কহিলেন "হুঁ—তারপর—তারকঘোষালের স্ত্রীর পক্ষ নিয়েও তার সঙ্গে কিছু গোলমাল হ'য়েছে' শুন্‌তে পাই—"

ভবানী বলিয়া উঠিলেন, "বলিস্ কি যাদব? তারকের বউ ছেলেটি মেয়েটি নিয়ে যে দুঃখে আছে, শত্তুরেও তা চোকে দেখ্‌তে পারে না। নিবু কি ক'রেছে? চালে একটি কুটো নেই—বৃষ্টি হ'লে গাছতলায় মাথা রাখা যায় ত সে ঘরে মাথা রাখা যায় না। নিবু তাই দেখে ঘরে খড় ছিল, ঝাড়েও বাঁশ আছে, তাই নিয়ে গিয়ে আবাগীর ঘরটুকু ছেয়ে দিয়ে আসে। এতেই হরিঘোষালের অপমান হ'ল? অপমান হ'য়ে থাকে সে নিজে কেন দুটাকা খরচ করে তার ঘরখান মেরামত করে দিল না? এ সব ত তারই দেখা উচিত।"

"দেখা উচিত, হয়ত দেখ্‌তও। তার অপেক্ষা না ক'রে নিবুর কি গায়ে পড়ে গিয়ে এটা করা ভাল হ'য়েছে!"

নিবু একটু উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "কিছুই মন্দ হয়নি। তুমি গাঁয়ে থাক না, জান না হরিঘোষাল আর তার বোন তাদের উপর কি অত্যাচারটা করে।"

যাদব কহিলেন "সরিকে সরিকে ঝগড়া ঢের হ'য়ে থাকে। বাইরের লোক গিয়ে যদি তার এক পক্ষ নেয়—তবে সেটা অপর পক্ষের শত্রুতার মত হ'য়ে দাঁড়ায় বই কি?"

নিবারণ উত্তর করিল, "কারও পক্ষ নিয়ে আর কারও সঙ্গে আমি ঝগড়া ক'ত্তে যাইনি। যা ক'রেছি যার কাছে শুন্‌লে। এতে কোনও ত্রুটি আমার হয়নি—"

চারুমুখী দরজার পাশ হইতে কহিলেন, "শুধু কি এই?—তাদের খাবার টাবার ত পাঠান হয়। এতে একটা যোগাযোগ তাদের সঙ্গে বোঝা যায় না কি?"

নিবারণের চক্ষু মুখ লাল হইয়া উঠিল,—পিছনের দিকে একবার ফিরিল, কি বলিতে যাইতেছিল,—কিন্তু ভবানী তাড়ি তাকে বাধা দিয়া বধূকে লক্ষ করিয়া কহিলেন, ।, বল্লে মন্দ শোনাবে, একদিন বাড়ীতে এসেছ—ব'লবে ট্টী কেবলই খোটা দিচ্ছে। তা, বাছা ওরা ভেয়ে একটা বোঝাপড়া ক'চ্চে করুক—তোমার কি এর-এই রকম ক'রে ফোড়ন দেওয়া উচিত হ'চ্ছে।"

চারুমুখী কহিলেন "আমার ত কিছুই উচিত হ'চ্চে -বাড়ীতে পা দিয়ে অবধিই তা দেখতে পাচ্চি। তবে খুকীটি ত আর নই।—ওঁদের ভেয়ে ভেয়ে এত বড় াটা বেঁধে উঠছে, ভালমন্দ একটা কথা কি এর মধ্যে াকে বলতে হয় না?"

"হবে না কেন বাছা,—তুমি ঘরণী গিন্নী হ'য়েছ—মন্দ তোমাকেই ত ব'লতে হয়। ঝগড়া হ'লে তোমাকেই য়ে দিতে হয়। তা তুমি যে উসকে দিচ্চ আরও।"

"উসকে দিচ্চি! উসকে দিয়ে আমার লাভ? বাড়ী থাকিও না, থাকবও না,—সরিকী ক'রে আধা-ধি সব ভাগ ক'রেও খাব না। কি স্বার্থ আমার যে র মধ্যে একটা ঝগড়া আমি পাকিয়ে তুলব? তবে ড়া একটা হ'চ্চেই দেখতে পাচ্চি। খোলাখুলি সব াই বলা ভাল—যে কোন গোল আর না থাকে, সব ষ্কার হ'য়ে মিটে যায়।"

যাদব কহিলেন, 'যাক যাক, আর অত কথায় কি কার? তবে মোট কথা হ'চ্চে কি নিবু জান? ওদের টা সরিকী গোলমাল আছে, তুমি ওদের খাবার টাবার াও—"

নিবু বড় উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল "খাবারটাবার াই! কে বলেছে এ সব কথা? হরিঘোষাল ত? র কথাটাই একেবারে বেদবাক্যি বলে ধ'রে নিলে, কেন মাদের কাছে না হয় একবার জিজ্ঞাসাই কত্তে!"

"তবে কি—খাবার টাবার কিছু পাঠাওনি?"

"পাঠাব না কেন? হাঁ, একদিন পাঠিয়েছিলাম তা—"

"ওই ত হ'ল! একদিন পাঠাও, আর পাঁচদিনই পাঠাও ঠিয়েছ ত? ওতেই তারা ধ'রে নিতে পারে, আরও চ পাঠাও, একদিন তারা ধ'রেছে!, কেমন, পারে নাকি ই?"

নিবারণ কহিল, "তারা কিসে না পারে তা জানিনে। তা যা খুসী করুক আমার বয়ে গেছে। তাদের কোনও তোয়াক্কা আমি রাখিনে। পয়সা যদি আমার থাকত, কুন্তীর মাকে একেবারে প্রতিপালন ক'ত্তেও আমি ভয় পেতাম না। বড় উকিল যদি হ'তাম, মামলা ক'রে তার ন্যায্য পাওনা তাকে পাইয়ে দিতাম,—হরিঘোষালকে নাস্তানাবুদ ক'ত্তাম।"

"এইত! ওরা ত এই-ই সন্দেহ করে। এই ত ওরা বলে যে ওদের সরিক তারকঘোষালের স্ত্রীর পক্ষ নিয়ে তুমি ওদের জব্দ ক'রবার ফিকির ক'চ্চ।"

"তা বলে বলুকগে,—যা ওদের খুসী সন্দেহ করুকগে। তার জন্যে থোরাই কেয়ার করি আমি। সত্যি যদি তা করতাম মনে ক'রতাম, খুব ভাল একটা কাজই ক'রলাম।"

ভবানী কহিলেন ওরে নিবু, হতভাগা একটু ঠাণ্ডা হ—ঠাণ্ডা হ! একেবারে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছিস্! যা মুখে আসছে তাই বলছিস্!"

চারুমুখী গৃহ মধ্য হইতে একটু মৃদু হাসিয়া কহিলেন "যাই হ'ক, নিজের কথায়ই ঠাকুরপো স্বীকার ক'রে নিচ্ছেন ঘোষালদের সঙ্গে শত্রুতা তিনি করেন।"

ভবানী কহিলেন, "তুমি আর ফোড়ন দিওনা বাছা! শত্রুতা তাদের সঙ্গে ও কিছুই করে না। তবে ওই হরি-ঘোষাল যে কি পাত্তর—তারকের বউটোকে যে কি দুর্গতিতে রেখেছে—গাঁয়ে থাকি আমরাই জানি। তুমি তার কি জানবে মা? এতে মানুষের আত্মা যার আছে, তারই রাগ হয়। তবে নিবু নাকি গোঁয়াড়, তাই যায়গা বুঝে কথাটা সামলে ব'লতে পারেনি। তাদের ঘর মেরামত ক'রে দিয়ে এসেছিল,—অমন কত গরীব দুঃখীর ঘর নিবু মেরামত ক'রে দিয়ে থাকে। পয়সা খরচ ত করে না—কোথায় পাবে যে ক'রবে। গতরে খেটে যদ্দূর পারে লোকের উপকার সে করে। তবে ওই খাবারের কথা—হাঁ। তা খাবার—ও কেন, আমিই একদিন পাঠিয়েছিলাম। নিবু এসে ব'ল্লে—"

যাদব কহিলেন, "সে যাই হ'ক মা, তাদের উপর নিবুর যে বড় একটা রাগ আছে, তাতে আর সন্দেহ নাই। বাজারে একটা গোলমাল হ'য়েছিল,—যে ভাবেই হ'ক ঘোষাল

নিবুর আচরণে তাতে অসন্তুষ্টই হ'য়েছিল। তারপরই আবার তারকঘোষালের পরিবারকেও সাহায্য ক'চ্চে দেখা গেল। তারও যাহ'ক একটা কৈফিয়ৎ না হয় দেওয়া যেত। কিন্তু তারপরেই ও আবার গেল জোর ক'রে তার পুকুর দখল ক'ত্তে—"

"দখল ক'ত্তে যাইনি দাদা। পচা জলে পাড়ার লোক মারা যায়, ও কিছুই ক'রবে না—তাই জোর ক'রে পুকুরটা সাফ ক'রে দিই—"

"পরের পুকুর, আইনে ওতেই দখল করার চেষ্টা বোঝায়; তিনি এসে বাদী হ'য়েছিলেন—তাও মাননি, তাঁর সঙ্গে হাতাহাতিও ক'রেছ—"

"যা করেছি তা ক'রেছি—বেশ ক'রেছি। আইন বুঝিনি দাদা, উকিল নই। তবে গাঁয়ের আসল ভালমন্দের হিসেবে কোনও অন্যায় আমাদের হয়নি। তার পুকুর তারই র'য়েছে। দখল কিছু করিনি। একটা কৈ পুঁটিও কথনও গিয়ে ধরিনি, ধ'রবওনা।"

যাদব কহিলেন, "ওই ত তোমার দোষ। গোঁয়াড়ের মত যা খুসী তাই ক'রবে, বুঝবেও না যে কোথায় কি দোষ হ'ল না হ'ল। ফলাফল ত শেষে আমাকেই ভুগ্‌তে হয়। আইন একটু নাড়াচাড়া করি—আদালতেও যাই—এই তিনটে ঘটনা একত্র কল্লে পরিষ্কার একটা শত্রুতা আর অনিষ্ট চেষ্টার প্রমাণ হয়।"

"হয় হ'ক—কি ক'রব তার?"

"ও ব'ল্লে ত আর চ'ল্‌ছে না ভাই। গাঁয়ের একটা সম্ভ্রান্ত পরিবার, তাদের সঙ্গে তুমি ক্রমাগত শত্রুতা ক'রবে, হক্ নাহক্ তাদের অনিষ্ট চেষ্টা করবে, পরিবারের কর্ত্তা আমি—আমার একটা দায়িত্ব নেই কি?"

নিবারণ কহিল, "তা সে দায়িত্ব ত তুমি পালন করেই এসেছ। দাঁতে কুটো ক'রে হরিঘোষালের হাতেপায়ে ধ'রে গিয়ে পড়েছ, বেণীবোসের—"

চারুমুখী কহিলেন "যাই ক'রে থাকুন, তোমার ভালর জন্যেই ক'রেছেন। নইলে যে হাতে দড়ী প'ড়ত, জেলে যেত হ'ত।"

নিবারণ বড় কঠোর স্বরে উত্তর করিল, "দাদা যা ক'রেছেন বউদি, তার চাইতে হাতে দড়ী কেন, হাতদুটো কেউ কেটে ফেলে দিলেও ভাল ছিল। জেল ত ভাল, অতখানি অপমানের চাইতে হরিঘোষালকে খুন ক'রে ফাঁসী গেলেও আমার দুঃখ ছিল না।"

যাদব ধীরে ধীরে কহিলেন, "কবে দেখ্‌ছি তাই হবে।"

ভবানী কহিলেন, "তোরা দেখ্‌ছি বড় বাড়াবাড়ি ক'রে তুল্লি। লক্ষণ আমি মোটেই ভাল দেখ্‌ছি না। ওরে আমি বুড়ো মা, তোদের মিনতি ক'চ্চি আমার কথাটা শোন্! এমন বেশী কিছু হয় নি, তবে নিবু নাকি ছেলেমানুষ আর বড় একগুয়ে, আবার তুই গিয়ে নাকি ওদের কাছে অতটা ঘাট স্বীকার ক'রেছিস্, তাতে তার রাগও হ'য়ে গেছে। তাই গুছিয়ে কথাটা ব'ল্‌তে পাচ্ছে না, নইলে ঘোষালদের সঙ্গে ও যে শত্তুরের মত একটা বাদ ক'রে চ'ল্‌ছে, তা কিছু নয়।"

যাদব কহিলেন, "নয় কিসে ব'ল্‌ছ মা? উপরো উপরি তিন তিনটে এমন ঘটনা হ'ল, একি শত্রুতা ছাড়া হয়?"

"ঐটিই তোর ভুল যাদব। তিনটে ঘটনা কিছুই হয় নি। আসল ঝগড়া যা হ'য়েছে, সে ওই পুকুর নিয়ে। তাতেও শত্রুতার মত লবওর কিছু ছিল না। সব ওর বাই, ও জোর ক'রে গাঁয়ের ভাল ক'রবে, খেয়েছে ত তাতেই। ওই যে তারকের বউএর ঘর ছেয়ে দিয়ে এল, সেও কতকটা ওই বাই। এই সব বাইতেই ত হতভাগা গেল!"

চারুমুখী বলিয়া উঠিলেন, "তা এত বাইএর তাল সাম্‌লায় কে? যা তা উনি ক'রে বেড়াবেন, সব ঝুঁকি ত এসে বড় যে তার ঘাড়েই পড়ে।"

ভবানী উত্তর করিলেন, "বাছা বড় যে হয়, ছোটর অনেক দায় তাকে সমলাতেই হয়।"

চারুমুখী পাল্টা জবাব দিলেন, "সামলাবার মত হ'লে সামলান যায়। এতটা বাড়াবাড়ি কে কোথায় সামলাতে পারে? তাও বরং পারে, ছোট যে সে যদি বড় মেনে চলে! ঠাকুরপো বলুন না, যা হ'য়েছে তা হ'য়েছে, এখন উনি যা ব'ল্‌বেন তাই করুন, ওঁর কথা মত চ'ল্‌বেন তাই স্বীকার করুন,—সব দায় উনি মাথায় ক'রে নেবেন এখন। আমিও জোর ক'রে ব'ল্‌ব, তা ক'ত্তেই হবে।"

"তা বেশ ত, যাদব হ'ল বড়, ওর অভিভাবক, সে যদি বিচার ক'রে ন্যায় মত একটা কথা বলে, কেন নিবু তা রাখবে না? কেন তার কথামত চ'ল্‌বে না?"

যাদব কহিলেন, "আমি যা ব'লব তা শুনবে নিবু? আমার কথা মত চ'ল্বে?"

নিবু কোনও উত্তর করিল না; চুপ করিয়াই বসিয়া রহিল।

যাদব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল নিবু?"

নিবু আরও একটুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে কহিল, "তুমি কি ব'ল্বে বল।"

"আমার কথা যদি না শোন, তবে বলা মিথ্যে।"

"বিচার ক'রে উচিত কথা যদি বল, কেন শুনব না?"

"তার অর্থ তোমার মনমত কথা যদি ব'ল্তে পারি, তবে শুনবে, নইলে নয়।"

নিবারণ কহিল, "আমি এখন আর কচি খোকাটি নই দাদা। উচিত অনুচিত বোধ আমারও একটা থাক্তে পারে।"

যাদব উত্তর করিলেন, "তা পারে। আমি যা উচিত বা ভাল মনে ক'রব, তুমি তা না ক'র্ত্তে পার। তবে এক পরিবারে এক অন্নভুক্ত হ'য়ে থাক্তে হ'লে, ছোটকে বড়র কথা মেনে চ'ল্তে হয়। নইলে বড় যে, সে ছোটর কোনও ভার—কোনও দায়িত্ব নিতে পারে না।"

নিবারণ কহিল, "ওবাড়ীর রাজেন খুড়ো আর নেপেন খুড়ো দুই ভাই আছেন। ছোট ব'লে নেপেন খুড়ো কি রাজেন খুড়োর ভাল মন্দ সব হুকুম মেনে চলেন?"

যাদব উত্তর করিলেন, "এইখানে একটু তফাৎ আছে নিবু। নেপেন স্বাধীন, রাজেন খুড়োকে তার কোনও ভার নিতে হয় না,—কাজেই তার কোন্ কাজের দায়িত্বও তার উপরে পড়ে না।"

"তা হ'লে তুমি ব'ল্তে চাও যে তুমি খেতে প'রতে দিচ্ছ ব'লে তোমার যে কোনও হুকুম—হাজার অন্যায় ব'লে মনে হ'লেও আমাকে মেনে চ'ল্তে হবে? তাই যদি হয় দাদা, তবে—"

ভবানী বলিয়া উঠিলেন, "ওরে লক্ষীছাড়া হতভাগা! কাণ্ডজ্ঞান একেবারে হারিয়েছিস্? কি ব'ল্তে যাচ্ছিস্? হাঁরে, যাদব তোরা কচ্ছিস্ কি? ওরে, হরিঘোষাল তোদের কে? তার সঙ্গে কি একটু ঝগড়া হ'য়েছে তাই নিয়ে ভেয়ে ভেয়ে তোরা এখন ভেন্ন হবি—আমি বুড়ো মা, আমার সাম্নে! কি সর্ব্বনেশে কথা! অাঁ! ওরে, তার চাইতে দুদিক থেকে টেনে আগে আমায় দু'ভাগ ক'রে ফেল্না তোরা? ওরে যাদব, নিবু যেন গোঁয়াড়গোবিন্দ, তুই ত বুদ্ধিমান, লেখাপড়া শিখেছিস্, তুইও কি বাজে একটা কথা নিয়ে রেগে এতবড় একটা অনর্থ ক'রবি! জ্যান্তে আমাকে একেবারে মেরে রাখবি?"

যাদব উত্তর করিলেন, "আমাকে মিছে দোষ দিচ্ছ মা! কি ক'রব আমি? ও এই গাঁয়ে যাখুসী তাই ক'রে বেড়াবে, কোনও কথা আমার শুনবে না, দায়িক ত লোকে শেষে আমাকেই করে।"

"কে দায়িক করে তোকে? হরিঘোষালের সঙ্গে নিবুর একটা ঝগড়া না হয় হ'য়েছেই। কি মুরোদ বা হরিঘোষালের? আর কার কাছে তার জন্যে তুই দায়িক হবি? হাঁ, তুই বড়, তোকে ওর মেনে চ'ল্তে হয়, তা বুঝি; তা ও-ও ত ছোট, ওর একটা ত্রুটি তোকে স'য়ে যেতে হয় না? একটা আবদার তোর পাল্তে হয় না?"

যাদব কহিলেন, "ছোট খাট ঘরের ত্রুটি ঢের সওয়া যায় মা, ছেলেমানুষী আবদারও ঢের পালা যায়। কিন্তু বাইরের পাঁচজনের সঙ্গে বিবাদ বাধিয়ে নিলে, আর সেই বিবাদের জন্য আমাকে যদি তারা দায়িক করে, তবে তা ত আর এড়ান যায় না? যাহ'ক, একটা প্রতিকার ত তার আমাকে ক'র্ত্তেই হবে।"

"বলি, পাঁচজন ত ওই ঘোষালরা? আর নিবু কি এমন ক'রেছে যে তার জন্যে বড় একটা দায় তোর মাথায় এসে প'ল?"

"যতই তুচ্ছ তোমরা কর, ঘোষালরা অত তুচ্ছ ক'রবার লোক নয়। গাঁয়ে হরিঘোষালও নেহাৎ সামান্য একটা লোক নয়, আবার সহরেও অম্বিকে ঘোষাল একেবারে ফেলা যায় না। তাদের সঙ্গে বিবাদটা যা ঘ'টেছে, তোমরা যতই সামান্য মনে কর, আইনের হিসেবে তেমন সামান্য একটা ব্যাপার হয় নি। আমি বড়, পরিবারের কর্ত্তা আমি, কাজেই ঝুকিটা এসে সব আমার উপরেই প'ড়েছে।"

"ভাল, তুই তবে কি ক'রতে বলিস্ শুনি?"

"তারা সব মিটিয়ে ফেল্তে রাজি, কিন্তু নিবারণ যে তাদের অপমান ক'রেছে, তার জন্যে তাকে বাট স্বীকার ক'রে তাদের সন্তুষ্ট ক'র্ত্তে হবে।

নিবারণ কহিল, "সেটা এমন বেশী কিছু নয় দাদা।

হরিঘোষাল গাঁয়ের লোক, বয়সে আমার অনেক বড়, গুরুজনের মত পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণামও তাকে ক'রে থাকি। হাঁ, যে ভাবে হ'ক, হাতাহাতি তার সঙ্গে ক'রেছি, সে মনে কত্তে পারে খুব অপমান তার হ'য়েছে। ভাল, তুমি ব'লছ তার কাছে মাপ চাইতে আমি রাজি আছি।"

"মাপ চাইবে, তা শুধু তার কাছে গিয়ে দুটো কথা ব'ল্লেই তারা খুসী হবে কি? অপমান যখন ক'রেছিলে, অনেক লোক ত সেখানে ছিল—"

নিবারণ কহিল, "যা ক'রব দাদা, লুকিয়ে চোরের মত ক'রবার দরকার কিছু নেই,—কাউকে ফাঁকি দিতেও চাইনে। বেশ ত, তুমি গাঁয়ের সব লোক ডেকে সভা করনা? সবার সামনেই মাপ চাইব। সবাই গাল দিক, মাথা পেতে নেব।"

"বেশ কথা। আমিও ত তাই ভাবছি, আবদার টাবদার যাই করুক, নিবু কি আমার অবাধ্য কখনও হতে পারে? তা বেশ ঘোষালদের বাড়ী একবার যাই, সে যাকে যাকে বলে ডাকাই, তারপর তাদের সামনে তুমি সব দোষ স্বীকার করে মাপ চাও। তবে আরও একটু কথা আছে। কেবল মাপ চাইলেই ত হবে না। আজ মাপ চাইলে, তারপর কালই যদি তুমি তার আপত্তিজনক কোনও কাজ কর, তাহ'লে ত আর হ'ল না কিছু?"

নিবারণ একটু ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, "তার আপত্তিজনক কিছু! বুঝলাম না দাদা, আমাকে কি ক'ত্তে হবে? আমাকে কি এমন একটা দাসখত লিখে দিতে হবে যে হরিঘোষালের আপত্তি যাতে হবে, এমন কোনও কাজ এ গাঁয়ে আমি কখনও ক'ত্তে পারব না?"

"আরে, না না পাগলু! তা কে ব'লছে? তাও কি হয় কখনও? তুই বাজারে কি মাছ কিনবি, কি কার বাড়ী কবে কি নেমন্তন্ন খাবি, তাও কি হরিঘোষালের কথা শুনে চ'লতে হবে? তা বলছি না। তবে ওদের সম্বন্ধে কোনও কাজ একটু বুঝে চ'লতে হবে। ওদের ক্ষতি হ'তে পারে, কি অসন্তোষ বা অপমানের কোনও কারণ ঘটতে পারে, এমন কোনও কাজ বিশেষতঃ যে সব ব্যাপার নিয়ে এই ঝগড়াটা পেকে উঠেছে—সেই সব কিছু—তাই আর ক'রবিনি। আর সেটা তাদের ব'লতেও হবে।

বুঝলাম না দাদা,—স্পষ্ট ক'রে বল, কি ক'ত্তে হবে।"

"এই ধর না—তারকঘোষালের স্ত্রী—"

"কি—গাশুদ্ধ লোকের সামনে আমাকে নাকে খত দিয়ে ব'লতে হবে—তাদের যে সাহায্য একটু ক'রে দি—সেটা যার পর নাই অপরাধ আমার হ'য়েছে—আর এমন গুরুতর অপরাধ কখনও ক'রবনা। না খেয়ে ম'লেও একমুঠো চাল তাদের হাতে তুলে দেব না।"

"আহা—অত বাড়াবাড়ি কেন ক'চ্ছিস্ নিবু! নাকে খত দেওয়ার কথা ত কিছু হ'চ্চেনা—আর এ কথাও কেউ বলছে না—যে গাঁয়ে কেউ না খেয়ে ম'লেও একমুঠো চাল তাদের দিবে না।—তা নয়রে পাগল, তা নয়,—তবে কি না—"

"ওই তবে কিনার মধ্যেই সব র'য়েছে দাদা! আসল কথা তা হ'লে তোমার এই? না দাদা, সোজা ব'লছি, ওটা আমাকে দিয়ে হবে না। বাজারে—আর পুকুর-পাড়ে—এই দুই দাদা—অপরাধ যদি আমার হ'য়েই থাকে তার জন্যে মাপ চাইতে আমি রাজি আছি। বছর খানেকের মধ্যে তার পুকুর আর সাফ ক'ত্তে হবে না, গোপাল দত্তের সঙ্গেও শীগ্‌গির আর তার ঝগড়াও হবে না। তা নিয়ে কোনও কড়ার ক'রবারও দরকার কিছু দেখিনে। তবে কুন্তীর মার কথা,—না দাদা, ওসব আমাকে দিয়ে কিছু হবে না। কুন্তীর মার দুঃখের অবধি নেই; আজ যদি দরকার হয়, আজই এক্ষুণি—গিয়ে তাদের সাহায্য যা পারি আমি করব। হরিঘোষাল কি অম্বিকঘোষাল—কি ওই বেণীবোস,—যতই কেন চটুক না—তাতে পিছপাও আমি হব না।—এতে চাই তুমি ছোট ভাই ব'লে খেতে আমাকে দেও—চাই না দেও। জনখেটে খাব—তবু এর চাইতে দাসত্ব বড় ভাই তুমি—তোমারও ক'রব না!—বাবাও আজ থাকলে—তাঁরও করতাম না।"

চারুমুখী মন্তব্য করিলেন, "তা হ'লে ঝগড়া যা তা ত রয়েই গেল,—মিটল আর কই?"

যাদব কহিলেন,—"তুমি কি বল মা?—শুনলে ত নিবুর সব কথা?"

"ভবানী একটি নিঃশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, "আমি আর কি ব'লব বাবা? বড় কুতপিণ্ডে ছিল আমার তাই আজ এও আমাকে চোকে দেখতে হ'ল। বুড়ো মা আমি ক'দিন আর এই পৃথিবীতে আছি? এই কটা দিন সরুর

ক'ত্তে পার্লিনি তোরা ? তা যা খুশী তোদের কর, আমায় কাশী পাঠিয়ে দে। পাপের ক্ষয় যদ্দিন না হয়, বাবা বিশ্বনাথের পায়ে পড়ে থাকব—তাঁর পায়ে প'ড়েই কাঁদব।"

বলিতে বলিতে ভবানী কাঁদিয়াই ফেলিলেন। গৃহদ্বারে একটি সশব্দ দীর্ঘনিশ্বাস উঠিল। ভবানী চমকিয়া মুখ তুলিয়া ফিরিয়া চাহিলেন,—দেখিলেন, চন্দ্রমণি আসিয়া দ্বারের কাছে বসিয়াছেন। হরিঘোষাল সংক্রান্ত সব গোলমালের কথাই তাঁহার শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। যাদব ত বাড়ী আসিয়াছে ভাইয়ে ভাইয়ে কি যেন একটা কুরুক্ষেত্রই ঘটে আজ! ও পাড়ায় তাঁহার আহারের নিমন্ত্রণ ছিল, বহু সুভোজ্যের প্রবল লোভ সত্ত্বেও চন্দ্রমণি বড় ছটফট্ করিতেছিলেন। বৃদ্ধা মাতার সমক্ষে দুইভ্রাতার কলহ—হায়, হায়, বুঝি এতক্ষণ শেষ হইয়াই গেল! 'পোড়া রান্না যেন আজ ওদের হয়ই না। কেন বাপু, বাজে দুই পদ কম করিলেই বা ক্ষতি কি ছিল আজকার দিনটা ?—যাহা হউক, পাক শেষে হইল,—চন্দ্রমণি আহারান্তে আচমন করিয়া একটু মুখশুদ্ধির মশলা আর তামাকুর গুড়া মুখে ফেলিয়া দিয়াই ছুটিয়া আসিলেন। পিছনের পথ দিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন,—নারদঠাকুরের জয় হউক!—না না, ঝগড়া এখনও শেষ হয় নাই। তবে খুব ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিও হইতেছে না।—তা ওদের বুদ্ধি আছে কিনা, পাড়ার লোক আনিয়া জমাইবে কেন? যাহা হউক, গুটি গুটি তিনি পিছনের দরজা দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন,—সামনের দরজার কাছে আসিয়া বসিলেন।

সহসা ভবানীর দৃষ্টিপাতে চন্দ্রমণি আর একটি সশব্দ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন,—একটু মাথা নাড়িয়া কপালে আঙ্গুল ঠেকাইয়া দুরদৃষ্টহেতু ভবানীর এই দুঃখে কিছু সমবেদনাও প্রকাশ করিলেন। ভবানী একটু ভ্রূকুটি করিয়া মুখ ফিরাইয়া নিলেন।

যাদব কহিলেন, "মা, কেবল কাঁদ্লেই ত প্রতিকার কিছু হয় না? কি আমি ক'ত্তে পারি বল ?"

ভবানী কহিলেন, "যা তোমাদের ভাল মনে হয় কর বাবা, আমি আর কি ব'ল্ব ?"

"আমি যা ভাল মনে করি তা ত বল্লাম। নিবু আমাকে ত্যাগ ক'র্বে, তবু এই বিবাদ মেটাবে না।—আমি কি ক'ত্তে পারি বল ?"

"বিবাদ ত নিবু মেটাতে চেয়েছিলই। ঘোষালের সঙ্গে ঝগড়া ক'রেছে—তার কাছে মাপ চাইবে—সব ফুরিয়ে যাবে। এর মধ্যে আবার তারকের বৌয়ের কথা তোমরা তুলছ,—তাকে নিয়ে কোনও ঝগড়া ত সে ঘোষালদের সঙ্গে করেনি।"

চারুমুখী বলিয়া উঠিলেন, "নিজে না করুন, তাদের সরিকী ঝগড়ার প্রশ্রয় ত দিচ্ছেন। আর যা হ'য়েছে, একদিনের ঝগড়া, এককথায় মিটে যায়। ওতেই ত একটা লাগাড় ঝগড়ার কারণ রয়েছে।"

যাদব কহিলেন, "আমি সব একেবারে মিটিয়ে যেতে চাই না,—ভবিষ্যতে বিবাদের সব কারণ দূর ক'রে যেতে চাই। তা ক'ত্তে হ'লে এটা নিতান্ত দরকার যে নিবু তারকঘোষালের স্ত্রীর সম্পর্কে কিছুর মধ্যে আর যাবে না।—তার দুঃখু আছে,—তা গাঁয়ে ঢের লোক আছে—সবাই তার সাহায্য ক'ত্তে পারে। নিবুর সাহায্য নইলে তার চ'ল্বেই না, এমন ত আর হতে পারে না। নিবু যদি বাইরে চাক্‌রী ক'ত্ত, তবে কি তারা বাড়ী ছেড়ে পালাত? আমিও বরং অম্বিকে ঘোষালকে ব'ল্ব, তাদের কিছু সুবিধে ক'রে দেয়, বিশেষ অভাব কিছু তাদের না হয়।"

নিবারণ কহিল, "দাদা, এ নিয়ে আর বেশী কথার দরকার কিছু দেখছিনে। কুন্তীর মার ভাল কিছু তুমি ক'রে দিতে পার বেশ কথা। কিন্তু আমি তাদের সঙ্গে কোনও আলাপ ক'র্ব না, দরকার হ'লেও কোনও সাহায্য তাদের কখনও কর্‌ব না, এমন দাসখত কাউকে দিতে পার্‌ব না! এ না হ'লে যদি এ বিবাদ নাই মোটে, তবে মিটবে না। ঘোষালরা আমার যা পারে যেন করে, আমি ভয় পাইনে। তুমি যদি এতই তাদের ভয় পাও—আমি তোমায় ত্যাগ কচ্ছিনা দাদা—তুমি সহরে থাক, তোমার যে ভয়ের কি থাকতে পারে তাও জানিনে, তবে বেণীবোস্ শুনেছি তোমাদের মুরুব্বি,—তা যদি এতই ভয় পাও—অবাধ্য ভাইকে সচ্ছন্দে ত্যাগ ক'ত্তে পার। ঘরে ব'সে দাদার ভাত খাচ্ছি, যথেষ্ট হীনতা হয়েছে! এর উপরে আবার এই দাসখত! না দাদা, তা কেটে ফেল্লেও আমাকে দিয়ে হবে না। লেখাপড়া না শিখে থাকি, শরীরে শক্তি ঢের আছে—দুটো ভাতের অভাবে মর্‌ব না।"

চারুমুখী কহিলেন, "তা হ'লে—ঠাকুরপো কি পৃথক্ হ'ত্তেই চান ?"

নিবারণ উত্তর করিল, "যদি তাই ব'লেই খুসী হও বৌদি, তাল তাই সই। এতদিন দাদার অন্নদাস ছিলাম, এখন তা থেকে মুক্তি চাই, নিজের অন্ন নিজেই ক'রে খাব।—মা, তুমি কাঁদ্‌ছ?—কেন, কাঁদবে কেন? তোমার বয়স্ক ছেলে আমি,—বিয়ে দিয়েছ—ছেলে হ'য়েছে,—তবু ঘরে বসে গন্তরপোষা হ'য়ে এতদিন দাদার ভাত খেয়েছি, সেটা কি ভাল হ'য়েছে আমার? এখন থেকে রোজগার করে খাব,—এতে মা তুমি, খুসী না হয়ে দুঃখ কেন পাবে? দাদা আছেন, আমি তাঁর ছোট ভাই, যখন দরকার হয় ছোট ভাই তাঁর পাশেই গিয়ে দাঁড়াব। তাই ব'লে এই বয়সে এই সমর্থ শরীর থাকৃতে ঘরে ব'সে স্ত্রীপুত্র নিয়ে তাঁর দেওয়া ভাত খাব, সেটা কি পুরুষের মত কাজ হয়? এদ্দিন সত্যি বড় কাপুরুষই ছিলাম। আজ যদি বুঝেছি, আর কেন তা থাক্‌ব।"

ভবানী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "যাদব, লক্ষ্মী বাবা আমার! একটু বুঝে দেখ। এ ছাড়া কি মিটমাট কিছুতে হয় না? কিসের ভয় তোর? ঘোষালরা তোর কি ক'র্‌বে? চাকরী ক'ল্লিনি যে স্বাধীন ব্যবসা ওকালতী করবি। বেণী-বোসের ভয়ে শেষে আজ ভাই ত্যাগ ক'র্‌বি? আমি বুড়ো মা, আমাকে এত বড় দুঃখু দিবি? বেণীবোস না হ'লে যদি তোর ওকালতী নাই হয়, ছেড়ে দিয়ে সাহেবদের চাকরী কেন গিয়ে কর্‌না? গাঁয়ের ঝগড়া নিয়ে তারা তোকে ভাই ত্যাগ ক'ত্তে কখনও ব'ল্‌বে না।"

যাদব কহিলেন, "মা, তোমরা বড় ভুল বুঝছ। বেণী-বোসের ভয় কিসের? বেণীবোস্ নইলে কি আমার ওকালতী হবে না? হাঁ, তিনি গোড়ায় যথেষ্ট সাহায্য ক'রেছেন, তার জন্যে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ আছি, এই পর্য্যন্ত। তাঁর কথায় আমি ভাই ত্যাগ ক'র্‌ব, তোমাকে দুঃখ দেব, এ সব কি কথা? তবে, আমার একটা কর্ত্তব্যবুদ্ধি—একটা দায়িত্ব ত আছে। আমার স্থির বিশ্বাস ঘোষালদের সঙ্গে এ নিয়েও নিবুর একটা বিদ্বেষ ভাব আছে- ওর নিজের কথায়ই তা বেশ বোঝা যায়। অত বড় একটা বিবাদ যখন বেধে উঠেছে, সব নির্ম্মূল ক'রে আমি মিটিয়ে দিয়ে যেতে চাই। নিবু এটা স্বীকার না ক'লে, আসলে মিটবেও না কিছু। বিবাদের বড় কারণটা থেকেই যাবে।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই যাদব চুপ করিলেন। চারুমুখী তখন স্বামীর ত্রুটি পূরণ করিয়া কহিলেন, "আর উনি ত এমন কথাও ব'ল্‌ছেন না যে ঠাকুরপোকে ত্যাগ ক'র্‌বেন। ঠাকুরপোই বরং জিদ ক'রে কেবলই ব'ল্‌ছেন, কারও অন্ন-দাস হ'য়ে থাকবেন না, স্বাধীন ভাবে নিজে রোজগার ক'রে খাবেন।—তা বেশ ত, যদি পারেন সে ত ভাল কথাই। তবে লোকে হয় ত এটা বুঝবে না, ওঁদেরই দোষ দেবে,—ব'ল্‌বে ঘোষালদের কথায় উনি এসে ভাইকে পৃথক্ ক'রে দিয়ে গেলেন। তা এই ত পিস্‌শাসঠাকরুণ র'য়েছেন, উনি ত সব দেখ্‌লেন। কুন্তীর মাই ঠাকুরপোর এত বড় হ'ল যে তার জন্যে নিজের বড় ভাই—যে এদ্দিন এত ক'রে প্রতিপালন ক'রেছে—তাকে পর্য্যন্ত উনি ত্যাগ কচ্ছেন।"

দরজার আড়ালে ভবানীর দৃষ্টির বাহিরে চন্দ্রমণি সরিয়া বসিয়াছিলেন। চারুমুখীর দিকে চাহিয়া একটু মাথা নাড়িয়া তিনি নগরাগতা মহিমান্বিতা এই বধূমাতার কথায় সমর্থন করিলেন, মুখভঙ্গী সহ হস্তাঙ্গুলী সঞ্চালনে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, নিবারণ কত বড় শক্ত গোঁয়ার, কাহাকেও গ্রাহ্য করে না। কিন্তু শ্রুতিগোচরেই ভবানী উপবিষ্টা, সুতরাং কোনওরূপ বাগ্‌বিভূতি প্রকাশে ভরসা পাইলেন না।

ভবানীর মনটা একেবারে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, বধূর কথায় কোনওরূপ প্রতিবাদ তিনি করিলেন না। আর প্রতিবাদও মিথ্যা। যা হইবার তা হইল। যাদব যদিও একটু নরম হইত, বধূ মধ্যে মধ্যে ফোড়ন দিয়া তাকে তাতাইয়াই রাখিল। এই জন্যই অভাগীর মেয়ে সঙ্গে আসিয়াছিল,—তার মনস্কামনা পূর্ণ হইল। আর তাকে দোষ দেওয়াও মিথ্যা। যাদব কি নরম হইত? ও যে বেণীবসু আর অম্বিকা ঘোষালের সঙ্গে এই পরামর্শ করিয়াই আসিয়া-ছিল। ভবানী বড় গভীর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

নিবারণ উঠিয়া বাহিরের দিকে গেল। যাদব আর এক ছিলুম তামাক খাইতে খাইতে কতক্ষণ নীরবে বসিয়া কি ভাবিলেন। তারপর নিজের ঘরে গিয়া জামা উড়ুনি লইয়া বাহির হইলেন।

চারুমুখীও উঠিয়া তাঁহার ঘরে গিয়াছিলেন। চন্দ্রমণির বড় ইচ্ছা হইতেছিল, চারুমুখীর কাছে তার ঘরে গিয়া একটু বসেন। সহর হইতে আসিয়াছে, ভাতার জজের উকিল, কিছু প্রত্যাশা তার কাছে আছে বই কি? কিন্তু ভবানীর

সম্বন্ধে সহসা সে ভরসা তাঁহার হইল না। চারুমুখী একদিন বাড়ী আসিয়াছে—দিলে কতই আর দিবে? কিন্তু ভবানীর কাছে নিত্যকার কত প্রত্যাশা তাঁহার রহিয়াছে। ধীরে ধীরে তিনি উঠিয়া দাওয়ায় ভবানীর সম্মুখে আসিয়া বসিলেন, উচ্চ 'হুঁ' শব্দে একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "তাই ত বড়বউ, এমন পুনির শরীর তোমার—আজ এ কি কাণ্ডটা তোমার সামনে হ'ল! লোকে ব'লে—'তাদের মা গঙ্গা পায় না'—"

ভবানী একটু রুক্ষ স্বরে কহিলেন, "কেন আগেই ওসব কুকথা ডাক্‌ছ ঠাকুরঝি? এই একটা কথায় এদিক ওদিক হ'য়েছে ব'লেই কি ভেয়ে ভেয়ে ওরা আলাদা হ'ল?"

চন্দ্রমণি উত্তর করিলেন, "না হ'লেই ত ভাল—প্রাত-ব্বাক্যিতে তাই হ'ক। তুমি যে কদিন আছ, তোমার সাম্‌নে—তবে নিবু নাকি বল্‌ছিল, রোজগার করে খাবে—"

"তা খাবে। পাঁচটি ভাই থাক্‌লে পাঁচজনেই ত রোজগার ক'রে থায়, তাই ব'লে কি তারা আলাদা হয়? নিবু যদি রোজগার ক'রে দুপয়সা আন্‌তে পারে, নিজের মাগ ছেলেকে নিজে ভাল খাওয়াতে পরাতে পারে—সেত ভাল কথা।"

"ওমা, তা আর ভাল নয়! দুই ভাই ওরা—দুজনেই যদি রোজগার ক'রে। সংসারেরও কত জৌলুষ হবে যে। দুটি বউ—দুজনেই যদি সমান পাঁচখানা গয়না আর ভাল কাপড় প'রে বেরোয়, কত মুখ উচু তোমার তাতে! হুঁ—:! তা যাদব গেল কোথায়? ঘোষালদের একটু ধ'রে প'ড়ে এটা মিটিয়ে দিয়েই যাক্ না। ওদের ছোট বউটা এত দুঃখু পাচ্চে—নিবু কিই বা দেওয়া থোয়—এ নিয়ে এত জিদই বা ওদের কেন? তা যাদব গেল কোথায় উঠে? ভাবছিলাম দুটা কথা তাকে বলি। আর কি জান ভাই (কাণের কাছে মুখ নিয়া নিম্নস্বরে) ওই বড়বউটিও তোমার বড় কম পাওর নয়। মাগীই সব গোল পাকাচ্চে, নইলে যাদব এমন মন্দ ছেলে তোমার নয়।"

বলিয়াই চন্দ্রমণি চারুমুখীর ঘরের দিকে একবার ভয়ে ভয়ে চাহিলেন। ভবানী কোনও উত্তর করিলেন না। ঈষৎ একটু ভ্রূকুটি প্রকাশ করিলেন। এমন সময় চন্দ্রমণির উপস্থিতি—আর এই সব মন্তব্য তাঁহার পক্ষে যারপরনাই অপ্রিয় বলিয়া বোধ হইতেছিল। কোনও উত্তর না পাইয়া চন্দ্রমণি আপন মনে কহিলেন, "তাই ত—যাদব গেল কোথায়? দুটো কথা তাকে বুঝিয়ে ব'লতাম—. ঝাঁ ক'রে অম্‌নি উঠে গেল। দেখি—"

এই বলিয়া চন্দ্রমণি উঠিলেন, গুটি গুটি উঠানে নামি-লেন চারুমুখীর ঘরের পিছন দিয়া একটা পথ ছিল, শিবুদের বাড়ী যাইবার সহজ পথ সেটা। উঠানে নামিয়া চন্দ্র-মণি আপন মনে কহিলেন, "যাই দেখি—শিবুর মা ব'লেছিল, এক ধামা তুষ দেবে আগুন রাখ্‌তে। এলাম যদি, যাই একেবারে নিয়েই যাই—"

ঘরের পিছন দিয়া যাইতে যাইতে চন্দ্রমণি গোটাদুই কাসি দিলেন। চারুমুখী কহিলেন, "কে পিসিমা যাচ্চেন নাকি?"

"হাঁ মা, যাচ্চি একবার ওই শিবুদের বাড়ীর দিকে—এক ধামা তুষ দেবে ব'লেছিল——

"তা ঘরে আসুন না?"

চন্দ্রমণি ঘরে গিয়া উঠিলেন। চারুমুখী মৃদুস্বরে কহি-লেন, "শুন্‌লেন ত সব! আচ্ছা বলুন ত, কুন্তীর মাই কি ওর এত বড় হ'ল যে ভাইয়ের মনের দিকে একটি বার চাইল না, স্পষ্ট মুখের উপর ব'লে দিল, আলাদা হ'য়ে রোজগার করে খাবে, কুন্তীর মাকে খাওয়াবে পরাবে, তার পক্ষ নিয়ে ঘোষালদের জব্দ ক'র্‌বে!"

চন্দ্রমণি বাহিরের দিকে চাহিয়া মৃদুতর স্বরে কহিলেন, "আর বলোনা মা, এমন গোঁয়ার গোবিন্দ গাঁয়ে আর দুটি নেই—একেবারে জ্বলিয়ে সবাইকে খেল! বড় ভাই—খেতে পরতে দিচ্চে—তোর বাপু এত জিদ্ কেন? আর ওই কুন্তীর মা—তাকে কত খাবার টাবার পাঠায়—ঘর ছেড়ে দিল—যখন তখন তাদের ঘরে গিয়ে গিস্ ফাস ক'চ্চে—পাণ তামাক খাচ্চে—ওই বয়সের মেয়ে ঘরে এখনও যে হয় নি—ওরা কত কি বলে! এটা কি ভাল মা? আমাদের অবিশ্যি মুখের বার ক'ত্তে নেই এ সব কথা। তবে এত বাড়াবাড়ি ক'ল্লে লোকে কদিন চুপ করে থাকবে ব'ল?"

চারুমুখী শিহরিয়া উঠিলেন; ওমা তাই নাকি! নইলে এত?

যাহা হউক, এ সম্বন্ধে কোনও কথা বলা তিনি যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না।

চন্দ্রমণি কহিলেন, "কদিন আছ মা বাড়ীতে?

চারুমুখী উত্তর করিলেন, "থাকতে আর পেলাম কই? ঠাকুরপো ত আলাদা করেই দিলেন,—এখন কোথায় রাঁধব কি খাব—আর এ সব কেলেঙ্কারীও ভাল লাগছে না—আরও মার সামনে! ভাবছি কাল সকালেই চলে যাব। আজ রাতটা কোনও মতে কেটে যাবে এখন;"

"হুঁ—:। বাড়ী এসেছ দুদিনের তরে—দুটি তৈরী ভাত খাবে—তাও কপালে নেই! কি করব মা, তোমার শাশুড়ী কি ভাববেন, নইলে দুট রেঁধে দিয়ে যেতাম।"

"তার এমন দরকার কিছু নেই। আজকের একটা রাত—এও এক রকম করে কেটে যাবেই।"

এই বলিয়া চারুমুখী বাক্স খুলিয়া একটি টাকা বাহির করিয়া চন্দ্রমণির হাতে দিয়া কহিলেন, "তাড়াতাড়ি চলে এসেছি পিসিমা—হাতে বেশী কিছু নেই। তা এই টাকাটি আপনি নিন, কিছু কিনেটিনে খাবেন! সঙ্গতি পেলেই একজোড়া কাপড় আপনাকে পাঠিয়ে দেব।"

"বেঁচে থাক মা, বেঁচে থাক। অক্ষয় ঐশ্বর্য্যি তোমাদের হোক! গরীব দুঃখী আমরা, তোমাদের মুখ চেয়েই ত আছি। আহা, নিবারণ বুঝলে না—কি ভাই ভাজ সে হেলায় আজ হারাল! তা আসিগে মা এখন। হাঁ মা, যাদব কোথায় গেল? ঘোষালদের বাড়ী বুঝি?"

"কে জানে—হয়ত তাই গেছেন। তবে তারা যে এটা ছেড়ে দেবে, এমন ও মনে হয় না। তারা ত আর দায় ঠেকেনি কিছু? এদের এত জিদ শুনবে কেন?"

"তা ত বটেই মা। তাদের কিসের দায়? যাই দেখি একবার ওপাড়ায়, শুনে আসিগে কি হ'ল। কি জান মা, তোমাদের জন্যেই প্রাণটা বড় পোড়ে। সেই ছেলেবেলা থেকে 'চন্দর পিসি' 'চন্দর পিসি' ক'রে যাদব যেন আমার পাগল! তুমি ত দেখনি মা, এই এতটুকু ছেলে যখন ছিল, আমাদের বাড়ীতেই ত থাকত—যেখানে যেতাম আঁচল ধ'রে ধ'রে আমার সঙ্গে যেত। তাই ত ভাবছি মা, তোমাদের ঘরে এত বড় একটা গোল বেধে গেল, আমি কি আর আমাতে আছি? আহা, যাদব আমার কি দুঃখুটাই আজ পেলে। ছোট ভাই—মুখের উপর তেড়ে ব'লে কিনা তোমার ভাত আমি খাব না, তোমার কথাও শুনব না। ছি—ছি, কলিকালে হ'ল কি? তা আসিগে এখন মা।"

চারুমুখী প্রণাম করিয়া চন্দ্রমণির পদধূলি নিলেন। যারপরনাই প্রহৃষ্ট মুখে আশীর্ব্বাদ করিয়া বাহিরের দিকে একবার উকি দিয়া দেখিয়া চন্দ্রমণি নামিয়া গেলেন।

(১৯)

যাদব সত্যই ঘোষালদের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। নিবারণের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক স্নেহ নিতান্ত কম ছিল না। নিবারণ যে অসঙ্গত কথা কিছু বলে নাই, তাহাও তিনি মনে মনে বেশ বুঝিয়াছিলেন। মনে মনে বড় দুঃখ—বড় লজ্জা তাঁহার হইতেছিল। কিন্তু উপায় নাই। বেণী বসুর মন যোগাইয়া তাঁহাকে চলিতেই হইবে। নিজের সহিলেও তাঁহার অসন্তোষের হেতু কোনও ক্ষতি চারুমুখীর সহিবে না। চারুমুখী সহরে দশজনের একজন হইয়া সুখবিলাসে ও মান-মর্য্যাদায় থাকিতে চায়। তাতেই সে অভ্যস্ত হইয়াছে,—আর তা ছাড়িতে পারে না। ছাড়াইতে চাহিলেও সে শুনিবে না, গৃহে আগুন বৃষ্টি করিবে। আর সব এড়াইতে পারিলেও চারুমুখীকে তিনি এড়াইতে পারেন না। এদিকে নিবারণ তার দেবর মাত্র, কোনও দিন তার উপরে বিশেষ প্রসন্ন সে নয়। তার খাতিরে নিজের এতটা ক্ষতি কখনও সে সহিতে চাহিবে না। হায়, ধিক ওকালতী! তাতেও পরের উপরে এতটা নির্ভর করিতে হয়! সত্যই মা যেমন বলিয়াছেন, কোনও সরকারী চাকরি যদি তিনি করিতেন, তবে এই ঘটনা লইয়া আজ কি তাঁহার ভাইকে ত্যাগ করিতে হইত? অবশ্য নিবারণ সরল গ্রাম্য যুবক, কূট বুদ্ধি কিছুই নাই, সহজে সে নিজেই বলিল, ভ্রাতার অন্ন সে ত্যাগ করিবে। তাঁহাকে একথা বলিতে হইল না যে তিনি তাকে ত্যাগ করিলেন। হয়ত লোকেও তাঁর দোষ বেশী দেখিবে না। কিন্তু আসল দোষ যে তাঁহারই। তাঁহার কূট কৌশলেই ত সরল নিবারণের মুখ দিয়া এমন কথা বাহির হইল। মুখে স্বীকার না করুন, মনে মনে আপনার কাছে ত এই সত্য তিনি অস্বীকার করিতে পারেন না! মনটা তাঁহার বড়ই পুড়িয়া যাইতে লাগিল,—আপনার কাছে আপনিই যেন এতটুকু তিনি হইয়া গেলেন। প্রতিকার কি ইহার কিছুই নাই? নিবারণ ত লোকের সামনে মাপ চাহিতে রাজি। ধরিয়া পড়িয়া হরিঘোষালকে কি ইহাতেই রাজি করা যাইবে না? সে যদি রাজি হয়, অম্বিকা ঘোষাল আপত্তি করিবে না। কুন্তীর মার ব্যাপারে ঘোষালদের

বিরুদ্ধে নিবারণের যে বাস্তবিক কোনও শত্রুতাসাধনের উদ্দেশ্য নাই, একথা হরিঘোষাল কি সত্যই বুঝিবে না? দেখা যাউক, বলিয়া কহিয়া যদি তাকে বুঝান যায়।

যাদব গিয়া হরিঘোষালের বাড়ীতে উঠিলেন। চণ্ডী-মণ্ডপের দাওয়ায় বসিয়া উভয়ে অনেক কথা হইল। যাদব অনেক করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ফল বিশেষ কিছুই হইল না। হরিঘোষাল শেষে কহিলেন, "বাবাজি, তুমি এত ক'রে বল্‌ছ, সম্ভব হ'লে তোমার কথাটা আমি রাখতাম। তবে কি জান, ঐখানেই হচ্চে নিবারণের আসল নষ্টামী। তুমি গাঁয়ে থাকনা জাননা কিছু. হক্‌ নাহক্‌ ও আমাকে অপদস্থ ক'ত্তে চায়, আর আমাকে গালমন্দ দিয়ে বেড়ায়। ছোঁড়াগুলোও দেখ্‌লেই আমাকে টিটকারী দেয়। সব ওর নষ্টামী।"

যাদব ধীরে ধীরে কহিলেন "হুঁ—তা হ'তে পারে। তা এসব যাতে আর না হয় সেটা আমি দেখব। তবে তারক বাবুর স্ত্রীর সম্বন্ধে ওসব দুষ্টুমী বুদ্ধি বোধ হয় ওর নেই।"

হরিঘোষাল উত্তর করিলেন, "বাবাজি, তুমি ত দেশে গাঁয়ে থাকওনা—এমও না বড়—তাই জাননা কিছু। তারকের বউকে কি আমরা দুঃখ দিচ্ছি কিছু? মাসে পাঁচটাকা ক'রে দেওয়া হয়—বাগানের ফল-ফুলুরী তরীতরকারী যা খুসী হাতে ধ'রেই নেন। ব্রাহ্মণী চালটা ডালটা—মাছটুকু দুধটুকু যখন পাচ্চেন দিচ্চেন। ওই একটা ছেলে আর মেয়ে—আর নিজে বিধবা—গাঁয়ে ঘরে কত আর লাগে? আসল কথা কি জান বাবাজি, উনি মানুষ বড় সহজ নন। লোকের কাছে কেবলই দেখিয়ে বেড়ান কত দুঃখই পাচ্ছেন, আর আমরা কত অত্যেচার ওঁর উপরে ক'চ্চি। এই নিয়ে আমাদের নিন্দে মন্দ যে কত ক'রে বেড়াচ্ছেন—গাঁয়ে আর মুখ রাখ্‌তে ঠাঁই পাইনে। নিবারণও আমাকে জব্দ ক'র্‌বে বলেই আবার ওর সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে, যখন তখন আসছে—কত ফিস্‌ ফিস্‌ ক'চ্চে। সম্প্রতি এও দেখ্‌তে পাচ্চি—বড্ড আড়াআড়ি ক'রে উনি চ'লছেন। সামনে তবু একটু নরম হ'য়ে আগে থাকতেন। নিবারণ এসে জুটেছে, ভরসা দিচ্ছে, সাহায্য ক'চ্চে—এখন একেবারে রণচণ্ডী মূর্ত্তি ধ'রেছেন। বিবাদ যদি মেটাতে যাও বাবাজি, নিবারণকে এ সব একেবারে ছেড়ে দিতে হবে। নইলে তোমার ভাই—যা খুসী তাই ক'ত্তে পার। আমাদের ত আর দাবী দাওয়া কিছু নাই। অম্বিকে ব'ল্লে—বেণীবোস ব'ল্লেন—মামলা ক'রোনা—ক'ল্লাম না। এখন তোমাদের যা ভাল বিবেচনা হয় ক'রবে।"

"দেখুন—ওটা বরং কৌশলেই করান যাবে। এখন কথাটা না তোলাই ভাল। আমি বিশেষ ক'রে ব'লে যাব, সামান্য একটু আধটু সাহায্য কখনও করে করুক—জিদ ক'রে বাড়াবাড়ি কিছু না করে। দেখুন ত কটা দিন—যদি অন্যায় কিছু দেখাই যায়—তখন যা হয় প্রতিকার করা যাবে। আপাততঃ এই কথাটা যদি না তুলে চলে—তবে বড় সুবিধে হয়। কটা দিনের জন্যে এইটুকু দয়া আপনি আমাকে করুন।"

এমন সময় স্বয়ং বামাঠাকুরাণি আসিয়া রণাঙ্গণে অবতীর্ণা হইলেন।

"হুঁ—! বলি কি ফুসফুসনি হচ্চে যেদ্দার সঙ্গে বসে? নিজের ভেয়ের সঙ্গে এঁটে উঠ্‌তে না পেরে ও বুঝি এখন তোমাকে ফুসলুনলি দিতে এসেছে? নিবে নাকি জোর ক'রে বলে, ভাই ত্যাগ ক'র্‌ব তবু কুন্তীর মাকে ত্যাগ ক'র্‌ব না। কেন এত জিদ তার কেন? ওকে দিয়ে আমার ভাইদের জব্দ ক'রবে, মামলা পাকাবে, এই জন্যে ত? ভেতরে আরও কত কি আছে, কে জানে—"

হরিঘোষাল কহিলেন—"বটে—বটে! নিবে এই কথা ব'লেছে। হাঁ বাবাজি, এর পরেও আবার তুমি এসেছ আমাকে এইটে ছেড়ে দিতে? আরে ছ্যা—ছ্যা! তোমার কি একটু মান অপমান বোধও নেই!"

"সে কি! সে কি! এমন কথা নিবু ব'লেছে—কে ব'ল্লে?"

বামা কহিলেন, 'যেই ব'লে থাক্‌—মিছে কথা ব'লেছে? তুই কি ব'ল্‌তে চাস্‌ নিবে এমন কথা বলেনি?—বামুনবাড়ী—চণ্ডীমণ্ডপে এসে ব'সেছিস্‌—বাপের বেটা যদি হ'স্‌—সত্যি ক'রে বল্‌,—বল্‌না, নিবু এ কথা ব'লেছে কি না। তুই তাকে আলাদা ক'রে দিবি কি? সেই যে তোকে আগে আলাদা ক'রে দিয়েছে। কেমন, মিছে কথা? সে রোজগার ক'র্‌ছে। কুন্তীর মাকে কুন্তীকে আর ক্ষেতোকে খেতে প'রতে দেবে! তোকে তোয়াক্কা সে কি রাখে? আবার তুই এসেছিস তার

হ'য়ে ওকালতী ক'চ্চে? ছি—ছি—ছি! একটু ঘেন্না নেই তোর! গলায় দিতে একটু দড়ী জোটে না? বলি তোর মা কি তার বাপের বাড়ীর জমিদারী পেয়েছে যে তার ভয়ে তুই একেবারে জুজু হ'য়ে গেলি? আর সেই বা কেমন মা? মাগী নিবেকে পেটে ধ'রেছে, তোকে পেটে ধ'রে নি? খেতে পর্‌তে দিচ্চিস তুই—তোর মুখের দিকে একবার চাইলনা,—এতখানি অপমান তোকে ক'ল্লে—তবু ওই হতভাগা নিবের কাছেই তোর মাথা হেঁট করাচ্চে! তুই ও অম্‌নি কুকুরের মত ঘা খেয়েও এখানে এসে কেঁউ কেঁউ ক'চ্চিস্!"

যাদবের মুখ এতটুকু হইয়া গেল। আম্‌তা আম্‌তা করিয়া তিনি কহিলেন, "হুঁ—চন্দরপিসি বুঝি এসেছিলেন?"

"এলই বা? চন্দরদি' কি কেবলই মিছে কথা ক'য়ে বেড়ায়? তুই-ই ব'লনা—কেমন বাপের বেটা তুই বুঝি—ব'ল্‌না নিবে এ কথা ব'লেছে কি না? তার এতখানি জিদ—আমাদের সর্ব্বনাশ সে ওই আটকুঁড়ীর সঙ্গে জুটে ক'রবেই, তবু আমরা একটি কথা না ব'লে মিটিয়ে ফেলব? দাঁতে কুটো ক'রে নিবে ব'ল্‌বে ওদের ছায়াও মাড়াবে না—তবে তাকে ক্ষমা করা হবে। নইলে তোরা যা খুসী ক'র্‌গে,—আমরাও দেখ্‌ব কি ক'ত্তে পারি।"

হরি ঘোষাল কহিলেন, "বাবাজি, আর কেন? আমাকে ভোগলামি দিতে এসেছ, নিজের ভাইটি যে কি পাত্তর, তা বুঝেও বুঝ্‌বে না। না বাবাজি, যা কথা হ'য়েছে, সেই ভাবেই কাজ ক'ত্তে হবে। না হয়, তোমাদের যা খুসী সে কর,—আমরাও যা জানি ক'র্‌ব।"

যাদব দেখিলেন, আর এ সম্বন্ধে কোনও আলোচনা নিস্প্রয়োজন। চন্দ্রপিসি একেবারেই সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছেন। এভাবে মিটাইবার সম্ভাবনা ত এক রকম ছিলই না,—তবু একটু যা আশা করিয়াছিলেন, তাও গেল।

যারপরনাই ক্ষুণ্ণ মনে তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। রাত্রিটা কোনও মতে বাড়ীতে কাটাইয়া সকালেই তিনি সপরিবারে কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলেন। আর কোনও কথা হইল না।

ওদিকে ক্ষিপ্রচরণা ক্ষিপ্ররসনা চন্দ্রমণি সন্ধ্যার মধ্যেই সমস্ত গ্রাম পর্য্যটন করিয়া গৃহে ফিরিলেন। গ্রামময় রাষ্ট্র হইল, যাদব ও নিবারণ পৃথক হইয়াছে। যাদবের স্ত্রী আজ রাত্রিতে কোথায় ছুটি রাঁধিয়া খাইবে, ভাবিয়া কুল পাইতেছে না। নিবারণেরই জিদ বেশী। সেই কত কি রূঢ় কথা বলিয়া নিজেই পৃথক হইল। ভাইয়ের কোনও তোয়াক্কাও সে রাখিবে না, তার অন্ন সে স্পর্শ করিবে না। আসল গোল হইয়াছে, ওই হতচ্ছাড়ী পোড়ারমুখী কুন্তীদের লইয়া। ঘোষালদের সঙ্গে ঝগড়া কি না? তাই যাদব বলিয়াছিল, ওদের সঙ্গে অতটা যোগাযোগ নিবারণের ভাল নয়। তাতেই নিবারণ একেবারে আগুন হইয়া গেল। ভাইয়ের মুখের উপরে রুখিয়া বলিল, ভাইকে সে ত্যাগ করিবে, তবু কুন্তীদের ত্যাগ করিবেনা। কে জানে বাপু, কুন্তীরা তার এত আপন কিসে হইল? আহা, বুড়ো মা মাগী, কাঁদিয়া আর চোকে পথ দেখিতেছে না। জ্বালা ত যত তারই, নইলে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই—ইহা ত হইয়াই থাকে। তবে কিনা, পরের জন্য নিবারণ অমন ভাইকে আজ ত্যাগ করিল। এটা কি ভাল দেখাইবে? লোকে যদি মন্দ দু কথা বলে কি মন্দ কিছু ভাবে—তবে ত দোষ কারও দেওয়া যায় না।

একটু কুমড়া, একটা কাঁচকলা, দুটি পটোল কি আলু, এক মুঠা ডাইল, কি কখনও এক সন্ধ্যা ভোজ—ইহাই চন্দ্রমণি লোকের কাছে পাইয়া থাকেন। চারুমুখী আজ আস্ত একটি নগদ টাকা তাঁহাকে দিয়াছেন। আরও একজোড়া নূতন কাপড় দিবেন বলিয়াছেন। এত বড় দান স্বয়ং ভবানীঠাকুরাণীর কাছেও চন্দ্রমণি কখনও পান নাই। সুতরাং অকুণ্ঠিতচিত্তে তিনি যাদবের দিকে টানিয়া সর্ব্বত্র নিবারণের নিন্দা করিয়া আসিলেন। আর ভবানীই বা ইহাতে বিরক্ত হইবেন কেন, যদি জানিতেই পারেন? যাদব ত আর তাঁহার সৎছেলে নয়, নিজের পেটেই জন্মিয়াছে। নিবারণেরই কি অত বাবাবাড়ি করা উচিত হইয়াছে? যাহা হউক, ভবানীর ত কোনও নিন্দা তিনি করিলেন না। তাঁহার জন্য বরং দুঃখপ্রকাশই সর্ব্বত্র করিয়াছেন। কোনও অভাগী যদি তাঁহার মন্দ করিবার জন্য ভবানীর কাণে একথা নেয়ই ত নিক্। তিনিও কি কথাটা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিতে পারিবেন না?

(ক্রমশঃ)

আগমনী।

(১)

এলি কি আবার শরতে শারদা পরিয়া শুভ্র-শেফালি কণ্ঠি।
কল মরালের নূপুর বাজায়ে ধেনুর আপীনে অমিয় বণ্টি॥
কুমুদ কমলে হাসিটি ফুটায়ে লীলায় নাচিয়ে লহর ভঙ্গে।
অতীত স্মৃতির প্রলেপ-শীতলা শত সাধকের প্রসূতি বঙ্গে॥

(২)

আজিকে যাহার জীবন গগনে ঘনায়ে এসেছে অকালসন্ধ্যা।
সংগ্রাম ভীম দানব দাপটে ভাগ্যলক্ষ্মী হয়েছে বন্ধ্যা॥
আধি ও ব্যাধির পীড়ন চিহ্ন ছড়ায়ে পরেছে সকল অঙ্গে।
ভোলার জামিনী ভ্রম বিঘাতিনী ভুলিলি ভস্মভালিকা বঙ্গে।

(৩)

ভবনে ভবনে শারদাগমনে নরনারী ঘোর বিষাদ মগ্ন।
কেমনে রাখিবে কুলশীল মান কি দিয়া ঢাকিবে শরীর নগ্ন॥
বৈবাহিকার তত্ত্ব যোগান চিরাগত প্রথা কেমনে লঙ্ঘে।
তনয়া পীড়ন ভাবনাভাবিতা শঙ্কাশিহরা জননী বঙ্গে॥

(৪)

কৃষাণ কৃষাণী ঢাকে কটিতট ছেঁড়াবাসে রচি ক্ষুদ্র কন্থা।
ভিক্ষা-জীবিনী ভূখায় দগ্ধা ভিক্ষাগমনে নাহিক পন্থা॥
পথিক, পথিকা বসন হরিছে কামিনী কাঁদিছে মুক্ত অঙ্গে।
মৃত্যু বরণে লজ্জা বারিণী রমণী দেবতা পূজিতা বঙ্গে॥

(৫)

সারাদিবসের শ্রম বিনিময়ে কিনিতে না পারি ভার্য্যা-বস্ত্র।
ক্ষোভে অভিমানে আপন কণ্ঠে ভর্ত্তা হানিছে শানিত অস্ত্র॥
দেশব্যাপী মহা মরক লাগিলে কাহারে সেবিবে সেবক সঙ্ঘে।
অন্ন- বস্ত্র স্বাস্থ্য শান্তি বিরাম বিহীনা বিপুলা বঙ্গে॥

(৬)

জামাতা দেখিয়া সরমে ত্রস্তে জীবন ত্যজিছে নগ্না শ্বশ্রূ।
পাষাণ তনয়া পাষাণি তবুও ঝরেনা কি তোর নয়নে অশ্রু?
নবীন বস্ত্রে ভূষিতা শিশুরা নাচিবে না আর পূজার রঙ্গে।
গ্রাম-সম্পদ লাস্য-রহিতা শোক-সন্তাপ তাপিতা বঙ্গে॥

শ্রীগোবিন্দলাল মৈত্র।

বস্ত্র-বিভ্রাট।

অবতরণিকা।

লোকের দুই একদিন অনশনেও চলে, কিন্তু বিবসনে এক মুহূর্ত্তও সভ্যসমাজে কাহারও চলিতে পারে না। সুতরাং এক হিসাবে অন্নাভাব অপেক্ষাও বস্ত্রাভাবের ক্লেশ অধিকতর তীব্র। অতএব বস্ত্রাভাবের জন্য দেশে যে হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে, তাহা এরূপভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে আমাদের কুম্ভকর্ণরূপী গভর্ণমেণ্টেরও নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে, এবং গভর্ণমেণ্ট এই বস্ত্রসঙ্কট নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। বাস্তবিক কলিকাতায় বসিয়া এই বস্ত্রকষ্টের পরিমাণ এবং তীব্রতা আমরা একবারেই বুঝিতে পারিতেছি না। মফঃস্বলের অনেক লোক—যাহারা ১৷৷৹ টাকা জোড়ার সময় বৎসর এক খানা নূতন কাপড় অতিকষ্টে কিনিতে পারিত, ঐ কাপড়ের যোড়া ৬৲ টাকায় চড়িয়া যাওয়ায় তাহারা একরূপ বিবস্ত্র হইয়াছে। হইবারই কথা। যে দেশের লোকের বাৎসরিক জন প্রতি আয় ২৪৲ টাকার অধিক নয়, সে দেশের লোককে সাধারণ সময় হইতে চতুর্গুণ মূল্যে পরিবার কাপড় কিনিতে হইলে, উহাদের মধ্যে যাহাদের আয় অপেক্ষাকৃত কম, তাহাদের কি অবস্থা দাঁড়ায়, তাহা বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যক নাই। তাহার উপর যুদ্ধের জন্য সাধারণ লোকের আয় অতিশয় কমিয়া গিয়াছে। কেন কমিয়াছে তাহা অন্যত্র বলিয়াছি। সুতরাং কাপড়ের অভাবে আত্মহত্যা এবং তদপেক্ষাও ভীষণতর পাপ কার্য্য সংঘটিত হওয়া খুব আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

বস্ত্র সঙ্কটের কারণ।

কিন্তু এই শোচনীয় অবস্থার জন্য কেবল বসিয়া বসিয়া হা হুতাশ করিলে ক্লেশের মোচন হইবে না। ধীর ভাবে ইহার প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতে হইবে এবং কেবল গভর্ণমেন্টের আশায় বসিয়া না থাকিয়া দেশের জন-নায়কগণকেও অগ্রণী হইয়া সুচিন্তিত উপায় অবলম্বনে ত্বরায় অগ্রসর হইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি কয়েকটি সভা সম্মিলিত হইয়া থাকিলেও এ পর্য্যন্ত আমরা এ বিষয়ে কিছু করিতে পারিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। কারণ আমার মনে হয় প্রতিকারের যথার্থ পথ আমরা সঠিকরূপে ধরিতে পারি নাই। অন্ধকারে চলিলে গন্তব্য স্থানে পৌছান অসম্ভব হইবে। সুতরাং এই বস্ত্রসঙ্কটের প্রতিকারের উপায় চিন্তনের পূর্ব্বে ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা দূর করিতে হইবে।

কার্পাস বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধির কথা মনে করিলেই প্রথমে মনে আসে, পৃথিবীর কার্পাসের কথা। কার্পাস না হইলে কার্পাস বস্ত্র হইতে পারে না। আমাদের দেশে যে কার্পাস জন্মে তাহাতে ভাল কাপড় হয় না। পৃথিবীর বাজারের উত্তম কার্পাসবস্ত্রের অধিকাংশই আমেরিকার কার্পাসে হইয়া থাকে। ইজিপ্ট এবং ভারতবর্ষেও দ্বিতীয় শ্রেণীর কার্পাস উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে ইজিপ্টের কার্পাস ইংলণ্ডে এবং কতকাংশ পৃথিবীর নানা স্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে। ভারতের কয়েকটি স্থানে যে কার্পাস জন্মে উহার কতকাংশ ভারতে ব্যবহৃত হয় এবং কতকাংশ জাপান প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। আমেরিকার কার্পাসও জাপানে রপ্তানি হয়। এই সমস্ত দেশেই প্রধানতঃ নানা প্রকারের কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান যুদ্ধে কয়েক কোটি সৈনিক যুদ্ধে ব্যাপৃত আছে। পৃথিবীর উৎপন্ন কার্পাসের অনেকাংশ ইহাদের আবশ্যকীয় বিশেষবস্ত্রাদি প্রস্তুতকার্য্যে ব্যয়িত হইয়া যাইতেছে। তাহার উপর এই তুলার অনেক পরিমাণ "গন কটন" প্রভৃতি নানা প্রকারের যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। এই সমস্ত নানা কারণে পূর্ব্বে পৃথিবীতে সাধারণ ব্যবহার্য্য বস্ত্রবয়নের জন্য যে পরিমাণ কার্পাস তুলা পাওয়া যাইত, বর্ত্তমানে তাহার অর্দ্ধেকও পাওয়া যাইতেছে না। এই কারণেই পৃথিবীর সর্ব্বত্র—বিশেষ আমেরিকার তুলার বাজারে ভয়ানক speculation বাড়িতেছে। চাহিদা ও যোগানের (demand and supply) নিয়মে তুলার দাম অতিশয় বাড়িয়া গিয়াছে, সুতরাং যে কাপড় হইতেছে, তাহার মূল্যও অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ইহার উপর আবার আরও কয়েকটী গুরুতর বিভ্রাট ঘটিয়াছে। ভারতের বস্ত্রশিল্প যে কারণেই হউক অনেকদিন হইতেই অতি দুরবস্থাপন্ন। সুতরাং ম্যানচেষ্টারই এতদিন আমাদিগকে বস্ত্র—বিশেষ ধুতি ও সাড়ী—যোগাইয়া আমাদের লজ্জা নিবারণ করিতেছে। তুলার ও লোকের অপ্রাচুর্য্যে সম্প্রতি ম্যানচেষ্টরের অনেক কলে কার্য্যের অসুবিধা ঘটিয়াছে। তাহার উপর যুদ্ধের উপকরণ প্রস্তুতেই ইহাদের অধিকাংশ শক্তি ব্যয়িত হইতেছে। যুদ্ধের জন্য বিলাতে পারিশ্রমিকের হার দ্বিগুণের উপর উঠিয়াছে। সুতরাং সাধারণের ব্যবহার্য্য কাপড় প্রস্তুত করিতে সেখানে খরচ অতিশয় অধিক পড়িতেছে। ইহার উপর যুদ্ধের জন্য জাহাজের অসুবিধা কিরূপ হইয়াছে তাহা বলা অনাবশ্যক। ফলতঃ জাহাজের ভাড়া অতিশয় বাড়িয়া গিয়া বিলাত হইতে কাপড় রপ্তানির খরচ অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। আবার এত ভাড়া দিয়াও ঠিক আবশ্যকমত সময়ে জাহাজ পাওয়া যাইতেছে না। জাহাজে মাল পাঠাইতে হইলেই উহা ইন্‌সিওর করিতে হয়। অনেক জাহাজ যুদ্ধের জন্য মারা পড়িতেছে, সুতরাং ইনসিওরেন্সের খরচও অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার উপর বিলাতী কাপড়ের উপর ভারতগবর্ণমেণ্ট যে নূতন ট্যাক্স বসাইয়াছেন, তাহাতেও কাপড়ের 'পড়তা' বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই দশচক্রে পড়িয়া ম্যানচেষ্টরের প্রস্তুত কাপড় যখন এ দেশে আসিয়া পৌছিতেছে না তখন তিনি রাগে পরম হইয়া পূর্ব্ব হইতে প্রায় দুই তিন গুণ স্থূল কলেবর ধারণ করিতেছেন। বাস্তবিক পক্ষে বিলাতী কাপড় যখন ভারতীয় বন্দরে উপস্থিত হইতেছে, তখন উহার উপর পড়তা এত অধিক পড়িতেছে যে পূর্ব্ব মূল্য হইতে অনেক অধিক দামে মহাজনগণের সহিত উহার চুক্তি হইতেছে। তারপর মহাজনের হাত হইতেও আরও কয়েক হাত ঘুরিয়া, পরে খুচরা বিক্রিতার দোকানে কাপড় পৌছিয়া থাকে। সেই হাত বদলীতেও যে বেশ কিছু দাম না চড়িতেছে, তাহা নহে। কার্য্যতঃ যখন সাধারণের নিকট কাপড় পৌছিতেছে,

তখন উহার মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা ৩।৪ গুণ অধিক হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমাদের দেশে বোম্বে, আহাম্মাদবাদ প্রভৃতি স্থানেও কয়েকটী কাপড়ের কল আছে। পৃথিবীর তুলার বাজারের সঙ্গে ভারতীয় তুলার বাজারও চড়িয়াছে। ভারতীয় মিল সমূহ এই তুলায় খুব মোটা এবং নিকৃষ্ট কাপড় প্রস্তুত করে, ভাল বিলাতী সুতায় আবার ভাল কাপড়ও প্রস্তুত করে। সুতরাং সাধারণ কাপড় প্রস্তুতের জন্য পৃথিবীর তুলার পরিমাণের অল্পতা প্রভৃতি সাধারণ কারণগুলি ইহাদের উপরেও প্রায় সমানভাবে কার্য্য করিতেছে। ভারতেও বিলাতের মত না হইলেও কারিকরগণের পারিশ্রমিক বাড়িয়াছে। ইহার ফলে ভারতীয় মিলের কার্পাস বস্ত্রের মূল্য বিলাতী কাপড়ের মূল্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতেছে। সুতরাং ধনীর পক্ষে সম্ভব হইলেও গরীব ও মধ্যবিত্তের কাপড় পড়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন উপায় কি? দেশের লোকের ত কাপড় পরিয়া লজ্জা নিবারণ করিতে হইবে। উপায় চিন্তনের জন্য সম্প্রতি কলিকাতা সহরে দুই একটি সভাসমিতি ডাকা হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে সংবাদপত্রেও এ বিষয়ে বেশ আন্দোলন হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট উপায় নির্দ্ধারণের জন্য একটি অনুসন্ধান কমিটী নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই সকল সভাসমিতি স্ব স্ব মতানুরূপ কতকগুলি উপায়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সে গুলির বিষয় বিবেচনা করা দরকার।

গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা।

গভর্ণমেণ্ট যে ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহার মোটামুটী মর্ম্ম এই যে ভারতের কাপড়ের কলগুলিকে কয়েক প্রকার বাঁধা নমুনানুযায়ী (Standardised) মোটা ধুতি প্রস্তুত করিতে বাধ্য করা হইবে। আইনানুসারে এই সকল কলের মোট তাঁতের এক নির্দ্দিষ্ট অংশ এই ধুতি ও সাড়ী প্রস্তুতে নিযুক্ত করিতে হইবে। খরচ হিসাব করিয়া উপযুক্ত লাভ দিয়া গভর্ণমেণ্ট ঐ কাপড় লইয়া নিজে দোকান খুলিয়া অথবা License প্রাপ্ত দোকানদারদিগের হাত দিয়া নির্দ্দিষ্ট দামে উহা বিক্রয় করিবেন। যাহাতে সাধারণে এই ব্যবস্থার সুবিধা সম্পূর্ণরূপে পাইতে পারে, তাহার জন্য আবশ্যকীয় বন্দোবস্ত করা হইবে। নির্দ্দিষ্ট মূল্য, কার্পাস তুলার মূল্য অনুসারে সাধারণতঃ তিন মাস অন্তর পরিবর্ত্তিত হইবে। তুলার মূল্যও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারা যায় কিনা তাহা বিবেচনা করিবার জন্য লোক নিযুক্ত হইয়াছে। এই সমস্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য একজন বস্ত্রমূল্য নিয়ামক (controller) নিযুক্ত হইবেন। আগামী ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনেই এই বিষয়ের জন্য আবশ্যকীয় আইন পাশ হইবে।

এই ব্যবস্থায় দেশীয় তুলায় একরূপ মোটা ধুতি ও সাড়ী যে কিছু সুতায় বিক্রয় হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। উহার ফলে অতিশয় দরিদ্রলোকদিগের অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে খুব মোটা ও নিকৃষ্ট ধুতি সাড়ী পরিয়া লজ্জা নিবারণের সুবিধা হইবে, তাহাও বলা যাইতে পারে। এইরূপ কিছু ধুতি ও সাড়ী বাজারে আমদানী হইলে সাধারণ কাপড়ের টান কিছু কমিবে। সে জন্য যতদূর সম্ভব উহার মূল্যও কিছু কমিতে পারে। কিন্তু আসল কথা হইতেছে যে পৃথিবীর বর্ত্তমান বাজারে ভারতীয় তুলাকে বিদেশে রপ্তানী হইতে আবশ্যকীয় পরিমাণে রক্ষা করিতে না পারিলে এদেশের তুলার দাম গভর্ণমেণ্ট কি পরিমাণে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবেন তাহা এখনও দেখিবার বিষয়। সুতরাং বর্ত্তমান বাজারের এই বিশেষভাবে প্রস্তুত ধুতী ও সাড়ী যে অতিশয় সস্তা হইতে পারিবে এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। যেখানে ভাল ধুতি ও সাড়ী ৭৲ টাকা হইতে ৮৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে, সেখানে এই বিশেষ ধুতি ও সাড়ী ৪৲ টাকা হইতে ৫৲ টাকা জোড়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু এই কাপড়ের স্থায়িত্ব কিরূপ হইবে বলা যায় না। খারাপ সুতার কাপড় ভিন্ন খুব সস্তা কাপড় এ বাজারে হইতে পারে না। সুতরাং সস্তা কাপড় অল্প দিনে ছিঁড়িয়া যাইবে। কাজেই সস্তা কাপড় ব্যবহারকারী কতদূর লাভবান্ হইবে বলা যায় না। কিন্তু এই বিশেষ কাপড় না দেখিয়া এখনও কোন কথা বলা চলে না। তবে ইহা নিশ্চয় যে এই কাপড়ে গরীবদিগের সুবিধা হইবে। কিন্তু সস্তা হইলেও ইহার মূল্য যেরূপ দাঁড়াইবে মনে করা যাইতেছে তাহাতে ভারতীয় দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের পক্ষে উহা অতিশয় অধিক মূল্য বলিয়াই বিবেচিত হইবে। তবুও গভর্ণমেণ্টের এই ব্যবস্থায় যদি সাধারণের কিছু কষ্টেরও লাঘব হয় তাহা হইলেও দেশের লোকের সেইজন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট কৃতজ্ঞ হইতে হইবে।

বর্ত্তমানে পৃথিবীর তুলার বাজারে কাপড় অতিশয় সস্তা করিয়া দিবার ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টের নাই। সুতরাং সেইজন্য আন্দোলন বৃথা। তবে গভর্ণমেণ্ট আরও নানা প্রকারের ব্যবস্থা করিয়া লোকের দুর্দ্দশার লাঘব করিতে পারেন। সে কথা পরে বলিতেছি।

ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন্ গৃহের সভা।

দেশের বস্ত্রসমস্যার মীমাংসার জন্য যে সকল সভা-সমিতি হইয়াছে, তাহার মধ্যে মাননীয় বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে ভারত-সভাগৃহে যে সভা হইয়াছিল, সেইটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেশের অনেক গণ্য মান্য লোক এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। বস্ত্রাভাব দূরীকরণোদ্দেশ্যে এই সভা কয়েকটি রিজলিউসন্ বা মন্তব্য পাশ করিয়াছিলেন। রিজলিউসনগুলির একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা বোধ করি এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতাতে বস্ত্রসমস্যা বিষয়ে

অনেক কথা ছিল,—সুতরাং এ বক্তৃতা বিষয়ে দুই একটি কথা বলিলে বিষয়টি বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে।

সভাপতির বক্তৃতা।

সভাপতি মহাশয় বলিয়াছিলেন যে কাপড়ের এই দুর্ম্মূল্যের জন্য বস্ত্র ব্যবসায়ীদিগের অর্থ গৃধ্নুতাই প্রধানতঃ দায়ী এবং অর্থ লোলুপ ব্যবসায়ীদিগের কেবল লাভের জন্য হস্ত পরিবর্ত্তনের নিমিত্তই কাপড়ের এরূপ মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে বাস্তবিক পক্ষে পূর্ব্বে সস্তা দামে ক্রীত, বাজারে প্রচুর পরিমাণে কাপড় মজুত আছে এবং ঐ কাপড়েই এখন দেশের কাপড়ের খরচ ২।৩ বৎসর চলিয়া যাইতে পারে। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্বের মূল্যের হিসাবে কাপড়ের দর বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

লোহা, কয়লা, কেরোসিন প্রভৃতির যদি গবর্ণমেণ্ট দর বান্ধিয়া দিতে পারেন তবে কাপড়ের দর বান্ধিয়া দিতে পারিবেন না কেন ইত্যাদি।

"মধ্য-ব্যবসায়ী" (middlemen) দিগের অর্থ লোলুপতা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে হস্তপরিবর্ত্তন কাপড়ের অস্বাভাবিক দরবৃদ্ধির প্রধান কারণ নহে। উহাতে দর বাড়িলেও সে বৃদ্ধি এরূপ দুর্ম্মূল্যতার কারণ হইতে পারে না। বাজারে এইরূপ ব্যবসায়ীর সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য, কিন্তু কোন জিনিষ ক্রমবর্দ্ধমান মূল্যে বিক্রয় হইতে থাকিলেই তাহাতে ব্যবসায়ীদিগের লাভ হইয়া থাকে, সুতরাং সেক্ষেত্রে ব্যবসায়ীর সংখ্যাও বাড়িয়া থাকে। এই স্বাভাবিক নিয়মেই কাপড়ের বাজারে এইরূপ ব্যবসায়ীর সংখ্যা বাড়িয়াছে। কিন্তু ব্যবসায়ীর সংখ্যা বাড়িলেই আবার স্বাভাবিক নিয়মে এ ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতার মাত্রা বাড়িয়া থাকে। সুতরাং কাপড়ের ব্যবসায়েও ঐরূপ প্রতিযোগিতা বাড়িয়া অস্বাভাবিক লাভের পক্ষে বিঘ্ন ঘটাইয়াছে। এরূপ অবস্থায় এই সমস্ত ব্যবসায়ীগণ যে অতি অস্বাভাবিক লাভ করিতেছে, এরূপ মনে করিতে হইলে তাহার জন্য তথ্য সংগ্রহের প্রমাণে বিশেষ যুক্তির আবশ্যক। সে যুক্তি এখনও কেহ দেখাইতে পারেন নাই। তবে হস্ত পরিবর্ত্তনে যে কাপড়ের মূল্য বিলক্ষণ রূপ চড়িতেছে, এ কথা অস্বীকার করিবারও উপায় নাই। আবার এ সকল "মধ্য-ব্যবসায়ী" ভিন্ন কাপড়ের ব্যবসা শৃঙ্খলার সহিত চলিতে পারে কি না সে বিষয় অনুসন্ধান করিয়া জানা দরকার। ইহাদের অভাবে যদি বাজারে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইয়া খুচরা বিক্রেতাদিগের মধ্যে কাপড় বিভক্ত হইয়া পড়ায় অসুবিধা না ঘটে, তবে গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিতে পারেন যে কাপড়ের মহাজন—অর্থাৎ যাঁহারা কাপড়ের আমদানীকারী সওদাগরগণের সহিত কন্‌ট্রাক্ট করিয়া কাপড় খরিদ করেন, তাঁহারা প্রকৃত খুচরা বিক্রেতা ভিন্ন অপর কাহারও নিকট কাপড় বিক্রয় করিতে পারিবে না। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা এবং অনুসন্ধান না করিয়া এরূপ ব্যবস্থা করিলে অনেক কাপড়ের দোকান উঠিয়া যাইবে। কারণ অনেক খুচরা দোকানদার ধারে কাপড় আনিয়া বিক্রয় করিয়া টাকা পরিশোধ করে। "মধ্য-ব্যবসায়ী" ভিন্ন মহাজনগণ খুচরা দোকানদারের সহিত এরূপ বন্দোবস্তে রাজি হইবে না। কাজেই অনেক কাপড়ের দোকান উঠিয়া যাওয়ায় খুচরা কাপড়ের ব্যবসায় কয়েকজন লোকেরই একচেটিয়া হইয়া পড়িবে এবং তাহাতে মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা ঘটিবে। সুতরাং বিশেষ অনুসন্ধান এবং বিবেচনা না করিয়া এরূপ ব্যবস্থা করাও সমীচীন হইবে না।

তারপর মহাজনদিগের কাপড়ের দর বাঁধিয়া দেওয়া সহজ ব্যাপার নহে। পড়তার নিচের মূল্যে কেহই জিনিশ বিক্রয় করিতে পারে না। পড়তা খুব বেশী পড়িতেছে এবং বাজার এরূপ ক্রমশঃ চড়া দামের উপর চলিতেছে যে মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। এরূপ বাজারের উপর হস্তক্ষেপ করিতে গেলে ফল অতিশয় খারাপ হইতে পারে এবং বিলাতের ও ভারতের মিলওয়ালাদের এবং ভারতীয় মহাজনদের ব্যবসায়ে এরূপ বিভ্রাট উপস্থিত হইতে পারে যে তাহারা কাপড় আমদানী রপ্তানী কার্য্য, বিশেষ সুবিধাজনক কনট্রাক্ট ভিন্ন, একবারে কমাইয়া দিতে পারেন। সেরূপ ঘটিলে দেশের কিরূপ শোচনীয় অবস্থা হইবে তাহা মনে করিতেও আতঙ্ক উপস্থিত হয়। কিরূপে ঘটনাপরম্পরায় এরূপ অবস্থা আসিতে পারে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া এখানে অসম্ভব। সুতরাং সভাপতি মহাশয়ের নির্দ্দিষ্ট পথে কাপড়ের দর বাঁধিয়া দেওয়াই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এবং দেশের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে কিনা সে বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহের কারণ আছে। তবে বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া আবশ্যক অনুসারে এবং সকল পক্ষের সুবিধা ও অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবিষয়ে যে কোন ব্যবস্থা হইতে পারে না, সেরূপ মনে করি না। পূর্ব্বে বলিয়াছি গবর্ণমেণ্ট কাপড়ের বিষয়ে সম্ভবপর ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। এই ব্যবস্থার ফলাফল দেখা দরকার। তবে সর্ব্বদাই আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে পৃথিবীর তুলার বাজার সস্তা না হইলে কাপড়ের বাজার আশানুরূপ ভাবে কেহই কমাইয়া দিতে পারিবে না। এ অবস্থায় বস্ত্রাভাব নিবারণ করিতে হইলে অন্যপন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। সে পন্থার কথা ক্রমে বলিতেছি।

দুর্ভিক্ষের ন্যায় ব্যবস্থা।

তারপর ভারতসভা-গৃহের সভায় যে সকল মন্তব্য পাস হয় তন্মধ্যে একটি মন্তব্যে গভমেণ্টকে অনুরোধ করা হয় যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে গভমেণ্ট লোকের ক্লেশ নিবারণার্থ যেরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন, বর্ত্তমান কাপড়ের

দুর্ভিক্ষেও তাঁহারা সেইরূপ ব্যবস্থা করুন। এই মন্তব্যের অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। দুর্ভিক্ষের জন্য গভর্ণমেণ্টের ফেমিন কোড্ (Femine code) আছে। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে গভর্মেণ্ট তদনুসারে রিলিফ ওয়ার্কস্ (Relief works) খুলিয়া থাকেন এবং রাস্তায় দুর্ভিক্ষগ্রস্ত যে সকল লোক মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়িয়া থাকে তাহাদিগকে নিকটবর্ত্তী সাহায্য কেন্দ্রে (Relief centre) লইয়া যাইবার জন্য ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কাপড়ের বেলায় এ প্রকারের ব্যবস্থা কি ভাবে হইবে মন্তব্য হইতে তাহার কোন আভাস পাওয়া যায় না। সভার উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে নানা স্থানে গভর্মেণ্ট খাদ্য সাহায্য কেন্দ্রের মত বস্ত্র সাহায্য-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া সেখানে প্রভূত পরিমাণ বস্ত্র সঞ্চয় করিয়া রাখুন এবং যে সকল বস্ত্র ভিখারী বস্ত্র ভিক্ষা করিতে আসে তাহাদিগকে বস্ত্র প্রদান করুন তাহা হইলে মন্তব্যের উদ্দেশ্য অতি উচ্চ সন্দেহ নাই, কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা কতদূর সম্ভবপর তাহা বুঝিতে পারি না। এরূপ সাহায্য কেন্দ্রে ফকির, বৈষ্ণব প্রভৃতি ব্যবসাদার ভিক্ষুক এবং অতি নীচজাতীয় দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরই আমদানী হইবে এবং যথেষ্ট পরিমাণে জুয়াচুরীও চলিতে থাকিবে। অন্নাভাব-ক্লিষ্টকে দৃষ্টিমাত্র সনাক্ত করা চলে, কিন্তু বস্ত্রাভাব-ক্লিষ্টকে চিনিবার উপায় নাই। যদি গভর্মেণ্ট গৃহে গৃহে অনুসন্ধান করিয়া যথার্থ অভাব-গ্রস্তকে বাছিয়া বস্ত্রদান করিতে থাকেন তবে উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণে সিদ্ধ হইতে পারে বটে, কিন্তু গরীব এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোক এরূপ দান গ্রহণ করিবে না এবং যাহারা বাধ্য হইয়া করিবে তাহারাও তাহাদের আত্মসম্ভ্রম জ্ঞানের উপর এত বড় আঘাত লাগিল বলিয়া মনে করিবে যে তাহারা জীবন্মৃত অবস্থায় বাস করিয়া আপনাদিগকে শত ধিকার দিতে থাকিবে। এরূপ সাহায্য কেন্দ্র খুলিয়া বস্ত্রাভাব নিবারণ করা গভর্মেণ্টের পক্ষে কতদূর সম্ভব এবং বর্ত্তমাননীতির অনুযায়ী তাহাও বিবেচনার বিষয়। আর নানা রূপ অসুবিধা সত্ত্বেও এরূপ সাহায্যকেন্দ্র খুলিয়া বস্ত্র যোগাইবার অর্থই বা গভর্মেণ্টের কোথায়! কিন্তু অবস্থা যেরূপ দাড়াইয়াছে তাহাতে গভর্মেণ্টের অনতিবিলম্বে ঠিক দুর্ভিক্ষের সাহায্যকেন্দ্রের ন্যায় না হইলেও, যেরূপ ভাবে সম্ভব সেইরূপ কোন উপায় অবলম্বন করিয়া বস্ত্রক্লেশ নিবারণ করা যে কর্ত্তব্য এবং আবশ্যক সে কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। পৃথিবীর আর যে কোন সভ্যদেশে সাধারণের এরূপ কোন ক্লেশের কারণ উপস্থিত হইলে গভর্ণমেণ্ট অস্থির হইয়া পড়িতেন এবং যেরূপেই হউক ইহার একটা ব্যবস্থা হইত। সুতরাং এই ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে দুর্ভিক্ষনীতি অবলম্বিত হওয়া সম্ভব না হইলেও আরও অনেক প্রকারের নীতি অবলম্বিত হইতে পারে, এবং গভর্ণমেণ্টের অনতিবিলম্বে লোকের বস্ত্রকষ্ট নিবারণের নিমিত্ত এইরূপ কোন নীতি অবলম্বন করা উচিত। আইন দ্বারা সাধারণের হাতে অধিক অর্থাগমের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের ক্রয়কারী শক্তি বাড়াইয়া দেওয়া, কাপড়ের এবং তুলার বিষয়ে আবশ্যকীয় নানারূপ ব্যবস্থা করিয়া কাপড়ের মূল্য সস্তা করিবার চেষ্টা, করনির্দ্ধারণ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া দরিদ্রের বোঝ ধনীর ঘাড়ে চাপাইয়া দরিদ্রকে কাপড় কিনিবার জন্য অধিকতর অর্থ ব্যয় করিবার সামর্থ দেওয়া এবং সর্ব্বোপরি সভায় উক্ত মন্তব্যের ভাবানুযায়ী নীতি অবলম্বন করিয়া সর্ব্বত্র গভর্ণমেণ্ট-ডিপো খুলিয়া সস্তা দামে কাপড় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি নানাপ্রকারের নীতি অবলম্বন করা, গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভবপর। এই সকল নীতির আলোচনা এখানে অসম্ভব এবং সাধারণ পাঠকের পক্ষে রুচিকর ও সুবিধাজনক হইবে না, তবে পরে এ বিষয়ে মোটামুটী ২।১টী কথা বলিব। উপস্থিত গভর্ণমেণ্ট এই উদ্দেশ্যে সাধারণের প্রতিষ্ঠিত ফণ্ডে প্রচুর পরিমাণে অর্থসাহায্য করিয়া বস্ত্রসমস্যার সমাধানে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন।

বস্ত্রাভাবের বেলায় আর একটা কথা মনে করাইয়া দিবার আছে। স্যার্ এণ্টনী ম্যাকডনেলের দুর্ভিক্ষ কমিশন সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে ভারতে খাদ্যসামগ্রীর দুর্ভিক্ষ কখনও হয় না। ভারতে দুর্ভিক্ষের কারণ খাদ্যের অভাব নহে, খাদ্য খরিদ করিবার উপযোগী অর্থের অভাব, দেশের লোকের আয় এত অল্প যে খাদ্যশস্যের সামান্য অল্পতা নিবন্ধন কিছু মূল্য চড়িলেই আর দেশের লোকের বিদেশী মহাজনের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া উহা ক্রয় করিবার সামর্থ্য থাকে না, তখন দেশে যথেষ্ট খাদ্যশস্য থাকিলেও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ফলতঃ যখন দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ, তখনও ভারতের বন্দর হইতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। খাদ্যশস্যের মূল্য বিষয়ে আমি ইতিপূর্ব্বে অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি।* সুতরাং এ স্থলে এ বিষয়ে আর বিশেষ কিছু বলিব না, তবে উক্ত অবস্থা হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে দুর্ভিক্ষের সময় দেশে খাদ্য যথেষ্ট থাকে, কিন্তু বর্ত্তমানে দেশে বস্ত্রের অল্পতা ঘটিয়াছে। অবশ্য এক হিসাবে ধরিতে গেলে মূল কারণ একই বলা যাইতে পারে। কারণ উভয় স্থলেই জনসমষ্টির ক্রয়কারী শক্তির সহিত উপস্থিত প্রাপ্য দ্রব্যের সম্বন্ধ দ্বারাই এ সকল ঘটনার কারণ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমানেও তাহাদের অর্থের অনুপাতে বস্ত্রের পরিমাণ কম হওয়ায় এরূপ ঘটিয়াছে। কিরূপে আমাদের ক্রয়কারী শক্তির সহিত বর্ত্তমান প্রাপ্যবস্ত্রের সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে তাহা ক্রমশঃ বলিতেছি।

৯ বিলাতী কলের উপর কণ্ট্রোল।

কথিত সভায় আর একটি মন্তব্য পাশ হইয়াছিল,

* 'মূল্য-বৃদ্ধি'—মালঞ্চের বর্ত্তমান বর্ষের বৈশাখ সংখ্যা।

যে গভর্মেণ্ট যেমন এ দেশীয় কাপড়ের কলগুলিকে তাহাদের তাঁতগুলির একটি নির্দ্দিষ্ট অংশ ব্যবস্থানুযায়ী মোটা কাপড় প্রস্তুত করিবার জন্য নিযুক্ত রাখিতে বাধ্য করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, বিলাতী কলওয়ালাদিগকেও সেইরূপে ঐ প্রকারের কাপড় প্রস্তুত করিতে বাধ্য করুন। এই প্রস্তাবটি কি প্রকারে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল বুঝিতে পারিলাম না। বিলাতের কলওয়ালাগণ তাহাদের বৎসরের সুবিধা ও অসুবিধা বুঝিয়া কাজ করিবে। এ দেশের গভর্ণমেণ্ট তাহার কি করিবেন? বিলাতী গভর্মেণ্ট পর্য্যন্ত এই কলওয়ালাদিগের অনেক পরিমাণে মুখাপেক্ষী, সুতরাং এ দেশীয় গভর্মেণ্টকে ঐ সকল কলগুলিকে কোন বিশেষ কাপড় প্রস্তুত করিতে বাধ্য করিবার অনুরোধ একপ্রকার গভর্মেণ্টকেই উপহাস করা মাত্র। আর যদি ভারতগভর্ণমেণ্টের পক্ষে এ কার্য্য সম্ভবও হইত, তাহা হইলেও এরূপ কোন ব্যবস্থা করার আবশ্যকতা হইলে ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য-নীতির আমূল পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা দাঁড়াইত। ভারতের বাণিজ্য-নীতির পরিবর্ত্তনের দ্বারাই কেবল ইংলণ্ডের কলওয়ালাগণের উপর আবশ্যকীয় চাপ আমরা প্রয়োগ করিতে পারি। ভারতগভর্মেণ্টের সে ক্ষমতা নাই। Fiscal autonomy যদি ভারত কখনও পায় এবং ভারত গভর্মেণ্টের গঠনে যদি এ দেশীয় লোকের ক্ষমতার বিস্তৃতি লাভ ঘটে, তখন এ সকল কথা মনে করিবার সময় আসিবে। বর্ত্তমান মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড প্রস্তাবে এই Fiscal autonomyর কথা একরূপ কিছুই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই কথা উক্ত প্রস্তাব সাধারণে প্রচারিত হইবার পূর্ব্বেই আমি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। * সুতরাং……উক্ত প্রকারের মন্তব্য গৃহীত হওয়ায় বিশেষ কোন ফল দর্শিবে এরূপ মনে করি না। তবে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ যথাযথ পরিমাণে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এবং ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে বর্ত্তমান বাণিজ্যনীতি অব্যাহত রাখিয়াও বিলাতী কাপড়ের বিষয়ে ভারত গভর্মেণ্টে ইচ্ছা করিলে বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতের পক্ষে হিতকর কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন না এরূপ কথা আমি বলিতে চাহিনা।

কাপড় খরিদ বন্ধ রাখা।

তারপর উক্ত সভায় আর একটী মন্তব্য লিপিবদ্ধ হয়—যে যতদূর সম্ভব সকলে কাপড় কেনা বন্ধ করিয়া দিন। কাপড় আপনিই সস্তা হইবে। কাপড় কেনা বন্ধ করিতে পারিলে যে কাপড় সস্তা হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু কেনা বন্ধ করা কি সম্ভব? চাউলের দাম চড়িয়া দুর্ভিক্ষ হয়। চাউল না কিনিলেই উহার দাম কমিয়া গিয়া দুর্ভিক্ষ কাটিয়া যাইতে পারে; কিন্তু চাউল না কিনিয়া চলে কই? পূর্ব্বেই বলিয়াছি সভ্যসমাজে অনশনে বরং চলিতে পারে, কিন্তু বিবসনে চলিতে পারে না।

সুতরাং যাহার টাকা আছে, আবশ্যক হইলেই সে কাপড় কিনিবে। মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় স্বাভাবিক নিয়মেই লোকে কাপড় কম কিনিবে, কারণ, মূল্যবৃদ্ধির সহিত বস্ত্র ব্যবহার কারী লোকসমূহের ক্রয়করী শক্তি তাঁহাদের কাপড় ক্রয় করিবার উপযোগী সমবেত, অর্থের অনুপাতে কমিয়া যাইবে, কিন্তু এ অর্থের একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কাপড় খরিদে ব্যয়িত হইবেই। এস্থলে এ সকল অর্থনৈতিক যুক্তির অবতারণ করিয়া প্রবন্ধ জটিল করিয়া ফেলিতে চাই না, তবে মোটামুটি বলিতে চাই যে এই রেজলিউসনগুলির বলে কাপড় খরিদ করিবে না।

আমি ধনী, আমার টাকা আছে, কাপড়ের নিতান্ত আবশ্যক, যে দামে কাপড় বিক্রীত হইতেছে, যে দামে যেখানে আমি পূর্ব্বে দুই জোড়া কিনিতাম, সেই দামে এখন আমি এক জোড়া কিনিব। অর্থাৎ মূল্যবৃদ্ধির জন্য কাপড় বিক্রয়ের বাজার স্বাভাবিক নিয়মেই কমিয়া যাইবে। কিন্তু আমি কাপড় না কিনিয়া অসুবিধা ভোগ করিব না। এইরূপে, যে দরিদ্র, বস্ত্রাভাবের বেলায় সেও ওই নিয়মে কাপড় কিনিবে, কিন্তু কাপড় কেনা একেবারে বন্ধ রাখিবে না। কাপড় সকলেই কিনিবে, কিন্তু যে পূর্ব্ব বৎসর একখানা মাত্র কিনিতে সমর্থ ছিল, সে এখন হয়ত চারি বৎসরে একখানা কিনিতে পারিবে না। সুতরাং তাহার দুর্দ্দশার একশেষ হইবে। এই দুর্দ্দশা নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণই বর্ত্তমানে দেশের পক্ষে গুরুতর সমস্যা।

তবে এ বিষয় লোকমত প্রবল করিতে পারিলে এই পূজার বাজারের অতিরিক্ত কাপড় খরিদ কিছু কমান যাইতে পারিবে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন ধর্ম্মঘট সম্ভব হইবে না।

রিলিফ কমিটী।

উপরে যে সকল কথা বলিলাম, সভায় ঐ সকল বিষয় সাধারণের আলোচনার সুবিধা হইলে বোধ করি মন্তব্যগুলি আর একটু পরিবর্ত্তিত এবং সংস্কৃত ভাবে বাহির হইত। কিন্তু আমার যতদূর মনে হয়, পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ভিন্ন সাধারণ শ্রোতৃবর্গকে কোন প্রস্তাব বিষয়েই মত প্রকাশ করিতে আহ্বান করা হয় নাই। বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে এ বিষয়ে আরও দক্ষভাবে আলোচিত হইলে ভাল হইত।

সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় মন্তব্য এই সভায় গৃহিত হয় যে দেশের যাহারা বস্ত্রাভাবে কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদের ক্লেশ বিমোচনের জন্য বস্ত্র ভিক্ষা করা হউক। এই ব্যবস্থা এবং উপরোক্ত মন্তব্য সমূহের অনুসারে আবশ্যকীয় কার্য্য করিবার জন্য এক কমিটি নিযুক্ত হয়, কিন্তু একটী আশ্চ-

* "স্বাধীন বাণিজ্য বনাম রক্ষানীতি"—"মালঞ্চ"—জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়

গ্যের বিষয় এই যে সভাস্থলে, যাঁহাদের দ্বারা কমিটি গঠিত হইল তাঁহাদের নামের উল্লেখ করা হয় না এবং পরে বেঙ্গলী প্রভৃতি যে সকল কাগজে সভার বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহাতেও এই সকল নাম প্রকাশিত হয় না। আশা করি কেবল আইন ব্যবসায়ী, ডাক্তার এবং ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা কমিটি গঠিত হয় নাই এবং অন্ততঃ উহাতে দুই একজনও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি আছেন।

বর্ত্তমানে দেখিতেছি মিষ্টার যতীন্দ্রনাথ বসু ও মিষ্টার নিবারণচন্দ্র রায় কমিটীর সম্পাদক রূপে সাধারণের নিকট বস্ত্র এবং অর্থসাহায্য ভিক্ষা করিতেছেন। ইঁহাদের যোগ্যতা বিষয়ে কাহারও কিছু সন্দেহ করিবার নাই। উভয়েই কর্ম্মী পুরুষ। আশা হয় ইঁহাদিগের উদ্যম ও উৎসাহে অনেকদিন দুঃখীর বস্ত্রকষ্ট নিবারিত হইবে। দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই মহদুদ্দেশ্যে সাহায্য করা আবশ্যক।

কিন্তু শুধু এরূপ সাহায্যে চলিবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র ভদ্রলোক এরূপ সাহায্য গ্রহণ করিবেন না। সুতরাং কেবল বস্ত্রবিতরণ করিলে বস্ত্রসঙ্কট নিবারিত হইতে পারে না। বস্ত্র সস্তা করিবার এবং অল্পবস্ত্রে চালাইবার উপায় দেখিতে হইবে কমিটী সে বিষয়ে বিশেষরূপ বিবেচনা এবং অনুসন্ধান করিয়া ঐ উদ্দেশ্যে কার্য্যে অগ্রসর হউন।

বাজারে পূর্ব্বক্রীত মজুত মাল।

অনেকে বলিতেছেন, বাজারে অনেক কাপড় পূর্ব্বের সস্তাদামে ক্রীত হইয়া গুদামে মজুত আছে। এ কাপড় কেন সস্তায় বিক্রয় করা হইবে না। এরূপ কাপড় আছে বলিয়া মনে হয় না। ক্রমশঃ বর্দ্ধমান-মূল্য বাজারে কেহ মাল মজুত রাখিয়া টাকা বন্ধ রাখে না। কারণ মাল যথেষ্ট লাভে বিক্রীত হইয়া টাকার পৌনঃপুনিক ব্যবহারেই ব্যবসায়ের লাভ। এরূপ অবস্থায় দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে খরিদ মাল এ জন্য বাজারে থাকা সম্ভবপর বলিয়া মনে করি না। তবে বাজার যখন ক্রমশঃই চড়িতেছে, তখন বর্ত্তমান কন্ট্রাক্টের মূল্য হইতে পূর্ব্ব কন্ট্রাক্টের মূল্য নিশ্চয়ই সস্তা ছিল বুঝিতে হইবে এবং বর্ত্তমান মাল পৌছিবার সময়ে পূর্ব্বকার মাল যে কিছু মজুত ছিল না এরূপ নহে। স্বাভাবিক নিয়মে পূর্ব্বকার খরিদ সস্তা মাল বাজারে থাকিলে পরের চড়াদামের মালের মূল্য সে জন্য কিছু কমিবারই কথা। ঐ সস্ত মাল বাজারে না থাকিলে হয়ত বাজার আরও চড়িয়া যাইত। বিশেষ ইতিপূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট বাজারে মজুত মালের যে রিটার্ণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায় বাঙ্গলা দেশে যে পরিমাণ কার্পাস বস্ত্রব্যবসায়ীর গুদামে মজুত আছে তাহাতে কোনরূপ এক বৎসর মাত্র চলিতে পারে। কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্বে বাজারে যে কাপড় মজুত থাকিত, তাহা সর্ব্বদাই দেশে ২।৩ বৎসরের ব্যবহারের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। ইহা হইতেই দেশের মজুত কাপড়ের পরিমাণ কি পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তবুও যদি অতিশয় সস্তা বাজারের কাপড় কেহ চারিগুণ লাভে বিক্রয়ের জন্য মজুত করিয়া রাখিয়াছে অনুসন্ধানে এরূপ প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে অনতিবিলম্বে তাহাকে উপযুক্ত লাভ রাখিয়া ঐ কাপড় বিক্রয় করিতে বাধ্য করিবার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন। এরূপ ব্যবস্থায় অনেক বাধা এবং অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও, যে কোন প্রকারের পথ এই বিঘ্নের ভিতর দিয়া আবিষ্কৃত হইতে পারে না এরূপ নহে।

মফঃস্বলের বাজার।

কাপড়ের বাজারে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা যাইতেছে যে কলিকাতার মূল্য হইতে মফঃস্বলের কোন কোন স্থানের মূল্য অত্যধিক পরিমাণে চড়া। পূর্ব্বে যেখানে মফঃস্বলে কলিকাতার মূল্য হইতে আট আনা জোড়া প্রতি অধিক দামে কাপড় পাওয়া যাইত, সেস্থলে এখন জোড়া প্রতি কোথাও কোথাও ২৲ টাকা পর্য্যন্ত দাম চড়িয়াছে দেখা যায়। ইহার কারণ অনেকে বলিতেছেন মফঃস্বলের মহাজন এবং দোকানদারগণের অতিরিক্ত লাভের ইচ্ছা। কিন্তু লাভের ইচ্ছা সকলে করিলেই লাভ হয় না। সর্ব্বত্রই প্রতিযোগিতা আছে, সুতরাং এই মূল্য বৃদ্ধির কারণ কেবল speculation নহে। যুদ্ধের জন্য রেলে মাল পাঠাইতে কিরূপ অসুবিধা দাঁড়াইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। পূর্ব্বে যে স্থলে মাসে ১০০ বস্তা কাপড় পাঠান যাইত, এই গাড়ীর অভাবের জন্য এখন সেখানে যদি পঞ্চাশ বস্তার অধিক না পৌছিতে পারে, তাহা হইলে চাওয়া ও যোগানের (demand and supply) নিয়মানুসারে মূল্যবৃদ্ধি হইবারই কথা। ইহাতে দোকানদারদিগের কম কাপড় বিক্রয় করিতে হইতেছে, এবং তাহা তাহাদিগের অধিক পরিমাণ কাপড় বিক্রয়ের লাভ কোনরূপে পোষাইতেছে, বড় জোর এতদূর পর্য্যন্ত ধরিয়া লওয়া যায়। কিন্তু তাহারা কাপড়ের ব্যবসায়ে speculation করিয়া অত্যধিক লাভ করিতেছে, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। বরং তাহাদের ব্যবসায়ে এই রেলবিভ্রাটের জন্য এরূপ অসুবিধা ঘটিয়াছে যে তাহাদের লাভের পরিমাণ যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে এরূপ সিদ্ধান্ত করাও অসঙ্গত নয়।

চরকার প্রচলন।

উপরোক্ত নানা কারণে কার্পাস বস্ত্রের দাম চড়িয়াছে এবং লোকের কষ্টের সীমা নাই। এমন উপায় কি? একদল বলিতেছেন, বাঙ্গলাদেশে বরাবর চরকায় সুতা কাটিয়া তাঁতিরা কাপড়ে লজ্জা নিবারণ করিয়াছে,

এখনও তাহাই করিবে। বাস্তবিক অনেক স্থলে চরকার প্রচলনের খুব চেষ্টা হইতেছে। ময়মনসিংহ জেলাতেই বিশেষভাবে খুব চরকায় সূতাকাটা শিক্ষা দেওয়ার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। এমন কি সেখানকার মেয়েদের হাইস্কুলে পর্য্যাপ্ত চরকার প্রচলন চেষ্টা হইতেছে। স্কুলের সুযোগ্য হেড মিষ্ট্রেস মিস্ বোস্ এই কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেছেন। স্বয়ং গভর্ণর লর্ড রোনাল্ডশে মহোদয় চরকা প্রচলনের চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে সাময়িক একটু সুবিধা যে না হইবে তাহা নহে। চরকার সূতায় তাঁতের কাপড় মিলের কাপড় হইতে কিছু সস্তা এবং টেকসই হইতে পারে সন্দেহ নাই এবং গরীবের পক্ষে ঐ কাপড় ব্যবহার করা অসুবিধা-জনকও হইবে না। কিন্তু চরকায় সূতা করিতে হইলে দেশে প্রচুর কার্পাসের চাষের প্রয়োজন এবং তুলার বাজারে যে ভয়ানক speculation চলিতেছে তাহা বন্ধ করা দরকার। নতুবা তুলার বর্ত্তমান বাজারে চরকার সূতায় যে দুই চারিখানি কাপড় প্রস্তুত হইবে, তাহাও আশানুরূপ সস্তা হইবে মনে করি না। বর্ত্তমান কর্ম্মের এবং ব্যস্ততার যুগে দায়ে পড়িয়া কয়েকজন চরকা ধরিলেও যে ব্যাপক ভাবে উহা প্রচলন করিতে পারা যাইবে এরূপ মনে হয় না। কারণ যাহারা আর কিছুই জানে না, তাহাদের পক্ষেই চরকায় সূতা কাটার মজুরী পোষাইবে। একটু উন্নততর শিল্পে কিম্বা অপর কার্য্যে পারদর্শী কেহ চরকায় সূতা কাটিয়া যে সময় ব্যয় করিবে, ঐ সময়ে অন্য কাজে তাহা অপেক্ষা বেশী উপার্জ্জন করিতে পারিবে। আর যদি চরকায় উপার্জ্জন তদপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে চরকায় উৎপন্ন সূতায় প্রস্তুত কাপড় মিলের কাপড় হইতে সস্তায় হইতে পারিবে না। সুতরাং অর্থ-নৈতিক নিয়মের ফলে চরকা আবার প্রচলিত হইতে পারিবে এরূপ আশা করিতে পারি না। উদাহরণ স্বরূপ বর্ত্তমানে মিস্ বোসের যে সকল ছাত্রী এখন চরকায় সূতা কাটা শিখিতেছেন, ইহার পরে domestic economyর দিক হইতে তাহাদের কাহারই এ কাজ পোষাইবে না।

চরকার স্থায়ীত্ব।

চরকার প্রচলনের কথা বলিতে গেলে স্বতঃই মনে আসে যে চরকা বাঙ্গলার এবং ভারতের অনেক স্থানের ঘরে ঘরে এক সময় চলিত, তাহা উঠিয়া গেল কেন? উহার উত্তর সকলেই জানেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীর কলকারখানার প্রতিযোগিতার মধ্যে বিশেষ অনুকূল কোনও কারণ ব্যতীত আদিম কালের প্রাথমিক যন্ত্রাদি কোনরূপেই টিকিতে পারে না। এ বিশেষ কারণ নানারূপে ঘটিতে পারে। এই কারণেই চরকা উঠিয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমান যুদ্ধের "বিশেষ কারণে" কয়েক দিন আবার চরকা চলিতে পারে। যুদ্ধের পর পৃথিবীর অর্থনৈতিক অবস্থা স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইলেই আবার উহা উঠিয়া যাইবে। উন্নতর প্রণালীতে গৃহশিল্প (Cottage Industry) রূপে সূতা প্রস্তুতের কাজ কিরূপে চলিতে পারে তাহা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি।* সুতরাং চরকা স্থায়ীভাবে প্রচলনের চেষ্টা সফল হইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। তবুও বর্ত্তমান দুর্দ্দশার সময় ইহাতে যে অনেক উপকার করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। যে কোন ভাবে যে কোন স্থল হইতে দেশে যে পরিমাণ বস্ত্রাধিক্য ঘটাইতে পারা যাইবে, তাহাতেই সেই পরিমাণ বস্ত্রসমস্যার মীমাংসার পথ হইবে। তবে চরকার সূতায় দেশী তাঁতের বস্ত্র যথেষ্ট পরিমাণে আমদানী হইবার পূর্ব্বে যদি যুদ্ধ থামিয়া যায়, তাহা হইলে গৃহশিল্পরূপেও চরকাকে বাচাইতে পারা যাইবে না এবং বর্ত্তমান সমস্ত আয়োজন বৃথা যাইবে, এ কথা প্রথম হইতেই মনে রাখিয়া এ কার্য্যে ব্রতী হইলে ভাল হয়।

প্রতিকারের উপায়।

আমি উপরে বলিয়াছি যে পৃথিবীর উৎপন্ন তুলার অনেকাংশ সৈনিকগণের বস্ত্রাদিতে এবং যুদ্ধের কার্য্যের জন্য ব্যয়িত হওয়ায় এবং যুদ্ধের জন্য পারিশ্রমিকের হার বাড়িয়া যাওয়াই কার্পাস বস্ত্রের মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ। এই কারণে বাজার চড়ায়, সাধারণ নিয়মেই তুলার এবং কাপড়ের যথেষ্ট পরিমাণে speculation ঘটিয়া এই বর্দ্ধিত মূল্যকে আরও বাড়াইয়া দিয়াছে। আবার বস্ত্রের পরিমাণ ভারতে কম হইয়া যাওয়া 'চাওয়া এবং যোগানের' নিয়মে মূল্যবৃদ্ধির আর এক কারণ ঘটিয়াছে। বস্ত্রের পরিমাণ বাড়াইতে কিম্বা আমাদের আবশ্যকতার পরিমাণ কমাইতে না পারিলে আমাদের কষ্ট নিবারণের উপায় নাই। বর্ত্তমান অবস্থায় দেশে যথেষ্ট পরিমাণে কার্পাসের চাষ বাড়াইয়া বস্ত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি করা বহুদিন সাপেক্ষ। ততদিনে যুদ্ধ মিটিয়া যাইবে। সুতরাং বস্ত্রের ব্যবহার আমরা কমাইতে পারিলে বস্ত্রের মূল্য খুব না কমিলেও আমাদের দুঃখ অনেক কমিতে পারে। কিন্তু কিরূপে ইহার ব্যবহার কমান যায়? পূর্ব্বে বলিয়াছি বস্ত্রের মূল্য যে পরিমাণে বাড়িয়াছে অর্থ-নৈতিক নিয়মে স্বভাবতঃই আমাদের আয়ের সহিত সেই অনুপাতে বস্ত্রের ব্যবহারও কমিয়াছে, তাহাতেই ত যথেষ্ট কষ্ট উপস্থিত। ইহার উপর আবার কি কমান যাইবে?

কিন্তু এখনও বস্ত্রের অনাবশ্যক ব্যবহার আমাদের মধ্যে আছে। এই দুর্দ্দিনে এই অপচয় নিবারণ করিতে হইবে। মিহি কাপড় অল্পদিনে ছিড়িয়া যায়, সুতরাং আমাদিগকে মোটা কাপড় ব্যবহার আরম্ভ করিতে হইবে। অনাবশ্যকীয় কাপড়ের ব্যবহার একবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাহাতে জাতীয় পোষাকের আদর্শের যদি কিছু খর্ব্বতা ঘটে তাহাতে মনোযোগ দিলে চলিবে না।

---

* "A state bank for India"—Modern Review April 1918.

অনাবশ্যক কাপড়।

বাঙ্গালীদের প্রধান পোষাক, ধুতি, চাদর ও কোন প্রকারের জামা। ইহার মধ্যে চাদর সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, সহজেই ইহাকে সকলে পরিত্যাগ করিতে পারেন. এই চাদরে অনেক পরিমাণে সুতার অপচয় হইতেছে। চাদর ছাড়িলে এই সূতার বহু পরিমাণে আবশ্যকীয় বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারিবে। পরিধানের জন্য মিহি ধুতীর স্থানে মোটা কাপড় ব্যবহার করিতে হইবে। অনাবশ্যক কাছাকে উপস্থিত বিদায় দিলে এবং কোচাকে যথেষ্ট পরিমাণে সংক্ষেপ করিয়া আনিতে পারিলে বস্ত্রের অনেক অনাবশ্যক খরচ বাঁচান যাইবে। ভারতের অন্যান্য স্থানের পোষাকেরও এরূপে অনেক সংক্ষেপ করা চলিবে। বাঙ্গালাতে যাহারা এরূপ ভাবে মোটা কাপড় ব্যবহার করিতে অসুবিধা কিম্বা কষ্ট বোধ করিবেন তাহারা মোটা কাপড়ের 'ইজের' ব্যবহার করিতে পারিবেন। কাপড়ের এইরূপ ব্যবহার করিতে পারিলে আমাদের আবশ্যকতার পরিমাণ প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া যাইবে এবং আমাদের আয়ের অবস্থানুসারে আমরা কাপড়ের জন্য যে পরিমাণে অর্থনিয়োগ করিতে সমর্থ সেই অর্থেই কাপড়ের আবশ্যকতার পরিপূরণ ঘটাইয়া আমাদের অনেক কষ্টের উপশম করিবে। সম্ভব হইলে মহিলাদিগের—পরিচ্ছদেও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া বস্ত্র বাচাইতে হইবে এবং যেরূপ পরিচ্ছদই ব্যবহৃত হউক, উহা মোটা কাপড় দ্বারা প্রস্তুত করিতে হইবে। এই মোটা কাপড়ের ব্যবহারে কাপড়ের খরচ কি পরিমাণে কমিতে পারে তাহা ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে একখানি মিহি ধুতি সাধারণতঃ ৩।৪ মাসের অধিককাল টিকে না; কিন্তু একটী মোটা কাপড়ের পেণ্টলান কিম্বা ইজের ২।৩ বৎসর টিকিয় থাকে।

ধনী ও দরিদ্র।

তবে কথা হইতেছে যাহার অর্থ আছে সে কেন এই অসুবিধার মধ্যে যাইবে। পাঁচটাকার স্থলে পনর টাকা দিয়া কাপড় কিনিয়াও সে এই অসুবিধা হইতে মুক্ত থাকিবে। যদিও স্বাভাবিক নিয়মে সে পূর্ব্বাপেক্ষা কম কাপড় কিনিবে কিন্তু অসুবিধা ভোগ করিয়া সে এই নূতন ব্যবস্থার মধ্যে যাইতে চাহিবে না, ফলে ধনী না করিলে দরিদ্রের মধ্যে ইহা একটী হীনতামূলক পরিবর্ত্তন বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং সহজে চলিবে না। এই কারণে এইরূপ পরিবর্ত্তনের জন্য দেশের নেতাগণের পথপ্রদর্শন করিতে হইবে এবং বস্ত্রকষ্ট নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে যে চাঁদা উঠিবে তাহার দ্বারা সাধারণের মধ্যে এইরূপ সংক্ষিপ্ত পোষাক বিতরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঐ অর্থে নানা স্থলে এরূপ পোষাক প্রস্তুত এবং বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিলেও, যাহারা বস্ত্রদান গ্রহণ করিবার হীনতা স্বীকার করিবে না তাহাদিগের পক্ষে সুবিধা হইবে। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে দেশের পদস্থ এবং শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে এবং যাহারা দেশের নায়ক বলিয়া দাবী করেন তাহাদিগকে পথ দেখাইতে হইবে। তাঁহারা এই পোষাক পরিলেই সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ইহা ফ্যাসান হইয়া দাঁড়াইবে।

গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা'র কথা।

গভর্ণমেণ্ট যে ভারতীয় কলগুলির একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তাঁত, মোটা standardised ধুতি ও সাড়ী প্রস্তুতের জন্য নিয়োগ করিতে বাধ্য করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, ঐ ব্যবস্থায় নানা প্রকারের অসুবিধা থাকা সত্বেও উহাতে বস্ত্রসমস্যার মীমাংসার অনেক সাহায্য করিবে। এরূপ কাপড় অনুমান ৪৲ জোড়া বিক্রয় হইলেও গরীবের অনেক সুবিধা হইবে। ইহাতে মিহি ভাল কাপড় ধনীদিগের জন্য অনেক থাকিয়া যাইবে। সুতরাং বিলাতী এবং দেশীয় ভাল কাপড় ইহাতে একটু সস্তা হইতে পারিবে, যদি উহাতে দেশীয় মিলের কতক কার্য্যক্ষমতা এই দিকে ব্যয়িত হওয়ায় সাধারণ ধুতি সাড়ীর পরিমাণ না কমিয়া যায়। বিলাতী কলের উপর কোন প্রকারের হস্তক্ষেপের ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টের নাই; অনুরূপে বিলাতী কাপড়ের আমদানীর উপর হস্তক্ষেপ করিলে উহার আমদানী কমিয়া গিয়া আরও বিভ্রাট ঘটিবে। বিশেষ সেরূপ হস্তক্ষেপও সহজ ব্যাপার নহে, সুতরাং সে বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের কোন ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নহে।

ভারতীয় তুলা।

তুলার বাজার পৃথিবীতে বাড়িয়া অন্যত্র যেরূপ speculation আরম্ভ হইয়াছে, ভারতীয় তুলায়ও, তুলার বীজ মাটীতে পড়ার সময় হইতেই অগ্রবর্ত্তী কণ্ট্রাক্ট প্রভৃতির আকারে ঐরূপ speculation চলিয়া থাকে। গভর্ণমেণ্ট এই speculation বন্ধ করিলে এবং সঙ্গে তুলার রপ্তানী বিষয়ে আবশ্যকীয় পন্থা অবলম্বন করিলে তুলা সস্তা হইয়া কাপড় সুলভ হইতে পারে। নতুবা চড়া তুলার বাজারে নরম কাপড়ের বাজার সম্ভব নহে। কিন্তু ভারতীয় মিলে রপ্তানী বাদে ভারতের আবশ্যকীয় বস্ত্রের এক-তৃতীয়াংশ কাপড়ও উৎপন্ন হয় না। এই মিলগুলি সমস্ত রপ্তানী বন্ধ করিয়া এবং আর সকল কাজ ফেলিয়া যদি কেবল ধুতী ও সাড়ী প্রস্তুত করে তাহা হইলে আমাদের আবশ্যকীয় ধুতী ও সাড়ীর অর্দ্ধেক মাত্র উৎপন্ন করিতে পারে। এরূপ অবস্থায় বিলাতী কাপড় আমাদের অতিশয় আবশ্যক। কিন্তু বিলাতী কাপড়ও অগ্নিমূল্য, তাহার উপর গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতাও চলিবে না সুতরাং উপায় কি?

গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

গভর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা করিতেছেন যে ভারতীয় মিলে যে সকল standardised ধুতী ও সাড়ী প্রস্তুত হইবে তাহা গভর্ণমেণ্ট-ডিপো হইতে কিম্বা লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতাদিগের হাত দিয়া সাধারণের নিকট বিক্রয় করিবেন। মিলকে একটা নির্দ্দিষ্ট লাভ ধরিয়া দিয়া গভর্ণমেণ্ট এই সকল কাপড় গ্রহণ করিবেন এবং বান্ধা মূল্য সাধারণকে বিক্রয় করিবেন। বিলাতী কাপড়ের দাম, তুলার মূল্য এবং পারিশ্রমিকের বৃদ্ধির জন্য, যে পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার উপর কাহারও কোন হাত নাই। "মধ্য ব্যবসায়ীর" speculation এ হস্তক্ষেপ করিতে গেলে যে সকল বিভ্রাট উপস্থিত হইবার কথা তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি. বিলাতী কাপড়ও যথেষ্ট পরিমাণে চাই সুতরাং গভর্ণমেণ্ট এক কাজ করিতে পারেন। অন্যান্য মহাজনদিগের ন্যায় গভর্ণমেণ্ট চলতি মার্কার কাপড়গুলির জন্য ম্যানচেষ্টারের কলওয়ালাদিগের এজেণ্টগণের সহিত কতকগুলি কণ্ট্রাক্ট করুন এবং ঐ কাপড় standardised কাপড়ের ডিপো কিম্বা লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকানে রাখিয়া সামান্য লাভে কিম্বা বিনা লাভে বিক্রয় করিতে থাকুন। তাহা হইলে প্রতিযোগীতায় যতদূর সম্ভব দাম কমিয়া যাইবে এবং মধ্যব্যবসায়ীগণের speculation এর সুবিধা নষ্ট হইয়া কাপড়ের মূল্য স্বাভাবিক অবস্থায় নামিয়া আসিবে। এরূপ করিলে কাপড়ের বাজারে speculation এর জন্য লোকের যে টুকু কষ্ট হইয়াছে তাহা দূর হইয়া যাইবে।

তুলা রপ্তানী।

তবে আসল কথা হইতেছে তুলার বাজার লইয়া। গভর্ণমেণ্ট standardised কাপড়ই করুন আর বস্ত্রের কণ্ট্রোলারই নিযুক্ত করুন, তুলার বাজার সস্তা না করিতে পারিলে লোকের কষ্ট দূর হইবে না। কাপড় কণ্ট্রোল করিবার সঙ্গে সঙ্গে তুলাও কণ্ট্রোল করিতে হইবে। তুলার বাজারে speculation ঘটিয়া যাহাতে তুলার বাজার অযথারূপে চড়িয়া না যায় সে ব্যবস্থা করিতে হইবে। বোম্বাই প্রদেশেই কার্পাসের চাষ হইয়া থাকে সুতরাং ভারত গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে আবশ্যকীয় ব্যবস্থা করিতে বোম্বে গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। দেখা যাক ফল কিরূপ দাড়ায়।

বিদেশে ভারতীয় তুলার রপ্তানীই এই speculation এর প্রধান কারণ। ভারতে যে তুলা উৎপন্ন হয় উহার সমস্ত যদি ভারতেই কাপড় প্রস্তুতে ব্যয়িত হয় এবং ঐ কাপড়ের অন্যত্র রপ্তানী না হয় তাহা হইলে উহাতে ভারতের লজ্জা নিবারণের কাজ একরূপ চলিয়া যায়। কিন্তু বাণিজ্য নীতি ব্যবস্থার জন্য এবং ভারতের কলের তাঁতের অপ্রাচুর্য্যের নিমিত্ত, সেরূপ ব্যবস্থা অসম্ভব। অথচ বর্ত্তমানে তুলা রপ্তানী বন্ধ না করিতে পারিলে যে এ দেশের মিলে সস্তা কাপড় প্রস্তুত হইতে পারিবে এরূপ আশা নাই। এই রপ্তানীর অধিকাংশ জাপানেই হইয়া থাকে। গভর্ণমেণ্টের তরফে এ বিষয়ের উত্তর দেওয়া হয় যে জাপানকে আমরা তুলা না দিলে, জাপানীরা উৎকৃষ্ট আমেরিকার তুলায় প্রস্তুত কার্পাস বস্ত্র যাহা এখন তাহারা ভারতবর্ষে পাঠাইতেছে, তাহা তাহারা পূর্ব্ব-উপদ্বীপের শ্যাম প্রভৃতি দেশে পাঠাইবে। তখন ভারতে কার্পাস বস্ত্রের আমদানী আরও কমিয়া যাইবে। বর্ত্তমানে জাপান, ভারতীয় তুলায় প্রস্তুত দ্বিতীয় শ্রেণীর মাল শ্যাম প্রভৃতি দেশে পাঠাইয়া থাকে। ভারতীয় তুলা না পাইলে উহারা আমেরিকার তুলায় প্রস্তুত প্রথম শ্রেণীর মাল সেখানে পাঠাইতে বাধ্য হইবে ইত্যাদি।

কথাটা একেবারে ভিত্তিহীন না হইলেও আমরা বুঝিতে অক্ষম, কেন আমরা সুলভবস্ত্র প্রাপ্তির আশায় এই দুর্দ্দিনেও আমাদের কাঁচা মাল তাহাদিগকে দিব। গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে ভারতীয় মিলগুলিতে তাঁতের পরিমাণ অনেক বাড়াইয়া দিতে পারেন এবং দেশের তুলা দেশে রাখিয়া সস্তা মোটা কাপড় প্রস্তুতের সুযোগ করিয়া দিয়া আমাদের ক্লেশ নিবারণ করিতে পারেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যাহাই বলুন এই কথা ভিন্ন ইহার অপর কারণও আছে। রাজনৈতিক কারণে এখন আমরা জাপানকে তুলা দিব না এ কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারি না। জাপান আমাদের বন্ধু; বাণিজ্যনীতি তাহার সহিত বান্ধা আছে। হঠাৎ সে নীতি উল্টাইয়া ফেলা সম্ভব নয়। আর কৌশলে নীতির পরিহারের উপায় হইলেও ভারত গভর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতা কোথায়? Fiscal policy বিষয়ে ভারত গভর্ণমেণ্ট স্বাধীন নহেন। এ বিষয়ে ইংলণ্ডের মত না লইয়া গভর্ণণ্টের কিছু করিবার উপায় নাই। বাণিজ্যনীতির একটা গুরুতর পরিবর্ত্তন করিতে বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের মন্ত্রী-সভা মত দিবেন না। এ বিষয়ে ভারত গভর্ণমেণ্ট কিরূপ ইংলণ্ডের মুখাপেক্ষী তাহা অন্য প্রবন্ধে সবিস্তারে বলিয়াছি। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের বিশেষ কোন আশা নাই। তবে গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে যে এই রপ্তানী সীমাবদ্ধ এবং নিয়মিত করিতে পারেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতীয় মিলের অসুবিধা।

পূর্ব্বোক্ত standardised কাপড়ে গরীবের কিছু সুবিধা হইতে পারে কিন্তু অনেক বৎসর পরে ভারতীয় মিলগুলি কেবল লাভ চ'খে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল—ইহাতে লাভের কিছু ব্যাঘাত ঘটিবে। অবশ্য যুদ্ধের জন্যই উহারা খুব লাভ করিতেছে, সুতরাং যাহারা যুদ্ধের জন্য লোকসান দিতেছে তাহাদের সুবিধার জন্য উহাদিগকে লাভের এক

অংশ পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু এই মিলগুলি বলিতে পারে এবং সেরূপ বলা অন্যায় হইবে না, যে পাটের কল, লোহার কারখানা প্রভৃতি যুদ্ধের জন্য তাহাদিগের হইতে অনেক অধিক লাভ করিতেছে সুতরাং তাহারা কেন, যাহারা লোকসান দিতেছে তাহাদিগের জন্য, তাহাদের লাভের অংশ ব্যয় করিবে না। সাধারণ প্রজা, বিশেষ বাঙ্গালার লোক, যুদ্ধের জন্য তাহাদিগের কাঁচা মালের দাম কমিয়া যাওয়ায়, অত্যধিক লোকসান দিতেছে এবং তার উপরে—কাপড় এবং অন্যান্য অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য অতিশয় চড়িয়া যাওয়ায় অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। সুতরাং প্রজার বস্ত্র-কষ্ট নিবারণের জন্য গভর্ণমেণ্টের যে অর্থ ব্যয়ের আবশ্যকতা হয় তাহা এই যুদ্ধে লাভবান ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতেই সংগৃহীত হওয়া কর্ত্তব্য।

এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

আর এক কাজ করিলে গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে কাপড়ের কলওয়ালাদিগের লোকসান কিছু পোষাইয়া দিতে পারেন। বর্ত্তমান আইন অনুসারে এই সকল কল যে কয়েক ঘণ্টা কাজ করিতে পারে, আইন পরিবর্ত্তন করিয়া তদপেক্ষা ৩।৪ ঘণ্টা অধিক কাজ করিবার অনুমতি তাহাদিগকে দেওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলেও সময়ের অতিরিক্ত কাজে standardised কাপড় প্রস্তুতের সময়টা পোষাইয়া যায়। নতুবা standardised কাপড় প্রস্তুতের জন্য সাধারণ কাপড় কম প্রস্তুত হইবে, তাহাতে বাজারে সাধারণ কাপড়ের পরিমাণ কমিয়া গিয়া ওরূপ কাপড়ের বাজার চড়িয়া যাওয়াও আশ্চর্য্য নহে।

কার্পাসের সূতা রপ্তানী বিষয়েও উপরোক্ত কথা খাটে। তুলার বিষয়ে কোন ব্যবস্থা হইলে সূতার বিষয়েও সেই প্রকারের ব্যবস্থার আবশ্যক হইবে। যে সকল নম্বরের সূতায় তাঁতিরা খুব মোটা কাপড় প্রস্তুত করে, ঐ সকল সূতার বিষয় গভর্ণমেণ্ট বোধ করি সহজেই কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন। কোন প্রকারে এই মোটা সূতার বাজার সস্তা করিয়া দিতে পারিলে দেশে মোটা কাপড় সস্তা হইয়া গরীবের উপকার হইতে পারে।

তুলার লাভ।

বোম্বে প্রেসিডেন্সির কৃষকগণ কার্পাসের চাষে অতিশয় লাভবান হইয়াছে। তুলার speculation এবং চড়া মূল্যের জন্য ইহারা আশাতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করিতেছে। ইহাদিগকে উপযুক্ত পরিমাণে লাভ দিয়া গবর্ণমেণ্ট তুলার মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারেন এবং দেশে সস্তা তুলায় সস্তা কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু রপ্তানী বন্ধ করিতে না পারিলে এরূপ সস্তাদামের ফলে রপ্তানী আরও বাড়িয়া যাইবে এবং অধিক মাল পাঠাইয়া বিদেশ হইতে আমরা অল্প টাকা পাইব। তাহাতে দেশের লোকসান হইবে। সুতরাং তুলার দর বাঁধিয়া দিবার পূর্ব্বে অনেক বিষয় বিবেচনা করিবার আছে। ফলতঃ ভারত-গবর্ণমেণ্টের অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বিদেশে তুলার দাম।

সর্ব্বোপরি আমেরিকার তুলার বাজারের উপরেই আমাদিগকে অনেক পরিমাণে নির্ভর না করিলে চলিবে না। আমেরিকার তুলা চড়িলে সমস্ত পৃথিবীতে বস্ত্রের মূল্য অধিক হইবে। নিউইয়র্কের তুলার বাজারের রিটার্ণ হইতে দেখিতে পাইতেছি বর্ত্তমান বর্ষের আগষ্ট মাসে ১৩৬১৯০০০ বস্তা তুলা বাজারে আমদানীর এষ্টিমেট করা হইয়াছিল কিন্তু সেপ্টেম্বরে যে এষ্টিমেট হইয়াছে তাহাতে ১১১৩৭০০০ বস্তা মাত্র তুলা এ মাসে বাজারে আসিবে দেখা যাইতেছে। গত বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে ১১৯৪৯০০০ বস্তার এষ্টিমেট ছিল; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এ বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে গত বৎসরের ঐ মাস হইতে এবং এ বৎসরের আগষ্ট মাস হইতে তুলার আমদানী কম হইবে। ইহার ফলে আমেরিকার বাজার হঠাৎ চড়িয়া গিয়াছে—সুতরাং এখন বিলাতের সহিত যে অগ্রিম কার্য্য হইবে তাহাতে কণ্ট্রাক্ট আরও চড়া দামে করিতে হইবে। কার্য্যতঃ এ দেশে বিলাতী কাপড়ের দাম আরও চড়িবে। ফলে এ দেশে বিশেষ ব্যবস্থা না করিতে পারিলে এবং সর্ব্বত্র প্রাইভেট সাহায্য কেন্দ্র খুলিয়া সস্তায় বস্ত্র বিক্রয় এবং বস্ত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে আমাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। দেশের যিনি যেরূপ পারেন এই বিপদে সাহায্য করিতে অগ্রসর হউন। এখন হইতে ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে এই বস্ত্র বিভ্রাটে অনেক দুর্ঘটনা ঘটিবে।

গভর্ণমেণ্টের তরফেও এখন হইতে ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। নতুবা শেষে অবস্থা সামলাইতে গভর্ণমেণ্টকে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে এবং প্রজার ক্লেশের ও দুর্দ্দশার সীমা সহিষ্ণুতার মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিবে।

এ বিষয়ে একটু আশার কথাও আছে। তুলার এই স্পেকুলেসনের (speculation) জন্য আমেরিকায়ও বস্ত্রের মূল্য অতিশয় চড়িয়া গিয়াছে এবং সৈনিকদিগের সাজসজ্জার জন্য গভর্ণমেণ্টের খরচ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং গভর্ণমেণ্ট এই speculation নিবারণ করিয়া তুলার বাজার সস্তা করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমেরিকায় সে ব্যবস্থা হইলে এ দেশেও স্বাভাবিক নিয়মে তুলা সস্তা হইবে এবং কাপড়ের মূল্য কমিবে। কিন্তু সঠিক ভাবে এ বিষয়ে কোন কথা বলিবার সময় এখনও আসে নাই। আমাদিগকে অবস্থা পরিবর্ত্তনের অপেক্ষায় থাকিতে হইবে।

বর্ত্তমান আলোচনা হইতে আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত কয়েকটীতে উপস্থিত হইতে পারি—

১। কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধির কারণ প্রধানতঃ—

(ক) পৃথিবীর তুলার অনেকাংশ সৈনিকগণের সাজ-সজ্জা প্রস্তুতে যাইতেছে। অনেক তুলা "গণ কটন" প্রভৃতি যুদ্ধের উপকরণ প্রস্তুতে ব্যয়িত হইতেছে।

(খ) যুদ্ধের জন্য ইংলণ্ডে পারিশ্রমিকের হার অতিশয় বাড়িয়া গিয়াছে।

(গ) জাহাজ ভাড়া অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে ও নিয়মিত ভাবে জাহাজ পাওয়া যাইতেছে না।

(ঘ) ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়ামের হারও খুব চড়িয়াছে।

(ঙ) বিলাতী বস্ত্রের উপর এ দেশে সামান্য কিছু ট্যাক্স বসিয়াছে।

(চ) বাজার ক্রমবর্দ্ধনশীল হওয়ায় "মধ্যব্যবসায়ী-" গণের speculation খুব চলিতেছে।

(ছ) তুলার মূল্য চড়িয়া যাওয়ায় পৃথিবীতে তুলার বাজারে ভয়ানক speculation চলিতেছে।

২। গবর্ণমেণ্ট standardised ধুতি, সাড়ী প্রস্তুত করিয়া নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করিবার যে ব্যবস্থা করিতেছেন উহাতে গরীব এবং মধ্যবিত্তের কিছু সুবিধা হইবে বটে। কিন্তু ঐ ধুতি এবং সাড়ীও আশানুরূপ সস্তা হইতে পারিবে না।

৩। "মধ্যব্যবসায়ী" বা মহাজনগণের speculation কাপড়ের দর বৃদ্ধির সর্ব্বপ্রধান এবং একমাত্র কারণ নহে।

৪। "মধ্যব্যবসায়ী" দিগকে উঠাইয়া দিলে কাপড়ের বাজারে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইতে পারে।

৫। বিলাতী কাপড়ের দর বাঁধিয়া দেওয়া নানা কারণে সম্ভবপর নহে। উহাতে বিপরীত ফল হইতে পারে।

৬। বস্ত্রসমস্যার মীমাংসায় গবর্ণমেণ্টের সাধারণ দুর্ভিক্ষ নীতি অবলম্বিত হইতে পারে না।

৭। বিলাতী মিলের উপর কোনরূপ ব্যবস্থা চালাইবার ক্ষমতা ভারতগবর্ণমেণ্টের নাই।

৮। গভর্ণমেণ্টের এই ক্ষমতা না থাকায় গভর্ণমেণ্টকে ঐ সকল কল কণ্ট্রোল (control) করিতে বলায় কোন ফল হইবে না।

৯। দল বাঁধিয়া কাপড় কেনা বন্ধ করিয়া কপড়ের দাম সস্তা করা সম্ভব নয়। এই ব্যাপারে ধর্ম্মঘট চলিবে না।

১০। দীন দুঃখীর বস্ত্রক্লেশ নিবারণের জন্য দেশের সর্ব্বত্র সাহায্য ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, সকলেই এই ভাণ্ডারে অর্থ কিম্বা বস্ত্র সাহায্য প্রদান করা আবশ্যক।

১১। গরীব ভদ্রলোকে এরূপ সাহায্য গ্রহণ করিবে না, তাহাদিগের নিমিত্ত সস্তায় বস্ত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১২। বাজারে পূর্ব্বে সস্তা দামে ক্রীত কাপড় অনেক মজুত আছে এরূপ অনুমানের কোন সঙ্গত কারণ নাই। কিছু কাপড় মজুত থাকিলেও তাহাতে বর্ত্তমান বাজার কিছু নরম করিয়া রাখিবারই কথা।

১৩। রেল বিভ্রাটই মফঃস্বলের অনেক স্থলের ভয়ানক মূল্য বৃদ্ধির কারণ। মফঃস্বলের দোকানদারগণ অত্যধিক পরিমাণে লাভ করিতেছে এরূপ অনুমানের কারণ নাই।

১৪। চরকায় হাতে সূতা কাটা সাময়িকভাবে চলিলেও স্থায়ীভাবে চরকা চালান সম্ভবপর নহে।

১৫। কার্পাস তুলার ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল মূল্যই উহাতে এরূপ speculation ঘটাইবার কারণ। আমেরিকা ও ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট উহা ইচ্ছা করিলে বন্ধ করিতে পারেন।

১৬। আমাদের বস্ত্রের ব্যবহার কমাইতে পারিলে ক্লেশের লাঘব হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে সামাজিক ভাবে standard পোষাক প্রচলিত করিতে পারিলে ভাল হয়।

১৭। বিলাতী বস্ত্র না হইলে কেবল এ দেশের উৎপন্ন কাপড়ে আমাদের আবশ্যকতার অর্দ্ধেক মাত্র এখন পরিপূর্ণ হইতে পারে।

১৮। এ দেশে তুলার speculation বন্ধ কিম্বা নিয়মিত করিতে না পারিলে এ দেশে সস্তা কাপড় হইতে পারে না।

১৯। তুলা রপ্তানী একেবারে বন্ধ করা অসম্ভব হইলেও অন্যরূপ ব্যবস্থার দ্বারা গভর্ণমেণ্টের এ কার্য্য নিয়মিত করা আবশ্যক।

২০। বিলাতী কাপড়ে speculation নষ্ট করিয়া দর কমাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের বিলাতী কাপড়ের এজেণ্ট গণের সহিত কণ্ট্রাক্ট করিয়া উহা আপনাদের ডিপোতে রাখিয়া কিম্বা লাইসেন্স প্রাপ্ত ক্রেতাদিগের হাত দিয়া সাধারণের নিকট বিক্রয়ের ব্যবস্থা গভমেণ্টের করা উচিত।

২১। Standardised কাপড় প্রস্তুতের জন্য ভারতীয় মিলের উপর যে indirect taxation হইতেছে পাটের কল, লোহার কারখানা প্রভৃতিকে এই ট্যাক্স হইতে মুক্ত রাখা সমদর্শিতামূলক নীতির অনুরূপ হইবে না।

২২। ভারতীয় মিলকে অতিরিক্ত সময় কাজ করি-বার অনুমতি দিয়া—গবর্ণমেণ্ট তাহাদের এই লোকসান পোষাইয়া দিতে পারেন।

২৩। তুলার বিষয়ে কোন ব্যবস্থা হইলে সূতার বিষয়ও তদনুরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন হইবে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র।

আনন্দোৎসব।

(১)

নীল-সাগর টুটে—
মেঘ পড়িল লুটে ;
হের গগন পটে—উঠে নবীন ভাতি।
ওই ধরণী রাণী
জাগে নয়ন মাজি ;
ব্যথা বক্ষে বহি
কেগো সুপ্ত আজি ?

আঁখি জলে মাখি—
ওঠ আলোয়ে জাগি ;
আজি পোহাইল ধরণীর দুঃখ-রাতি।
বন-কক্ষ ঘিরি
গাহে লক্ষ অলি ;
মধু বক্ষে ভরি
ফুটে শিউলি কলি।

ধান ক্ষেতের কূলে,
আশা-তটিনী দুলে ;
হের লক্ষ্মী রেখেছে—ভূমে আঁচল পাতি।
কালো আঁধার টুটে—
আলো উঠেছে ফুটে ;
প্রাণ-বন্ধু ওগো—জাগো পুলকে মাতি॥

(২)

সুধা সাগর দহি ;
সুধা-গাগরী বহি ;
এস নন্দন-বন-প্রাণ নন্দ রাণী।
আজি শস্য হিয়া
প্রেম পুণ্য ভরা ;
প্রীতি পবিত-রাখী
সবে পরায় ধরা।

হেম পল্লী মাঝে,
শোন নূপুর বাজে ;
ওই রুণু ঝুনু রুণু—প্রেমময় বাণী।
শত স্বরগ-পরী
ফুটে উঠেছে ফুলে ;—
লীলা-তটিনী বুকে
ধরা-তরণী দুলে।

শিশু পুলকে হারা,
ঝরে হাসির ধারা ;
আজি আলোকে ভরা ধরা-চিত্ত খানি।
শুভ শারদ প্রাতে
মৃদু মন্দ বাতে ;
এস নন্দন-বন মধু-নন্দ রাণী॥

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

বিবাহ বন্ধন।

(২)

গত সংখ্যায় এই প্রসঙ্গে আমরা দুইদিকের মূল দুইটি কথার অবতারণা করিয়াছি। প্রথম কথা এই যে পৃথিবীর প্রায় সকল উন্নত মানবসমাজেই স্ত্রী-পুরুষের বৈবাহিক মিলন বহুদায়িত্বপূর্ণ দুশ্ছেদ্য বন্ধন বলিয়াই স্বীকৃত। মানব সেখানে সমষ্টিবদ্ধ হইয়া বাস করে, ধর্ম্মনীতি ও দণ্ডনীতি সেই সমষ্টিকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশাসিত করিতে প্রয়াস পায়, এবং এই উদ্দেশ্যে ধর্ম্মনীতি ও দণ্ডনীতি—উভয় শক্তিই নর-নারীর এই বৈবাহিক মিলনকে এইরূপ বন্ধনরূপে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং মানব যাহাতে সচ্ছন্দে এই বন্ধনকে স্বীকার করিয়া নেয়, সন্তুষ্টচিত্তে ইহার বশীভূত থাকে, তার জন্যও ধর্ম্মনীতি বহু উপায় অবলম্বন করিয়াছে।

দ্বিতীয় কথা এই যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নিতান্ত পক্ষপাতী নবীন এই যুগে নূতন এক মতবাদের প্রাদুর্ভাব হইতেছে, যাহা কোনরূপ বন্ধনেই আনবাত্মার স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করার একান্ত বিরোধী। এই মতবাদীদের মূল কথা এই যে মানবাত্মা স্বভাবমুক্ত এবং স্বাধীন, স্বাধীনভাবে আপন আপন ব্যক্তিত্ব পথে সে সম্যক্ উন্নতিলাভ করিবে, স্বাভাবিক সকল অধিকার ভোগ করিবে। বন্ধন তাহার উন্নতির পথে, অধিকার ভোগের বাধা দেয়, তাহাকে হীন করিয়া রাখে, সুতরাং সকল বন্ধন হইতে তাকে মুক্ত থাকিতে হইবে। স্ত্রী-পুরুষের বৈবাহিক মিলন দাম্পত্য প্রেমের সম্যক্ ও সার্থক উপভোগের জন্য। দুইজনে সুখে মিলিয়া থাকিতে হইলে সকলের আগে পরস্পরের প্রতি সরল সহজ একটা প্রেমের আকর্ষণ চাই,—ভাবের ও চিন্তার সমতায়—প্রাণে প্রাণে সেই সমতার সম্যক্ পরিচয়ে পর-

পরের প্রতি আন্তরিক একটা শ্রদ্ধা চাই। আর সকলকে ফেলিয়া—আর কাহাকেও না চাহিয়া দুইজনে কেবল দুই-জনকেই চায়—এমন একটা অন্তরঙ্গ ভাব হওয়া চাই। আর কোনও বিবেচনায় নয়—আর কোনও সুখসুবিধার জন্য নয়,—দুইজন দুইজনকে সব চেয়ে বেশী ভাল বাসিল, দুইজনের দুইজনকে সব চেয়ে বেশী ভাল লাগিল, সবচেয়ে ভালবসিয়াই শুধু স্বাধীন অবাধ ইচ্ছায় দুইজনকে দুইজনে বাছিয়া নিতে পারিল।—এমন যদি হয়, তবেই এই মিলন হইতে পারে,—না যদি হয়, তবে সে মিলনে প্রকৃত বিবাহ হয় না। এবং সেই মিলনে স্ত্রী পুরুষকে বাঁধিয়া রাখা অতি গ্লানিকর আত্মার অবনতিকর দুঃখ বই আনন্দ কিছু হইতে পারে না। বন্ধনের কঠোরতা পুরুষ অপেক্ষা নারীকেই অধিক বহিতে হয়, সুতরাং গ্লানি ও ক্ষতি নারীকেই অধিক সহিতে হয়। এই নব্যমতের প্রধান পাশ্চাত্য কবি ইবসনের দুইখানি প্রসিদ্ধ নাটক হইতে এ সম্বন্ধে দুইটি নারীর দৃষ্টান্তও গত সংখ্যায় প্রসঙ্গক্রমে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই দুই নারী Doll's House বা 'পুতুলঘর' নাটকের নায়িকা নোরা এবং The lady from the Sea অথবা 'সাগরকামিনী' নাটকের নায়িকা এলিডা। আট বৎসর স্বামীর স্নেহে ও আদরে স্বামীর ঘর করিয়া স্বামীর তিনটি সন্তান গর্ভে ধরিয়া সহসা কোনও অপ্রীতিকর ঘটনায় নোরার মনে হইল, স্বামী তাহাকে লইয়া এতদিন চিত্তবিনোদনের প্রধান অবলম্বন স্বরূপ পুতুলের মত খেলা করিয়াছেন মাত্র, যার জন্য হেলায় সর্ব্বস্ব ত্যাগ করা যায়—এমন প্রেম দিয়া তাকে ভালবাসেন নাই। এতদিন বড় একটা ভুলে সে মুগ্ধ ছিল। এখন দেখিল, স্বামীর প্রাণের প্রকৃত পরিচয় সে পায় নাই। তার আত্মমর্য্যাদায় তীব্র আঘাত লাগিল,—স্বামীর সহস্র মিনতি উপেক্ষা করিয়া সে সেই মুহূর্ত্তেই স্বামীর গৃহ ত্যাগ করিয়া গেল। সন্তানদের প্রতি মাতার কোনও কর্ত্তব্যের কথাও বিবেচনা করিল না, যাইবার সময় একবার তাহাদের চক্ষে দেখিয়াও গেল না,—বিদায় পর্য্যন্ত লইল না! কারণ যখন তার ধারণা জন্মিল, স্বামী তাকে ভালবাসেন না, সেও স্বামীকে আর ভালবাসে না, স্বামী তার কাছে যেন একেবারেই অপরিচিত, তখন আত্মমর্য্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধা মানবী হইয়া সে আর কেমন করিয়া সেই স্বামীর ঘরে স্বামীর সঙ্গে থাকিবে। সেই স্বামীর সন্তান যে সে গর্ভে ধারণ করিয়াছে, তার জন্যই তার মনে দারুণ ধিক্কার উপস্থিত হইল।

তারপর এলিডার কথা। এলিডা সাগরতীরে বাস করিত—এক নাবিক তাহার চিত্তকে অদ্ভুত এক মোহে মুগ্ধ করতঃ বিবাহের প্রতিশ্রুতিতে তাকে আবদ্ধ করিয়াছিল। নাবিক চলিয়া গেল,—বহুদিনের মধ্যে আসিল না। নাবিকের কথা ভাবিতেও এলিডার কেমন ভয় হইত,—সে সেই প্রতিশ্রুতি হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া পত্র লিখিল। একা তখন বড় অসহায় অবস্থায় এলিডা পড়িয়াছিল,—একজন পনস্থ বিপত্নীক ভদ্রলোক তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন,—এলিডা আশ্রয় লাভের আশায় তাঁহাকে বিবাহ করিল। বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই সেই নাবিকের মোহ আবার তার চিত্ত অধিকার করিল। নাবিকও কতদিন পরে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে দাবী করিল। এলিডা পূর্ব্ব হইতেই স্বামীর ঘরে থাকিয়াও স্বামীর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছিল। এখন বিবাহ বন্ধন হইতে একেবারে মুক্তি চাহিল। মুক্ত হইয়া সে বুঝিবে, সে কাকে চায়,—সেই নাবিককে না তার স্বামীকে। স্বামীর সঙ্গে বিবাহের বন্ধন যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ বাছিয়া নিবার স্বাধীনতা তার নাই। স্বামী অনেক বুঝাইলেন,—স্নেহে ও স্বামীর অধিকার বলে নাবিকের অশুভ প্রভাব হইতে তাকে রক্ষা করিতে চাহিলেন। কিন্তু এলিডা কিছুতেই রাজি হইল না,—মুক্তিই প্রার্থনা করিতে লাগিল। সে ভালবাসিয়া বাছিয়া স্বামীর ঘরে আসে নাই, আশ্রয় লাভের আশায় আসিয়াছিল। স্বামীও শূন্য-গৃহ পূর্ণ করিবার আকাঙ্ক্ষায় তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ভালবাসিয়া বাছিয়া নয়। এখন স্বাধীন হইয়া সে বুঝিয়া দেখিবে, কাকে সে সত্য ভালবাসে, কাকে সে সত্য চায়। অগত্যা স্বামী তাহাকে প্রার্থিত মুক্তি দান করিলেন, কারণ এলিডাকে তিনি ভাল বাসিয়াছেন এবং তার সুখশান্তি তিনি চাহেন। তখন এলিডা স্বামীর ভালবাসার পরিচয় পাইয়া নাবিককে ত্যাগ করিয়া স্বামীকেই বাছিয়া নিল। ইহাই হইল, গত সংখ্যায় আলোচিত প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত চুম্বক, বিবাহবন্ধন সম্বন্ধে দুইদিকের মোট দুইটি কথা। ধর্ম্মনীতি, যে ভাবেই ঘটুক, সর্ব্বত্রই প্রায় দাম্পত্যমিলনকে দুশ্ছেদ্য বন্ধনে পরিণত করিতে চাহিয়াছে। মুক্তিবাদীরা এই বন্ধনের বিরোধী, তাহারা চান, এই মিলন এবং মিলনের স্থিতি সম্পূর্ণরূপে প্রেম। পরস্পরের প্রতি প্রেমজাত আসক্তি এবং উভয় পক্ষের অবাধ ইচ্ছার (অর্থাৎ ভাল না লাগিলে ইচ্ছা হইলেই ছাড়িয়া যাইতে পারি বাধা কিছু নাই, কেবল ভাল লাগে বলিয়াই মিলিয়া আছি—এমনই একটা মুক্ত ভাবের) উপরে নির্ভর করে। মানবাত্মার মুক্ত-স্বভাবের অধিকারের দিকে না চাহিয়া, কেবল ধর্ম্মনীতির বা দণ্ডনীতির কঠোর বিধানে যেখানে দাম্পত্য বন্ধনে নর-নারীকে বাঁধিয়া রাখা হয়, সেখানে অবমানিত আত্মা বিদ্রোহী হইয়া আপন মর্য্যাদা রক্ষা করিতে উদ্যত হইতে চায়। বন্ধন যখন নারীর পক্ষেই অধিকতর কঠোর, তখন এই বিদ্রোহ নারীতেই প্রথমে ও প্রধান ভাবে প্রকাশ পাইবে। নোরা এবং এলিডার দৃষ্টান্ত নারীর সেই বিদ্রোহেরই দৃষ্টান্ত।

স্বাধীনতার মহিমাব্যঞ্জক কাব্যের নায়িকার হিসাবে নোরা ও এলিডার দৃষ্টান্ত যতই চিত্তগ্রাহী হউক, বাস্তব এই

জগতে—বাস্তব সাংসারিক ও সামাজিক জীবনে এই আদর্শ গৃহীত হইলে কয়টি নরনারী দাম্পত্যসম্বন্ধে মিলিত হইয়া থাকিতে পারে, এই মিলনে কয়টি সংসারের স্থিতি এই মানবসমাজে সম্ভব হইতে পারে, তাহা সাধারণ মানব-চরিত্রে অভিজ্ঞ পাঠকপাঠিকাবর্গ নিজেরাই বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

অবশ্য নোরা কি এলিডাকে মহাপাপিনী বলিয়া জাহান্নামে দিতেছি না। নীচ কোনও প্রলোভনের বশে নোরা স্বামীর গৃহ ত্যাগ করিয়া যায় নাই।—এলিডাও সেরূপ কোনও নীচ উদ্দেশ্যে স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহে নাই। যে ভাবের অভিব্যক্তি কবি এই দুইটি নায়িকার চরিত্রে দেখাইতে চাহিয়াছেন, সেই ভাবটিকেই বড় করিয়া ধরিলে, চরিত্র দুইটিও বেশ চিত্তগ্রাহী বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু বাস্তব এই সংসারে মানুষ কেবল কাব্যের এক একটি ভাবের মানুষ হইয়াই চলিতে পারে না। অনেক দিকের অনেক কাজ, অনেক ধর্ম্ম, অনেক দায়িত্ব অনেক কর্ত্তব্য তার আছে। সেই বাস্তব জীবনের মধ্যে আনিলে, নোরা ও এলিডার সম্বন্ধে এ কথা বলা যাইতে পারে, এক একটা বড় বাই তাহাদের ঘাড়ে চাপিয়াছিল,—এই বাই কাব্যে মনোরম বর্ণে চিত্রিত করা যায়, সংসারে চলে না। কেহ কেহ বলিতে পারেন, সংসারের নীতির ধার কবি ধারেন না, নীতিশাস্ত্রকারেরা তাহা লইয়া থাকুন। কবি নীতিশাস্ত্রকার বা নীতিশিক্ষক নহেন। তিনি ভাবের খেলা দেখাইবেন, রসের সৃষ্টি করিবেন, সেই রসের উপভোগে কাব্যরসিক পরিতৃপ্ত হইবে। বড় একটা শক্ত তর্কের কথা আসিয়া পড়িল। অধুনা বাঙ্গলা মাসিক সাহিত্যে যাহা লইয়া বেজায় তোলপাড় আরম্ভ হইয়াছে। এই প্রবন্ধে সেই তুমুল তরঙ্গভঙ্গে আমরা ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারি না। তবে সংক্ষেপে এই কথাটা বলা যাইতে পারে যে, কবি নীতিশাস্ত্রকার বা নীতিশিক্ষক না হউন, সুনীতি-বিদ্রোহও তাহাকে শোভা পায় না, তাঁহার পক্ষে উচিত কর্ম্মও হয় না। তিনি কেবল কবি নন, মানবও বটেন। মানব বলিয়া মানবসমাজের নিকট তাঁহার একটা দায়িত্বও আছে। যাহারা কাব্য পড়ে, তাহারা তখনকার মত রসটুকু পান করিয়াই তাহা উগারিয়া ফেলে না,—সেই রস তাহাদের মনঃশরীরে পরিব্যাপ্ত হয়, রসের প্রভাব তাহাদের ভাব ও চিন্তার গতিকে বহুপরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে, তাহাদের জীবননীতিও সেই অনুসারে পরিবর্ত্তিত ও পরিচালিত হয়। সুতরাং কেবল রসের স্রষ্টা বলিয়াই তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না,—পাঠকের জীবননীতির উপরে তাঁহার কাব্য অন্ততঃ পরোক্ষভাবেও যে প্রভাব বিস্তার করে, তাহার জন্য তাঁহার দায়িত্ব বড় কম নয়। তারপর ইবসেন প্রমুখ কবিগণ কেবল রসের বা ভাবের কবি নন,—কেবল Artist তাঁহারা নন, তাঁহাদের কাব্যের বড় একটা উদ্দেশ্যও আছে। তাঁহারা পুরাতন সমাজনীতির সকল বন্ধনের বিরুদ্ধে নূতন এই মুক্তিবাদের মহিমা প্রচার করিতে চান। সুতরাং সমাজ-নীতির পক্ষ হইতে ইহার আলোচনা নিতান্ত আবশ্যক বই কি?

আমাদের মধ্যে অনেকের একটা ধারণা আছে এই যে পাশ্চাত্য সমাজ বুঝি এই নূতন মতে একেবারেই মাতিয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য জগৎ উন্নত সভ্য জগৎ, এই স্বাধীনতার মতবাদ সেখানে চলিয়াছে, তার প্রভাবেই আবার সে সমাজ উন্নতিতে এত দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং আমরাও কেন সকল নীতির বন্ধন (ইঁহারা ইহাকে বিধি-নিষেধের বন্ধন বলেন) ভাঙ্গিয়া তাহাদের সমান হইয়া উঠিব না? কিন্তু এ ধারণা বড় ভুল ধারণা। পাশ্চাত্য সমাজের স্থিতিশীলতা (conservatism) নিতান্ত কম নয়। রাষ্ট্রীয়-ক্ষেত্রে যতই সাম্য ও স্বাধীনতার প্রভাব দেখা যাউক, সমাজ মোটের উপর পুরুষপরম্পরাগত সুপ্রতিষ্ঠিত নীতির বিধান ও বন্ধন মানিয়াই চলিতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে সাফ্রাগেট সম্প্রদায়ের নারীগণের প্রচণ্ড উৎপাত ইহার একটি প্রমাণ। প্রাচীন নীতি খুব শক্ত ভাবেই আপন প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিয়া চলিতে চায় বলিয়াই সাফ্রাগেট চণ্ডীদের এই উৎপাত সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। ইংলণ্ডের প্রায় লোকই ইহাদের ভাল চক্ষে দেখে নাই,—সমগ্র নারীসংখ্যার তুলনায় ইহাদের সংখ্যাও নগণ্য।

কিছু দিন পূর্ব্বে বিখ্যাত নর্ত্তকী মড্ এলানের মানহানির মোকদ্দমার বিবরণ ইংরেজি কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইনি দেহের বিবসন সৌন্দর্য্য দেখাইয়া নানা স্থানে নৃত্য করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারতেও আসিয়াছিলেন। ভারতপ্রবাসী ইংরেজ-সম্প্রদায় বিশেষ আপত্তি করায় ইনি বিবসননৃত্য এদেশে দেখান নাই। অস্কার ওয়াইল্ড বর্ত্তমান যুগের বড় একজন রসের কবি, অর্থাৎ বন্ধনমুক্ত Artist। ইঁহার মতে কাব্যে সুনীতি কুনীতি বলিয়া কোনও কথা থাকিতে পারে না,—কেবল দেখিতে হইবে কাব্যে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা সরস কি নীরস। অস্কার ওয়াইল্ডের মত শ্রেষ্ঠ একজন রসজ্ঞ রস-পারদর্শীর মত বলিয়া—সাহিত্যে অরসিক সুনীতি-বাদীদের যেন স্তব্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই—সম্প্রতি কোনও কোনও বাঙ্গলা মাসিকে উদ্ধৃত হইয়াছে দেখিয়াছি। এই অস্কার ওয়াইল্ডের 'স্যালোমে' নামক নূতন একখানি নাটকের অভিনয় ব্যাপার লইয়া এই মানহানির মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। মড্ এলান এই নাটকে নায়িকা স্যালোমের ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং অতি সরস রঙ্গভঙ্গী সহকারে ভূমিকায় যেন নূতন প্রাণ দিয়া তিনি অভিনয় করেন। ইহা অতি জঘন্য রুচি-পূর্ণ এবং সামাজিক সুনীতির পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর বলিয়া নিন্দিত হওয়ায় মড্ এলান এই মানহানির মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। বিলাতের বহু সুপ্রতিষ্ঠ সুধী ব্যক্তিদের সাক্ষী

থাকিয়া তাঁহাদের অভিমত গ্রহণ করা হয়। সকলেই কেবল স্যালোমে নাটক নয়, অস্কার ওয়াইল্ডের সকল গ্রন্থই সমাজের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর বলিয়া মত প্রকাশ করেন। মড্ এলান মোকদ্দমায় হারেন। রায় যখন বাহির হইল, আদালতে এবং আদালতের বাহিরে যত লোক ছিল, উল্লাসে জয়ধ্বনি করিতে থাকে।

বস্তুতঃ বন্ধনমুক্ত আর্ট বা কাব্য রস সুরুচি ও সুনীতির সীমা ছাড়াইয়া যে কতদূর যাইতে পারে, অস্কার ওয়াইল্ডের গ্রন্থ সম্বন্ধে সাক্ষীদের অভিমত পড়িয়া কতকটা তার ধারণা করা যাইতে পারে। সাহিত্যে নীতি চাই না নীতি চাই না—এ সব বন্ধন হইতে সাহিত্য মুক্ত হউক মুক্ত হউক, অবাধে স্বাধীনভাবে আপনাকে প্রকাশ করুক, এ কথাগুলি শুনিতেও বেশ, বলিতেও বেশ। কিন্তু বন্ধনমুক্ত কাব্য যদি একেবারে উদ্ভ্রান্ত হইয়া চ'লে, মানবজীবনের যত কিছু কুৎসিৎ ব্যাপার আছে—যা সমাজের মঙ্গলে বা লোকলজ্জায় লোকে আড়ালে ঢাকিয়াই চলিতে চায়—সব যদি খোলাখুলি ভাবে—প্রতিভার বলে অতি সরস করিয়া, বাহারের রঙ চড়াইয়া কোনও কবি চিত্রিত করিতে থাকেন,—কি বলিয়া তাহাদের বাধা দিবে? সেই সব প'ড়িয়া যদি ছেলেমেয়েরা একেবারে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যা খুসী তাই করিতে থাকে, কেমন করিয়া তা ঠেকাইবে? বন্ধন ত তোমরা মানিতে চাও না, কি দিয়া কাকে বাঁধিবে? —বলিবে, কবি অত খারাপ কিছু লিখিতে পারেন না। খারাপ? কাব্যে আবার খারাপ কি? কাব্যের কথা সরস হইলেই হইল। যা সরস, কাব্যে যে তাহাই ভাল। তোমাদের বড় একজন রসগুরু—আর্টের বড় একজন authority—স্বয়ং অস্কার ওয়াইল্ডই যে তাহা বলিয়াছেন। সেই গুরু যে এমনই সব কাব্য লিখিয়াছেন! ইংরেজ সামাজিকগণ তাহা অতি নিন্দনীয় বলিলেও, তোমরা বলিতে চাহিবে কি?

কথায় কথায় বোধ হয় কিছু অবান্তর কথার মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। ইবসেন আর বিবাহবন্ধনের কথা হইতেছিল। যতদূর জানি ইবসেনের মধ্যে অস্কার ওয়াইল্ডের মত অমন কুৎসিত ভাব কিছু নাই। তিনি সাধারণ ভাবে মানবের স্বাধীনতার মর্য্যাদার পক্ষে বিবাহবন্ধনের বিরোধী—কুৎসিৎ ইন্দ্রিয়লালসা-তৃপ্তির কথা তার মধ্যে আনেন নাই।

যাহাহউক, পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি সমাজনীতির পক্ষে এই ইবসেনী বাদের আলোচনা আবশ্যক। সেই আলোচনাই যথাসাধ্য আমরা এখন করিব।

সমাজের স্থিতি * জন্য নীতির বন্ধন আবশ্যক। এই মূল একটি কথা আমাদিগকে প্রথমেই স্বীকার করিয়া নিতে হইবে। সাধারণ মানবচরিত্র যেরূপ, তাহাতে নীতির বন্ধন ব্যতীত সামাজিক স্থিতির পথে তাহাদের রাখা যায় না। অসাধারণ ধীমান্ হও, বুদ্ধিতে সমুন্নত, মঙ্গলবিচারে অভ্রান্ত, মঙ্গলকর সংযমে সুশক্ত, কোনও নীতির বন্ধন যাহাদের জন্য আবশ্যক হয় না—এমন মানব যে পৃথিবীতে একেবারেই দুর্ল্লভ তা বলি না। কিন্তু সুলভও নয়। দুই চারিটি কোথাও কোথাও এমন লোক মিলিলেও পৃথিবীর অধিকাংশ লোকেরই স্বভাব এইরূপ যে যতই শিক্ষায় তাহাদের উন্নতি করিবার চেষ্টা হউক, সকল নীতির বন্ধন হইতে মুক্ত বলিয়া একটা সংস্কার যত তাহাদের মধ্যে জন্মিবে, ততই তাহারা আত্মসর্ব্বস্ব—আপনার সুখসুবিধার জন্য যথেচ্ছাচারী হইবে। এই ব্যক্তিগত যথেচ্ছাচার যত বাড়িবে, সমাজ তত ভাঙ্গিবে। পূর্ণ শক্তিতে যথেচ্ছাচার পূর্ণ মাত্রায় উঠিলে সমাজ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না।

অবশ্য গবর্ণমেণ্ট থাকিলে দণ্ডনীতির বন্ধন সকলকে মানিতে হয়। না মানিলে রাজদণ্ড ভোগ করিতে হয়। কিন্তু দণ্ডনীতি কেবল রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধেই বহু লোককে বাঁধিয়া রাখিতে পারে,—সমাজ গড়িতে কি সমাজ রাখিতে পারে না। সমাজ ধর্ম্মনীতির এবং ধর্ম্মনীতির অবিরোধী পুরুষপরম্পরাগত আচারের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সমাজ-বন্ধনও এই ধর্ম্মনীতির ও আচারের বন্ধন। নীতির ও আচারের সংস্কার বা পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, কিন্তু সমাজের স্থিতি যত দিন আছে, যে প্রকৃতিরই হউক, নীতির ও আচারের বন্ধন থাকিবেই। কারণ এই স্থিতি এই নীতি ও আচারের বন্ধনের উপরেই নির্ভর করে।

সমাজ ব্যক্তির মঙ্গল পরিপন্থী কোনও শত্রু পক্ষ নয়। সকলের অশেষ মঙ্গলের ক্ষেত্র। প্রত্যেক ব্যক্তিই সমাজের কাছে অনেক পাইয়াছে, অনেক মঙ্গলে সমাজের কাছে ঋণী। এই ঋণ তাকে শোধ করিতে হয়, সমাজের স্থিতির অনুকুল নীতির অনুসরণ করিয়া। এই নীতির শাসনে যতটুকু আপনাকে ছাড়িয়া দিতে হয়, এইরূপস্থলে যতটুকু আপনার স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিতে হয় ততটুকুই ব্যক্তির পক্ষ হইতে সমাজের ঋণ পরিশোধ আপনার স্থিতির জন্য সমাজ এই প্রতিদান ব্যক্তির কাছে আদায় করিয়া নেয়, ব্যক্তির স্বেচ্ছা-প্রণোদিত দানের জন্য অপেক্ষা করে না। সকল দেশেই ধর্ম্ম নীতি প্রবর্ত্তক প্রাচীন সমাজ স্থাপক ঋষিগণই এই বিশ্বাস করিয়াছেন। আবার প্রায়শ কালের গতিতে অবস্থা বিশেষে আপনা হইতেই আপনাদের মাঙ্গলিকতায় উদ্ভূত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,—অবস্থার পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিতও

* সমাজ সমাজরূপে থাকিবে, বা রক্ষিত হইবে—ইহাই সমাজের স্থিতি। সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয়—ইহার মধ্যে 'স্থিতির' যে অর্থ, এস্থলে আমরাও স্থিতির সেই অর্থ ধরিয়াছি। এই স্থিতি বলিতে এক ভাবেই চুপ করিয়া থাকা বুঝায় না—ইহা উন্নতির বিরোধী নয়। ক্রমে উন্নত যতই হউক, সমাজের সমাজরূপে থাকা চাই, তাহাই সমাজের স্থিতি।

হইয়াছে। দণ্ডনীতি কতক পরিমাণে ধর্ম্মনীতির পোষক ও রক্ষক। যেখানে এই পোষণ ও রক্ষণের প্রয়োজন দণ্ড-নীতি আপনার দুর্লঙ্ঘ্য শক্তিবলে ধর্ম্মনীতিকে পোষণ ও রক্ষা করিয়াছে। সমাজ স্থিতির অনুকূল নীতিবন্ধনের মধ্যে বিবাহবন্ধন অতি প্রধান একটি বন্ধন। দণ্ডনীতি ও ধর্ম্মনীতি এই বন্ধনকে যেখানে যেরূপ প্রয়োজন আপন শক্তির সহায়তা-দানে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। ধর্ম্ম-নীতি ও দণ্ডনীতি—উভয় শক্তিই নরনারীর বৈবাহিক মিলনকে প্রাচীন কাল হইতেই দুশ্ছেদ্য বন্ধনে পরিণত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। তার কারণ ধর্ম্মনীতি ও দণ্ডনীতির প্রবর্ত্তক যাঁহারা—সকল দেশের সকল সমাজের প্রধান ব্যক্তি যাঁহারা—তাঁহারা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন, সমাজ-স্থিতির পক্ষে এই বন্ধন একেবারেই অপরিহার্য্য। ইঁহাদের এই বিধান লোকের অকল্যাণকর ও ভ্রান্তিমূলক বিধান বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে সকল সমাজেই মূল এক লক্ষ্যের দিকে যদি কোনওরূপ নীতির বন্ধন আমরা দেখিতে পাই, যাহা প্রাচীন কাল হইতে পুরুষপর-ম্পরাগত ভাবে চলিয়া আসিতেছে, অধিকাংশ লোকই সন্তুষ্ট চিত্তে যাহা স্বীকার করিয়া আসিতেছে এবং যার মধ্যেই মোটের উপর তাহারা সুখে আছে,—বুঝিতে হইবে, সে বন্ধন মঙ্গলের বন্ধন। কোনও নীতির সত্য মাঙ্গলিকতার বড় একটি প্রমাণও ইহা।

যাহা হউক, এই বাস্তব সংসারে আমরা দেখিতে পাই, স্বামী আশ্রিত ও প্রতিপাল্য বলিয়া কতকটা প্রভুর ভাবে স্ত্রীকে দেখিয়া থাকেন স্নেহময় অভিভাবকের মত আদর সোহাগ তাহাকে করিয়া থাকেন, আবার স্ত্রীও কতকটা প্রভুর মতই স্বামীর আনুগত্য করে—স্বামীর সেবাকে জীব-নের বড় একটা কর্ত্তব্য বলিয়া অনুভব করে। একান্ত নির্ম্মম নিষ্ঠুর ও উৎপীড়ক না হইলে এই ভাবের মধ্যেও স্বামীর ভালবাসা পাইয়া স্বামীকে ভালবাসিয়া প্রায় সকল স্ত্রীই পৃথিবীতে বেশ সুখেই থাকে এবং আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। স্বামীর ভালবাসা কম হইলেও অনেক স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসিয়াই সুখী হয়। কেবল ভোগে নয়, ত্যাগে, এবং কেবল পাইয়া নয়, দিয়াও জীবনের বড় একটা সুখ—বড় একটা আনন্দ আছে। এরূপ আনন্দেও আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া অনেক স্ত্রী এই পার্থিব জীবনযাপন করেন। স্বামীর প্রেম আশানুরূপ না পাইলেও অপত্যস্নেহ আছে, সংসারে আর পাঁচজন পরিজনের টান আছে,—আরও কত কাজকর্ম্ম আছে, ধর্ম্মসাধনা আছে, তাহাতে অনেকের জীবন যেমন পূর্ণ হইয়া থাকে—এই অভাবটা বেশ সহিয়া যাইতে পারেন। মানুষের স্বভাবই এই অনেক দুঃখের মধ্যেও সুখের যে দুই একটা উপায় থাকে, তাই খুঁজিয়া নেয়,—তাই ধরিয়া যথাসম্ভব সুখে থাকিতে চেষ্টা করে।

পৃথিবীর উন্নত প্রায় সকল সমাজেই আছে এবং ধর্ম্মনীতি ও দণ্ডনীতির প্রবর্ত্তকগণ ইহা বিধান করিয়াছেন, সুতরাং ইহা মঙ্গলকর একথা কেহ কেহ স্বীকার নাও করিতে পারেন,—যদিও ইহা স্বীকার না করা অথবা এই প্রমাণ গ্রাহ্য না করার পক্ষে প্রবল যুক্তি বড় পাওয়া যায় না। যাহা হউক, কেবল এই পরোক্ষ প্রমাণের উপরেই বা একেবারে নির্ভর করিবার প্রয়োজন কি? সাক্ষাৎ প্রমাণেরও অভাব হয় না। আমাদের দেখিতে হইবে, বর্ত্তমান এই নীতির বন্ধন লোকসমাজে প্রচলিত আছে বলিয়া দাম্পত্য সম্বন্ধে সাংসারিক জীবনে নরনারী—বিশেষ নারী—মোটের উপরে সুখে আছে কিনা। আর এই নীতির বন্ধন একেবারে ছিন্ন করিয়া নূতন যুক্তি-বাদের ধুয়া ধরিয়া চলিলে নারীদের অবস্থা কিরূপ হইবে—তাহাদের সুখ শান্তি বাড়িবে কি কমিবে? সমাজের ভাল মন্দের কথা কিছু নাই ধরিলাম। সমাজ চুলায় যাউক, ব্যক্তির কথাই বলিব। সমাজ-নিরপেক্ষ ব্যক্তিভাবেই বা নারী কতখানি বেশী সুখী এই নূতন মতে হইতে পারে, তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব।

প্রথমে বর্ত্তমান অবস্থার কথা বলিব। মানুষের চরিত্র অতিবিচিত্র, অতি জটিল। একেবারে সরল সোজা ভালও বড় পাওয়া যায় না, আবার একেবারে কালী পূজার পাঠার মত নিছাক কালো—কোথাও একটু শাদা দাগ নাই, মন্দের কালীতে এমন ভরা মানুষও অতি বিরল। বেশীর ভাগ মানুষই অতি বিচিত্র পরিমাণে অতি বিচিত্র রকমে ভালয় মন্দয় মিশান।

মানুষে মানুষে মিলিয়া মিশিয়াও বেশ থাকে, আবার একটা ঘাত প্রতিঘাতও নিয়ত চলিতেছে। ইহাই মানুষের স্বভাব, শিক্ষায় এ স্বভাব একেবারে বদলায় না—সব মানুষ একটি বাঁধা আদর্শে ভালর ছাঁচে ঢালা হইয়া যায় না। শিক্ষায় ও জীবনসংগ্রামে মানুষের সহজ দোষ গুণ পরিণত ও পরিপক্ক হয়, কখনও কারও কোনও দোষ বাড়ে গুণ কমে বা গুণ কমে দোষ বাড়ে, কোথাও মেলামেশা বাড়ে ঘাত প্রতিঘাত কমে কোথাও ঘাত প্রতিঘাতই বাড়ে মেলা-মেশাই কমে। একেবারে সব ভাল কি মন্দ হয় না, বা কেবলই মেলামেশায় কি ঘাত প্রতিঘাতেই পরস্পরের সঙ্গে জীবনের সম্বন্ধ আসিয়া দাঁড়ায় না। এই ভাবেই সেই প্রাচীন কাল হইতে এ পর্য্যন্ত মানুষের জীবন চলিতেছে। সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে জীবন ব্যাপারের জটিলতা বাড়িতেছে, ভাল মন্দে বিশেষ তারতম্য কিছু ঘটিতেছে না।

একটানা একটা প্রশান্ত অনাবিল স্রোতের মত মানু-ষের জীবন কখনও চলে না, আবার কেবলই সংক্ষুব্ধ কেবলই আবিল, কেবলই বিপর্য্যস্ত গতিও তাহা নয়। সুখ দুঃখের ও ভাল মন্দের বড় বৈচিত্র্যের মধ্যে মানবের জীবন কাটিয়া যায়। কোনও এক বিশেষ অবস্থায় পাঁচজনের পাঁচ রকম দুঃখ কষ্টের মধ্যে, মোটের উপরে বেশীর ভাগ মানুষের

জীবন সুখে সচ্ছন্দে চলিতেছে কিনা, তাহা ধরিয়াই সেই অবস্থার বিচার আমাদিগকে করিতে হইবে।

অপেক্ষাকৃত কঠোর কি অপেক্ষাকৃত শিথিল যে ভাবেই হউক, বিবাহ বন্ধন অবলম্বনেই সকল উন্নত সমাজে পারিবারিক জীবন এখন চলিতেছে। পুরুষপরম্পরাগত ধর্ম্মনীতির অনুশাসনে সাধারণতঃ এমন একটা সংস্কার লোকের জন্মিয়াছে, যাহাতে এই বন্ধনকে পবিত্র একটা সম্বন্ধ বলিয়াই তাহারা অনুভব করে। দাম্পত্য প্রীতি ইহাকে মধুময় করিয়াছে। ক্রমে একত্র থাকিয়া এবং স্বার্থে মিলিয়া পরস্পরের প্রতি গভীর একটা স্নেহময় মমতা জন্মে। আবার সন্তানসন্ততি জন্মিলে সমান অপত্য স্নেহ, অপত্য পালনের সমান দায়িত্ব, অপত্যের সমান মঙ্গল চিন্তা স্বামী স্ত্রীকে এক পরিবারের মধ্যে বড় শক্ত এক সমানটানে আপন করিয়া মিলাইয়া রাখিতেই চায়। ইহা ছাড়া আরও একটি টান আছে, সেটি সংসার যাত্রার টান। স্ত্রী-পুরুষ একত্র মিলিয়া আপন আপন স্বাভাবিক কর্ম্মবিভাগে পরস্পরের সহায় হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে,—উভয় পক্ষেরই সাংসারিক সচ্ছন্দতা আরাম বিরাম ইহাতেই লাভ হয়।* পুরুষপরম্পরাগত ধর্ম্ম সংস্কার, দাম্পত্য প্রীতি, অপত্যস্নেহ এবং সংসারযাত্রার প্রয়োজন—সবগুলি উপাদান মিলিয়া এই সংসার-জীবনে স্বামী স্ত্রীর বর্ত্তমান সম্বন্ধ গঠিত হইয়াছে। এবং এতগুলি টানে দৃঢ় শক্তভাবেই দুইজনকে দুইজনের সঙ্গে মিলাইয়া রাখিতে চাহিতেছে। সকল গুলির পূর্ণ প্রকাশ যেখানে ঘটে, সেখানে এ সম্বন্ধ পূর্ণ সুখময়ই হয়—কোনওরূপ বিচ্ছেদের কথা কেহ মনেও আনিতে পারে না। কিন্তু সকলগুলি উপাদানের পূর্ণ বিকাশে দাম্পত্য জীবনে এমন পূর্ণ সুখের দৃষ্টান্ত এ পৃথিবীতে অতি বিরল—একটিও কোথাও মিলে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু এতখানি পূরা সুখ না হইলেই যে দম্পতির জীবন একেবারে দুঃখময়ই হইবে তাহারা আর মিলিয়া থাকিতে পারিবে না এমনও হইতে পারে না। এই চারিটি উপাদানের মধ্যে দাম্পত্য প্রীতিকে এই হিসাবে একটি প্রধান উপাদান বলা যাইতে পারে যে ইহাই এই সম্বন্ধকে তার মধুর ভাবটি দান করে। ইহার অভাবে স্বামী-স্ত্রী একত্র থাকিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যাইতে পারে, কিন্তু উহাতে তেমন একটি আনন্দ—একটি পরিতৃপ্তি অনুভব করে না। এখন দেখিতে হইবে সাধারণ মানবের বাস্তব জীবনের এই দাম্পত্যপ্রীতি কি ধারায় হইয়া থাকে এবং তাহাতে তাহারা কতটা সুখী হইতে পারে, সাধারণ জীবনে তার মূল্যই বা কি? কাব্যের নায়ক নায়িকার আদর্শ প্রেম—ধরুন নোরা যে প্রেম তাহার স্বামীর নিকট চাহিয়াছিল, যাহা পাইল না বুঝিয়া স্বামীর ঘর সে ছাড়িয়া গেল—সেই প্রেম কাব্যের কল্পনা-জগতের বাহিরে—এই বাস্তব জীবনে কোথাও বড় দেখা যায় কি? হওয়া সম্ভব কি? সাধারণ মানবমানবী কেহই কাব্যের নায়ক নায়িকা নয়,—রূপে গুণে অনেক ত্রুটী অনেকেরই থাকে। একেবারে মনের মত স্বামী কি স্ত্রী কাহারও বড় জোটে না। স্বভাবে বিপরীত ভাবের দোষ গুণও অনেক দেখা যায়। সকলখানি প্রাণ কেহ কাহাকেও খুলিয়া দেখায় না, দেখাইতে পারেনও না। আপন আপন অনেক স্বার্থ, অনেক অভিমান ও উভয়পক্ষের থাকে,—একের খাতিরে একেবারে সবটা অপরে ত্যাগও করিতে পারে না। এই সব অভাব ত্রুটি সত্ত্বেও এবং ইহার জন্য মধ্যে মধ্যে মনোমালিন্য ও কলহ ঘটিলেও আমরা দেখিতে পাই সাধারণতঃ স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিতে চায়—কেহ কাহাকেও ছাড়িতে সহজে চায় না। মোটের উপর দুইজনকেই দুইজনের এতখানি ভাল লাগে—এতখানি স্নেহ মমতা পরস্পরের প্রতি জন্মে—দুইজনের সঙ্গ দুইজনের এমন অভ্যাস হইয়া যায়, যে এই সব ত্রুটি এবং ত্রুটিসম্ভূত মান অভিমানের কোঁদল বা স্বার্থের সংঘাত সত্ত্বেও পরস্পরের সঙ্গে মোটের উপর সুখে ও আনন্দেই তাহারা জীবনটা কাটাইয়া যায় এবং সাময়িক মনোমালিন্য বা কলহ যাহা ঘটে তাহাও মিটিয়া যায়। একেবারেই বনে না, অবিরত মনের অমিল চলিতেছে, অবিরত কলহ হইতেছে, পরস্পরের প্রতি প্রীতি কি স্নেহ-মমতা একেবারেই নাই, একত্র থাকায় কেবল অশান্তি কেবলই অসুখ—এরূপ দৃষ্টান্তও যে না আছে, তা নয়। এরূপ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী অনেকস্থলে পৃথকভাবেই বাস করেন। কিন্তু ইহা কোনও সমাজে দাম্পত্য জীবনের সাধারণ অবস্থা নয়। দাম্পত্য-প্রীতি যত বেশী থাকিবে সম্বন্ধ ততই সুখের হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু দাম্পত্য-প্রীতি কিছু কম হইলেও অন্যান্য টানে ও স্বার্থে মোটের উপর বেশীর ভাগ দম্পতিই পরস্পরের সঙ্গে বনাইয়া যতটুকু আনন্দ যার ভাগ্যে সম্ভব হয়, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

প্রায় সকল দেশেই স্বামীর অনুগতি স্ত্রীর পক্ষে প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে*।

এই অনুগতি দাম্পত্য-প্রীতির মধ্যেও একটা গুরু লঘুর সম্বন্ধ আনিয়াছে। স্বামী আশ্রয়দাতা, রক্ষক, প্রতিপালক ও অভিভাবক—স্ত্রী আশ্রিতা, রক্ষিতা, প্রতিপালিতা ও অভিভাবিতা। এ অবস্থায় এই প্রীতির মধ্যে গুরুজনের ন্যায় একটু সশ্রদ্ধ সম্ভ্রমের ভাব স্ত্রীতে এবং লঘুজনের মত একটু মনতোষান আদর সোহাগের ভাব স্বামীতে যে হইবে—

---

* গত আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত নারীধর্ম্ম প্রবন্ধে এই বিষয়টি বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

---

* আষাঢ় সংখ্যার নারীধর্ম্ম প্রবন্ধে ইহার কারণ বিবৃত হইয়াছে।

ইহা স্বাভাবিক। এবং এই পার্থক্যে কোনও স্ত্রী আপনাকে হীন বলিয়া মনে করেন না। তাঁহার আদর সোহাগের একটু হালকা খেলার ভাব থাকিলেও টরভাল্ড হেল্‌মার স্ত্রীকে যেমন স্নেহে যত্নে পালন করিতেন,—এরূপ স্নেহে যত্নে বাস্তব জীবনে প্রায় সকল নারীই আপনাকে ভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিয়া থাকে। রাগিয়া বড় একটা আঘাত তিনি স্ত্রীর মনে দিয়াছিলেন,—কিন্তু আবার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। এমন কঠোর কথা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে হামেসা হইয়া থাকে আবার তা মিটিয়া যায়। স্ত্রীও ভুলিয়া যায় স্বামীও ভুলিয়া যায়। ব্যাঙ্গেলের মত স্নেহময় সুযোগ্য স্বামীর আশ্রয় পাইয়া—স্বামীর সঙ্গে একত্র থাকিয়া সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা হইতে ক্রমে তাঁহাকে ভালবাসিয়া বহু নারী পরম সুখে জীবনযাপন করিতে পারে। বিপত্নীক ব্যাঙ্গেলও ত একত্র থাকিয়া ক্রমে এলিডাকে অমন ভালবাসিয়াছিলেন। এলিডার পক্ষেই বা তাহা সম্ভব হইবে না কেন? তার সেই নাবিকের মোহ? কেবল নাবিকের মোহ নয়—স্বামীকে ভালবাসিয়া বাছিয়া বিবাহ করে নাই—ইহাই সে স্বামীর সম্বন্ধ হইতে মুক্তিলাভের প্রধান হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিল।

পৃথিবীর সকল লোক সুখী নয়—যারা সুখী, তারাও পুরা সুখী কেহ নয়। তবুও একথা বলা যাইতে পারে, সাধারণ সাংসারিক জীবন যাঁহারা ভাল করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারাও স্বীকার করিবেন, স্বামী-স্ত্রীরূপে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ থাকিয়াও বেশীর ভাগ নরনারী নানা অমিলের মধ্যেও একটা মিল করিয়া, এখন তখন এটা ওটা দুঃখের মধ্যেও মোটের উপর সুখে আছে। ধর্ম্মনীতি ও দণ্ডনীতি এই বন্ধনে নরনারীকে বাঁধিয়াছে বলিয়াই পৃথিবীর দুঃখ এমন কিছু বাড়ে নাই।

আরও একটি কথা এইখানে বলিতে চাই। কাব্যের নায়ক নায়িকার মত পূরা প্রেম পূরা মনের মিল না হইলেও মানব দম্পতির দিন মন্দ যায় না,—এ কথা এখন সকলেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন। যে পরিমাণ প্রীতি এবং প্রীতি হইতে যে পরিমাণ আনন্দ তাহাদের ঘটে, তার জন্যও বিবাহের আগে একটা ভাল বাসাবাসি বা বাছা-বাছিরও বড় দরকার হয় না,—পূর্ব্বরাগের কথা কাব্যে উপন্যাসে আছে,—পরস্পরের চিত্ত ও চরিত্র পরীক্ষার কথাও বিবাহ সম্বন্ধীয় অনেক আদর্শ প্রবন্ধে দেখা যায়। কিন্তু বাস্তব জীবনে ইহার কোনটাই কি তেমন ঘটিয়া থাকে? এদেশের ত কথাই নাই,—হিন্দু মুসলমান কোনও সমাজেই পূর্ব্বরাগের ফলে বিবাহ হয় না। বাছাবাছি যা হয়, অভিভাবকরাই করেন,—পাত্র পাত্রী নিজেরা কিছু করে না। তবু বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বেশ দাম্পত্য প্রীতি জন্মিয়া থাকে,—যা জন্মে তাহাতেই মোটের উপর স্বামী স্ত্রীর সংসার জীবন বেশ সুখশান্তিতে কাটিয়া যায়। এ সম্বন্ধে এ দেশের হিন্দু মুসলমান পরিবার অন্য কোনও দেশের পরিবার অপেক্ষা কম সুখী তা নয়। যাঁহারা বলেন এ দেশে প্রকৃত দাম্পত্য সুখ নাই, থাকিলেও পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় তাহা কিছুই না, তাঁহাদের সম্বন্ধে এই বলা যাইতে পারে, যে এ দেশের গৃহস্থ জীবন তাঁহারা ভাল করিয়া দেখেন নাই, পাশ্চাত্য সমাজের গৃহস্থ জীবনেরও কোনও খবর রাখেন না। আগে ভাল বাসা-বাসি বা বাছাবাছি ছাড়া দাম্পত্য প্রীতি হইতে পারে না,—এই কথাটা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া নিয়া তাহা হইতেই আপনাদের মত গড়িয়া তাঁহারা নিয়াছেন। মানব জীবনের সম্বন্ধে কি সত্য তাহা 'অবরোহ' বা deductive যুক্তি প্রণালীতে তেমন বাহির হয় না—'আরোহ' বা inductive যুক্তি প্রণালী ধরিয়া বাহির করিতে হয়। পাঁচ রকম দেখিয়া পরীক্ষা করিয়া তবে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেই তাহা ঠিক হয়। বিনা পরীক্ষায় আগেই একটা মনোজ্ঞ কথা সত্য বলিয়া ধরিয়া নিয়া তার সঙ্গে যাহা মিলে, তাই ঠিক, যা মিলেনা তাই ভুল, ইহা সমীচীন যুক্তির পথ নহে। পাশ্চাত্য সমাজে যৌবনে বিবাহ হয়, নরনারী মুক্তভাবে মেলেমেশে,—পূর্ব্বরাগ সেখানে সম্ভব এবং বাছাবাছিরও রীতি একটা আছে। কিন্তু এ সব প্রকৃত পক্ষে হয় কতটা? পূর্ব্বরাগের ফলে বিবাহ কতক কতক হইয়া থাকে, কিন্তু সে স্থলে পরীক্ষা বড় ঘটে না। রাগ যদি রাগের মতই চড়িয়া উঠে আর যদি তাতে যুবক-যুবতী মাতিয়া যায়, তবে পরীক্ষা করিবার মত ধীরতা থাকে না, ভাবের আবেগটাই বিচার-বুদ্ধিকে একেবারে অভিভূত করিয়া রাখে। তারপর এই প্রেমটা নির্ম্মল প্রাণের প্রেম না হইয়া রূপ-যৌবনের মোহও হইতে পারে। মুগ্ধের পক্ষে ইহা বুঝিয়া নেওয়া সহজ নয়। এ অবস্থায় ভোগের তৃপ্তিতে মোহ যখন কাটিয়া যায়,—আর দুই জনেরই মনে হয়—আরে রামঃ! এটা যে কিছুই নয়। ওটাকে লইয়া কেমন করিয়া গোঁয়াইব—তখন দুইজনেরই জীবনটা যে কত বিষময় হইয়া উঠে, তা না বলিলেও চলে। এরূপ দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্য সমাজে বিরল নহে। যাহা হউক, সব বিবাহ এরূপ পূর্ব্বরাগের ফলে হয় না,—বেশীই সুবিধার হিসাবে ঘটে। আগে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই যুবক যুবতীর বিবাহ হইত, সুবিধার হিসাব অভিভাবকরা প্রায় করিতেন,—পাত্র পাত্রীকে তাঁহাদের মতে চালাইয়া নিতেন। এখন নানা কারণে ক্রমে বিবাহের বয়স বাড়িয়া যাইতেছে। পঁচিশ হইতে ত্রিশের মধ্যে নারীর এবং ত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে পুরুষের—ইহার পূর্ব্বে বিবাহ বড় ঘটে না,—পরেও অনেকের হয়। এ বয়সে কার কিসে সুবিধা হইবে, অভিভাবকের উপরে তার জন্য কেহ নির্ভর করে না,—আর এ বয়সে অভিভাবক থাকেই বা ক্ষয়জনের? থাকিলেই বা মানিতে চায় কয় জনে? এই ভাবে সুবিধা

বুঝিয়া সুবিধা খুঁজিয়াই বেশীর ভাগ বিবাহ এখন পাশ্চাত্য সমাজে হইয়া থাকে। তবে পাত্রপাত্রী অবশ্য সাধারণতঃ এটা দেখেন, যার সঙ্গে দাম্পত্য সম্বন্ধে মিলিতেছেন, তাকে মোটের উপর ভাল লাগে, স্বভাবতঃই তাহার দিক হইতে মনটা বিরাগে ফিরিয়া না আসে। তারপর বিবাহ হইলে বনিবনাও যাতে থাকে, পরস্পরের দোষ ত্রুটি পরস্পর বিরোধী ভাব ও স্বার্থ যাহাই থাক্ তার মধ্যেও মোটের উপর একটা মিলমিশে দুইজনেই যাতে সুখে থাকিতে পারেন, তার জন্য চেষ্টা করেন। ক্রমে একটা স্নেহ মমতাও জন্মে,—তার কোমল ও মধুর প্রভাবে অনেক খোঁচাখুচি মোলায়েম হইয়া যায়। একেবারে না হইলেও সুখে দুঃখে দিন এক রকম চলিয়া যায়। সুবুদ্ধি যাঁহারা নিতান্ত অসহনীয় দুঃখের কারণ কিছু না ঘটিলে, নিজের ভাগ্যেই সন্তুষ্ট থাকিতে চেষ্টা করেন। সে চেষ্টা একেবারে বিফল হয় না।

এখন দেখিতে হইবে, সংসার জীবনের এই যে অবস্থা আমরা দেখিতে পাই,—বিবাহবন্ধন লোপ করিয়া মুক্ত-প্রেমে মুক্ত-নির্ব্বাচন, মাত্র প্রেম সাপেক্ষ স্বেচ্ছাধীন মিলন, প্রচলিত হইলে নরনারীর বিশেষভাবে বিবাহবন্ধনের কঠোরতর দায়িত্ব ভারবাহিনী নারীর দাম্পত্য সুখ এবং মানবত্বের অধিকার ভোগ পূর্ণ হইবে কিনা। একেবারে পূর্ণ না হউক,—বর্ত্তমানে যাহা আছে, তাহা অপেক্ষা বাড়িবে কি না। তাও যদি হয়, তবুও এই বন্ধন অপেক্ষা মুক্তিই অধিকতর কাম্য হইবে।

ইঁহাদের প্রথম কথা এই, যাহার সঙ্গে মিলিবে তাহার সঙ্গে ঠিক প্রেম হওয়া চাই, আর পাঁচজনকে দেখিয়া পাঁচজনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া পাঁচজনকে নাড়িয়া চাড়িয়া ভাল করিয়া পরখ করিয়া দেখিয়া যার সঙ্গে মিলিব সবচেয়ে ভাল বা ভাল লাগে বলিয়া ঠিক তাহাকেই চাই কি না। নারীর কথাই আগে বলিতে হইবে। ধরিলাম, কোনও যুবতী—নাম তার রঙ্গিণী—তিনি এইরূপ মনের মানুষের খোঁজে পুরুষ সমাজে বাহির হইলেন। দেখিতে দেখিতে ধরুন রঙ্গলাল নামক সুরূপ ও সুবেশ কোন যুবককে তাহার চোকে ধরিল,—তাহাতেই মন মজিল। এখন এটা ঠিক খাঁটি প্রাণের প্রেম না বাহ্যিক চিত্তাকর্ষক কিছুর মোহ—তাহা রঙ্গিণীর বুঝিবার উপায় কি? কেহ বলিতে পারেন, তখন নাই বুঝিল। এই মোহেই মিলুক না, মিলিয়া দেখুক না—কেমন লাগে। যদি খাঁটি প্রেম হইয়া থাকে, ভাল,—আর যদি মোহই হয়, মোহ ভাঙ্গিয়া যখন ভুল বুঝিবে, তাকে ছাড়িয়া দিবে। আবার যার দিকে মন টানে, তার সঙ্গে গিয়া মিলিবে। শেষে খাঁটি প্রেম যেখানে জুটিয়া যায়, সেই খানেই লাগিয়া থাকিবে।

কথাগুলি বড় খারাপ শুনাইতেছে। কিন্তু মুক্ত প্রেম ও মুক্ত প্রেম-সাপেক্ষ মিলনের রীতি ধরিলে ব্যাপারটা কি এই রকমই গিয়া দাঁড়ায় না? হিতাহিত বোধ যাঁহাদের আছে, ভাবিয়া দেখুন এটা কেমন ভাল হইবে। আর এই মেলা ও ছাড়াটা কেবল রঙ্গিণীর খেয়ালের উপরেই নির্ভর করিতেছে না। রঙ্গলালও যে রহিয়াছে। পুরুষ হইলেও সেত মানুষ বটে! তার মনেরও ত একটা টান বেটান থাকিতে পারে? রঙ্গিণীর মন তাহাতে মজিল বলিয়া তার মন রঙ্গিণীতে নাও মজিতে পারে? আবার মজিলেও—রঙ্গিণীর যে মুহূর্ত্তে বিরাগ জন্মিল, তাকে ছাড়িতে চাহিল, তার বিরাগ তখনই হয় ত না জন্মিতে পারে—সে হয়ত তাকে নাও ছাড়িতে চাহিতে পারে। রঙ্গলাল যে তখন বড় দুঃখ পাইবে—তার উপায় কি হইবে? বিপরীত অবস্থায় রঙ্গিণীরও ঠিক এমনই দুঃখ হইতে পারে। তারই বা উপায় কি? সেই দুঃখ ত হইলই—পুরা সুখ কোথায় মিলিল? তারপর, কেবল এইরূপ প্রেমিক প্রেমিকার মিলন ছাড়নেই ত সব চুকিয়া যায় না। আরও অনেক গোল বাধে। প্রত্যেক মিলনেই গুটিকত করিয়া সন্তান-সন্ততি আসিতে পারে। সেগুলার গতি কি হইবে?—এরূপ খুসীমত মেলায় ছাড়ায় পারি-বারিকজীবন গড়ে না। কোথায় তারা থাকিবে? কে তাদের পালনের ভার নিবে? একা জনকও দায়ী নয়, একা জননীও দায়ী নয়। দুজনেই ত সমান স্বাধীন সমান ইচ্ছায় মিলিয়াছে, ছাড়িয়াছে, বুঝিতে হইবে,—এ অবস্থায় স্ত্রী ও স্বামীর ঘরে যায় না,—স্বামী ও স্ত্রীর ঘরে যায় না। দুজনে যখন মিলে, তখনকার মত হোটেলে বা আর কোথাও একটা ঘর করিয়া লয়,—আবার ছাড়াছাড়ি হইলেই—সেই ঘর ভাঙ্গিয়া যায়। ছেলে পিলেগুলি পাথারে ভাসে, এ অবস্থায় একজনের হইতে পাওয়া ছেলেপিলে লইয়া আর এক জনের সঙ্গে এরূপ প্রেমের মিলনে যাওয়াও সুবিধা হয় না। সমস্যা এখানে বড় কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। এক রাজসরকার ব্যারাক খুলিয়া এই সব ছেলেপিলেদের পুষিবার ব্যবস্থা একটা করিতে পারেন। মা বাপের উপরে ট্যাক্স বসাইয়া ইহাদের পোষার খরচ তোলা যাইতে পারে। কিন্তু পিতা-মাতার স্নেহবঞ্চিত—স্নেহময় গৃহবর্জ্জিত হইয়া ব্যারাকের কলের মত শাসনে এই সব ছেলেপিলেরা যে কেমন মানুষ হইয়া উঠিতে পারে, তাহা কি মুক্তিবাদীরা কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছেন? ছেলেপিলেদের যে গতি হয় হউক, আমি মানব বা মানবী, আমি দেখিব,—আমার প্রেমের—যে প্রেম আমার স্বভাবের বড় একটা বৃত্তি—যার ভোগ আত্মার (?) বড় একটা অধিকার—তার সার্থকতা ও তৃপ্তি, কিসে হইবে? কিন্তু (আত্মার হউক, কি দেহেরই হউক)—এই প্রেমের রঙ্গ কতদিন থাকিবে? বার্দ্ধক্যে এই প্রেম সম্ভোগে লালসা কাহারও থাকে কি?—এই প্রেমের জন্য বুড়া বুড়ী বা বুড়ী বুড়াকে খুঁজিবে কি? তখন তাদের গতি কি হইবে?—সংসার নাই, সন্তান নাই,—পরিজন নাই—

জরায় ইহারা কোথায় কার আশ্রয় নিবে? কি ধরিয়া থাকিবে? ব্যারাক্ ছাড়া আর ত স্থান দেখা যায় না। দেশটা একটা হোটেল আর ব্যারাকের দেশই হইয়া উঠিবে। যুবকযুবতীদের জন্য হোটেল,—আর ছেলেপিলে ও বুড়াবুড়ীদের জন্য ব্যারাক্! অবস্থাটা কি তখন এমনই হইবে না? এটা যে কত সুখের ও কত মঙ্গলের অবস্থা হইবে,—তাহার বর্ণনা অনাবশ্যক। পাঠকপাঠিকাবর্গ আপনারাই বুঝিয়া দেখুন,—এই রকম অবস্থাটা তাঁহারা চান্ কি না।

তারপর—বাহিরে পাঁচ রকম মানুষ দেখিয়া—পরখ করিয়া—কাকে বেশী চাই—তাই বুঝিয়া বাছিয়া নেবার কথা।

একরকম দার্শনিকমত আছে যাতে বলে, কেবল আমিই আছি, আমিই সত্য—আর সব মায়া সব মিথ্যা,—আমি আছে বলিয়া মনে করি এই সব আছে নতুবা তাদের আর কোনও সত্তা নাই, ইহার নাম অহংবাদ বা Egoism.

এইরূপ বাছিয়া নিবার সম্ভাবনাও কতকটা এই অহংবাদের সম্ভাবনার মত—যেন সকলপুরুষ বসিয়া আছে অমুকীনারী আসিয়া তাহাদের কাহাকে বাছিয়া নেয় কেবল তারই জন্য, যেন তাদের নিজেদের কোনও ইচ্ছা-কোনও কামনা, আর কোনও প্রয়োজন এ জগতে নাই।

ধরুন কোনও নারী—নাম মুক্তা—কাকে তার সব চেয়ে ভাল লাগে—কাকে সে ঠিক চায়, তাই বুঝিয়া বাছিয়া নিতে বাহির হইল। সে পাঁচজনকে দেখিল—নাড়িল চাড়িল পরখ করিল,—শেষে বুঝিল প্রাণতোষকে সে চায়। কিন্তু সে চাহিল বলিয়াই প্রাণতোষ যে তাকে চাহিবেই,—এমন কি কথা আছে? যদি চাহিয়াই বাছিয়া নিতে হয়, তবে প্রত্যেক নারীই—সে খাঁদা ছাঁদা কানা রাণা, পেত্নী পরী যেমনই হউক—শ্রেষ্ঠ পুরুষকেই অবশ্য চাহিবে। রাক্ষসী সূর্পণখা রামকেও চাহিয়াছিল, লক্ষ্মণকেও চাহিয়াছিল,—কিন্তু রাম লক্ষ্মণ কেহই তাহাকে চাহিলেন না। লাভের মধ্যে অভাগীর নাক কাণ কাটা গেল। এমন চাহিতে গেলে, অমন নাক কাণ কি অনেক নারীরই কাটা যাইবে না?

আসল কথা, এ হাটে বাজারে গিয়া লাউকুমড়া বাছিয়া নেওয়া নয়,—তাও দশজনে বাছিতে গেলে, প্রত্যেকেই মনের মত জিনিষটি পায় না। একটা হুড়াহুড়ি কাড়াকাড়ি লাগিয়া যায়। আর এ ত মানুষের মানুষ বাছা, সকলেই মানুষ,—সকলেই যদি বাছিতে যায়,—বাছাবাছির গোলমালেই প্রায় সকলের জীবনটা চলিয়া যাইবে। বাছিয়া মনের মানুষ মেলা নিতান্ত ভাগ্যবান্ দুই চারি জনের ছাড়া ঘটিবে না।

বাস্তবিক ইহা চলে না,—চলিতে পারে না।

যা চলে, তাই এ পৃথিবীতে চলিতেছে, তার মধ্যে নিতান্ত অন্যায় যেখানে আছে, বড় দুঃখের ঘটনা যেখানে হইতেছে,—তার যতদূর সম্ভব প্রতিকারের চেষ্টা দেখা যাইতে পারে। নীতির বন্ধন-ব্যবস্থা উল্টাইয়া ফেলিয়া,—কেবল খোলা মুক্তি—কেবলই নিজের সুখ চাহিয়া অবাধ স্বেচ্ছাচার চালাইতে গেলে তা চলিবে না,—যেটুকু চলে, তাহাতে মানবের কল্যাণ হইবে না।

আর একটি বড় কথাটি আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। কেবল দাম্পত্য-প্রেম সম্ভোগের জন্যই নরনারী এই পৃথিবীতে জন্মে নাই,—আরও অনেক কায অনেক ধর্ম তাদের আছে, অনেকের সঙ্গে অনেক রকম সম্বন্ধে তাদের আসিতে হয়, থাকিয়া জীবনযাপন করিতে হয়। দাম্পত্যভোগকে সকলের বড় করিয়া দেখিলে চলে না। আরসবদিকেও চাহিতে হয়। তার জন্য এ কামনাকে সংযত ও খর্ব্ব করিতে হয়।

ধর্ম্মনীতি ও দণ্ডনীতি তাই ইহাকে বিধিবন্ধনে বাঁধিতে চাহিয়াছে। এ বন্ধন অন্যায় কঠোরবন্ধন নহে। বন্ধন যদি কোথাও অতিকঠোর হয়, যথাপ্রয়োজন শিথিল করা যাইতে পারে। কিন্তু তুলিয়া দেওয়া যায় না। এই বন্ধনেও মানব—মানবস্বভাবের বহু অপূর্ণতার মধ্যে যতদূর সুখে [illegible]কিতে পারে, তা আছে। বন্ধন একেবারে ভাঙ্গা স[illegible]ও, তাহাতে সুখ কিছু বাড়িবে না, মঙ্গলও বাড়িবে না,—বরং ঘোর অমঙ্গল ও অশান্তিই ঘটিবে।

রঙ্গ।

"'রাম' নাম কি মুসলমানী 'হারাম' হইতে আসিয়াছে?"

"দূর হ! বলে কি?"

"নইলে—ঘৃণা হইলেই লোকে 'আ রামঃ' বলে কেন?"

এক ব্রাহ্মণ রাজসভায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! আমি একটি শ্লোক রচনা করিয়া আনিয়াছি, কিছু পুরস্কার প্রার্থনা করি।"

রাজা কহিলেন, "আপনার শ্লোক কি বলুন?"

"শ্লোক ত এই—'দুগ্ধং পিবতি বিড়াল'।"

"এই কি শ্লোক হইল ঠাকুর?"

"কি না হইল মহারাজ?"

"শ্লোকে চারিটি শব্দ চাই,—এ যে একটি মাত্র পদ!"

"একটি! বলেন কি মহারাজ! শ্লোকে বিড়াল রহিয়াছেন,—বিড়াল ত চতুষ্পদই বটেন।"

রাজা হাসিয়া কহিলেন, "তাহা যেন হইল,—কিন্তু রস ছাড়া ত শ্লোক হয় না! রস কোথায় আপনার শ্লোকে?"

"দুগ্ধ রহিয়াছে। রসের অভাব কি?"

"আর অর্থ?"

"অর্থ ত আপনি দিবেন মহারাজ! অর্থই যদি থাকিবে, আপনার দ্বারে কেন—প্রার্থী হইয়া আসিব?"

স্নেহগদ্গদা জননী।—আহা, আমার জগুর মত ছেলে কয়টি আছে? হক না কালো, তা কি চাঁদছিরী তার! মুখরা শ্রোতী।—তা হবে না কেন! বিশ্বকর্ম্মার আপন হাতে গড়া জগন্নাথ ত?

পুরোহিতের কথা মত—গৃহস্থ··· ··········" নারায়ণি নমোঽস্তুতে।" এই বলিয়া পূজান্তে দুর্গাপ্রতিমাকে প্রণাম করিল, তারপর কহিল, এ ত কেবল লক্ষ্মী-ঠাকুরুণকে প্রণাম করা হ'ল। আসল মাদুর্গাকে কি ব'লে প্রণাম ক'রব এখন?"

"ঐ ত দুর্গাকে প্রণাম করা হ'ল। তিনিই হ'লেন কিনা নারায়ণী!"

"ছি ঠাকুর! দেবতাকে অত বড় গাল দিতে আছে? মাদুর্গাকে ব'লছেন নারায়ণী, নারায়ণ যে মাদুর্গার জামাই।"

"পাঁচটি মেয়ে ঘরে ঠাকুর! আমার মত পাপের ফল আর কার বলুন?"

"পঞ্চকন্যা তোমার! আহা, পাপের জন্য চিন্তা কি?—এদের স্মরণ কর-সব পাপ কেটে যাবে। শাস্ত্রে আছে—'পঞ্চকন্যাং স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক নাশনম্'।"

ব্রাহ্মণী। "বলি শুনছ,—দৈব এসেছে যে—"

ভট্টাচার্য্য। দৈব এসেছেন! আহা তবে আর চিন্তা কি? শাস্ত্রে ব'লেছেন—'ন চ দৈবাৎ পরং বলং'।

ব্রাহ্মণী। আ মর মিনসে বলে কি? সে যে টাকা পাবে, তাই চাইতে এসেছে। এক্ষুণি দিতে হবে ব'লছে। পরে আরও কি ব'লবে, শুনবে কেন?

ভট্টাচার্য্য। দৈব টাকা চায়? হায় হায়! ঘোর কলি উপস্থিত। নইলে দেব প্রেরিত দৈব চায় হীন পার্থিব ধন—টাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—পূজা উপলক্ষে আশ্বিন মাসের শেষ ভাগ হইতে কার্ত্তিকের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত মালঞ্চ আফিস বন্ধ থাকিবে বলিয়া এবং ঐ সময় গ্রাহকগণও অনেকে নানাস্থানে থাকিবেন, এই জন্য—**কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যা মালঞ্চ একত্রে অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহে বাহির হইবে।**

মালঞ্চ-কার্য্যাধ্যক্ষ।

৫ম বর্ষ ভাদ্র—১৩২৫। ৫ম সংখ্যা

নারায়ণ

বিবিধ প্রসঙ্গ।

দলাদলি ও কংগ্রেস—
মডারেট দলের কৈফিয়ত।

দেশের রাষ্ট্রীয় দলাদলি এবার দেখিতেছি, একেবারে চরমসীমাও ছাড়িয়া গেল। মডারেটদল সংকল্প করিয়াছেন—সংকল্প ঘোষণাও করিয়াছেন, তাঁহারা বোম্বে নগরে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যোগদান করিবেন না, ভারতসচিব মণ্টেগু সাহেবের শাসনসংস্কার প্রস্তাব সম্বন্ধে পৃথকভাবে আপনাদের অভিমত প্রকাশ করিবেন। কংগ্রেসে না গিয়া পৃথক বৈঠক যে কেন তাঁহারা করিতে চান, তার একটা কৈফিয়তও তাঁহারা দিয়াছেন। কৈফিয়ত এইরূপ:—

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের পর হইতে দেখা যাইতেছে, এক্স্ট্রিমিষ্ট দল * কংগ্রেস দখল করিয়াছেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটি এবং প্রদেশিক কংগ্রেসকমিটি সমূহে ইহাদেরই এখন প্রধান্য। কংগ্রেস পরিচালনার কর্ত্তৃত্ব এই সব কমিটির হাতে। কংগ্রেসের অধিবেশনেও এই দলের লোক বেশী হয়,—ইহাদের মত মডারেটদের ছাপিয়া ফেলে। এবার এই বিশেষ কংগ্রেসেও তাই হইবে। মডারেটদের মত চলিবে না।

এই নূতনদল সর্ব্বত্রই বলিতেছেন, সংস্কারপ্রস্তাব ব্যর্থ ও দেশকালের অনুপযোগী (Disappointing & inadequate) হইয়াছে, তার অর্থ,—ইহা গ্রহণ করা যাইতে পারে না। মডারেটগণ মনে করেন, প্রস্তাব মোটের উপর বেশ হইয়াছে,—তবে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক। এবং সেই ভাবে কৃতজ্ঞ ও সন্তুষ্টচিত্তে ইহা আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে, তারপর পরিবর্ত্তনের জন্য আন্দোলন করিতে হইবে। কিন্তু এক্স্ট্রিমিষ্ট-প্রধান কংগ্রেসে তা হইবে না। কংগ্রেসের প্রস্তাব Subjects Committe (বিষয়নির্দ্ধারক সমিতিতে) স্থির হয়,—যাহা স্থির হয় তাই শেষে সাধারণ অধিবেশনে পাশ হয়। এই সাধারণ অধিবেশন যেভাবে পরিচালিত হয়, তাহাতে তার মধ্যে কোনও amendment (পরিবর্ত্তিত প্রস্তাব) উপস্থিত করা চলে না—ভোট নেওয়াও বড় কঠিন। সে চেষ্টা করিতে গেলে বিশ্রী একটা হট্টগোল উপস্থিত হইবে। কোনও মতে তা সম্ভব হইলেও যে নিয়ম আছে, তাহাতে সুবিধা কিছু হইবে না। নিয়ম এই যে, উপস্থিত জন হিসাবে ভোট নেওয়া হইবে না। প্রত্যেক প্রদেশের প্রতিনিধিগণ পৃথক ভাবে ভোট দিবেন এবং তাঁহাদের মেজরিটীর মতই সেই প্রদেশের মত বলিয়া কংগ্রেসে গৃহীত হইবে। সকল প্রদেশেই যখন নূতন দলের প্রধান্য—তখন সংস্কারপ্রস্তাব গ্রহণের বিরুদ্ধেই সকল প্রদেশের মত

* মডারেটগণ এখন খুব জোর করিয়া এই এক্‌ষ্ট্রিমিষ্ট (Extremist) নামটি ব্যবহার করিতেছেন। নামটি এঙ্গলোইণ্ডিয়ানদের দেওয়া নিন্দাসূচক নাম, ইহাতে এই বুঝায়, যাহারা দেশকালপাত্রের অবস্থা ধীরবুদ্ধিতে বিবেচনা না করিয়া চলিতে পারে না,—যাতে ভাল হইবে না—এমন বাড়াবাড়ী দাবী করে, করিয়া কাজ নষ্ট করে। এই দল যে আপনারা এই নাম ব্যবহার করেন না, পছন্দও করেন না, একথা বলাই বাহুল্য। এখন তাঁহারা আপনাদের হোমরুলার বলিয়া অভিহিত করেন।

হইবে, এবং তাহাই কংগ্রেসের মত বলিয়া গৃহীত ও ঘোষিত হইবে। অর্থাৎ দেশের প্রধান রাষ্ট্রীয় মুখপাত্র কংগ্রেস হইতে এই মন্তব্য বাহির হইবে যে ভারতের সকল প্রদেশ এক বাক্যে সংস্কার প্রস্তাব গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া অভিমত দিলেন।

যদি ইহা হয়, হইবেই,—তবে দেশের সর্ব্বনাশ হইবে। ভারতের রাষ্ট্রীয় উন্নতির বা স্বায়ত্তশাসনের বিপক্ষ শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় তখন বলিবেন,—এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা এখন নিষ্প্রয়োজন—ভারতবাসীরা ইহা গ্রহণ করিতে চায় না। গবমেণ্টও হয় ত ইহাদের কথা শুনিয়া এবং অবস্থা বাস্তবিকই এইরূপ মনে করিয়া ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব এখন স্থগিত রাখিবেন। তারপর কতকাল কি হইবে তার স্থির কি? সুতরাং কংগ্রেসে গিয়া আমরা দেশের এমন সর্ব্বনাশ করিতে পারি না। পৃথক ভাবেই এই প্রস্তাব সমর্থন করিব। দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধন তাঁহাতেই হইবে। কংগ্রেস আমাদের লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য স্বায়ত্তশাসন লাভ, কংগ্রেস তার একটা পন্থা মাত্র ছিল। যে লক্ষ্য সাধনের জন্য এতদিন আমরা কংগ্রেস করিয়াছি,—সেই লক্ষ্য যখন পাইতেছি, আর কংগ্রেস তার পথে এখন বাধাই হইতেছে, তখন কেন কংগ্রেসে গিয়া এই বাধা বাড়াইব? কংগ্রেসের খাতিরে কেন এই সিদ্ধিতে বিঘ্ন ঘটাইব?

কৈফিয়তের উত্তর।

মডারেটদলের এই কৈফিয়তের যুক্তিযুক্ততা ভাল বুঝিলাম না! কতক নিজেদের কথায় তাঁহারা নিজেরা ঠকেন,—কতক ছেলেভুলানর মত কথা বলিতেছেন।—কংগ্রেস জাতি ধর্ম্ম সমাজ নির্ব্বিশেষে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একমাত্র রাষ্ট্রীয় মিলনক্ষেত্র। এক মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ একটি মিলনক্ষেত্র কয়েকবৎসর যাবৎ হইয়াছে—মস্লেম লীগ। কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের একমাত্র মিলনক্ষেত্র দেশের সমবেত রাষ্ট্রীয় শক্তির একমাত্র কেন্দ্র—কংগ্রেস। গত বত্রিশ বৎসরের কর্ম্মফলে কংগ্রেস এখন এই স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রদেশে প্রদেশে, জেলায় জেলায়, যে সব রাষ্ট্রীয় সংঘ গঠিত এখন হইয়াছে, কংগ্রেস তাহাদের কেন্দ্র, কংগ্রেসের শাখা প্রশাখা রূপেই সব দেশময় বিস্তৃত হইয়াছে, কংগ্রেসের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধেও সব আবদ্ধ। এই সব সংঘ, প্রদেশ প্রত্যেক জেলা হইতে, কংগ্রেসে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। কংগ্রেস বলিলে এখন দেশের শিক্ষিত সাধারণের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিবর্গের মহাসভাই বুঝা যায়।

মডারেটগণ বলিতেছেন,—কংগ্রেসে তাঁহাদের কথা থাকিবে না, তাঁহাদের মত পরাভূত হইবে। যদি তাই হয়, বলিতে হইবে তাঁহাদের মত কেবল তাঁহাদেরই মত, দেশের লোকমত নয়, এই মতে তাঁহারা দেশের প্রতিভূ বা রাষ্ট্রীয় মুখপাত্র নহেন। কংগ্রেস কমিটি সমূহে নূতন দলের প্রাধান্য হইয়াছে। কেন হইয়াছে? নূতন দল ত লাঠির জোরে কমিটি দখল করেন নাই? লোকমতের জোরেই করিয়াছেন। লোকমত যদি মডারেটগণ আবার আপনাদের পক্ষে আনিতে পারেন, আগামী নির্ব্বাচনে কমিটি সমূহে তাঁহারাই প্রধান হইবেন। যদি না পারেন, বুঝিতে হইবে লোকমতের সমর্থন তাঁহারা পাইতেছেন না। তারপর, বর্ত্তমান কমিটিসমূহে নূতন দলের প্রাধান্য রহিয়াছে বলিয়াই যে বোম্বের বিশেষ অধিবেশনে তাঁহাদের দলের লোকই প্রধান হইবে, একথা তাঁহারা কিসে ধরিয়া নিলেন? তাঁহারা বলিতেছেন, তাঁহাদের মতই সমীচীন এবং দেশের পক্ষে হিতকর,—নূতন দলের মতে দেশের সর্ব্বনাশ হইবে। তাই যদি হয়, দেশের লোককে তাই বুঝাইয়া তাঁহাদের দলই বড় করিয়া তুলুন না। কংগ্রেসের প্রতিনিধির নির্ব্বাচন কংগ্রেসের কোনও কমিটি উপরে নির্ভর করে না। ইহাতে দেশের লোকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কোথা হইতে কত প্রতিনিধি যাইবে তাহার সংখ্যাও বাঁধা নাই। যে সব রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার আছে, যত ইচ্ছা প্রতিনিধি তাঁহারা পাঠাইতে পারেন। মডারেটদের মত [illegible] সত্য সমীচীন ও হিতকর হয়, তবে দেশের শিক্ষিত লোক—নিরে বোকা ত সকলে নয়—কেন তা বুঝিবে না? বুঝিয়া গ্রহণ করিবে না? কেন সেই মতের লোকই কংগ্রেসে বেশী যাইবে না? কেন মডারেটদল তাঁহাদের মতের লোক বেশী কংগ্রেসে নিতে পারিবেন না? তাঁহাদের দল কংগ্রেসে বড় হইবে না, এ কথা বলা, আর দেশের বেশীর ভাগ লোক তাঁহাদের মত ভাল বলিয়া নিতে চায় না, ইহা স্বীকার করা একই কথা,—যদি না তাঁহারা বলিতে চান, দেশের কাহারও বড় হিতবুদ্ধি নাই—সব বাতুল—ছেলেমানুষ,—আমরা অভিভাবক হইয়া তাদের ভাল যাতে হয় তাই করিব।

এদিকে নূতন দলও বলিতেছেন না যে কংগ্রে

করিতেছি সংস্কারপ্রস্তাব অগ্রাহ্য করিব বলিয়া। এই প্রস্তাব 'গ্রহণের অযোগ্য' প্রথমে এইরূপ মত নূতন দলের নেতারা কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন. এ কথা সত্য।" কিন্তু এখন সকলেই প্রায় বলিতেছেন, প্রস্তাব আশানুরূপ ও সন্তোষজনক হয় নাই,—প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন (Respon‹ible Gorvernment) দেওয়ার কথা বিশেষ কিছু ইহার মধ্যে নাই। সুতরাং প্রস্তাব দেশের পক্ষে বাস্তবিক হিতকর ও সন্তোষজনক করিতে হইলে, অনেক পরিবর্ত্তন ইহার মধ্যে আবশ্যক হইবে। গ্রহণ কি ত্যাগের কথা এখনই কিছু হইতে পারে না,—খুঁটিনাটি সব ভাল করিয়া আলোচনা করিতে হইবে। গবমেণ্ট এ সম্বন্ধে সকলের মত চান, অকুণ্ঠিতভাবে ভালমন্দের সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়া মত প্রকাশ করিতে হইবে। এই জন্যই কংগ্রেস ডাকা হইয়াছে। দেশের রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং দেশীয় জনগণের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিবৃন্দ কংগ্রেসে সমবেত হইয়া ইহার আলোচনা করুন,—করিয়া একটা অভিমত ব্যক্ত করুন। কিন্তু মডারেটগণ প্রথমে ঐযে কে কে প্রস্তাব গ্রহণের যোগ্য নয় এই কথা বলিয়াছিলেন,তাহাই ধরিয়া বসিয়াছেন। শেষে যে সব কথা নূতন দলের প্রধানগণ বলিতেছেন, তা আমলেই আনিতেছেন না। অবশ্য নূতন দলের মত স্পষ্ট এই বুঝা যাইতেছে যে সংস্কার প্রস্তাব বর্ত্তমান আকারে মোটের উপর তাঁহারা সন্তোষজনক বলিয়া মনে করেন না, এবং কি কি পরিবর্ত্তন হইলে সন্তোষজনক হইতে পারে, তাহাও তাঁহারা বলিতেছেন। তাঁহাদের কথা তাঁহারা দেশের লোককে বুঝাইতেও প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। সকলেই ইহা করিয়া থাকে। মডারেটগণও তা করিতেছেন। কেন করিবেন না ? ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি—যে কোনও বিষয়েই হউক, যে যাহা ভাল মনে করে, তাহাই লোককে বুঝাইতে চায়, সেই মতই যাহাতে সকলে গ্রহণ করে, তার জন্য চেষ্টা করে। ব্যক্তি হিসাবে কি দল হিসাবে এইরূপই সর্ব্বত্র হইয়া থাকে, ইহাই স্বাভাবিক। নূতন দল আপনাদের মত জোরে প্রচার করিতেছেন, কংগ্রেসে সেই মতই প্রবল করিবার চেষ্টা করিতেছেন। মডারেটগণও আপনাদের মত সমান জোরে প্রচার করিতেছেন— এবং কংগ্রেসেও সেই মত প্রবল করিবার চেষ্টাতে কোন বাধা তাঁহাদের নাই। তাহা না করিয়া, তাঁহারা যে কংগ্রেস হইতে সরিয়া দাঁড়াইতেছেন, ইহাতে ইহারই প্রমাণ হয় যে তাঁহারাও বুঝিয়াছেন দেশের লোকমতের প্রাধান্য আর তাঁহাদের পক্ষে নাই।

তাই যদি হয়, তাহা হইলেই বা কংগ্রেস একেবারে ত্যাগ কেন তাঁহারা করিবেন ? আমাদের মত খাট হইবে, সুতরাং দেশের প্রতিনিধি সভায় যাইব না,—এ কথা বর্ত্তমান এই গণতন্ত্রবাদের যুগে বলা চলে না বস্তুতঃ তাঁহারাও এ কথা বলিতেছেন না। তাঁহাদের যুক্তি এই যে কংগ্রেসে সকল প্রদেশের মোট ভোটে সংস্কারপ্রস্তাব বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তোষজনক বা গ্রহণের যোগ্য নয় বলিয়া ঘোষিত হইবে। এইরূপ মতঘোষণার ফলে সংস্কারপ্রস্তাব বৃটিশ মন্ত্রিসভা ও পার্লামেণ্ট এখন ত্যাগ করিতে পারেন, এবং তাহাতে দেশের সর্ব্বনাশ হইবে ইহা বাস্তবিকই ছেলেভুলানর মত কথা। এই প্রস্তাব লইয়া দেশে দুই দলে আন্দোলন ও বাদপ্রতিবাদ কম হইতেছে না। ইহা মন্ত্রিসভা বা পার্লামেণ্টেরও অবিদিত রহিতেছে না। এখন কংগ্রেসে ভোট নেওয়ার যে নিয়ম আছে, তাহাতে যদি সকল প্রদেশের মেজরিটীর ভোটে প্রস্তাব সন্তোষজনক বা গ্রহণীয় নয় বলিয়াই ঘোষিত হয় অথবা যে পরিবর্ত্তন ইহারা প্রস্তাব করেন, তাহাও অতি বাড়াবাড়ি রকমই হয়, তবে ভারত গবর্ণমেণ্ট, বৃটিশ মন্ত্রিসভা ও পার্লামেণ্ট কি এমনই স্থূলবুদ্ধি যে তাঁহারা বুঝিবেন না, দেশের গণ্যমান্য এক প্রবীণ দল কংগ্রেসে এই মতের বিরোধী আছেন এবং এই মত দেশের একেবারে সর্ব্ববাদী সম্মত নয় ? মাইনরিটীর মত সভার মত বলিয়া প্রচার না হইলেও, মাইনরিটীর প্রতিবাদ বা protest এর অধিকার সর্ব্বত্রই আছে। মডারেটদল সত্যই যদি কংগ্রেসে মাইনরিটীতে পড়েন,—তবে কি তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিবাদ বা protest ঘোষণা করিতে পারিবেন না তাহাতেই কি ভারত গবমেণ্ট বা বৃটিশ পার্লামেণ্ট জানিতে পারিবেন না যে মডারেটগণ তাঁহাদের প্রস্তাবের পক্ষে তারপর আরও উপায় আছে। কংগ্রেসের মন্তব্য দেশের পক্ষে অহিতকর হইবে বলিয়া যদি মডারেটগণ মনেই করেন, এ কংগ্রেসের বিপরীত মন্তব্যে কেবল প্রতিবাদই যদি যথেষ্ট বলি মনে না করেন, তবে কংগ্রেসের পরেও পৃথক বৈঠকে তাঁহারা তাঁহাদের মত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিতে পারিবেন

কংগ্রেসের মন্তব্য আইনের মত মাথা পাতিয়া নিবার বাধ্যতা কাহারও নাই। মাইনরিটী অনায়াসে পরে পৃথক বৈঠক করিয়া তাঁহাদের পৃথক মত ব্যক্ত করিতে পারেন। এরূপ অবস্থায় কংগ্রেসে না গিয়া মডারেটগণ দেশের যে হিতসাধনের আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন, সে হিতসাধন কংগ্রেসে গিয়াও করিতে পারেন।

কংগ্রেস দেশের মঙ্গলের পরিপন্থী—লক্ষ্য সাধনের পথে বিঘ্ন—এমন কথা আজ বত্রিশ বৎসর পরে বড় বড় কংগ্রেস ওয়ালাদের মুখে শুনিতেও হাসি পায়। মডারেট মতাবলম্বী যত লোকের ইচ্ছা কংগ্রেসে যাইতে পারেন। কোনও বাধা তাহাতে নাই। তবু যদি কংগ্রেসে মডারেট মত না চলে, তবে বুঝিতে হইবে দেশের শিক্ষিত লোকের বেশীর ভাগই এই মতেই দেশের মঙ্গল হইবে বলিয়া ধরিয়া নিতেছে না। এ অবস্থায় একথা বলিলে দেশের বহুমতকেই অবমাননা করা হয়। অন্ততঃ মডারেটরা দেখুন, দেশের লোককে এই হিতবুদ্ধি তাঁহারা দিতে পারেন কিনা। যখন একান্তই না পারিবেন—তাহাতেই ত তাঁহাদের হিতবুদ্ধি বিনষ্ট হইবে না,—হিত-চেষ্টাও ব্যর্থ হইবে না। তাঁহাদের হিতকর মত তখনই তাঁহারা প্রচার করিতে পারিবেন। বৃটিশ গবমেণ্ট কিছু আর কংগ্রেসের মুখের কথাটি শুনিবার জন্যই বসিয়া রহেন নাই যে, যে মুহূর্ত্তে এই কথাটি বাহির হইবে, অমনই তাঁহারা তাঁহাদের প্রস্তাবটা ফেলিয়া দিবেন। মডারেট দল তাঁহাদের মতটা বুঝাইবার অবসর যথেষ্ট তখন পাইবেন। ইহা যে এখনই হইতেছে না, কি কংগ্রেসেও হইবে না, তাও নয়।

আর একটি আপত্তির কথাও ইঁহারা বলিতেছেন। নূতন দলভুক্ত অনেক উচ্ছৃঙ্খল লোক সকল সভায় গিয়া বড় উৎপাত করে,—প্রবীণ মডারেট নেতাদের বড় অপমান করে। নূতন দলের নেতারাও কেহ কেহ ইহাদের পোষকতা করেন,—অন্ততঃ ইহাদের এই উচ্ছৃঙ্খলতা সংযত করিয়া রাখিবার সামর্থ্য ইহাদের নাই। এইরূপ গোলমাল যে অনেক সভায় হয়, ইহা সত্য। আজকাল এই উচ্ছৃঙ্খলতা যে মডারেট নেতাদের বিরুদ্ধে নূতন দলের পক্ষ হইতেই বেশী হয়, একথাও অস্বীকার করা যায় না। সম্প্রতি অত্যুক্ত একদল নূতনদলের প্রধান নেত্রী শ্রীমতী এনিবেসাণ্টকেও মাদ্রাজের সভায় এইরূপ অবমাননা করিয়াছে কারণ তিনি একেবারে তাহাদের মনের মত কথা বলিতে চান নাই। কেহ কেহ ইহার সমর্থনও করিয়া থাকেন তাঁহারা বলেন,—বিলাতে ইহা আরও বেশী হইয়া থাকে এই অসহিষ্ণুতা মতের আন্তরিকতার লক্ষণ। ইত্যাদি।

আমরা একথা মানিয়া নিতে পারি না। আন্তরিক মতের সমর্থন যে ধীর সংযতভাবে হয় না, এমন নয় ঔদ্ধত্য অশিষ্টতা সুশিক্ষার পরিচায়ক নয়। ইয়োরোপে গণতন্ত্রবাদ গ্রহণ করিব বলিয়া যে তার সঙ্গে বিলাতী সক অশিষ্টতা সকল পাপই অনুকরণ করিব, এমন কথা হইতে পারে না।

যাহা হউক, ইহা অপরিহার্য্য নহে। নূতন দলের ধীর বুদ্ধি নেতৃবৃন্দ একটু আগ্রহে চেষ্টা করিলে যে এই উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করা যায় না, তা নয়। আর তাঁহারা যে তা করিবেনই না,—অতীতে যদি কোনও ত্রুটি করিয়া থাকেন, জিদ করিয়া এখনও তাই ধরিয়া চলিবেন, এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। এ সম্বন্ধে ইঁহারা এক প্রতিশ্রুতি দিলেই এ আপত্তি মিটিয়া যায়, এবং কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পক্ষে ইহা একটা অলঙ্ঘনীয় আপত্তি বলিয়া ধরা যায় না।

দেশের মডারেট নেতৃবৃন্দ যে এসব কথা বোঝেন না—তা বলিতে পারি না। কিন্তু তবু এই সব আপত্তি দেখাইয়া তাঁহারা কংগ্রেসে যাইবেন না পণ করিয়াছেন। কি আর বলিব? ঘুমন্ত মানুষ জাগান যায়, কিন্তু জাগিয়া যে ঘুমায় তাকে কেহ জাগাইতে পারে না।

বিরোধ কোথায়?

এই যে এত বড় একটা দলাদলি ভাঙ্গাভাঙ্গি হইতেছে ইহার মধ্যে আসল বিরোধের মূল যে কোথায় তাহা বুঝিয়া উঠা দুঃসাধ্য। সংস্কার প্রস্তাব যে বর্ত্তমান আকারে ঠিক পছন্দ মত হয় নাই, ইহা দুই দলেরই অভিমত। মডারেট হোমরুলার—দুই দলই বলিতেছেন, এই প্রস্তাবের সংস্কার বা পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

কেবল, মোটের উপরে প্রস্তাবটা ভাল বলিব কি মন্দ বলিব—বিবাদ চলিতেছে, এই কথা লইয়া। প্রস্তাবে কি কি পরিবর্ত্তন আবশ্যক, নূতন দলের পক্ষ হইতে কতক কতক কথা তার পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু মডারেট দল—

এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন বলিয়া ত মনে হয় না। তবে সম্প্রতি তাঁহারা বলিতেছেন, নূতন দল যে সব পরিবর্ত্তন চাহিতেছেন, তা বড় বেশী, অত চলিবে না, কর্ত্তৃপক্ষ অতটা ছাড়িয়া দিতে এখন চাহিবেন না। তাই, তাঁহারা আরও বলেন, কংগ্রেসে সংস্কারপ্রস্তাব একেবারে অগ্রাহ্য করা না হউক, নূতন দল ইহার রদবদল সম্বন্ধেও এত বাড়াবাড়ি দাবী করিবেন যে তাহা অগ্রাহ্য করার সামিলই হইবে। সুতরাং কংগ্রেসে তাঁহাদের না যাওয়াই ভাল। এই অজুহাতের মূলেও যে কোনও ভাল যুক্তি আছে এমন দেখিতে পাই না। প্রথম কথা এই, মোটের উপর ভাল বলিব কি মন্দ বলিব ইহাই যদি বিরোধের প্রধান কারণ হয়—অন্ততঃ উপর উপর তাই দেখা যাইতেছে বটে—তবে বিরোধ এমন একটা শক্ত বিরোধ নয়। মোটের উপর ভাল কি মন্দ কিছুই না বলিয়া সংস্কারপ্রস্তাব বাস্তব পক্ষে দেশের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী করিতে হইলে এই এই পরিবর্ত্তন আবশ্যক—এই ভাবে একটা আপোষ অনায়াসে হইতে পারে, যদি না কোনও এক পক্ষের অতি অসঙ্গত একটা জিদ অন্য রকম থাকে। তারপর কি কি বিষয়ের পরিবর্ত্তন আবশ্যক সেই কথা। ইহা লইয়াইবা ভাঙ্গাভাঙ্গির মত অমিল একটা কেন হইবে? মডারেটগণ বলিতেছেন, নূতন দল এত বেশী চাহিতেছেন, যা চলিতে পারে না, কর্ত্তৃপক্ষের গ্রাহ্য হইতে পারে না। তা নাই হউক, বেশী কিছু চাহিলে এমন ক্ষতি কি? সিকির বেশী পাইব না বলিয়া টাকাটা চাহিব না কেন? একটা কথাও ত আছে, 'টাকাটা চাহিলে সিকিটা মেলে'। এ অবস্থায় মোটে সিকি চাহিলে হয়ত আনিটার বেশী কিছুই মিলিবে না। যাহাই হউক, বৃটিশ পার্লামেণ্ট কতটা দিবেন না দিবেন, তা যে ঠিক আমাদের চাওয়ার উপরেই নির্ভর করিতেছে, তা নয়। বেশী চাহিয়াছি বলিয়া কমও যে পাইব না, এমন কি কারণ হইতে পারে? তারপর, কংগ্রেসওয়ালারা ত এই বত্রিশ বৎসর যাবৎ কতই চাহিতেছেন, পাইয়াছেন এ পর্য্যন্ত তার কতটুকু? এতদিন যদি তাঁহারা পাওয়ার অনেক বেশী চাহিয়াছেন, তবে আজ এই কংগ্রেসে কিছু বেশী চাহিলেই বা কি সর্ব্বনাশটা হইবে? এতদিন যদি ইহাতে কর্ত্তৃপক্ষের বিরক্তির ভয় কেহ না করিয়া থাকেন, তবে আজ এত ভয় কেন? এতদিন যদি ইহাতে অবমাননা কিছু না হইয়া থাকে, আজ কংগ্রেসের এত মান কিসে বাড়িল?

মোট কথা, এসব আপত্তি কোনও কাজের আপত্তিই নয়। আসল কারণ রহিয়াছে ভিতরে। যাক্, তাহা আর ঘাঁটিয়া বাহির করিতে চাই না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া মডারেট নেতৃবৃন্দ শ্বেতাঙ্গ-রাজপুরুষগণের যতই প্রিয়পাত্র হইবার আশা করুন দেশীয় শিক্ষিত সাধারণের প্রকৃত রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব তাঁহারা হারাইলেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও ব্যক্তিত্বের মহিমা যত বড়ই হউক, দেশের শিক্ষিত সমাজের কাছে কংগ্রেসের মহিমা তার চেয়ে অনেক বড় যদি তাঁহারা ভাবিয়া থাকেন, যেহেতু কংগ্রেসকে নূতন দল দখল করিয়াছে, কংগ্রেসটাকে আমরা ভাঙ্গিয়া দিব অথবা ইহাকে অতি নগণ্য একটা বাজে সভায় পরিণত করিব তবে তাঁহারা বড়ই ভুল বুঝিয়াছেন। নূতন দল দশ বৎসর আগে সুরাটের কংগ্রেসের সময় যাহা ছিল এখন আর তাহা নাই। তখন যাহারা ছোকরা ছিল, দশ বৎসরে তাহারা অনেক বড় হইয়াছে। ক্ষমতাপ্রতিপত্তি তাহাদের অনেক এখন বাড়িয়াছে। দেশের লোকমত যে এখন তাহাদের পক্ষে, তাহার সাক্ষ্য মডারেটরা নিজেরাই দিতেছেন। সে দিনও আর নাই। তখন যাহা সম্ভব হইত এখন হইবে না। তারপর মডারেট নেতারা সকলেই একেবারে 'পাক্কা' মডারেট নন। সকলেই যে বোম্বের ওয়াচা আর বাঙ্গালার সুরেন্দ্রনাথের জিদে কংগ্রেস ত্যাগ করিবেন এমন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। সেদিন যে কলিকাতায় মডারেট-মজলিসে ঠিক হইল, তাঁহারা কংগ্রেসে যাইবেন না,—দেশের বড় বড় মডারেট নেতা কয়জন সেখানে আসিয়া এই মতে ভোট দিয়াছেন? খ্যাতনামা কেহ কেহ বরং আপোষের পক্ষেই ছিলেন।

কংগ্রেস যদি জাঁকিয়া তার অধিবেশন সম্পন্ন করিতে পারে, কংগ্রেসের মন্তব্য যদি সঙ্গত ও সমীচীন হয়, আর দেশের লোক সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়াই তাহা গ্রহণ করে তবে কংগ্রেস-বিমুখ এই মডারেট নেতাদের মুখ তখন কোথায় থাকিবে? দেশের নেতৃত্বে কোথায় তাহাদের স্থান রহিবে?

একথাটাও যে বিচক্ষণ নেতৃগণ বোঝেন না তা নয়। বুঝিয়াও তাঁহারা এইরূপ করিতেছেন,—আসল কারণ আরও ভিতরে।

যুদ্ধের গতি—ভারতের বিপদ।

ফরাসী রণাঙ্গণে জর্ম্মাণ এখন হঠিতেছে। গত কয়েক মাস যাবৎ জর্ম্মাণসেনা জোর চাপের উপর চাপ দিয়া

পেরিসের দিকে এবং ক্যালে প্রভৃতি ইংলণ্ড-অভিমুখী বন্দরের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছিল। ইতিমধ্যে আমেরিকার বহু সেনা আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাদের সহায়তায় ফরাসীইংরেজের উল্টা চাপে জর্ম্মাণসেনাকে আবার হঠিতে হইতেছে। জর্ম্মাণসেনা পুরাতন লাইনে আবার স্থান নিতেছে। জর্ম্মাণীর পক্ষে পেরিস বা ক্যালে দখল করা এখন আর সম্ভব হইবে বলিয়া বোধ হয় না। এদিকে মিত্রপক্ষও যদি জর্ম্মাণবাহিনীকে ঠেলিয়া ফ্রান্স ও বেলজিয়াম ছাড়াইয়া একেবারে জর্ম্মাণীর মধ্যে নিয়া না ফেলিতে পারেন, তবে কিনারাও কিছু হইবে না, লম্বা একটা শক্ত ঠেকাঠেকিতে গিয়া অবস্থাটা দাঁড়াইবে। যদি তা হয় তবে জর্ম্মাণী বৃটিশশক্তিকে জব্দ করিবার উদ্দেশ্যে এসিয়ায় অভিযান করিয়া ভারতের দিকে বড় একটা চাপ না দিয়া যে ছাড়িবে, এমন বোধ হয় না। রুষিয়ার পতনে পারস্য ও তাতারের মধ্য দিয়া আফগানিস্থান ও কাশ্মীরের দিকে জর্ম্মাণীর পথ যে অনেকটা মুক্ত একথা সকলেই এখন জানেন। ইহাও সকলে জানেন যে কোনও কোনও জর্ম্মাণ সেনানায়ক এবং জর্ম্মাণীর বহু চর এই সব অঞ্চলে এইরূপ একটা গোলমাল বাধাইবার আয়োজনেও ব্যাপৃত আছেন। পশ্চিমসীমান্তে যুদ্ধের বর্ত্তমান গতি দেখিয়া প্রধান রাজপুরুষ কেহ কেহ ভারতের এই বিপদের আশঙ্কার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। এজন্য ভারতীয় সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজনও বিশেষভাবে তাঁহারা অনুভব করিয়াছেন। সম্প্রতি ভারতীয় ভারতরক্ষী ফৌজও বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু ভারতের সৈন্যবল বাড়াইবার পক্ষে যে সব অন্তরায় আছে, তাহা দূর করিবার পক্ষে তেমন কোনও চেষ্টা কর্ত্তৃপক্ষের দেখিতেছি বলিয়া মনে হয় না। আমাদের মোট কথা এই যে ভারতীয় সৈনিক ও সেনানায়কগণ বেতনে ও পদমর্য্যাদায় যদি বৃটিশ সৈনিক ও সেনানায়কগণের সঙ্গে একেবারে সমান অধিকার পায় তবে ভারতবাসীর সৈন্যদলে যোগ দিতে যে উৎসাহ ও আগ্রহ হইবে, অন্যথা সেরূপ হইতে পারে না,—বিশেষ শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহার কমে যে সন্তুষ্ট হইবেন, এমন মনে হয় না। সিভিল বা অসামরিক রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বৃটন ও ভারতবাসী একই কার্য্যে মোটের উপর একই বেতন—একই অধিকার ভোগ করিয়া থাকেন; তবে সামরিক ক্ষেত্রে এত বড় একটা পার্থক্য থাকিবে কেন? সিপাহীর বেতন বাড়িবার কথা হইয়াছিল, বাড়িল ... মধ্যে মধ্যে থোক এক একটা পারিতোষিক বা ভা... তারা পাইবে এইরূপ ব্যবস্থা হইতেছে মাত্র। সেনানায়ক... যেটুকু যেভাবে দেওয়ার কথা হইয়াছে, তাহাও যে বি... সন্তোষজনক বা লোভনীয় হইয়াছে, এরূপ বলিতে পারি না... মোটের উপর দেশের বিপদ যে কত বড় হইতে পারে, ই... জানিয়াও দেশবাসীর মধ্যে দেশরক্ষার জন্য অস্ত্র ধরি... তেমন আশাপ্রদ একটা উৎসাহ উদ্যমের ভাব দেখিতেছি না... ইহা ভাল কথা নয়। কর্ত্তৃপক্ষের ইহা বেশ বুঝা উচি... প্রকাণ্ড একটা নির্জীব রণবিমুখ জাতিকে সজীব ও রণো... করিয়া তুলিতে হইবে,—ইহা যেমন তেমন ভাবে হওয়া শ... অনেক আশা, অনেক লোভ দেখাইয়া ইহা করি... হইবে। বিপদ যদি সত্যই আসন্ন হয়, বিশেষ উদ্যমে স... উচ্চ অধিকার দিয়া গবর্মেণ্টে দেশের লোককে ডা... নতুবা হয়ত সময় চলিয়া যাইবে, অসময়ে হাজার করিলেও ... গুছাইয়া উঠা দুঃসাধ্য হইবে। বিপদ ভারতবাসী প্রজা ... বৃটিশরাজশক্তি উভয়েরই সমান। কিন্তু এই বিপদ বার... যথোচিত ব্যবস্থা করা রাজশক্তিরই হাতে। তাঁহারা ... করাইলে ভারতবাসী কিছুই করিতে পারে না।

বস্ত্র-সমস্যা।

বস্ত্র সমস্যা বড় অসহনীয় একটা কঠিন সমস্যায় উপ... হইয়াছে। চারিদিকে হাহাকার উঠিয়াছে। অন্নের দু... অনেক এদেশে হইয়াছে, অনেক দুঃখ লোকে তা... পাইতেছে। কিন্তু এই বস্ত্র-দুর্ভিক্ষ তার চেয়েও যেন ... দুঃখের হইয়াছে। কুলনারী বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যা ক... ইহা অপেক্ষা গ্লানির কথা আর কি হইতে পারে?

ইহার প্রতিকার সম্বন্ধেও অনেক আন্দোলন হইতে... অনেকেই হাত চরকায় সূতা কাটিয়া হাতের তাঁতে ক... বুনিয়া নিবার কথা বলিতেছেন। কিন্তু পূর্ব্বেও আ... বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, তাহা চলিবে ... আপাততঃ কিছু প্রতিকার হয়ত হইতে পারিত। ইহার আয়োজন করিতে করিতে যদি যুদ্ধ শেষ হয়, বিলাতী কলের সূতা আর কলের কাপড় আসে, হ... চরকা ও তাঁত উঠিয়া যাইবে। আয়োজনের খরচই যাইবে। কেহ কেহ আবার বলিতেছেন প্রতিজ্ঞা 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' পরিব, বিদেশীয় ...

মিহি কলের কাপড় ত্যাগ করিবে। এ প্রতিজ্ঞা একদিন ত দেশের লোক করিয়াছিল। কিন্তু রাখিতে পারিল কই? কেন পারিল না, তার আলোচনা এখন বড় অপ্রিয় হইবে। দেশের লোকের বিলাসিতা বা পণের শিথিলতা যে ইহার কারণ তা বলিতে পারি না। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে যাহা বুঝিয়াছি, ইতিহাসের সাক্ষ্যও যেরূপ জানি, তাহাতে ইহাই বুঝি, যে দেশের কোনও শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশী সুলভ দ্রব্যের প্রতিযোগিতার মুখে দেশে চালাইতে হইলে গবর্মেণ্টকে Protcetion Po'icy অথবা ব্যবসায়িক রক্ষানীতি অবলম্বন করিতে হয়। যে দেশে ইহা হইয়াছে, গবর্মেণ্টের আইনের বলেই হইয়াছে। গবমেণ্ট এই নীতি অবলম্বন না করিলে, অথবা ইহার বিরোধী হইলে, প্রজার সাধ্য নাই কেবল 'বয়কটে'র বলে বিদেশী সুলভ দ্রব্য দূর করিয়া বেশী দরের দেশের দ্রব্য দেশে চালায়। আমাদের গবমেণ্ট যে এই নীতি অবলম্বন করিবেন, সে ভরসা কোথায় পাইতেছি?

কাপড়ের এত চড়াদর যে মাড়োয়ারী বণিকদের জোটে অনেকটা হইয়াছে, নানা অবস্থা দেখিয়া এইরূপ আমাদের মনে হয়। কলিকাতার বাজারে ঘুরিয়া দেখিয়াছি, মজুত কাপড় যে কোনও দোকানে আগের তুলনা'য় অনেক কম, এরূপ অবস্থা চক্ষে পড়ে নাই, কাহারও পড়িবে না। এই সব কাপড় আগের প্রস্তুত বা আগের আমদানী। উৎপাদনের ব্যয় যে খুব চড়া পড়িয়াছিল, যাহাতে অল্পমূল্যে বিকান যায় না, তা বলিতে পারি না। মাড়োয়ারী বণিকগণ যে খুব টাকা করিতেছেন, তাহারও লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি। আজকাল অসম্ভব চড়াদরে তাঁহারা কলিকাতার জমি কিনিতেছেন। সম্প্রতি শুনিলাম, শ্রীযুক্ত ডাক্তার কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয় প্রচার করিতেছেন, মাড়োয়ারীরা তাহাকে কাপড় যোগাইবেন, জোড়া তিন টাকা মূল্যে মোটা কাপড় তিনি ত্রিশ টাকার নিম্নে মাসিক আয় যাহাদের তাহাদের নিকট বিক্রয় করিবেন। কেমন করিয়া এই বিক্রয়ের বন্দোবস্ত হইবে বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু মাড়োয়ারীরা দরিদ্রের জন্য যদি তিন টাকা জোড়ার কাপড় যোগাইতে পারেন, তবে অদরিদ্রের নিকট জোড়ায় ৫।৬ টাকা করিয়া নিবেন কেন? তিন টাকা জোড়ায় কি তাঁহারা লোকসানে কাপড় বেচিবেন? লোকসান ত বড় কম হইবে না! বাঙ্গলাদেশে এমন দরিদ্রই যে অনেক বেশী। এই সব অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, কেবল পড়তায় বেশী পড়ে বলিয়া নয়, সময়ের সুযোগ দেখিয়া জোট বাঁধিয়াই তাঁহারা কাপড়ের দর চড়াইয়া রাখিতেছেন। যদি ইহা আংশিকও সত্য হয়, তবে সহজ প্রতিকার গবর্মেণ্টের হাতে। কয়লার দাম, খাবানের দাম, কেরোসিনের দাম তাঁহারা যেমন বাঁধিয়া দিয়াছেন, কাপড়ের দামও তেমনই বাঁধিয়া দিতে হইবে। যদি তাহা সম্ভব না হয়,—তবে বড় দুর্ভিক্ষে লোকে যাহা করে আমাদের তাহাই করিতে হইবে। কাপড়ে বাবুয়ানা একেবারে ছাড়িতে হইবে, যত দূর সম্ভব কম কাপড় পরিয়া চলিতে হইবে, ধোপার বাড়ী না দিয়া কাপড় বাঁচাইতে হইবে, ঘরে পুরুষদের ছোট ছোট মোটা কাপড়ের খণ্ড কোমরে জড়াইয়া লজ্জা নিবারণ করিতে হইবে। আর যারা নিতান্তই দরিদ্র, এত চড়াদরে কাপড় কিনিতেই পারে না, অন্নদুর্ভিক্ষে যেমন চাঁদা তুলিয়া অন্ন বিতরণের ব্যবস্থা করিতে হয়, এই বস্ত্রদুর্ভিক্ষে তেমনই বস্ত্রবিতরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সর্ব্বত্র সহায়ক সমিতি গঠিত করিতে হইবে এবং তাঁহাদের সাহায্যে চাঁদা তুলিয়া কাপড় কিনিয়া বা ভিক্ষা করিয়া দরিদ্র পরিবারে তাহা অল্পমূল্যে বিক্রয় অথবা বিতরণ করিতে হইবে। বিতরণ অপেক্ষা অল্পমূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থাই ভাল। তাহাতে অপব্যবহার কম হইবে, ব্যয়ও কম পড়িবে। দেশের জননায়কগণ সকলেই প্রায় রাষ্ট্রীয় কলহে আকণ্ঠমগ্ন হইয়া হাবুডুবু খাইতেছেন,—তাঁহাদের দ্বারা এ কাজ হইবে না। রামকৃষ্ণ মিশন এবং অন্যান্য যত সেবক সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা এই মহাব্রত গ্রহণ করিলেই ভাল হয়। তবে রাষ্ট্রীয় নেতাদেরও বলি, এই সব বড় বড় দুর্ব্বিপাকে দেশের দীনদুঃখী জনসাধারণের হিতসাধনে যদি তাঁহারা ব্রতী হইতে পারেন, তবেই সেই জনসাধারণ তাঁহাদিগকে আপনাদের প্রকৃত নেতা বলিয়া মানিবে। নতুবা তাঁহারা কেবল নাগরিক সভায় সখের বক্তা নেতাই রহিবেন,—নেতৃত্বের বিলাস তাঁহাদের যতই হউক, কর্ম্মে কোনও প্রতিষ্ঠা হইবে না।

আর একটি বড় কথা বলিবার আছে। বাজার গুজব এই যে পূজার বাজারে কাপড়ের দাম আরও অনেক চড়িবে। কেন চড়িবে না? জোট বাঁধা যদি হইয়াই থাকে, তবে এই মরসুমে লাখে পাঁচ লাখ করিয়া কাপড়ের গুদামওয়ালারা লাভ করিবে না কেন? এক মাসেই যে তারা রাজা হইয়া যাইবে! বিক্রেতারা যখন জোট বাঁধিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দর চড়ায়, এক গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রতিকার করিতে পারেন,—আর তা যদি না হয়, তবে ক্রেতাদেরও পাল্টা জোট বাঁধা ছাড়া এই অত্যাহিত দমনের আর কোনও উপায় নাই। তবে স্থায়ীভাবে এরূপ জোট বাঁধা বড় শক্ত, অনেক কাঠখড় তাহাতে লাগে। তবে আগামী পূজার বাজারে মাড়োয়ারী বস্ত্রব্যবসায়ীরা যদি জোট করিয়া দর আরও চড়ায়, বাঙ্গালীক্রেতা আমরাও একটা পাল্টা জোট বাঁধিতে পারিলে কিছু করিতে পারি। পূজায় আমরা কেহ কাপড় কিনিব না,—কাহাকেও কাপড় দিব না। পূজার অঙ্গে যে বস্ত্র লাগে, তাহারও মূল্য ধরিয়া পুরোহিতকে দিতে পারি। অথবা এক পূজায় একখানি মাত্র বস্ত্র দিয়া, তাই মূল্যের

বিনিময়ে পুরোহিতের নিকট হইতে কিনিয়া নিয়া অল্প পূজার কাজ চালাইতে পারি। 'দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি'—এইরূপ শাস্ত্র বচনও আছে। তবে পূজায় যে কেবল লোকে সখের কাপড়ই কেনে, তা নয়। দরকারী কাপড়ও অনেক কেনে। কিন্তু মাস দুই কাল দরকারেও আমাদিগকে কিছু চাপিয়া থাকিতে হইবে। যদি তা পারি, পূজার একটা মাসও যদি আমরা সকল দরকার চাপিয়া একটু ক্লেশ স্বীকার করিয়া চলি, তবে বিক্রেতাদের জোট শিথিল হইবে, তারা কিছু জব্দও হইবে। বাঙ্গালী কি এমন বিপদে এই একটা মাসের জন্যও এমন একটা জোট বাঁধিতে পারিবেন না?

এই বস্ত্র সমস্যা সম্বন্ধে সম্প্রতি (২০শে আগষ্ট তারিখের) ষ্টেট্স্‌ম্যান পত্রিকায় এক্স (X) স্বাক্ষরিত একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রলেখক অনেক যুক্তি দ্বারা দেখাইয়াছেন, বর্ত্তমান মজুত কাপড়ের খরচা বেশী পড়িয়াছে বলিয়া নয়, দুঃসময়ের সুযোগ নিয়াই বস্ত্রব্যবসায়ীরা জোট বাঁধিয়া দর চড়াইতেছে। গবমে´ণ্ট এ সম্বন্ধে কোনও হস্তক্ষেপ না করায় তাহারা আরও যো পাইয়া বসিয়াছে। গত ১৩ই জুলাই, বরিশালে বঙ্গীয় লাট শ্রীযুক্ত লর্ড রোণাল্ডসে সাহেব বরিশালবাসীর প্রার্থনার উত্তরে কতকগুলি যুক্তি দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, গবমে´ণ্টের পক্ষে এ সম্বন্ধে কিছু করা সম্ভব হইবে না। ইহার পর (এবং গবমে´ণ্ট কোনও বাধা হইবে না, ইহা বুঝিবার ফলেই) কাপড়ের দর যে আরও কিরূপ বাড়িয়াছে, তার কতিপয় দৃষ্টান্তও তিনি দিয়াছেন। নিম্নে তার একটি তালিকা প্রদত্ত হইল।

কাপড়ের নমুনা		যুদ্ধের পূর্ব্বকার দর (জোড়া)	লাটসাহেবের বক্তৃতার পূর্ব্বেরদর	বক্তৃতার পরের দর
১। রেলির লাটিমমার্কা ধুতি		১।৶০	৪৸০	৬॥০
২। ঐ লাটিম ও তাগা	„	১৶১০	৪/০	৫৸০
৩। গ্রেহামের ৮৪নং	„	১॥৶১০	৫৲	৭৲
৪। ঐ ময়ূরমার্কা	„	১॥০	৪৸১০	৬।০
৫। কেটেওয়েলের কোরা থান		৬।০	১৮॥০	২৯৲

ইহার পর আর কোন টিপ্পনী অনাবশ্যক।

টাকী নোট্।

এক টাকার নোট লইয়া লোকের বড়ই মুস্কিল হইয়াছে। এই নোট হাতফের অনেক হয়, এক টুকরা কাগজ ত? তাও এমন পুরু নয়। এত হাতফেরে তা টিঁকিবে কেন? অল্প দিনেই ছিঁড়িয়া ময়লা হইয়া বিশ্রী হইয়া যায়। দোকানদারেরা নিতে চাহে না। মফঃস্বলের হাটে বাজারে সকলে বেশী বাটা দাবী করে। গবমে´ণ্ট অবশ্য ঘোষ করিতেছেন, এরূপ বাটার দাবী বে-আইনী কিন্তু এই রক ছোট ছোট বে-আইনী কাজ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা হইলে, তা প্রতিকার বড় কঠিন হয়। ডাকঘরে ও ট্রেজারীতে খুঁতো এ টাকার নিবে, এরূপ ভরসাও গবর্মে´ণ্ট দিতেছেন। কি হাটবাজারে কেনাবেচার জরুরী প্রয়োজন সর্ব্বদা এমন ভা ঘটে, যে ডাকঘরে বা ট্রেজারীতে নোট লইয়া যখন তখ বদলাইতে যাওয়াও চলে না। তাই এই নোট লইয়া বড় অসুবিধা লোকের হইয়াছে। তারপর আরও অসুবিধা কথা আছে। সাধারণ লোকে এ দেশে জামা ব্যবহা করেনা,—পকেটে কি মণিব্যাগেও টাকা রাখে না টাকাপয়সা সকলে কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া কোমরে গুজি রাখে। কাপড়ও সব যারপরনাই তেলা ময়লা, আব গরমদেশে গায়ে লোকের ঘামও কম হয় না। এ অবস্থ এই টাকী নোটের কি কিছু থাকে? পথেঘাটে লো যখন চলে, কাপড়ের খুঁটে বাঁধা টাকাপয়সা লইয়াই তা স্নানাদি করে। নোট লইয়া ত স্নান চলে না,—পাড়েই কোথায় রাখিবে? বাতাসে উড়িয়া যাইতে পা কেহ হাতে করিয়াও লইয়া যাইতে পারে। অনেকে আব এককাপড়ে শুধু গামছা দোছোটে পথ চলে, স্নানা গামছা পরিয়া কাপড় শুকাইয়া নেয়। এই বস্ত্রদুর্ভিক্ষে দিনে যে বহু লোককেই তাহা করিতে হয়, ইহা বলিলেও চলে। টাকী নোট লইয়া তাদের যে বিপদ হয়, সকলেই তাহা বুঝিতে পারিবে যদি এই যুদ্ধের দিনে রূপার টাকার বহুল প্রচার স নাই হয়, তবে কাগজের টাকী নোট তুলিয়া দিয়া কোনও ধাতুর বা ঐরূপ সুস্থায়ী কোনও দ্রব্যের 'টোকে (token) বা চিহ্ন মুদ্রা চালাইলে, ক্ষতি কি? কাগ টুকরা অপেক্ষা তার খরচ কিছু বেশী পড়িবে। কি লোকের যা অসুবিধা হইতেছে, তার তুলনায় এ খর বিবেচনা কিছুই নয়। গবমে´ণ্ট কি এই কথাটা একব ভাবিয়া দেখিবেন? কাগজের টাকী নোট অপেক্ষা এই টা টোকেন token অনেক সুবিধার জিনিশ হইবে।

উদ্বোধন।

(১)

সমুদ্রে তরঙ্গ জাগে ; গর্জ্জে ধরি' ঘোর ঝটিকায়
দিক্-অন্তে জলদ ঘনায়।
তরী কম্পমান্,
ঘন ঘন উঠে ডাক্ "সাবধান—ওরে সাবধান।"
তীরে তরুশিরে,
অন্ধকার ঘনাইয়া গ্রাম, বন ফেলিতেছে ঘিরে।
ক্রমে উঠে ঝড়,
ডুবে তরী, ভাঙ্গে পোত, বজ্রের গর্জ্জন কড়কড় ;
পাষাণ প্রাসাদ মাঝে সুরক্ষিত, ওরে বোধহীন,
নিশ্চিন্ত হইয়া বসি, কি ভাবিস্, কাপুরুষ, দীন !

(২)

কি বলিস্ "পাপী ওরা—মানেনিক বিধির বিধান,
টুটে তাই গর্ব্ব অভিমান।
ধরণীর মাঝে
দেখে নাই দেবতারে, স্বার্থ শুধু খুঁজিয়াছে কাজে ;
তাই এতদিনে
পিনাকীর রোষানল জ্বলিয়াছে তৃতীয়-নয়নে।"
ওরে জ্ঞান হারা
বিজ্ঞ সাজিবার আগে ভেবে দেখ নিজে কিরে তোরা।
তারপর খুঁজে দেখ্ অতীতের তমোমাঝে লীন
তোদের আদর্শ, যাহা অনুসৃত হ'ত একদিন।

(৩)

একদিকে রণরঙ্গে উন্মত্ত চতুরঙ্গ সেনা,
দিকে দিকে দিতেছিল হানা ;
কলিঙ্গের পথ
অবরুদ্ধ শবদেহে, ভগ্নচক্র নিপতিত রথ।
ভয়ে অধিবাসী
পলায়েছে বনমাঝে, শূন্য পড়ি' আছে গৃহরাশি ;
দূরে বা কোথায়,
বিদ্রোহীর গৃহদাহধূম উঠে গগনের গায় ;
দলিয়া মথিয়া দেশ অশোকের সেনা চলে' যায়
সমীরে শ্বসিয়া উঠে' গুরুভার হৃদি-বেদনায়॥

(৪)

আরদিকে ধ্যান-রত পীতবাস ভিক্ষুকের দল
অহিংসা প্রচারি' অবিরল,
ভোগের সাধন
করতলগত যবে, পায়ে ঠেলে করেছে গমন ;
রাজ্য ভাবি মিছে,
করঙ্ক ধরিয়া করে রাজ্যেশ্বর ছুটিয়াছে পিছে ;
রত্নবাজি ধনী
ধরার ধূলায় ফেলে, বিলাসী যে ত্যজিছে রমণী— ;
কর্ম্ম ও ধর্ম্মের শুভ সম্মিলন গঙ্গা-যমুনার,
আজিও পষাণলেখা সাক্ষী সেই মৌন-মহিমার।

(৫)

সে ছিল গর্ব্বের দিন—দৃপ্ত বীর মত্ত রণমদে
নত হ'ত সন্ন্যাসীর পদে।
বিশ্রামের গান
ভুলাত না অলসের ধর্ম্ম বলি করি মিথ্যা ভাণ ;
ভীরু, বলহীন,
মিথ্যাচারী, কাপুরুষ সঙ্গোপনে হয়ে যেত লীন।
বৈরাগ্য সাধন
কর্ম্মের জীবন যাপি' তাহাদের আছিল শোভন।
চক্ষু মুদি' গৃহে বসি' তত্ত্ববাণী কথায় কথায়
এখন তোদের ফুটে', বিশ্ববাসী হাসিয়া উড়ায়।

(৬)

ভোগের শকতি নাহি—নাহি কোন ভোগের সাধন,
ত্যাগ শুধু মুখের বচন ;
নাহিক সাহস
প্রেম, শান্তি বুলি মুখে, ভয়ে হৃদি কাতর বিবশ ;
একি উপহাস ?
অত্যাচার সহি' সহি' ক্ষমা বলি নিজেরে ভুলা'স্ ?
রাখ্ বিজ্ঞবাণী,
ছাড়্ আত্মপ্রবঞ্চনা, ধৌত কর্ যত দৈন্য গ্লানি ;
এসেছে আহ্বান আজি, রাখ্ ওরে বাঙ্গালীর মান
রাজার—দেশের তরে কর্ গিয়া আত্ম-বলিদান॥

'সিদ্ধি'-রচয়িতা।

সহধর্ম্মিণী।

(১)

বাপ মায়ের একটি মাত্র আদরের পুত্র বলিয়া, পড়া-শুনায় কোনদিন আমি একটুও অবহেলা করি নাই। প্রত্যেক বৎসরই স্কুলে, আমি ডবল প্রমোশন পাইতাম। এইজন্য স্কুলে ও পাড়ায় সকলেই আমার অত্যন্ত সুনাম করিত। লোকের মুখে অজস্র নিজের সুখ্যাতি শুনিয়া শুনিয়া একটু গর্ব্বের ভাব আমার মনে মোটেই উদয় হয় নাই এ কথা বলিলে একেবারে সত্যের অপলাপ করা হয়। তবে তাহাতে আমার কোন অনিষ্ট না হইয়া বরং উপকারই হইতেছিল। কারণ চারিদিক হইতে উৎসাহ পাইয়া বাল্যকাল হইতেই আমার জেদ হইয়াছিল যে, সকলে যখন আমায় এত ভাল বলে, তখন আমি নিশ্চয়ই খুব ভাল ছেলে হইব; খুব উচ্চ আদর্শে চরিত্র গঠন করিব।

প্রশংসার সহিত একে একে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হইয়া, যেদিন দেশে ফিরিলাম, বাড়ীর মেয়েরা সকলে এমনই একটা আনন্দের কোলাহল তুলিল— যেন আমি কত বড় এক যুদ্ধ জয় করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি।

আমার জন্মভূমি, ক্ষুদ্র একখানি পল্লীগ্রামে,—শিক্ষিত লোকের সংখ্যা সেখানে খুবই কম; তাই এম এ উপাধি-ধারী, অপূর্ব্ব জীবটিকে দেখিবার জন্য বাবার বৈঠকখানা সেদিন গ্রামের লোকের ভিড়ে ভরিয়া গেল। পাড়ার প্রবীণ ব্যক্তিরা একবাক্যে সকলেই বাবাকে বলিতে লাগিলেন, "আমরা ত বলেছিলাম চৌধুরী মশাই, বিমল আপনার একটা মানুষ হবে। ও ছেলে যে আপনার বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে তা আমরা ওর ছোটবেলা থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম।"

পরীক্ষার পর দুইটি মাস ঘরে বসিয়া কাটিল। এতদিন কলেজের পাঠ্য পুস্তকেই মনটিকে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলাম, জগতের অন্য কোন দিকেই দৃষ্টি ছিল না,—এইবার সংসারের কর্ত্তব্য সম্মুখে, কোন পথে যাইব এই চিন্তা ও জল্পনা কল্পনা দিয়া দিনের পর দিনগুলি কাটিয়া যাইতে লাগিল।

এই সময় হঠাৎ মা আমার বিবাহের প্রস্তাব তুলিলেন আমি মাথা নাড়িয়া দৃঢ়স্বরে বলিলাম, "না, মা ঐ কথা ছাড়া সব কথা তোমার শুনব, শুধু ঐ অনুরোধটি আমা[য়] কোরো না।"

মা বলিলেন—"না, আমার কথা শুন্‌বে না বই কি এই মাসের মধ্যেই আমি তোর বিয়ে দেব, কতদিন আ[গে] থেকে তাদের আমি কথা দিয়ে রেখেছি—কেবল তে[ার] পরীক্ষার জন্যে এত দেরি করেছিলাম, পরীক্ষা শেষ হয়ে গে[ছে] এখন আবার তোর কিসের আপত্তি?"

বাল্যকাল হইতেই আমার "মহা লাজুক" অপবাদ ছি[ল] বাপ মায়ের সাম্‌না সাম্‌নি দাঁড়াইয়া যে বিবাহ-সম্ব[ন্ধে] কোন তর্ক তুলিব, সে সাধ্য আমার ছিল না। কাজেই ম[া'র] কথার আর কোন উত্তর না দিয়া নীরবে ঘর হইতে বা[হির] হইয়া আসিলাম।

আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাঁহারা বিবাহের আয়োজ[ন] করিতে লাগিলেন।

দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতে লাগিল, ততই আ[মি] অস্থির হইতে লাগিলাম। তবে কি এতদিনের সঙ্কল্প আম[ার] অতল-তলে বিসর্জ্জন করিতে হইবে? পাঁচ ছয় বৎসর পূ[র্বে] কলেজের কয়েকটি বন্ধুতে মিলিয়া স্থির করিয়াছিলাম আমাদের দলের মধ্যে কেহই বিবাহ করিব না। দে[শের] কল্যাণ সাধনের জন্য জননী জন্মভূমির মঙ্গল-কাম[নায়] আমাদের জীবন উৎসর্গ করিব। কিন্তু হায়—এত স[াধ] এত আশা, এত উচ্চ মহৎ উদ্দেশ্য সকলি আমার ব্যর্থ হ[ইয়া] যাইবার উপক্রম হইল!

বাড়ীতে একটা মহা আনন্দের সাড়া পড়িয়া গে[ল] সকলেই আনন্দের উৎসবে মত্ত, কোলাহলে বাড়ী পরিপূর্ণ কেবল তার মধ্যে শুধু আমি—আমিই একা আনন্দহী[ন] রুদ্ধ আক্রোশে হৃদয়টা আমার ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছি[ল] যাহাকে লইয়া এত উৎসব, এত আয়োজন, এত আ[নন্দ] তাহার মনের অবস্থা যে কি সে কথা কাহারও জানি[বার] প্রয়োজন নাই। আমার অনিচ্ছায় নিজেদের জেদে এর[া] আমার ভবিষ্যৎটা এমনি করিয়া আষ্টে পৃষ্ঠে নাগপাশ[ে]

বাঁধিয়া দিবে ? কারণ, আমি যে বাঙ্গালীর ছেলে হইয়া জন্মিয়াছি ! অতএব—জনমের চরম উদ্দেশ্য—জীবনের সার সুখ বিবাহ আমায় করিতেই হইবে ! আমাদের বাঙ্গালী জাতির মা-বাপের পুত্রের প্রতি প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে সর্ব্ব অগ্রে তাহার বিবাহ দেওয়া ! এই কঠিন নিগড়ে পুত্রকে বাঁধিয়া দিয়া তবে পিতামাতা আত্মীয় পরিজন প্রভৃতি নিশ্চিন্ত হইবেন। তারপর পুত্রের অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক না কেন !

বিবাহের দিন প্রাতঃকাল হইতে নানাবিধ মাঙ্গলিক আচারে আমাকে উৎত্যক্ত করিয়া তুলিল, বিকাল বেলা একটু নিষ্কৃতি পাইলাম। বিদ্রোহী মনটাকে কিছুতেই দমন করিতে পারিতেছিলাম না, বিরক্ত মনে বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া সম্মুখের মাঠে বেড়াইতে লাগিলাম, বাহিরে মুক্ত বাতাসে মনের ভিতরকার গরমটা যদি কাটিয়া যায়, এই আশায়। কিন্তু বাড়ীর ভিতর হইতে আগত ঘন ঘন শাঁখের মঙ্গলধ্বনি, আর আনন্দের কলহাস্য আমায় অধীর করিয়া তুলিল। আর দুই তিন ঘণ্টা মাত্র ! তারপর—এরা আমার এই মুক্ত স্বাধীন জীবনটাকে শৃঙ্খলিত করিবে ! এই নিগড় পরাইবার জন্য এদের এত আনন্দ উচ্ছ্বাস ! ইহাতে বাধা দিবার শক্তি কি আমার নাই— ? আমি কি এতই দুর্ব্বল ? এমনই শক্তিহীন ?

কিন্তু যদি আমি—এই শৃঙ্খল পরিবার পূর্ব্বে দূরে পলাইয়া যাই ! এখনই, এই মুহূর্ত্তে—

অজ্ঞাতে কে যেন আমায় টানিতে লাগিল, যেন কাহার প্রবল আকর্ষণে এক পা দুই পা করিয়া শেষে আমি ছুটিতে সুরু করিলাম।

আমাদের বাড়ীর ভিতর হইতে নহবতে যে পূরবী-রাগিণীর সুর সান্ধ্যবাতাসে মাঠের চারিধারে ফিরিয়া বেড়াইতেছিল, আমার কাণে তাহা ক্রমে অস্পষ্ট—আরও অস্পষ্ট হইয়া আসিল। ... ...

(২)

কলিকাতায় আসিয়া বন্ধু বান্ধবের সাহায্যে মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইলাম। তারপর ডিপ্লোমা পাইয়া প্রধান চিন্তা হইল কোথায় প্র্যাক্‌টিস্ করি !

অনেক দিন মায়ের স্নেহের কোল ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম, তাঁর কাছে যাইবার জন্য মনটা বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু যাইবার উপায় নাই। আমার ছোট বোন্ বীণার পত্রে খবর পাইয়াছিলাম যে বিবাহের দিন আমার অকস্মাৎ পলায়নে বাবা একেবারে নাকি রাগিয়া অগ্নিমূর্ত্তি হইয়াছিলেন, আর এখনও পর্য্যন্ত তাঁর সে রাগ পড়ে নাই। বীণার প্রত্যেক পত্রেই আমি খবর পাইতাম যে মা আমার জন্য নিত্যই ক্রন্দন করেন। আমি কিন্তু তথাপি বাবার ভয়ে প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও বাড়ী যাইতে পারিলাম না।

পুরী হইতে আমার এক বন্ধু পত্র লিখিলেন—"এখানে এসে প্র্যাক্‌টিস্ কর—পসার হবে।"

বিদেশে যাইবার ইচ্ছাই তখন আমার মনে হইতেছিল। বন্ধুর পত্র পাইয়া খুবই খুসি হইলাম, যাইবার জন্য বন্দোবস্ত করিতেছি—এমন সময় এক টেলিগ্রাম পাইলাম বাবার কলেরা হইয়াছে।

তখনই দেশে ছুটিলাম—বাড়ীতে গিয়া পা দিতেই বুক-ফাটা ক্রন্দনের রোল উঠিল, সব শেষ হইয়া গিয়াছে। মাকেও আমার ঐ কালরোগে ধরিল, তাঁকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিলাম কিন্তু পারিলাম না, আমার হাতখানা বুকে চাপিয়া ধরিয়া তিনি চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদিলেন। আর হতভাগ্য আমি—মায়ের সেই ছোট ছোট পা দুখানির তলায় মুখ লুকাইয়া আর্ত্তস্বরে জনমের মত শেষ ডাকা—ডাকিলাম—'মা, মা, মা আমার !' ... ...

শ্রাদ্ধাদি শেষ হইয়া গেল। বীণাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়া দিয়া দিন কয়েক পরে আমার সেই ক্লাসফ্রেণ্ড হীরুর কাছে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

পুরীতে আসিয়া যখন ট্রেণ থামিল তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি সুরু হইয়াছে, ছাতা খুলিয়া যেমন নামিয়া দাঁড়াইয়াছি, —অমনি দশ বারজন পাণ্ডা আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বাহির হইবার পথ পাই না, বিরক্ত মুখে পাণ্ডাদের বলিলাম—"পথ ছাড় বাপু,—আমি যাত্রী নই ! কিন্তু সে কথা শুনে কে ? অতিকষ্টে তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া হীরেনের বাসার উদ্দেশে চলিলাম।

একেবারে বারান্দায় উঠিয়া ডাকিলাম—"হীরু" !

একখানা "মাসিক পত্র" হাতে লইয়া সে, আরাম কেদারায় পড়িয়াছিল,—আমার আহ্বানে সচকিত ভাবে উঠিয়া বলিল—"আরে কে ও বিমল নাকি ? একেবারে খবর না দিয়েই উপস্থিত যে হে !

আমার নিকটে আসিয়া মুখের পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিল "একি! তোমার এমন চেহারা হয়েছে কেন বিমল? অসুখ হয়েছিল নাকি!"

আমি একটু দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিলাম—"না ভাই, অসুখ বিসুখ কিছুই নয়, আজ আমি সব হারিয়ে তোমার কাছে এসেছি। এখন এ অভাগাকে একটু স্থান দাও ভাই।"

একে একে সকল ঘটনা শুনিয়া সে, দুই হাতে আমায় বক্ষে জড়াইয়া ধরিল, তার বুকের স্নিগ্ধ আশ্রয়টিতে মাথা রাখিয়া আমি ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

তারপর প্রায় ছয়মাস কাটিয়া গেল।

আনন্দময় হীরু,—তার হাসির স্রোত দিয়া আমার মলিন বিষাদমাখা হৃদয়টাকে ধোয়াইয়া দিতে লাগিল, আবার মনে বল আসিল, কার্য্যের উৎসাহ ফিরিল,—দুই বন্ধুতে দেশের নানা কল্যাণে সমুদয় শক্তিটুকু ঢালিয়া দিতে লাগিলাম। হীরুর মতলবে এক ডাক্তারখানা খুলিলাম, প্রত্যহ অনেক অনাথ আতুর রোগী জুটিতে লাগিল; শেষে এত ভিড় আরম্ভ হইল যে স্নান আহারেরও সময় পাইতাম না।

বৎসর ঘুরিবার পর,—একদিন রাত্রে হীরু বেড়াইয়া আসিয়া বলিল—"তোমার জন্যে একটা কেস্ জোগাড় করেছি হে! যদি ভাল করতে পার কিছু পেয়ে যাবে। বেশ পয়সাওলা লোক।"

আমি তখন নিবিষ্ট মনে বসিয়া বসিয়া প্রবন্ধ লিখিতেছিলাম—টেবিলের উপর হইতে মুখ না তুলিয়াই তাহাকে বলিলাম—"হলই বা সে পয়সাওলা লোক, তাতে আমার কি! আমি কি পয়সার প্রত্যাশায় ডাক্তারি করি তাই ওকথা বলছিস্? এ ডাক্তারি করা আমার সখের—নইলে বাবা যা রেখে গেছেন, আমার একটা পেটের জন্যে কি কোন ভাবনা আছে?"

লজ্জিত হইয়া হীরু আমার কাছে সরিয়া আসিয়া আস্তে আস্তে বলিল "তাকি আমি জানি না ভাই, ঠাট্টা করে বল্লাম। যাক্—কিন্তু তোমাকে একবার ওঁদের বাড়ী যেতে হবে বিমল, আমি ভদ্রলোককে কথা দিয়ে এসেছি।"

আমি তাহাকে একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিলাম—"এখন তুই যা,—আমায় লিখতে দে, কাল তখন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।"

পরদিন সন্ধ্যার সময় হীরু রোগী দেখিবার জন্য আমায় টানিয়া লইয়া চলিল, সমুদ্রের ধারে নানা রকম ফুলগাছে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছোট্ট সুন্দর একখানি বাঙলা। বাঙলাখানি আঙুল দিয়া দেখাইয়া হীরু আমায় বলিল—"এর মালিক হচ্ছেন ব্যারিষ্টার জলধিবরণ বাবু।"

বাঙলার নিকটে গিয়া সে একজন চাকরকে দেখিয়া বলিল—"ডাক্তার বাবু এসেছে—বাড়ীতে খবর দিগে যা।"

চাকরের নিকট সংবাদ পাইয়া জলধিবাবু নিজেই আসিয়া আমাদের অভ্যর্থনা পূর্ব্বক ভিতরে লইয়া গেলেন। সম্মুখে বড় হলে হীরুকে বসাইয়া—আমায় বলিলেন, "চলুন—আপনার কেস্ দেখবেন চলুন।"

দ্বিতলে উঠিলাম।

সুসজ্জিত একখানি ঘরের সম্মুখে গিয়া জলধিবাবু ডাকিলেন—"লিলি!" ঘরের মধ্য হইতে ক্ষীণস্বরে উত্তর আসিল—"ভিতরে আসুন!"

প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—সোফার উপর একটি যুবতী অবসন্নভাবে পড়িয়া আছেন, তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিলাম দুরন্ত রোগ বহুদিন পূর্ব্বে হইতে আক্রমণ করিয়া তার সুন্দর শ্রীটুকুকে একেবারে লুপ্ত করিয়া দিয়াছে। দেহ জীর্ণ—কঙ্কালসার—মুখখানি পাংশু, রক্তের লেশ মাত্র নাই। একজন চাকর আসিয়া দুইখানা চেয়ার লিলির নিকট সরাইয়া দিল, আমরা তাহার উপর বসিলাম। জলধিবাবু লিলির একখানি হাত ধরিয়া স্নেহমাখা স্বরে বলিলেন "লিলি! এঁর কথাই আজ সকালে তোমায় বল্‌ছিলাম, তোমার যা যা কষ্ট হয়, সব তুমি এঁকে খুলে বল!" আমি ঘরে প্রবেশ করিয়া পর্য্যন্ত লিলিকে একবারও আমার পানে চাহিতে দেখি নাই। জলধিবাবুর কথা শেষ হইলে পর সে প্রথম আমার পানে তার বড় বড় চক্ষুদুটি মেলিয়া চাহিল, তারপর আমার সহিত তার দৃষ্টি বিনিময় হইতেই যেন একটু শিহরিয়া উঠিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া ফেলিল। আমি বিস্মিত হইয়া দেখিতে লাগিলাম লিলির দেহখানি কিসের আবেগে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে, তার বুকে অধীর স্পন্দন দ্রুত তালে তালে বারবার উঠিতেছে নামিতেছে। বহুক্ষণ সে আচ্ছন্নের মতন পড়িয়া রহিল দেখিয়া জলধিবাবু ভীত হইয়া তাহাকে নাড়া দিয়া ডাকিতে লাগিলেন—"লিলি—! লিলি!"

অনেকক্ষণ পরে লিলি সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল।

আমি জলধিবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কতদিন এরকম ভুগছেন?" লিলির পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তার বিশৃঙ্খল চুলগুলি গুছাইয়া দিতে দিতে জলধিবাবু বলিলেন—"বছর ঘুরে গেল বিমলবাবু! আমার বাবা লিলিকে বড্ড ভাল বাস্‌তেন, তিনি মারা যাবার পর থেকেই ওর অসুখ! সেই আঘাতই ওর রোগের সূত্রপাত। কল্‌কেতায় যত ভাল ডাক্তার ছিল সকলকেই দেখিয়েছি কিছুই উপকার হলো না, শেষে সকলে বল্লেন "চেঞ্জ" কর্‌তে—তা কই এখানে এসেও ত কিছু সুবিধে বুঝ্‌ছি না। এইবার আপনার শরণাপন্ন হলুম—এখানে সকলেই আপনার সুখ্যাতি করে, লিলির ভার আপনার হাতেই দিলাম, ওকে আরাম করে দিতে হবে।"

আমি বিদায় গ্রহণ করিবার সময় বলিলাম—"আমার যতটুকু সাধ্য চেষ্টা কর্‌ব, তারপর ভগবানের ইচ্ছে—মানুষের হাত এতে কিছুই নেই জলধিবাবু!

রাস্তায় আসিতে আসিতে হীরু জিজ্ঞাসা করিল—"কিরে? কি রকম দেখ্‌লি?"

"বিশেষ কোন ভয়ের কারণ নেই, সেরে যাবে বোধ হয়—দেখ্ হীরু, জলধিবাবু বোন্‌টিকে ভয়ানক ভালবাসেন দেখ্‌লুম্। আহা ভদ্রলোক একেবারে"—বলিতে বলিতে থামিয়া হঠাৎ আমি হীরুকে প্রশ্ন করিলাম—"আচ্ছা হীরু—মেয়েটির এখনও বিয়ে হয়নি নয়?"

হীরু হাসিয়া উত্তর দিল—"কেন হে! বিয়ের খোঁজ কেন এত তোমার? সাবধান—শেষে ডাক্তারি কর্‌তে এসে—" আমি সবলে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিলাম।

(৩)

আমার চিকিৎসার গুণেই হউক, আর সমুদ্রের জল হাওয়ার গুণেই হউক, লিলি ক্রমে ক্রমে বেশ সারিয়া উঠিল। তাহার অসুখের সময় প্রত্যহ দুইবেলা আমি দেখিতে যাইতাম; নিত্য এই যাতায়াতে খুবই ঘনিষ্ঠতা বাড়িল। জলধিবাবু অত্যন্ত অমায়িক ও সরল অন্তঃকরণের লোক,—লিলিও ভ্রাতার উপযুক্ত ভগ্নী। শিক্ষিতা, গুণবতী, মিষ্ট-ভাষিণী! তাহাদের সংসর্গে আমার ও হীরুর দিনগুলি বড়ই আনন্দে কাটিতে লাগিল।

হঠাৎ একদিন হীরুর বদলীর খবর আসিল, তাহাকে এক মাসের মধ্যে পুরী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। বিদায়ের দিন দুই বন্ধুতে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া বহুক্ষণ চ'খের জলে বুক ভাসাইলাম। তারপর চক্ষু মুছিয়া হীরু ম্লানমুখে চলিয়া গেল।

কয়েকদিন পরে কি প্রয়োজনে জলধিবাবু একবার কলিকাতায় যাইবেন বলিয়া আমার বাসায় আসিয়া বলিলেন—"বিমল! আমি যে কদিন না ফিরে আসি, তুমি সর্ব্বদা আমাদের বাসাটা দেখো। লিলি একলা রইল, তোমার ভরসাতেই তাকে রেখে চল্লুম।"

জলধিবাবু চলিয়া যাইবার পর আমি অবসর সময় বাসাতেই থাকিতাম।

লিলির সহিত সর্ব্বদা দেখা হইত। লিলি আর আমার কাছে মোটেই সঙ্কোচ করিত না, দুজনে কত গল্প করিতাম। শিক্ষিতা লিলির সঙ্গ পাইয়া আমার হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার যেন আপনি খুলিয়া গেল, দর্শন ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি কত আলোচনা করিতাম, সে বুঝিত কিনা কে জানে। আমি কিন্তু শতমুখে সহস্রধারা ছুটাইতাম। সমুদ্রতীরে দুজনে বেড়াইতে বেড়াইতে কত কথা হইত, দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তাহাকে নানা কথা বলিতাম,—বলিতে বলিতে প্রচণ্ড আবেগে আমার দেহ কম্পিত হইত, দৃঢ় মুষ্টিতে লিলির কোমল হাতখানি চাপিয়া ধরিতাম। কখনও বা আমার চক্ষু আর্দ্র হইয়া কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া যাইত। আর সে—তার ব্যাকুল দৃষ্টিটুকু আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া অনিমিষে চাহিয়া থাকিত; সমবেদনায় কখন সে আয়ত চক্ষু রক্তরাগে দীপ্ত হইয়া উঠিত—কখনও বা অশ্রু ভারে টলমল করিত।

লিলির সেই পুষ্পকোমল ক্ষুদ্র হাতখানি আমার হাতের মধ্যে লইয়া ভাবিতাম, যদি এমনি একটি জীবনসঙ্গিনী পাই … …

সত্যই বলিতেছি, এমন মধুর সহৃদয়তা, এমন নির্ম্মল পবিত্রতা আমি আর কখনও অনুভব করি নাই। কে বলে নারী উচ্চশিক্ষা পাইলে গর্ব্বিতা হয়? না, না, সে তোমাদের মহা ভুল! লিলি—দেবীতুল্যা, বিনয়ের আধার, নম্রতা প্রতিমূর্ত্তি! তাহাকে দেখিয়া, তাহার সুন্দর স্বভাবে মুগ্ধ হইয়া, সমস্ত নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে আমার অন্তর পূর্ণ হইয়া গেল।

সপ্তাহখানেক পরে জলধিবাবু ফিরিয়া আসিলেন, রাত্রি

তাঁহার সহিত একত্রে কাটাইয়া প্রাতে বাসায় ফিরিলাম। পরদিন সন্ধ্যার পর আমার বাসার পশ্চাতের ক্ষুদ্র বাগানটীতে একলা বসিয়াছিলাম—সম্মুখেই আমার অনন্তবিস্তৃত নীলজলরাশি,—তাহার উপর জ্যোৎস্নাময়ী সন্ধ্যার ছায়া পড়িয়াছে। চারিদিকে নিস্তব্ধতা, পৃথিবী তখন স্থির শান্ত,—কেবল সমুদ্রই শুধু একাকী উচ্ছলিত হৃদয়ে গুরু গম্ভীরস্বরে এক মহা সঙ্গীত তুলিয়াছিল—সে যেন সেই বহুকালের অতীত বেদধ্বনির মতন। সেই মহা সঙ্গীত বিভোর হইয়া শুনিতেছিলাম, এমন সময়ে কোমল মৃদুস্বরে কে ডাকিল,—"বিমলবাবু ?"

চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম,—আমার পশ্চাতে লিলি দাঁড়াইয়া ! তাহার মুখখানিতে উদ্বেগমাখা !

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম—"একি ! লিলি তুমি এমন সময় হঠাৎ যে ?"

লিলি ব্যস্তভাবে বলিল—"শীগ্‌গির চলুন, দাদার বড় অসুখ।"

আমি উঠিয়া বলিলাম—"অসুখ ! এর মধ্যে তাঁর কি অসুখ হোল ? তা তুমি নিজে এলে কেন ? চাকর পাঠালেই হোত।"

"চাকরেরা দুবার এসে ফিরে গেছে, আপনাকে খুঁজে পায় নি—দেখ্‌তে দেখ্‌তে দাদার জ্বর বড্ড বেড়ে যাচ্ছে, আমি আর চুপ করে থাক্‌তে পারলাম না, নিজেই এলুম তাই ; চলুন, চলুন, আর দেরি করবেন না।" বলিয়াই সে অগ্রসর হইল।

যত দ্রুত পারি একরূপ ছুটিয়াই, দুইজনে জলধিবাবুর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বিছানায় বসিয়া পড়িয়া জলধিবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কখন জ্বর হয়েছে ?" আমার হাতখানি, হাতের মধ্যে লইয়া জলধিবাবু বলিলেন—"তুমি চলে যাবার একটু পরে।" তাঁহার দেহ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বুঝিলাম প্লেগ হইয়াছে, আর রক্ষা নাই।

দেখিতে দেখিতে অবস্থা বড় মন্দ হইয়া আসিতে লাগিল। যতটুকু শিক্ষা আমার আয়ত্ত হইয়াছিল সমস্তটুকু প্রয়োগ করিলাম, কোন ফলই ফলিল না। অন্য অন্য ভাল ডাক্তার যত ছিল সকলকেই আনাইলাম, কিন্তু হায়—বৃথা চেষ্টা !

রাত্রি বারটার সময় আমার হাতখানা টানিয়া লইয়া লিলির ক্ষুদ্র হাতটি তাহার উপর রাখিয়া কাতরস্বরে তিনি বলিলেন—"ভাই বিমল ? আজ আমার একমাত্র স্নেহের ধনকে তোমার হাতে দিয়ে চল্‌লাম, আপনার বলিতে ওর আর কেউ নাই,—তুমি দেখো।" বড় বড় দুই ফোঁটা অশ্রু তাঁর চক্ষু হইতে গড়াইয়া পড়িল।

তারপর কুড়ি মিনিট পরে সব ফুরাইল … … …

সৎকার-কার্য্য শেষ হইয়া যখন চিতা নির্ব্বাণ হইল—তখন ভোরের স্নিগ্ধবাতাস বহিতে সুরু হইয়াছে। ভারাক্রান্ত মনে অবসন্ন দেহে শুভ্র বালির উপর বসিয়া পড়িলাম। বহুক্ষণ ধরিয়া, আমি তন্ময়ভাবে তরল নীলিমাভরা জলময় মহামরুর পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম ; সেই নীলজলরাশি—অনন্ত নীল আকাশের সহিত মিশিয়া যেন একাকার হইয়া গিয়াছে। দেখিতে দেখিতে—দুই নীলিমা ভেদ করিয়া আবীরমাখা সোণার থালাখানির মতন সূর্য্যদেব উদয় হইলেন, তাঁহার গায়ের সোণার রশ্মি সমুদ্রের মত বুকে ছড়াইয়া পড়িল।

সেই স্বর্ণরশ্মিমাখা ফেনাযুক্ত তরঙ্গগুলি নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া আসিয়া তটভূমিতে আছড়াইয়া পড়িতেছিল, আবার ফিরিয়া যাইতেছিল—পুনরায় আসিতেছিল। তরঙ্গের বারবার এই যাওয়া আসা দেখিয়া কেবলই আমার মনে হইতে লাগিল, মানবের জীবনও ত এইরূপ ! বারবার এইরূপই যাতায়াত করিতেছে, এ আনাগোনার কি আর শেষ নাই ? যদি থাকে, তবে মানুষ সে চেষ্টা করে না কেন ? হে অনন্ত অসীম, কেন তোমার অবিদ্যারূপিণী মায়ায়—এমন করিয়া মানবকে ভুলাইয়া রাখ !

গভীর বৈরাগ্যে আমার সমস্ত মনটা ভরিয়া উঠিল। এই ত মানুষের জীবন ! এই আছে—এই নাই ! এই ত ছিল, নিমেষের মধ্যে স্বপনের মতন কোথায় মিলাইয়া গেল ? এই জলধিবাবু! রাত্রিটুকুর মধ্যে তাঁহার সকল অস্তিত্ব লোপ হইল। রহিল কি ? কেবল ধ্বংসবাশিষ্ট কয়মুষ্টি ভস্ম ! এই ক্ষণিক আলেয়ার আলোর মতন জীবনের জন্য মানুষ কতই না দ্বেষ কতই না দ্বন্দ্ব করে। কত মিথ্যা—কত প্রবঞ্চনা ! হায়, জ্ঞানআঁখিহীন অন্ধ মানব—এই মৃত্যু দেখিয়াও ভ্রান্তি যায় না ?

কতক্ষণ বসিয়া এই সকল চিন্তা করিতেছিলাম জানি না, হঠাৎ স্মরণ হইল—লিলি একাকিনী সমস্ত রাত্রি বাসায় আছে। উঠিয়া বাসার দিকে অগ্রসর হইলাম, গিয়া দেখিলাম

—সে, মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে। শিয়রে বসিয়া আস্তে আস্তে ডাকিলাম—"লিলি" ··· ···

সে অশ্রুভরা আঁখি দুটি তুলিয়া আমার পানে চাহিল, তারপর দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"আমার দাদা? আমার দাদা কই? আপনি তাঁকে কোথায় রেখে এলেন?" আমি তাহাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব, ভাষা খুঁজিয়া পাইলাম না। ব্যথিত-হৃদয়ে তাহার পানে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিলাম।

বিষাদপরিপূর্ণ দুইটি সপ্তাহ ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। লিলির দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় বন্ধু যাঁহারা ছিলেন সকলকেই খবর দিলাম, কিন্তু কেহই কোন খোঁজ খবর লইলেন না। বিদেশে একাকিনী সে,—কেহই আপনার জন নাই; আর ত এরূপভাবে আমার সহিত একত্র অবস্থান করা ভাল দেখায় না। তাহাকে লইয়া বড়ই ভাবনায় পড়িলাম। একদিন সাহস করিয়া এই প্রসঙ্গ তুলিলাম—সে কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে এবং অত্যন্ত কাতরস্বরে বলিল—"আপনিই আমায় বলে দিন বিমলবাবু, আমি এখন কি করব? আমার যে কোন আশ্রয়ই নেই! দাদা, আপনার হাতেই আমায় দিয়ে গেছেন, আপনি যা হয় ব্যবস্থা করুন।"

ইহার পর আর তাহাকে কি বলিব? সে যে একান্ত ভাবে নির্ভর করিয়া আমাকেই আশ্রয় করিয়াছে, এখন কিরূপে তাহাকে ত্যাগ করি? না,—না, এত নিষ্ঠুর আমি নই! কিন্তু—এতদিনের সঙ্কল্প আমার—লিলির ঐ মলিন মুখখানি আর অশ্রুপূর্ণ কাতর চক্ষু দুটি টলাইয়া দিবে? ··· ···

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে স্থির করিলাম, আমার ভগ্নী বীণার কাছে লিলিকে রাখিব। বীণার স্বামীকে পত্র লিখিয়া বীণাকে পুরীতে আনাইলাম, সে আসিয়া লিলিকে দেখিয়া ভয়ানক চমকিয়া উঠিল। আমি তাহার সেইরূপ চমকান দেখিয়া একটু আশ্চর্য্য হইলাম। আমি বীণাকে সকল কথাই খুলিয়া লিখিয়াছিলাম; তবে সে অমন করিল কেন?

কয়েকদিন পরে দুপুরবেলা বিছানায় শুইয়া বই পড়িতেছিলাম, এমন সময় বীণা একটি কালোরঙের উপর সোনালীর কাজ করা ছোট জাপানি বাক্স হাতে করিয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিল। বাক্সটা আমার বিছানায় রাখিয়া সে হাসিতে হাসিতে বলিল—"লিলির চাবি চুরি করে আজ এই বাক্সটা তার ট্রাঙ্ক থেকে বার করেছি, এটা খুলে দেখ দাদা—একটা মহারহস্যের আবিষ্কার আজ হয়ে যাবে।"

বাক্সটা খুলিয়া দেখিলাম, তাহার ভিতর বেল, যুঁই, মল্লিকা ফুল দিয়া সাজান ক্ষুদ্র একখানি ছবি!

কে এমন ভক্তির পাত্র লিলির? কে এমন ভাগ্যবান্—যে তার ছবি লিলি নিত্য এই সদ্যঃপ্রস্ফুটিত ফুলে পূজা করে?

তাড়াতাড়ি ছবিখানা বাক্সর মধ্য হইতে বাহির করিলাম।

একি রহস্য? "ফটো" যে আমারই! লিলি এ "ফটো" আমার কোথা হইতে পাইল? এ ছবি যে বহুদিনের—যখন কলিকাতায় আমি বি, এ পড়িতাম তখন ঐ ফটো তুলাইয়াছিলাম!

আশ্চর্য্য হইয়া বীণাকে বলিলাম—"আমার এ "ফটো" লিলি কোথায় পেলে বীণা?"

—"কি জানি দাদা! আমিও ত তাই ভাবছি, আচ্ছা, লিলিকে জিজ্ঞেস্ করলেই ত সব জানা যাবে, তাকে ডেকে আনি"—বলিয়া বীণা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, একটু পরেই সে লিলিকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল।

ছবিখানা লিলির সম্মুখে ধরিয়া বলিলাম—"আমার এ "ফটো" তুমি কোথায় পেলে?"

লিলির শুভ্র সুন্দর মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল।

সে মাথা নত করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, আমার প্রশ্নের কোনও উত্তর দিল না।

আমি আবার বলিলাম—"বল লিলি, এ ছবি কোথায় পেলে?"

সে সেইরূপ মৌনভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল।

লিলির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বীণা নীরবে হাসিতেছিল, লিলির ঐরূপ মৌন অবস্থা দেখিয়া তাহাকে একটা ধাক্কা দিয়া সে বলিল—"কি গো? আমার দাদার কথার উত্তর দেওয়া হচ্ছে না যে। ভেবেছ তোমার গুপ্তকথা ব্যক্ত করবার লোক এখানে কেউ নেই, না? আচ্ছা, দাঁড়াও তবে—" কথাগুলো তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া বীণা ছুটিয়া চলিয়া গিয়া কোথা হইতে আর একখানা "ফটো" আনিয়া আমার হাতে দিল।

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"এ আবার কার ফটো রে ?"

বীণা একটু দুষ্টামীর হাসি হাসিয়া বলিল—"যে মেয়েকে তুমি বিয়ে করবে না বলে বিয়ের দিন পালিয়ে গিছ্‌লে,—মনে নেই ? এ ফটো সেই মেয়ের ! আমরা তাদের বাড়ীথেকে কনের ফটো চেয়ে আনিয়েছিলাম যে !" ছবিখানি ভাল করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে হঠাৎ ছবির তলায় নজর পড়িল—সেইখানে সোনালী অক্ষরে ছোট্ট করিয়া লেখা আছে—লীলা ··· ···

সেই মুহূর্ত্তেই আমার চক্ষের সম্মুখ হইতে যেন একখানা আবরণ খসিয়া পড়িল। বীণার হাতখানি ধরিয়া কাতরস্বরে বলিলাম—"আর দুষ্টামী করিস্‌নি বীণা, সব কথা আমায় খুলে বল্‌।"

বীণা তখন হাসি চাপিয়া যথাসাধ্য গম্ভীর হইয়া বলিতে আরম্ভ করিল—"লিলির সঙ্গেই তোমার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক্ হয়েছিল দাদা। তারপর বিয়ের দিন তুমি পালিয়ে গেলে, বাবার মহা রাগ হ'ল, লিলিদের বাড়ি খবর পাঠিয়ে দিলেন বিয়ে হবে না। খবর পেয়ে লিলি্‌র বাপ আমাদের বাড়ী এসে হাজীর হলেন,—বুড়ো ত কেঁদেই অস্থির! বল্‌তে লাগ্‌লেন্ "আমার জাত যাবে যে, এখন বর আমি কোথায় পাব ? আপনার ছেলেকে যেখান থেকে হোক্ খুঁজে এনে দিন্, আমার মেয়ে কি দোবরা হয়ে থাক্‌বে ?" কিন্তু তোমাকে ত কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না! ও দিকে লিলির দাদা খবর পেয়ে কল্‌কাতা থেকে এসে লিলিকে নিয়ে গেলেন। তিনি একজন বিলাতফেরত ব্যারিষ্টার, তাঁর মেজাজ অন্যরূপ—যাবার সময় তিনি বলে গেলেন—"লিলির এখনও বিয়ের সময় হয়নি, ও নেহাৎ ছেলে মানুষ, বড় হলে আমি ওর ভাল দেখে বিয়ে দেব। এখন ও আমার কাছে থেকে ভাল করে লেখা পড়া শিখুক।" কাজেই লিলি—আইবুড়ো হয়ে রইল,—হাঁ, একটা কথা বল্‌তে ভুলে গেছি—তোমার ঐ ফটোখানা লিলির বাপ্ বাড়ীতে মেয়েদের দেখাবে বলে আমাদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে গিছ্‌লেন। এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছ দাদা ? তোমার ফটোখানাকে কেন লিলি ফুল দিয়ে সাজিয়ে রোজ পুজো করে। আমি যা জানি বল্লুম, তারপর—" লিলির পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া বীণা বলিল—"উপসংহারটা তুই এইবার করবি !" লিলি আরক্ত মুখে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

(৫)

এই ঘটনার পর বীণা আমায় বলিল—"দাদা—তুমি যে অন্যায় করেছ তার দণ্ড তোমায় নিতে হবে !"

অনুতাপে তখন আমার হৃদয় পুড়িয়া যাইতেছিল। আমি রাজি হইয়া বলিলাম—"একবার অন্যায় করে তার শাস্তি খুব পেয়েছি, এবার তোর কথা শুনব বীণা !" কয়েক দিন পরে বীণা আমায় চুপে চুপে বলিল—"এবার আর দেশে নয় দাদা ! কল্‌কেতায় একখানা বাড়ীভাড়া নিয়ে বিয়ের কদিন থাকা যাবে।" বীণার কথায় আমি সম্মত হইলাম, বুঝিলাম—লিলি বয়স্থা হইয়াছে, পাছে পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে সেই ভয়ে বীণা কলিকাতাতে বিবাহ দিতে চায় !

কলিকাতায় আসিয়া একখানি বাড়ীভাড়া লইলাম। লিলি বহুবাজার ষ্ট্রীটে তার নিজের বাড়ীতে চলিয়া গেল, বহুদিন পরে আবার আমার বিবাহের আয়োজন চলিল। এবার আর কোনরূপ আড়ম্বর নাই, চুপে চুপে নীরবে সমস্ত আয়োজন হইতে লাগিল।

লিলির সহিত কয়দিন আর দেখা হয় নাই। এই বিবাহের ব্যাপারে কেমন যেন সঙ্কোচ আসিয়া আমাদের মধ্যে এই ব্যবধান ঘটাইয়া দিয়াছিল ! বীণার মুখে শুনিলাম সে নাকি বলিয়াছে "এতদিন পরে আবার কেন ? এই ত বেশ আছি !" বীণা তাহার সকল আপত্তি তুচ্ছ করিয়া কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে। বিবাহ সে দিবেই।

আর বিবাহের দুইটি দিন মাত্র বাকি আছে ! হীরু দেশে ছিল তাহাকে আসিতে লিখিলাম, সে আসিয়া একটু নির্জ্জনে আমায় ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিল—"আবার এতদিন পরে কেন এ জালে জড়াচ্ছিস্ ? তোর দ্বারা আর কিছুই হবে না দেখ্‌ছি, এখনও ফের বিমল—এখনও সময় আছে।"

আমি কাতরভাবে তাহাকে বলিলাম—" না ভাই পার্‌ব না, আমায় মাফ্ করো।"

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সে আমায় বলিল—"যাই একবার লিলির সঙ্গে দেখা করে আসি। সে আবার রাগ করবে।" রাত্রে আর হীরু ফিরিল না দেখিয়া ভাবিলাম—লিলি তাহাকে ছাড়ে নাই। আর লিলির ত পুরুষ অভিভাবক কেহই

নাই, হীরু হয়ত লিলির বাড়ীতেই থাকিবে। কন্যাকর্ত্তা সেই বোধ হয় হইবে, আর তারই ত হওয়া উচিত!

তার পরদিনও হীরু আসিল না। একটু রহস্য করিবার অভিপ্রায়ে লিলির বাড়ীতে হীরুর সহিত দেখা করিতে চলিলাম। কত কথাই তখন আমার মনে হইতেছিল, আজ হয় ত লিলি আমার সম্মুখে বাহিরই হইবে না। আমাকে দেখিয়া সে লজ্জায় হয়ত পলাইয়া যাইবে।

লিলির বাটীর সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম, অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে দুয়ার ঠেলিতে গিয়া দেখি তালাবদ্ধ! এ আবার কি প্রহেলিকা? বাড়ীতে চাবি দিয়া লিলি কোথা গিয়াছে? হঠাৎ দরজার মাথায় দৃষ্টি পড়িল, সেখানে এক সাইন্‌বোর্ড টাঙান, তাহাতে বড় বড় হরফে লেখা—"বাড়ী ভাড়া দেওয়া হইবে।" ... ...

সেইখানে বসিয়া পড়িলাম। হা ভগবান্! অদৃষ্টের একি নিষ্ঠুর পরিহাস! হতভাগ্যের জীবনে কি একটুও শান্তি নাই! এইমাত্র যে আমি কল্পনায় সুখের স্বর্গ সৃজন করিতে করিতে আসিতেছিলাম! একটি নিমিষের মধ্যে তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ধূলিসাৎ হইয়া গেল!

হায় লিলি—নিষ্ঠুর লিলি! একদিন তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম বলিয়া তাই কি আজ এমনি করিয়া শোধ দিলে? মর্ম্মান্তিক দুঃখে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল, মাথা ঘুরিয়া চারিদিক যেন শূন্য দেখিলাম—কোন রকমে মাতালের মতন টলিতে টলিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

(৬)

তাহার পর যাহা ঘটিল, সে সকল আর সবিস্তারে বর্ণনা করিতে পারিব না। লিলির জ্বালাময়ী স্মৃতি ভুলিবার জন্য আমি ধ্বংসের মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম।... ... ...

বহুদিন পরে গোলদীঘির ধারে হঠাৎ একদিন হীরুর সহিত সাক্ষাৎ হইয়া গেল। তাহাকে দেখিয়া আমি পাশ কাটাইতেছিলাম, সে তাহা বুঝিতে পারিয়া দ্রুত আসিয়া আমার একখানা হাত চাপিয়া ধরিল। একখানা বেঞ্চের উপর জোর করিয়া আমায় বসাইয়া দিয়া নিজেও বসিয়া পড়িয়া অতি দুঃখিত স্বরে বলিল—"একটা তুচ্ছ স্ত্রীলোকের জন্য তুই কি হয়ে গেলি বিমল? তোর সে শক্তি, সে সংযম কোথায় গেল? অধঃপাতে গেছিস্ একেবারে!" আমি কোন উত্তর দিলাম না। সে আবার বলিতে লাগিল—"কিন্তু আর তুমি আমার হাত ছাড়িয়ে পালাতে পারছ না! তোমাকে আমি নিতে এসেছি, চল আমার সঙ্গে—যার জন্য তুমি এমন হয়ে গেছ সেই লিলি—ক্ষুদ্র একটা স্ত্রীলোক—তার শক্তি ও সংযম দেখবে চল।"

হীরুর প্রত্যেক কথাটি আমার বুকে বিঁধিতেছিল।

বহুদিন পরে তাহার মুখে লিলির নাম শুনিয়া—আমার বুকের মধ্যে ঝড় বহিতে লাগিল,—কম্পিতকণ্ঠে হীরুকে বলিলাম—"সে কোথায় আছে ভাই? চল হীরু, আমাকে তার কাছে নিয়ে চল! সে ভিন্ন আর কেউ আমায় উদ্ধার করতে পারবে না!"

পূর্ব্ববঙ্গে হীরুর বাড়ী! সে—সেইখানে আমায় লইয়া চলিল, তার বাড়ীতে পৌঁছিয়াই বলিলাম—"কই ভাই, আমার লিলি কই?"

হীরু হাসিয়া বলিল—"এত ব্যস্ত কেন? এই ত এলে—একটু পরে দেখা হবে এখন।"

বিকাল বেলা হীরু আমায় লইয়া বেড়াইতে বাহির হইল, তখন রোদ পড়িয়া গিয়াছে—অস্তগামী সূর্য্যের রক্তআভা আকাশের গায়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, দুই ধারে মাঠ—মাঝখান দিয়া সরু মেটে রাস্তা—তাহার উপর দিয়া দুই বন্ধুতে গল্প করিতে করিতে চলিয়াছিলাম; বক্তা হীরু—আর শ্রোতা আমি! আমার নিকট হইতে বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া সে যখন কলিকাতায় যায়—লিলির সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে বিবাহে কত অসম্মতি জানাইয়াছিল। পাছে তাহার সহিত বিবাহ হইলে আমার সকল উচ্চ আশা; সকল মহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়, এই ভয়ে সে কিরূপ ভীত হইয়াছিল, যাহাতে বিবাহ না হয় এইজন্য দূরে পলাইবার জন্য কিরূপ ব্যাকুলতা দেখাইয়াছিল, তাহাকে হীরুর বাড়ীতে আনিবার জন্য কত মিনতি করিয়াছিল, বিস্তারিত করিয়া হীরু সেই সকল কথা বলিতেছিল। হঠাৎ সে থামিয়া গিয়া আমার গায়ে মৃদু আঘাত করিয়া ইঙ্গিত করিল,—তাহার ইঙ্গিতে মাঠের দিকে চাহিয়া দেখিলাম,—একি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি!

ক্ষীণকায় ক্ষুদ্র একটি নদী—মাঠের পার্শ্বদিয়া ধীরে ধীরে শান্তভাবে বহিয়া যাইতেছে। আর তাহার ধারে গৈরিক-বসনে উন্মাদিনীর মতন আমার লীলা দাঁড়াইয়া। তার কোঁকড়ান মেঘের মত কালো চুলের রাশি বিশৃঙ্খলভাবে

দেহের চারিধারে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, বাতাস আসিয়া মধ্যে মধ্যে সেই কালো চুলে তরঙ্গ খেলাইয়া দিতেছিল,—আঁচলখানি উড়িয়া উড়িয়া ধানের শীর্ষের উপর লুটাইতেছে, সে দিকে লীলার ভ্রূক্ষেপও নাই। সে তন্ময়চিত্তে—মধুরস্বরে "রবিবাবুর" সেই "মাতার আহ্বান" গান গাহিতেছিল,——

বারেক তোমার দুয়ারে দাঁড়ায়ে,
ফুকারিয়া ডাক জননী!
প্রান্তরে তব সন্ধ্যা নামিছে,
আঁধারে ঘেরিছে ধরণী!
ডাক চলে আয়, তোরা কোলে আয়,
ডাক সকরুণ আপন ভাষায়,—
যে বাণী হৃদয়ে করুণা জাগায়,
বেজে উঠে শিরা ধমনী!

আমি উচ্ছ্বসিত আবেগে হীরুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম,—"আমার লীলাকে কে এমন করে গড়েছে ভাই? এ মন্ত্র তাকে কে দিলে?"

গম্ভীরভাবে হীরু বলিল—"এ শিক্ষা তুমিই তাকে দিয়েছ! তোমারই ভালবাসার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে লীলা জন্মভূমিকে এত ভক্তি কর'তে—এত ভালবাস্‌তে শিখেছে। লৌকিক আচারে তোমার সঙ্গে বিয়ে না হলেও লীলা তোমার যথার্থই সহধর্ম্মিণী! তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক চিন্তা প্রত্যেক ভাবটি লীলা—নিজের হৃদয় দিয়ে ঠিক অনুভব করতে পেরেছিল, এই ত হচ্ছে প্রকৃত স্ত্রীর কর্ত্তব্য! আমাদের শাস্ত্রে স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলে, প্রকৃত স্বামীর ধর্ম্মের সহায় হবে বলেই ত! কিন্তু সেরূপ স্ত্রী কয়জনের ভাগ্যে মিলে ভাই? নাই বা হ'ল বিয়ে, নাই বা হ'ল সমাজ-বন্ধন, তার জন্যে এত দুঃখ কেন বিমল? তোমাদের দুজনের যদি মিলন হত, তা হলে কি লীলা এমন পূর্ণশক্তিতে আজ কাজ করতে পারত! বিয়ে হলে ছেলে মেয়ে নিয়ে নিজেদের স্বার্থ-চিন্তায় দেশের কথা একেবারেই ভুলে যেত!"

আমি তাহার গায়ে হাত দিয়া বলিলাম—"দেখ হীরু, ওদিক থেকে কেমন সুন্দর একদল ছেলে আসছে!" সে চাহিয়া দেখিয়া একটু হাসিয়া বলিল—"দেখ্‌ছ কি বিমল? তুমি ভেবোনা যে তোমার লীলা শুধু নিজেই এমন হয়েছে, তা নয় ভাই—ও আমাদের এই সারা গ্রামখানিকে মাতিয়ে তুলেছে।"

আমি অনিমেষে পলকহীন চক্ষে চাহিয়া রহিলাম; কি সুন্দর দৃশ্য! একটি দল কিশোর বয়স্ক বালকবালিকা আসিয়া লীলাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর তাহাদের মাঝখানে দাঁড়াইয়া সে অশ্রুসিক্ত চক্ষে গাহিতেছে—

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্,
জগৎ-জনের শ্রবণ জুড়াক্
হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক্
মুখ তুলে আজ চাহরে!

বালকবালিকারাও তাহার কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া গাহিল—
একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্,

সেই ভক্তি-সঙ্গীত, প্রান্তরে—কাননে,—আকাশে—বাতাসে প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অসংখ্য লোকে মাঠ পরিপূর্ণ হইয়া গেল, সকলেরই চক্ষে অশ্রু, মুখে ভক্তির ভাব পরিস্ফুট।

আমি আর ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। উন্মত্তের মত ছুটিয়া গিয়া লিলির সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িলাম, করজোড়ে তাহাকে বলিলাম—"লীলা, লীলা স্বর্গের দেবী আমার! আমায় উদ্ধার কর!" ... ...

শ্রীমতী ... ... দেবী।

সুখ দুঃখের ভাগী।

সুখের সময় ভাগী অর্থাৎ অংশীদার গো অংশীদার,
সোজা কথাও বুঝ্‌তে নারো বুদ্ধিতে কি এতই ধার?
(তাই) তোমার সুখে মেলাই হাসি মেলাই ডাকি প্রিয়তম,
কত ভাবেই আদর করি, মোদের কিগো দরদ কম?

দুখের সময় ভাগী অর্থাৎ করি ওগো পলায়ন,
এক হস্তে পুঁটুলী বাঁধি (মুছি) অপর হস্তে দুনয়ন।
উপায় কি আর আছে বল, মজ্জমান সে তরীর পর,
কে শুনেছে কোন্ দেশেতে কোন্ বেকুবে রাখে ভর?

শ্রীবিনোদমোহন চক্রবর্ত্তী।

মন্থরার অভিযোগ।

বলি হাঁগা, আমি কি কারো বুকের উপর ধান ভেনে খেয়েছি, যে আজ তিনযুগ ধ'রে তোমরা কোটিকণ্ঠে আমার নিন্দা ক'রে বেড়াচ্ছ ? আমরা গরীব দুঃখীর মেয়ে, পরের বাড়ীতে গতর খাটিয়ে খাই, কারো কোন ভাল মন্দ কথায় থাকিনে, ভদ্রলোকের পেটে যে কত জিলিপির পেঁচ আছে তাও বুঝতে পারিনে; তাই তঁদের ঘরের সাত সতের ঝগড়া কোঁদল কোন ব্যাপারেই ঘেঁসি নে। আপন মনে ঘরের কোণে বা খিড়কীর পুকুরে নিরিবিলি ব'সে ব'সে কোটনা কোটা, বাটনা বাটা কিংবা বাসন মাজা নিয়ে থাকি। তবু বড় লোকের ঘরে চুরি, ডাকাতি, জাল, জুয়াচুরি যা কিছু আপদ বিপদ ঘটবে, সব দোষেরই ভাগিনী আমরা! আমরা যেন ভদ্রলোকের আস্তাকুড়! ভাই ভাই সতীনে সতীনে বা শাশুড়ী বউরীতে কোন ঝগড়া ঝাঁটি হলেই—পোড়া লোকে আমাদের ঘাড়ে সে দোষ চাপাবে! বামুন পণ্ডিতের চণ্ডী মণ্ডপ থেকে পদীপিসীর মজলিসে পর্য্যন্ত কেবল আমাদের কথা নিয়ে আলোচনা! কোথাও কোন দুর্ঘটনা ঘটলে শান্তিরক্ষক রাজপুরুষ হতে গ্রামের কুকুরগুলা পর্য্যন্ত আমাদেরই দিকে কটমট্ ক'রে তাকায়! আমরা সমাজের "ছাই ফেলার—ভাঙ্গা কুলো"। সমাজের যতকিছু ময়লা-আবর্জ্জনা সব গুলো আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তোমরা জন-সমাজে ভালমানুষ সেজে বুক ফুলিয়ে চল!

কথাটা ভেঙ্গেই বলি না কেন ? এই যে তিনযুগ ধরে তোমরা রাম বনবাসের সকল দোষ আমার ঘাড়ে চেপে দিয়ে সেই বুড়ো মিন্সে "দশরথ"কে "সত্যসন্ধ" "সত্যব্রত" রাজা ব'লে মাথায় তুলে নৃত্য কর, আর তাঁর সব দোষ চেপে গিয়ে কাব্যি নাটকে, গানে-গল্পে, আমাকে অপরাধী সাজিয়ে টানা হেঁচড়া কর, এটা কোন দেশী ভালর কথা ? সেই বুড়ো মুনি গোঁসাইটি সেই মহাবংশ-সূর্য্যবংশের সব দোষ চেপে গিয়ে শুধু খোসনাম গেয়েই রামায়ণ খানা পুরিয়ে রেখেছেন। সেই বংশের যত কেলেঙ্কারী, যত কলঙ্ক, সব আমার ঘাড়ে চাপিয়ে কাব্যিখানা বেশ জমিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু এত চেষ্টা ক'রেও সব বাহাদুরীর আসল কথাটি বেমালুম লুকোতে পারেন নি। দু একটা কথায় ধর্ম্মের ঢোল বে'জে উঠে আজ আমি সেই কথাগুলিই তোমাদের বোঝা চাই।

আমি সব রহস্য জানি। তোমাদের "সত্যব্রত" রাজ যখন রূপলালসায় পাগল হয়ে কেকয় রাজ্যে গিয়ে উপি হ'লেন, তখন আমাদের রাজকুমারী কৈকেয়ী সোমত্ত মে "ধর্ম্মব্রত" মহারাজাটি ত সেই "ফুল্ল-নলিনী"র মত দে দেখে বিয়ের জন্য ক্ষেপে উঠলেন। মেয়ের বাপ অশ্বপ ভারী বুদ্ধিমান্ লোক। যুবরাজ যুধাজিৎও খুব তুখে ছেলে। তাই মহারাজ দশরথের শুধু ধন মান দেখেই তাঁে ভুল হলো না। সাড়ে সাত শত যুবতী কামিনীও য ভোগের পিপাসা মিটাতে পারে নাই, তেমন ইন্দ্রিয়দাে হাতে তাঁর ভোগলালসা ইন্ধন ক'রে অমন সোন কমলিনীকে অর্পণ করতে তাঁদের তেমন আগ্রহ হলো ন যদি কৈকেয়ীর পুত্রকে তিনি কোশল রাজ্যের ভাবী অধিকা ব'লে অঙ্গীকার করেন তবেই তাঁরা তাঁকে এই কন্যা সম্প্রদান করতে পারেন—বলিয়া মত জানালে এদিকে দশরথ পূর্ব্বেই কৌশল্যাকে পাটরাণীরূপে গ্র করেছিলেন, সুতরাং তিনি বর্ত্তমান থাকতে কেমন ক এই চুক্তিতে আবদ্ধ হবেন ? এই ভেবে প্রথমে তিনি এক "ভ্যাবাচেকায়" পড়ে গেলেন। কিন্তু "গরজ বড় বালাই রাজা ভাবলেন, "কৌশল্যার ত এত বয়সে ছেলেপু'লে হলো না, আর হওয়ারও বড় একটা সম্ভাবনা নেই। সুতরাং এ ছেলেকে রাজ্য দেওয়ার অঙ্গীকার করায় এমন কি গোলমা হবে ? তবে একটা লোকলজ্জা। তা গোপনে চুক্তি ক' নিলে কে জানবে ?" তাই তিনি "ডুব দিয়ে জল খেয়ে একাদশীকে ফাঁকি দেওয়ার বন্দোবস্ত করলেন। তি অশ্বপতি আর যুধাজিতের কথা মত অঙ্গীকার ক' কৈকেয়ীকে বিয়ে ক'রে বাড়ীতে নিয়ে এলেন। এই চুক্তি পত্রেই কিন্তু রামবনবাসের পথ ক'রে রাখা হলো। তোম এই গুপ্ত রহস্য না জেনে রামবনবাসের যত দোষ, এ সবই কুঁজী বাঁদীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেও। কিন্তু সুশী "রামভদ্র"—কোনোদিনই এমন "উদোর পিণ্ডী বুধোর ঘাড়ে

চাপান নাই। দেখ তোমাদের প্রধান দলিল রামায়ণে ইহার কি আভাস পাওয়া যায়?

রাম বনযাত্রা করিলে সাধারণ জনগণ ভরতকে বড়ই ধিক্কার দিতে আরম্ভ করায় ভরত অতিশয় দুঃখিত হ'য়ে মন্ত্রী, পুরুত ও প্রজাবর্গ নিয়ে রামকে বনবাস হ'তে ফিরিয়ে আনার জন্য চিত্রকূটে গেলেন। রামের পায় ধ'রে পুনরায় অযোধ্যায় গিয়ে রাজ্য গ্রহণ করার জন্য জেদ্ করতে লাগলেন, তখন রাম ভরতকে ডেকে সব রহস্য ভেঙ্গে বল্লেন—(ওগো, আমি দাসী বাঁদী হ'লেও এই পুরোণো সংস্কৃত কালের মেয়েমানুষত! শ্লোক শাস্ত্রও জানি—)

"পুরা ভ্রাতঃ পিতা নঃ স মাতরং তে সমুদ্বহন্,
মাতামহে সমাশ্রৌষীদ্রাজ্যশুল্ক মনুত্তমম্।"

(অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৭ সর্গ।)

(হে ভ্রাতঃ! পূর্ব্বকালে যখন আমাদের পিতা তোমার মাতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তখনই রাজ্যশুল্ক বিনিময়ে মাতামহ অশ্বপতি পিতৃদেবের হাতে তদীয় কন্যা অর্পণ করেন। সুতরাং এখন আমি রাজত্ব গ্রহণ করিলে পিতাকে সত্যভ্রষ্ট করা হয়।)

পিতৃভক্ত ভরতও এই রহস্য অবগত হ'য়েই রামের পাদুকা নিয়ে এসে প্রতিনিধিরূপে রাজত্ব চালাতে থাকেন। তবু লোকগুলো চোকের মাথা খেয়ে দিনরাত আমাকেই গাল মন্দ দেবে! বলি গরীবদুঃখীর উপর এমন অত্যাচার কেন গা?

বিনা বাতাসে এক গাছা তৃণও নড়েনা, বিনা পাপে কারো গায় একটি কাঁটার খোঁচাও লাগে না। সুতরাং দশরথ অকারণে পুত্রশোকও পান নাই, বাসীমরাও হন নি। সেই কারণটির কথাই এখন বলব।

যখন "সত্যব্রত" রাজাটির কামনা-সাগরে কিছু ভাটা লাগলো, আর প্রিয়তমা কেকয়ীর সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বেই কৌশল্যা দেবীর একটি সুপুত্র জন্মিল, তখন চতুরশিরোমণি দশরথ মহা ফাঁপরে প'ড়ে গেলেন। রূপে, গুণে, বিদ্যায় আর বুদ্ধিবলে, কৌশল্যা-নন্দন রামই প্রজামণ্ডলীর শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত পিতৃ-হৃদয়ের স্নেহটুকুও অধিকার ক'রে বসলেন। এই সময় হ'তেই দশরথ ভাবী বিপদের কথা ভাবতে লাগলেন। চতুরা মেজ রাণীও রাজার ভাব ভঙ্গী দেখে ছেলেদের বিয়ের পরেই উপযুক্ত সহোদর যুধাজিতের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ভরতকে তাঁর মামারবাড়ীই পাঠিয়ে দিলেন। অযোধ্যায় তাঁকে রাখা ভাল মনে হলোনা। একদিন নয়, দুদিন নয় – বিয়ের পরে একাদিক্রমে বারোটি বছর বাছাকে মামারবাড়ীতেই থাক্‌তে হলো। এদিকে রাম চব্বিশবৎসর বয়সে পদার্পণ করেছেন। দশরথ দেখলেন—রামকে যৌবরাজ্য প্রদানের এই সুযোগ। একদিকে যেমন বহুকাল প্রবাসে থাকায় লোকে ভরতকে ভুলে গিয়েছে, অন্যদিকে তেমনই জনসাধারণ ও সামন্তচক্র রামের গুণে তাঁর একান্ত পক্ষপাতী হয়ে পড়েছে। যদিও আমি আর মেজোরাণী ব্যতীত রাজপুরের আর কেহই সেই বিবাহের চুক্তি-রহস্য অবগত ছিল না, তথাপি চতুর রাজা আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে গোপনেই রামকে অভিষিক্ত করিতে আয়োজন করিলেন। "সামন্তচক্র" ও "প্রধানবর্গের" মতামতটা বেশ ভালরূপে জেনেশুনে—আঁটঘাট বেঁধে কাজ করার অভিপ্রায়ে—

"নানানগরবাস্তব্যান পৃথগ্‌জানপদানপি।
সমানিনায় মেদিন্যাঃ প্রধানান্ পৃথিবীপতিঃ॥"

আরও—

"প্রাচ্যোদীচ্যাঃ প্রতীচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ ভূমিপাঃ
ম্লেচ্ছাশ্চার্য্যাশ্চ যে চান্যে বনশৈলান্তবাসিনঃ।"

"নানানগর নানা-জনপদের প্রধান প্রধান অধিবাসি-বর্গকে এবং পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ দেশের, ম্লেচ্ছ দেশের ও পার্ব্বত্যপ্রদেশের নরপতিগণকে নিমন্ত্রণ ক'রে আনা হলো।" কেবলমাত্র—

"নতু কেকয় রাজানং জনকং বা নরাধিপঃ
ত্বরায় চালয়ামাস পশ্চাত্তৌ শ্রোষ্যতঃ প্রিয়ম্।"

(অঃ কাঃ ১ম সর্গ)

"তাড়াতাড়ি বলে নিমন্ত্রণ করা হলো না অর্থাৎ জানতে দেওয়া হলো না ভরতের মাতুলালয়ে আর শ্বশুরালয় জনক পুরে!" বলি এটা কি একটা গুপ্ত ষড়যন্ত্র নয়?

পাছে এতে কোন গোল বাধে, এই আশঙ্কায় দশরথ সকলের মতামত জান্‌তে চেয়ে রাজন্য বর্গের নিকট বললেন,

"যদিদং মেঽনুরূপার্থং ময়া সাধু সুমন্ত্রিতম্,
ভবন্তো মেঽনুমন্যন্তাং কথং বা করবাণ্যহম্।"

"রামাভিষেক আমার অনুমত বটে, এ বিষয়ে আপনাদের মতামত প্রকাশ করুন।" সকল রাজাই তখন "বৃষ্টিমন্তং

রক্ষামেবং নর্দ্দন্তইব বর্হিনঃ" উচ্চৈঃস্বরে স্পষ্টবাক্যে রাজার মত অনুমোদন করিলেন। তখন চতুর রাজা বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে পরামর্শ করার জন্য বশিষ্ঠ, বামদেব ও সুমন্ত্র প্রভৃতিকে ডেকে বল্লেন—"যখন রামকে অভিষিক্ত করা সকলেরই অনুমত, তখন আর বিলম্বের প্রয়োজন কি?"

কথাটা পাছে কৈকেয়ীর বা কেকয় রাজের কাণে পৌঁছে, এই আশঙ্কায়ই যেন দশরথ মন্ত্রিগণের কাছে বলিলেন—

"শ্ব এব পুষ্যো ভবিতা শ্বোঽভিষেচ্যস্তু মে সুতঃ,
রামো রাজীবপত্রাক্ষো যুবরাজ ইতি প্রভুঃ।"

(অযোধ্যাকাণ্ড ৪র্থ সর্গ)

"কাল পুষ্যানক্ষত্র। ভাল দিন, অতএব কালই রামাভিষেক কাজটা হয়ে যাক।" কি তাড়তাড়ি! যেন মেয়ের বিয়ের লগ্ন উতো'রে যাচ্ছিল!

তখনই আবার তাড়াতাড়ি রামকেও অন্তঃপুর হ'তে ডাকা হল। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই রাজগণের দরবার হ'তে তিনি তাঁর অভিষেকের অনুমোদন প্রস্তাব শুনে এসেছিলেন, এখন আবার পিতার আহ্বানে নিতান্ত শঙ্কান্বিত হয়ে তিনি রাজার কাছে ফিরে এলেন। রাজা অতি ভাল মানুষটির মত ছেলেকে বল্লেন—

"তদ্ যাবদেব মে চেতো ন বিমুহ্যতি রাঘব
তাবদেবাভিষিঞ্চস্ব চলাহি প্রাণিনাং মতিঃ।"

(অযোধ্যাকাণ্ড ৪র্থ সর্গ)

"বাবা, মানুষের মনে কখন কি ভাব হয় বলা যায় না। অতএব আমার মনটা ঠিক থাক্‌তে থাক্‌তে অভিষেক কাজটা হ'য়ে যাক।"

"শ্ব পুষ্য যোগ নিয়তং বক্ষ্যান্তে দৈব চান্তিকাঃ
শ্বস্ত্বহমভিষেক্ষ্যামি যৌবরাজ্যে পরন্তপঃ॥"

(অঃ ৪র্থ সর্গ)

কালই পুষ্যা নক্ষত্র, প্রশস্ত দিন। অতএব কালই তোমার অভিষেক ব্যাপারটা হ'য়ে যাক।"

কি তাড়াহুড়ো—চোরের মার রাত কাটে না যেন। এত বড় একটা ব্যাপার—তার কি ব্যবস্থা!

পাছে রাম রাজার মনের ভাবটা না বোঝে, এত তাড়াহুড়ো ক'রে রাজা হ'তে কোন আপত্তি ক'রেন, তাই এবার আসল কথাটা খুলে বলে ফেল্লেন। 'তিনি রামকে চুপি চুপি বল্লেন—

"বিপ্রোষিতশ্চ ভারতো যাবদেব পুরাদিতঃ,
তাবদেবাভিষেকস্তে প্রাপ্তকালো মতোমম।"

(অযোধ্যাকাণ্ড ৪র্থ

"বাপুহে, ভরত যত দিন বিদেশে (মামারবাড়ী) অ ততদিনই অভিষেকের উপযুক্ত কাল।"

কি আশ্চর্য্য কথা! যদি তোমাদের "সত্য সন্ধ" রা ভরতের ন্যায্য প্রাপ্য রাজ্যই রামকে গোপনে দেওয়ার যত্ন না করে থাকেন, তবে এত ঢাক ঢাক গুড়্ গুড়্—লুকোলুকি কেন? ইহাই "সত্যব্রত" "ধর্ম্মব্রত" লো কাজ! ইহা কি পরের গোয়ালে গোদান নয়?

সব কথা রামকে বুঝিয়ে ব'লেও নিশ্চিন্ত হলেন পাছে কৈকেয়ীর লোকেরা টের পে'য়ে গোলমাল বা এই আশঙ্কায় তিনি রামকে পুনর্ব্বার বল্লেন—

"সুহৃদশ্চা প্রমত্তাস্তাং রক্ষন্ত্বদ্য সমন্ততঃ।"

"আজ রাত্রে যেন তোমার বন্ধুবান্ধবেরা তোম সাবধানে রক্ষা করেন।"

বলি এত ভয় কিসের? রামকে ত দেশের সর্ব্বসাধা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখ্‌ত।

লোকে কথায় বলে, "ধর্ম্মের ঢোল আপনি বা এত লুকোলুকি করেও কথাটা গোপন রাখ্‌তে পাল্লেন যদিও মহারাজ দশরথ সব ঠিক করে একবারে শেষ মুহূ মেজরাণী খবরটা শুন্‌তে পাবেন না ব'লে মনে মনে ক'রে নিশ্চিন্ত মনে ব'সে রইলেন। আমার ভাগ্যি বল কি অভাগ্যি বল, খবরটা আগেই আমার কাণে এ'ল। সেই দি বিকাল বেলা ছাদে গিয়া দেখলাম বড়রাণীর অন্দরে খুব ধাম লেগে গেছে। দেবার্চ্চনা, ব্রাহ্মণভোজন, কাঙ্গালি অজস্র চল্‌ছে। কৌশল্যাদেবীর দাসীগুলো পোষাকী ক আর সোনাদানা প'রে বুক ফুলিয়ে ঝম্ ঝম্ ক'রে ছুটো কর্‌ছে। গতরখাকীদের ঠমক দে'খে আমার স যেন জ্বলে উঠ্‌ল। আমি ত প্রথমে বুঝতেই পার না—ব্যাপার খানা কি! ডেকে সুধোতে কৌশল্যার দাসী শেষে ব'ল্লে——

"শ্ব পুষ্যেন জিতক্রোধং যৌবরাজ্যেন চানঘম্
রাজা দশরথ রামমভিষেক্তাহি রাঘবম্।"

(অযোধ্যাকাণ্ড ৭ম

"কাল রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা হ

শুনেই আমি তাড়াতাড়ি মেজরাণীর মহলায় গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি সব নীরব। প্রতিদিনের মত কাজ-কর্ম্মই সেখানে চল্‌ছে। আমাদের মেজরাণী এ পর্য্যন্ত এত বড় একটা ব্যাপারের কোন সংবাদই পান নাই। অতি চালাক রাজাটির চালাকী বুঝতে আমার আর ভাব্‌তে হলো না। তখন সব কথা খুলে বলে কৈকেয়ীকে মহারাজের সত্যপরায়ণতার দৌড়টা বুঝায়ে দিলুম। অভিমানিনী রাজকন্যা রাজার জুচ্চোরি কাণ্ড দেখে ক্রোধে, ঘৃণায় একেবারে গর্জ্জে উঠলেন। সিঁধের মুখে চোর ধরা পড়ে গেল! অবশ্য আমি ধরিয়ে না দিলে হয়ত চুরি হ'য়ে না গেলে গেরস্থ সজাগই হোত না। কিন্তু এমন একটা সর্ব্বনেশে খবর জেনে শুনেও যদি কৈকেয়ীকে তার বিন্দু-বিসর্গ জান্‌তে না দিতাম, তবে কি তোমরাই আমাকে নিমকহারাম—বেইমান বল্‌তে ছাড়্‌তে? না ধর্ম্মে তাহা সইত? যার নুন খেয়ে এতকাল বেঁচে আছি, তাঁকে অমন ফাঁকি দিয়ে—তাঁকে ঠকিয়ে অন্যে তাঁর দুধের বাটীর সরটুকু তুলে খাবে, আর আমি মন্থরা তাই ব'সে ব'সে দেখব, তেমন মেয়েই আমি নই!

স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতা, প্রবঞ্চনা দেখে মেজরাণী রাগে একেবারে টং হ'য়ে রইলেন। বুড়োমিন্সে মৌতাতের সময়মত রসের নাগরটি সেজে যেই মেজরাণীর শয়ন মন্দিরে প্রবেশ কল্লেন, আর তিনি যান কোথা! লাঙ্গুল মাড়ানো গোখুরা সাপের মত অভিমানিনী একেবারে ফোঁস্ ক'রে উঠল। বুড়ো মিন্সে তাঁর পিয়ারের রাণীর তেজ দেখে বুঝলেন যে সর্ব্বনাশ হয়েছে! কোন্ সর্ব্বনেশে অন্তঃপুরে এ'সে সব "গোমর ফাঁক" ক'রে দিয়েছে। মেজরাণীর ভাব গতিক দেখে চতুর চূড়ামণি বেশ বুঝ্‌তে পাল্লেন যে "ভবি সহজে ভোল্‌বার নয়।" চুক্তি অনুসারে কার্য্য না হ'লে কৈকেয়ী সব গুপ্ত কথা ব্যক্ত ক'বে, হাটে হাঁড়ী ভেঙ্গে কলঙ্কের বোঝা ত তাঁর মাথায় তুলে দেবেনই, অধিকন্তু বাপভাইকে খবর দিয়ে একটা খুনোখুনি কাণ্ড ঘটাবেন। এদিকে অভিষেকের সমস্ত আয়োজন ঠিক হ'য়ে র'য়েছে। রাজা দু'নায়ে দুপা দেওয়ার মত অবস্থায় পড়ে চক্ষে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। মেজরাণীর হাতে পায়ে ধরতে লাগলেন। কিন্তু তিনি রাজাকে বিলক্ষণ রূপেই চিনেছিলেন। একটু সময় পেলেই তিনি মেজ মহিষীকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করবেন, তা বুঝতে চতুরার আর বাকী ছিল না। সুতরাং রাজার অনুনয় বিনয়ে তাঁর প্রতি রাণীর দয়া ত হলই না, অধিকন্তু ভবিষ্যতে আবার কোন ষড়যন্ত্র না হয়—এই জন্য ভরতকে নিরাপদ করার জন্য এবং কতকটা লুকোচুরির প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য "রাম বনবাস" জেদ ক'রে বস্‌লেন পিতৃ-ভক্ত গুণধাম রাম পিতার সঙ্কট বুঝতে পেরে আর ভ্রাতৃ-বিরোধের ভয়ে কোন আপত্তি না ক'রে আপনিই বনযাত্রা করলেন! "স কামবল সংযুক্তো রতার্থী মনুজাধিপ" হর্ষ বিষাদের আবেগ সইতে না পেরে সেখানেই ঢ'লে পড়লেন। ভরতশত্রুঘ্নকে আনিবার জন্য কেকয় রাজ্যে তাড়াতাড়ি দূত পাঠান হল। যুধাজিৎ সকল ব্যাপার বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি বহু সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ ক'রে, যুদ্ধের আশঙ্কায় প্রস্তুত হ'য়ে ভাগ্‌নেকে নিয়ে অযোধ্যাভি-মুখে ধাবিত হ'লেন। তখন—

"বলেন গুপ্তো ভরতো মহাত্মা, আদায় শত্রুঘ্নমপেতশত্রু।
সহার্যকন্যাত্মসমৈরমাত্যৈঃ গৃহাদ্‌যযৌ সিদ্ধইবেন্দ্রলোকাৎ॥"

ভরত শত্রুঘ্নের সঙ্গে মামাবাড়ীর সৈন্যসামন্ত এবং মন্ত্রীদিগের দ্বারা বেশ সুরক্ষিত হয়ে, বাড়ী এ'সে সকল ঘটনা জানতে পারলেন। ভরত ছেলেটি বড় সাদাসিধা মেজাজের। তিনি এ সব গুপ্ত রহস্য কিছুই জানতেন না। বড় ভাইয়ের প্রতি বেশ শ্রদ্ধাভক্তিও ছিল। সুতরাং তারই রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য এমন একটা শোচনীয় ঘটনা ঘটেছে দেখে তিনি লজ্জায় যেন মরে গেলেন। দেশের লোকেও চুক্তি রহস্য অবগত ছিল না; তাই না বুঝে না শুনে লক্ষ-কণ্ঠে ভরতের অপযশঃ গাইতে লাগল। লোকপ্রিয় রামের শোকে প্রজাগণ হাহাকার করতে লাগল। "ধর্ম্মজ্ঞ" "রামজীবন" ভরত এমন কলঙ্কের পশরা মাথায় নিয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সিংহাসনে বসতে রাজি হলেন না। তিনি রামকে বনবাসে নিবৃত্ত করবার জন্য চিত্রকূটে গিয়ে তাঁর পায়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। রাম তখন ভরতকে সব গুপ্ত রহস্য ভেঙ্গে বল্লেন। রামের কাছে সব কথা শুনে তাঁর আত্মগ্লানি ক'মে গেল। তিনি ভাইয়ের পাদুকা সিংহাসনে রেখে রাজকার্য্য করতে লাগলেন। রামগতপ্রাণ প্রজারা তাঁর ভ্রাতৃভক্তি দেখে ধন্য ধন্য করতে লাগল। আর আমাকে এই দুই ঘটনার মূল মনে ক'রে, ভিতরে খবর কিছু না জেনে, শুনে,

কলঙ্কভাগিনী করল। গুপ্তকথা সকলে আর জানতেও পেলে না। যে রাজা পৌঢ় বয়সে একটা মেয়ে মানুষের রূপে পাগলপারা হ'য়ে কন্দর্পের তাড়নায় কিছুমাত্র ভবিষ্যৎ চিন্তা না ক'রে—তার কাছে নাকে খৎ দিয়ে সম্পূর্ণ আত্মবিক্রয় করে বসলেন, তিনি হলেন কিনা জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মাবতার— আর রাক্ষুসী হল সেই নিরপরাধা মেয়ে। যিনি নিজের কাজটুকু হাসিল করেই – সরলা কামিনীকে সাত পাঁচ কথায় ভুলিয়ে অঙ্কগতা করেই তাকে প্রতারিত করবার জন্য অ... ফন্দি আঁটলেন, তিনি হলেন "সত্যব্রত" "সত্যসন্ধ"—অ... সেই প্রতারকের প্রতারণা ধরিয়ে দিয়ে, সেই বুনো ও... উপযুক্ত বাঘ তেঁতুলের ব্যবস্থা করে আমি হ'লেম সর্ব্বনা... রাক্ষুসী, কলঙ্কিনী, আরও কত কিছু! বলি তোমা... বিবেচনাটা কেমন গা?

শ্রীনীলকণ্ঠ ...

ও

(১)

তীর্থযাত্রী পান্থ ওগো! ওগো অমৃতের
অতৃপ্ত পিপাসি!
শুনিলে কি শুভক্ষণে আনন্দলোকের
সম্মোহন বাঁশী!
খুলে গেল রুদ্ধদ্বার, আঁধার গুহায়
পশিল কিরণ,
ছুটে এসে আলিঙ্গিল সুহৃদের প্রায়
স্নিগ্ধ সমীরণ!
শুনাল ললিত কণ্ঠে মধুর সঙ্গীত
বিহঙ্গ-সমাজ,
ঘুচে গেল মুহূর্ত্তেকে কল্পনা অতীত
দুঃখ-দৈন্য-লাজ!
দাঁড়াইলে অকস্মাৎ নিখিল বিশ্বের
মাঝখানে আসি'—
তীর্থযাত্রী পান্থ ওগো! ওগো অমৃতের
অতৃপ্ত পিপাসি!

(২)

অনন্ত আকাশ ঊর্দ্ধে—নিম্নে বসুন্ধরা
দিগন্ত বিস্তার,
তোমারে লইল বরি' স্নেহ-প্রীতি ভরা
আনন্দে অপার!
রবি-চন্দ্র-গ্রহ-তারা জ্যোতিঃ দিল দান
ভরিয়া অন্তর,
অর্পিল অপূর্ব্ব প্রেম নিষ্কাম মহান্
তটিনী-সাগর!
কি গীতি শিখাল তোমা বিহগ-নির্ঝর
কত ছন্দময়;
বিলাল চেতনা বায়ু—হাসি মনোহর
প্রসূন নিচয়।
তপঃদৃপ্ত পার্থ পাশে শক্তি ত্রিদিবের
উঠিল উচ্ছ্বাসি'—
তীর্থযাত্রী পান্থ ওগো! ওগো অমৃতের
অতৃপ্ত পিপাসি!

(৩)

আপনার পরিচয় লভিলে আপনি
সিদ্ধ-কাম তুমি,—
শুনিলে আকাশে জাগে অনাহত ধ্বনি
স্বর্গ-মর্ত্ত্য চুমি'!
তা'রি ক্ষীণরেখা ধরি' দিগন্তের-পারে
সুদূরে কোথায়,—
তোমা শুধু যেতে হবে আলো-অন্ধকারে
প্রফুল্ল হিয়ায়!
আছে সেথা মহাতীর্থ—না জানি কেমন
বাঞ্ছিত তোমার,—
বারেক দর্শন হলে হয় সম্পূরণ
সব আকাঙ্ক্ষার!

আনন্দে ছুটিলে তাই চির-মিলনের
হয়ে অভিলাষী,—
তীর্থ-যাত্রী পান্থ ওগো ! ওগো অমৃতের
অতৃপ্ত পিপাসি !

(৪)

নিঃসঙ্গ পথিক তুমি, অনন্ত সে পথ—
কে রাখে সন্ধান,—
না জানি কখন হবে উদ্‌যাপিত ব্রত
লভিবে নির্ব্বাণ !
কি গান গাহিছ আজি আপনার মনে
মুগ্ধ দশদিক্‌,
সারা বিশ্ব তব পানে ব্যাকুল নয়নে
চেয়ে অনিমিষ ।
ভ্রূক্ষেপ করনা কিছু, তুমি আত্মহারা
উদাসী পাগল,—
বক্ষভরা প্রেম আর মুক্ত অশ্রুধারা
পথের সম্বল ।
জান শুধু একদিন আছে নির্ভরের
জয় অবিনাশী,—
তীর্থযাত্রী পান্থ ওগো ! ওগো অমৃতের
অতৃপ্ত পিপাসি !

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত ।

মুক্তার মালা ।

(কোনও ইংরেজি গল্প হইতে অনূদিত ।)

মহাসমুদ্রের বক্ষদেশে ক্ষুদ্র একটি দ্বীপে দুইটি জীবন—পিতা আর পুত্রী। পিতা কাঠুরিয়া, সমুদ্র তীরবর্ত্তী নগরে প্রত্যহ কাষ্ঠ বিক্রয় করিতে যাইতেন। আর সহায়-হীনা কন্যাটি একাকী উদ্বিগ্নচিত্তে তাহার পিতার ছোট্ট নৌকাটির প্রতীক্ষায় তীরে বালুকা রাশির উপর বসিয়া বসিয়া বীচিমালা গণিত—এই একটা, এই দুইটা, এই তিনটা।

বহির্জগতের সঙ্গে তাহাদের বড় একটা সম্পর্ক ছিল না। যত কিছু সম্বন্ধ আত্মীয়তা ছিল, এই অসীম জলরাশির সহিত। প্রভাতে আলোর সঙ্গে সঙ্গেই এই ফেনিল তরঙ্গ-ময় জলরাশির পূর্ব্বকোণ লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইত—কন্যা ইহার দিকে পলকহীন নেত্রে চাহিয়া থাকিত। তারপর প্রভাত-তপনদেব যখন সমুদ্রের জলরাশি হইতে উঁকি দিয়া বালিকার পানে এক একবার চাহিয়া আবার ডুবিয়া যাইতেন, তখন বালিকাও তাহার সঙ্গে লুকোচুরি খেলিত। কিন্তু হায় হইত উজ্জ্বল ঐ গোলোক পিণ্ডের—তাহাকে বাধ্য হইয়া আত্মপ্রকাশ করিতে হইত! পুত্রী পিতাকে বলিত বাবা, ঐ জিনিষটা আমায় আনিয়া দিতে হইবে।

পিতা বলিতেন, আচ্ছা দিদি আমি আনিয়া দিতেছি; আমাকে কিন্তু এই জলের মধ্যদিয়া হাঁটিয়া যাইতে হইবে। কন্যা ভয়ে বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিত "না, বাবা থাক্‌ থাক্‌, আমার দরকার নাই। আমি চাই না।"

পিতা শুধু হাসিতেন, আর কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া চুমা খাইতেন। পিতৃস্নেহ কন্যার যত কিছু আবদার আকাঙ্ক্ষা এককালে মন হইতে মুছিয়া ফেলিত।

সন্ধ্যায় সূর্য্যদেব যখন স্বীয় তাপিত অঙ্গ শীতল করিতে অপার জলরাশির মধ্যে নামিয়া আসিতেন, তখন বালিকা বলিত—বাবা ও এখন কোথায় যাবে?

পিতা বলিতেন, ওর বাড়ীতে। বালিকা জিজ্ঞাসা করিত—ওর আবার বাড়ী আছে নাকি? সেটা কোথায়? পিতা বলিতেন—সমুদ্রের নিম্নে। বালিকা বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিত,—তবে নিচেও বাড়ী আছে!

পিতা কেবল একটা সংক্ষিপ্ত—হাঁ বলিয়াই নীরব থাকিতেন—শুধু একটা সুদীর্ঘনিশ্বাস হৃদয়ের মর্ম্মমূল হইতে বাহির হইয়া বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া যাইত।

এই ছিল পিতা আর পুত্রীর জীবন—এইরূপে উভয়ের জীবন-স্রোত প্রবাহিত হইত—বালুকারাশির মাঝে—অনন্ত সমুদ্রের তীরে।

উষাসমাগমে বালিকা প্রত্যহ সমুদ্রতীরে যাইয়া মুক্তা সংগ্রহ করিত। কোনও দিন সংগৃহীত হইত একটি, কোনও দিন দুইটি—এর বেশী সে খুজিয়া পাইত না। যে দিন উজ্জ্বল সুন্দর মুক্তাবিন্দু তাহার চোখে পড়িত, দৌড়াইয়া আসিয়া হর্ষচিত্তে পিতাকে দেখাইত।

পিতা কেবল একটু হাসিতেন। উজ্জ্বল নীলাভ মুক্তা-খণ্ডগুলি সে অন্যান্য মুক্তা হইতে ভিন্ন রাখিত—আর মালা গাঁথিত। পিতা জিজ্ঞাসা করিতেন—এই মুক্তার মালা তুমি কাহার গলায় পরাইবে ?

বালিকা বলিত—যাহাকে পরাইতে হয় তাহাকেই পরাইব।

পিতা নীরব থাকিতেন, আর বার বার চোখ মুছিতেন। চোখ হইতে অশ্রুবিন্দু বালুকার উপরে পড়িয়া শুকাইয়া যাইত। কন্যা জিজ্ঞাসা করিলে বুঝাইতেন, রৌদ্রের তাপে চোখে জল আসিয়াছে। তাই বালিকা বলিত বাবা তবে চল, আমরা কুটীরে যাই।

কখন কোন সময়ে ইহারা এখানে আসিয়াছিল, তাহার ঠিক সংবাদ কেবল ঐ অনন্ত বালুকারাশি এবং সমুদ্রের ফেনিল তরঙ্গই বলিতে পারে। তবে নাকি, ইহারা যখন সমুদ্র পথে দেশান্তরে যাইতেছিল, তখন ভীষণ ঝঞ্ঝাবাতেই ইহাদের জীবন-প্রবাহ দিগন্তরে চালিত করে। বৃদ্ধের পত্নী জলমগ্ন হইয়া অনন্ত জলরাশির মধ্যেই চিরশয্যা রচনা করেন। রাখিয়া যান পঞ্চমাসের এক শিশুকন্যা—লিলিয়ান্‌কে। সেই হইতেই বৃদ্ধ তাহার এই কন্যাটিকে কৃপণের ধনের মতন লালনপালন করিয়া আজ ৮ বছরে দাঁড় করাইয়াছে।

দুই

বছর কতক চলিয়া গিয়াছে। একদিন অন্যান্য দিনের মতন বৃদ্ধের কন্যা পিতার ছোট্ট নৌকাটির আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। ওই না একটা নৌকা আসিতেছে ? না, না, ওটা ত আর একদিকে চলিয়া গেল। ওই যে একটা পালের মত কি দেখা যাইতেছে। ঐই বাবার নৌকা। কোথায় ? আর যে দেখা যাইতেছে না। তবে বোধ হয় ওটাও নয়। আজ বাবার এত দেরী হইতেছে কেন ? প্রতিদিন ত কত আগে আসেন। ওই যে বহুদূর ওটা কি ধূ ধূ করিতেছে তাই ত—ওযে একখানা নৌকা এদিকে আসিতেছে। এটাই বোধহয় আমার বাবার, দুইজন লোক যে দেখা যাইতেছে না, না, এইটিও বোধহয় নয়। বাবার ত একা আসি কথা। আচ্ছা, এদিকেই ত আসিতেছে ওই ত আমার ব দাঁড়াইয়া আর একজন কে জানি নৌকার দাড় ধ রহিয়াছে।

ক্ষণকাল পরেই নৌকাখানা আসিয়া তীরে ভিড়ি বৃদ্ধ গর্ণেলিস্ লম্ফ দিয়া নামিয়াই লিলিয়ানের গোলা সদৃশ ছোট্ট মুখখানিতে একটি চুম্বন দিয়া বলিলেন লিলি, এই যে তোর মুক্তার মালা গলায় দেবার লে আনিয়া দিলাম। এর নাম হচ্ছে টোরো ডি মর্নিং।

তারপরে একদিন বৃদ্ধ গর্ণেলিসের সেই সুন্দর ে সাম্পান খানিকে আর ফিরিতে দেখা গেল না। লিলিয় সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমুদ্রের জলরাশির দিকে এ দৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে হতাশ হৃদয়ে ক্ষুদ্র কুটী ফিরিয়া গেল। হৃদয়ে তখনও আশার প্রদীপ জ্বলিতেছি —আগামী কল্য নিশ্চয়ই বাবা আসিবেন।

পরদিন অতি প্রত্যুষে সাগরের ধারে দ্বীপের নিক সাম্পান খানাকে দূর হইতে দেখিয়া লিলিয়ানের ছে হৃদয় খানি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

বাবা, বাবা, বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে আসি দেখিল—শুধু ছোট্ট তরীখানা তরঙ্গের তালে তালে না তেছে—আরোহী কেহ নাই।

তিন

ছিল পিতা আর পুত্রী—শুধু দুইজন ; কিন্তু তার পরে সংখ্যাতে দুইজনই রহিল—নূতন দুইজন হইল, মিঃ মর্নি এবং লিলিয়ান্।

পিতৃশোকে কতিপয় দিবস যাপন করিয়া লিলিয় তাহার নূতন জীবনের জন্য বদ্ধপরিকর হইল। বর্ত্তমানে লিলিয়ান্ আর আগেকার সেই ছোট্ট আদুরে মেয়ে লি রহিল না। এখন সে তাহাদের সেই ক্ষুদ্র কুটিরের গৃহি —ষোল বছরের যুবতী। কিন্তু এখনও তাহাকে প্রতিদি সাগরের ধারে ছোট্ট সাম্পানটির প্রতীক্ষায় বসিয়া সাগরে লহরমালা গণনা করিতে হয়—শুধু মর্নিং এর নগর হই প্রত্যাবর্ত্তনের আশায়। এখনও সে মুক্তাবিন্দু সংগ্রহ করে এখনও সে তাহা দিয়া মালা গাঁথে।

মর্নিংএর সঙ্গে থাকিতে থাকিতে পরস্পরের মধ্যে এক প্রকার নিকটতম আত্মীয়তা স্থাপিত হইল—উভয়ের মাঝে প্রগাঢ় ভালবাসার সৃষ্টি হইল। লিলিয়ানের অবলম্বন বর্ত্তমানে কেবল মর্নিং, সে মর্নিংকেই স্বামী বলিয়া তাহার পদে নিজকে সমর্পণ করিতে পারিলেই যেন বাঁচে। পিতা গর্ণেলিসেরও এই অভিপ্রায়ই ছিল,—তিনি কথাবার্ত্তায় এই ইচ্ছাই প্রকাশ করিতেন; মর্নিংএর এই বিবাহে কোনও-রূপ অনিচ্ছা ছিল না। সেও লিলিয়ানকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত। সে শুধু বলিয়াছিল—লিলি, তোমার এই মুক্তার মালা শেষ হইয়া গেলেই তুমি আমার স্ত্রী হইবে।

আর তিনটি মুক্তাবিন্দু—তার পরেই ত মালা শেষ। আজ একটি—কাল একটি—পরশু একটি—তার পরদিনই ত লিলি স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যে একটা দাবী অধিকার—সম্পূর্ণ-রূপে তাহা পাইবে।

দুইদিন দুইটি মুক্তাখণ্ড পাওয়া গেল। তৃতীয় দিবস প্রত্যূষে একটিও মুক্তাবিন্দু খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। মিঃ মর্নিং সমুদ্র তীরবর্ত্তী নগর হইতে ফিরিতেছিলেন—আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন। প্রবল বাত্যাহত হইয়া মর্নিংএর ক্ষুদ্র সাম্পানখানা ইতস্ততঃ জলের উপর সঞ্চালিত হইতে লাগিল অতিকষ্টে একহাত অগ্রসর হইতেছে—দুইহাত বাত্যাঘাতে পশ্চাতে চলিয়া যাইতেছে। লিলি তীর হইতে পলকহীন দৃষ্টিতে মর্নিংএর এই ভীষণ বিপদ দেখিতেছে, আর একমনে ভগবান্‌কে ডাকিতেছে।

একটা ঝাপটা বাতাস হঠাৎ ক্ষুদ্র নৌকা খানাকে তীরের দিকে চালনা করিল—মুহূর্ত্তরে লিলি দেখিল নৌকাখানা তীরের দিকে আসিতেছে—তারপরে সব শেষ—সাম্পানটিকে আর দেখা গেল না। কোথায় সাম্পান—কোথায় মিঃ মর্নিং! শুধু একটা অত্যুচ্চ পর্ব্বতপ্রায় তরঙ্গখণ্ড আসিয়া তীরে প্রতিহত হইল, জলরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে একটি উজ্জ্বল মুক্তাখণ্ড বালুকা রাশির উপরে ঝকমকিয়া উঠিল! লিলি মুহূর্ত্তের জন্য সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের দিকে চাহিল। তারপর মুক্তাবিন্দুটিকে হস্তে লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিয়া তাহার অন্যান্য মুক্তারাশির সঙ্গে একত্র করিয়া গাঁথিয়া অর্দ্ধসম্পূর্ণ মালাটিকে সম্পূর্ণ করিল।

মাল্য হস্তে সে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া ভাবী স্বামী মর্নিংএর গলদেশে স্বহস্তে মালাগাছটি পরাইয়া দিতে মহাসাগরের জলকল্লোলের সঙ্গে মিশিয়া গেল। অসীম জলরাশি তাহাদের বিবাহ শয্যা হইল—ক্ষুদ্র কুটিরখানি শূন্য পড়িয়া রহিল। তারপরে রহিল কি? শুধু অনন্ত মহাসমুদ্রের প্রলয়ব্যাপী—শোঁ। শোঁ। শোঁ।!

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রতিবাসী।

তোমার প্রাসাদ পাশেই যে গো
আমার কুটীরখানি;
আজও তোমায় আমায় কভু
হয়নি জানাজানি?
তুমি থাক আলোর ভুবন মাঝে,
কুটীরে মোর চির আঁধার রাজে,
তুমি সদা হাস, নাচ,—ফুর্ত্তি-হারা
মগ্ন হ'য়ে শুনি;

চির বিষাদ-কারায় বসি
অশ্রুবিন্দু গণি।
কেমন ওগো তুমি প্রতিবাসী,
একটি বারও দেখনাক আসি;
মুছিয়ে দেওনা অশ্রু-রাশি
শান্তি পরশ আনি;
তোমার প্রাসাদ পাশেই যে
বেঁধেছি কুঁড়ে খানি?

শ্রীউমাপ্রসন্ন দে।

সাহিত্যিক ষড়যন্ত্র।

বটুকৃষ্ণ ঘোষ যখন 'হেয়ার স্কুলে' পড়িত, ক্লাসের ছেলেরা তখন তাহার নামের 'বোটো,' 'বটা,' এইরূপ সংক্ষেপ করিয়া লইয়াছিল। বটুকৃষ্ণের লাজুক স্বভাব-ইহাতে প্রকাশ্য যুদ্ধ-ঘোষণা না করিলেও, এই কঠোর গদ্যাত্মক সম্বোধনে সে মনে মনে বিলক্ষণ চটিত।

বটুকৃষ্ণের প্রকৃতিটা ছিল কাব্যপ্রিয়। এন্ট্রেন্স পড়িবার সময়ই সে মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর অধিকাংশই পড়িয়া ফেলিয়াছিল। রবিবাবুর 'মানসী' 'কড়ি ও কোমল' এবং 'সোনার তরীর' বহু কবিতা সে আবৃত্তি করিতে পারিত। তাহার দেরাজে একখানি রচনার খাতা লুকান থাকিত। তাহার অনেক-গুলি পাতা এই বালক-কবির কবিতায় ও কাটাকুটিতে ভরিয়া গিয়াছিল। সুতরাং সহাধ্যায়ীরা যখন নিঃসঙ্কোচে কাব্যের চতুঃসীমার বাহিরের এই গদ্য অপভ্রংশ উচ্চারণ করিয়া তাহার সহিত আলাপ করিত, তখন এই তরুণ কবি-হৃদয়টিতে যে ব্যথা বাজিত, তাহা সেই জানিত, আর জানিতেন অন্তর্য্যামী। সারাজীবন তাহাকে একটা নীরস নামের বোঝা বহিতে হইবে, এই খেদে মাঝে মাঝে তাহার মন অস্থির হইয়া উঠিত।

বটুকৃষ্ণ প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৫৲ টাকা বৃত্তি পাইয়া রিপন কলেজে ভর্ত্তি হইল। তাহার সহপাঠীরা অনেকেই প্রেসিডেন্সি কলেজে গিয়াছে। তাহার অবস্থা সচ্ছল, এবং উপরন্তু এই ১৫৲ বৃত্তি, তবুও সে গেল রিপনে পড়িতে! এই খাপ-ছাড়া ব্যাপারটার রহস্য কেহই বুঝিতে পারিল না। যাহাদের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা ছিল তাহারা বলিল—আচ্ছা, এই খেয়ালের মজা টের পাবে এক্জামিনের সময়; স্কলার্সিপের দফা এই পর্য্যন্ত।

দুই বৎসর পরে যখন এফ এ পরীক্ষার ফল বাহির হইল, বটুকৃষ্ণের বাল্যবন্ধুরা খুঁজিয়া পাতিয়া দেখিল গেজেটের কোথাও—এমন কি তৃতীয় বিভাগেও বটুকৃষ্ণ ঘোষ, রিপন কলেজ, বলিয়া কোন নাম নাই! তাহাদের কথা ফলিয়াছে, যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল!

বিকাল বেলা তাহারা কয়েক জন বন্ধু ম্লানমুখে বটু-কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করিল। হেয়ার স্কুলে প্রভাস ছিল, তাঃ প্রতিদ্বন্দ্বী, এবারও সে বেশ ভাল পাশ করিয়াছে। দে মুখপাত্র হইয়া সেই বলিল, "বটু! এ কেমন হ'ল? তুই ভাই বেশ ভাল ছেলে। তবে কলেজের দোষে অমন হ গেল।"

বটুকৃষ্ণ একটু হাসিয়া বলিল, "কেন? কলেজের দো কেন? সেখানেও নোট লেখায়। এখানেও নোট লেখা পাশ ফেল সব জায়গায়ই নিজের খাটুনীর উপর। ও সেখানে ভাল ছেলে পায়, ভাল পাশ করে। আমা কলেজেও ত এবার একজন পঞ্চম হয়েছে।"

আর একজন বলিল, "এই কুবলয় ঘোষটি কে হে? ব এন্ট্রেন্সে ত ভাল পাশ করেনি। যাক্ ও অমন এব আধটা বরাতগুণে কেমন উত্‌রে যায়। বোধ হয় যা মুঃ ক'রেছিল, তাই প'রে গেছে।"

বটুকৃষ্ণ একটু হাসিয়া বলিল, "কুবলয় কে তোরা চিনি না? সে যে আমাদের সঙ্গেই প'ড়ত।"

এমন সময় বাড়ীর চাকর কয়েক রেকাবী উৎকৃষ্ট খাব সকলের সম্মুখে রাখিয়া গেল,—তাহার বাবু খুব ভাল প হ'য়েছে, বড় জলপানি পাবে, তাই গিন্নিমা তাদের মিষ্টি ক'রতে বলেছেন।

প্রভাস লাফাইয়া উঠিয়া বটুকৃষ্ণকে জড়াইয়া ধরি বলিল, "আরে আমাদের বোটোই কুবলয় ঘোষ!" তখ একটা হাসি ও চেঁচাচেচির হল্লা পড়িয়া গেল।

প্রভাস বলিল, "এবার তোকে প্রেসিডেন্সিতে যেতে হবে। আমাদের ছেড়ে তোর একটু কষ্টও হয় না? আম এবার আর ছাড়চি না। কিসে 'অনার' নিবি বল্?"

নির্ম্মলের সঙ্গে স্কুলে বটুকৃষ্ণের একটু বেশী ঘনিষ্ঠত ছিল। সে মাঝে মাঝে তাহার বাড়ীতে আসিত। বটু কখন কখন তাহার বাড়ীতে যাইত। এত বড় একা ব্যাপার ঘটিয়াছে, বটু তাহার নাম বদলাইয়াছে, সে দিনও ত তার সঙ্গে গোলদিঘীতে দেখা, তথাপি সে ইহার বিন্দু বিসর্গও জানে না! আজ অনেককেই দুঃখ জানাইতে আসিয় বোকা বনিতে হইয়াছে, তাহাকেও বটু বোকা বনাইল

সে একটু অভিমানের সহিত বলিল, "আমরা এখন ওর পর হে। নতুন নতুন বন্ধু হয়েছে, তাদের মায়া কাটিয়ে বটু কি আর আমাদের কথা রাখতে পারে? সাত বচ্ছর এক সঙ্গে পড়া গেছে, তা অমন কত লোক এক সঙ্গে পড়ে, সবাইকে কি আর সবার ভাল লাগে?"

বটুকৃষ্ণ হাসিয়া বলিল, "ভাল লাগে কি না লাগে, নির্ম্মল, তুমি তা বিলক্ষণই জান।"

নির্ম্মল বলিল, "হাঁ! বটুকৃষ্ণ ঘোষ যে কুবলয় ঘোষ, একথা তারসঙ্গে ছবছর বেড়িয়েও যেমন জেনেছিলুম।"

মাখন বলিয়া উঠিল "ও! মনে পড়েছে—'নীহারিকা' কাগজে মাসে মাসে 'কুবলয় ঘোষ' নাম দিয়ে একজন খাসা কবিতা লিখিত। বটুবাবু তা'হলে শুধু কুবলয় ঘোষ নন্—শ্রীযুক্ত কবি কুবলয় ঘোষ। Bravo (সাবাস্) বটু!"

নির্ম্মল বিস্ময়ের মাত্রা চড়াইয়া বলিল "অ্যাঁ! তাই নাকি? বটু এখন কুবলয় ঘোষ, কবি, সম্পূর্ণ নূতন লোক! আমাদের সঙ্গে বটুকৃষ্ণের বন্ধুত্ব ছিল বটে, তা বলে কুবলয় সেই হীনতা স্বীকার ক'রে নিতে রাজী হবেন কেন? দেখলে আজকে কেমন আমাদের সবাইকে বোকা বানিয়ে ছাড়লে।"

বাল্যকালের বন্ধুতা যে কি জিনিষ, কেমন স্বচ্ছন্দ, সহজ, অথচ গভীর, তাহার দাবী যে কতখানি, বটুকৃষ্ণ এই খোঁচায় তাহা একটু বুঝিল।

প্রাণ যখন সম্পূর্ণ খোলা, সংসারের 'চাল চলন' নামক খোলসটা যখন তাহাকে ঢাকিতে আরম্ভ করে নাই, মনের বৃত্তিগুলি সবে মাত্র ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে, ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য তখনও প্রচ্ছন্ন, জীবনের এমন সোনার শৈশবে যাহারা একসঙ্গে মেলে, ছোটখাটো জিনিষ লইয়া হাসে, কাঁদে, রাগে, অভিমান করে, তাহারা অতীতের কথা ভাবিবার অবকাশ পাইলে, ইহার জন্য দুই একবার দীর্ঘশ্বাস না ফেলিয়া থাকিতে পারে না।

কেহ শোকের আগুন বুকে চাপিয়া ফরোক্কাবাদে, কেহ সৌভাগ্যের সন্ধানে রেঙ্গুনে, দুর্ভাগ্যের তাড়নায় কেহ বা মিরাটে, কেহ ম্যালেরিয়ায় পেটজোড়া পীলে লইয়া নিজের অখ্যাত দরিদ্র পল্লীতে—অবস্থার এত পার্থক্য, দূরত্বের এত বড় ব্যবধান, অন্য সব দিক দিয়া এমন অপরিসীম অমিল, তথাপি অকস্মাৎ যদি কোনও দিন কোথাও সাক্ষাৎ ঘটে, তখন দুদণ্ডের জন্যও যে শৈশবের সুখস্মৃতির স্পন্দন অনুভব না করে, সে অভাগা, ইহা নিঃসন্দেহ!

প্রভাস কুবলয়ের নীচে হইয়াছিল। সে বলিল "তা হ'লে কুবলয় ঘোষ এবার কিসে অনার নিচ্ছেন জানতে পারি? বোধ করি ইংরাজীতে?"

বটুকৃষ্ণ একটি ছোট "হুঁ" দিয়া চুপ করিল।

(২)

নির্ম্মলের দল জিতিয়াছে। কুবলয় ঘোষ প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরাজী সাহিত্যে অনার লইয়া পড়িতেছে। বন্ধুরা সবাই অঙ্গীকার করিয়াছে, বটুকৃষ্ণকে অতঃপর কুবলয় বলিয়াই ডাকিবে এবং পূর্ব্বের নামটা মুখে আনিবে না। প্রভাস মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে এবার তাহার নষ্ট গৌরব উদ্ধার করিবে, বি, এ, পরীক্ষায় কুবলয়ের উপরের স্থান তাহাকে অধিকার করিতেই হইবে।

কুবলয় আর সে বটু নাই। এখন সে কবি, সাহিত্যের ভক্ত উপাসক। তাহার কথাবার্ত্তার ভাষায়ও কাব্যের গন্ধ এবং ছন্দের ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। বাঙ্গালাদেশের কয়েকখানি নব প্রকাশিত মাসিকপত্রে তাহার কবিতা বাহির হইয়াছে। তাহার বেড়াইবার সময় ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে, সে সময়টা কিট্স্, শেলী, ওয়ার্ডসোয়ার্থ, কালিদাস, চণ্ডীদাস অথবা রবীন্দ্রনাথের কবিতা ধীরে ধীরে দখল করিয়া ফেলিতেছে। তাহার বন্ধুরা কুবলয়কে পাইয়া বটুর অভাব ভুলিতে পারে নাই। সে যেন দিন দিন নূতন লোক হইয়া উঠিতেছে। তাহার খেয়ালের সঙ্গে তাহাদের মিল নাই। অসংখ্য অমিলের মধ্যেও প্রায় সকল মানুষের যে জায়গাটায় মিল—আড্ডা ও খেলা—সে ক্ষেত্র হইতে কুবলয় ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িতেছিল। ইহাতে নির্ম্মল ব্যথা পাইয়াছে, প্রভাস খেলাধূলা এবং বেড়ানর মাত্রা কমাইয়া পড়ার বই আর নোট লইয়া দ্বিগুণ খাটিতেছে।

আবার দুই বৎসর পরে বি, এ, পরীক্ষার ফল বাহির হইল। প্রভাস প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় এবং কুবলয় দ্বিতীয় বিভাগে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে। বন্ধুরা বিস্ময়ে অবাক্। একদিন প্রভাস সকলকে বড়গোছের ভোজ দিল। কুবলয় গিয়াছিল, কিন্তু নির্ম্মল যায় নাই। সে রাগে ও দুঃখে কুবলয়ের সঙ্গে কয়েকদিন ভাল করিয়া কথা কহিতে পারে নাই।

কুবলয় এম,-এ, পড়িবে না। বন্ধুরা অনুরোধ, উপরোধ এবং পরিশেষে অবরোধ আরম্ভ করিল। সকলের চেয়ে বেশী জেদ করিল প্রভাস। পরীক্ষায় সে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে; কিন্তু ক্লাসে কুবলয়ের যে সব ইংরাজী রচনা সে দেখিয়াছে তাহাতে স্পষ্টই বুঝিয়াছে কুবলয় একজন সুলেখক এবং তাহাদের চেয়ে ঢের উঁচুদরের সমজদার। আর এণ্ট্রেন্সে ও বি, এ, তে কুবলয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়া পড়িয়াই ত সে তাঁহার উপরে স্থান পাইয়াছে।

নির্ম্মল একদিন আসিয়া বিস্তর পীড়াপীড়ি করিল। তাহার অনুরোধ ও অভিমান কিছুই যখন টিকিল না তখন সে কাঁদিয়া ফেলিল। এবার কুবলয়কে রাজী হইতে হইল। সে বুঝিল এই কয় ফোঁটা অশ্রু সংসারের প্রতিদিনকার অভিনয়ের চোখ রগ্‌ড়ান জল নয়—বহুদিনের দুঃখ, অভিমান ও সমবেদনার বাষ্প জমিয়া নির্ম্মলের বুকে যে কালো মেঘ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল, ইহা তাহারই বর্ষণ। সে নির্ম্মলের সঙ্গে গিয়া কলেজে নাম লেখাইয়া আসিল।

(৩)

কুঁড়ি যখন ফুটিতে আরম্ভ করে তাহার সব পাপড়ি এক সঙ্গে খোলে না। একটির পর একটি, ধীরে ধীরে, পাপড়িগুলি ছড়াইয়া পড়ে। কুবলয়ের এই অদ্ভুত জীবনের বিকাশও এমনি ভাবেই হইয়াছিল। সে যে কি হইয়া দাঁড়াইবে, গোড়ায় তাহার ভাবভঙ্গী, কার্য্য-কলাপ দেখিয়া কেহই বুঝিতে পারে নাই।

এইটাই মানুষের স্বাতন্ত্র্যের বয়স। এই সময়ে কে যে কি হইবে, কাহার জীবনের স্রোত কোন পথে বহিবে, কে কর্ম্মী হইবে, বীণাপাণির প্রসন্ন হাস্য কাহার ললাট জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিবে, নিগৃহীতের আর্ত্তনাদে, ব্যথিতের হাহাকারে, কাহার হৃদয় টলিবে, আর কাহারা গতানুগতিকের বাঁধা পথে গরুরগাড়ীর চাকার মত একঘেয়ে ক্যাঁচক্যাঁচানিতে চারিদিক বিব্রত করিয়া মৃত্যুর অভিমুখে অগ্রসর হইবে, এই বয়সেই তাহার আভাষ পাওয়া যায়। এই সময়টায় সমষ্টির ব্যষ্টি বিভাগের সূচনা, ব্যক্তি তাহার বৈশিষ্ট্য লইয়া সমষ্টি হইতে তফাৎ হইয়া পড়ে।

কুবলয়ের ভাবভঙ্গী চালচলন ক্রমশঃই বদলাইয়া উঠিতেছিল। সে এখন সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক। সে চায় কবিতার ভাবে, সাহিত্যের রসে বিভোর হইয়া থাকিতে। এখন তাহার জীবনের একমাত্র কাম্য, সাহিত্য-সাধনা। সে সব ছোটখাটো সুখ দুঃখের মধ্য দিয়া সাধারণ লোকেরা হাসিয়া কাঁদিয়া তাহাদের জীবনের দিনগুলি কাটাইয়া দেয়, সে সব লইয়া বাঁচিয়া থাকা মৃত্যুরই নামান্তর—একথা কুবলয় তাহার বন্ধুদের কাছে খুলিয়া বলিয়াছে।

তাহার পড়িবার ঘরের চারিধারের আলমারিগুলি নূতন নূতন পুস্তকে ভরিয়া উঠিতেছে। মাঝে মাঝে দুই একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে সে বলিয়া ফেলিয়াছে "ইহারাই আমার বন্ধু। তোমাদের সঙ্গে ত বর্ত্তমানের একঘেয়ে ব্যাপার লইয়া কথাবার্ত্তা হয়; আর ইহারা কত শতাব্দীর যবনিকা সরাইয়া অতীতের কত কথা, কত কল্পনা, কত বুকভরা আশা আমার কাছে আনিয়া কি বিচিত্র ভাবায়, কি সুন্দর সুস্পষ্টভাবে খুলিয়া বলে। বড় বড় প্রাণে যে সব ভাবের ঢেউ উঠিয়াছে, মনীষীদের চিত্তে যে সব আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, আমি বসিয়া বসিয়া ইহাদের মুখে সেই সব শুনি।"

নির্ম্মল বেচারী গণিত পড়িত, সাহিত্যিকতার এই দুঃসহ গুমোটে সে অস্থির হইয়া উঠিত, আর ভাবিত—সেই বটু আজ কি হ'য়ে উঠল! প্রভাস বুঝিত, এই খেয়ালে বি, এ, টা মাটি করিয়াছে, এম, এ টাও মাটি করিবে। মাথন অনেক আড্ডার আড্ডাধারী, মনুষ্যচরিত্র ইহাদের চেয়ে একটু ভাল করিয়া বুঝিবার ক্ষমতা তাহার জন্মিয়াছিল। সে বলিল "বাপ পয়সা রেখে গিয়েছে, বাড়ীতে পুষ্যি কম। আমাদের মত ত একপাল ক্ষুধার্ত্ত জীব ওর মুখ তাকিয়ে বসে নেই। তবে ছেলেটা ছিল ভাল, এই খেয়ালটা আর দুবছর পরে হ'লেই ভাল হ'ত।"

বসন্ত আসিলে গাছের ডালে, পাতায়, ফুলে, সর্ব্বত্রই তাহার স্নিগ্ধ শ্যামল শ্রী ছড়াইয়া পড়ে। ভাবরসের যে মদির বসন্ত কুবলয়ের চিত্ত স্পর্শ করিয়াছিল তাহাতে তাহার চারিধারে এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল।

কুবলয়ের বসিবার ও পড়িবার ঘর দুইটির চেহারা এবং সাজ সরঞ্জাম সে তাহার রুচির অনুযায়ী করিয়া লইয়াছিল। খোলা, মোড়া, আধখোলা, প্রভৃতি অবস্থায় নানাজাতীয় বই আর সে ঘরে ছড়ান নাই। বিদ্যুতের আলো নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছে। আগরার বাতিদান এখন তাহার আলো জোগায়। কাশ্মীরের কার্পেট, জয়পুরের পাথরের কাজ

কৃষ্ণনগরের ছোট ছোট্ট মূর্ত্তি প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের দেশীয় 'আর্টের' জিনিষ সংগ্রহ করিয়া কুবলয় তাহার চারিধারে কলাবিদ্যা অনুশীলনের উপযোগী আবহাওয়া রচনা করিয়া লইয়াছে। বর্ত্তমান যুগটা তাহার মতে কলকারখানার যুগ সুতরাং কাব্যকলাকে বাঁচাইতে হইলে এই কঠোর গদ্যময় যুগের কর্কশতা ও কদর্য্যতার সংস্পর্শ হইতে দূরে না থাকিলে চলিবে না।

এসেন্স্ ল্যাভেণ্ডারের বদলে সে এখন আতর গোলাপ-জল ব্যবহার করে। আত্মীয়, বন্ধু, সহপাঠী সবাই দেখিল কোথাও যাইতে হইলে কুবলয় কটকের ফুলতোলা জুতা আর গরদের ধুতি চাদর প'রে। তাহার আটপৌরে কাপড় ফরাসডাঙ্গা কিংবা শান্তিপুরের মিহি ধুতি এবং পাতলা বেনিয়ান। ফুলদানিতে নিত্যই জুঁই, রজনীগন্ধা ও বেলের কুঁড়ি থাকে; পড়িবার এবং লিখিবার টেবিলের পাশে সকালে সন্ধ্যায় ধূপের কাঠি জ্বলে। হারমোনিয়ম অর্গান ছুটি পাইয়াছে, বীণা তাহাদের স্থান পূরণ করিয়াছে। চা'র পরিবর্ত্তে এখন শীতকালে গরম দুধ এবং গ্রীষ্মকালে ঘোলের সরবৎ।

আত্মীয়েরা ভাবিল, অবস্থা ভাল সুতরাং এই বয়সে একটু সখ মিটাইয়া লওয়ার দোষ নাই; সমালোচকেরা বলিল—বড়মানুষী চাল; তাহাকে যাহারা ভাল করিয়া জানিত—তাহারা বুঝিল, সেই একই খেয়াল।

(৪)

বি এ, পাশ করিবার পর নানা কারণে বিবাহের মর-শুম (monsoon) পড়িয়া যায়। কুবলয়ের বন্ধুবর্গেরও তাই হইল। প্রভাস ভাল পাশ করিয়াছে, সুতরাং সে নগদে গহনায় ৯৫০১৲ পাইল। তাহার পিতা অপর যায়গায় বেশী দর পাইয়াছিলেন, কিন্তু মেয়েটি দেখিতে ভাল, আর কন্যা-পক্ষ বড়ই কাকুতি মিনতি আরম্ভ করিয়াছে, কাজে কাজেই তাঁহাকে কিছু লোকসান সহিতে হইল। মাখন অল্পবয়সে পিতৃহীন, সে ভবিষ্যতের মুরুব্বি দেখিয়া বিবাহ করিল। তাহার শ্বশুর বিহারের কোন জেলার বড় উকীল; ভবিষ্যতে সেও সেইখানেই ওকালতী করিবে; কারণ তাহার অন্য সহায় সম্বল কেহ নাই। তাহার বরাতে পৌণে চারহাজার জুটিল। সুশীল বিবাহ করিতই না, বরাবরই তাহার ইচ্ছা নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া তবে এই সব দায়িত্ব ঘাড়ে করা, কিন্তু তাহার বাবা কথা দিয়া ফেলিয়াছেন, সব ঠিকঠাক, কাজে কাজেই নিজের ইচ্ছার ষোল আনা বিরুদ্ধে তাহাকে বাধ্য হইয়া একাজ করিতে হইল। তাহার পাওনা অঙ্ক ছয় হাজারের মধ্যে। সে স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছে দুইবৎসরের মধ্যে বউকে তাহাদের বাড়ীতে আনিলে, সে মেসে গিয়া থাকিবে। প্রফুল্লের পিতা সদাশয় লোক, তিনি ছেলে বেচিয়া টাকা লইতে একান্তই নারাজ। কন্যাপক্ষ ইচ্ছা করিয়া যাহা দিবে তাহাতেই সন্তুষ্ট। তাহার শ্বশুর দিলেন চারহাজার টাকার গহনা, দান সামগ্রী ছয় সাতশ টাকার মধ্যে; আর নগদ সাত শ। কাজে কাজেই বিবাহে কোনও ঘটা হয় নাই; তিনি ত আর ছেলের বিবাহে ঘর হইতে টাকা বাহির করিতে পারেন না।

নির্ম্মলের বাবা কড়া লোক, পোড়ো ছেলের বিবাহ দেওয়া তাহার 'প্রিন্সিপলের' বিরুদ্ধে। ছিদ্রান্বেষীরা বলিল, —দর বাড়াইবার ফন্দি। নির্ম্মল নিজে কি ভাবিল, সে কথা কাহাকেও খুলিয়া বলে নাই।

কুবলয়ের বাপ নাই। সে মা'র বড় ছেলে। তাহার মার ইচ্ছা একটি ভাল ঘরের সুন্দর টুকটুকে মেয়ে আনেন। নির্ম্মল প্রভৃতিকে ডাকাইয়া তিনি মনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

গোপনে বন্ধুদের পরামর্শ-বৈঠক বসিল। প্রভাস বলিল, 'সে দেখিয়াছে কুবলয় পড়ার বইগুলির কয়েকখানার পাতাও কাটে নাই, শুধু তাহাদের পীড়াপীড়িতে কলেজে যায়। সুতরাং এই খেয়ালের উপর আবার বিবাহ দিলে এবারে ডাহা ফেল্। এখন যা একটু আধটু পড়ে, কলেজে আসে, তখন তাও বন্ধ হইবে। মাখন বলিল—"বিষস্য বিষমৌষধং। ছোকরাকে বর্ত্তমানের বা ভবিষ্যতের কোন ভাবনাই ভাবিতে হয় না, সুতরাং বেশ হাওয়ায় উড়িতেছে। উহার গলায় একটা পাথর বাঁধিয়া দাও, একটা সত্যিকার খেয়াল জুড়িয়া দাও, তখন যথাসময়ে ঠিক দুরস্ত হইয়া যাইবে।" নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল—"তাহাকে রাজি করিবে কি করিয়া?"

কয়েক দিন ধরিয়া তর্ক আলোচনাদির পর ঠিক হইল, মাখন এই ব্যাপারের সেনাপতি হইবে, অন্য সকলে তাহার নির্দ্দেশ মত কাজ করিবে।

সর্ব্বাগ্রে একটি ভাল ঘরের ভাল মেয়ে ঠিক করা চাই।

সকলে খোঁজ খবর লইয়া জানিল, তাহাদের একজন সহপাঠীর একটি ভগ্নী বেশ সুন্দরী, মোটামুট লেখাপড়া, সূচের কাজ প্রভৃতি জানে এবং তাহার বয়সও বার তের। তাহারা গরীব, বেশী কিছু দেওয়া থোওয়া তাহাদের সাধ্যাতীত। তাহার নাম লক্ষ্মীমণি। মাখন বলিল—ও নামে চলিবে না; বদলাইয়া একটা কোমল কাব্যাত্মক নাম দিতে হইবে। অনেক তর্কের পর স্থির হইল নাম হইবে মুকুলমঞ্জরী।

একদিন নির্ম্মলকে দিয়া সোজাসুজি কথা পাড়া হইল; কোনও ফল হইল না। কুবলয় তাহাকে পরিষ্কার বুঝাইয়া দিল—'তাহার জীবন সাহিত্যের সাধনায় উৎসর্গ করিয়াছে। এখন অন্য কথা ভাবিবার সময় তাহার নাই। সাহিত্য-সাধনা যে কত বড় জিনিষ, এ অভাগা দেশের লোকেরা তাহা বুঝে না। সে সারাজীবন অধ্যয়ন, চিন্তা আর সাহিত্য-সৃষ্টি লইয়া কাটাইবে, তাহার হৃদয়ে অন্য জিনিষের স্থান নাই—'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট এ তরী, আমার সোনার ধানে গিয়াছে ভরি।'

কয়েক দিন পরে মাখনের ইঙ্গিত মত আবার নির্ম্মল কথাটা তুলিয়াছে। কুবলয় পরম-আবেগভরে তাহার জীবনের সাধনার কথা বলিয়া যাইতেছে;—'এ সাধনায় সে কোনও বিক্ষেপ আসিতে দিবে না, অলঙ্কার শাস্ত্রে ইহাকে বলা হইয়াছে "ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ,' যে বিরাটের আভাষ সে পাইয়াছে, যাহার অমৃতের আস্বাদে সে বিভোর, সেই মহোৎসবের মধ্যে সে কেমন করিয়া এই ধূলা খেলায় মাতিবে? আমাদের দেশে এই মহাভাবের ভাবুক, এই অপূর্ব্ব সাধনার সাধক চাই, তবেই ত আমাদের এই ক্ষুদ্রতা ঘুচিবে। দুই চারিজন ভাবুক সাধক দেখা দিয়াছেন, যথা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, 'আরও চাই, আরও চাই' ইত্যাদি। এমন সময়ে মাখন আসিয়া উপস্থিত হইল।

মাখন বিষয়টা শুনিয়া পরম সহানুভূতির সহিত বলিল—"ঠিক কথা বলেছ কুবলয়। সবাই কি এই আটপৌরে জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে? না, না, নির্ম্মল, তুমি ওকে ওসব কথা নিয়ে বিক্ষুব্ধ ক'রোনা। তুমি গণিত পড়, সাহিত্য, কাব্য এ সব তোমার বোধে কুলোবে না। আমি তোমার মতে সায় দিতে পাল্লুম না।' কুবলয় বোধ হয় ভাবিল, অন্ততঃ একজন তাহাকে একটু বুঝিয়াছে। ক্রমশঃ মাখন আসিয়া অবসর মত তাহার সাহিত্য আলোচনায় যোগ দিতে সুরু করিল।

মাখন বহু দলে মিশিয়া গল্প গুজব, খেলাধূলা করিয়াছে, বহু লোক-চরিত্র তাহার দেখা আছে, এমনটি কিন্তু সে আর কখনও দেখে নাই। সুতরাং তাহাকে খুব সন্তর্পণে চাল চালিতে হইল।

সে প্রায় প্রতিদিনই বিকালে কুবলয়ের সঙ্গে বসিয়া ঘোলের সরবৎ পান করে এবং রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, হেমচন্দ্র প্রভৃতির কবিতার নূতন নূতন ছত্র মুখস্থ করিয়া মাঝে মাঝে তাহাদের সৌন্দর্য্য ও ভাবুকতার বিশ্লেষণে আত্মহারা হইয়া পড়ে। তাহাদের অধ্যাপক, একদিন ব্রাউনিং এবং টেনিসনের কবি-প্রতিভা ও কলা চাতুর্য্যের তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া সুন্দর নোট লেখাইয়াছিলেন। ভাগ্যক্রমে কুবলয় সে দিন কলেজে যায় নাই। তাহার পরদিন মাখন এই দুই কবির বেশ সরস ও মনোজ্ঞ সমালোচনা করিল। কুবলয় মুগ্ধ হইয়া গেল। সে বুঝিল, মাখনের সঙ্গ তাহার সাহিত্য-সাধনার বিশেষ অনুকূল এবং স্থির করিল তাহার এই সমজদার বন্ধুটিকে সংসারের নানা প্রকারের বিক্ষেপ হইতে দূরে রাখিতে হইবে। উভয়েরই পরস্পরকে দলে টানিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। বন্ধুরা কুবলয়ের গৃহে ঘন ঘন আসিয়া সাহিত্য-চর্চ্চার এবং ঘোলের সরবতের স্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিল।

একদিন প্রভাস কুবলয়ের সাহিত্য-বৈঠকে "নির্ঝরিণী" পত্রিকায় প্রকাশিত দুইটি কবিতা পড়িয়া শুনাইল। কবিতা দুইটির ভাব নক্ষত্রের জ্যোতির মত সুন্দর ও সুস্পষ্ট, এবং উহাদের ছন্দে সঙ্গীতের একটা সহজ ও মধুর রাগিনী, যাহা পাঠককে তৃপ্ত করে অথচ ভাবকে আড়ষ্ট বা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে না—একথা সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইল।

মাখন বলিল, "এই কবিতা দুইটির লেখক কারা? বাস্তবিক বাঙ্গলা কাগজে এমন কবিতা দেখিনি।" প্রভাস বলিল, "শ্রীমতী মুকুলমঞ্জরী বসু-দুহিতা।" সকলেই অবাক্। কুবলয় কাগজখানি লইয়া কবিতা দুইটি আবার পড়িল, যথার্থ ই এমন কবিতা অধুনা সেও অল্পই পড়িয়াছে।"

সুনীল বলিল, "কি বললে বসু-দুহিতা? হাঁ, হাঁ, এই

রকম একটা নাম আমি "নীহারিকা"র মহিলা সংখ্যায় বোধ হয় দেখেছি।"

কুবলয় "নীহারিকা"র তাড়া আনিতে উঠিয়া গেল। ইত্যবসরে মাখন সকলকে আর বেশী বাড়াবাড়ি করিতে নিষেধ করিল। কুবলয় কাগজগুলি লইয়া আসিলে সবাই দেখিল উপর্যুপরি তিন সংখ্যায় লেখিকার কয়েকটি কবিতা ও প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। কুবলয় আবার সেগুলির কোনও কোনও স্থানে পেন্সিলের দাগও দিয়াছে! কুবলয় নাম দেখিয়া প্রবন্ধ পড়ে না, অতঃপর সূচি-পত্র দেখিয়া এই লেখিকার প্রবন্ধ বাছিয়া সর্ব্বাগ্রে পড়িবে, মনে মনে সংকল্প করিল।

শ্রীমতী মুকুলমঞ্জরীর কবিতা এবং অন্যান্য রচনা এখন প্রতিমাসেই এই সাহিত্য-বৈঠকে সাগ্রহে এবং সানন্দে পঠিত ও আলোচিত হয়।

এমন কি কাব্যরসে বঞ্চিত নির্ম্মলচন্দ্রও সে আলোচনায় উৎসাহের সহিত যোগদান করে। কুবলয় ত এতদিন ইহাই চাহিয়াছিল। দেশের শিক্ষিত যুবকদের হৃদয়ে সাহিত্যের রসবোধ জাগিয়া উঠিবে, সকলের জীবন-যাত্রার অপরিহার্য্য ব্যস্ততার মধ্যে ভাবুকতার অবকাশ থাকিবে—তাহার জীবনের সাধনার ত ইহাও একটা উদ্দেশ্য।

"নীহারিকা"র পূজার সংখ্যার প্রথমেই শ্রীমতী মুকুলমঞ্জরীর কবিতা এবং কার্ত্তিক সংখ্যায় "কুমারী মুকুলমঞ্জরীর কবিতা ও বঙ্গসাহিত্যে তাহার দান" নামক একটি চমৎকার প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। প্রবন্ধ-লেখক কলিকাতার কোনও কলেজের অধ্যাপক, তিনি সানন্দে এই নবীন কবিকে অভিনন্দন করিয়াছেন, এবং আশা করেন এই তরুণ কবি-হৃদয়ের পরিণতির সঙ্গে বঙ্গ-সাহিত্য তাহার অপূর্ব্ব এবং বিচিত্র দানে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। কুবলয়ের সাহিত্য-বৈঠকের সকলেই স্তব্ধ হইয়া গেল।

মাখন বলিল, "তাই ত হে এ যে দেখছি অসাধারণ প্রতিভা (genius)! ইনি এখনও কুমারী! এদেশে এঁর স্বামী হবার যোগ্য কজন আছেন তা ত জানি না। কি বল কুবলয়? এই ক্ষমতা যখন পূর্ণ হ'য়ে উঠবে, তখন আমাদের মাতৃভাষায় আমরা অনেক নূতন জিনিষ পাব।"

কুবলয় বলিল, "ইনি কুমারী, তাই এমন অবাধে এবং সহজে এমন সুন্দরভাব ফুটিয়ে তুলতে পারেন। ঘরকন্নার ঘ্যানঘ্যানানি প্যানপ্যানানি, আর 'এটা নেই ওটা নেই' এই সবের পাল্লায় পড়লে এমন জিনিষটি আর পেতে না।"

প্রভাস বলিল, "তা ব'লে হিন্দুর মেয়ে হিন্দুসমাজে কতদিন আর আইবুড় থাকবে? শুনিছি এখনি এঁর বয়স পনর, যার নাম ষোল। তবে ছোটখাট গড়ন, আর বাপের অবস্থা তেমন স্বচ্ছল নয় তাই, তা না হ'লে কবে বিয়ে হ'য়ে যেত।" প্রভাস জানিত কুবলয় বালিকা-বিবাহের বিরোধী।

নির্ম্মল বলিয়া ফেলিল, "কুবলয় তুমি একে বিয়ে করতে রাজী হও, মেয়েটির 'টোপাকুল' চাইবার বয়স পেরিয়েছে। আর এমন সাহিত্য-সাধিকা জুটবে না।" মাখন ধমক দিয়া উঠিল "আচ্ছা নির্ম্মল! তুই সাহিত্যের কি বুঝিস্? সাহিত্য-সাধনা যে কত বড় ব্যাপার, তাতে যে আজীবন ব্রহ্মচারী না হ'লে চলে না, এ সব তুই কি বুঝ্‌বি? তোর আঁকের বইতে এ সব লেখে না।"

নির্ম্মল বলিল, "পৃথিবীতে কজন সাহিত্যের জন্য আজীবন ব্রহ্মচারী রয়েছে বল্‌তে পারিস্? আর এ মেয়েটিও ত সাহিত্য সাধিকা।"

মাখন হাসিয়া উত্তর করিল, "ফের সাহিত্য-সাধিকা বল্‌ছিস্? তুই একেবারে নিরেট mathematics (অঙ্ক শাস্ত্র)। আচ্ছা আমি কালই বাড়ীতে বই দেখে এসে ব'লব, কজন বিখ্যাত সাহিত্যসেবী চিরকুমার ছিলেন।"

এবার সবাই হাসিয়া ফেলিল; কুবলয়ও হাসিল। নির্ম্মল বলিল, "আমার সগোত্র না হ'লে আমি বাবাকে রাজি করিয়ে নিজেই বিয়ে করতুম্। কুবলয়কে পরে পস্তাতে হবে ব'লে রাখছি।"

কুবলয় এতক্ষণ নীরব ছিল। এবার সে বলিল, "তোমার শুষ্ক গণিতের চাপে তা হ'লে এই কোমল প্রাণটি একেবারে দমে যেত। এর কাছে আমরা এখনও অনেক প্রত্যাশা রাখি, তোমার হাতে প'ড়লে সে সব কিছুই পূর্ণ হ'তো না। না হ'তে তুমি সুখী, না হ'ত এ বেচারী সুখী।"

নির্ম্মল চটিয়া উত্তর করিল, "বেশ বেশ, কোন্ কালিদাস বা (Pope) পোপের হাতে তোমাদের মুকুলমঞ্জরী পড়েন দেখা যাবে।" একটা হাসির রোল পড়িয়া গেল।

ব্যাপারটা লইয়া সেদিন আর কোন উচ্চবাচ্য করা উচিত নয়, সুতরাং সেনাপতির ইঙ্গিতে সকলে বাড়ী ফিরিয়া গেল।

(৫)

আজ কুবলয়ের সাহিত্য-বৈঠকে একটা বড় দুঃসংবাদ আসিয়াছে। মাখন মনের দুঃখে প্রায় দুই গেলাস গরম দুধ পান করিয়া ফেলিয়াছে। যে আসে সেই মুখভার করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া পড়ে। বঙ্গ-সাহিত্যের উদীয়মানা কবি এবং শক্তিশালিনী লেখিকা কুমারী মুকুলমঞ্জরী বসুর বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। তাহার স্বামী জামালপুরে রেওলয়ে অফিসে চাকরী করেন, বেতন পঞ্চাশ টাকা। তাঁহার বয়স আন্দাজ ৪৫।৪৬, বৎসর খানেক স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে। চার পাঁচটি ছেলে মেয়ের তত্ত্বাবধান করিবে এবং তাঁহাকে নয়টার মধ্যে রাঁধিয়া ভাত জোগাইবে, এমন একটি বয়স্থা পাত্রী তিনি চান। কাজে কাজেই নগদ ২০০৲ এবং মোটামুটি এক প্রস্থ গহনা ও চলনসই দান-সামগ্রী লইয়া ভদ্রলোক কুমারী মুকুলমঞ্জরীর পিতার জাত বাচাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। 'মাহিনা ছাড়া আরও দশ বিশ টাকা উপরি পাওনা আছে। মেয়েটি এক রকম সুখেই থাকিবে। তিনি মেয়ে পার করিয়া দেনার দায়ে বাপের চুল পর্য্যন্ত বিক্রী যার সঙ্গে যার প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ সে কে খণ্ডাইবে? 'চেষ্টারও কসুর হয়নি'—ইত্যাদি নানা রকমের যুক্তি তর্ক করিয়া তাহার বাপ মা নিজেদের মনকে একরকম প্রবোধ দিয়াছেন। আজ অগ্রহায়ণের ২২এ, বিবাহের দিন ২৬এ, ধার্য্য হইয়াছে। প্রভাস স্বয়ং এ খবর তাহাদের ক্লাসের হরিপদর কাছে শুনিয়াছে; মেয়েটি তার মাসতুতো বোন।

মাখন দুঃখ করিল—এটা একটা জাতীয় ক্ষতি। বঙ্গ-সাহিত্যের মহা দুর্ভাগ্য যে এমন মেয়ের বিবাহে পাত্র জুটিতেছে না। হায়রে। লেখাপড়া জানা ছেলেরা কেহই চার পাঁচ হাজারের কম দর হাঁকে নাই। যাক্ সে আর দেশে থাকিবে না, বি এল টা পাশ করিয়াই বিহারে গিয়া ওকালতি করিবে, তাহাকে আর এ সব চোখে দেখিতে হইবে না!

প্রভাস বলিল—পরকে আর কি বলিয়া দোষ দেওয়া যায়? তাহারা নিজেরাই যে একরাশ টাকা লইয়াছে। সমাজে এখন আদর্শ চাই। জনকত ভাল লোক দৃষ্টা দেখাইলে অনেকেই তখন তাঁহাদের দেখাদেখি সেই পা চলিবে।

নির্ম্মল বলিল—এখনও সময় আছে। তাহা সাহিত্য সাধনা প্রভৃতি বড় বড় কথা প্রায়ই ত আওড় আর গরম দুধ উদরস্থ করে। কুবলয় ত পানতোয়ার ম সাহিত্যরসে ডুবিয়াই আছে। সেই না হয় মাতৃভাষা এবং জাতীয় সাহিত্যকে এত বড় বিপদের হাত হইতে রক্ষ করুক। মেয়েটি ত বালিকা নয়, কুবলয়ের রুচির সঙ্গে তা এতটা মিল, আর বিনা পয়সায় মেয়েটিকে বিবাহ করিে একটা সুদৃষ্টান্তও দেখান হইবে। সে ঢের দিনই আ এ সব খেয়াল বাপের পয়সা আছে, মাথার উপর কে দেখিবার নাই, কাজে কাজেই এই সব খেয়ালের আব হইতেছে—। মাখন চোখ টিপিল, নির্ম্মল থামিয়া গেল।

অপর একজন বলিল—কুবলয়ের অনেক খেয়া তাহারা সহিয়াছে, আর সহিবে না। জগতে ঢের লো সাহিত্য-সাধনা করিয়াছে, কই এমন সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার কেহ কখনও শোনে নাই। তাহারা আজই কুবলয়ের স সকল সম্বন্ধ ছেদন করিবে। সাহিত্যের জন্য যদি অত দরদ, তবে সাহিত্যের এই বিপদের দিনে চুপ করিয়া বসি থাকে কেমন করিয়া?

প্রভাস প্রভৃতি সকলেই তাহার কথার অনুমোদ করিল এবং স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিল, তাহারা যেমন বটু ভুলিয়াছে, তেমনি কুবলয়কেও ভুলিবার চেষ্টা করিবে এই বাড়ীতে তাহাদের এই শেষ আসা, আর কেহ মুখো হইবে না।

মাখন উত্তেজিত স্বরে বলিল "তোমরা সব অবুঝে মত কথা ব'লছ। একজন এই ব্যাপারটায় তার জীবনে সাধনা মাটি করিবে? হ'তেই পারে না। কুবলয় বুঝেছে, তাকে তা করতেই হবে। আমি কখনও এ বিবা মত দিতে পারি না।"

কুবলয় বলিল, "আচ্ছা, টাকার জন্যেই ত আটকাচ্ছে এসো না চাঁদা তোলা যাক, আমি পাঁচশো টাকা দিচ্ছি।"

নির্ম্মল বলিল, "তোমার সাহিত্যের রসবোধ আে তাদেরও বোধ হয় একটু সম্ভ্রমবোধ আছে। তোমা ভিক্ষে তারা নেবে কেন? আর সব ত তোমার ম

পয়সাওয়ালা নয়, সকলেরই কন্যাদায় আছে। পাঁচশো বা হাজার টাকা এই জামাই-ই অন্য জায়গায় পেতে পারত। সেদিন যে বড় বলা হ'চ্ছিল, আমার হাতে প'ড়লে এই তরুণ কবিহৃদয়টি দ'মে যাবে। এবার কি হ'চ্ছে? তোমার সাহিত্যের প্রত্যাশা কতখানি পূর্ণ হচ্ছে হে সাহিত্য-সাধনাওয়ালা?"

তারপর সকলে রাগিয়া বাহির হইয়া গেল। মাখন বসিয়া রহিল, "না না এ হতেই পারে না। তোমার জীবনে একটা বিক্ষেপ জোটাতে ব'লতে পারি না। যদি শেষটায় তোমার দুর্ব্বলতা আসে! তোমার সে জোর আছে কিনা জানিনা। অবশ্য তুমি যদি ততটা শক্তিমান্ হও তবে আলাদা কথা। যা জানিনা তার উপর নির্ভর ক'রে কোনও কাজ করতে ব'লতে পারি না।" কথাটা কুবলয়কে খোঁচার মত বিঁধিল। রাত সাড়ে নয়টা বাজিয়া গিয়াছে, সুতরাং মাখন বাড়ি চলিয়া গেল।

কুবলয় কতক্ষণ কি ভাবিল। তার পর "নীহারিকা" ও "নির্ঝরিণী"র সংখ্যাগুলি লইয়া বার বার পড়িল। বাস্তবিক কি চমৎকার কবিতা! কি সুমিষ্ট ছন্দ, মধুর ভাব এবং সহজ ভঙ্গী! যে পড়িবে সেই মুগ্ধ হইবে। তাহার বন্ধুরা সাহিত্যিক নয়, কিন্তু তাহারাও প্রতি মাসে এই লেখিকার কবিতার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকে। তার পর একে একে প্রবন্ধগুলি পড়িতে লাগিল। যথার্থই এক একটি প্রবন্ধ কি মূল্যবান্, ভাষার মারপ্যাঁচ নাই, একটা কথাকে এক যোজন জুড়িয়া ফেনান নাই, অনেক চলতি প্রবন্ধের মত সেগুলি ষোল আনা পুরাতন কথায় প্রতিধ্বনি অথবা ইংরাজির বোটকাগন্ধ-যুক্ত তর্জ্জমা নয়। সত্যই যাহার এত শক্তি, এমন অসাধারণ প্রতিভা, সে শেষটায় জামালপুরের রেলের কেরাণীর চার পাঁচটা ছেলে মানুষ করিবে আর আফিসের ভাত যোগাইবে? কি বিড়ম্বনা!

মনুষ্যত্বের দিক দিয়া তাহার নিজের বোধহয় একটা কর্ত্তব্য আছে। সে নিজেই সে দিন নির্ম্মলকে বলিয়াছিল —এই তরুণ লেখিকার কাছে এখনও তাহাদের অনেক জিনিষ পাইবার আছে। তাহার বন্ধুরা তাহার মত সাহিত্য-সাধনায় মনপ্রাণ উৎসর্গ করে নাই, তবু তাহাদের চিত্ত ইহার জন্য ব্যথিত হইয়াছে। আজ এই সাহিত্য-সাধন-নিরতা নারীর এই বিপদের দিনে সাহিত্যিক হিসাবেও ত তাহার একটা কর্ত্তব্য আছে। মাখন বলিল কিনা তাহার যদি মনের বল থাকে তবে বিবাহ করিতে কোনও আপত্তি নাই! তাহাকে এতদিন দেখিয়া, তাহার সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়া, মাখন নিঃসঙ্কোচে বলিল, 'কি জানি শেষে যদি তোমার দুর্ব্বলতা আসে, তুমি জীবনের সাধনা যদি ভুলিয়া যাও!' সে জীবনের অন্য আশা আকাঙ্ক্ষা, ভাল পাশ করার প্রলোভন সব ছাড়িয়াছে, তবু মাখনের তাহার সম্বন্ধে এই ধারণা! এইরূপ ভাবনা-তরঙ্গে পড়িয়া কুবলয়ের মন ক্রমাগত দুলিতে লাগিল। সে রাত্রে সে ভাল ঘুমাইতে পারিল না।

(৬)

পরদিন কুবলয়ের অনেক বেলায় ঘুম ভাঙ্গিল, সঙ্গে সঙ্গে গত রাত্রির চিন্তা আসিয়া জুটিল। আর বিলম্বের সময় নাই, মাঝে মাত্র চারিটি দিন। সে ভাবিতে লাগিল —সত্যই কি নারী সাধনার অন্তরায়? এ নারী ত যে সে নারী নয়। সত্য বলিতে গেলে, এমন কবিতা, এমন ছন্দ, এমন ভাব ও কল্পনা যাহার, তাহাকে পাইলে তাহার সাধনা সার্থক হইয়া উঠিবে। এই ত তাহার বন্ধুরা যে-যাহার নিজের ছোটখাটো ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত, তাহাদের না আছে সেই উদার সহানুভূতি, না আছে সেই চির-সুন্দরের আরাধনার জন্য প্রাণের অফুরন্ত অতৃপ্ত আকুলতা। কাহার সঙ্গে সে দুইটা কথা কহিবে? তাহার নিঃসঙ্গ জীবনের অবসাদের দিনে কাহার স্নিগ্ধ চোখের কোমল দৃষ্টি তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িবে? ইহারা ত সবাই বাহির লইয়াই থাকে, ভিতরের ব্যথা ও আনন্দ সে কাহাকে বুঝাইবে? কর্ত্তব্য ও প্রয়োজন দুই দিক দিয়াই মঙ্গলের এমন আহ্বান, শ্রেয় ও প্রেমের এমন মধুর মিলন আর আসিবেনা। আজ ২২এ, আর সময় নাই।

বিকালে কেহই আসিল না। মাখনও আজ আসে নাই। তাহার সেই খোঁচাটা আবার তাহাকে নূতন করিয়া আঘাত করিতে লাগিল। চাকর পাঠাইয়া সে নির্ম্মলকে ডাকাইয়া আনিল। নির্ম্মল আসিয়া মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল। দুই তিন বার তাহার এই বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করায় নির্ম্মল বলিল, "আমি অত চির-কুমারের সাধনা টাধনা বুঝি না। এমন একটা সুন্দর প্রাণ মাটি হ'য়ে যাবে, এত বড় শক্তি বাটনা বাটা কুটনো

কোটায় সারা জীবন আটক থাকবে, আর তোমরা সাহিত্যিকরা বসে বসে দুধ খাবে, আর বড় বড় বোলচাল আওড়াবে, এইটাই আমার দুঃখ। কি খাসা কবিতাই মেয়েটি লিখত!" আবার সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কুবলয় বলিল, "নির্ম্মল, তুমি জান আমি তোমার কথা কত শুনি। এ ব্যাপারটা তোমার সঙ্গে একবার আলোচনা কর্তে চাই।"

নির্ম্মল উত্তর করিল, "আমার কথা যত শোন, তা তুমিও জান আমিও জানি। আর আলোচনায় কাজ নেই। প্রভাস বল্‌লে কাল সকালেই সব ঠিক ঠাক হ'য়ে যাবে। আর তোমার আলোচনা গবেষণা কিছু করতে হবে না।"

তারপর সে উঠিল, কুবলয়ের নিষেধ মানিল না। যাইবার সময় বলিয়া গেল, "তোমার কি প্রাণ আছে? তুমি কি মানুষ? সাহিত্যসাধনা টাধনা সব বড়মানুষি খেয়াল—cultured (মার্জ্জিত) বুজরুকি, সব ঝুঁটো! সত্যি হ'লে এমন যার কবিতা লেখবার ক্ষমতা, তাকে একটা তার বাপের বয়সি কেরাণীর হাতে পড়তে দিতে না।"

কুবলয় ভাবিতে লাগিল—আজই তাহাকে মনস্থির করিতে হইবে। আবার সেই সব কথা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া ভাবিল। অনেক চিন্তার পর স্থির করিল,—যে নিয়তি তাহাকে সাধারণের মধ্য হইতে তফাৎ করিয়া সাহিত্যসাধনায় টানিয়া আনিয়াছে, ইহা বোধ হয় তাহারই আহ্বান। নির্ম্মল তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তাহার ভালর জন্য সে সব করিতে পারে; মাখনও ত বেশ রসজ্ঞ লোক; প্রভাস সুশীল সবাই তাহার হিতৈষী; সকলেরই যখন ইচ্ছা, মাও কয়েকদিন চোখের জল ফেলিয়াছেন, আর জীবনের এমন সঙ্গিনী যথার্থই দুর্লভ। সকলের সমবেত ইচ্ছার মধ্যে বোধ হয় সেই ইচ্ছাময়েরই ইচ্ছার আভাস এই। মানুষের জীবনে এমন এক একটা মুহূর্ত্ত আসে যখন তাহাকে নিজের মত বলি দিতে হয়, এটা সেইরূপ একটা মুহূর্ত্ত। আর সময় নাই, সে এখনি বন্ধুদের চিঠি লিখিয়া জানাইবে এবং যার কাছে নির্ম্মলকে দিয়া বলাইবে।

সে চিঠি লিখিতে বসিল। অনেক কথার মধ্যে সে এই কয়টি কথা লিখিল—"* * * * * এই অভিশপ্ত দেশে একটি নারীচিত্ত রসবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া উদ্ভিন্ন শতদলের মত তাহার কল্পনা, ভাব ও সঙ্গীতের দলগুলি একে একে বিস্তা করিতেছিল। এমন একটি ফুটন্ত কুসুম দুর্ভাগ্যের করকাপাত বিনষ্ট হইবে, তাহা অসহনীয়। * * * * * তোমাদে সমবেত ইচ্ছার মধ্যে আমি ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার আভা পাইতেছি। কর্ত্তব্যের হিসাবে আমি তোমাদের প্রস্তা সম্মত হইলাম। এ বিবাহ সম্পূর্ণ সাহিত্যের দিক দিয়া আমি স্পষ্ট বলিয়া রাখিতেছি, তোমরা ইহাকে কোন দিন ঘরকন্নার দাঁড়িপাল্লায় ওজন করিওনা। তাহা অনর্থক অশান্তি ও বিক্ষেপ ডাকিয়া আনা হইবে।" চিঠি মাখনকে প্রভাস সুশীল প্রভৃতিকে লইয়া ভোরে তাহ বাড়ীতে আসিবার কথা লেখা হইয়াছিল। নির্ম্মলকে স্বতন্ত্র চিঠি পাঠাইয়াছে। কুবলয়ের চাকর রাত্রি প্র বারটার সময় মাখন ও নির্ম্মলের ঘুম ভাঙ্গাইয়া চিঠি দি আসিল।

(৭)

২৬শে অগ্রহায়ণ শুভলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল। কুবলয় বন্ধুরা এই কয়দিন খুব হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি, দৌড়াদৌ করিল, কারণ চারদিনের মধ্যে তাহাদের সমস্ত আয়োজ করিতে হইয়াছে।

কুবলয়ের মা আশীর্ব্বাদ করিয়া বউ ঘরে তুলিলে খাসা চাঁদপারা মুখ, বেশ গড়ন, রং যেন ফাটিয়া পড়িতেছে কুবলয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গোরার বাজনা আসিয়াছি ইলেক্‌ট্রিক এবং গ্যাসের আলো জ্বলিয়াছিল। তাহ নগদ কিছু নেয় নাই, কিন্তু গহনাও দানসামগ্রীতে সর্ব্বসমে প্রায় ২৫০০৲ টাকা মেয়ের বাপ স্বেচ্ছায় দিয়াছেন।

দুই বৎসর পরে কুবলয় ঘোষ প্রথম বিভাগে এম, পাশ করিয়াছে এবং তাহার একটি ফুটফুটে ছে হইয়াছে।

খোকার অন্নপ্রাশন উপলক্ষে তাহার ঠাকুরমা খুব করিলেন। কুবলয়ের বন্ধুরা সবাই আসিল, মাখন বি হইতে আসিয়া জুটিল। সেদিন আবার হাসি ও চীৎকা হল্লা পড়িয়া গেল।

এবার নির্ম্মল তাহাদের ষড়যন্ত্রটা ফাঁসাইয়া দি কবিতা লিখিতেন মাখনের একজন পরিচিত, ভদ্রলো তাঁহার নাম বঙ্গসাহিত্যে সুবিদিত; আর প্রবন্ধ লিখি

প্রভাসের ভগ্নীপতি, তিনিও একজন সুশিক্ষিত অধ্যাপক এবং নামজাদা লেখক।

সবাই হাসিল, কুবলয়ও হাসিল। সে বলিল—"যা পেয়েছি তাই ঢের, যা পাইনি তার জন্যে আর আপশোষ নেই।"

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন গুপ্ত।

হৃদয়-ভাণ্ডার।

গভীরা রজনী ভাগে, কেহ কোথা নাহি জাগে
জোছনার কোলে শুয়ে প্রকৃতি-বালিকা
ঘুমাইছে নিরালায় কৌমুদী মাখিয়া গায়
ভালে পরি' চন্দ্রমার দিব্য ললাটিকা।

সুষমা উছলি যায়, কেহ নাহি দেখে তায়
সৌন্দর্য্যের অজস্রতা, ব্যর্থ অপব্যয়!
স্থির শান্ত নভোময় জাগিছে জ্যোতিষ্কচয়
আর শুধু জেগে আমি, এ হেন সময়!

হেনকালে ওরে প্রাণ, আয় তোর মর্ম্মস্থান
খুঁজে দেখি; তোর এই গোপন-ভাণ্ডারে
কোথা কি সঞ্চিত আছে—কেহ কোথা নাহি কাছে—
কেহ কিছু জানিবে না এ বিশ্ব-সংসারে।

আপনাতে আপনার, আসিবার, ডুবিবার
এই শুধু যোগ্যকাল—প্রশান্ত গম্ভীর
চঞ্চল, দিনের মাঝে রত হয়ে' শত কাজে
আপনা হারায়ে ফেলি উন্মাদ অস্থির।

এ যে অতি পুরাতন, গ্রন্থ—চির সনাতন
অদ্ভুত রহস্য এর বিচিত্র অক্ষর
প্রতিদণ্ডে লহমায়, কত বর্ণ গরিমায়
ফুটিতেছে অবিরত ভাবের লহর।

চিরন্তন এ ভাণ্ডার, কিছু না হারায় তার
অনাদি কালের এক বিরাট সঞ্চয়
পরিপূর্ণ হয়ে আছে মহাকাল বসি কাছে
নির্নিমেষ প্রহরায় মেলি আঁখিদ্বয়!

কথক—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন

ফিরোজ-শাহ-তোগলকের জন্ম।

(ঐতিহাসিক কাহিনী)

মোগল সম্রাট আকবর-শাহের সময়ে, মুসলমানগণের সহিত হিন্দু রমণীগণের বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় বটে; কিন্তু তাহার বহু পূর্ব্বেও এরূপ বিবাহের দৃষ্টান্তের একেবারে অভাব ছিল না। পাঠান রাজগণের মধ্যে সুলতান ফিরোজ-শাহ তোগলাকের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। ইনি হিন্দুরমণী-গর্ভজাত ছিলেন। ইঁহার মাতা দিপালপুরের অন্তর্গত আবুহর নামক একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি রাণামল ভট্টির কন্যা। ইঁহার পিতার বিবাহ-ব্যাপারে কিছু "রোম্যান্সের" গন্ধ ছিল। প্রসিদ্ধ পারস্য ঐতিহাসিক শ্যাম্‌স্‌-ই-সিরাজ আফিফ্ তাঁহার তারিখি-ফিরোজশাহি গ্রন্থে এই বিবাহ ব্যাপার সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। শ্যাম্‌স্‌-ই-সিরাজ এই আবুহর সহরেরই অধিবাসী ছিলেন। তিনি বলেন, তাঁহার প্রপিতামহ মালিক-সাহ্‌-ই-মুনফ-সাহাব, ফিরোজের পিতৃব্য গিয়াস্-উদ্দীন (গাজিবেগ) তোগলাকের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, এবং ইঁহারই কূটনীতি-বলে এই বিবাহ সংঘটিত হইয়াছিল।

সুলতান আলা-উদ্দীন খিলজির রাজত্বকালে, গিয়াস্-উদ্দীন তোগলক এবং তাঁহার দুইভাই সিপহ-সালার-রজব ও আবুবকর, খোরাসান হইতে দিল্লী আগমন করেন। সুলতান আলা-উদ্দীন তাঁহাদিগকে অতি সাদরে গ্রহণ করেন এবং ক্রমে তাঁহাদের শৌর্য্য ও বীর্য্যের পরিচয় পাইয়া, গিয়াস্-উদ্দীনকে দিপালপুরের শাসনকর্ত্তৃপদে এবং অপর দুই ভ্রাতাকে প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেন।

গিয়াস্-উদ্দীন তাঁহার ভ্রাতা সিপহসালার-রজবকে আন্তরিক ভাল বাসিতেন। দিল্লীর রাজকার্য্যে পাছে ভ্রাতার ভবিষ্যৎ কোনরূপে নষ্ট হয়, এই আশঙ্কায়, তিনি সুলতানকে অনুরোধ করিয়া ভ্রাতাকে নিজের সেনাপতিপদে নিযুক্ত করেন, এবং স্বীয় তত্ত্বাবধানে তাঁহাকে রাজকার্য্যাদি শিক্ষা দিতে থাকেন।

দিপালপুরের কোনও পদস্থ ব্যক্তির কন্যার সহিত ভ্রাতা রজবের বিবাহ দিতে তাঁহার একান্ত ইচ্ছা হয়। তিনি চারিদিকে দূত প্রেরণ করিয়া মনোমত পাত্রী অনুসন্ধান করিতে থাকেন, এবং ক্রমে জানিতে পারেন, আবুহরের রাজা রাণামল-ভট্টির একটি রূপগুণসম্পন্না কন্যা আছে। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় মিনি ও ভট্টি সম্প্রদায়-গণের সমস্ত ছোট ও বড় রাজ্যগুলি এবং জঙ্গল সমূহ দিপালপুরেরই অধীনস্থ ছিল; এবং ইতিহাস লেখক শ্যাম্‌স-ই-সিরাজ আফিকের প্রপিতামহ মালিক-সাদ্-ই-মুল্‌ক্-সাহাব এই দিপালপুরের অন্তর্গত আবুহার সহরেরই আমলদার ছিলেন। রাণামলভট্টি রাজপুত হিন্দু; কিন্তু তাহা সত্বেও, গিয়াস্-উদ্দীন তাঁহার কন্যার রূপগুণের বিবরণ শুনিয়া এতদূর আকৃষ্ট হইয়া পড়েন যে, এই কন্যার সহিতই ভ্রাতার বিবাহ দিতে কৃতসঙ্কল্প হন, এবং বন্ধুবর মালিক সাদ্-ই-মুল্‌ক্-সাহেবের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া, একজন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিকে রাণামলের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়া দূত পাঠান।

একখানি পারস্যভাষায় লিখিত বহু পুরাতন উপন্যাস গ্রন্থে, এ সম্বন্ধে ভিন্ন বিবরণ দৃষ্ট হয়। ইহাতে কথিত আছে,—একদা ফিরোজের পিতা সিপহ-সালার রজব রাজকার্য্যে অতি দূরদেশে গমন করেন। প্রত্যাগমনকালে আবুহারের জঙ্গলের মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে পথ হারাইয়া ফেলেন এবং ঘুরিতে ঘুরিতে পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া রাণামল ভট্টির রাজবাটীর পার্শ্বস্থ উদ্যান সমীপে আসিয়া উপস্থিত হন। উদ্যানে কতিপয় যুবতী এক বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া ক্রীড়া কৌতুক করিতেছিল। রজব এতদূর ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিলেন যে, যুবতীদিগের নিকট একটু জল যাচ্ঞা করিবেন এরূপ বাক্যস্ফূর্ত্তিও তাঁহার হইল না। তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া অবসন্ন দেহে এক বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া পড়িলেন, এবং অনিমিষ লোচনে যুবতীগণের দিকে চাহিয়া তাঁহার প্রার্থনা জানাইতে প্রয়াস পাইলেন। যুবতীগণ সহসা একজন মুসলমান সৈনিককে উদ্যান পার্শ্বে আসিতে দেখিয়া ভয়ে সকলে তথা হইতে প্রস্থান করিল। কেবল একজন মাত্র যুবতী পলায়ন করিল না। ইনি রানামল ভট্টির কন্যা নাইলা বিবি। রজবের করুণ ও কাতর দৃষ্টি তাঁহার অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া মর্ম্মস্পর্শ করিল। তিনি সৈনিকের ভাবভঙ্গী দেখিয়া বুঝিলেন এ ব্যক্তি বিপদগ্রস্থ, কোনও কারণে নিজের প্রার্থনা জানাইতে পারিতেছে না। একারণ তিনি ধীর গতিতে সৈনিকের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার প্রার্থনা জানিতে চাহিলেন। সৈনিক ইঙ্গিতে একটু জল প্রার্থনা করিল। সেই উদারচিত্তা বিবি নাইলা, তখন ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, সুশীতল জল ও বহুবিধ স্বাদু ফলমূলাদি সৈনিককে অতি আদরের সহিত ভোজন করাইলেন। রজব সুস্থ হইলেন। বিদায় কালে তিনি কৃতজ্ঞতা জানাইবার উদ্দেশ্যে, নিজের বহুমূল্য কণ্ঠহারটি তাহার জীবনদাতা নাইলা বিবিকে উপহার দিতে উদ্যত হইলে, বিবি নাইলা অবজ্ঞাভরে এই দান প্রত্যাখ্যান করেন এবং তেজের সহিত বলেন, "রণোমল ভট্টির কন্যা এতদূর হীনচিত্তা নয় যে, একজন তৃষ্ণার্ত্ত পথিককে জলদান করিয়া, তাহার নিকট উপহার গ্রহণ করিবে।" রজব লজ্জিত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন। তিনি নাইলা বিবির রূপে ও গুণে এতদূর মোহিত হন যে, ইহার চিন্তায় তিনি সর্ব্বদা বিভোর হইয়া পড়েন, এবং ইহাকে লাভ করিবার বাসনা তাঁহার মনে অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠে। তিনি স্বাভিলাষ পূর্ণ করিবার মানসে বহু উপায় উদ্ভবন করেন; কিন্তু কিছুতেই সফল মনোরথ না হইয়া অবশেষে মালিক সাদ্-ই-মুলুক সাহেবের শরণাপন্ন হন। মালিক-সাদ্ গিয়াস্-উদ্দীনের নিকট সকল ব্যাপার আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করেন; এবং তাঁহাকে এই বিবাহ সম্মত

করাইয়া রাণামলের নিকট দূত পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

বিবরণটি ঔপন্যাসিক হইলেও, ইহাতে যে একেবারে ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই, এমন কথা বলা চলে না। ভারত বর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্তে লিখিত আছে, গিয়াস্-উদ্দীনের ভ্রাতা (ফিরোজের পিতা) রাণামল ভট্টির কন্যার অনুপম সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়া, তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হন। ইতিহাসবেত্তা সেখ্ রাজী-উদ্দীন বিস্মিল্ বলেন, ফিরোজের পিতা শিকারে বহির্গত হইয়া দৈবক্রমে রাণামল ভট্টির কন্যার দর্শন পান এবং তাহার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠেন।

যে কারণেই হউক, দূত রাণামলের নিকট যাইয়া বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করে। রাণামল রাজপুত। তোগলকের অধীনস্থ ভূম্যাধিকারী হইলেও, তাঁহার আভিজাত্য জ্ঞানের অভাব ছিল না। তিনি দূতমুখে এরূপ জঘন্য প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া, ক্রোধে আত্মহারা হন; এবং অতি উদ্ধতভাবে তোগলককে অকথ্য কটূক্তি করিয়া দূতকে বিদায় করিয়া দেন।

তোগলক দূতমুখে রাণার কটূক্তি শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হন, এবং সহসা কোন কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া বন্ধুবর মালিক-সাহু-ই-মুনুফ সাহেবের পরামর্শ গ্রহণ করেন। মালিক-সাহু অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি রাণামলের ন্যায় একজন অধীনস্থ ভূম্যাধিকারীকে বশে আনিবার জন্য, যুদ্ধাদির আয়োজনের কিছুমাত্র প্রয়োজন বোধ করিলেন না; রাণার রাজ্যে গমন করিয়া, স্বকার্য্যসাধনার্থ পূর্ণ একবৎসরের খাজনা দাবী করিতে মত প্রকাশ করিলেন। তোগলক ইহাতে প্রথমে অনেক আপত্তি করিলেন বটে, কিন্তু মালিক-সাহুর সুযুক্তি ও সুতর্কের বলে তাঁহাকে এই খাজনা দাবী করা কি কার্য্যোদ্ধারের সহজ উপায় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইল।

তোগলক পরদিনই বন্ধুবর মালিক-সাহুর সহিত স্বয়ং রাণার রাজ্যের অন্তর্গত তালওয়াণ্ডি নগরে গমন করিলেন, গ্রামের মোকাদ্দিম ও চৌধুরীগণের প্রতি জুলুম আরম্ভ করিয়া দিলেন। রাণার প্রজাবর্গ সকলে অসহায়। আলা-উদ্দিনের প্রবল প্রতাপে কাহারও কোনরূপ হস্তোত্তলন করিবার ক্ষমতা বা সাহস পর্য্যন্ত ছিল না। তিন দিন ধরিয়া জুলুম চলিল। প্রজাবর্গের উপর অত্যাচার চরম সীমায় পৌছিল। ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল উঠিল। রাণামল কিং কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

কথিত আছে, রাণার বৃদ্ধা মাতা প্রজাবর্গের উপর এই ভীষণ অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিয়া, প্রজার দুঃখে এতদূর অভিভূত হন যে, একদিন সন্ধ্যাকালে রাণামলের শয়নকক্ষে উপস্থিত হইয়া, পাগলের ন্যায় মাথার কেশ ছিন্ন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকেন। রাণামলের কন্যা নাইলা বিবি সেই সময় প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি পিতামহীকে এরূপভাবে কাঁদিতে দেখিয়া সবিস্ময়ে কারণ জিজ্ঞাসা করেন। রাণামলের মাতা উত্তর করেন, "তুমিই আমার এই রোদনের কারণ। তোমার কারণেই তোগলক আজ আমার এই অসহায় প্রজাবর্গের উপর অযথা উৎপীড়ন করিতেছে।" কথাটা সেই উচ্চমনা তেজস্বিনী নাইলা বিবির প্রাণ স্পর্শ করিল। তিনি কহিলেন, "আমাকে মুসলমান হস্তে সমর্পণ করিলেই যদি এতগুলি প্রজার উপর উৎপীড়ন ক্ষান্ত হয়, তখন সে কার্য্যে এতটা ইতস্ততঃ করিতেছেন কেন? আমাকে এখনই তোগলক শাহের নিকট পাঠাইয়া দিন। মনে করুন যেন মুসলমানেরা আপনার একটি কন্যাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে।" কথাটা বৃদ্ধার যুক্তিযুক্ত বিবেচনা হইল। তিনি রাণামলকে কন্যা নাইলা বিবির অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, "এতগুলি প্রজার উপর অযথা উৎপীড়নের বিনিময়ে স্বীয় কন্যাকে মুসলমান হস্ত হইতে রক্ষা করা রাজধর্ম্মোচিত হয় না। তুমি এখনই কন্যাকে তোগলকের শিবিরে প্রেরণ কর।" মাতার কথায় সম্মত হওয়া ব্যতীত রাণার আর গত্যন্তর ছিল না। তিনি অবিলম্বে আমলদার মল্লিক-সাধু-ই-মুনুফ-সাহেবের নিকট বিবাহে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া দূত প্রেরণ করিলেন।

তোগলক রাণামলের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, অতি-সমারোহের সহিত তাঁহার কন্যাকে আনাইবার জন্য যানবাহনাদি প্রেরণ করেন। রাণামল কিন্তু এরূপ সমারোহের সহিত কন্যাকে পাঠাইতে সম্মত হইলেন না; রাত্রে সামান্য মাত্র একটি শিবিকায় কন্যাকে বন্দী হিসাবে লইয়া যাইবার জন্য তিনি তোগলক-শাহাকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন।

তোগলক রাণামলের অভিপ্রায় অনুসারে গোপনেই তাঁহার কন্যাকে দিপালপুরে লইয়া গেলেন। তথায় অতি সমারোহের সহিত রজবের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল (হি ৭০৬)। বিবাহের পর নাইলা বিবি, সুলতান-বিবি কদ-বেহু নামে অভিহিত হইলেন।

ইহার কয়েক বৎসর পরে (হিঃ ৭০৯, খৃঃ অঃ ১৩০৯) নাইলা বিবির গর্ভে সুলতান ফিরোজশাহ-তোগলকের জন্ম হয়। গিয়াস্-উদ্দীন তোগলক প্রাণ সম ভ্রাতার পুত্র সন্তান হওয়ায় এতদূর আনন্দিত হন যে, এই জন্মদিন গরীব দুঃখি-গণকে মুক্ত-হস্তে অজস্র অর্থ বিতরণ করেন এবং রাজ্যের সর্ব্বত্র দীপালোকে পরিশোভিত করিতে আদেশ দেন।

যে দিন ফিরোজ-শাহের জন্ম হয়, সেই দিন মালিক-সাহু-ই-মুনুফ-সাহেবেরও একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। ইনিই ইতিহাস লেখক শ্যাম্‌স্-ই-সিরাজ-আকিফের পিতামহ শ্যাম্‌স্-ই-সাহাব-আকিফ। মালিক-সাহু এই সময় দিপাল-পুরেই অবস্থান করিতেন; [illegible] তোগলক-সাহের অন্তঃপুরে তাঁহার পরিবারবর্গের বিশেষরূপ গতি-বিধি ছিল। ইতিহাস লেখক শ্যাম্‌স্-ই-সিরাজ আকিফ বলেন, তাঁহার প্রপিতামহ ফিরোজ শাহাকে যে দুধ খাওয়াইতেন, একথা ফিরোজ সাহের মুখে কথা প্রসঙ্গে প্রায়ই শুনা যাইত। কেবল তাহাই নহে, তাঁহার প্রপিতামহীর স্তন্যপান করিয়াই যে ফিরোজশাহ পরিপুষ্ট, একথা ফিরোজশাহ সিংহাসনা-রোহণের পরেও বহুবার নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন।

ফিরোজশাহ নাইলা বিবির একমাত্র সন্তান। ইতিহাসে মালিক-কুতুব-উদ্দীন ও মালিক-নাইবার-বক্ নামক ফিরোজ শাহের আরও দুই ভ্রাতার উল্লেখ পাওয়া যায় বটে; কিন্তু সাম্‌স্-ই-ফিরোজ-আকিফ বলেন, ইহারা ফিরোজের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, রাজবের মুসলমান স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র।

ফিরোজশাহ সাত বৎসর বয়ঃক্রম কালে পিতৃহারা হন। তাঁহার মাতা নাইলা বিবি তাঁহার লালন পালন ও শিক্ষা দানের জন্য প্রথমতঃ বড়ই উদ্বিগ্ন হন; কিন্তু তোগলক-শাহ ফিরোজকে পুত্রবৎ পালন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া নাইলা বিবিকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। তোগলক-শাহ অকপটে তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ফিরোজকে এত অধিক স্নেহ করিতেন এবং এরূপ যত্নে তাঁহার শিক্ষা যাবতীয় বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন যে, ফিরোজ-শাহ পিতৃহারা কি না বুঝিতে পারেন নাই।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

নিবেদন।

(১)

মরুভূর বক্ষ ভেদ করি,
অঙ্কুরিত হয় যদি কভু কোন লতা;
প্রস্ফুটিত হ'লে ফুল সে লতিকা' পরি,
হ'লেও তা' গন্ধহীন—শুন দেবী কথা,
আদর না কর যদি ক্ষতি নাহি তায়—
শুধু ও চরণপ্রান্তে স্থান যেন পায়।

(২)

গুল্মলতা আচ্ছাদিত গিরি
ছুটাইতে চাহে যদি কভু প্রস্রবণ;
না কর' গাহন তায় নামি ধীরি ধীরি
কিন্তু মাতঃ ধুয়ে নিও ওরাঙা চরণ;
পদ-রেণু বক্ষে লয়ে কুলু কুলু তানে,
তর্ তর্ বহে যাবে অনন্তের পানে।

(৩)

আবেগের বশে যদি কভু
ভগ্নবীণা ছিন্নতার উঠে ঝঙ্কারিয়া;
বার বার হয় যদি তাল ভঙ্গ,—তবু
অপ্রসন্ন হ'য়ে মাগো যেওনা ফিরিয়া।
প্রশংসার দাবী নাহি রাখে ছিন্ন তার
চাহে শুধু মাঝে মাঝে করিতে ঝঙ্কার।

শ্রীভুপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

বিবাহ-বন্ধন।

ধর্ম্মশাস্ত্র এবং দণ্ডনীতি (বা আইন) স্ত্রী পুরুষের বৈবাহিক সম্বন্ধকে একটা বন্ধনে পরিণত করিয়াছে। কোথাও কিছু শিথিল—কোথাও অতি কঠোর—কিন্তু পৃথিবীর প্রায় সকল সমাজেই ইহা বন্ধন, স্ত্রীপুরুষ যখন খুসী মিলিয়া আবার যখন খুসী একে অপরকে ছাড়িয়া যাইতে পারে না। এই রকম খুসীমত মেলা ও ছাড়া যেখানে ঘটে, সেখানে এ সম্বন্ধকে 'বিবাহ' এই পবিত্র নাম কেহ দেয় না। প্রকাশ্যেই হউক, কি গোপনে হউক, এরূপ মিলনকে সমাজ সুনীতি-সঙ্গত মিলন বলিয়া স্বীকার করে না, কোনও অনুষ্ঠানে ইহাকে বৈধ ঘটনার গৌরব দান করে না, কল্যাণকর বলিয়া ইহাকে আশীর্ব্বাদ করে না। আইন এই মিলনের কোনও দায়িত্ব মানে না। সন্তান হইলে অপ্রাপ্ত বয়স্কাল পিতাকে সেই সন্তানের প্রতিপালন ভার গ্রহণ করিতে হইবে, এই মাত্র আইনের বাধ্যতা আছে। সমাজ কি আইন সেই সন্তানকে পিতার বৈধ বংশধর বলিয়া স্বীকার করে না। আইন এরূপ সন্তানকে পিতার পদবী ও সম্পদের উত্তরাধিকারিত্ব দেয় না। সমাজে এই সন্তানের সম্মানিত কোনও স্থানও হয় না।

বৈবাহিক মিলনকে একটা ছেলেখেলার বস্তু মনে না করিয়া, কল্যাণকর অতি গুরু একটা ব্যাপার বলিয়া লোকে যাহাতে অনুভব করে, দুশ্ছেদ্য হইলেও এই বন্ধন যাহাতে সাধারণ বন্ধনের মত অপ্রীতিকর না হইয়া প্রীতিকর হয়, অতি পবিত্র একটা ধর্ম্ম সম্বন্ধ বলিয়া সকলের মনে এমন দৃঢ় একটা সংস্কার জন্মে, যাহাতে ইহার দায়িত্ব ত্যাগ করিতে লোকে বড় একটা দ্বিধা বোধ করে, অধর্ম্ম ও অন্যায় বলিয়া মনে করে, তারজন্য এই মিলনকে সমাজ বহুল ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মহিমাময় করিতে, কত মাঙ্গলিক আচারে ইহাকে পরমরম্য একটি মঙ্গলমূর্ত্তি দান করিতে, প্রয়াস পাইয়াছে। বহুল আয়োজনে, বিপুল আড়ম্বরে, বহু লোকের সমক্ষে এই ধর্ম্মানুষ্ঠান, এই সব আচার সম্পন্ন করা হয়। যাহারা কোনও ধর্ম্মের প্রতি কোনওরূপ দায়িত্ব মানিতে চান না,—তাঁহাদিগকেও আইনের বিধি মানিয়া সাক্ষীর প্রমাণে লেখাপড়া করিয়া এই বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয়।

কোনও সমাজে এই বন্ধন একেবারেই অচ্ছেদ্য,—কোথাও কোথাও অচ্ছেদ্য না হইলেও দুশ্ছেদ্য বটে। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হয় না। পুরুষ একাধিক স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারেন বটে, কিন্তু ব্যাভিচারিণী বা কুলত্যাগিনী না হইলে কেহ স্ত্রীর স্ত্রীত্ব বিলোপ করিতে পারেন না। স্ত্রীর সঙ্গে একত্র বাস না করিলেও, স্ত্রীকে তাঁহার প্রতিপালন করিতে হইবে। তাঁহার স্ত্রী বলিয়াই সমাজে সেই নারী পরিচিতা থাকিবে এবং স্বামীর কুলোচিত মর্য্যাদাও ভোগ করিবে। অন্য কোনও সমাজে বিবাহ-বন্ধন একেবারে অচ্ছেদ্য নয় বটে,—কিন্তু সহজেও ছেদ্য নয়। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সমাজ-বিধির অনুমোদনে অথবা দণ্ডনীতির সিদ্ধান্তে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে, এবং ব[illegible]দম্পতি আবার অপর পাত্র বা পাত্রীকে বিবাহ [illegible] পারে।

আর একটি কথা এইখানে বলিতে হইবে। এই যে বন্ধন, ইহা ধর্ম্মনীতির ও দণ্ডনীতির বন্ধন—মানবজীবনের সমষ্টি শক্তির বিহিত বন্ধন,—ব্যষ্টিভাবে কাহারও স্বেচ্ছাধীন বন্ধন নহে। বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে এই বন্ধনে আদৌ আবদ্ধ হইবে না, হইলে কাহার সহিত হইবে, এ সম্বন্ধে যতই স্বাধীনতা কাহারও থাক্, আবদ্ধ হইতে হইবে সমাজনীতি হইতে দণ্ডনীতির বিধি অনুসারে।

বন্ধনের জন্য যেমন, মুক্তির জন্যও সেইরূপ অবস্থা বিশেষে বিশেষ বিশেষ বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই অবস্থা না ঘটিলে, অবস্থানুযায়ী বিধির আদেশ বা অনুমোদন না পাইলে, কেহ এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে না। বন্ধন তাকে স্বীকার করিয়া চলিতেই হইবে,—যতই কঠোর ও অপ্রীতিকর বলিয়া মনে হউক, বদ্ধ তাকে থাকিতেই হইবে,—মুক্তিলাভে তার স্বাধীনতা কিছু নাই। ধর্ম্মনীতি বা সমাজনীতি সহজে কাহাকেও মুক্তি দেয় না।

ব্যষ্টিভাবে মানবের পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব আজকাল হইয়াছে। এই মতাবলম্বী লোক বরাবরই এই পৃথিবীতে আছেন, তবে বর্ত্তমান যুগে এই মতের কিছু প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। পাশ্চাত্য দেশে

প্রাদুর্ভূত হইয়া এই মত ক্রমে এদেশেও আসিতেছে। এই মতবাদীরা বলেন, মানব তার ব্যষ্টি-জীবনে পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকারী, সকল চিন্তায় ও কর্ম্মে এই স্বাধীনতাই মানবকে পূর্ণতা দান করে, তার আত্মার সকল শক্তিকে বিকাশ করে, মানবত্বের পূর্ণ মহিমায় মানবকে উন্নীত ও প্রতিষ্ঠিত করে, পূর্ণ আনন্দের ভোগে তাহার মানব জীবন সার্থক করে। যে কোন বিষয়েই হউক, বন্ধন মাত্রই তাহার চিন্তাকে ও কর্ম্মশক্তিকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে ধরিয়া রাখিবে, তাহার আত্মিক বিকাশে বাধা দিবে, তার মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করিবে, তার আনন্দের ভোগে তাকে দীন করিয়া রাখিবে। মানব তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশে সমর্থ হইবে না, পূর্ণ আনন্দের উপভোগে পরিতৃপ্ত হইবে না,—মানবাত্মার যে প্রকৃত অধিকার, তাহাতে বঞ্চিত থাকিবে। বন্ধন মানিলে বন্ধনের পর বন্ধনে ক্রমে সকল শক্তি তার অসাড় হইবে, যন্ত্র চালিত জড়ের ন্যায় হীন এই জীবন সে বহন করিবে। সুতরাং মানবকে তার মানব জীবনের সার্থকতার জন্য সকল বন্ধন-মুক্ত হইতে হইবে। বন্ধন মাত্রই তার পক্ষে যেমন অকল্যাণকর, তেমনই অসুখকর। অন্যান্য বন্ধনের ন্যায় বিবাহ-বন্ধনও বন্ধন। স্বাধীনতার অধিকারী মানবকে সমাজনীতি বা দণ্ডনীতি, সেই বন্ধনেই বা আবদ্ধ করিয়া রাখিবে কেন?

দাম্পত্য প্রেম মানব-প্রকৃতির বড় প্রবল একটি বৃত্তি। এই বৃত্তির চরিতার্থতার জন্য—এই প্রেমের সম্ভোগে জীবন মধুময় করিবার জন্য—নরনারীকে মিলিতে হইবে। কিন্তু এই মিলনেই বা স্বাধীনতা হারাইয়া বাহিরের কোনও নীতির কঠোর বন্ধনে কেহ আবদ্ধ হইবে কেন? বাহিরের কোনও শক্তি মানবাত্মার উপরে তাহার কোনও বিধানের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবে, কি এমন অধিকার তার আছে? পরস্পরের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেমে নরনারী যখন পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইবে, দুইটি নরনারী যখন অন্য সকলকে ছাড়িয়া—আর কাহাকেও না চাহিয়া—কেবল একে অপরকেই চাহিবে, তখনই তাহারা স্বেচ্ছায়—স্বাধীনতার অধিকারে—মিলিবে। প্রেমের টানে এই মিলন—বাহিরের পাঁচজনের সঙ্গে মিশিয়া, পাঁচজনকে দেখিয়া শুনিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া যাহাকে সব চেয়ে বেশী আপন বলিয়া মনে হইবে, প্রাণ সত্য যাহাকে চাহিবে, তাহার সঙ্গে এই মিলন—কখনও বন্ধনের মত অসুখকর বা অশুভকর হইতে পারে না। প্রেমে এই মিলন, প্রাণে প্রাণে প্রাণের সত্য পরিচয়ে এই মিলন—সেই প্রেমে সেই পরিচয়েই স্থায়ী হইবে।

কিন্তু যদি না হয়? মানুষ মাত্রেরই ভুল হইতে পারে। যদি দেখা যায়, প্রেমে ভুল হইয়াছিল, পরিচয়েও ভুল হইয়াছিল, তবে কি হইবে? দুইটি নরনারী—ধরুন, রঙ্গলাল ও রঙ্গিনী—পরস্পরের প্রেমে মজিল, পরস্পরের প্রাণ খুব চিনিয়াছে বলিয়া মনে করিল, পরস্পরকেই সব চেয়ে আপন বলিয়া বুঝিল,—তারপর দুইজনে দাম্পত্যসম্বন্ধে মিলিল। কিন্তু কিছুদিন পরেই এমন হইল, যে রঙ্গিণীকে রঙ্গলালের আর ভাল লাগে না, অথবা রঙ্গিণীরও আর রঙ্গলালকে ভাল লাগে না,—অথবা দুইজনের কাহারও কাহাকেও ভাল লাগে না। আগে যাহা তাহারা প্রেম বলিয়া বুঝিয়াছিল, শেষে দেখিল, তাহা ঠিক প্রেম নয়, সাময়িক একটা মোহ মাত্র তাহাদের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। অথবা প্রেম হইয়া থাকিলেও প্রেমের পিপাসা একেবারেই মিটিয়া গিয়াছে। মনটা অতিতৃপ্তিতে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষুধা যতই থাক্, অতি আহারে যেমন আহার্য্যের উপরে দারুণ একটা বিতৃষ্ণা জন্মে,—পরস্পরের প্রতি অথবা কোন এক পক্ষের অপর পক্ষের প্রতি তেমনই একটা বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। তারপর, আগে তাহারা পরস্পরকে যে চিনিয়াছিল—শেষে হয়ত দেখিল যে চেনাটা চেনাই হয় নাই, দারুণ একটা ভুল হইয়া গিয়াছে। বড় আপন বলিয়া একে অন্যকে অনুভব করিয়াছিল, দেখিল, আপন হইবার যো একেবারেই নাই, নূতন এমন একটা বাধা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, যাহা আগে কেহই ধরিতে পারে নাই, যাহাতে সমপ্রাণতার সুখের মিলন একেবারেই অসম্ভব। আর ভুল যদি নাও হয়, মানুষের পরিবর্ত্তন ত হইতে পারে,—কতদিন পরে একজনের ভাব সাব—চালচরিত্র এমন বদলাইয়া গেল, অথবা দুই জনের দুই বিপরীত দিকে এমন টান পড়িল যে আর সঙ্গে মিলিয়া থাকা একেবারেই চলে না। সর্ব্বদা সকল ক্ষেত্রে না হউক, এমন সব ব্যাপার যে হইতে পারে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এমন ব্যাপার যে ঘটিয়াও থাকে, তাহাও অনেকে জানেন। এই সব ভুলচুক বা পরিবর্ত্তনের কথা ছাড়িয়া

দিলেও আরও কথা আছে। মানুষ সব সরল ধর্ম্মভীরু মানুষ নয়। কোনও লোভে একজন আর একজনকে ঠকাইতেও পারে, ঠকাইয়াও থাকে। নাটক নভেল কাব্যাদি যাহারা খুব পড়িয়াছে, প্রেমের ভাণ করা তাহাদের পক্ষে কিছুই কঠিন নয়। তারপর প্রেমে যেখানে প্রাণ টানে, সেখানে বাছাই যাচাই করিবার অবসর বড় হয় না। যদিই হয়, বেশীদিন তাহাতে লাগে না। ততদিন ভাক্ত ভাল হইয়া চলিতে বা বাঞ্ছিতের মনের মত ভালমানুষী করিতে, একটু বুদ্ধি থাকিলে সকলেই পারে। এই ভাবে ঠকাইয়া ভুলাইয়া কাহারও সঙ্গে প্রেমের মিলন ঘটান দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। অনেক এমন হইয়াও থাকে।

যাহা হউক, এমন যদি হয়,—সর্ব্বদা সকলের পক্ষে না হউক, অনেক সময় অনেকের পক্ষেই হইতে পারে,—এমন যদি হয়—মিলনের পর যদি দেখা যায়, দুইজনেই আগে বড় ভুল বুঝিয়াছিল,—মিলিয়া থাকায় সুখ কিছুই হইতেছে না, কাহারও কাহাকেও ভাল লাগিতেছে না—কিছু লাগিলেও পূরাপূরি লাগিতেছে না একেবারে বিষ না উঠুক, আকাঙ্ক্ষিত পুরা মধুও ইহার মধ্যে পাওয়া যাইতেছে না,—দুজনের দুজনকে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে,—মিলিয়া থাকিতেই মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে,—এমন যদি হয়, তখন কি হইবে? শুধু তাই নয়, প্রত্যেকেরই হয়ত অপর কাহাকেও তখন বেশী ভাল লাগিতেছে,—পরস্পরকে ছাড়িয়া সেই অপরের সঙ্গেই মিলিতে প্রাণটা পাগল হইয়া উঠিতেছে। এমনও ত হইতে পারে। হইলে, তখনই বা কি হইবে?

মূল যে নীতির উপরে এই মত প্রতিষ্ঠিত, সেই নীতির যুক্তি অনুসারে এরূপ অবস্থায় সেই নরনারীকে অপ্রীতিকর দাম্পত্য সম্বন্ধে বাঁধিয়া রাখা অন্যায়। মিলন যখন পরস্পরের প্রতি প্রেমের অভাবে মধুর ও প্রীতিকর আর থাকিবে না,—প্রাণের যে পরিচয়ের বিশ্বাসে মিলন ঘটিয়াছিল, সেই পরিচয় যখন ভুল পরিচিত হইবে,—সকলের বড় কথা—স্বভাবমুক্ত স্বাধীন নরনারী যখন স্বেচ্ছায় আর মিলিয়া থাকিতে চাহিবে না,—তখন এই মিলন আর থাকিতে পারে না। দুইজনেই মিলনের দায়িত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিবে। করিয়া যদি আর কাহারও সঙ্গে মিলিতে ইচ্ছা হয়, তাই মিলিবে।

এই অবস্থায় এই নীতি ধরিয়া যুক্তিতে এই সিদ্ধান্তেই আমাদিগকে উপনীত হইতে হয়। পূর্ণ স্বাধীনতাবাদী যাঁহারা, তাঁহাদেরও মত এইরূপ।

প্রেমব্যতীত—স্বেচ্ছায় যাচাই বাছাই ব্যতীত—দাম্পত্য-মিলন, এবং প্রেমের অভাবে, পরস্পরে প্রতি আন্তরিক পূর্ণবিশ্বাস ও শ্রদ্ধার অভাবে, মিলনে স্বাভবিক একটা প্রবৃত্তির অভাবে, বাধ্য হইয়া দুইটি নরনারীর দাম্পত্য সম্বন্ধে বদ্ধ থাকা, একেবারেই অস্বাভাবিক। ইহা অপেক্ষা হীনতা এবং দারুণ দুঃখ - জীবনসম্ভোগে ব্যর্থতা আর কিছুই হইতে পারে না।

বিবাহবন্ধনের দায়িত্ব কোনও কোনও গুরুতর বিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা নারীর অনেক বেশী। কেবল এদেশীয় নয়, ইয়োরোপীয় সমাজেও এই অবস্থা। পুরুষকে স্ত্রী ও সন্তানগণের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় ভার গ্রহণ করিতে হয়। আর কোনও বিষয়ে অতি কঠোর কোনও বিধি তার সম্বন্ধে নাই। স্ত্রীকে স্বামীর সংসারে স্বামীর অনুগত থাকিয়া গৃহকর্ম্মাদি পরিচালনা করিতে হয়, সন্তান গর্ভে ধরিতে হয়, তাহাদের লালন পালন করিতে হয়। আইনে নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি কারণ ব্যতীত স্বামী বা স্বামীর গৃহ ত্যাগ করিয়া স্ত্রী অন্য কোথাও গিয়া থাকিতে পারে না, থাকিলে স্বামী আর তাহাকে খোরপোষ দিতে বাধ্য নয়। খরচপত্র যোগাইতে পারিলে, পুরুষ গৃহ ছাড়িয়া যেখানে ইচ্ছা সেখানে গিয়া থাকিতে পারে। ব্যভিচার পুরুষের পক্ষে নিন্দনীয় হইলেও সমাজে একেবারে অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না। নারী অসতী বলিয়া বিদিতা হইলে ভদ্রসমাজে সে বর্জ্জনীয়া হয়। স্বামীর ব্যভিচার দোষ প্রমাণ করিতে পারিলে, আইনে নারীও বিবাহবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু ব্যভিচারিণী নারীর যে সামাজিক গ্লানি হয়, ব্যভিচারী পুরুষের তাহা হয় না। মোটের উপর পাশ্চাত্য সমাজেও বিবাহবন্ধনের কঠোর দায়িত্ব পুরুষ অপেক্ষা নারীকে অনেক বেশী বহন করিতে হয়। মুক্তি-বাদী যাঁহারা, তাঁহারা স্বাভাবতঃই বিবাহ-বন্ধনে নারীর অধিকতর দুর্গতি ও হীনতার কথাই বেশী করিয়া দেখাইয়া থাকেন, কবি এই বন্ধনের বিরুদ্ধে নারীর বিদ্রোহের মহিমাই চিত্তগ্রাহী বর্ণে রঞ্জিত করিয়া প্রকট করিতে

প্রয়াস পান। মানবচরিত্রের—বিশেষতঃ নারীচরিত্রের এই দিকটি ব্যঞ্জনা করিয়া সমাজনীতির অস্বাভাবিক কঠোরতা যাঁহারা প্রতিপন্ন করিতে চান, এরূপ কবিদের মধ্যে আজ-কাল ইব্‌সেনের নাম বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। নব্য-বঙ্গের সাহিত্যরসিকগণের মধ্যেও ইব্‌সেনের নাম অনেকেরই পরিচিত। বিবাহ-বন্ধনের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহবাদের নামও হইয়াছে, এখন Ibsenism বা ইব্‌সেনী বাদ। ইব্‌সেনের দুইখানি প্রসিদ্ধ নাটক হইতে দুইটি দৃষ্টান্ত এই স্থলে উদ্ধৃত করিব।

পুতুলের ঘর—নোরা।

বঙ্গীয় পাঠকগণও অনেকে জানেন, Doll's House বা 'পুতুলের বা খেলার ঘর' ইব্‌সেনের অতি প্রসিদ্ধ একখানি নাটক। নাটকের নায়িকা নোরা, নায়ক নোরার স্বামী টর্‌ভাল্ড হেল্‌মার তখন সম্ভ্রান্ত পদস্থ পুরুষ,—অবস্থাও সচ্ছল। নোরা সুন্দরী, স্বভাবও ছেলেমানুষটির মত অতি সরল ও মিষ্ট। নোরার রূপে ও সরল মধুর স্বভাবে মুগ্ধ হেল্‌মার তাকে বড় আদর করিতেন, সোহাগ করিতেন। বিবাহের পর হাসিয়া খেলিয়া দম্পতির আট বৎসর কাটিয়া গেল,—তিনটি সন্তানও হইল। কাজের সময় হেল্‌মার নিজের ঘরে একা কাজকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতেন,—কেবল অবসর সময়ে নোরাকে লইয়া আমোদপ্রমোদে চিত্তবিনোদন করিতেন,—কাজকর্ম্মসম্বন্ধীয় কোনও গুরু ব্যাপারে তার কোনও পরামর্শ বা সহায়তা চাহিতেন না। নোরা তাঁহার রূপ লইয়া, বেশভূষায় সাজিয়া, হাসি ও সঙ্গীতের মাধুরীতে ভরপুর হইয়া, অবসরকালে তাঁহার চিত্তবিনোদনের জন্য প্রস্তুত থাকে, ইহাই যেন তিনি চাহিতেন। নোরার সৌন্দর্য্য কিছুতে একটু ক্ষুণ্ণ হয়, সুন্দর দাঁতগুলিতে পর্য্যন্ত একটু দাগ পড়ে, ইহাও তিনি সহিতে পারিতেন না। তবে নোরাকে যারপরনাই স্নেহও তিনি করিতেন, নোরা যখন যাহা চাহিত তাই দিতেন. ইহাতে অর্থব্যয়েও মুক্তহস্ত তিনি ছিলেন। স্বামীর এই আদরে সোহাগে নোরাও যারপরনাই আনন্দে ছিল,—স্বামীর চিত্তরঞ্জনের জন্যও সর্ব্বদাই প্রয়াস পাইত।

বিবাহের পর কিছুকাল হেল্‌মারের অবস্থা খুব ভাল ছিল না এবং এক সময়ে অতিশ্রমে তিনি বড় রুগ্ন হইয়া পড়েন ডাক্তারেরা গোপনে নোরাকে বলিলেন, ইটালী দেশের আব-হাওয়া ভাল, সেখানে গিয়া অন্ততঃ বৎসর খানেক না থাকিলে হেল্‌মারের জীবন রক্ষা পাইবে না। নোরা নিজে তখন গর্ভবতী। নরওয়ে দেশ হইতে এই অবস্থায় রুগ্ন স্বামীকে লইয়া ইটালীতে যাওয়া এবং সেখানে গিয়া এক বৎসর থাকা বহু ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। হেল্‌মারের সে অর্থ নাই। তাঁহার জীবনরক্ষা যে ইহা ব্যতীত হইতে পারে না, সে কথাও তাঁহাকে বলা হয় নাই। ইটালী যাত্রা এ অবস্থায় অনাবশ্যক ও অসাধ্য বলিয়া নোরার সহস্র অনুনয়েও তিনি কর্ণপাতও করিলেন না। কিন্তু নোরা মনে মনে সংকল্প করিল, যে ভাবে হউক, স্বামীর জীবন-রক্ষা করিতেই হইবে। তাহার পিতা তখন অতি রুগ্ন,—তাঁহার নিকট হইতে কোনও সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। অগত্যা নোরা তাহার বাল্যজীবনে পরিচিত ক্রগষ্টাড্‌ কোনও বন্ধুর নিকটে ১২০০ ডলার (প্রায় ৩৷৪ হাজার টাকা) ধার চাহিল। নোরা হ্যাণ্ডনোট্‌ লিখিয়া দিবে, এবং তাহার পিতা তাহাতে জামিন থাকিবেন, এই সর্ত্তে ক্রগষ্টাড্‌ এই টাকা নোরাকে সংগ্রহ করিয়া দিতে চাহিল। কিন্তু পিতা তখন কঠিন রোগে শয্যাগত, একথা তাঁহাকে বলাও যায় না। নোরা অগত্যা পিতার নাম জাল করিয়া দিল। ইতিমধ্যে পিতার মৃত্যু হইয়াছিল। জামিনে স্বাক্ষরের তারিখ পড়িল, মৃত্যুর তিন দিন পরে। ক্রগষ্টাড টাকা দিল,—কিন্তু সহজেই জানিতে পারিল, নোরা তাহার পিতার নাম জাল করিয়া দিয়াছে। টাকা পাইয়া নোরা স্বামীকে লইয়া ইটালীতে গেল এবং স্বামীকে জানাইল, তার পিতা এই টাকা দিয়াছেন। এক বৎসর ইটালীতে থাকিয়া হেল্‌মার বেশ সুস্থ হইলেন এবং নোরা স্বামীকে লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিল। টাকা সম্বন্ধে কোনও কথা নোরা স্বামীকে জানাইল না। পিতা জীবিত নাই,—সুতরাং সেদিক হইতেও কোনও ভয়ের কারণ নাই। নোরা তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া টাকা কর্জ্জ করিয়া তাঁহার জীবনরক্ষা করিয়াছে, একথা জানিতে পারিলে তিনি সহজে নোরাকে ক্ষমা করিবেন না, ইহা নোরা জানিত।—স্বামী যারপরনাই অভিমানী,—স্ত্রীর সাহায্যে এই দুরবস্থায় তিনি রক্ষা পাইয়াছেন, ইহা তিনি অতি গ্লানিকর বলিয়া বিবেচনা করিবেন। কর্জ্জ করিয়া কোনও ব্যয় করা তিনি একেবারেই পছন্দ করিতেন না। তারপর নোরা যে পিতার নাম জাল করিয়া দিয়াছে, ইহা জানিতে পারিলে ত একেবারে সর্ব্বনাশ

হইবে। আবার স্বামীর জন্য যে এত বড় একটা কাজ নোরা করিয়াছে, স্বামীকে এত ভাল বাসে যে তার জন্য গুরুতর অন্যায় একটা করিতেও সে কুণ্ঠিত হয় নাই, ইহা স্বামীর কাছে গোপন রাখিয়াই নোরা মনে মনে বড় গৌরব অনুভব করিত। যদি কখনও প্রয়োজন হয় জানাইবে, নতুবা তার এই ত্যাগের কথা তারই অন্তরে থাকিবে, নোরা মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়াছিল।—তবে এই দেনা পরিশোধ করিতে হইবে। স্বামীর কাছে নিজের প্রয়োজনে নোরা মাসে মাসে যে টাকা পাইত, নিজে অনেকটা ক্লেশ করিয়াও সেই টাকার অর্দ্ধেকের বেশী সে ক্রগষ্টাডকে দিত।

ক্রগষ্টাড্ এক ব্যাঙ্কে চাকরী করিত,—সেই ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষতা হেল্মারের হাতে আসিল। ক্রগষ্টাড্ একবার জাল করিয়াছিল, আদালতে ভাল প্রমাণের অভাবে শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাইলেও এই কলঙ্ক তাহার নামে ছিল। লোকের এই সব দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে হেল্মারের নীতির আদর্শ বড় কঠোর ছিল। ক্রগষ্ট্যাডের মত অসৎলোকের সংসর্গে এক আফিসে কাজ করাও তাঁহার অতি ঘৃণাস্কর বলিয়া বোধ হইল,—তিনি তাহাকে কাজে জবাব দিলেন। এই কলঙ্কহেতু এই কাজ গেলে ক্রগষ্ট্যাডের একেবারে সর্ব্বনাশ হয়,—আর কোথাও সে কাজ পাইবে না, ছেলেপিলেগুলিকে লইয়া তাকে উপবাস করিতে হইবে। সে গিয়া নোরাকে ধরিল। নোরাকে ভয় দেখাইল,—স্বামীকে বলিয়া কহিয়া যদি তার কাজে তাকে নোরা না রাখিয়া দিতে পারে, তবে তার সেই জালের কথা সে হেল্মারকে বলিয়া দিবে। নোরা প্রমাদ গণিল। স্বামীকে অনুরোধ করিল,—কিন্তু হেল্মার কিছুতেই ক্রগষ্টাডের মত লোককে তাঁহার আফিসে রাখিতে সম্মত হইলেন না। ক্রগষ্টাড সমস্ত ঘটনা জানাইয়া হেল্মারকে একখানা পত্র লিখিল। নোরার কৌশলে সেই পত্র হেল-মারের হাতে পড়িতে ২।৩ দিন বিলম্ব হইল। ইতি মধ্যে নোরা তার এই বিষম সঙ্কটের কথা তার এক বাল্যসহচরীকে বলিয়াছিল। এই বাল্যসহচরী—নাম ক্রিষ্টিনা লিণ্ডেন—তখন একজন দরিদ্র বিধবা। সে নোরাকে উপদেশ দিল, সকল ঘটনা স্বামীকে বলিয়া তার কাছে মাপ চাও। কিন্তু নোরার তাহা সাহসে কুলাইল না। তখন ক্রিষ্টিনা গিয়া ক্রগষ্টাডকে ধরিল। প্রথম জীবনে ইহারা পরস্পরের প্রেমাকাঙ্ক্ষী-ছিল,—ঘটনাচক্রে বিবাহ হয় নাই, উভয়েই অন্যত্র বিবাহ করিয়াছিল। ক্রিষ্টিনা এখন বিধবা, ক্রগষ্টাডও বিপত্নীক। বহু দুঃখের পর প্রণয়ীদের আবার মিলন হইতে পারে। নূতন সুখের জীবনের আশায় ক্রগষ্ট্যাড উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ক্রিষ্টিনার অনুরোধে নোরার জালের প্রমাণসহ সেই হ্যাণ্ড-নোট সে আর একখানা চিঠি লিখিয়া হেল্মারের কাছে পাঠাইয়া দিল। পূর্ব্বের পত্রখানা ফিরাইয়া আনিবারও সময় তখন ছিল—কিন্তু ক্রিষ্টিনা কহিল, নোরা যে স্বামীর সঙ্গে এই লুকাচুরী খেলিতেছে, ইহা মোটেই ভাল নয়। হেল্মার সব জানুক, সব গোল মিটিয়া যাউক, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি পূর্ণ একটা বিশ্বাস স্থাপিত হউক।

ইতিমধ্যে ক্রগষ্ট্যাডের প্রথম চিঠি হেল্মারের হাতে পড়িল। পড়িয়া হেল্মার একেবারে আগুন হইয়া উঠিলেন। নোরা যে এত বড় একটা দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, ইহাতে বড় একটা ঘৃণা তাঁহার হইল। আবার ইহা প্রকাশ হইলে তাঁহার মাথা হেঁট হইবে, লোকসমাজে তাহার মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না। সেই গ্লানি হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে ক্রগষ্ট্যাডের মত লোকের হাতে তাঁহাকে থাকিতে হইবে,—যাকে ঘৃণিত কীটের মত দূর করিয়া দিতে চান, তাকেই আদর করিয়া কাছে রাখিতে হইবে। জীবনের মত সুখশান্তি তাঁহার নষ্ট হইল। এই সব কথা বলিয়া অতি কঠোর ভাষায় নোরাকে তিরস্কার করিলেন। কিন্তু নোরা তাহার স্ত্রী, সর্ব্বথা তাঁহার রক্ষণীয়া। যত গ্লানিই সহিতে হউক, নোরাকে তিনি রক্ষা করিবেন, কিন্তু স্বামীস্ত্রীভাবে আর তিনি নোরার সঙ্গে থাকিতে পারেন না। তিনি আদেশ করিলেন,—নোরা বাহিরে লোকের দৃষ্টিতে গৃহিণীরূপেই তাঁহার গৃহে বাস করিবে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ আর থাকিবে না। ছেলেপেলের কোনও ভারই আর তিনি নোরার উপরে রাখিবেন না,—মাতার পাপ সংসর্গ হইতে তাহারা দূরে থাকিবে। নোরা ধীর স্থির ভাবে স্বামীর সব কথা শুনিল,—কোনওরূপ ভয়ের কি পরিতাপের কোনও চাঞ্চল্য তাহার মুখের ভাবে কি কথায় প্রকাশ পাইল না।

এমন সময় ক্রগষ্ট্যাডের দ্বিতীয় পত্র আসিল, তার মধ্যে সেই হ্যাণ্ডনোট্ ছিল। নোরার দুষ্কর্ম্মের সকল প্রমাণ হস্তগত হইল। আর ভয় নাই,—কোনও কেলেঙ্কারী হইবে না

ক্রগষ্ট্যাডের হাতেও তাঁহাকে থাকিতে হইবে না। নোরার প্রতি সকল ক্রোধ---তাঁহার মুহূর্ত্তে দূর হইল। আনন্দে তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আমি রক্ষা পাইলাম! নোরা— নোরা!—আমি রক্ষা পাইলাম! আর ভয় নাই।"

নোরা ধীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আর আমি?"

হেল্‌মার কহিলেন, "তুমিও অবশ্য পাইলে। আমরা দুজনেই রক্ষা পাইলাম। এই যে সেই সর্ব্বনেশে হাতচিঠি, এখনই ইহা পোড়াইয়া ফেলি!" এই বলিয়া হাতচিঠিখানি টুকুরা টুকরা করিয়া আগুনে ফেলিয়া দিলেন। তারপর স্নেহপূর্ণ স্বরে নোরাকে আদর করিয়া কহিলেন, "আহা, এ কয়দিন কি অশান্তিই তুমি ভোগ করিয়াছ! আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি এখন, আমাকে এত ভালবাস বলিয়াই তুমি ইহা করিয়াছিলে।—যাহা হউক, তোমাকে আমি ক্ষমা করিলাম।"

"ক্ষমা করিলে! বেশ, তার জন্য ধন্যবাদ!" ধীর গম্ভীর স্বরে মাত্র এই কথা বলিয়াই নোরা বাহিরে চলিল।

হেল্‌মার ব্যগ্রভাবে কহিলেন, "ওকি! কোথায় যাও নোরা?"

"আমার পুতুলের পোষাক খুলিয়া ফেলিতে।" তখন রাত্রি, হেল্‌মারের গৃহে নৃত্যগীতের উৎসব হইতে ছিল,—সেই উৎসবের জন্য স্বামীর নির্দ্দেশ ক্রমে অতি মনোহর পরিচ্ছদে নোরা তখন সজ্জিত ছিল।

হেল্‌মার মনে করিলেন, এই উত্তেজনার পর উৎসবের পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া নোরা এখন বিশ্রাম করিবে।

কিন্তু নোরার মধ্যে যেন একটা বিপ্লবের পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। স্বামীর বাস্তবিক প্রেমের পাত্রী সে নয়,—চিত্তবিনোদনের একটি পুতুল মাত্র। পুতুলের মত তাকে সাজাইয়া—এই আট বৎসর তাকে লইয়া তিনি খেলা করিয়াছেন মাত্র, প্রাণ দিয়া তাকে ভাল কখনও বাসেন নাই। যত বড়ই গর্হিত কাজ সে করিয়া থাক্‌, স্বামীর জীবনরক্ষার জন্য করিয়াছে। কিন্তু স্বামী সে কথা বুঝিলেন না। তাঁর কলঙ্ক হইবে, মুখ ছোট হইবে, তাই মনে করিয়া তিনি আগুন হইয়া গেলেন। যখন ক্ষমা করিলেন, নোরার প্রেমের মর্য্যাদা অনুভব করিয়া নয়, তাঁর নিজের গ্লানির আশঙ্কা দূর হইল, তাই। যে ভালবাসে, ভালবাসার মর্য্যাদা যে করে, প্রাণ দিয়া যে প্রাণের দরদ করে, সে কি কেবল নিজের সুখ দুঃখ-মান অপমানের হিসাব এত করিতে পারে? আট বৎসর স্বামীর সঙ্গে একত্র সে বাস করিয়াছে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে বাস্তবিক প্রাণের কোনও পরিচয় তার হয় নাই,—কেবল খেলার পুতুল মাত্র হইয়া সে রহিয়াছে। নোরার আত্মমর্য্যাদার বড় আঘাত লাগিল। তার মনে হইল, যে অপরিচিত কোনও লোকের ঘরে তার প্রমোদক্রীড়নক হইয়া সে রহিয়াছে, তার আত্মাকে ইহাতে যারপরনাই অবমানিত সে করিয়াছে। আর সে স্বামীর সঙ্গে স্বামীর ঘরে থাকিতে পারে না। উৎসবের পরিচ্ছদ ছাড়িয়া সাধারণ এক পরিচ্ছদ পরিয়া সে ফিরিয়া আসিল,—ধীর গম্ভীরভাবে স্বামীকে মনের সকল কথা জানাইল।

নোরা কহিল, "আট বৎসর আমাদের বিবাহ হইয়াছে—জীবনের কোনও গুরু বিষয়ে গুরুত্বের উপযোগী একটি কথাও কখনও আমরা বলি নাই। আমাদের সম্বন্ধের কোনও দায়িত্বের কথা আমরা কখনও বুঝিতে চেষ্টা করি নাই, তুমি কখনও আমাকে বোঝ নাই, কখনও আমাকে ভালবাস নাই। আমার সঙ্গে ভালবাসার খেলা করিয়া একটা আমোদ পাইয়াছ, তাই সেই খেলাই মাত্র করিয়াছ। পিতার ঘরেও আমি পুতুল মাত্র ছিলাম। 'পুতুল খুকী' বলিয়া আমাকে তিনি ডাকিতেন,—আমি যেমন আমার পুতুল লইয়া খেলা করি, তেমনই তিনি আমাকে লইয়া খেলা করিতেন। তিনি যা বলিতেন, আমিও তাই বলিতাম। অন্য রকম কিছু ভাবিলেও মুখে তাহা বলিতে পারিতাম না,—কারণ তিনি তা পছন্দ করিতেন না। তারপর তোমার ঘরে আসিলাম, তোমার খেলার পুতুল হইলাম। তুমি যেমন চাও, ঠিক তেমনিটিই আমাকে হইতে হইল। তোমার রুচির মত সকল ব্যবস্থা তুমি করিলে, আমাকেও একেবারে তোমার রুচির অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইল। অন্ততঃ তেমনই একটা ভাণ করিয়া চলিতে আমাকে হইয়াছে। তোমাদের যখন যেমন খেয়াল হইয়াছ, তোমাদের কৃপাপ্রার্থিনীর মত তখন তেমন খেলা করিয়াই আমি জীবন কাটাইয়াছি। উঃ! বড় একটা অন্যায় তোমরা,—আগে পিতা তারপর তুমি যে আমার উপরে করিয়াছ! আমার একটা জীবন তোমাদের জন্য নষ্ট হইয়া গেল।"

হেল্‌মার অতি বিস্ময়ে কহিলেন, "নোরা, এ তুমি কি বলিতেছ! তুমি এখানে সুখে রও নাই?"

"না—কখনও না। আমার মনে হইয়াছে,—সুখে ছিলাম,—কিন্তু বাস্তবিক সুখী কখনও হই নাই।"

"বল কি? সুখে রও নাই?"

"না। আমোদ আহ্লাদে ছিলাম, সুখে কখনও রই নাই। যথেষ্ট দয়া তুমি আমাকে করিয়াছ, কিন্তু তোমার এই ঘর একটা খেলার ঘরের মত মাত্র ছিল,—এই খেলার ঘরে আমি তোমার খেলার স্ত্রী মাত্র ছিলাম। যখন তুমি খেলা করিয়াছ, মনে করিয়াছি বেশ একটা মজা হইতেছে,—ছেলেপিলেদের নিয়া খেলিলে যেমন তারা সেটাকে একটা মজা মনে করে। আমাদের বিবাহ এই রকম একটা খেলার ব্যাপারই ছিল।"

হেল্‌মার কহিলেন, "নোরা তুমি যাহা বলিতেছ, বাড়াবাড়ি হইলেও কিছু সত্য তার মধ্যে আছে। যাই হউক, এখন অবধি অন্যভাবে আমরা চলিব। খেলার সময় চলিয়া গিয়াছে, শিক্ষা এখন আরম্ভ হউক।"

"কার শিক্ষা? আমার না ছেলেপিলেদের?"

"দুইয়েরই।"

"তোমার উপযুক্ত স্ত্রী হইতে তুমি আমাকে শিক্ষা দিতে পার না। আর তোমার ছেলেপিলেদের শিক্ষা দিতে পারি, এমন যোগ্যতা কি আমার আছে? এই মাত্র না তুমি বলিয়াছ, ভরসা করিয়া আমার হাতে তাদের তুমি রাখিতে পার না?"

"রাগের মাথায় একটা কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলাম,—তা কেন আর মনে রাখিতেছ?"

"না, তুমি ঠিক বলিয়াছ! আমি খেলার পুতুল। কাহারও শিক্ষার ভারগ্রহণের যোগ্য নই। আমার নিজেরই শিক্ষা আবশ্যক, সে শিক্ষা তুমি দিতে পার না, নিজেকেই সেই ভার আমার নিতে হইবে। তাই আজ তোমার ঘর আমি ছাড়িয়া যাইতেছি। আজই—এখনই—এই মুহূর্ত্তে—আমি চলিয়া যাইব।"

"নোরা এ কি বলিতেছ? তুমি কি একেবারে পাগল হইয়াছ? তাও কি হয়? তোমার গৃহ, তোমার স্বামী, তোমার সন্তান—সব তুমি ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে? লোকে কি বলিবে—তা ভাবিতেছ না?"

"ও সব কিছুই আমি গ্রাহ্য করি না। আমাকে যাইতেই হইবে। জীবনের শিক্ষা লাভ আমি করিতে চাই।"

"কি বলিতেছ নোরা! জীবনের শ্রেষ্ঠ পুণ্যতম কর্ত্তব্য—সব ত্যাগ করিতে চাও।"

"আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পুণ্যতম কর্ত্তব্য কি—তুমি বলিতে পার?"

"তাও আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ নোরা? তোমার স্বামীর প্রতি তোমার সন্তানদের প্রতি তোমার কর্ত্তব্য।"

"আমার নিজের প্রতিও কর্ত্তব্য রহিয়াছে, তাও কম নয়।"

"ভাবিয়া দেখ নোরা, সকলের উপরে—তুমি স্ত্রী—তুমি মাতা——"

"না, সকলের উপরে আমি মানব।—যেমন তুমি মানব, তেমন আমিও মানব। অন্ততঃ প্রকৃত মানব হইবার চেষ্টা আমি করিব। আমি জানি, বেশীর ভাগ লোকেই—তুমি যাহা বলিতেছ তাই বলিবে, পুস্তকেও তাই লেখে। কিন্তু লোকে যা বলে বলুক, পুস্তকে যা লেখে লিখুক, আর আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে পারি না। সকল কথা আমি নিজে ভাবিব,—তার ভাল মন্দ নিজে বুঝিয়া নিব।"

"নোরা! তোমার গৃহে তোমার স্থান কি, তাহা কি নিজে তুমি বুঝিতে পার না? এই সব প্রশ্নে অভ্রান্ত কোনও নির্দ্দেশ কি তুমি কোথা হইতে পাও না? তোমার কি ধর্ম্মবিশ্বাস কিছু নাই?"

নোরা উত্তর করিল, "ধর্ম্ম কি ঠিক জানিনা। যাজকেরা যা বলে, তা ছাড়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান আমার নাই। এখান হইতে যাইতেছি—একা এই পৃথিবীতে গিয়া দাঁড়াইব,—তখন ধর্ম্ম সম্বন্ধেও ভাবিয়া দেখিব। দেখিব, যাহা শুনিয়াছি, তাহা সত্য কি না,—অন্ততঃ আমার পক্ষে তাহা সত্য হইতে পারে কি না।"

হেল্‌মার অতি বিস্মিত ও ক্ষুব্ধভাবে বলিয়া উঠিলেন, "এমন কথা আর কখনও শুনি নাই! নোরা, যদি ধর্ম্মবিশ্বাস তোমাকে ন্যায় পথে না রাখিতে পারে, তোমার বিবেকের নিকটে আমি নিবেদন করিতেছি। বোধ হয় সাধু নৈতিক বুদ্ধি তোমার আছে,—বল, তাও কি নাই?"

নোরা উত্তর করিল, "জানি না,—আমি এখন কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এই পর্য্যন্ত জানি যে, তোমার

সঙ্গে এ সব বিষয়ে আমি একমত নই। শুনিতে পাই, আইনের ব্যবস্থা আমার এই মতের বিরুদ্ধে। কিন্তু আমার মনে হয় না, আইন এ সম্বন্ধে ঠিক ব্যবস্থা করিয়াছে। আইনের ব্যবস্থায় বোধ হয় মুমূর্ষু পিতাকে উত্যক্ত করিবে না, কি স্বামীর জীবনরক্ষা করিবে না, এ অধিকার নারীর নাই। আমি এ কথা বিশ্বাস করি না।"

"নোরা! তুমি ছেলেমানুষের মত কথা বলিতেছ। যে সমাজে তুমি বাস করিতেছ, সেই সমাজের কথা তুমি বুঝিতেছ না।"

"না, বুঝিতেছি না। বুঝিতে চেষ্টা করিব। সমাজ কি, আমি—কে, ঠিক তাহাই আমাকে বুঝিয়া নিতে হইবে।"

"নোরা তুমি বড় অস্থির হইয়াছ! তোমার মাথা ঠিক নাই, ভাল মন্দ পরিষ্কার তুমি বুঝিতে পারিতেছ না।"

নোরা উত্তর করিল, "আজ যেমন বুঝিতেছি, এমন পরিষ্কার ভাবে এমন নিশ্চন্তভাবে—কোনও কথা আমি কথনও বুঝি নাই, ভাবিও নাই।"

"স্পষ্ট নিশ্চিন্ত ভাবে সব বুঝিয়াই কি তুমি তোমার স্বামী ও সন্তানদের ত্যাগ করিয়া যাইতেছ?"

"হাঁ।"

"ইহার একমাত্র কারণ থাকিতে পারে।—তুমি তবে আমায় ভালবাস না?"

"না। তুমি যথেষ্ট অনুগ্রহ আমাকে করিয়াছ, কিন্তু কি করিব? দুঃখের কথা যতই হউক, স্পষ্ট আমি বলিতেছি, —তোমাকে আর আমি ভালবাসি না।"

"নোরা! তুমি ঠিক বলিতেছ? ঠিক তোমার মন বুঝিয়াছ?

"হাঁ, ঠিক বুঝিয়াছি। তোমাকে আর ভালবাসি না, তাই তোমার গৃহে আর আমি থাকিব না।"

বড় ব্যথিত স্বরে হেল্‌মার কহিলেন "নোরা! বলিতে পার তোমার ভালবাসা আমি কিসে হারাইয়াছি?"

নোরা উত্তর করিল, "হাঁ পারি। আজ এই রাত্রিতেই আমি বুঝিয়াছি। তোমাকে যা আমি এতদিন ভাবিয়াছিলাম, তুমি তা নও।"

"ভাল বুঝিলাম না, পরিষ্কার বুঝাইয়া বল।"

নোরা কহিল, "ক্রগষ্ট্যাডের পত্র পড়িয়া আমি ভাবিয়াছিলাম, তুমি ওর কাছে মাথা হেঁট করিবে না, জিদ করিয়া বলিবে, 'তোমার যা খুসী কর—ইচ্ছা হয় সকলে এ কথা জানাও'—"

"ভাল, নিজের স্ত্রীর নাম যদি এই কলঙ্কে আ[মি] সমর্পণ করিতাম—"

নোরা বাধা দিয়া বলিল, "আমার স্থির বিশ্বাস ছি[ল] নিজের মাথায় এই কলঙ্ক তুমি নিবে, তুমি বলিবে, আমি অপরাধী। কিন্তু তাহা আমি করিতে দিতাম না। আ[র] তোমার যাহাতে অতটা ত্যাগ স্বীকার না করিতে হয়, ত[জ্জ]ন্য আমি মরিতেও প্রস্তুত হইয়াছিলাম।"

হেল্‌মার কহিলেন, "নোরা তোমার সুখের জন্য দিব[া] রাত্র আমি পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত, তোমার জন্য সক[ল] দুঃখ সকল অভাব সহিতেও প্রস্তুত,—কিন্তু কোনও পুরু[ষ] যাকে বড় ভালবাসে, তার জন্যও তার মর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিত[ে] পারে না।"

"অনেক নারী তাহা করিয়াছে। যাহা হউক, যে রক[ম] পুরুষের জীবন-সঙ্গিনী আমি হইতে পারি, তোমার মনে[র] ভাব যাহা বুঝিয়াছি, কথা যেরূপ শুনিতেছি, সে রকম পুর[ুষ] বলিয়া তোমাকে আর মনে করিতে পারি না। আমার জ[ন্য] নয়,—তোমার নিজের মানমর্য্যাদার জন্য তোমার [ভয়] যখন দূর হইল, তখনই তুমি এই গুরুতর ব্যাপারটি তু[চ্ছ] করিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিলে। তখনই আবার আ[মি] তোমার আদরের খেলার পুতুলটি হইলাম। তখন দুর্ব্ব[ল] বলিয়া দ্বিগুণ যত্নে ভবিষ্যতে তুমি তাকে রক্ষা করি[বে] ভাবিলে। টর্‌ভাল্ড! সেই মুহূর্ত্তে আমি বুঝিলাম গত আ[ট] বৎসর যাবৎ একেবারে অপরিচিত একটি লোকের সঙ্গে আ[মি] রহিয়াছি, তিনটি সন্তান তার গর্ভে ধরিয়াছি। এক[থা] চিন্তাও আমি করিতে পারি না!—যখনই মনে হয়, টুক[রা] টুকরা আপনাকে আপনার ছিঁড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে।"

হেল্‌মার বড় ব্যথিত স্বরে কহিলেন, "নোরা, বুঝিয়া[ছি] দুজনের মধ্যে বড় বিষম একটা ভেদ হইয়া গিয়াছে। কি[ন্তু] ইহার প্রতিকার কি কিছু হয় না?"

"এখন এই অবস্থায় আর আমি তোমার স্ত্রী নই।"

"আমার চিত্তের এমন বল আছে যে অন্য রকম মা[নুষ] আমি হইতে পারি।"

"হয় ত তোমার খেলার পুতুল দূরে চলিয়া গেলে পারিবে।"

"নোরা! নোরা!—সত্যই কি আমাদের ছাড়াছাড়ি হইবে? না না, একথা যে চিন্তাও আমি করিতে পারি না!"

"এই জন্য এই ছাড়াছাড়ি আরও প্রয়োজন।"

এই বলিয়া নোরা তার ঘরে গিয়া একটি ব্যাগ হাতে লইয়া বাহির হইল।

হেল্‌মার আকুল স্বরে কহিলেন "নোরা! নোরা! আজ নয়—এখন নয়। ভাল, কাল তুমি যাইবে,—আজ থাক!"

"না না, অপরিচিত লোকের গৃহে রাত্রি আমি কাটাইতে পারি না।"

"নোরা! অন্ততঃ—ভাইবোন যেমন এক বাড়ীতে থাকে, তেমন ভাবেও কি আমরা একত্র থাকিতে পারি না?"

"না, সে ভাবে বেশী দিন থাকা যাইবে না। আমি চলিলাম। ছেলে মেয়েদের সঙ্গেও আর দেখা করিব না। তারা আমার অপেক্ষা ভাল হাতেই রহিল। এখন এ অবস্থায় আমি তাদের কেহই নই।"

"নোরা! কখনও কি—"

"জানি না! এ সম্বন্ধে কিছুই আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

"কিন্তু তুমি আমার স্ত্রী। এখনও স্ত্রী—চিরকালই স্ত্রী থাকিবে।"

নোরা উত্তর করিল, "স্ত্রী যখন স্বামীর গৃহ ত্যাগ করে, শুনিয়াছি আইনে স্বামী স্ত্রীর প্রতি সকল দায়িত্ব হইতে মুক্তিলাভ করে। যাহা হউক, আমি তোমাকে মুক্তি দিতেছি। পরস্পরের প্রতি কোনও দায়িত্বে তুমি কি আমি—কেহই আর আবদ্ধ নই। দুজনেই এখন সমান মুক্ত—সমান স্বাধীন। এই নেও তোমার বিবাহের অঙ্গুরী,—আমার অঙ্গুরীও আমাকে ফিরাইয়া দেও।"

"এতদূর পর্য্যন্ত যাইবে নোরা?"

"হাঁ।"

"ভাল, এই নেও তবে।"

"বেশ হইল। সব আজ শেষ হইল।"

হেল্‌মার যারপরনাই ক্ষুব্ধস্বরে কহিলেন, "সব শেষ হইল—সব শেষ হইল! নোরা কখনও কি আমার কথা চিন্তা করিবে না?"

নোরা উত্তর করিল, "তোমার কথা—ছেলেপেলের কথা—এই গৃহের কথা—হাঁ, অনেক সময় চিন্তা করিব বই কি!"

"তোমার কাছে চিঠি লিখিব নোরা?"

"না।"

"যদি তোমার অভাব কখনও হয়, কোনও সাহায্যও করিব না?"

"না, অপরিচিত লোকের কোনও সাহায্য আমি গ্রহণ করিতে পারি না।"

"নোরা! চিরদিনই কি তোমার কাছে এমন অপরিচিত থাকিব? কখনও কি একটু পরিচিত তোমার হইব না?"

"টরভাল্ড! যদি তা হয়, অসম্ভব একটা অলৌকিক ব্যাপার তখন ঘটিল বলিতে হইবে।"

"কি সে অলৌকিক ব্যাপার!"

"দুজনকেই এমন বদলাইতে হইবে—না টরভাল্ড, এরূপ অলৌকিক ঘটনায় আমার কোনও আর বিশ্বাস নাই।"

হেল্‌মার কহিলেন, "আমি বিশ্বাস করি। দুজনেই আমরা সত্যই এমন বদলাইব যে—"

"যদি হয়, তখনকার সেই মিলনই আমাদের সত্য বিবাহ হইবে।"

এই বলিয়া নোরা ব্যাগটি হাতে লইয়া চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত—সাগরকামিনী—এলিডা।

এই নাটক খানির নাম—সাগরকামিনী (The Lady from the Sea),—নায়িকা এলিডা নরওয়ে দেশের সাগর তীরবর্ত্তী কোনও আলোক-মঞ্চ রক্ষকের কন্যা। অধিক লোক সেখানে ছিল না,—সাগরতীরে থাকিয়া, সাগর দেখিয়া সাগরে স্নান করিয়া এলিডা একরূপ সাগরগতপ্রাণা হইয়া পড়ে। একদিন একখানি জাহাজ সেখানে দেখা দিল। একটি যুবক নাবিক কর্ম্মচারী সেই জাহাজে আসিল। এই নাবিকের জীবনও সাগরেই কাটিতেছে।—নাবিকের সঙ্গে এলিডার পরিচয় হইল। পরস্পরের প্রতি দুই জনেই প্রবল একটা সমপ্রাণতাজাত আকর্ষণ অনুভব করিল। দুইজনে বিবাহে প্রতিশ্রুত হইল। কোনও কারণে এই নাবিক জাহাজের কাপ্তেনকে সহসা একদিন হত্যা করিল,—সেখানে আর থাকা বিপজ্জনক বুঝিয়া এলিডাকে সকল কথা বলিয়া গেল। যাইবার সময় এলিডার অঙ্গুরী নিয়া তাহার অঙ্গুরীর

গন্ধে একত্র করিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিল,- কহিল, "সাগরিক্ জীবনে আমরা দুইজনেই বিবাহিত হইলাম। এই বিবাহের সত্যে স্থির থাকিও। আমি আবার আসিব, আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইব।"

নাবিক চলিয়া গেল। এলিডা দেখিল, অজ্ঞাতনামা অজ্ঞাতকুলশীল এই নাবিক হইতে যেন অপার্থিব রহস্যময় একটা মোহের প্রভাব তার চিত্তে আসিয়া পড়িয়াছে। সাগররঙ্গিণী সাগরবিহারিণী এলিডা—সাগরে যেন কি এক অসীম রহস্য সে দেখিত,—তার চিত্ত সাগরের পানেই আকৃষ্ট হইত। আবার এই অসীমতা ও রহস্যের কথা মনে হইলেই কেমন একটা আতঙ্কে সে শিহরিয়া উঠিত। তার মনে হইত, এই নাবিক যেন সাগরেরই মূর্ত্তি, তেমনই কি এক অসীম রহস্য তাহাতে আছে। ইহার দিকেও তার চিত্ত তেমনই টানিত, আবার কখনও কেমন একটা ভয়ে সে শিহরিয়া উঠিত। নাবিক চলিয়া গিয়াছে,—আকর্ষণ অপেক্ষা ভয়ের ভাবটাই ক্রমে এলিডার চিত্তে প্রবল হইয়া উঠিল। নাবিককে সে ভুলিতে চেষ্টা করিল। ইহার সঙ্গে বিবাহের পণ হইতে মুক্তিলাভেরও একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা তার জন্মিল। এলিডা নাবিককে পত্র লিখিয়া জানাইল,—তাহার সঙ্গে এই পণ হইতে আপনাকে সে মুক্ত করিয়া নিতেছে এবং তাহাকেও মুক্তি দিতেছে। কিন্তু নাবিক এই মুক্তি স্বীকার করিল না। পত্রের উত্তরে এ সম্বন্ধে কোনও কথাই তুলিল না। ক্রমে তিনবার এলিডা মুক্তির অভিপ্রায় তাহাকে জানাইল,—কিন্তু একবারও নাবিক সেই মুক্তি স্বীকার করিল না। শেষে অনেকদিন আর কোনও পত্র তার আসিল না। এলিডা প্রায় তাকে ভুলিয়া নিশ্চিন্ত হইল, আপনাকে মুক্ত বলিয়াই ধরিয়া নিল।

কিছুকাল পরে এলিডার পিতার মৃত্যু হইল। সেই জনশূন্য স্থানে একা থাকা তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। ব্যাঙ্গেল নামক এক ডাক্তার নিকটস্থ কোনও নগরে ব্যবসায় করিতেন। এই সময় তাঁহার পত্নী বিয়োগ হইল। মাতৃহীনা দুইটি কন্যার মাতৃত্বের ভার নিতে পারে এবং তাঁহার শূন্য গৃহের গৃহিণী হইতে পারে, এইরূপ একটি নূতন পত্নী তিনি খুঁজিতে ছিলেন। এলিডাকে তাঁহার পছন্দ হইল, বিবাহের প্রস্তাব তিনি করিলেন। এলিডারও তখন এইরূপ আশ্রয়ের বড় প্রয়োজন হইয়াছিল—সে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিল। কিন্তু একথাও জানাইল যে পূর্বে এক ব্যক্তির প্রতি তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। ডাক্তার ব্যাঙ্গেল সেই ব্যক্তি কে, তাহার সঙ্গে এলিডার সম্বন্ধ ঠিক কিরূপ ছিল, কিছুই জানিতে চাহিলেন না। এলিডা সরল ভাবে এই কথা তাঁহাকে জানাইয়াও তাঁহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত, ইহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। ডাক্তার ব্যাঙ্গেলের সহিত এলিডার বিবাহ হইল। কিন্তু বিবাহের কিছুকাল পরে—এলিডার তখন গর্ভাবস্থা—সেই নাবিকের স্মৃতি এলিডার চিত্তে প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিল,—তাহার মূর্ত্তি যেন সর্ব্বদা সে চক্ষের উপরে দেখিত। সেই মোহ—সেই ভয়—সব আবার ফিরিয়া আসিল। এলিডার একটি পুত্র হইল অল্পদিনের মধ্যেই পুত্রটি মারা গেল। ইহার পর এলিডা স্বামীর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ একেবারে ত্যাগ করিল।

তাঁহার গৃহেই সে রহিল বটে, কিন্তু একেবারে পৃথক ভাবে থাকিত। সপত্নী কন্যাদের প্রতিও কোনও স্নেহ সে দেখাইত না। ডাক্তার ব্যাঙ্গেল্ এলিডাকে যারপরনাই স্নেহ করিতেন। সে যাহাতে সুখে থাকে, তার জন্য সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকিতেন। কিন্তু এলিডার এই বিরাগের ভাব দূর হইল না। বড় একটা বাতিকের মত এই হইল (?) প্রত্যহ সে সমুদ্রে গিয়া অনেকক্ষণ সমুদ্র জলে স্নান করিত। কেন যে এইরূপ হইয়াছে, তাও এলিডা স্বামীকে বলিল না। এই ভাবে আরও কয়েক বৎসর চলিয়া গেল। সেই নাবিকের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ও বিচ্ছেদের পর মোটের উপর দশ বৎসর কাটিয়া গেল।

এই সময়ে কোনও সূত্রে এলিডা শুনিতে পাইল সে নাবিক শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে, আসিয়া এলিডাকে দাবী করিবে। এলিডার অশান্তি ও অস্থির ভাব দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। একদিন স্বামীকে সে সকল কথা জানাইল ডাক্তার ব্যাঙ্গেল এলিডাকে যারপরনাই স্নেহ করিতেন এলিডার এই মানসিক দুর্গতির কথা শুনিয়া প্রাণে তিনি বড় ব্যথা পাইলেন, এবং সংকল্প করিলেন এই বিদেশী নাবিকের ঐন্দ্রজালিক প্রভাব হইতে স্ত্রীকে তিনি রক্ষা করিবেন।

একদিন সত্য সত্যই সেই নাবিক আসিয়া উপস্থিত হইল,—এলিডার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, তাঁহাকে (?) নিতে আসিয়াছে। এলিডা বড় ভয় পাইল। ভ

সে পলাইয়া আসিতে চাহিল। কিন্তু নাবিকের সেই মোহপূর্ণ দৃষ্টি যেন তাহাকে সেই স্থানে বাঁধিয়া রাখিল। এমন সময় ডাক্তার ব্যাঙ্গেল আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"ব্যাঙ্গেল! আমাকে রক্ষা কর—রক্ষা কর!" বলিয়া এলিডা তার স্বামীকে গিয়া জড়াইয়া ধরিল। এলিডার কথায় ক্রমে ব্যাঙ্গেল বুঝিতে পারিলেন, এই সেই নাবিক। নাবিককে তিনি কঠোর স্বরে বলিলেন, এলিডা তাঁহার স্ত্রী, তাঁহার আশ্রয়ে তিনি তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। নাবিকের কোনও অধিকার এলিডার উপরে নাই। অতএব সে দূর হইয়া যাউক।

নাবিক টলিল না, দৃঢ়স্বরে কহিল, "এলিডার উপরে প্রথম দাবী আমার! আমাদের সেই অঙ্গুরীর কথা কি এলিডা আপনাকে বলে নাই?"

ব্যাঙ্গেল উত্তর করিলেন, "হাঁ, বলিয়াছে। তার কি? তাঁহাতে পরস্পর বিবাহের একটা অঙ্গীকার মাত্র হইয়াছিল। সে অঙ্গীকারের পণ হইতে যে এলিডা আপনাকে মুক্ত করিয়া নিয়া ছিল, ইহা তোমার অবিদিত নাই।"

"সেই ঘটনা আমরা বিবাহ বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম।"

এলিডা বলিয়া উঠিল, "না—না! আমি সে কথা স্বীকার করি না। তোমার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ জীবনে আমার হইতে পারে না। যাও যাও! ওভাবে আমার দিকে চাহিও না।"

ব্যাঙ্গেল কহিলেন, "সেই একটা ছেলেখেলা হইয়াছিল, তাতেই কি তুমি মনে কর, এলিডার উপরে তোমার কোনও দাবী হইতে পারে?"

নাবিক উত্তর করিল, "আপনি যে ভাবে বলিতেছেন, সেভাবে কোনও দাবী আমার হইতে পারে না—ইহা সত্য।"

"তবে আর কেন? তুমি কি মনে করিতেছ, এলিডার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে তুমি আমার নিকট হইতে লইয়া যাইতে পারিবে?"

"না, তাতে লাভই বা কি? এলিডা স্বেচ্ছায় আমার কাছে আসিবে। স্বেচ্ছায় আসিলেই সে আমার হইতে পারে।"

এলিডা কাঁপিয়া উঠিল, আপন মনে কহিল, "স্বেচ্ছায়—স্বেচ্ছায় যাইব!"

নাবিক কহিল, "এলিডা! কাল রাত্রি পর্য্যন্ত তোমাকে আমি সময় দিলাম। ভাবিয়া দেখ, আমার সঙ্গে আমার সাগরবিহারের সঙ্গিনী হইয়া তুমি যাইবে কি না। যদি যাইবে বলিয়াই তোমার মন স্থির হয়, কাল রাত্রিতেই আমার সঙ্গে যাত্রা করিতে প্রস্তুত থাকিও। আর যদি না যাইতে চাও, আমাদের সকল সম্বন্ধ কালই শেষ হইবে। আর আমি আসিব না। কি করিবে, বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখ। যদি যাও, কাল রাত্রিতেই তোমাকে আমি লইয়া যাইব।"

এ বলিয়াই নাবিক চলিয়া গেল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে এলিডা ডাক্তার ব্যাঙ্গেলকে বলিলেন, "আজ আমার মনের সব কথা তোমাকে খুলিয়া বলিব।"

"হাঁ, বল।"

এলিডা কহিল, "এটা বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা যে আমরা দুইজনে বিবাহ সম্বন্ধে মিলিত হইয়াছিলাম।"

"এ কি বলিতেছ এলিডা?"

"ঠিক কথাই বলিতেছি। যে ভাবে আমরা মিলিয়াছিলাম, তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল দুঃখ।"

"কি ভাবের কথা তুমি বলিতেছ?"

এলিডা কহিল, "শোন ব্যাঙ্গেল, মিথ্যার ছলনায় আমরা দুজনেই আপনাদের ফাঁকি দিয়া রাখিয়াছি, পরস্পরকেও ফাঁকি দিয়া চলিতেছি। কিন্তু সব বৃথা, আর তা পারি না!"

ব্যা। মিথ্যা ছলনায় ফাঁকি দিতেছি! সে কি?

অন্ততঃ সত্য গোপন করিয়া চলিতেছি। সত্য—একেবারে সোজা নির্ভাজ সত্য এই যে তুমি আমাকে কিনিয়া আনিয়াছ।

ব্যা। কিনিয়া আনিয়াছি! কিনিয়া আনিয়াছি বলিতেছ!

এ। আমার ত্রুটিও তোমার চেয়ে কম হয় নাই। এই কেনা বেচার ব্যাপারে আমারও ভাগ আছে। তুমি কিনিতে গিয়াছিলে, আমি তোমার কাছে আপনাকে বিক্রয় করিয়াছিলাম।

ব্যা। এলিডা! কোন্ প্রাণে আজ এ সকল কথা বলিতেছ?

এ। কেনাবেচা ছাড়া আর কি বলিতে পারি? তোমার গৃহশূন্য হইয়াছিল, সেই শূন্যতা তুমি সহিতে পারিতেছিলে না, একটি স্ত্রী খুঁজিতেছিলে।

ব্যা। কেবল আমার জন্য স্ত্রী নয়, আমার কন্যাদের জন্যও মাতা খুঁজিতেছিলাম।

এ। তাও কতক হইতে পারে। যদিও আমি তাদের উপযুক্ত মাতা হইব কি না, এটা তুমি একেবারেই বিবেচনা কর নাই। দুই একবার মাত্র আমাকে দেখিয়াছিলে, আমার সঙ্গে আলাপ করিয়াছিলে। যাহা হউক, আমার উপরে তোমার খেয়াল পড়িল। ওদিকে আমিও তখন একা—অসহায়—যেন পাথারে ভাসিতেছিলাম। তুমি আসিয়া বলিলে আমরণ আমাকে প্রতিপালন করিবে,—আমিও এই বন্দোবস্তে অমনই রাজি হইলাম।

ব্যা: এলিডা, তোমাকে সত্য বলিতেছি, এ ভাবে তখন আমি কথাটা ভাবি নাই। আমি সরল প্রাণে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আমার গৃহে যা কিছু সুখ সম্পদ আছে, আমার সঙ্গে আর আমার মেয়ে দুটির সঙ্গে তার ভাগিনী তুমি হইবে কি না।

এ। হাঁ, তা তুমি বলিয়াছিলে সত্য। কিন্তু কোনও মূল্যে আমার তা গ্রহণ করা উচিত হয় নাই। আপনাকে এমন করিয়া বিকাইয়া দেওয়া মোটেই আমার ভাল হয় নাই। হীনতম দাসীবৃত্তি—দীনতম দুর্গতিও যদি আমি তখন আমার স্বাধীন ইচ্ছায় বাছিয়া নিতাম, তাও ইহার চেয়ে ভাল ছিল।

ব্যা। এই যে পাঁচ ছয় বৎসর আমরা একত্র বাস করিলাম, ইহা কি তবে তোমার পক্ষে একেবারেই বৃথা হইয়াছে এলিডা ?

এ। না ব্যাঙ্গেল, তা মনে করিও না! তুমি যথেষ্ট অনুগ্রহ আমাকে করিয়াছ। ইহার অপেক্ষা অধিক অনুগ্রহ কেহ কাহারও কাছে পাইতে পারে না। কিন্তু আসল কথা হইতেছে এই যে আমি আমার স্বাধীন ইচ্ছায় তোমার ঘরে আসি নাই। স্বাধীনভাবে বাছিয়া তোমার ভাগ্যে আমার ভাগ্য মিলিত করি নাই।

ব্যা। স্বাধীন ইচ্ছা! স্বাধীন ভাবে বাছাই! মনে হইতেছে, সেই নাবিকও কাল এই কথাই বলিয়াছিল।

এ। হাঁ, সব ঐ কথাটির মধ্যেই রহিয়াছে। ঐ কথাটি আমার জীবনের উপরে যেন নূতন একটা আলো ঢালিয়া দিয়াছে। সেই আলোতেই সব আমি এখন দেখিতেছি।

ব্যা। কি দেখিতেছ ?

এ। আমরা যে এই একত্র বাস করিতেছি, ইহা বিবাহই নয়।

ব্যা। ঠিক! আজকাল আমরা যে ভাবে আছি, তা বিবাহ নয়ই বটে।

এ। আগেও ছিল না, আরম্ভ হইতেই ছিল না। প্রথমকার সেই—তাই হয়ত সত্য বিবাহ হইত।

ব্যা। প্রথমকার? কি প্রথমকার তুমি মনে করিতেছ

এ। আমার সেই প্রথম বিবাহ—ঐ নাবিকের সঙ্গে।

ব্যা। কি বলিতেছ—বুঝিলাম না।

এ। ব্যাঙ্গেল? আর মিথ্যা ছলনায় কাজ নেই আর পরস্পরকে আমরা ফাঁকি দিব না—নিজেদেরও না। এই যে সত্য—ইহা যে আর এড়াইতে পারি না। তার হইব, স্বেচ্ছায় এই অঙ্গীকার করিয়াছিলাম। সে অঙ্গী-কারের দায়িত্ব বিবাহের দায়িত্বেরই সমান। ব্যাঙ্গেল! আ[মি] তোমাকে ছাড়িয়া যাইব।

ব্যা। এলিডা! এলিডা! একি কথা বলিতেছ?

এ। হাঁ, ছাড়িয়াই আমাকে যাইতে হইবে। [যে] ভাবে আমরা মিলিত হইয়াছিলাম, তাহাতে ইহা ব্যতী[ত] আর গতি কিছু হইতে পারে না। ব্যাঙ্গেল, যদি তোমা[কে] ভালবাসিতে পারিতাম বড় সুখী হইতাম। বড় স্নে[হ] ভালবাসারই যোগ্য তুমি। কিন্তু আমি স্পষ্ট বুঝিতেছি—তা কখনও হইবে না।

ব্যা। তবে কি তুমি আইনতঃ ডাইভোর্স (বিবা[হ]বন্ধনচ্ছেদ) চাও?

এ। ভুল বুঝিও না ব্যাঙ্গেল। বাহ্যিক কোনও অ[নু]ষ্ঠানের জন্য 'কেয়ার' আমি মোটেই করি না। এ[স] আপন আপন স্বাধীন ইচ্ছায় আমরা দুজনেই দুজনকে এই বিবাহবন্ধন হইতে মুক্তিদান করি। সেই যে এক বিকিকিনির চুক্তিতে আমরা বদ্ধ হইয়াছিলাম, তা খারি[জ] করিয়া ফেলি।

ব্যা। তারপর? তারপর আমাদের কি হইবে—আমরা কে কোনপথে কি ভাবে চলিব, তা কি ভাবিয়[াছ] এলিডা?

এ। সে যাহা হয় হইবে। ভবিষ্যৎ তার আপন প[থ] খুঁজিয়া নিবে। এখন আমার কথা এই যে আমা[কে] মুক্তি দেও। আমার পূর্ণ স্বাধীনতা আবার আমা[কে] ফিরাইয়া দেও।

ব্যা। এলিডা! এ বড় শক্ত দাবী তুমি করিতে[ছ]

একটু সময় আমি চাই। সব ভাবিয়া তবে আমাকে কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে।

এ।—আর সময় নাই। আজই আমি মুক্তি চাই।

ব্যা। আজই? কেন?

এ। আজ রাত্রিতে সে আসিবে।

ব্যা। তার সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ কি?

এ। মুক্তভাবে—স্বাধীন ভাবে—আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাই। আমি অপরের স্ত্রী, এ বিষয়ে আমার স্বাধীনতা কিছুই নাই—এই ছুঁতার আশ্রয় ধরিয়া আমি থাকিতে চাই না। তাহাতে আমি ঠিক যে কি বাছিয়া নিতে পারি, তা বুঝিতে পারিব না।

ব্যা।—বাছিয়া নিবে! ইহাতে কি বাছিয়া নিবার কিছু আছে?

এ।—বাছিয়া আমাকে নিতেই হইবে। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে একটি পথ আমাকে বাছিয়া নিতেই হইবে। তাকে একা ফিরাইয়া দিব কি তার সঙ্গে যাইব—সম্পূর্ণ স্বাধীনমনে ইহা আমাকে স্থির করিয়া নিতে হইবে।

ব্যা।—তার সঙ্গে যাইবে! একি বলিতেছ এলিডা! তার হাতে তোমার জীবনের ভাগ্য সমর্পণ করিবে?

এ। তোমার হাতে কি একদিন তা করিয়াছিলাম না?

ব্যা।—এ যে একেবারে অপরিচিত। এর সম্বন্ধে কিছুই যে তুমি জান না।

এ।—তুমি তার চেয়েও বোধ হয় অপরিচিত তখন ছিলে। তবু ত তোমার সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছিলাম।

ব্যা।—অন্ততঃ—এইটুকু তুমি জানিতে, আমার সঙ্গে—আমার গৃহে তোমার জীবন কি ভাবে কাটিবে।

এ।—(অন্যমনস্কভাবে) তা ঠিক। ইহার সম্বন্ধে তাও জানি না। তাই ত কেমন ভয় হইতেছে। তবু তার আকর্ষণও কি প্রবল!

ব্যা।—এলিডা! তোমাকে কখনও আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই। এই কথাটি এখন যেন বুঝিতেছি।

এ।—তাই বলিতেছি, আমাকে মুক্তি দেও! সকল বন্ধন হইতে একেবারে মুক্ত করিয়া দেও। আমাকে যা ভাবিয়াছিলে, তা আমি নই। নিজেই তুমি তা এখন বুঝিতে পারিতেছ। আপনাদের স্বাধীন ইচ্ছায়—আপনাদের অবস্থা বুঝিয়া আমরা এখন দুজনেই দুজনকে বেশ ছাড়িয়া দিতে পারি।

ব্যা।—এলিডা! হয়ত তাই ভাল হইবে। কিন্তু আজকার দিন যাক্। হঠাৎ হয়ত বড় একটা ভুল করিয়াই আমরা ফেলিব। ভাল করিয়া ধীর শান্তভাবে সব আমরা ভাবিয়া দেখি। আজ তোমাকে আমি মুক্তি দিয়া এমন ছাড়িয়া দিতে পারি না। তোমারই মঙ্গলের জন্য এই কথা বলিতেছি। আমি তোমার স্বামী,—স্বামী বলিয়া তোমাকে রক্ষা করিবার অধিকার আমার আছে, আমার কর্ত্তব্যও তাই। সেই অধিকারে সেই কর্ত্তব্য আমি পালন করিব।

এ। রক্ষা করিবে? বাহিরের কোনও শক্তি কি আমাকে পীড়ন করিতেছে যে তুমি তাহা হইতে আমাকে রক্ষা করিবে? এই মোহ যে আমার অন্তরের,—কেমন করিয়া তাহা হইতে তুমি আমাকে রক্ষা করিবে!

ব্যা।—এই মোহের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমার সহায়তায় তোমার বল বাড়িবে।

এ।—যদি সেই সংগ্রামে আমার ইচ্ছা থাকিত, তবেই বল বাড়িত। কিন্তু সে ইচ্ছা আমার আছে কিনা, তাই যে জানি না।

ব্যা।—এলিডা! তুমি কি এই বিদেশী নাবিককে ভালবাস?

এ। কেমন করিয়া বলিব? এইমাত্র জানি, যে তার প্রবল একটা মোহ—কেমন একটা ভয়—একটা বড় আকর্ষণ আমাকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। আর——

ব্যা।—আর কি?

এ।—আর মনে হইতেছে, আমার গৃহ তাহারই সঙ্গে হায়! কি সহায়তা তুমি আমাকে করিতে পার? কি প্রতিকার তুমি ব্যবস্থা করিতে পার?

ব্যা।—কাল সে আর এখানে থাকিবে না। তোমার এই বিপদ কাটিয়া যাইবে। ভাল, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কাল তোমাকে আমি মুক্তি দিব,—কাল এই বিকিকিনির চুক্তি খারিজ করিব।

এ। কাল যে মুক্তি একেবারে বৃথা হইবে।

কন্যারা তখন গৃহের দিকে আসিতেছিল। আর কথা হইল না।

রাত্রিতে সেই নাবিক আসিল। দ্বিধায় ভয়ে—মোহে এলিডা যেন পাগলের মত হইয়া উঠিল। একবার সে বলিল, "কেন তুমি আমাকে নিতে চাও? কেন আমাতেই এমন আকৃষ্ট হইয়া তুমি আছ?"

নাবিক উত্তর করিল, "আমি যেমন অনুভব করিতেছি, তুমি কি তেমনই অনুভব করিতেছ না যে আমরা দুজনেই দুজনের সঙ্গে একেবারে বাঁধা।"

"কিসে? সেই প্রতিশ্রুতির জন্য?"

"না,—প্রতিশ্রুতি কাহাকেও বাঁধিয়া রাখিতে পারে না,—পুরুষকেও নয়, নারীকেও নয়। আমি যে তোমার টানে এমন বাঁধা আছি,—তার কারণ ইহাই স্বাভাবিক—ইহার অন্যথা হইতে পারে না।"

ব্যাঙ্গেল সাবধান করিবার জন্য ডাকিলেন,—"এলিডা!"

এলিডা আপন মনে কহিল, "হায়, কিসের এ মোহ—এই অজানা অপরিচিত ভাগ্যের দিকে এমন করিয়া আমাকে প্রলুব্ধ—আকৃষ্ট করিয়া নিতেছে!"

নাবিক কাছে সরিয়া আসিল।

"কি এ! কি চাও তুমি!" এই বলিয়া কেমন আতঙ্কে এলিডা তার স্বামীর পিছনে গিয়া দাঁড়াইল।

নাবিক কহিল, "আমি বেশ বুঝিতেছি এলিডা, আমাকেই তুমি স্বেচ্ছায় বাছিয়া নিবে।"

ব্যাঙ্গেল কহিলেন, "আমার স্ত্রীর এক্ষেত্রে বাছিয়া নিবার কিছুই নাই। তার পক্ষে কি ভাল, আমি বাছিয়া দিব। আমিই তাকে রক্ষা করিব।"

এলিডা অতি উত্তেজিতভাবে কহিল, "না – না, ব্যাঙ্গেল! ইহার সাক্ষাতেই এই কথা তোমাকে বলিতেছি—শোন। তুমি আমাকে ধরিয়া রাখিতে পার, সে ক্ষমতা তোমার আছে,—আমি জানি, সে ক্ষমতা তুমি ব্যবহারও করিবে। কিন্তু আমার মন—আমার মনের সকল চিন্তা—আমার প্রাণের সকল আকাঙ্ক্ষা—কিছুই তুমি বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না। সকল কামনা আমার ঐ অজ্ঞাত ভাগ্যের দিকেই ধাবিত হইতেছে—যার জন্য আমি সৃষ্ট হইয়াছিলাম, যার বিরুদ্ধে তুমি আমার বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছ।"

ব্যাঙ্গেল কহিলেন, "বুঝিয়াছি এলিডা। আমার নিকট হইতে তুমি সরিয়াই যাইতেছ। কি এক অজ্ঞাত রহস্যময় অসীমেরই দিকে তোমার চিত্ত ধাবিত হইতেছে, যা পাইবেনা যাতে একেবারে নিবিড় এক অন্ধকারে তোমাকে ডুবাইবে"

"হাঁ,—তাই—তাই—বটে।"

"রক্ষার আর কোনও উপায় আমি দেখিতেছি না ভাল—তোমাকে মুক্তি দিলাম। তুমি এখন স্বাধীন,—তোমার স্বাধীন ইচ্ছায় তোমার জীবনের পথ তুমি বাছিয়া নেও।"

"মুক্তি দিলে! সত্যই মুক্তি দিলে? এই কি তোমার অন্তরের কথা তুমি বলিতেছ?"

"হাঁ, তাই বলিতেছি।"

"সত্য তুমি তা পার?"

"পারি। কারণ আমি তোমাকে ভালবাসি—বড় গভীর স্নেহে তোমাকে ভালবাসি।"

"এত ভাল তুমি আমাকে বাস?"

"হাঁ, এতদিন একত্র থাকিয়া তোমাকে এমন ভালবাসিতে শিখিয়াছি।"

"আর আমি এমন অন্ধ হইয়াছিলাম যে তা বুঝি[তে] পারি নাই।"

"তোমার চিত্ত অন্যদিকে ধাবিত হইয়াছিল। যাহা হউ[ক] তুমি এখন মুক্ত,—আমার সঙ্গে কোনও বন্ধন [আর] তোমার নাই। তোমার সত্য জীবন আবার তুমি ফিরি[য়া] পাইতে পার। কারণ স্বাধীনভাবে নিজের স্বা[ধীন] দায়িত্বে তোমার জীবনের পথ তুমি এখন বাছিয়া নি[তে] পার।"

"স্বাধীনতায়—নিজের স্বাধীন দায়িত্বে আমার জী[বন] আমি বাছিয়া নিব! এই স্বাধীনতায় সব যে আর এক র[কম] হইয়া গেল"—এই বলিয়া এলিডা কাছে ঘেঁসিয়া [তার] স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিল।

নাবিকের জাহাজে শেষে ফুঁ পড়িল। নাবিক ক[হিল,] "এলিডা! আর সময় নাই। এখনই জাহাজ ছাড়িবে[,] আমাকে যাইতে হইবে। এস আমার সঙ্গে।"

এলিডা কহিল, "আর তোমার সঙ্গে আমি যাইতে প[ারি] না। আমি স্বাধীন—স্বাধীনভাবে আমার ভাগ্য [আমি] বাছিয়া নিলাম। তুমি যাও, আর তোমাকে ভয় [করি] না,—আর সে মোহের আকর্ষণ আমার নাই। যা[ও,] বৃথা আর আমাকে প্রলোভিত করিও না।"

"বিদায় তবে মিসেস্ ব্যাঙ্গেল! আজ অবধি

আমার কেহ নও—জীবন-সমুদ্রে নৌকাভঙ্গের একটা স্মৃতি মাত্র!" এই বলিয়া নাবিক চলিয়া গেল।

ব্যাঙ্গেল কহিলেন, "এলিডা! এ কি হইল? এ পরিবর্ত্তন তোমার সহসা কিসে ঘটল?"

এলিডা উত্তর করিল, "বুঝিতে পারিলে না? বন্ধনমুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে বাছিয়া নিতে পারিলে আমি যে ইহাই বাছিয়া নিব। অজানা ঐ ভাগ্য—বাছিয়া নিবার স্বাধীনতা আমার ছিল, তাই অনায়াসে ত্যাগ করিতে পারিয়াছি। আজ সত্যই তোমার স্ত্রী হইয়া আবার তোমার কাছে আমি আসিতে পারিলাম,—কারণ স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে আপন দায়িত্বে আজ তোমার সঙ্গই বাছিয়া নিলাম। তোমার কন্যা দুটি—এখন তারা আমারও কন্যা হইবে।"

বিবাহ সম্বন্ধে পূর্ণ স্বাধীনতাবাদীদের আদর্শ ঠিক কিরূপ, সেই কথা সকলে ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন, তাই ইবসেনের নাটক হইতে এই দুইটি দৃষ্টান্ত হয়ত কিছু অতিরিক্ত দীর্ঘ ও সূক্ষ্মভাবেই—উদ্ধৃত করিলাম। এইদিকের কথা এই হইল। এখন সমাজশক্তি ও সমাজ-নীতি এবং সেই শক্তির অধিকার ও সেই নীতির বন্ধনের প্রয়োজন যাহারা স্বীকার করেন,—তাঁহাদের পক্ষ হইতে এ সম্বন্ধে কি বলিবার আছে পরবর্ত্তী সংখ্যায় তাহার আলোচনা করিব।

কবিতার প্রতি।

কৃপা কটাক্ষেতে তুমি চেয়েছ যে দিন
হে সুন্দরী! হে কবিতা রাণি! মোর পানে,
সে অবধি নিরবধি আনন্দের বীণ
হৃদিমাঝে ঝঙ্কারিছে সুমধুর তানে।
সে অবধি অনুখণ চঞ্চল পরাণ,
মোর পাশে সবি চির নবীনের প্রায়,
তটিনীর কুলুরব, বিহগের গান,
সে অবধি কত কথা কয়ে মোরে যায়!
সে অবধি চাঁদিমার আলোক নিকর,
মলয় পবন,—তারা কত অর্থে ভরা!
বিমান, বনানীরাজি কত যে সুন্দর।
অসীম সৌন্দর্য্যে ঘেরা সারা বসুন্ধরা।
নয়নে পড়ায়ে দে'ছ কোন যে অঞ্জন,—
যাহা হেরি সবি যে গো নয়ন-রঞ্জন!

শ্রীঅজিতকুমার সেন

শ্যামে হিন্দু-উৎসব।

শ্যাম এখন বৌদ্ধের দেশ—পীত-পরিচ্ছদধারী বৌদ্ধ শ্রমণদিগের সংখ্যাধিক্য বশতঃ "পীত-পরিচ্ছদের দেশ" বলিয়াই অভিহিত। প্রসিদ্ধ মোঙ্গলীয় জাতির 'শান' নামক সম্প্রদায় বিশেষই এখন শ্যামের প্রধান অধিবাসী। শানদিগের আদি বাসস্থান চীনের কিউলঙ পর্ব্বত। সেখান হইতে তাহারা চীন, তিব্বত, আসাম, ব্রহ্ম, পেগু অধিকার করিয়া ক্রমে শ্যাম দেশে আসিয়া প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। কোনও কোনও প্রত্নতাত্ত্বিকের এইরূপ অনুমান যে, এই 'শান' জাতির বাস হইতেই দেশের নাম 'শ্যাম' হইয়াছে—'শানের দেশ' প্রথমে 'শানদেশ' এবং পরিশেষে 'শ্যামদেশ' নামে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এ অনুমান ভ্রমাত্মক বলিয়াই মনে হয়। যেহেতু শ্যাম অতি প্রাচীন দেশ, শান জাতির আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতেই ইহা শ্যাম নামে প্রখ্যাত হইয়া আসিতেছে। বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন, 'খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দে বাঙ্গালী বীরগণ যখন তাম্রলিপ্ত হইতে পোতারোহণে যাত্রা করিয়া যব, বলী, লম্বক, সুমিত্রা প্রভৃতি

পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বিশাল হিন্দু উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, তখন তাঁহাদেরই এক সম্প্রদায় ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তবর্ত্তী দেশ সমূহের সহিত এই দেশও করায়ত্ত করিয়া লয়েন এবং শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির ন্যায় ইহার শ্যাম-শোভা দর্শন করিয়া ইহাকে 'শ্যামলদেশ' নামে পরিচিত করিয়া তুলেন। সেই 'শ্যামলদেশ'ই কালক্রমে কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া 'শ্যামদেশ' আখ্যালাভ করিয়াছে। কিন্তু পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রাদির আলোচনা করিলে জানা যায়, শ্যাম আরও অধিক প্রাচীন জনপদ। মহাভারতীয় যুগে মণিপুর রাজ্য যখন রাজা চিত্রভানু ও বভ্রুবাহনের সুশাসনগুণে গৌরবের উচ্চ চূড়ায় অধিরূঢ় হয়, তখনও 'শ্যাম' নামেও রাজ্য বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন ভারত বর্ত্তমান ভারত হইতে বহুগুণে বর্দ্ধিতায়তন ছিল। তাহার একদিকে কাম্বোজ, কেকয়, গান্ধার, বাহ্লীক, চীন, মহাচীন আর অন্যদিকে মণিপুর, ব্রহ্ম, শ্যাম, কাম্বোজ (কাম্বোডিয়া), অনম্ (আনাম), মলয়, সিংহপুর (সিঙ্গাপুর) প্রভৃতি প্রদেশ সকল বিরাজ করিত। সেই বিশাল ভারতের সকল দিক পূর্ণ করিয়া বিরাট হিন্দুসমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর যব, বলী, লম্বক প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ সেই ভারতেরই উপনিবেশ বলিয়া পরিগণিত হইত। একথার বহু সাক্ষ্য প্রমাণ বর্ত্তমান থাকিলেও, আমরা সেই সকল দেশের অস্থিমজ্জাগত হিন্দু প্রভাবকেই ইহার অকাট্য ও শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া মনে করি। কোনও দেশ যুগযুগান্ত ব্যাপিয়া জাতি বিশেষের প্রভাবাধীন না থাকিলে সেই জাতির ভাবভঙ্গি, রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, উৎসব অনুষ্ঠান প্রভৃতি কখনই তদ্দেশবাসীর প্রকৃতিগত ও ধর্ম্মানুমত হইতে পারে না। শ্যাম স্মরণাতীতকাল হইতে বহুশত বৎসর ভারতের অঙ্গগত ও হিন্দুর শাসনাধীন ছিল বলিয়াই, আজ ভিন্ন জাতির ও ধর্ম্মাবলম্বীর অধ্যুষিত হইয়াও, পূর্ব্বের হিন্দু আচার অনুষ্ঠানাদি ত্যাগ করিতে পারে নাই। অজ্ঞাতেই হউক আর জ্ঞাতসারেই হউক, শ্যামের বর্ত্তমান শানজাতি হিন্দুর অনেক রীতি প্রকৃতিই নিজস্ব করিয়া লইয়াছে এবং কিছু কিছু রূপান্তরিত ও নিজের ধর্ম্মানুমত করিয়া লইয়া প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে। শ্যামের সকল ব্যাপারই প্রায় ভারতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত। ভারতের বর্ণমালা শ্যামবাসীর বিদ্যাশিক্ষার সহায়তা করে, ভারতের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা তাহাদের পীড়া নিবারণ করিয়া থাকে। তাহারা মনুসংহিতার অনেক বিধি নিষেধ মান্য করে এবং লেখাপড়ায়, কথাবার্ত্তায় বহুল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। শ্যামের ভাষা চিনীয় ভাষার অনুরূপ হইলেও, তাহাতে শত শত ভারতীয় শব্দ মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। শানজাতির 'আমাট', 'আটপ', 'ওয়াট', 'মাহুট', 'সটাঙ্ক', শব্দ যে যথাক্রমে 'আমাত্য', 'আতপ', 'মঠ', 'মাহুত' 'শতাঙ্ক' শব্দের প্রতিরূপ, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। এতদ্ব্যতীত 'নাগ', 'শালা' প্রভৃতি অনেক আবিষ্কৃত সংস্কৃত শব্দও তাহাদের ভাষার সৌষ্ঠবসাধন করিয়াছে। শ্যামের বৌদ্ধ শ্রমণেরা ভারতীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ন্যায়, তালপত্রে লৌহ লেখনীর সাহায্যে প্রাচীন পুঁথির (বৌদ্ধশাস্ত্রাদির) অনুলিপি প্রস্তুত করেন এবং সেই পুঁথি হইতে অপ্রচলিত প্রাচীন ভাষায় লিখিত বচন বা মন্ত্রাবলী আবৃত্তি করিয়া উৎসবাদি সমাধা করিয়া থাকেন। তাঁহারা হিন্দুর রামায়ণ পাঠও শ্রবণ করেন এবং শুভকার্য্যে, বিঘ্ননাশের জন্য, হিন্দুর বিশ্বেশ্বর শিবের আরাধনা করিয়া থাকেন। শ্যামের প্রায় সকল কার্য্যেই এইরূপ হিন্দুপ্রভাব পরিলক্ষিত হয় আর আজ আমরা যে উৎসব বিশেষের কথা লিপিবদ্ধ করিতেছি, তাহাও সেইরূপ হিন্দু প্রভাবের নিদর্শন ভিন্ন কিছুই নহে। এই উৎসব এখন বৌদ্ধভাবে বিভাবিত, কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া গেলেও, ইহা যে সেই প্রাচীন হিন্দু-উৎসবের নূতন বৌদ্ধ-সংস্করণ, তাহা সহজেই, পাঠমাত্রেই সাধারণের বোধগম্য হইবে।

আমাদের আলোচ্য এই উৎসবের নাম 'হল-কর্ষণোৎসব'। প্রতি বৎসর বসন্ত ঋতুতে এই উৎসব আরম্ভ হয়। প্রথম বারিপাত হইলেই শ্যামবাসীরা ইহার জন্য ব্যাগ্র হইয়া উঠে। কারণ ইহার অনুষ্ঠান ব্যতীত শ্যামের কোনও কৃষকই ক্ষেত্রের কর্ষণ ও ধান্যাদির বপন রোপণে সমর্থ হইবে পারে না। শ্যামের রাজা বা রাজকুমার স্বহস্তে হলচালন করিয়া এই উৎসব সমাধা করেন। প্রথমে রাজাদেশে বৌদ্ধশ্রমণ বা ব্রাহ্মণ-দৈবজ্ঞ উৎসবের দিনক্ষণাদি নির্দ্ধারণ করেন এবং একজন রাজকর্ম্মচারী, উৎসবের পূর্ব্বদিন নগর প্রাচীরের বহির্ভাগে গমন করিয়া স্থান-নির্ব্বাচন ও আবশ্যক আয়োজনাদি সম্পন্ন করিয়া আইসেন। কর্ষণের জন্য একটী সমতল, সমচতুষ্কোণ ভূমিখণ্ড মনোনীত ও উহার একপ্রান্তে

মৃত্তিকা ও বংশাদির একটি মঞ্চ বা বেদী, আর অন্তপ্রান্তে তিনটি ধ্বজদণ্ড প্রোথিত করা হয়। বেদীর উপরিভাগ রক্তবর্ণ বস্ত্র বিশেষে সমাচ্ছাদিত এবং প্রত্যেক ধ্বজদণ্ডের শীর্ষদেশে একটি রক্তপতাকা ও গাত্রে পাঁচটি পুষ্পপত্র ও হরিৎবস্ত্রাদির চতুষ্কোণ সুন্দর স্তবক বা গুচ্ছ সন্নিবদ্ধ থাকে। বেদীর অনতিদূরে ক্ষুদ্র একটি গোশালা নির্ম্মিত ও তন্মধ্যে তুষারশুভ্র দুইটি বলীবর্দ্ধ এবং কারুকার্য্যখচিত সুরচিত একখানি লাঙ্গল রক্ষিত হয়। এইরূপে উৎসবের প্রাথমিক অনুষ্ঠান নির্ব্বাহিত হইয়া যায়।

পরদিবস রাজা অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া বহুমূল্য রাজবেশে, ফলফুলাদির চিত্রশোভিত স্বর্ণখচিত পরিচ্ছদ বিশেষে সজ্জিত হন। এবং শিরে শ্বেতবর্ণ বিচিত্র কিরীট ধারণ করিয়া সুবর্ণরঞ্জিত চতুর্দ্দোলায় আরোহণ করেন, তখন আটজন বলবান পুরুষ তাঁহাকে চতুর্দ্দোলা-সহ স্কন্ধে লইয়া ধীরে ধীরে উৎসব ক্ষেত্রাভিমুখে অগ্রসর হয়। চতুর্দ্দোলার অগ্রে ঢোল বাজাইতে বাজাইতে প্রথমে লোহিত পরিচ্ছদধারী একদল বাদক এবং তৎপরে যোদ্ধবেশে সৈনিকদল, পীতপরিচ্ছদে বৌদ্ধশ্রমণগণ ও ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত, নানাশ্রেণীর নরনারীবৃন্দ পরপর শ্রেণীবদ্ধভাবে গমন করে। চতুর্দ্দোলার পশ্চাতে উৎসবোপযোগী দ্রব্যসম্ভার - তিনটি পবিত্র কার্পাস সূত্র, তিনখানি শুভ্রধৌত বস্ত্র, একটি সুরঞ্জিত দীর্ঘ গো-তাড়ন-দণ্ড বা পাঁচনী, একটি প্রকাণ্ড রাজছত্র, একখানি শ্বেত পুষ্পাবৃত অসি, সুগন্ধ পুষ্পমাল্যালঙ্কৃত একটি সুবর্ণময়ী বুদ্ধমূর্ত্তি, পুষ্পভূষিত সুবর্ণরচিত একটিগাভী, কতকগুলি বৃহদাকার আতপত্র, লোহিত পতাকা, তালপাতার পুঁথি প্রভৃতি -হস্তে লইয়া সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ ও পুরোহিতগণ গমন করেন। আর কৃষক, দর্শক ও জনসাধারণ দলেদলে তাঁহাদের অনুগামী হয়। পুরোহিতেরা বার বার শঙ্খ ও শৃঙ্গধ্বনি করিয়া গমনপথ মুখরিত করিয়া তুলেন।

যথাসময়ে রাজা ও তাঁহার সহযাত্রিগণ উৎসবক্ষেত্রে সমাগত হইলে, পুরোহিতেরা বেদীর উপরে যথাযোগ্যস্থলে উৎসব-দ্রব্যগুলি একেএকে রক্ষা করেন এবং পুঁথি হইতে দীর্ঘ দীর্ঘ শ্লোক বা মন্ত্রপাঠ করিয়া পূজা ও প্রার্থনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। গ্রামবাসীরা বৌদ্ধ হইলেও ভূতের প্রাধান্য স্বীকার করে এবং প্রত্যেক শুভানুষ্ঠানে, অনিষ্টের আশঙ্কায়, ভূতাপসরণের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় না। পূজাদিক্রিয়া শেষ হইলেই, একজন পুরোহিত ভূতাপসরণের মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে কর্ষণ-ক্ষেত্র, বেদী ও গোশালা এই তিনটি স্থল পবিত্র সূত্রত্রয়ে পরিবেষ্টিত করিয়া দেন। অতঃপর রাজাকে বেদীর সম্মুখে লইয়া গিয়া, প্রাগুক্ত তিনখানি বস্ত্র হইতে একখানি নির্ব্বাচন ও গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়। বস্ত্রত্রয় পরিমাণে পরস্পর পৃথক হইলেও দেখিতে সম্পূর্ণই একরূপ—এমনভাবে পরিপাটীরূপে রক্ষিত হয় যে, কোনখানি কিরূপ দীর্ঘ বা হ্রস্ব তাহা দেখিয়া স্থির করিতে পারা যায় না। রাজা বিশেষ বিবেচনা না করিয়াই তাহার একখানি গ্রহণ ও নিজের পরিচ্ছদের উপরে ধারণ করেন। এই বস্ত্র নির্ব্বাচন হইতে ভাবী বারিবর্ষণের অবস্থা বা ইতর বিশেষ নির্দ্ধারিত হয়। রাজা যদি ক্ষুদ্র বস্ত্র নির্ব্বাচিত করেন, তবে বুঝিতে হয়—সেবার বৃষ্টির পরিমাণ অধিক হইবে, কৃষকেরা জানুর উর্দ্ধে পরিধেয় বসন উত্তোলন করিয়া ভূমিকর্ষণে বাধ্য হইবে। দীর্ঘবস্ত্রের নির্ব্বাচনে বৃষ্টির অল্পতা ঘটিবে, কৃষকগণ আগুল্ফলম্বিত বস্ত্র পরিধান করিয়াও হলচালনায় সমর্থ হইবে। কিন্তু মধ্য-পরিমাণ বস্ত্র নির্ব্বাচিত হইলে বৃষ্টিপাত অধিকও হইবে না, অল্পও হইবে না, মধ্যপরিমাণেই হইবে, আর কৃষকদিগের পরিধেয় বস্ত্রের উত্তোলন বা অবনমন কিছুরই প্রয়োজন হইবে না।

বস্ত্রনির্ব্বাচনের পরেই কর্ষণোৎসব আরম্ভ হয়। একজন ভৃত্য গোশালা হইতে হল যোজনা করিয়া বলদ দুইটিকে রাজার নিকটে লইয়া আইসে এবং একজন পুরোহিত তাঁহার দক্ষিণহস্তে হলমুষ্টি ও বামহস্তে গো-তাড়ন দণ্ড প্রদান করেন, আর একজন পুরোহিত হলদণ্ডের অগ্রভাগে একটি লোহিত পতাকা, এবং হলদণ্ড ও বলদদ্বয়ের স্কন্ধলগ্ন কাষ্ঠ ফলকের মিলনস্থলে বুদ্ধমূর্ত্তি সন্নিবেশিত করিয়া দেন ও রাজাকে কর্ষণ করিতে মিনতি করেন। রাজা কর্ষণে প্রবৃত্ত হইলে মস্তকে ছত্র ধরিয়া একজন ভৃত্য তাঁহার অনুগামী হয় এবং দক্ষিণপার্শ্বে পতাকাধারী ও বামপার্শ্বে বাদকদল বাদ্য করিতে করিতে গমন করে। সম্মুখে মন্ত্রপূত পবিত্রবারি সেচন করিতে করিতে একজন পুরোহিত অগ্রসর হন। রাজাকে নয়বার সেই নির্দ্দিষ্ট ভূমিখণ্ড কর্ষণ করিতে হয়। কিন্তু তিনবারের পরে, বারিসেচন রহিত করিয়া

পুরোহিত চলিয়া যান এবং নয়জন মহার্ঘ্য বসনভূষণে সজ্জিতা যুবতীস্ত্রীলোক রাজার পশ্চাৎভাগে আসিয়া উপনীত হন তাঁহাদের স্কন্ধে স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত দীর্ঘ বংশদণ্ড (বাঁক) ও উহার উভয়প্রান্তে দুইটি বৃহৎ বেত্রপাত্র (ধামা) রজ্জুযোগে লম্বমান থাকে। একটি পাত্র শ্বেত ও অন্যটী পীতবর্ণে রঞ্জিত, কিন্তু দুইটিই মন্ত্রপূত পবিত্র ধান্যে পরিপূর্ণ। স্ত্রীলোকগণ সেই পাত্রদ্বয় হইতে মুষ্টি মুষ্টি ধান্য লইয়া কর্ষণপর রাজার পশ্চাতে, ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতে করিতে গমন করেন। ধান্যগুলি এরূপভাবে নিক্ষিপ্ত হয় যে, তিনবার রাজার সহিত ভ্রমণ করিয়া আসিলেই তাহা নিঃশেষিত হইয়া যায়। তখন তাঁহারা কৃষ্টভূমির বহির্ভাগে গমন করেন এবং রাজা আর তিনবার কর্ষণ করিয়া বেদীর নিকটে গিয়া উপবিষ্ট হন।

অতঃপর একজন ভৃত্য বলদ দুইটি পুনর্ব্বার গোশালায় লইয়া যায় এবং বিভিন্ন শস্য ও তৃণবীজপূর্ণ কতকগুলি পাত্র তাহাদের সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধভাবে স্থাপন করে। শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত্ত বলদদ্বয় তৎক্ষণাৎ ভোজনে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের এই ভোজন দেখিয়াই গ্রামবাসীরা শস্যের ভাবী ফলাফল নির্ণয় করে। তাহারা প্রথমে যে শস্য ভোজন করে, সেবার সেই শস্যেরই আধিক্য সূচিত হয়। বলদ দুইটি প্রথমেই যদি ধান্য বা মটর কলাই ভক্ষণ করে, তবে সে বৎসর পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ধান্য বা মটর কলাই উৎপন্ন হইবে। কিন্তু প্রথমে ঘাসের বীজ ভক্ষণ করিলে ধান্যাদি কোনও শস্যই উৎপন্ন হইবে না,—কেবল ঘাসেই সমস্ত ক্ষেত্র আচ্ছন্ন হইয়া যাইবে। যাহা হউক, বলদ দুইটির আহার শেষ হইলে পুরোহিতেরা পূর্ব্ববৎ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে, কৃষ্টভূমি, বেদী ও গোশালা পরিবেষ্টক সূত্র তিনটি ছিন্ন করিয়া দেন, আর তৎক্ষণাৎ সমাগত কৃষকেরা বেগে কৃষ্টভূমিতে গমন করিয়া আগ্রহ সহকারে নিক্ষিপ্ত ধান্যগুলি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। এই ধান্যগুলি সাধারণ ধান্যের সহিত মিশাইয়া বপন করিলে ধান্যের উৎপত্তি অধিক হয়—গ্রামবাসী কৃষকদিগের এইরূপ বিশ্বাস। সুতরাং সংগৃহীত ধান্যগুলি তাহারা অতীব প্রয়োজনীয় বোধে গৃহে লইয়া যায় এবং স্বতন্ত্র পাত্রে বিশেষ যত্নের সহিত রক্ষা করে। এইরূপে গ্রামবাসীর পরম প্রীতিকর ও বিশেষ প্রয়োজনীয় হলকর্ষণোৎসবের পরিসমাপ্তি হয়। রাজা পূর্ব্ববৎ সাড়ম্বরে শ্রমণ পুরোহিত ও অনুচর সহচরদিগের সহিত রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্যামের শান বৌদ্ধদিগের এই উৎসব যে প্রাচীন হিন্দুদিগেরই হলকর্ষণোৎসব তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু সেই উৎসব তাহার মাতৃভূমি এই ভারতবর্ষে এখনও প্রচলিত আছে কিনা, কোনও ভারতীয় হিন্দু নরপতি স্বহস্তে হলচালনা করিয়া অদ্যাপি 'হলকর্ষণোৎসব' সম্পন্ন করেন কিনা, তাহা আমরা অবগত নহি। তবে সার্দ্ধ দ্বি-সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে, রাজা শুদ্ধোদনের সময়ে, কপিলবাস্তু নগরে যে সমারোহে সেই উৎসব সমাহিত হইত তাহা ইতিহাস পাঠে জানিতে পারা যায়। সেখানে প্রতিবর্ষে বর্ষার প্রারম্ভে 'হল-'কর্ষণোৎসব' নির্ব্বাহিত হইত। কপিলবাস্তুর জনসাধারণ, উৎসব উপলক্ষে, নগরের বাহিরে আগমন করিত। সিদ্ধার্থকে সঙ্গে লইয়া রাজা শুদ্ধোদন সেই উৎসবে যোগ দিতেন। কিন্তু কৃষ্টভূমি হইতে মহীলতাদি কীট পতঙ্গের বলে নির্গমন ও পক্ষিকর্তৃক তাহাদের নিষ্ঠুরভাবে প্রাণনাশ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া 'অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ' নীতির ভাবী প্রচারক করুণহৃদয় সিদ্ধার্থ মর্ম্মাহত হন এবং পিতাকে মিনতি করিয়া চিরদিনের মত সেই উৎসব রহিত করিয়া দেন কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় শ্যামের অধিবাসীরা বৌদ্ধ হইয়াও বুদ্ধদেবের অননুমোদিত সেই উৎসব এখনও পূর্ব্বের মত প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীঅঘোরনাথ বসু কবিশেখর

নিবেদন।

তোমার চরণে এসে ফিরি বারবার,
কখন করিবে মুক্ত অবরুদ্ধ দ্বার?
ওই তো গোধূলি এল দিন যায়-যায়,
আঁধারে কেমনে হায়, যাপিব নিশায়?
দুরু দুরু করে মোর শঙ্কিত হৃদয়,
হে কল্যাণি! দাও সুতে সান্ত্বনা অভয়।

স্বর্গীয়া হেমন্তবালা দত্ত

নেতার উপর জুলুম

(১)

সহরের একজন প্রধান নেতা তারিণীবাবুর বাসার কাছে একদল দুষ্ট ছেলের আড্ডা ছিল। ইহারা যে কোন প্রকারে একবার তারিণীবাবুকে একটু বিশেষরূপ জব্দ করিবার জন্য মতলব পাকাইতেছিল। তড়িৎ বিজয় এবং পরেশ নামে তিন যুবক একদিন তাহাদের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া তারিণীবাবুর বাসার উদ্দেশে চলিল।

সেখানে আসিয়া তাহারা তারিণীবাবুর ভ্রাতা নবদ্বীপের অনুসন্ধান করিল। অনুসন্ধানে জানিল, নবদ্বীপ বাসায় নাই—কোথায় গিয়াছে। অগত্যা তাহারা আর একবার তারিণীবাবুর বক্তৃতা শুনিয়া যাইবার ইচ্ছা করিল—যদিও তাহারা ইতি পূর্ব্বে বহুবার সে অমৃতের আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছে।

এইখানে তারিণীবাবু এবং নবদ্বীপের পূর্ব্ব ইতিহাস কিঞ্চিৎ বলা অবশ্যক।

(২)

নবদ্বীপ তারিণীবাবুর কনিষ্ঠ সহোদর। সে যখন নিতান্ত বালক তখন তাঁহাদের পিতা ইহসংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। পূর্ব্বপুরুষের সৌভাগ্যক্রমে পিতার মৃত্যুর পর হইতেই তারিণীবাবু লেখাপড়ায় বিশেষ মনোযোগী হইয়া পড়েন এবং পাঁচ ছয় বছর যাইতে না যাইতেই তিনটা পরীক্ষায় পাশ করিয়া ফেলেন। বি, এ, উপাধি লইয়াও তিনি নিরস্ত হইলেন না। পরীক্ষায় পাশ করিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত হইয়া ছাড়িলেন।

চাকুরী হইবার পরই মা এবং সহোদরকে তিনি সহরে লইয়া গেলেন। মা বায়না ধরিলেন, "বাছা তোমার মস্ত চাকরী হয়েছে, তুমি বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ হয়েছ, এইবার মনের সাধ পূর্ণ কর, বিয়ে করে বউ ঘরে আন।"

ডেপুটিবাবুর মনে কি ছিল তাহা তিনিই জানিতেন,—মুখে বলিলেন, "এত তাড়াতাড়ি কি, মা ? বিয়ে ত কর্‌তেই হবে, আমিও কর্ব্ব। কিন্তু আজকাল যেমন দেখছি, বউ ঘরে এলেই সব মাটি। কেবল বোতলে বোতলে সুগন্ধি তেল মাথায় ঢালা, নভেল পড়া, আর ঝগড়া ক'রে দিন কাটানো। শাশুড়ীর কোন কথাই মান্‌তে চায় না ; আজকাল শাশুড়ীকে বউয়ের দাসী হয়ে থাকতে হয়। আমি এখন ও সব কর্‌তে চাই না। তোমাকে পাঁচ বছর সময় দিচ্ছি। তুমি সকল রকম প্রভুত্ব করে নাও, খাও দাও' তারপর আমি বিয়ে কর্ব্ব।"

মা বলিলেন, "এমন সর্ব্বনেশে কথা ত আর কারুর মুখে শুনিনি। আমি বৌয়ের দাসী হ'য়ে যাব বলে' তুই এখন বিয়ে কর্‌বি না ? তা হলে আমার মরাই ভাল যে।" এই বলিয়া বৃদ্ধা অশ্রুমোচন করিলেন।

প্রজাপতির দূতেরা তারিণীবাবুর মায়ের কাছে হাট বসাইল, কত জায়গার কত ভুবনমোহিনী বালিকার রূপের প্রশংসা কীর্ত্তিত হইতে লাগিল ; কিন্তু বিবাহের কলি ফুটিল না। তারিণীবাবু পাঁচবছরের মেয়াদ কিছুতেই ছাড়িলেন না।

নবীন ডেপুটির উপরি পাওনা যথেষ্ট হইতে লাগিল। ন্যায়পরায়ণতা এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠা তাঁহার যতখানি শিক্ষা হইয়াছিল, অর্থোপার্জ্জনের কৌশল আয়ত্ত হইয়াছিল তদপেক্ষা অনেক বেশী। উপরি পাওনাটা তিনি হাতখরচের জন্য রাখিতেন এবং মাসের মাহিনাটা সাকুল্যে আনিয়া মায়ের হাতে দিতেন। মা সংসারিক খরচের জন্য সামান্যমাত্র ব্যয় করিয়া বাকী সমস্ত জমা করিয়া রাখিতেন—নবদ্বীপচন্দ্রের ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য। বড় ছেলেটি ইন্দ্রতুল্য হইয়াছে বলিয়া ছোটটী যে একান্ত গণ্ডমূর্খ হইবে না, এমন কথা কে বলিতে পারে ? বিশেষতঃ সেই সময়ে কেহ যদি বেচারার বুদ্ধিবৃত্তির নিরপেক্ষ বিচার করিয়া দেখিত, তাহা হইলে ভারবাহী দীর্ঘকর্ণ জন্তুবিশেষ ছাড়া অন্য কোন জীবের সহিত তাহার কোন সাদৃশ্য উপলব্ধি হইত না।

ক্রমে বড় হইলে পর যখন দেখা গেল লেখাপড়া নবদ্বীপের কিছু হইল না, তখন জননী তাহার বিদ্যাবুদ্ধির অভাব দূর করিয়া দিবার জন্য সঞ্চিত অর্থ সমস্ত পুত্রের হাতে দিলেন। নবদ্বীপ টাকা হাতে পাইয়া বরাবর সাহা কোম্পানীতে গিয়া হাজির হইল এবং প্রত্যহই সেখান হইতে নিজের এবং দুই একজন বন্ধুবান্ধবের জন্য পানীয় সরবরাহ করিতে

লাগিল—দেখিতে দেখিতে সে একটা প্রকাণ্ড মাতব্বর ব্যক্তি হইয়া উঠিল। তারিণীবাবু টের পাইয়াও কিছু বলিলেন না; কারণ পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার মেয়াদ; ইতিপূর্ব্বে তিনি মাতা এবং নবদ্বীপের কোন সুখসচ্ছন্দতায় বাধা দিবেন না সাব্যস্ত করিয়াছিলেন এবং সকলের নিকটও তাহাই বলিলেন।

কিছুদিন যাইতে না যাইতেই নবদ্বীপের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িল। হরদম স্ফূর্ত্তি এবং মদ্যপানে তাহার মস্তকের ভিতর যেটুকু মস্তিষ্ক ছিল তাহারও সম্পূর্ণ বিকার উপস্থিত হইল—সে পাগল হইয়া গেল। জননী মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন, বাহিরের লোক তাঁহাদের এত সুখ সহ্য করিতে না পারিয়া নবদ্বীপকে মদ খাওয়াইয়া মাতাল করিয়া অবশেষে পাগল করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে।

ডাক্তারী কবিরাজী চিকিৎসা, অশেষ প্রকারের জপতপ মাদুলীগ্রহণের পর কয়েকবৎসর পরে নবদ্বীপ কতকটা প্রকৃতিস্থ হইল। কিন্তু তাহার চেহারায় যে একটা অদ্ভুত উন্মত্তভাব জন্মিয়াছিল, তাহা কিছুতেই দূর হইল না; এবং আশৈশব সে যে দাদাকে 'ডাডা', ভাতকে 'ভাট', দুধকে 'ডুড' বলিত, তাহার সেই বালভাষিত উন্মত্তাবস্থায় যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল সেইরূপই রহিয়া গেল।

ইতিমধ্যে মেয়াদের কাল পূর্ণ হইল। একদা শুভদিনে, শুভক্ষণে, শুভলগ্নে তারিণীবাবু একটি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া সুন্দরী বালিকার পাণিগ্রহণ করিলেন।

এই সুন্দরী চতুর্দ্দশীর বয়স যখন পঞ্চদশ ছাড়াইয়া ষোড়শে উঠিল, তখন ডেপুটিবাবুর হঠাৎ এত অর্থের প্রয়োজন হইয়া পড়িল যে তাঁহার উপরি আয় কি মাসের মাহিনা হইতে এক কপর্দ্দকও আর পূর্ব্বের মত মায়ের হাতে আনিয়া দিবার সামর্থ্য রহিল না। সুতরাং নবদ্বীপেরও আর একটি পয়সা পাইবার উপায় রহিল না। এদিকে সেকরামহলে তারিণী-বাবুর মস্ত নাম বাহির হইয়া পড়িল।

অল্পদিন পরে জননীর মৃত্যু হইলে এমন ভাবও প্রকাশ পাইল যে তারিণীবাবু আধ-পাগল নবদ্বীপটাকে সংসার হইতে তাড়াইয়া দিবেন; যখন বাজারে সকল দ্রব্যের মূল্য আগুণ এমন সময়ে মাতাল পাগল পুষিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই। কিন্তু নবদ্বীপের চলাকেরা, তাহার আধ আধ বাণী এবং তাহার 'বৌডিডি' ডাক ভ্রাতৃজায়ার নিকট বেশ একটু মিষ্ট বলিয়া বোধ হইত। সুতরাং ডেপুটি গৃহে তাহার অন্নের সংস্থান অচল অটল হইয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে বিধাতার খেয়া হইতে যখন সাত আটটি বালক বালিকা নামিয়া আসিয়া তারিণীবাবুর গৃহ-খানিকে একখানি ক্ষুদ্র বাজারের মত করিয়া তুলিল, তখন হইতে তিনি অর্থসঞ্চয়ে বিশেষ মনোযোগ দিলেন এবং সেই সময় হইতে তাঁহার পরিধেয় বসন অবধি গৃহের আসবাব পত্র মায় বৈঠকখানার টেবিলটিও ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া বর্ত্তমানে ক্ষুদ্রতম আকার ধারণ করিয়াছে। ভগবানের প্রকোপবশতঃ একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও কেবল নিজের দেহখানি পছন্দ মত ছোট করিয়া লইতে পারেন নাই। এই জন্য বাহির হইবার সময়ে যখন পুরা দশহাত কাপড় এবং বড় বড় জামা কামিজের প্রয়োজন হয়, তখন তিনি মনে মনে ভারি বিরক্ত হয়েন। এ পর্য্যন্ত তাঁহার সংসারযাত্রা এইভাবে চলিয়া আসিয়াছে এবং হাতে যে ভাবে হউক, পয়সাও বিস্তর জমিয়া গিয়াছে।

একদিন তাঁহার প্রতাপে মহকুমার সমস্ত লোক থরহরি কম্পমান্ ছিল। মোক্তারগণ তাঁহার কাচারীতে যাইবার-কালে দুর্গানাম জপ করিতে করিতে যাইতেন, কারণ তিনি অনেক সময়েই সকারণে এবং অকারণে তাঁহাদের প্রতি চটিয়া লাল হইতেন এবং কখন কাহাকে কি বলিয়া বসিতেন তাঁহার ঠিক ছিল না। পেন্সন লইবার পর হইতে তাঁহার প্রকৃতি অনেকটা মোলায়েম ভাব ধারণ করে এবং তিনি সহরের মধ্যে একজন মস্ত নেতা হইয়া পড়েন। তখন ছোট বড় দেশের অনেক কাজ তাঁহার হাতে আসিয়া পড়িতে লাগিল এবং সহরের অনেক লোক অতি সহজেই তাঁহার সহিত মেলামেশা করিতে আরম্ভ করিল।

যখন দেশের সকল নেতা বাঙ্গালী সৈন্য এবং সমরঋণ সংগ্রহ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন, তখন তারিণী-বাবুর হাতেও এক মস্ত কাজ জুটিল; তিনিও প্রাণপণে সরকারের সাহায্যের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

(৩)

তারিণীবাবু বৈঠকখানায় অতি ক্ষুদ্র একটি টেবিলের এক পাশে বসিয়া খবরের কাগজ পাঠ করিতেছিলেন, এমন সময়ে তড়িৎ প্রভৃতি যুবকেরা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

যুবকেরা তাঁহার বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া নিঃসন্দেহ যুদ্ধে যাইবার জন্য পরামর্শ করিতে আসিয়াছে অনুমান করিয়া গর্ব্বে তাঁহার বক্ষস্থল স্ফীত হইয়া উঠিল। অতিশয় আগ্রহের সহিত চস্মার উপরকার ফাঁক দিয়া তাহাদের মুখের দিকে তিনি চাহিয়া রহিলেন। দেখিতে পাইলেন প্রত্যেকের মুখশ্রীই যেন তরুণ-অরুণ-স্পর্শ-পুলকিত পদ্মফুলটির মত অচিরাগত সম্মুখসমরে বিজয়লাভের আশায় উৎফুল্ল এবং অভিনব কঠোর কর্ত্তব্যের উৎসাহে উদ্দীপিত।

তারিণীবাবু কিঞ্চিৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, কি জন্য এসেছ তোমরা ?"

যুবকদিগের মধ্যেও দুইজন হাসিয়া উঠিল। সে হাসি তারিণীবাবুর হাসিরই প্রত্যুত্তর অথবা তারিণীবাবুর তখনকার চেহারা স্বভাবতই কৌতুকপ্রিয় যুবকদিগের হাসি উৎপন্ন করিয়াছিল, তাহা ঠিক করিয়া বলা শক্ত। কারণ, তখন তারিণীবাবু কাপড়ের বাজার নিতান্ত গরম বলিয়াই হউক আর যে জন্যই হউক ছয় হাত কি সাতহাত মাত্র একখানি মোটা কাপড়ের সাহায্যেই তাঁহার বিশাল দেহের বিকটনগ্নতা আবৃত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বলা বাহুল্য, সে কাপড়ের অধিকাংশই তাঁহার উদরের বেষ্টন-কার্য্যে নিঃশেষ হইয়াছিল। সংযুক্ত ভ্রূযুগলের উপর সোনার চশমা, অতিশয় ক্ষুদ্র একটি টেবিলের সম্মুখে উক্তপ্রকার বসনাবৃত তাঁহার সুবিশাল মধ্যদেহ, বর্ত্তুলাকার বদনমণ্ডলের চরিতার্থতার প্রসন্ন হাসি—এই সকলে মিলিয়া তাঁহাকে তখন অপূর্ব্বদর্শন করিয়া তুলিয়াছিল।

সে যাহা হউক, যে যুবকটি কিঞ্চিৎ গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছিল, সে বলিল, "বহুদিন থেকেই আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করেছি। ঘরে ব'সে আর দিন কাট্‌ছে না; ইচ্ছে হচ্ছে সৈন্যদলে ঢুকে পড়ি। সেখানে গেলে আমাদের কোন কষ্ট হবে না ত ? আপনি আমাদের সকল কথা ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিন।"

"ভালকথা বলেছ, পরেশ! জলের মত ক'রে আমি তোমাদের সকল কথা বুঝিয়ে দিচ্ছি।" এই কথা বলিয়া তারিণীবাবু বক্তৃতার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

সভা করিয়া বড় বড় বক্তৃতা করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। উঠিয়া দাঁড়াইয়া এক সঙ্গে অনেকগুলি কথা বলিতে হইলেই তাঁহার ভারি গণ্ডগোল বাধিয়া যাইত। হাত পা নাড়িয়া টেবিল চাপ্‌ড়াইয়া দুই চারি কথা বলার পর আর কি বলিতে হইবে, সহসা তাহার কিছুই মনে আসিত না। একটা কথার অর্দ্ধেক বলিয়া অবশিষ্ট অংশ মিলাইবার জন্য, তিনি যখন নিতান্ত খাপছাড়া কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করিয়া বসিতেন অথবা মুখভঙ্গী করিয়া কিম্ভূতকিমাকার কাণ্ড করিয়া ফেলিতেন, তখন নিতান্ত পেচক-প্রকৃতির লোকও হাস্যসংবরণ করিতে পারিত না।

এই জন্যই তিনি শেষে আর কোন সভাসমিতিতে যোগদান করিতেন না। বাড়ীতে কোন লোক দেখা করিতে আসিলে শ্রোতৃবর্গের নিকট তাঁহার সেই ঋণ সার সুদ কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ করিয়া নিতেন। তাহাকে একঘণ্টার জায়গায় তিনঘণ্টা বসাইয়া রাখিয়া নানারকমের উদাহরণ, একটা পেন্সিল বা কলমের সাহায্যে আকাশমণ্ডলে অশেষপ্রকারের রেখাপাত এবং একখণ্ডকাগজের উপর অদ্ভুত চিত্রাঙ্কণদ্বারা আপনার বক্তব্য পঁচিশবার করিয়া বুঝাইয়া তবে তাকে ছাড়িয়া দিতেন।

কাহাকেও কোন কথা বুঝাইতে হইলে তিনি তিনপ্রকারে মনের ভাব প্রকাশ করিতেন। প্রথমতঃ বিশেষভাবে শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণপূর্ব্বক নাকের উপর হইতে চশমাজোড়া খুলিয়া লইয়া তাহার সাহায্যে অথবা একটা পেন্সিলদ্বারা সম্মুখস্থ আকাশে সরলবঙ্কিম নানাবিধ রেখা টানিতেন। শ্রোতার বুদ্ধিস্থূল বলিয়া প্রতীত হইলে, তৎক্ষণাৎ টেবিলের উপর হইতে একটুকরা কাগজ লইয়া তাহাতে বহুপ্রকারের দাগ কাটিয়া ছবি আঁকিয়া বক্তব্যবিষয় সরল করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন। তাহাতেও শ্রোতার জ্ঞানসঞ্চার না হইলে, নিজের কর্ম্মজীবনের, ফৌজদারী আদালতী মামলা মোকর্দ্দমার গল্প করিয়া তাহার কর্ণবিবর ঝালাপালা করিয়া দিতেন। এই শেষোক্ত পন্থা তিনি সকল শ্রেণীর লোকের জন্য অবলম্বন করিতেন না, কেবল বৈষয়িক লোকের জন্যই রাখিয়া দিতেন। "বুঝিতে পারিলাম না" এইরূপ ভাবপ্রকাশ করিয়া কেহই তাহার নিকট হইতে নিষ্কৃতি পাইত না। যতক্ষণেই হউক, তাহাকে স্বীকার করিয়াই যাইতে হইত, "হ্যাঁ, বল্লেন বেশ বুঝতে পেরেছি।"

দুই একটা দুষ্ট লোক এমনও ছিল যে তখনও বলিত "বিষয়টা বেশ পরিষ্কার হ'ল না, আর একটু বুঝিয়ে বলুন।"

নিজের বৈঠকখানায় বসিয়া অথবা অন্য লোকের বাড়ী যাইয়া এই প্রকারে তারিণীবাবু সমরঋণে টাকা দেওয়া এবং বাঙ্গালী যুবকদের যুদ্ধে যাওয়া সম্বন্ধে অশেষবিধ বক্তৃতা করিতেন। বলাবাহুল্য, হৃষ্টপুষ্ট নধরকান্তি পুত্রদিগের মধ্যে কাহাকেও যুদ্ধে পাঠান অথবা নিজের সঞ্চিত অর্থভাণ্ডার হইতে এক পয়সাও সরকারের উপকারের জন্য ব্যয় করিবার কথা কোন দিন তাঁহার কল্পনায়ও উদিত হইতে পারে নাই।

সে যাহা হউক, পরেশের কথা শুনিয়া তারিণীবাবু মনে মনে কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেন এবং অবশেষে নাকের উপর হইতে চস্‌মা জোড়া খুলিয়া অতি সন্তর্পণে খাপের ভিতর পুরিলেন। তদ্দ্বারা আকাশে এক হরাইজণ্টাল রেখা টানিয়া বলিতে লাগিলেন, "এই তোমরা সকলে দেখতে পাচ্ছ, আমি যে প্রাণপণে সৈন্যসংগ্রহের জন্য চেষ্টা কচ্ছি, সেটা যদি একটা বিশেষ মহৎ কাজ না হবে তা হ'লে আমার মত লোক—সে কথা বলা উচিৎ নয়-কি এমন করে লাগ্‌ত ?"

মাথা নাড়িয়া পরেশ বলিল, "যা বল্লেন, আপনার মত এত বড় একটা লোক কি আর যে সে কাজে মাথা ঘামায় ?"

তারিণীবাবু বলিলেন, "ঠিক বুঝেছ তুমি। আমার আর সব কথাও তুমি সহজেই বুঝতে পার্ব্বে !"

পরেশ আবার বলিল, "আপনার কথা আমি জলের মত বুঝতে পারি। বোঝে না কেবল তড়িৎ আর বিজয়।"

তড়িৎ কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া পরেশের দিকে চাহিয়া বলিল, "বাঃ, কি বুদ্ধিমান তুমি! সকল কথাই জলের মত বোঝ! পৃথিবীতে তোমার মত বুদ্ধিমান জীব আর কে আছে—"

তড়িৎকে বাধা দিয়া তারিণীশঙ্কর বাবু হাসিয়া বলিলেন, "থামো হে, ঘরোয়া বিবাদে আর কাজ নেই বাপু! সমস্ত পৃথিবী যে বিপদে পড়েছে, তাথেকে এখন উদ্ধার পেলে হয়।"

এই বলিয়া তিনি আসন্ন বিপত্তির আশঙ্কাতেই যেন কয়েক মুহূর্ত নীরব বিমর্ষ ভাবে থাকিয়া আবার বলিলেন, "এখন তোমরা সকলে আমার কথাগুলি শুনিয়ে বোঝবার চেষ্টা কর।" এবার তিনি চস্‌মার খাপ রাখিয়া এক টুকরা কাগজের উপর দুইটি সমান্তরাল রেখা আঁকিয়া তাহার মধ্যে একটি রেখার উপর পুনরায় পেন্সিল চালাইতে চালাইতে বলিলেন, "এই দেখ একদিকে জার্ম্মাণরা পাশ শক্তির বলে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর,—বুঝলে কি না ;—আপনাদের আধিপত্য চালাবার চেষ্টা কচ্ছে ; আর একদিকে (অপর রেখাটির উপর পেন্সিল চালাইয়া) ইংরাজ, ফ্রান্স প্রভৃতি মিত্রশক্তিবর্গ জগতের মহাধন স্বাধীনতা রক্ষা জন্য চেষ্টা কচ্ছেন। অসৎ আর সৎ দুইটা দিক,—বুঝলে কি না—যেমন দানব পক্ষ আর দেবতাদিগের পক্ষ। এ ইংরাজ, যাঁরা আমাদের দেশের রাজা, তাঁদের পক্ষ হ'য়ে লড়াই করবার জন্য আমি তোমাদের ডাক্‌ছি। এই হ মোট ব্যাপারটা ; তারপর বলছি শোন—" এই বলিয়া বক্তা শ্রোতৃবর্গের মৌনে স্বকীয় বাক্যের গুরুত্ব অনুভব করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া কাগজের উপ চারি পাঁচটি রেখা অঙ্কিত করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন "এই দেখ মহানুভব ইংরেজ তাঁদের দেশের স্বাধীনতা রক্ষা জন্য যুদ্ধ কচ্ছেন, আরও কত লোক জর্ম্মাণীর কুমতলব বাধাদিবার জন্য লড়াইতে যোগ দিয়াছেন ; তোমরা বাঙ্গা হ'য়ে বাঙ্গলার সুখের জন্য, আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী রাজা জন্য কেন যুদ্ধ কর্ব্বে না ?" এই বলিয়া তারিণীবাবু টেবিলটির উপর সজোরে এমন এক চপেটাঘাত করিলে যে তাহাতে তাহার পরমায়ু অনেকটা নিঃশেষ হইয়া গেল সম্মুখবর্ত্তী শ্রোতারা বহু কষ্টে ও কোন প্রকারে সশ হাসি সম্বরণ করিতে পারিল না।

তারিণীবাবু পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "হাঁ, আমা যদি বয়স থাকত, আমি যদি তোমাদের মত ছেলেমা হতুম, তা হলে কবে যুদ্ধের বায়গায় চলে যেতুম। এখন মাঝে মাঝে আমার শরীর থেকে একটা উৎসাহের আ যেন উদ্গীর্ণ হ'তে থাকে।"

এই কথা শুনিয়া বিজয় পরেশের গায়ে এমন এ ধাক্কাদিল যে সে বেঞ্চি হইতে গড়াইয়া পড়িল গে তাড়াতাড়ি সে কোন মতে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল, "স কথা, আপনার মত ক'জন ? এখনও এই বয়সে যে র করে আপনি আমাদের উৎসাহ দিচ্ছেন, এমন কয়জ দেয় ?"

সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তারিণীবাবু কাগজে

উপর কয়েকটি বৃত্ত আঁকিয়া আবার বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "এই ভাখো, আমি তোমাদের খুব ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই সূর্য্য (এক একটি বৃত্তের উপর পেন্সিল রাখিয়া), এই পৃথিবী, আর এই গুলি অন্যান্য গ্রহ। মারকিউরি বল, ভেনাস্ বল, সকল গ্রহই সূর্য্যের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়, কেউ বাদ যায় না; by the Law of Analogy পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরতে বাধ্য। সেই রকম সবাই যুদ্ধ কর্‌চে, ইংরেজ করচে, ফরাসী করচে—" পরে কি বলিতে হইবে কথাগুলি হঠাৎ তারিণীবাবুর মনে আসিতে ছিল না, তখন পরেশ বলিয়া উঠিল, "তোমরা কেন যুদ্ধ কর্‌বে না ?"

তারিণীবাবু পরম আনন্দিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, পরেশ, তুমি আমার সকল কথা বুঝতে পারছ। Law of Analogy। সকলে যখন সে কাজ করছে, তখন তোমরা কেন কর্ব্বে না ?"

পরেশ। আমি আপনার সকল কথা সহজেই বুঝতে পারি। ওদের হয় ত এখনও ঠিক হয়নি।

বিজয়। ঠিক হবে না কেন ? আমাদেরও সকল কথা বেশ clear হয়েছে। কোন্ stupid আবার ওঁর কথা বুঝতে না পারে ?

"আরও ভাখো—এই বলিয়া তারিণীবাবু আর এক-টুকরা কাগজে একটি সরলরেখা টানিয়া তাহার দুই-দিক দেখাইয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন—"তোমরা মরবার কথা ভাবছ ? এই ভাখো, যুদ্ধে গেলে হয়ত এই মৃত্যু আর ব্যারামে মর্‌লে এই মৃত্যু উভয়ই ত এক। তবে তফাৎ হচ্ছে এই যে যুদ্ধের মৃত্যুতে স্বর্গলাভ, অক্ষয়-গৌরব; আর ব্যারামের মৃত্যুতে খ্যাতি অখ্যাতি কিছুই নেই। তবে কেন লোকে যুদ্ধে মরবে না ?"

পরেশ কহিল, "আপনি যেমন ক'রে বুঝিয়ে দেন, তা'তে মরামানুষেরও চোখ ফোটে। এর জন্যেই ত আমরা আপনার কাছে আসি।"

তারিণী। তারপর সমরঋণের কথা তোমাদের কাছে বলছি———"

পরেশ। আপনি ত নিশ্চয়ই অনেক টাকা দিয়েছেন। অবশ্য সে কথা জিজ্ঞাসা করাও নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু একবার আমাদের জানতে ইচ্ছা হচ্ছে আপনি ক' হাজার——"

সে কথা যেন শুনিতেই পান নাই এমন ভান করিয়া তারিণীবাবু সমরঋণে টাকা জমা দেওয়ার সার্থকতা বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন।

পরেশ বাধা দিয়া কহিল, "সে সব ত জানিই, কতবার আপনার মুখে শুনিয়াছি। তা আপনার ছেলেদের ভিতর একজনকে যুদ্ধে পাঠান না ? তড়িৎ অস্ফুটস্বরে বলিল, "ও সমস্ত কথা উনি শুনতেই পান না।"

বিজয় বলিল, "আপনি ক' হাজার——"

"হাঁ দেব বই কি ? আমি কি আমার কর্ত্তব্যপালন কর্ব্ব না ? নিশ্চয় কর্ব্ব।" এই কথা বলিয়া তারিণীবাবু একেবারে চুপ করিলেন। নিজের টাকা খরচ এবং পুত্রদিগের মধ্যে কাহাকেও যুদ্ধে পাঠাইবার প্রস্তাব শুনিয়া তাঁহার উৎসাহে হঠাৎ মন্দা পড়িয়া গেল। দেখিয়া পরেশ বলিল, "আজকের মত এখন আমরা উঠি। আর এক সময় আপনার কাছে আস্‌ব" বলিয়া তাহারা উঠিল। তারিণীবাবুও আর তাহাদিগকে বাধা দিলেন না।

(৪)

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তাহারা নবদ্বীপকে দেখিতে পাইল, দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া তড়িৎ বলিয়া উঠিল, "ডাদা কোট্‌ঠেকে আস্‌স ?" সহরের প্রায় পনর আনা লোকই তাহাকে দাদা এবং সময়ে সময়ে 'ডাডা' বলিয়া ডাকিত। হাতে ছোট একটি পুঁটলী দেখাইয়া নবদ্বীপ উত্তর করিল, "হাটে পোঁটলা রয়েচে ড্যাক্‌চো না ? বাজার ঠেকে বৌডিডির জন্যে পান খাবার মসলা নিয়ে আস্‌চি।"

তড়িৎ। বৌডিডি তোমার বড্ড ভালবাসেন, না ?

নবদ্বীপ। হাঁ, বাসেন বই কি ? টোমরা কোটায় যাচ্চ ?

তড়িৎ। আমরা শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছি, টুমি ?

নবদ্বীপ একগাল হাসিয়া বলিল, "বাঃ, টিনজনেই শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছ ? বেশ। ভাল ক'রে খেয়ে এসো, আর আমার জন্যে ——"

পরেশ তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "বাস্তবিক আমরা কোথায় যাচ্ছি জান ? যুদ্ধে যাচ্ছি। এই তোমার দাদা কত লোককে যুদ্ধে পাঠাবার জন্য চেষ্টা কচ্ছেন, তা'ত জান। তাঁরই পরামর্শে আমরা বাঙ্গালী পল্টনে সৈন্য হয়ে যাচ্ছি।"

নবদ্বীপ শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ্‌ করিয়া রহিল,—পরে বলিল, "যাও, টোমরা টিন বন্দুটে জর্ম্মানকে এবার একেবারে গগার পার ক'রে ডিয়ে এসো।"

"পরেশ। ঠাট্টা নয় দাদা! সত্যি আমরা যুদ্ধে যাচ্ছি।" পরে একটু বিমর্ষভাব ধারণ করিয়া পরেশ আবার বলিল, "অনেক দিনের জন্য যাচ্ছি, বহু দূরে, তোমাদের সঙ্গে আবার কবে দেখা শুনো হবে, কিছু মনেটনে করো না।"

নবদ্বীপ ভাবিল, পরেশের কথা বাস্তবিক ঠাট্টা নয়। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "সট্টি বল্‌চ টোমরা যুড্ডে যাবে? মা বাপ তোমাদের ছেড়ে ডেবেন?"

পরেশ। ছেড়ে দিবেন না কেন? আমরা যে রকম যুদ্ধে যাচ্ছি তাতে মরবার ভয় ত কিছু নেই।

নবদ্বীপ সে কি রকম?

পরেশ। ফরাসী দেশে খুব বড় যুদ্ধ হচ্ছে, সেখানকার কত লোক মারা যাচ্ছে। অনেক বাড়ীতে পুরুষছেলে একটি নেই। সেই সব বাড়ীতে আমাদের পাহারা দিতে হবে। খাবার জিনিষ বিস্তর পাওয়া যায়; রুটি, বিস্কুট, মাংস ডিম আর বোতল বোতল খাসা মদ।

নবদ্বীপ। ভারি মজা টো হবে টোমাডের।

বিজয়। মজা বলে মজা! লাল টুক টুকে ছোট ছোট মেম; কুলিন বামুনের মত এক এক জনের সঙ্গে পাঁচ সাতটি ক'রে গেঁথে দেবে।

নবদ্বীপ। যাও, আর ঠাট্টা করুটে হবে না।

পরেশ। ঠাট্টা নয়, দাদা, সত্যি। সেখানে এখন ব্যাটা-ছেলের খুব অভাব হয়েছে কি না। কত শত মেয়ে, সবাই কি আই বুড় থাক্‌বে? তুমিও আমাদের সঙ্গে চল না? তোমার একটি ভাল মেম বিয়ে করিয়ে দেব।

নবদ্বীপ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; পরে বলিল, "সি! আমার কি আর বিয়ে কর্‌বার বয়স আসে?"

পরেশ। কি বল্‌ছ তার ঠিকানা নেই। সে দেশে তোমাথেকে অনেক বেশী বয়সের লোক বিয়ে করে। তোমার আর বয়স কত?

এই কথা শুনিয়া নবদ্বীপ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিল, তারপর একটু হাসিয়া বলিল, "টোমরা কাজলামো কচ্চো।"

পরেশ। এসব কথা তোমার কাছে ফাজলামো হ'লো? আচ্ছা বেশ; তোমায় আর কিছু বলতে চাই না, আমরা চল্‌ম।

এই বলিয়া পরেশ বিজয়ের হাত ধরিয়া প্রস্থানোদ্যত হইল। নবদ্বীপ বলিল, "ঠামো না, যেয়ো এখন।" পরেশ বুঝিল তাহাদের ঔষধে কাজ করিয়াছে; থামিয়া অত্যন্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, "সত্যি দাদা, তুমিও আমাদের সঙ্গে চল না?" নবদ্বীপ অনেক আপত্তি করিল, অনেক বাধা বিঘ্নের উল্লেখ করিল, তাহার বৌদিদির মত হইবে না বলিল। পরেশ সকল বাধা বিঘ্ন খণ্ডাইয়া তাহার বৌদিদির মত করাইবার ভার লইয়া অবশেষে তাহাকে স্বীকার করাইল যে সে যুদ্ধে যাইবে।

সকল পরামর্শ সাব্যস্ত করিয়া প্রস্থানের কালে হঠাৎ এক মস্ত বিপত্তির কথা পরেশের মনে উদয় হইল। সাধারণ ভাবে যুদ্ধে যাইতে হইলে নিজের পকেট হইতে টাকা পয়সা খরচের কোন প্রয়োজন হয় না বটে; কিন্তু তাহারা যেরূপ অসাধারণ সমরব্যাপারে যোগদান করিতে যাইতেছে, তাহাতে অর্থের একান্ত প্রয়োজন—অন্ততঃ এক হাজার টাকা চাই। নবদ্বীপ আকাশ হইতে পড়িয়া বলিল, "টোমরা এটক্ষণ টা' বল নাই কেন? আমি এট টাকা কোঠায় পাব?"

পরেশ। সে জন্যে তোমার ভাবনা নেই। আমি তোমার টাকার যোগাড় করে দেব।

নবদ্বীপ। কেমন করে?

পরেশ নবদ্বীপকে লইয়া একটু দূরে গেল এবং অপর দুই ব্যক্তির অশ্রাব্যস্বরে দুইজনে অনেকক্ষণ ধরিয়া কত কি পরামর্শ করিতে লাগিল। নবদ্বীপকে দেখিয়া ভারি বিমর্ষ বোধ হইল। সে বার বার কোন প্রস্তাবে অমত করিয়া শেষে যেন রাজি হইল।

(৫)

প্রায় এক সপ্তাহ পার হইয়া গেল। তারিণীবাবু এক দিন পূর্ব্ববৎ বৈঠকখানায় বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও একজন লোককে সৈন্য করিয়া পাঠান গেল না; ইহার অর্থ কি? তড়িৎ, বিজয় এবং পরেশ যেমন করিয়া তাঁহার কথাগুলি মনোযোগের সহিত শোনে তাহাতে বোধ হয় আজই তাহারা সৈন্যদল ভুক্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু কই কাজে ত কিছু দেখাইতেছে না। এমন সময়ে তড়ি

বন্ধু তাঁহার চিন্তা-স্রোতে বাধা দিয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। দেখিয়া তারিণীবাবুর অনেকটা ভরসা হইল, বুঝি এইবার তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্যই উঁহাদের আগমন হইয়াছে। পূর্ব্বদিনের বক্তব্য বিষয়ের যতটা অংশ বাকী ছিল, তাহা পূরণ করিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, এমন সময়ে তড়িৎ বলিয়া উঠিল, "আমরা তিন জনে সমবেতভাবে এক হাজার টাকা দিয়ে এসেছি।"

বিস্মিত এবং পুলকিত হইয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "এক হাজার! এত টাকা তোমরা কোথায় পেলে?"

তড়িৎ। একটু কৌশলে আদায় হয়েছে।

তারিণী। সে কি রকম?

তড়িৎ। এত বড় মহৎ কাজ, দেশের এবং সাম্রাজ্যের কাজ, এর জন্য কত লোক কত করছে, যুদ্ধে যাচ্ছে, প্রাণ দিচ্ছে, আর আমরা একটু মিথ্যা প্রবঞ্চনাও করতে পারব না? বিজয় গিয়া তার মার কাছে কেঁদে কেটে বল্লে,—তিনদিনের ভেতর আমরা চু'শো টাকা চাই, একান্ত দরকার, নইলে আমি আত্মঘাতী হব। মায়ের প্রাণ ছেলের মুখে আত্মঘাতী হবার কথা শুনে গয়না বাঁধা রেখে টাকাটা দিয়ে দিলে। সেদিকে সুবিধে হবে না দেখে পরেশ গোপনে তার বাপের চাবিটি হাত ক'রে লোহার সিন্দুক থেকে চার শো টাকা নিয়েছে। তার বাপ এখনও টের পাননি। পরেশের দেখাদেখি আমিও সেই পথ ধরেছি। আজ কালকার দিনে জানেন ত একটু চালাকি না করলে কোন কাজ হয় না।

তারিণীবাবু যুবকদিগের চালাকিতে পরম পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বেশ করেছ; তোমরাই ধন্য, বাবা। প্রবঞ্চনার কথা আবার কি বলছ? এ ত নিজেদের টাকা; নিজেদের টাকা নিজেরা সৎকাজে ব্যয় করেছ, তা'তে আর প্রবঞ্চনা কি? আরে মা বাপ; মা বাপ বড় ভাইয়ের হাতে যদি বিস্তর টাকা থাকে, আর তারা সৎ কাজে না লাগায়, সে টাকা নিয়ে এইরূপ করা ত উপযুক্ত লোকের কাজ। এ জন্যে তোমরা একটুও সঙ্কোচ বোধ কোরো না; আমি বলছি, এ তোমাদের অতি মহৎ উদার কাজ হয়েছে।"

কাগজের উপর কত কি আঁকিয়া, আকাশের গায়ে রেখাপাত করিয়া তারিণীবাবু অতীব আনন্দের সহিত আরও কত কথা বুঝাইতে লাগিলেন। যুবকেরা মৃদুহাস্যের সহিত সকল কথা হজম করিতে লাগিল।

বিদায়কালে বিজয় জামার পকেট হইতে তিনখানা কাগজ বাহির করিয়া বলিল, "এই কাগজ ক'খানা আপনি রাখুন। মাস মাস সুদের টাকাটা নিয়ে আসবেন।"

তারিণী। সুদের টাকার জন্য আমাকে আবার যেতে হবে কেন? তোমরা যাও বা এই কাগজ নিয়ে সেই যা'ক না কেন পোষ্ট আফিস সুদের টাকা দিয়ে দেবে।

পরেশ। সে জন্যে নয়। এখন সত্যি কথাটা বলতে হয়। ও টাকাও আপনার, কাগজও আপনার! আমরা কেবল উপলক্ষ্য। মেম বিয়ে করাবার লোভ দেখিয়ে নবদ্বীপবাবুকে দিয়ে আমরা এই কাজ করেছি। তিনি গোপনে আপনার চাবি নিয়ে সিন্দুক থেকে নোট বের ক'রে দিয়েছেন। মহৎ কাজ, এজন্য তাঁকে কিছু বলবেন না, আপনিও অনর্থক রাগ কর্ব্বেন না। আমরা এখন আসি তবে।

কাগজ কয়খানা রাখিয়া যুবকেরা চলিয়া গেল।

পরেশ যতক্ষণ কথা বলিতেছিল, ততক্ষণ তারিণীবাবু স্তম্ভিত, বজ্রাহতের ন্যায় বসিয়া তাহার কথা শুনিতেছিলেন কি সর্ব্বনাশ! একেবারে একহাজার টাকা লোকসান! তাহার কথা শেষ হইলে পর তিনি একবার দাঁত কিড়মিড় করিয়া "কি বলছে ব্যাটারা!" বলিয়া তৎক্ষণাৎ সত্যাসত্য সন্ধানে লোহার সিন্দুকের দিকে ছুটিলেন।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিরাশার আশা।

জোছনা ফুরায়ে এল, মিতে গেল তারা।
কাঁদে কবি—ধরা এবে হ'ল জ্যোতি হারা।
—মোছ অশ্রু, তোল আঁখি, ওই প্রাচী-শিরে
আলোকে ঢাকিয়া বিশ্ব রবি উঠে ধীরে।

শ্রীসতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত

দ্বারকা।

(২)

দ্বারকানাথ বিষ্ণুর একটি নাম "ডাকোজী রণছোড়"। বোম্বাই প্রদেশের ভক্তদিগের মধ্যে এই নামটি বিশেষভাবে প্রচলিত। এই নামের সঙ্গে জড়িত একটি সুন্দর কিম্বদন্তী স্থানীয় লোকের মুখে সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। আহ-মদাবাদ জেলার কোন গণ্ডগ্রামে ডাকোজী নামক বিষ্ণুর এক মহাভক্ত বাস করিতেন। তিনি প্রতিবৎসর পদব্রজে বহুশত মাইল অতিক্রমণ পূর্ব্বক দ্বারকায় যাইয়া ভগবানের বিগ্রহদর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতেন। যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহার দেহে শক্তি ছিল ততদিন তিনি তাঁহার এই বার্ষিক ব্রত উদ্‌যাপনে বিরত হন নাই। এই তীর্থগমন এবং গৃহে প্রত্যাগমন, ইহাতেই তাঁহার বৎসরের অধিকাংশ ভাগ ব্যয়িত হইত। অবশেষে যখন বার্দ্ধক্য আসিয়া তাঁহাকে একেবারে অপারগ করিয়া ফেলিল, তখন তিনি শেষবার দ্বারকায় যাইয়া ভগবানের চরণে কাঁদিয়া নিবেদন করিলেন,—"ঠাকুর, তোমাকে এজীবনে এই আমার শেষ দেখা। প্রভু, তোমার দেওয়া আমার এই দেহ এখন জরাজীর্ণ, এখন আর আমার দু'পা চলিবারও শক্তি নাই, কেবল তোমারই কৃপায় শক্তিলাভ করিয়া এবারেও আমি এই ভগ্নদেহটাকে টানিয়া তোমার চরণে আনিয়াছি। আর ত আমি তোমার এই ভুবনমোহন মূর্ত্তি দেখিব না। তবে হে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, হয় তুমি দয়া করিয়া এই কর,—যেন আমি ইচ্ছামাত্র গৃহে বসিয়াই তোমাকে দেখিয়া চরিতার্থ হইতে পারি, আর না হয় এইখানেই তোমার সম্মুখে আমার জীবনান্ত হউক।" ভক্তবৎসল বিষ্ণু ভক্তের দুঃখে বিচলিত হইলেন। ডাকোজী ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিলেন,—শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী ভগবান শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন—"ডাকোজী, তুমি অধীর হইও না; তুমি আমার ভক্ত; ভক্ত আমার প্রাণ; তোমাকে না দেখিয়া আমি দ্বারকায় থাকিতে পারিব না। তুমি শীঘ্র উঠ আমাকে লইয়া তোমার গৃহে চল। মন্দির রক্ষকেরা এখন নিদ্রিত, চল, এই অবসরে আমরা পলায়ন করি।" ডাকোজী উঠিলেন এবং ভগবানের বিগ্রহ মাথায় তুলিয়া আনন্দসাগরে ভাসিতে ভাসিতে দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরদিন প্রভাতে দ্বারকাবাসী শ্রীমন্দিরে ভগবানের সিংহাসন শূন্য দেখিয়া হায় হায় করিতে লাগিল। আনন্দোজ্জ্বল দ্বারকাপুরী বিষাদের ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। শ্রীমন্দিরের পুরোহিতেরা কাঁদিয়া আকুল হইলেন এবং ভগবানের শূন্য সিংহাসনের সম্মুখে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া 'ধন্না' দিয়া পড়িয়া রহিলেন। অনুসন্ধানের জন্য দেশদেশান্তে লোক প্রেরিত হইল, কিন্তু কিছুদিন পর্য্যন্ত কোন সংবাদও মিলিল না। ওদিকে ডাকোজী দৈববলে বলীয়ান হইয়া এক মাসের পথ একদিনে অতিক্রম করিতে লাগিলেন। অবশেষে দেশে পৌছিয়া গৃহ প্রাঙ্গণে রম্যকুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক মহাসমারোহে তন্মধ্যে ভগবৎবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। আহম্মদাবাদ জেলায় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। লক্ষ লক্ষ ভক্তের চরণধূলায় ডাকোজীর গৃহ মহাতীর্থে পরিণত হইল। ক্রমে এ সংবাদ দ্বারকায় পৌছিল। পাণ্ডার দল অমনি ডাকোজীর গ্রামের দিকে ছুটিল। তাহারা আসিয়া যখন ডাকোজীর গৃহকে বেষ্টন করিল, ভগবান তখন আত্ম-গোপনের জন্য এক নিম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন। কিন্তু সেখানেও পাণ্ডাদিগের চক্ষু এড়াইতে না পারিয়া অবশেষে নিকটস্থ এক সরোবরের জলে ঝাঁপ দিলেন। পাণ্ডার দল প্রথমে জাল টানিয়া দেখিল, বিগ্রহ তুলিতে পারিল না। পরে অসংখ্য বড় বড় বড়শী সূত্রে গাঁথিয়া জলে ফেলিয়া টানিতে টানিতে বিগ্রহকে বিদ্ধ করিল, এবং হৃতধন উদ্ধার করিয়া জয়োল্লাসে দ্বারকাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। দ্বারকানাথ বিগ্রহের দক্ষিণকুক্ষিতে একটি ক্ষত-দাগ দেখাইয়া পাণ্ডারা এখনও সেই বড়শী অভিযানের কাহিনী যাত্রীদিগকে শুনাইয়া থাকে। আহম্মদাবাদে অবস্থান কালে আমি শুনিয়াছিলাম যে, সে জেলার বহু লোক এখনও বিশ্বাস করে যে দ্বারকানাথ অদ্যাপি ডাকোজীর কুটীরেই অবস্থান করিতেছেন, এবং দ্বারকায় বিষ্ণুর এক নকল বিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছে। আর তাহারা পূর্ব্বোক্ত কিম্বদন্তীর প্রথমাংশই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, কিন্তু উহার হাস্যোদ্দীপক শেষাংশ পাণ্ডাদিগের রচিত গালগল্প বলিয়া উপেক্ষ

ওমার মিশর জয়ের সময়ে এই পাঠাগার আগুন লাগাইয়া নষ্ট করেন। পণ্ডিত সৈয়দ আমীরআলি সাহেব তাঁহার History of the Saracens নামক গ্রন্থে এ কথা অস্বীকার করেন। তাঁহার মতে ওমারের স্থায় সদাশয় ব্যক্তির দ্বারা একার্য্য অনুষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। তিনি বলেন, জুলিয়াস সিজার যখন এলেকজেন্দ্রিয়া নগর আক্রমণ করেন, সেই সময় উক্ত পাঠাগারের কিয়দংশ নষ্ট হইয়াছিল।···তাহার পর চতুর্থ খৃষ্টাব্দে রোমসম্রাট্‌-থিয়োডোসিয়াস্ (Theodosius) অবশিষ্টাংশ নষ্ট করেন। এসম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। যাহা হউক, যাঁহার দ্বারাই এই কার্য্য হইয়া থাক্, তিনি পৃথিবীর মহা ক্ষতি করিয়াছেন সন্দেহ নাই। অসিনাস্ পলিও রোমে প্রথম সাধারণ পাঠাগার স্থাপিত করেন। ইহার পর রোমসম্রাট্ অগষ্টাস্ প্যালাটিন (Palatine) নামে এক প্রকাণ্ড পাঠাগার স্থাপন করেন।

গিবন (Gibbon) বলিয়াছেন যে মিশর দেশে ফতেমীয় (Fatamites) নামধারী মুসলমান সম্রাট্‌গণ যে পাঠাগার স্থাপন করেন, তাহাতে একলক্ষ অতি সুন্দর বাঁধাই পাণ্ডুলিপি ছিল। স্পেনে ওমিয়াড্ (Ommiades) রাজগণের এক পাঠাগার ছিল। তাহাতে পুস্তকের সংখ্যা ছিল ৬০০,০০০ লক্ষ। ইহার মধ্যে ৪৪ খানি তালিকা পুস্তক (Catalogues) ছিল। স্পেন দেশে এণ্ডালুসিয়া বলিয়া একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। সেই রাজ্যে ৭০টি সাধারণ পাঠাগার ছিল।

এখন আমরা আধুনিক পাঠাগারের কথা বলিব। ইউরোপের আধুনিক বড় বড় পাঠাগারগুলির কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইংলণ্ডে ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরী (British Museum Library) নামে যে প্রকাণ্ড পাঠাগার আছে, তাহার বই রাখিবার আলমারীগুলি একত্রিত করিলে তাহার বিস্তৃতি হয় ৩২ মাইল। পুস্তকের সংখ্যা ১,২৫০,০০০ লক্ষ। পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ৮৯০০০ হাজার। সেই লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রতি বৎসর গড়ে ৪০০০০ হাজার পুস্তক সংগ্রহ করেন।

সম্রাট চতুর্দ্দশ লুই প্যারিসে Bibliotheque Nationale of Paris নামক যে পাঠাগার স্থাপন করেন তাহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার পুস্তকের সংখ্যা ১,৪০০,০০০ লক্ষের উপর। ক্ষুদ্র পুস্তিকার (Pamphlets) সংখ্যা ৫০০০০০ লক্ষ। এই স্থানে ১৭৫,০০০ লক্ষ পাণ্ডুলিপি আছে। মানচিত্র (Maps and charts) প্রভৃতির সংখ্যা ৩০০,০০০ লক্ষের উপর। পুরাতন মুদ্রা ও পদক প্রভৃতির সংখ্যা ১৫০,০০০ লক্ষ। অঙ্কিত চিত্র (engravings) পুস্তকের সংখ্যা ১৮,০০০। ইহা ব্যতীত ১০০,০০০ লক্ষ নানাবিধ চিত্র আছে।

এই ফ্রান্স দেশে আর একটি পুস্তকাগার আছে। তাহাতে ৬০০,০০০ লক্ষ পুস্তক আছে, ক্ষুদ্র পুস্তিকা আছে ইহার সংখ্যা ৮৫০০০ হাজার।

জর্ম্মাণীতে মিউনিচ্ নগরে একটি পুস্তকাগার আছে,—তাহাতে ছয় লক্ষ পুস্তক ও দশহাজার পাণ্ডুলিপি আছে।

অষ্ট্রীয়ার রাজধানী ভিয়েনার পুস্তকাগারে পাঁচলক্ষ পুস্তক ও বিশহাজার পাণ্ডুলিপি আছে।

রোমের ভেটিকান (Vatican) প্রাসাদে পোপদের যে পাঠাগার আছে তাহাতে দুইলক্ষ পুস্তক ও ৪০,০০০ হাজার পাণ্ডুলিপি আছে।

রুষিয়ার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে ৬৫০,০০০ লক্ষ পুস্তক ও ২১,০০০ হাজার পাণ্ডুলিপি আছে।

ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনের পুস্তকাগারে পুস্তকের সংখ্যা ৫০০,০০০ লক্ষ ও পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ১৫০০০ হাজার।

মশক নিবারণ।

(শ্রীমাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়।)

ম্যালেরিয়া বিষবাহী মশক সম্বন্ধে বহু আলোচনা ও গবেষণার বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। শব্দ ও বর্ণ বিশেষে মশকের নৈসর্গিক অনুরাগ বিচিত্র বলিয়াই মনে হয়।

মশক তাহার নিজের গুণ গুণ শব্দের স্থায় নিম্ন স্বরের নিতান্ত অনুরক্ত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তারকেশ্বর অঞ্চলে জনৈক ব্রাহ্মণ নিম্নস্বরে হারমোনিয়াম বাজাইয়া সহস্রাধিক মশক আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে মশকবহুলস্থানে কয়েকজন একত্রিত হইয়া খোলা যায়গায় যখন চলে, যে ব্যক্তি বেশী কথা বলে তাহার নিকট, বহু মশক একত্রিত হয়। বৈদ্যুতিক মোটর দ্বারা মশকবৎ ধ্বনি উৎপাদন করিয়াও ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে।

বর্ণের মধ্যে মশক হরিদ্রাবর্ণের বিরোধী এবং গাঢ় নীলবর্ণের নিতান্ত অনুরক্ত। নীলবর্ণের পর্দা ঝুলাইয়া এ বিষয় পরীক্ষিত হইয়াছে। একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নীলবর্ণের আচ্ছাদনে গা ঢাকিয়া শয়ন করিয়া প্রভাতে দেখিয়াছেন যে তাঁহার শয়ন ঘরটি মশকে পরিপূর্ণ।

ব্যাক্‌ট্রিও লজিকেল পণ্ডিতগণ বিভিন্ন বর্ণের মশক আকর্ষণের শক্তি নিম্নলিখিত রূপ স্থির করিয়াছেন :—

গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ	০	ঈষৎ সবুজবর্ণ	৪
কমলালেবুর বর্ণ	১		
শ্বেতবর্ণ	২	গাঢ় রক্তবর্ণ	৯০
ঈষৎ নীলবর্ণ	৩	নীলবর্ণ	১০৪

উপরোক্ত পরীক্ষা হইতে ইহা অনুমান করা যায় যে হরিদ্রাবর্ণের মোজা পরিধান করিলে মশকদংশন হইতে অনেকটা নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে। মশকগণ প্রায়ই পায়ে দংশন করিয়া থাকে। কথা না কহিয়া থাকিতে পারিলে আরও ভাল হয়। সকলেই ইহা আবশ্যকমত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

আনন্দ



সর্ব্ব দেবগণের সম্মিলিত তেজে মহিষ মর্দ্দিনী মহাশক্তির
আবির্ভাব।
[মার্কণ্ডেয় চণ্ডী—দেবীমাহাত্ম্য—মধ্যম চরিত]